গল্পসমগ্র

জরাসন্ধ

(এক খণ্ডে সম্পূর্ণ)

চ্যা টা র্জি   পা ব্‌ লি শা র্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত
চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

ভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্পসমগ্র

তিলোত্তমা

'অত গভীর মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ ?'

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার ঘোষ। বড় সওদাগরি অফিসে অনেকখানি উপরতলার চাকরে! ছুটির দিন বলে বেশবাসে কিছুটা ঢিলেঢালা। মুখে পাইপটি অবশ্য ঠিক আছে। কাছে এসে যেন আঁতকে উঠলেন, 'আরে, এ যে দেখছি বাংলা কাগজ!'

লাহিড়ী সাহেব মাথা না তুলেই একটু হাসলেন, 'কারে পড়লে বাঘেও ঘাস খায়, জান তো ?'

'মানে ?'

এবার মুখ তুললেন মিস্টার লাহিড়ী। সামনের টেবিলের উপরে ছড়ানো খবরের কাগজখানা গুটিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। রমলা বললে এতে নাকি অনেক ভাল ভাল মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। তা না হলে এই সব ট্র্যাশ আমি পড়ি! ম্যাটারের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, চেহারা দেখ! তেমনি ছাপা! একটা শীটে চোখ বুলোতেই মাথা ধরে গেছে।'

লাহিড়ী সাহেবের পুরো নাম তিনকড়ি লাহিড়ী, আধুনিক ভদ্রসমাজে যা উচ্চারণ করা যায় না। এই নামের জন্যে দীর্ঘদিন পরলোকগত পিতামাতার উপর তাঁর ক্ষোভ আজও মেটেনি।

দুটি সন্তান অকালে মারা যাবার পর এঁকে নাকি তাঁরা তিন কড়া কড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন যমের হাত থেকে। সিলী সুপারস্টিশান! কিন্তু স্কুলে-কলেজে ঐ নাম থাকায় পরে আর বদলাতে পারেননি। তবে লোকের কাছে তিনি টি· লাহিড়ী নামেই পরিচিত।

ইংরেজ আমলেই শ্বশুরের টাকায় বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন। ঘরে বাইরে সাহেবিয়ানার পত্তন তখন থেকেই। ইংরেজ চলে যাবার পর সেটা আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পশার। ছেলেকে ডাক্তারি পড়িয়েছেন এবং বিলেত পাঠিয়েছেন সেখান থেকে আরও গোটাকয়েক বড় বড় ডিগ্রী সংগ্রহ করে দেশে এসে যাতে কোন একটা বিষয়ে স্পেশালিস্ট হয়ে বসতে পারে। জাঁকিয়ে বসার মত প্রাথমিক উপকরণ যোগাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন।

ছেলে এই দুটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি ভাল ভাবেই পূরণ করেছে। অর্থাৎ তার নামের পরে এমন কতগুলো হরফ যুক্ত হয়েছে যা বিধান রায় প্রমুখ দু'চারজন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছাড়া আর কোন ভারতবাসী আজ পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি।

লাহিড়ী সাহেবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয়নি। সে ওখানেই একটা

বৃহৎ অঙ্কের চাকরি যোগাড় করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। সুদূর ভবিষ্যতেও দেশে ফেরার কোন ইচ্ছা নেই।

মিসেস লাহিড়ী বড়লোকের ঘর থেকেই এসেছিলেন। তবে সেখানকার ধরন-ধারণ খুব একটা আধুনিক নয়। শীর্ষেন্দুকে বিলেত পাঠাতে তাঁর আপত্তি ছিল না, তবে তার আগে একটি মনোমত বৌ ঘরে আনার ইচ্ছা ছিল। স্বামীর কাছে প্রকাশও করেছিলেন। লাহিড়ী সাহেব কথাটাকে বিশেষ আমল দেননি। 'ইন্দু'র উপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। বাপ-মায়ের অমতে সে কিছু করবে না।

তাছাড়া ধরে নিয়েছিলেন, সে তো কয়েক বছর পরেই ফিরে আসছে এবং এখানেই প্র্যাকটিস্ করবে। ততদিন একটি যুবতী মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা তাদের কাছে পড়ে থাকবে, সেটা কারো পক্ষেই সুখের হবে না।

আর একটা কথাও ভেবেছিলেন। এখানকার একজন এম. বি.-র চেয়ে একটি ফরেন ডিগ্রীওয়ালা কৃতী ছেলের পাত্র হিসাবে কদর অনেক বেশী। বিয়ের বাজারে বড় রকম দাঁও মারার অভিপ্রায়ও হয়তো মনে মনে পোষণ করেছিলেন লাহিড়ী সাহেব।

মিস্টার ঘোষ বললেন, 'মেয়ের খোঁজ করছ, ছেলে আসছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এসে পড়বে। পুরো মাস দেড়েক সময়ও নেই। এর মধ্যেই একটি মেয়ে ঠিক করে ফেলতে হবে।'

'বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তাহলে?'

'রাজী করাতে হয়েছে। অত টাকা রোজগার করে। ফ্ল্যাট কিনেছে লণ্ডনে। এদিকে একা। দেখাশুনো করবার কেউ নেই। তাই আমরা দুজনেই অনেক দিন ধরে লিখছিলাম। কদিনের জন্যে এসে বে-থা করে বৌ নিয়ে চলে যাও! ইংরেজি জানা ভাল মেয়ের তো আর এখন অভাব নেই। শেষ পর্যন্ত মতি ফিরেছে। মাকে লিখেছে, পনরো দিনের ছুটিতে যাচ্ছি। তার মধ্যে যা করবার করো!'

'বিজ্ঞাপনে কিছু পেলে?'

'মেয়ে তো আছে একগাদা। পছন্দসই একটাও চোখে পড়ল না। তাই ভাবছি আমিই একটা ইনসারশন দিই!'

'তাই ভাল। পাত্রপক্ষের রিকোয়ারমেণ্ট জানিয়ে দিলে সেইমত পার্টিই আসবে। তার থেকে বেছে নেওয়া সহজ।'

'তাহলে এস, এখনই একটা ড্র্যাফট করে ফেলা যাক। আমার আবার বাংলা-টাংলা তেমন আসে না।'

'আমারও তাই। তবু কিছুটা হেল্প করতে পারব আশা করি। তুমি আগে একটা দাঁড় করাবার চেষ্টা কর।'

লাহিড়ী সাহেব একটা প্যাড নিয়ে শুরু করলেন, 'লন্ডন-প্রবাসী উচ্চ উপাধিধারী উচ্চ উপার্জনকারী ··ঠিক হচ্ছে তো?'

মিস্টার ঘোষ একটু ভেবে বললেন, 'শেষ শব্দটা যেন কেমন কেমন লাগছে! 'হাই-ইনকাম' বলতে চাও তো?'

'হ্যাঁ। ওটাই তো আসল।'

'তাহলে 'সু-উপায়ী' বলতে পার।'

'ঠিক বলেছ। কাগজেও ঐ কথাটা দেখলাম দু'এক জায়গায়।'

মিস্টার লাহিড়ী লিখে চললেন, 'সু-উপায়ী ডাক্তার পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী, উচ্চশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, লাবণ্যময়ী, মধুর-স্বভাবা…আর কী লিখব ?'

'উচ্চশিক্ষিতা'র পর ব্র্যাকেটে লিখে দাও, 'ইংরেজি ভাষা ও কথাবার্তায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি-সম্পন্না'—ওটাই তো আগে দরকার। অনেক এম. এ. পাস মেয়ে পাবে, দু লাইন ইংরেজি বলতে পারে না। সেরকম হলে তো চলবে না !'

'ঠিক বলেছ। এবার তাহলে শেষ করি। না, রমলাকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। তার যদি কোনও ফরমাস থাকে !'

মিসেস লাহিড়ীকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি খসড়াটা শুনে বললেন, 'আসল কথাই তো বাদ দিয়েছ। ভাল বংশের মেয়ে হবে, সংসারের কাজকর্মও জানা চাই। বয়সটাও বলে দাও। কুড়ি বছরের বেশী হলে খোকার সঙ্গে মানাবে না।'

মায়ের সঙ্গে মেয়েও এসেছিল। সে বলল, 'আর নাচগানের কথাও তো লেখোনি। অন্ততঃ গান না জানলে চলবে কেন ?'

লাহিড়ী সাহেব যোগ করলেন, 'সদবংশজাত, গৃহকর্মনিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা, অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বয়স্কা ব্রাহ্মণ পাত্রী আবশ্যক। সদ্য তোলা ফটোসমেত যোগাযোগ করুন।'

ঘোষ সাহেবের দিকে চেয়ে একটু যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আমার অবিশ্যি জাত সম্বন্ধে কোনো অমত ছিল না। কিন্তু রমলার আবার বামুন না হলে চলবে না।'

রমলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তা যাই বল, আমার ঠাকুর আছেন—সেখানে আমি যাকে-তাকে ঢুকতে দিতে রাজী নই।'

সবটা যখন পড়ে শোনালেন মিস্টার লাহিড়ী, ঘোষ সাহেব বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না ? অত কথা না বলে শুধু লেখো—একটি তিলোত্তমা আবশ্যক। তাতে অনেক খরচ বাঁচবে, আর আমাদের বক্তব্যও ঠিক ঠিক বলা হবে।'

লাহিড়ী হাসলেন, 'তা মন্দ বলোনি। বিশেষণের লিস্টিটা বড্ড বেশী লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু কোন্‌টা কাটা যায় বল !'

মিসেস বললেন, 'কোনোটা কাটতে হবে না। ঐ বেশ আছে। ছেলের যুগ্যি মেয়ে চাই তো !'

লাহিড়ীর মনে মনে সন্দেহ ছিল, এরকম অর্থাৎ এত অধিক গুণান্বিতা মেয়ে কারো ঘরে আছে কিনা। বললেন, 'দেখা যাক, কি রকম রেসপন্স পাওয়া যায় !'

ফটো সকলে দেননি। অন্যান্য বিষয় পছন্দ হলে পরে পাঠাবেন বলে

জানিয়েছেন। যে কখানা ফটো পাওয়া গেল, তার মধ্যে বেশির ভাগই সরিয়ে রেখে দিলেন রমলা। তাঁর ছেলে সত্যিই সুপুরুষ। সুতরাং মেয়ের রূপ সম্বন্ধে কড়াকড়ি করার অধিকার তাঁর আছে! দু'তিনটি ছবি তাঁর নজরে পড়ল।

বাকি চিঠিগুলো পড়বার পর স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে মাত্র দুটি পার্টিকে ছবি পাঠাতে লেখা হল।

কদিনের মধ্যেই ছবি এসে গেল। তারপর ঘোষ সাহেব, তাঁর স্ত্রী এবং আরো দু'তিনটি আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে নির্বাচন-সভা বসল। ঘণ্টা দুইয়ের অধিবেশনে নানা তরফ থেকে বিচার-বিবেচনা করে তিনটি কনেকে দেখতে যাওয়া স্থির হল। দেখার পর আবার একদফা দীর্ঘ আলোচনা। তাতে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। কোনো না কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। তখন ঠিক হল তিনজনের একটি সিলেকশন বোর্ড গঠন করা হোক। কর্তা-গিন্নী তো থাকবেনই, পারিবারিক বন্ধু ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে রইলেন মিস্টার ঘোষ।

চেহারা, শিক্ষা, কণ্ঠস্বর, রুচি, হাবভাব ইত্যাদি বিষয়ের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি হল এবং প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা নম্বর বসালেন তিন বিচারক। এমনি করে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করল তাদের মধ্যেও অমিল রয়ে গেল। বোর্ডের একজন মেম্বর যে মেয়েকে ফার্স্ট বলে ঘোষণা করলেন, অন্য একজনের মার্কশীটে তার স্থান হল সেকেণ্ড। তখন নিজেদের মধ্যে একটা রফা করে একটি পাত্রীকে নির্বাচন করা হল। সে সত্যিই তিলোত্তমা।

ঘোষ বললেন, 'আমাদের কাজ তো চুকল, কিন্তু ছেলের পছন্দ অপছন্দ জানতে হবে তো!'

'সে সময় কই?' বলে উঠলেন লাহিড়ী, 'তিনদিন পরেই সে এসে যাচ্ছে। থাকবে মাত্তর দু সপ্তাহ। তার মধ্যেই সব কিছু মিটিয়ে বৌ নিয়ে চলে যাবে। কনেপক্ষকে তৈরি হতে হবে তো। আমাদেরও একটা আয়োজন আছে। একেবারে নমো-নমো করে সারা যাবে না। কাজেই আমাদের সিলেকশানই ফাইনাল। তুমি কী বল, রমলা?'

'আমারও মনে হয়, খোকা আমাদের কথার উপর কথা বলবে না। সে তো সেদিনও লিখেছে, তোমরা যা কিছু করবার করে রেখো। আমি দিন-পনরোর বেশী থাকতে পারব না।'

'তাছাড়া ইন্দু আমাদের সেরকম ছেলে নয়।' বেশ গর্বের সঙ্গে যোগ করলেন লাহিড়ী, 'সব ব্যাপারেই বাপ-মার ওপর নির্ভর।'

পাত্রীপক্ষকে পাকা কথা দেওয়া হল। পাত্রের শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি ইত্যাদি বিষয় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফটোও পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা তো হাতে স্বর্গ পেলেন।

এয়ারপোর্টের নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে সদলবলে অপেক্ষা করছেন লাহিড়ী-দম্পতি ও তাঁদের মেয়ে শিপ্রা, মিস্টার ও মিসেস ঘোষ এবং আরো কিছু আত্মীয়-বন্ধু। ভাবী বৈবাহিককেও নিয়ে এসেছেন লাহিড়ী সাহেব। কনেকেও

আনবার ইচ্ছা ছিল, সে সলজ্জ সংকোচে এড়িয়ে গেছে।

ঠিক সময়ে বিশাল জেট এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা নামতে শুরু করেছে। ঐ তো শীর্ষেন্দু! একটু কাছে আসতেই শিপ্রা বলল, 'দাদা কি দারুণ সুন্দর হয়েছে, দেখেছ মা?'

মা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। একটা কি বলতে গেলেন, স্বর ফুটল না। কাছে এসে প্রণাম করতেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। দু চোখ জলে ভরে গেল। শীর্ষেন্দু বাবাকে প্রণাম করে বলল, 'তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে বাবা!'

'ও নো, আমি ঠিক আছি।' বলে ছেলের পিঠে হাত রাখলেন।

মিস্টার ও মিসেস ঘোষ এবং অন্যান্য পরিচিত সকলকেও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করল শীর্ষেন্দু। শিপ্রার পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বলল, 'তুই এত বড় হয়ে গেছিস! আমি ভাবছিলাম কোনো আননোন লেডি ফ্রেণ্ড অব দা ফ্যামিলি। নমস্কার করতে যাচ্ছিলাম।'

ভাবী বৈবাহিকের সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন লাহিড়ী, সেই মুহূর্তে শীর্ষেন্দু পিছন ফিরে একটি মেয়ের বাহু ধরে এনে দাঁড় করাল ওঁদের সামনে। ঘোর কালো রঙ, ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিকের প্রলেপ, মোটা-সোটা, বেঁটে, চওড়া কপাল, সামনের দাঁত দুটো ভীষণ উঁচু। পরিচয় করিয়ে দিল—'মিস্ নবুটু, মাই ফিয়াঁসি। আফ্রিকার মেয়ে। ওর বাবার লণ্ডনে মস্ত বড় হোটেল আছে। ও সে-সব দেখাশুনো করে। লণ্ডন এয়ারপোর্টে আলাপ। প্লেনে সিট পড়েছিল পাশাপাশি। সেখানেই প্রোপোজ করলাম। শী হ্যাজ্ এগ্রিড্। ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে। একসঙ্গেই ফিরব।'

বর্ণনাটা যাঁদের কাছে দিচ্ছিল তাঁরা যেন সকলেই প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেয়ে অচল হয়ে গেছেন। কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

শীর্ষেন্দু বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। ওকে গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে পরে যাচ্ছি। তোমরা চলে যাও।'

গ্রাম থেকে আসছি

সুশোভন রায় পড়বার ঘরে ঢুকেই প্রথমে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পুজো একেবারে ঘাড়ের উপর। এখনো গোটা চারেক পুজা-বার্ষিকীর দাবি মেটাতে বাকি। কথা দেওয়া আছে। এদিকে মাথায় কিছু নেই।

Brain wash শব্দটা যোগরূঢ়। একটা বিশেষ অর্থ আছে। সুশোভনের মনে হল একে যদি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা যেত তাহলে ওদের বলতেন, লেখা আসবে কোত্থেকে? তোমরাই আমাদের পুরোপুরি **Brain wash** করে ছেড়েছ। মাথার ভিতরটা ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দিয়েছ।

কিন্তু সে কথা বলে পার পাবার উপায় নেই। লেখা দিতেই হবে। সেটা কী, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কোন সম্পাদকের। লেখকটি কে, তাঁর লক্ষ্য শুধু

সেইখানে। যেহেতু সুশোভন রায় একজন 'নামী' লেখক, সেই নামের দণ্ড তাঁকে দিয়ে যেতে হবে।

'খুব ব্যস্ত নাকি ?'

মনে মনে একটি ছোট গল্পের কাঠামো সবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলেন সুশোভন। তার উপরে হঠাৎ একটা হাতুড়ির ঘা এসে পড়ল। ব্রজেন মৈত্র, পাড়ার লোক। এককালে সরকারী শুল্ক বিভাগের উপরতলায় বিচরণ করতেন, এখন করেন নিরীহ প্রতিবেশীর বৈঠকখানায়। ঢুকলে আর বেরোতে চান না। নিজেই বলে যান, অপরকে বলতে দেন না। অর্থাৎ মানুষের ধৈর্য, সময় ও সৌজন্যের উপর কঠোর শুল্ক আদায় করেন।

সুশোভন হাসবার মত মুখ করে, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, 'আসুন।'

'না ; বেশীক্ষণ বসবো না। আপনার কাজের ক্ষতি হবে।'

বলতে বলতে সামনের চেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে টেবিলের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'দিন, দেশলাইটা দিন।'

সুশোভন বুঝলেন, এবার অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক এঁর কবল থেকে তাঁর মুক্তি নেই। ইনি যে সব অক্ষয় কীর্তি রেখে এসেছেন তাঁর সুদীর্ঘ সরকারী জীবনে, তারই একটানা ধারাবিবরণী শুনে যেতে হবে।

তার জন্যেই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দুটি যুবক এসে দাঁড়াল দোর-গোড়ায়। রাস্তার ধারে ঘর, সুতরাং সকলের পক্ষেই অবারিত দ্বার। লেখা চাইতে, চাঁদা আদায় করতে, কোন সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক সম্মিলনে সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণের আবেদন নিয়ে এই ধরনের ছেলেছোকরা প্রায়ই এসে থাকে। তারা গটগট করে ঢুকে যায়।

কিন্তু এ দুটি ছেলের হাবভাব আলাদা, অনেকটা যেন কুণ্ঠিত। চোখেমুখে বিনম্র সংকোচ। চেহারায় জামাকাপড়ে শহুরে জলুসের অভাব। দুজনের কাঁধেই আধময়লা শান্তিনিকেতনী ঝোলা।

'কাকে চাই ?' জিজ্ঞাসা করলেন সুশোভনবাবু।

ছেলে দুটি একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল। তারপর একজন সশ্রদ্ধ বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আমরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুশোভন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি কি আছেন ?'

উত্তর দিলেন মৈত্র সাহেব, 'ইনিই প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুশোভন রায়।'

ছেলে দুটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথম যে কথা বলেছিল সে-ই আবার বলল, 'আসতে পারি ?'

সুশোভন বললেন, 'এসো না ? কোত্থেকে আসছ তোমরা ?'

'আজ্ঞে, বীরভূম জেলার একটা গ্রাম থেকে। ওখানেই আমাদের বাড়ি।'

মৈত্র সাহেব বিড়বিড় করে ইংরেজিতে যা বললেন তার মানে—'সেটা আকারেই মালুম।'

সুশোভন দুটো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসো।'

ওরা দাঁড়িয়ে রইল। একমনে দেখতে লাগল তাঁকে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তা আমার কাছে কী মনে করে? সভা-সমিতি হলে কিন্তু যেতে পারব না। আগেই বলে রাখছি।'

'আজ্ঞে না', অন্য ছেলেটি বলল এবার, 'আমরা একটা মাসিক পত্রিকা বের করছি। তাতে আপনার—'

'লেখা?' বাধা দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুশোভন: 'একেবারে অসম্ভব। অতদূর থেকে কষ্ট করে না এসে তোমরা যদি একটা চিঠি লিখতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতাম।'

ছেলে দুটি হঠাৎ কিছুটা ভড়কে গেছে বলে মনে হল। চোখে চোখে কী কথা হল দুজনের। তারপর সেই প্রথম বক্তা বলল, 'লেখা চাইছি না। শুধু একটা শুভেচ্ছা বাণী যদি দেন—'

'তাহলেই হবে তো?'

'খুব হবে স্যার।'

'কী নাম তোমাদের পত্রিকার?'

নামটা বলতেই ড্রয়ার থেকে এক শীট কাগজ বের করে পাঁচ-সাত লাইন লিখে দিলেন সুশোভন।

ওরা খুশী মুখে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

মৈত্র সাহেব সারামুখে একরাশ বিরক্তি মাখিয়ে এতক্ষণ কোন রকমে চুপ করে ছিলেন। আর থাকতে পারলেন না। বললেন, 'এই আবার এক নতুন হুজুগ শুরু হয়েছে আজকাল। কাগজ বের করা। রীতিমত এপিডেমিক। শহর থেকে এবার গাঁয়েও ছড়াতে শুরু করল। কী হবে এত কাগজ বলতে পারেন?'

সুশোভন কোন উত্তর দিলেন না; হাসি মুখে চুপ করে রইলেন।

মৈত্র সাহেব সুর চড়ালেন, 'এত যে সব বড় বড় নামকরা ম্যাগাজিন রয়েছে দেশে, তার মধ্যে কটার অবস্থা ভাল? পড়বার লোক কই? তার ওপরে আবার এই—কী যেন বলেন আপনারা? লিট্‌ল ম্যাগাজিনের হিড়িক। আপনারা কোথায় এগুলো ডিস্‌কারেজ করবেন, না ঘটা করে শুভেচ্ছা বাণী দিচ্ছেন!'

'শুভেচ্ছা বাণী' শব্দ দুটোর মধ্যে অনেকখানি শ্লেষ ঢেলে দিলেন মৈত্র সাহেব। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা পড়ল।

'আমি আসছি, দাদা', বলতে বলতে ঢুকে পড়ল নৃপেন দাস, একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদনা সেরেস্তার লোক। প্রায়ই আসে যায়।

সুশোভন বললেন, 'তোমার তো আজকে আসার কথা ছিল না।'

'ছিল না। তবু আসতে হল। প্রেস বসে আছে। অন্ততঃ গোটা দশেক স্লিপ্‌ না দিলে চলবে না।'

'মুশকিলে ফেললে।'

'একটু কষ্ট করুন দাদা। আগের ফাইলগুলো নিয়ে এসেছি।'

'আচ্ছা ওগুলো দাও। ঘণ্টা তিনেক পরে এসো।'

'কোথায় আর যাবো? এখানেই বসি।'

মৈত্র সাহেব খবরের কাগজ ওল্টাবার ছলে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিলেন কখন উঠবে লোকটা। এবার নিরাশ হয়ে নিজেই উঠে পড়লেন—'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। আপনি কাজ করুন।'

নৃপেনকে বিদায় দেবার পর ব্রজেন মৈত্রের প্রশ্নটা আবার ফিরে এল সুশোভনবাবুর মনে। এত বড় বড় কাগজ রয়েছে দেশে, তার ওপরে আবার এই লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর কী দরকার? ঠিক একই যুক্তি দিয়ে বোধ হয় বলা চলে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র পদ্মা দামোদরের অকৃপণ ধারায় প্লাবিত যে দেশ, সেখানে ছোট-খাটো নদীনালা, খালবিলের প্রয়োজন কী?

উত্তরটা নিজের মনেই দিলেন সুশোভনবাবু—প্রয়োজন আছে, থাকবে এবং ছোট বলেই তারা নিরর্থক নয়। তাদের কাজ আলাদা, ক্ষেত্র আলাদা। সেখানে বড় বড় জাহাজ স্টীমার বা সওদাগরি পানসি এসে ভেড়ে না। তার বদলে ভিড় করে ছোট ছোট জেলেডিঙ্গি, হাঁড়িকলসি-বোঝাই কুমোরের নৌকো, দূর স্টেশন থেকে সওয়ারি নিয়ে ফেরা 'এক মাল্লাই'।

তাদের দু' তীর ঘিরে কোন বন্দর নেই, কলকারখানা নেই, ভারী ভারী মাল-পত্তর ওঠানামার সোরগোল নেই। কিন্তু ঘাটগুলো হুটোপাটি-করে-স্নান-করা দামাল ছেলেমেয়েদের কল-কোলাহলে মুখর। তারই ফাঁকে দু'বেলা কলসি-কাঁখে জল নিয়ে যায় ঘোমটা-ঘেরা নতুন বৌ। পড়ন্ত বেলায় গা ধুতে ধুতে সুখ-দুঃখের থলি খুলে দেন বর্ষীয়সী গিন্নীরা।

ঐ সরু খাল কিংবা ছোট নদীটিকে ঘিরে ঘন পরিচয়ের সূত্রে গাঁথা একটা আলাদা জগৎ।

ছোট ছোট পত্রিকাও তাই। লেখক ও পাঠক মিলে একটি স্বল্পপরিসর অন্তরঙ্গ সমাজ। একের সঙ্গে অন্যের সমাদর্শ ও সমবেদনার বন্ধন।

কিন্তু নদী বা খাল যত ছোটই হোক, একটি ছোট্ট পরিধির মধ্যেই সে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। সংকীর্ণ হলেও তার একটি নিত্য-বহমানা ধারা আছে, গতি আছে। পরিচিত গণ্ডির বাইরে যে জীবন ও জগৎ, তার সঙ্গেও সে যোগ রেখে চলতে চায়। এখানকার বার্তা নিয়ে যায়, ওখানকার বার্তা বয়ে নিয়ে আসে।

তেমনি ছোট বেষ্টনীর মধ্যে জন্ম নিল যে ক্ষীণাঙ্গী গ্রাম্য পত্রিকা, সেও ধীরে ধীরে নিজের বৃত্তটিকে প্রসারিত করে। বাইরের বৃহত্তর ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে দিনে দিনে পুষ্ট হতে চায়, দূরের সঙ্গে গড়ে তুলতে চায় আত্মীয়তার বন্ধন।

সুশোভন রায়ের আরো মনে হল, আগে যা কখনো ভাবেননি, এই চাওয়াটা শুধু এক তরফের, একথা মনে করলে ভুল হবে। চাইবার আছে এ তরফেও।

ঐ ছেলে দুটির মত তাঁদেরও ঝোলা কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতে হবে গ্রামের দরজায়. বিনীত কণ্ঠে বলতে হবে, 'শহর থেকে আসছি।'

একটি বেআইনী ইণ্টারভিউ

সালটা বোধ হয় ১৯৩১। শীতকাল; দার্জিলিং-এর শীত।

জেলের আফিস বসে সকালবেলা। দুপুরে বিরাম। বিকেলে একটা সংক্ষিপ্ত দ্বিরাগমন থাকে। সেইটুকু কোন রকমে সেরে বেরিয়ে পড়ব, এই মনে করে তৈরি হয়ে এসেছি এবং দ্রুততালে কলম চালাবার চেষ্টা করছি। তার কি জো আছে? হাতে ডবল-নিটিং ভুটিয়া উলের দস্তানা। দুটো আঙুলের ডগাটুকু শুধু বেরিয়ে আছে, কলম ধরবার জন্যে, সেখানটা অসাড় হয়ে আসছে। চেয়ারের পাশে রাখা তোলা উনুনে কাঠ-কয়লা পুড়ছে। মাঝে মাঝে হাতটা সেঁকে নিচ্ছি।

গুর্খা গেটকীপার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। টেবিলের ওপারে 'অ্যাটেনসন' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বুটে বুট ঠুকে সেলাম জানাল।

মনে মনে বিরক্ত হলাম। কী খবর নিয়ে এল কে জানে? একটা না একটা ঝামেলা তো লেগেই আছে। বেরোনোটা না বন্ধ হয়।

গেটকীপার হিন্দী মেশানো নেপালী ভাষায় জানাল, 'একজন 'জেনানা আদমী' আমার দর্শনপ্রার্থী।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকাতে যোগ করল, 'আমি বলেছিলাম, 'সাব' এখনই বেরোবেন। তিনি 'স্রেফ' পাঁচ মিনিটের জন্যে আসতে চান।'

'আচ্ছা, নিয়ে এসো।'

ঘরে ঢুকলেন একটি প্রৌঢ়া মহিলা। দীর্ঘাঙ্গী; দোহারা গড়ন। গায়ের রং দেখে মনে হবে মেমসাহেব। কিন্তু পরনে মোটা খদ্দরের শাড়ি, তারই পুরো-হাতা ব্লাউজ। শালটাও তাই। মৃদু হেসে 'গুড্ আফটারনুন' জানালেন। আমি সামান্য একটু উঠে সামনে চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

তিনি নিখুঁত সাহেবী উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি। তবু না এসে থাকতে পারলাম না। শুনলাম মিস্টার সতীন সেনকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। তিনি কেমন আছেন জানতে এলাম। দয়া করে যদি—'

বলতে বলতে খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর। চোখে ও গলার স্বরে গভীর উদ্বেগ।

আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি তাঁর কোন আত্মীয়া?'

আত্মীয় বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নই। তাঁর অসংখ্য দেশবাসীর মত আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, একান্ত প্রিয়জন বলে মনে করি। স্বভাবতই তাঁর জন্যে আমাদের উৎকণ্ঠা রয়েছে। তার ওপরে ওখানে যে-সব ঘটনা ঘটেছে—'

'কোন্ ঘটনার কথা বলছেন আপনি ?'

'শুনেছি ঐ জেলে থাকতে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। আঘাত কি খুব বেশী ? চলাফেরা করতে পারছেন ? আশা করি এ খবরটুকু জানাতে আপনার কোনো বাধা নেই।

আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাত্র কয়েকদিন আগে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স আন্দোলনে বন্দী এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে দল থেকে আলাদা অর্থাৎ সরকারী ভাষায় **segregate** করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এই দূর দুর্গম পাহাড়ী জেলে চালান দেওয়া হয়েছে। কোলকাতার মত শহরে অনেক চেষ্টা করেও বাইরের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ বন্ধ করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। এখানে তার সম্ভাবনা নেই, অথবা সুদূর, এ আশাও করে থাকবেন। সেটা যে সফল হয়নি তার প্রমাণ তো আমার সামনেই বসে আছেন।

এই খদ্দর-ধারিণী মেমসাহেবটি এই রকম একজন রাজনৈতিক বন্দীর চলাফেরার খবরই শুধু পাননি, মারধরের ব্যাপারটাও জেনে বসে আছেন।

সতীন সেনের কাছে মারধরটা অবশ্য জলভাত। সেই পটুয়াখালী আন্দোলনের সময় থেকে পুলিসের লাঠি এবং জেলের ব্যাটনের বহু ব্যবহার চলেছে তার উপর। বাগ মানাতে বা কাবু করতে পারেনি। ওটা বোধ হয় ওঁর কোষ্ঠীতে লেখে না। এবারকার ডোজটা শুনেছি আগেরগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

স্বভাবতই সঙ্গী-সাথীদের ছেড়ে নির্বাসনে আসতে চাননি ভদ্রলোক ; সতীন সেন একবার 'না' বললে তাঁকে 'হাঁ' করানো সরকারের পক্ষে সভ্য উপায়ে সম্ভব নয়। তাই ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার নামক দুটি ফিরিঙ্গি পুঙ্গব এই বেয়াড়া কয়েদীটিকে হাতকড়া লাগিয়ে পিছন থেকে বুটের ঠোক্কর মারতে মারতে সেল থেকে গেট পর্যন্ত এনে পুলিসের কালো গাড়িতে পুরে দিয়েছিল। সেখান থেকে শিয়ালদা স্টেশনে রিজার্ভ করা রেলের কামরা। সারাপথে পুলিস ব্যারিকেড। কাক-পক্ষীরও জানবার কথা নয়, অথচ ইনি জেনে গেছেন !

'মেমসাহেবে'র আগ্রহ-দীপ্ত চোখ দুটির দিকে চেয়ে কিছুটা সত্য গোপন করতে হল। তখনো সেরে ওঠেননি ভদ্রলোক। সংক্ষেপে জানালাম, 'তিনি ভাল আছেন।'

'একবার দেখা করতে পারি ?' সঙ্গে সঙ্গে সানুনয় প্রার্থনা।

'দেখা করতে হলে আপনাকে এস. পি.র কাছে দরখাস্ত করতে হবে।'

'হোয়াই ? হি ইজ্ ইন জেল কাস্টডি। ইউ ক্যান্ গ্র্যাণ্ট্ দ্য ইণ্টারভিউ। এখন যদি সম্ভব না হয়, আপনি যখন বলবেন আমি আসবো। পিটিশন আমি নিয়ে এসেছি।'

ব্যাগ খুলে একখণ্ড টাইপ করা কাগজ আমার সামনে রাখলেন।

আমি কেমন করে বোঝাই যে সতীন সেনের বেলায় আমাদের ক্ষমতার দৌড় ঐ 'কাস্টডি' পর্যন্ত, শুধু আটকে রাখা। বাকী সব পুলিসের হাতে। তবু বলতে হল, 'আমরা এ বিষয়ে নিরুপায়।

পিটিশনটার উপর চোখ বুলিয়ে যোগ করলাম, 'চান্স তো, আমরা এটা

ফরওয়ার্ড করতে পারি। ফল কি হবে বলতে পারি না। তার চেয়ে এস. পি. কিংবা ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো সহজে কাজ হবে। আপনার বেলায় বোধ হয় ওঁরা আপত্তি করবেন না।'

'যেহেতু আমার নাম দেখছেন মিসেস ব্লেয়ার এবং আপনার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছি?' বলে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন ইংলিশম্যান। হি ওয়াজ ইন্ দ্য আরমি। ছেলেবেলা থেকে ঐ দেশেই আমি মানুষ। এখানকার ইংরেজ ডি. সি. এবং এস. পি.-র সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট জানাশোনা আছে। কিন্তু আমি এ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতে চাই না। আপনারা যখন পারবেন না বলছেন তখন আর কী করা যায়! আচ্ছা চলি। ধন্যবাদ।'

দিন দুই পরে বেলা দুটো নাগাদ বাজারের দিকে উঠছিলাম। চাঁদমারির ভিতর দিয়ে খানিকটা গিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা সিঁড়ি বাঁধানো সর্টকাট্ ধরতে যাচ্ছি, পাশের বস্তি থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ব্লেয়ার। হাতে একটা বেশ বড় আকারের কাপড়ের ব্যাগ।

'হ্যালো, মিস্টার 'চৌড্রি', এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন এবং আমি উত্তর দেবার আগেই বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। সেদিন কম আলোতে ঠিক বুঝতে পারিনি। সবে চাকরিতে ঢুকেছ বোধ হয়?'

তাঁর অনুমান ঠিক। কিন্তু উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনি এই দিকে থাকেন নাকি?'

'না, আমি থাকি অনেক দূরে। জলাপাহাড়। এই বস্তিতে মাঝে মাঝে আসতে হয়।'

কাছে এসে স্বর নামালেন, 'উনি কেমন আছেন?'

'আগের চেয়ে অনেকটা ভাল।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার কাছ থেকে খবর নিয়ে আসবো। আচ্ছা দু-একখানা বই যদি দিই, নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবে না। পলিটিক্স-টলিটিক্স নয়, হার্মলেস বুক্স!'

জেলখানায় বই পড়তে পাওয়ার প্রথম সর্ত হল গুড্ কণ্ডাক্ট্। সতীন সেন প্রেসিডেন্সি থেকেই বেশ গোটাকয়েক শাস্তি নিয়ে এসেছেন। সরকারী মতে তাঁর কণ্ডাক্ট্ ব্যাড্ এবং বই তাঁর কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু মিসেস্ ব্লেয়ারের দিকে চেয়ে কথাটা বলতে কেমন বাধল। বললাম, 'বেশ তো, দেবেন।'

ব্যাগটা নিয়ে চড়াইপথে উঠতে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে বললাম, 'ওটা আমার কাছে দিন।'

'না, না; তুমি কেন নেবে? এ আমার অভ্যাস আছে। যা ভাবছ তা নয়। এতে ভারী কিছু নেই। গোটাকয়েক জাম্পার। উল আমরা দিই, বস্তির পাহাড়ী মেয়েরা বোনে। সামান্য কিছু পায়। বড্ড গরীব তো। কাল তোমাদের পাড়ায় যাবো।'

'আমাদের পাড়া মানে?'

'মানে তোমাদের কাছাকাছি। চাঁদমারি। কয়েকটি বাঙালী পরিবার আছে। চরকায় সুতো কাটে। ফাইন সুতো। সেগুলো নিয়ে আসবো ; নতুন কিছু তুলোও দিয়ে আসতে হবে।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তাদের অবস্থা অবিশ্যি এদের মত এতটা খারাপ নয়। বাবুরা চাকরিবাকরি করে। তবে তেমন কিছু তো নয়। মেয়েরা কিছু বাড়তি রোজগার না করলে চলে না।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করবেন না ?'

'না, না ; মনে করবো কেন ? বল না, কি জানতে চাও ?'

'ওঁদের সঙ্গেও কি আপনি ইংরেজিতে কথা বলেন ?'

'যারা বোঝে না, তাদের সঙ্গে বাংলা বলি। তবে সে এমন বাংলা, শুনলে তুমি হাসবে। কী করবো বল। আমারই দুর্ভাগ্য। মাতৃভাষাটাও শেখবার সুযোগ পাইনি।'

'মাতৃভাষা ! আপনি কি বাঙালী ?'

মিসেস ব্লেয়ার হেসে উঠলেন—'তুমি ভেবেছিলে বুঝি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ? আমার বাবা-মা দুজনেই বাঙালী।'

পরদিনই এলেন আমার কোয়ার্টার্সে। জেলের খানিকটা উপরে। হাতে তেমনি খদ্দরের ব্যাগ। তবে আকারে ছোট।

তার ভিতর থেকে বের করলেন কাগজে জড়ানো কয়েকটা ফুলের চারা, একটা টিফিন-বক্স আকারের কৌটো আর একখানা 'বুক অব নলেজ'। বললেন, 'এগুলো ডায়ান্থাস্। সেদিন তোমার বাগান দেখে গেছি। তোমার 'কেটার' সঙ্গে আলাপ হল। বলল, 'সাব্' নিজে হাতে সব করেন। খুব ভালো লাগল। আমারও বড্ড বাগানের সখ। বড় একটা সময় পাই না। এগুলো দেয়ালের ধারে দিও। নাইস্ ব্যাকগ্রাউণ্ড হবে। বইটা সেনকে দিও। আর এর মধ্যে কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচ আছে। তুমি চিকেন খাও তো ?'

'তা খাই। কিন্তু আমার জন্যে আবার কষ্ট করে—'

'কষ্ট কিসের ? নিজেদের জন্যে তো করতে হয়। তারই সামান্য ভাগ দিচ্ছি তোমাকে। একা একা বিদেশে পড়ে আছ। …তোমার মা আছেন ?'

'আছেন।'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বুটের শব্দে দুজনেই দরজার দিকে তাকালাম। একজন সিপাই জানিয়ে গেল, 'টেলিফুক আয়া হুজুর।'

'তার মানে তোমাকে অফিসে যেতে হবে। আমিও উঠি। বইটা পড়া হয়ে গেলে তোমার কাছে এনে রেখো। পরে যেদিন আসবো ওটা বদলে অন্য বই দিয়ে যাবো।'

বলা হল না, বই আর আনবেন না, এটাও আমার কাছে থেকে যাবে, যাঁকে দিতে চাইছেন তাঁর হাতে পৌঁছবে না। সেদিন নেহাৎ দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছিলাম।

এটাও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাত সরল না। হয়তো আমার

অসহায় অবস্থা বুঝে কিছু বলবেন না, কিন্তু ভীষণ নিরাশ হবেন। নিজেও বড় খেলো হয়ে যাবো ওঁর কাছে।

ঠিক পথে, যাকে বলে through proper channel, দিতে গেলে আমাদের বড়কর্তা অর্থাৎ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের অনুমতি দরকার। বই-এর উপর রবার স্ট্যাম্পের ছাপ পড়বে—Passed. তার নীচে তাঁর সই। সেটা তিনি কখনো দেবেন না। ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। ব্যাপারটা তাঁর বিবেচনা বা discretion-এর এলাকা। কিন্তু তাঁকে তো চিনি। অতি বশংবদ সরকারী কর্মচারী। সরকারের শত্রুকে নিজের শত্রু বলে মনে করেন। অতএব?

অতএব গোপন পথ অর্থাৎ improper channel-এর আশ্রয় নিতে হল।

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। সোজাসুজি smuggling, বে-আইনী পাচার। আমার কাজ সেটা বন্ধ করা। আর আমি নিজেও তাই করে বসলাম।

কিন্তু করবার পর, অর্থাৎ বইখানা যখন সতীনবাবুর হাতে পৌঁছে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও যেন হালকা হয়ে গেল। যা করলাম আইনবিরোধী হতে পারে কিন্তু ন্যায়-বিরোধী নয়। যখন দেখা হল সতীনবাবু জানতে চাইলেন, কোত্থেকে এল এই লোভনীয় বস্তুটি। বললাম। শুনেই ওঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীর শ্রদ্ধাভরে বইখানা কপালে ঠেকালেন। আমার চোখে একটু বিস্ময় লাগল। কদিন থেকেই তো দেখছি ওঁকে। বুদ্ধিদীপ্ত সুরসিক মানুষ। বাস্তববাদী, কথায়-বার্তায় matter-of-fact. উচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ নেই। এই মহিলাটি এবং তাঁর দেওয়া একখানা সামান্য বইকে ঘিরে সতীন সেনের এই আকস্মিক ভাবাবেগ একটু আশ্চর্য বৈকি!

কারণটা পরে বুঝেছিলাম।

দিন তিনেক পরে সকালে আফিসে রয়েছি। ফোন এল।

মিসেস ব্লেয়ারের গলা—'দুটো নাগাদ বাড়ি থেকো। আমি আসছি।'

তৈরি হয়েই ছিলাম। ঘরে ঢোকামাত্র বললাম, 'চলুন।'

'কোথায়!' বিস্মিত হলেন। হবারই কথা।

বললাম, 'আসুন না!'

আফিসে নিয়ে গিয়ে বসালাম। আর কেউ নেই সেখানে। উনি আগের সুরেই জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কী বল তো?'

আমি শুধু একটু হাসলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যে একজন হেড-ওয়ার্ডারের সঙ্গে ঘরে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে সুপুরুষ বলা বলে। নাতিদীর্ঘ, বলিষ্ঠ গড়ন। পরনে জেলের পোশাক—ব্লু সার্জের গলাবন্ধ কোট এবং সেই একই কাপড়ের ট্রাউজার্স। পায়ে স্লিপার।

মিসেস ব্লেয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আপনাকে দেখতে পাবো, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি।'

আমার দিকে ফিরে কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'you naughty boy. You didn't tell me anything!'

সতীনবাবু বাংলাতেই বললেন, 'আপনার বইখানা যে আমাকে কত আনন্দ দিয়েছে, বোঝাতে পারবো না।'

'ও কিছু না। আপনার শরীর বেশ সুস্থ তো ?'

'হ্যাঁ, এখানে আমি খুব ভাল আছি।'

সতীনবাবুকে আগেই বলে রেখেছিলাম, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ইণ্টারভিউটা সেরে ফেলতে হবে। আমাকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেই উঠে পড়লেন। এগিয়ে নত হয়ে হাতটা পায়ে ছোঁয়াতেই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন মিসেস ব্লেয়ার, 'এ কী করছ !'

'আপনার পরিচয় আমি জানি। আপনি আমাদের সকলের নমস্য।'

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে দাঁড়ালেন সতীনবাবু, 'হ্যাঁ, একটা কথা। আমাদের দেখা হল, এটা যদি প্রকাশ পায়, আমাকে যে শাস্তি পেতে হবে তার জন্যে পরোয়া করি না, কিন্তু আমার এই বন্ধুর পক্ষে সেটা বিপজ্জনক। উনি তো চাকরি করেন।'

মিসেস্ ব্লেয়ার বললেন, 'সে কথাও কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে ? কিন্তু জেলের গার্ডস যারা জানল—'

'তারা কিছু বলবে না। তারা আমাকে ভালবাসে।'

মিসেস ব্লেয়ারকে বিদায় দিয়ে সোজা চলে গেলাম সতীনবাবুর সেল-এ।— 'কে বলুন তো ?'

'ডবলিউ সি ব্যানার্জি'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট !'

বললাম, 'তা শুনেছি বৈ কি !'

'ইনি তাঁর মেয়ে।'

আইন ও ছেলেটা

লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ফিরছিলাম।

বিকেলবেলার ডাউন গাড়ি। ভিড় ছিল, তবে মারাত্মক নয়। বসবার জায়গা পাওয়া গেল। হাতে একটা সুটকেস। পিসতুতো ভাই সনতের কাছ থেকে ধার। ক'দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে। আমার যেটি ছিল, তাকে মেরামতে পাঠাতে হয়েছে। অনেক বছর ধরে অনেক মোটঘাট টেনেছে বেচারা।

রমা বলছিল, এবার ওকে পেন্‌সন্ দাও। তাই উচিত ছিল। কিন্তু ওর জায়গায় আবার একটিকে বহাল করতে হবে তো। তার মানে এই বাজারে অন্তত শ'খানেক টাকার ধাক্কা।

কোত্থেকে আসবে সেটা, সে বিষয়ে গৃহকর্ত্রী নীরব। গার্হস্থ্য-নীতিতে ওরা দক্ষিণপন্থী। ডানধার অর্থাৎ খরচের অংশটা নিয়ে আছেন। বামে তাকান না। সেদিক সামলাবার ভার বেচারা গৃহকর্তার।

'গোচারণ' স্টেশনে উঠল একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে। পরনে ছেঁড়া

প্যাণ্ট। ওর চেয়ে বহরে ডবল, অন্য কারো হবে।

সঙ্গে একটা মেয়ে, বয়স বোধ হয় সাত-আট। হাত-পাগুলো কাঠি-কাঠি, পেটটা ঢাকের মত। তার ওপর কেটে বসেছে একটা ইজের। ওপরে কিছু নেই।

দুজনের হাতে ছোট দুটো ময়লা ন্যাকড়ায় জড়ানো পোঁটলা।

গাড়িতে পাখা-আলোর বালাই নেই। এককালে ছিল, তার চিহ্ন অবশ্য আছে। কিন্তু জিনিসপত্র রাখবার তাকগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে স্যুটকেসটাকে কোলের ওপর বসিয়ে নিয়েছিলাম। সেইদিকে কয়েকবার তাকাল ছেলেটা। তারপর বলল (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেহাতী ভাষায়; সেটা আমার রপ্ত নয় বলে নিজের ভাষাতেই বলছি), 'আপনি কোথায় নামবেন বাবু?'

'বালিগঞ্জে।'

'আপনার এই বাক্সটা কি খালি?'

'কেন বল তো?'

'তাহলে এই পুঁটলি দুটো রাখতাম। বাক্সটা আমি মাথায় করে নামিয়ে দেব ইস্টেশনে।'

এমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে ওর মুখের দিকে তাকালাম। একটা কুণ্ঠিত অনুনয়ের হাসি-হাসি ভাব।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী আছে পুঁটলিতে?'

'তা আর বুঝতে পারছেন না?' উত্তর দিলেন আমার পাশের ভদ্রলোক, 'চাল। চোরাই চালানের দল এরা। সোজা কথায় স্মাগলার। এই রকম হাজার হাজার আছে এ লাইনে। পেছনে শাঁসালো পার্টি। তারা টাকা যোগায়।'

'না বাবু, আমাদের কেউ টাকা দেয়নি। এই ক'টা চাল আমার মা হাট থেকে কিনে এনেছে। বালিগঞ্জে এক বাবুর বাড়িতে দেব।'

'ঐ শুনুন', ওর কথা থেকেই যেন নিজের উক্তির সমর্থন পেলেন ভদ্রলোক, 'গাঁয়ের লোক খেতে পায় না, আর এরা সেখান থেকে চাল নিয়ে র‍্যাশান এলাকায় পাচার করে, শহুরে বাবুদের পেট ভরাবার জন্যে। তাদের হাতে পয়সা আছে তো।'

'হ্যাঁ, সামনের থেকে বলে উঠলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, 'কিন্তু তাদের অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখবেন। র‍্যাশান থেকে চাল যা মেলে, তার পরিমাণের কথাটা না হয় না-ই তুললাম, (আপনারা বলবেন, আলু খাও, কাঁচকলা খাও, ছোলাসেদ্ধ খাও) কিন্তু সে চালের চেহারা? তিন ভাগের এক ভাগ ধুলো, এক ভাগ কাঁকর। ঝেড়েঝুড়ে যেটা দাঁড়ায়—'

'আলোচালের চেহারা তো একটু রুখু-রুখু হবেই', শেষ করার আগেই মন্তব্য করলেন আগের ভদ্রলোক।

'কিন্তু এ কোন্ জাতের আলোচাল? আলোচাল তো আমাদের ঘরেও ছিল এককালে। বিধবারা খেতেন, দেবপুজায় লাগত। তার স্বাদ গন্ধই আলাদা। সে সব কোথায় গেল?'

'অন্য স্টেটে চলে যাচ্ছে', কোণের দিক থেকে আর একটি কণ্ঠ শোনা গেল, 'বেঙ্গলের সেন্ধচাল জোর করে চাপানো হচ্ছে মাদ্রাজের ঘাড়ে আর ওঁড়িষ্যার আতপ খেয়ে মরছেন আপনারা।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক এবার প্রথমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জয়নগর থেকে দুটো চাল নিয়ে যাওয়া যদি স্মাগলিং হয় তাহলে মশাই আমিও স্মাগলার। আমার ব্যাগে দু' কিলো চাল আছে। এক বন্ধুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি : অখাদ্য খেয়ে খেয়ে নাড়ি পচে গেছে। দু'দিন মুখ বদলানো যাবে।'

বলতে বলতে যাদবপুরে নেমে গেলেন। ছেলেটা ফাঁকা পেয়ে আমার কাছে সরে এসে বলল, 'রাখবেন বাবু চাল ক'টা ? এখনই পুলিস উঠবে!'

তারপরের ব্যাপারটা কারোর অজানা নয়। পুঁটলি দুটো তো কেড়ে নেবেই মারধোরও করতে পারে।

কিন্তু তাই বলে আমিই বা এগুলো সুটকেসে তুলে নিই কেমন করে ? ঐ যাদবপুরে নেমে যাওয়া ভদ্রলোক যা-ই বলুন, কাজটা যে আইন-বিরুদ্ধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আইন মাত্রেই কঠোর। শুধু সেইজন্যই তাকে অমান্য করা চলে না।

জানি কলকাতায় র‍্যাশানের দোকান থেকে যে চাল দেওয়া হয় তার মান অনেক ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট, তা নিয়ে অভিযোগ আছে, সে অভিযোগ অন্যায্য নয়। কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন। সে যুক্তি দেখিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে চাল পাচারে সাহায্য করা যায় কি ? সরকার সঙ্গত কারণেই সেটা বন্ধ করেছেন। শহরের লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেশি। গ্রামের লোকের কম। বাধানিষেধ না থাকলে গ্রামের বাজার থেকে প্রায় সব চাল সরে যাবে শহরে। যা থাকবে তার দাম সেখানকার মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

মাথা নীচু করে এইসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, ছেলেটা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তখনই গাড়ি এসে থামল বালিগঞ্জে। তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম।

প্ল্যাটফর্মে অনেক পুলিস। দুজন চারজন করে ঢুকে পড়ছে কামরায় কামরায়। বেশ বড় রকম অভিযান, বোঝা গেল।

দিন কয়েক পর। বাইরের ঘরে ডিভানে শুয়ে কাগজ পড়ছিলাম! রমা এসেছিল কি যেন বলবে বলে। সদরে বেল বেজে উঠল। বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এই আবার কে এল! তাড়াতাড়ি বিদেয় করে ভেতরে এসো। দরকারী কথা আছে।'

দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তারপরেই রমার গলা, 'কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন ? তিনদিন হল আমার চাল বাড়ন্ত।'

উত্তরটা কানে যেতেই চমকে উঠলাম!—'কী করব মা ? শনিবার দিন তো আপনার চাল নিয়েই আসছিলাম। পুলিসে ধরল।'

'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ ইস্টেশনে।'

'পুলিসের আর কাজ কী ? মারধোর করেনি তো ?'

'তার আগেই পোঁটলা ফেলে পালিয়ে গেলাম ! ছোট বোনটা ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল ! হাঁটুর কাছে এতটা ছড়ে গ্যাছে ।'

'ওকে নিয়ে আসিস কেন ? অতটুকুন মেয়ে !'

'ও না এসে ছাড়লে তো ! মাও বলবে, যাক । দু'চারবার গেলে তবে না ভয় ভাঙবে !'

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না । বোধ হয় চাল মাপা চলছিল ।

তারপর আবার আমার চমকাবার পালা ।

'জানেন মা ?' বেশ বিজ্ঞের মত শুরু করল ছেলেটা, 'পুলিস যা করে, তার জন্যে ওদের দোষ দিই না । ওটা তো ওদের কাজ । কিন্তু গাড়িতে যে সব ভদ্দরলোক ওঠে, তারা যদি একটু চাইত আমাদের দিকে ! এই দেখুন না, সেদিন এক বাবু আসছিল । কোলের ওপর একটা খালি বাক্স । আস্তে করে বললাম, আমার এই পুঁটলি দুটো রাখতে দেবেন ওর মধ্যে ! ইস্টেশনে আমিই নামিয়ে দেব । বাইরে গিয়ে নিয়ে নেব আমার জিনিস । কী ক্ষেতি হত বলুন তো ? শুনল না, গটগট করে নেমে গেল বালিগঞ্জে ।'

গিন্নীর উত্তরের জন্যে ভয়ে ভয়ে কান খাড়া করে রইলাম । শনিবার, খালি বাক্স আর বালিগঞ্জ, এই তিনটেকে যোগ করে বাক্সওয়ালা বাবুটিকে চিনে ফেলবে না তো ! না ; চাল পাবার আনন্দে ওসব বোধ হয় খেয়াল ছিল না । তবে একটা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়তে কসুর হয়নি, 'বাবুদের আর কী ! চালের ধান্দায় তো আর ঘুরতে হয় না । সে-সব ভাবনা আমাদেব ।'

সেদিন ছেলেটার অনুরোধ হয়তো রাখতাম । পারিনি । অতগুলো ভদ্রলোকের সামনে বে-আইনী কাজে সাহায্য করা !

মনটা খুঁতখুঁত করছিল । কিন্তু বে-আইনী চালের ভাত যখন পাতে পড়ল, বিশেষ করে বেশ কদিন আইনসঙ্গত আতপ চিবোবার পর, তখন আর সেটা টের পেলাম না ।

হাতসাফাই

এ পাড়ায় খেলার মাঠ বলে কিছু নেই । এখানে সেখানে দু-চারটে খালি জমি পড়ে ছিল, ছেলেরা ফুটবল ক্রিকেট খেলত । বছর কয়েকের মধ্যে সব-গুলোতেই বাড়ি উঠে গেছে ।

থাকবার মধ্যে বিজুদের বাড়ি থেকে কয়েকখানা বাড়ি ছাড়িয়ে একটা কাঠা চারেকের প্লট । দশ থেকে বারো-তেরো বছরের একদল ছেলে ঐখানে একটু খেলাধুলো করে ।

বিজু খেলছিল । সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওদের ছোকরা চাকর মদন এসে বলল, 'মা তোমাকে এখনই আসতে বলছে দাদাবাবু ।'

বিজু অপ্রসন্ন মুখে বাড়ি ফিরে দেখল, মা সাজগোজ করে বেরোবার জন্যে

তৈরি। বেশ ব্যস্তসমস্ত ভাব।

'শোন্, ছ'টা বাজলেই পড়তে বসবি। কালকের ইংরেজি হোম-ওয়ার্ক যেন পড়ে না থাকে। তাহলেই আবার চিঠি এসে যাবে—তোমার ছেলে কিছু করছে না। ওদের কি? মাইনে নিয়েই খালাস।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমরা একটু বেরোচ্ছি।'

'তার মানে সিনেমায়'—চাপা হাসির সঙ্গে মাথা নাড়ল বিজু।

'ধাঃ, সিনেমায় কি রে! তোর ছোটমাসির ওখানে একটু কাজ আছে।'

'আমি যাব!'

'তুই যাবি? তোর পড়াশোনা আছে না?'

'হুঁউউ; একলা একলা বাড়িতে ভারী বিচ্ছিরি লাগে আমার।'

'একলা কোথায়? মদন তো রইল। ঠিক ন'টায় তোর খাবার দিয়ে দেবে।'

'কোনো দরকার নেই। আমি কিছু খাব না।'

'বি-জু-উ'—ওঘর থেকে বাবার হাঁক শোনা গেল, 'ওসব বাজে বায়না করার বয়স আর তোমার নেই, মনে রেখো। যা বলা হচ্ছে শুনবে। ব্যাস্।'

বিজু মুখ গোঁজ করে বসে রইল। বাপ-মা বেরিয়ে গেলে বিড়বিড় করে বলল, 'ছোটমাসির বাড়ি না হাতি! আমি যেন কিছু জানি না?'

ছ'টা বেজে গেল। বিজু উঠল না, জামা-জুতো ছাড়ল না। আরো কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে যখন সে নীচে যাচ্ছে মদন পিছন থেকে বলল, 'এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?'

'যেখানে খুশি। তোর তাতে কি?'

পাশের রাস্তায় ওর এক বন্ধু থাকে, মান্তু। একতলায় কোণের দিকে তার পড়বার ঘর। জানালা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই, কী করছিস?'

মান্তু একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিল। সরে এসে বলল, 'কিছু না।'

'ক্যারাম্ খেলবি?'

মান্তুর বাবার আফিস থেকে ফিরতে রাত হয়। মা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকে না।

খুশি হয়ে বেরিয়ে এল মান্তু।

আটটা পর্যন্ত চলল ক্যারাম। তারপর মান্তু উঠে গেল। তার মার ফেরার সময় হয়ে গেছে।

বিজু তার হোম-ওয়ার্ক নিয়ে বসল। খানিকটা করে আর ভাল লাগল না।

খেতে বসে মদনকে খানিকটা বকাবকি করল, 'কী রাঁধিস ছাই! মুখে দেওয়া যায় না।'

খানিকটা খেয়ে বাকীটা ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল। দশটায় শুতে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন পর্যন্ত বাবা-মা ফেরেননি।

কলকাতার এক নামী সওদাগরি ফার্মে উঁচুদরে শাঁসালো পদেই আছেন

ত্রিদিব গুহ। কোম্পানির টাকায় ভাল ফ্ল্যাট নিয়েছেন লেক টেরাসে। গাড়ি আছে, নিজেই চালান। মাইনে ভাল। তার উপরে কিছুটা ডান হাত বাঁ হাতের ব্যাপারও আছে বলে শোনা যায়। হয়তো সেইজন্যেই মাসের শেষের দিকে দীপ্তির বাজেটে প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। স্বামীর কাছে পূরণ করার তাগিদ আসে।

গুহ হাসতে হাসতেই বলল, 'দেখছ তো, গভর্মেন্টও আজকাল ডেফিসিট ফাইন্যান্স-এর বহর ক্রমশ কমিয়ে আনছে। ইউ মাস্ট কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ।'

মিসেসও হাসতে হাসতে জবাব দেন, 'তুমি যদি প্রফেসারি-ট্রফেসারি করতে, তাহলে সে কথা খাটত। ক্লথের লেংথ্ সেখানে বাঁধা।'

'আর আমার বেলায় বুঝি ওটা ইলাস্টিক, টানলেই বাড়ে!'

দীপ্তি এবার মুচকি হেসে চুপ করে থাকেন।

ত্রিদিব বলেন, 'যা ভাবছ তা নয়। আগের দিন আর নেই। ফাঁকটাকগুলো ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। কড়া নজর রাখছে কর্তারা।'

এসব কথাবার্তা বিজুর সামনেই হয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চালাক ছেলে। সব না হলেও কিছু কিছু বুঝতে পারে।

পরদিন বাবা-মা'র উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে বিজু বুঝল অনেক রাত্রে ফিরেছে ওরা। মদনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করতে সেও তাই জানাল, বড় ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে গেছে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় কী করছিলেন জানতেই হবে।

সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েন ত্রিদিব। তারপরেই মা'র বাথরুমে ঢোকার পালা। ঘণ্টাখানেক তো বটেই। সেই ফাঁকে ড্রেসিংরুমে ঢুকে বাবার রাত্রে ছেড়ে রাখা ট্রাউজারের পকেট থেকে দুটো জিনিস পেয়ে গেল বিজু—দু'খানা সিনেমার টিকিটের অর্ধেক আর পার্ক স্ট্রীটের এক নামকরা হোটেলের বিল। টাকায় অঙ্কটা বেশ মোটা।

বিজুর দু'চোখ জ্বলে উঠল—এত টাকা উড়িয়ে এল দুজনে! আর সে একটা আইসক্রীম খেতে চাইলে মা বলবে, রোজ রোজ এত পয়সা আসে কোত্থেকে? আর সিনেমা দেখা মানে সাহেবপাড়ায় কবে ছোটদের বই আসবে তার জন্যে বসে থাকা। অথচ মান্তু আর তার বন্ধুরা কত হিন্দী বই দেখে!

হোটেলের নামটা দেখেই বিজুর জিভে জল এসে গেল। কতকাল অমন সব ভাল ভাল খাবার তার পেটে পড়েনি!

মাকে যখনই বলে, চল না, একটু বাইরে খেয়ে আসি, তখনই শুনতে হয়, না, ওসব আজেবাজে খাবার খেয়ে পয়সা নষ্ট করতে হবে না। কী খেতে চাস বল্, বাড়িতে করে দিচ্ছি।

হোটেল-রেস্টুরেন্টের মত জিনিস বাড়িতে কখনো হয়? মা কী তা জানে না? আসলে ঐ পয়সা। আর নিজেদের বেলায়—

বিলের অঙ্কটা দেখলে সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে যায়।

আচ্ছা! বলে কাগজের টুকরোগুলো রেখে জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে এল বিজু। পড়ার ঘরে গিয়ে বসল, কিন্তু বইতে মন বসল না।

তাদের রাস্তার মোড়ে একটা রেস্টুরেণ্ট আছে। পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীপাড়ার মত না হলেও ভাল আফগানী কাটলেট করে। একবার ওর এক বন্ধু খাইয়েছিল তার জন্মদিনে। তারপর থেকে যেতে আসতে যখনই একটা অত্যন্ত মন-কেমন-করা গন্ধ নাকে যায়, ইচ্ছা হয় ঢুকে পড়ে। কিন্তু টাকা কোথায় ?

টিফিনের পয়সা পেলেও কিছু কিছু করে জমিয়ে টাকাটা যোগাড় করা যেত। কিন্তু মা ওকে বাক্সে করে টিফিন দিয়ে দেয়, পয়সা দেয় না।

কয়েক দিন পরে স্কুল থেকে ফিরে সিঁড়ি থেকেই বিজুর কানে গেল, মা কাকে ভীষণ বকছে—'বাবু বাড়ি এলে তোকে আমি জুতোপেটা করাব। বাজারের পয়সা চুরি করে করে বড্ড লোভ বেড়ে গেছে। শেষকালে আমার ব্যাগে হাত !'

মদন দু'হাতে চোখ মুছছে আর বলছে, 'আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি মা, আমি টাকা নিইনি।'

'তুই ছাড়া আর কে নেবে শুনি ? আমার ব্যাগ তো ছিল ড্রেসিং-টেবিলের ওপর। সেখান থেকে হোয়াট-নট্-এর মাথায় গেল কেমন করে ?'

'টেবিল ঝাড়তে গিয়ে আমি সরিয়ে রেখেছি।'

'সেই সঙ্গে পাঁচটা টাকাও সরিয়ে ফেলেছি—' মুখ ভেংচে মদনের বলার ধরনটা নকল করে বললেন দীপ্তি।

বিজু জানত ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না। বাবা আফিস থেকে ফিরলেই তার কানে উঠবে। একটু রঙ চড়িয়েই বলবে মা। তারপর মদনের কপালে যা ঘটবে, ভাবতেও ভয় হয়। একবার বাজারের পয়সায় সামান্য গরমিল হওয়ায় কি মারটাই না খেয়েছিল ছেলেটা ! রাত্রে জ্বর এসে গিয়েছিল। সকালে উঠতে পারেনি। মা বলেছিল, 'ঢং দেখে আর বাঁচি না। অত সুখের শরীর যাদের তারা চাকর থাকতে আসে কেন ?'

বিজু তার ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। মদন বেচারা খালি খালি মার খাবে কেন ? বাবা আসবার আগেই ও গিয়ে মা'র কাছে কবুল করবে টাকা আমি নিয়েছি, মদন কিছু জানে না। তার চেয়ে আরো ভালো হত টাকাটা যদি একফাঁকে মার ব্যাগে রেখে আসতে পারত। সে উপায় নেই। একটা আফগানী কাট্‌লেট্ আর একখানা ঢাকাইপরোটার পিছনে সবটাই প্রায় চলে গেছে, কয়েকটা পয়সা মাত্র পড়ে আছে তার পকেটে !

কিন্তু মা'র ব্যাগ থেকে নিলেও আসলে তো চুরি। মাও সেই ভাবেই নেবে। ভীষণ বকাবকি করবে, মারধোরও করতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল বিজু। কিন্তু মনটা ভারী খারাপ হয়ে রইল। মদনকে যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বলবে সে উপায়ও নেই। ওর কাছে একটাও পয়সা নেই। সব মাইনেটা মনি-অর্ডারে চলে যায় মেদিনীপুরের কোন্ এক গাঁয়ে ওর বাবার কাছে।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই। বাবার ফিরতে রাত হয়েছিল বলে মা বোধ হয় সেদিন কিছু বলেনি। পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেই নালিশ রুজু করা হল—'তোমার গুণধর চাকরের নতুন কীর্তি শুনবে ?'

বাবা কাগজ থেকে মুখ তুললেন, 'কী করেছে ?'

'আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে পাঁচটাকার নোট উধাও—'

'বল কী !'

'বাজারের টাকা থেকে দু-চার পয়সা এদিক ওদিক করে। টের পেয়েও কিছু বলিনি। চাকরবাকর ক্লাসটাই চোর। এবার যেখানে গিয়ে উঠেছে, তার পরে তো আর বাড়তে দেওয়া চলে না !'

বিজুর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল পড়ার ঘরে। সেখান থেকেই বাবার হুঙ্কার কানে গেল, 'মদন।'

মদন এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে। বিজুও এসে দাঁড়াল দরজার পাশে।

'টাকা বের কর।'

'এজ্ঞে, আমি নিইনি বাবু।'

'তুই না নিলে কে নেবে ?'

মদন জবাব দিল না। বাবা গলা চড়ালেন, 'বল্ শীগগির !'

'তা আমি কেমন করে জানব ?'

বেশ একটু ক্ষোভের সুরেই বলল মদন। বাবা বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করলেন। উঠে এসে বাঁ হাতে ওর একটা কান ধরে বললেন, 'বটে ! বল্ কী করেছিস টাকা দিয়ে ?'

মদন চুপ করে রইল। বাবা তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন, 'যাও, এবার অল্পে পার পেলে। এর পরে আর একটা পয়সা সরিয়েছ তো খুন করে ফেলব।'

বিকেলে খেলার মাঠে যাবার পথে কেউ কোথাও নেই দেখে বিজু রান্নাঘরে ঢুকে চুপি চুপি মদনকে বলল, 'আমি জানি, তুই টাকা নিসনি। খালি খালি বাবা তোকে মারল। তুই কিছু মনে করিস না মদন। আমি তোকে একদিন সিনেমা দেখিয়ে দেব।'

মদনের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সিনেমার ওপর তার ভীষণ লোভ। পাড়ার সব চাকররা দেখে। তারা হাতে মাইনে পায়। তার সে সুবিধা নেই। তারপরেই নিরাশ সুরে বলল, 'তুমি টাকা পাবে কোথায় ?'

সেটা অবশ্য বিজুও জানে না। তবু মুখে ভরসা দিল, 'সে হয়ে যাবে।'

দীপ্তির মামাতো বোনের বিয়ে। এ মাসে পর পর আরো দুটো বিয়েতে যেতে হয়েছিল ওঁদের। শাড়ি দিয়েই সেরেছেন। ত্রিদিবের ইচ্ছা এখানেও তাই হোক। ওরই মধ্যে একটু ভালটাল দেখে— ।

দীপ্তি মাথা নাড়লেন, 'তা হয় না। ছোট মামার প্রথম কাজ। একটু সোনা না দিলে ভাল দেখায় না। সবাই জানে তুমি নামী কোম্পানির বড় চাকরে। তার মান রাখতে হবে তো।'

ত্রিদিব ম্লান হাসলেন—'মান রাখতে গিয়ে এদিকে যে জান যায় !'

শেষ পর্যন্ত দীপ্তির কথাই রইল। একটা কানের গয়না। খুব উঁচুতে ওঠবার

দরকার নেই, আবার নেহাৎ খেলো জিনিসও না হয়। দুয়ের মাঝামাঝি। গড়িয়াহাটে ওদের সেই বাঁধা দোকান থেকে দেখেশুনে নিলেই হবে।

ত্রিদিব কখন ফিরবেন সে ভরসায় না থেকে দীপ্তি ট্যাক্সি করে বেরোলেন। পরদিন স্কুলে কিসের যেন ছুটি। বিজু কিছুতেই শুনল না, মা'র সঙ্গে চলল।

সন্ধ্যার মুখে দোকানে বেশ ভিড়। তা হলেও চেনা খদ্দেরের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন মালিক। সেই পুরনো সেলস্ম্যান একরাশ দুল, কানপাশা, ইয়ারটপ ইত্যাদি নানা ডিজাইনের জিনিস এনে হাজির করল। কতক কেসে ভরা, কতক পাতলা কাগজে মোড়া।

দীপ্তি তুলে তুলে দেখলেন, দাম যাচাই করলেন। কিন্তু কোনটাই যেন ঠিক চোখে লাগার মত নয়।

'সব সেই একঘেয়ে প্যাটার্ন! নতুন কিছু নেই?' বললেন লোকটিকে।

'আছে বৈকি মা।' বলে পিছন ফিরতেই পাশ থেকে স্পষ্ট দেখল বিজু, মা এদিক ওদিক চেয়ে চট করে একটা দুল ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে ফেলল। তারপর একটা পছন্দ করে ব্যাগ খুলে দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

সমেনেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠেই বলল, 'লেক টেরাস্।'

গাড়িতে বসেও বিজুর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছিল।

পরদিন সকালেই এল সেই দোকানের লোকটি। গয়নাটয়না দেখাতে কিংবা টাকা দিতে আগেও এসেছে দু-একবার। বিজু চেনে।

মা ঘরে ঢুকতেই বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু একটা কথা জানতে এলাম। আপনি তো ঐ একটা ইয়ারটপ নিলেন! তাছাড়া বাড়িতে কাউকে দেখাতে বা পছন্দ করাতে আরেকটা দুল কি নিয়ে এসেছেন?'

'কই না তো! এবারে শুধু ঐ একটাই এনেছি। কেন, কী হয়েছে?'

লোকটার সারামুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, 'একটা দুল পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কী!'

'আমারই গল্তি। অত ভিড়ে সব দিকে নজর রাখা যায় না। কিন্তু মালিক তো তা শুনবে না। পুরো টাকাটা কেটে নেবে মাইনে থেকে।'

বলেই উঠতে যাচ্ছিল, আবার বসে পড়ে বলল, 'আপনার লোককে এক গেলাস জল দিতে বলবেন?'

ঢক ঢক করে পুরো গ্লাসটা নিঃশেষ করে ধীরে ধীরে চলে গেল লোকটা।

দিন দুই পরে স্কুল থেকে ফিরছিল বিজু। বড় রাস্তার মোড়ে সিনেমা হল। একটা দুর্দান্ত ভাল ছবি এসেছে ক'দিন থেকে। তেমনি ভিড়।

হঠাৎ চোখে পড়ল মদন এক কোণে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেয়াল-জোড়া ছবিগুলোর দিকে। মনে পড়ল, ওকে একটা ছবি দেখাবে কথা দিয়েছিল সেদিন। বিজুর নিজেরও ভীষণ ইচ্ছা এই ছবিটা দেখে। মান্তু দেখেছে, আরো দুজন বন্ধুও দেখে বলেছে, দারুণ! কিন্তু মা কিছুতেই টাকা দেবে না। তাছাড়া

সে তো একা নয়, মদনকেও দেখাতে হবে।

যখন বাড়ির দিকে চলল, মদন তখনো সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন হুঁশ নেই। বেচারা!

বাড়ি ঢুকতেই দেখল মা দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব, 'একটা কাজ করবি বাবা?'

'কী?'

'মদনটা গ্যাছে র‍্যাশান আনতে—সে কি এখন? কোথায় বসে আড্ডা মারছে বাঁদরটা! ঘরে একফোঁটা চিনি নেই। মতির দোকান থেকে এক কিলো চিনি এনে দে। চা করতে পারছি না।'

'হুঁউঁ! আসতে না আসতেই—'

'ঐ তো দোকান। বেশীদূর তো আর যেতে বলছি না।'

দোকানে খদ্দের নেই। মতি সামনে বসে নোট গুনছিল। বিজু চিনি চাইতেই বলল, 'একটু দাঁড়াও খোকাবাবু।'

'মা যে এক্ষুনি চাইলে!'

'এক্ষুনি চাইলেন? আচ্ছা'—বলে উঠে গেল চিনি ওজন করতে।

বিজুর ঠিক সামনেই একতাড়া দশটাকার নোট। সেই মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠল গয়নার দোকানের কাউন্টারে একরাশ গয়না। তার থেকে এক ফাঁকে—

ঐ সঙ্গে আর একটা দৃশ্যও জুড়ে গেল—

সিনেমা হলের সামনে বড় বড় পোস্টার। একপাশে জুলজুল চোখে দাঁড়িয়ে আছে মদন।··

বিজু চকিতে একবার তাকাল মতির দিকে। সে দাঁড়িপাল্লার দিকে চেয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট ধরতেই, থামের আড়াল থেকে আর একখানা হাত বেরিয়ে এসে তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলল—'কী হচ্ছে, খোকাবাবু?'

মতির ছেলে সাধন। সে যে ওখানে ছিল, বিজু দেখতে পায়নি। হঠাৎ সারা শরীর ঘেমে উঠল। কানে গেল মতির বিষের মত কথাগুলো—'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভদ্দরলোকের ছেলের এই কাণ্ড! এখন থেকেই হাতসাফাই অভ্যেস করছ!'

চিনির ঠোঙাটা বাড়িতে রেখেই ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল বিজু। পিছন থেকে মা'র ডাক কানে গিয়েছিল। দাঁড়ায়নি।

ঘণ্টা দুয়েক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন বাড়ি ফিরল, মনের ভিতরকার সেই অস্থিরতা যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, মা'র ডাক কানে গেল, 'এই, তুই নাকি মতির দোকান থেকে টাকা তুলে নিচ্ছিলি? আমি অবিশ্যি তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলাম—এ হতেই পারে না!···কী, কথা বলছিস না যে?'

বিজু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তাহলে সত্যি? তুই চুরি করতে গিয়েছিলি? আমাদের ছেলে চোর?···

লজ্জা হচ্ছে না তোর !'

বিজু তেমনি গোঁজ হয়ে চুপ করে রইল। না; লজ্জা নয়, ভীষণ রাগ হচ্ছিল তার। আর কারো উপর নয়, নিজের উপর। টাকাটা ফস্ করে তুলে নিতে পারেনি, ধরা পড়ে গেল, তাই।

নামের দৌলতে

সব দিক ঘেরা কালো পুলিস ভ্যান একদল কয়েদী নিয়ে জেলের সামনে এসে দাঁড়াল। একপাশের ছোট গেটটা খুলে ধরল গেটকীপার। কয়েদীরা একজন একজন করে ঢুকছে আর সে গুনতি করে করে জোড়ায় জোড়ায় বসাচ্ছে এক, দো, তিন, চার…

এবার ভর্তির পালা। কোর্ট থেকে প্রত্যেকের জন্যে একখানা ওয়ারেণ্ট এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে তার নাম, বাপের নাম, কী কেসে কত সাজা হল, কী করত বাইরে, এই সব।

একজন জেল-অফিসার ওদের ডেকে ডেকে সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছেন আর ঐ ওয়ারেণ্টের পিঠে লিখে রাখছেন তার কাপড়-জামা জিনিসপত্রের লিস্টি। খালাস যাবার সময় ওগুলো তারা ফেরত পাবে।

তিন-চারজনের পর যার ডাক পড়ল, সে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

কী নাম, জিজ্ঞেস করতে বলল, মিস্টার জি. এস্. ডেভিডসন।

গায়ের রঙ একসময়ে হয়তো ফর্সাই ছিল, এখন তামাটে, মাথাজোড়া টাক, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা ট্রাউজার হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া, শার্টের পাশটায় তালি। তবে টাই আছে এবং সেটা গলা থেকে বেশ খানিকটা নেমে এসেছে। কালি-ঝুলি-মাথা হ্যাট, জুতোজোড়াও ছেঁড়া, এবং বহুদিন কালির মুখ দেখেনি।

'কোন্ কেসে জেল হল?' জানতে চাইলেন জেল অফিসার।

ডেভিডসন উত্তর দেবার আগেই কয়েদীদের মধ্য থেকে কে বলে উঠল, 'পকেট মারা।'

'নো', গর্জে উঠল ডেভিডসন এবং ইংরেজিতে বলল, 'আমি কখখনো পকেট মারিনি। পুলিস মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। হাকিম আমার কথা না শুনেই জেল দিয়ে দিল।'

'অকুপেশন কী, অর্থাৎ কী কাজ কর?'

ডেভিডসন গম্ভীর ভাবে বলল, 'বিজ্‌নেস্।'

কয়েদীদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল। অফিসার তাদের একটা ধমক লাগালেন এবং ওয়ারেণ্টের সঙ্গে যে কাগজ থাকে, যার নাম হাইকোর্ট ফর্ম, সেটা উল্টে দেখলেন, লেখা আছে ভ্যাগাবণ্ড (ভবঘুরে)। একটু ভাল করে তাকালেন সাহেবের দিকে। মনে পড়ল, চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে আলো থেকে কিছুটা দূরে একেই টুপি উল্টে ভিক্ষা করতে দেখেছেন।

ডেভিডসন তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ নীচু ক্লাসের কয়েদী। মস্ত বড় ব্যারাকে পাশাপাশি সাধারণ চোর-ডাকাত-পকেটমারদের সঙ্গেই তাকে থাকতে দেওয়া হল। বিছানা বলতে শুধু দুটো কম্বল। আর পোশাক জেলে-বোনা ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া, কুর্তা, গামছা আর টুপি।

ডেভিডসন তার 'স্যুট' ছাড়তে রাজী নয়। কিন্তু কাপড়-গুদামের মেট (কয়েদী সর্দার) কড়া লোক। তার ধমক খেয়ে গজগজ করতে করতে ওগুলোই পরে নিল।

পরদিন সকালবেলার খাবার নিয়ে বাধল গণ্ডগোল। কয়েদীরা ব্যারাকের বারান্দায় লাইন করে বসেছে, সামনে একখানা করে অ্যালুমিনিয়াম থালা। একটা মস্ত বড় ডেক থেকে বড় একহাতা লপসি পড়ছে তাব উপর। লপসি আসলে খিচুড়ি, তাতে চালের ভাগ বেশী, ডালেব ভাগ কম। লোহার ডেকচিতে রান্না হয় বলে চেহারাটা কালো।

ডেভিডসনের কাছে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেহি খায়গা। ব্রেকফাস্ট লেয়াও।'

'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইল রান্নাঘরের মেট।

'ব্রেড, বাটার, ফ্রায়েড এগস অ্যান্ড টী।'

মেটটি বেশ রসিক। বলল, 'বিলেতে অর্ডার গেছে সাহেব। ততক্ষণ লপসিটা খেয়ে লাও।'

ডেভিডসন থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

দুপুরবেলার খাবার এল মোটাচালের ভাত, ডাল, নানারকম সবজি ঘেঁটে লাবড়া-মতো একটা তরকারি আর তেঁতুলের চাটনি। সেটাও ছুঁল না ডেভিডসন। জানিয়ে দিল, জেলে যেসব সাহেব অর্থাৎ ইওরোপীয়ান কয়েদী আছে, তাদের মত লাঞ্চ চাই।

সন্ধ্যাবেলায় ঐ খাবারই এল, শুধু ভাতের বদলে আটার রুটি। ডেভিডসন ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ডিনার লেয়াও।'

তখন ইংরেজের আমল। জেলার ছিলেন লড়াই-ফেরত ইংরেজ। তাঁর কাছে রিপোর্ট গেল, একজন কয়েদী খাচ্ছে না। জেলের আইনে সেটা বড় অপরাধ!

ডেভিডসনকে তাঁর কাছে হাজির করা হল। তিনি ওর পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুনলেন। ওর ঠাকুরদা নাকি খাঁটি ইংরেজ ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন এদেশী মেয়ে। তারপর এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন এঞ্জিন ড্রাইভার। সে নিজে চাকরিবাকরির দিকে না গিয়ে বিজনেস নিয়ে আছে।

কী বিজনেস সেটা আর বলল না। তবে জেলের পুরনো কয়েদীরা কেউ কেউ ওকে চিনত। তাদের উক্তি অন্যরকম। গোড়াতে ডেভিডসনের বিজনেস ছিল চুরি। ক্যানভাসার সেজে কোন বাড়িতে ঢুকেছিল। টেবিলের উপর থেকে একটা ঘড়ি সরাবার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে গেল। তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে গেল নর্দমায়। সেখান থেকে পা ভেঙে হাসপাতাল। সেই থেকে খুঁড়িয়ে চলে।

এখন তার পেশা হল কখনো ভিক্ষা, কখনো সুযোগ পেলে বাসে উঠে পকেট

কাটা।

জেলার সাহেব বললেন, 'তুমি কোর্টে একটা দরখাস্ত করো যে, আমার পূর্ব-পুরুষ খাঁটি ইংরেজ ছিলেন এবং আমি বিলিতী ধরনের খাওয়া-পরা-জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণী কয়েদীর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক।'

জেলে একদল লেখাপড়া-জানা কয়েদী থাকে। তাদের নাম 'রাইটার', কাজ কয়েদীদের চিঠিপত্তর দরখাস্ত লিখে দেওয়া। তারই একজনকে ডেকে পাঠালেন জেলার সাহেব। দরখাস্ত লেখা হল তাঁর নির্দেশমত এবং 'জরুরী' ছাপ দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঐদিনই সন্ধ্যাবেলায় ফেরত এল দরখাস্ত। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তার উপরে মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে নিজে হাতে লিখে দিয়েছেন—রিজেকটেড অর্থাৎ নামঞ্জুর।

জেলার তখন ডেভিডসনকে নিয়ে গেলেন বড়সাহেব অর্থাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে। তিনিও লড়াই-ফেরত। মিলিটারী মেডিক্যাল সারভিসে উঁচুপদে ছিলেন। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল আই. এম. এস.। দেশী সাহেব। ইংরেজ জেলারের কথায় ওঠেন বসেন। তিনি আবার জেলের মেডিক্যাল অফিসারও বটে।

জেল আইনের কোন এক ধারায় তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তিনি যদি মনে করেন, জেলের সাধারণ কয়েদীকে যে খাবার-দাবার কাপড়চোপড় দেওয়া হয় এবং যে অবস্থার মধ্যে রাখা হয় সেটা কোনো কয়েদীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহলে তিনি তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন।

তখনই হুকুম হয়ে গেল। ডেভিডসনের জায়গা হল আলাদা সেল বা ছোট কামরায়। এল চেয়ার, টেবিল, গদিওয়ালা লোহার খাট, চাদর, বালিশ। জাঙ্গিয়া কুর্তার বদলে তাকে দেওয়া হল সাদা ড্রিলের প্যাণ্ট, টুইলের শার্ট, নতুন জুতো মোজা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয়ান বন্দীদের যে-সব খাবাব দেওয়া হয়, তার জন্যেও সেগুলো মঞ্জুর হল। সেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুন-টী আর ডিনার।

তারই ক্লাসের অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর নেটিভ কয়েদীরাই সে-সব বয়ে এনে পৌঁছে দিল তার ঘরে।

ডেভিডসনের বাপ-ঠাকুরদা তাদের এই বংশধরটির জন্যে কোনো সম্পত্তি রেখে যেতে পারেননি, শুধু দিয়ে গিয়েছিলেন একটা নাম। তারই জোরে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হয়েও গদি-আঁটা খাটে শুয়ে, নতুন তৈরী সাহেবী স্যুট পরে, ব্রেড-বাটার কোর্মা-কারি চপ-কাটলেট চিবিয়ে পুরো তিনটি মাস বাজার হালে কাটিয়ে দিল খোঁড়া পকেটমার জর্জ স্টুয়ার্ট ডেভিডসন।

কুহু-কেকা সংবাদ

মণ্টুদা, মণ্টুদা, মণ্টুদা! একশোবাব শুনে শুনে কেকার কান দুটো ঝালা-পালা হয়ে গেল।

কিন্তু কী করবে? কুহু তার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়

বাড়ি। তাই শুনতে হয়, কোথায় কাদের ঘাড়ে কটা গোল চাপিয়েছে মণ্টুদা, কতগুলো কাপ জেতাল আর শীল্ড বাগিয়েছে দৌড়ে, সাঁতার কিংবা লাফিয়ে। বড় বড় চোখ করে ঘাড়ও নাড়তে হয় মাঝে মাঝে। বলতে হয়, 'তাই নাকি!'

সেদিন ছিল রবিবার। সকাল সকাল চায়ের পালা সেরে পড়ার ঘরের দোর বন্ধ করে কাল রাতের শুরু করা ডিটেকটিভ গল্পটা সবে খুলে বসেছে কেকা, দরজার গায়ে ঠকঠক। আওয়াজ শুনেই বুঝল, কে। খুলতে হল। যা ভয় করছিল তাই।

কুহু হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল। হাতে একটা খবরের কাগজ। 'মণ্টুদার ছবি বেরিয়েছে। তোকে দেখাতে দিয়ে এলাম। কী সুন্দর উঠেছে, দ্যাখ।'

কেকা হাসি-হাসি মুখ করে দেখল। আসলে কিছুই ওঠেনি। কতগুলো ইউনিফর্ম পরা ছেলে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মণ্টুদা বলে যাকে দেখাল তাকে ভজাদা কেষ্টদা পটলদা বলেও অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কারো সঙ্গে কারো এতটুকু তফাত নেই। কুহু তখন ফলাও করে বলে চলেছে, 'জানিস, মণ্টুদা এবার স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে সিনিয়র লীগে চান্স পাচ্ছে।'

নাঃ, এর পরে আর চুপ করে থাকা চলে না। একটু বেশী রকম বেড়ে গেছে কহু। এতকাল শুধু একতরফা শুনে গেছে কেকা। এবার ওর মুখ খোলা দরকার। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল' 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন! ওটা আবার একটা টীম নাকি? আমার ঝণ্টুদা তো মোহনবাগানে খেলে।'

'বলিস কী!' চোখ কপালে তুলল কুহু, 'ভাল নামটা কী বল্ তো?'

কেকা সে কথার জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি। গড়গড় করে বলে গেল ঝণ্টুদার খেলোয়াড়-জীবনের তাক-লাগানো ইতিহাস। শুধু কি ফুটবল নাকি? ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, সবগুলোতে ওস্তাদ। যাকে বলে, স্কোয়ার।· সেবার ওর খেলা দেখে সোবার্স একেবারে থ'। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিয়ে যাবার জন্যে কী টানাটানি। বড়মাসীমা রাজী হলেন না। বাড়ির বড় ছেলে কিনা।'

'অ্যাদ্দিন বলিসনি তো? কোন্ প্লেসে খেলেন মোহনবাগানে?'

'সব প্লেসে। ফরওয়ার্ড, হাফব্যাক, ব্যাক—যেখানে দাও।'

কহু আর বসল না।

দিনকয়েক পরে স্কুল থেকে ফিরে কেকা দেখল, সারা বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেছে। কী ব্যাপার? ঝণ্টুদা আসছে দু-তিন দিনের জন্যে।

কত বছর হল ঝণ্টুদাকে দেখেনি কেকা। সেই যে সেবার গিয়েছিল মা'র সঙ্গে, সেই শেষ দেখা। তখন ও কতটুকু? ঝণ্টুদাও ওর চেয়ে মোটে তিন বছরের বড। কিন্তু কী গম্ভীর। সারাদিন বই নিয়ে বসে আছে। দুর্দান্ত ভাল ছেলে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফোর্থ হয়েছে। ইতিহাসে অনার্স নেবে। সেই জন্যেই আসা।

কেকাদের বাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ পাঁচ মাইল। হাজার দুয়ারি, সিরাজের কবর, আরো যে-সব পুরাকীর্তি আছে সেখানে, সে সব দেখবে। তা না হলে বড়-বাজারের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির ছেলে কখনো কলকাতার বাইরে পা দেয়? ছুটিছাটায়

অবিশ্যি উটি, ওয়াল্টেয়ার, কাশ্মীর, আগ্রা ঘুরতে বেরোয়। তাই বলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসবে কী করতে? কত বড় বনেদী বড়লোক ওরা। ওর জ্যাঠামশাই বলে রেখেছিলেন, যেখানে খুশি যাও, শেয়ালদর স্টেশনে গাড়ি চড়ো না। তার পরেই বাঙালদেশ—জোঁক, মশা, কচুরিপানা আর ম্যালেরিয়ার রাজত্ব। ভাগ্যিস তিনি নেই। তা নাহলে ঝণ্টুদার কক্ষনো আসা হত না।

কিন্তু এদিকে যে গোলমেলে খবর। ফুটবল টুর্ণামেণ্ট চলছে বটতলার মাঠে। কুহুটার পেটে তো কথা থাকে না। চারদিকে রটে গেছে, ঝণ্টুদা মোহনবাগানের প্লেয়ার। ছেলেগুলো নাচতে শুরু করেছে, ওদের টীমে অর্থাৎ মাধবডাঙা উত্তর-পাড়া এফ সি-তে ঝণ্টুদাকে নামাতে হবে। সেকেণ্ড রাউণ্ডে উঠেছে তারা। দক্ষিণপাড়া ইলেভেন-এর সঙ্গে খেলা। কুহুর বাবা আবার ঐ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন কেকার কাছে ঝণ্টুকে যদি বলে কয়ে ঠেকানো যায়। মোহনবাগানের প্লেয়ার মাধবডাঙায় খেলবে কী!'

কেকাও তো তাই চায়। ঝোঁকের মাথায় কুহুকে সেদিন কী বলে ফেলেছিল! আসলে সে খেলে কিনা, খেললেও কি রকম খেলে—কেকা কিচ্ছু জানে না।

এদিকে আবার উত্তরপাড়ার ছেলেগুলো তার বাবাকে গিয়ে ধরেছে। তিনি তো ওদের চেয়েও এককাঠি সরেস। 'মোহনবাগানে খেলে নাকি ঝণ্টু! তাহলে তো তাকে নামাতেই হবে।'

বেগতিক দেখে কেকা মেজকাকে গিয়ে ধরল। ওঁর কাছে সব আব্দার চলে। তাছাড়া উকিল মানুষ। একটা কোনো পথ বাতলে দিতে পারবেন, যাতে সাপও মরে—লাঠিও না ভাঙে।

সব কথাই খুলে বলল মেজকাকে। রবীনবাবু হাসলেন, 'এসব বলতে গেলি কেন কুহুকে?'

'বা-রে! ও বরাবর চাল মারবে, আর আমি কিছু বলবো না?'

'তা ঠিক। তবে পাল্টা চালটা বড্ড লম্বা হয়ে গেছে। এখন সামলানো মুশকিল।'

কেকা আর কী বলে? মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মেজকা ভরসা দিলেন, 'আচ্ছা আসুক ঝণ্টু। দেখি কী করা যায়।'

ঝণ্টু এলে এ-কথা ও-কথার পর জানতে চাইলেন রবীনবাবু, 'ফুটবল-টুটবল খেল?'

কেকা পাশের ঘরে কান পেতে আছে। মনে হল ঝণ্টুদা আঁতকে উঠল, 'ফুটবল!'

'হ্যাঁ, এক-আধটু অভ্যেস আছে তো?'

'আজ্ঞে না, খেলার মাঠে কোনোদিন যাইনি।'

'বল কী! তোমাদের স্কুলে তো বেশ ভাল টিম আছে?'

'তা থাকতে পারে, তবে আমি ওর মধ্যে নেই। আমাদের বাড়ির ছেলেরা খেলে না। জ্যাঠামশাইয়ের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার।'

'কেন বল তো ?'

'উনি বলতেন, ফুটবল তো শুধু ফুট্ দিয়ে খেলে না, হেড্ও লাগাতে হয়। অত বড় একটা শক্ত জিনিসের ঘা খেয়ে খেয়ে মাথার ঘিলুগুলো জমাট বেঁধে যায়। বুদ্ধি খেলে না। তাই তো বড় বড় খেলোয়াড়গুলো বেশির ভাগই লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা।'

'কিন্তু জ্যাঠামশাই স্বর্গে যাবার পর, মাঝে মাঝে এক-আধটু পরখ করে দ্যাখোনি, জিনিসটা কীরকম ?…বল না ? আমার কাছে বলতে আর দোষ কী ?'

ঝণ্টু স্বীকার করল, 'বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কখনো-সখনো দু-চারটে শট্ মেরেছে।'

রবীনবাবু বললেন, 'ব্যস্, তাহলেই হল। ছেলেরা যখন আসবে, ওদের 'না' বলে দিও না।'

'কিন্তু এই বিদ্যে নিয়ে ম্যাচ খেলতে নামা—'

'সেজন্যে তো আমি রইলাম। কেকা…'

মেজকার ডাক শুনে কেকা গিয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ার আসামীর মত। রবীনবাবু বললেন, 'কী বলছে তোর বন্ধুরা ?'

'বলছে তোর দাদা কি মেয়েমানুষ নাকি, ফুটবল খেলতে ভয় পায় ?'

'না না, ভয় পাব কেন ?' কেকার চোখের দিকে তাকাল ঝণ্টু, 'মানে অভ্যেস-টভ্যেস তেমন নেই। তা সবাই যখন বলছেন—।'

পরদিনই খেলা। রবীনবাবু উত্তরপাড়া এফ সি-র ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'অত বড় একটা প্লেয়ার, গেঁয়ো টীমে খেলবে, এটা তো সত্যিই আশা করা যায় না। অনেক বলেকয়ে রাজী করিয়েছি। কিন্তু কদিন আগে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে পায়ে লেগেছে। ছুটতে পারবে না। গোলে খেলবে।'

'তাহলে তো খুব ভালো। আমাদের গোলকীপারটা কিছু নয়। ঐখানটায় ওঁকে পেলে আর আমাদের আটকায় কে ?'

অত বড় মাঠে একতিল জায়গা নেই। সাত-আটটা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে। মোহনবাগানের প্লেয়ার চোখে দেখাই বরাতের কথা। আর এখানে তার খেলা দেখা যাবে! বহরমপুর থেকে হোমরাচোমরা দর্শকও এসে গেছেন কিছু।

ঝণ্টু ঘরে বসেই সব খবর পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবছে, কেন মরতে এসেছিল মাসীর বাড়ি ? ভীষণ রাগ হচ্ছে কেকার উপর। কী দরকার ছিল বন্ধুর কাছে চাল মারবার ? আবার মায়াও হচ্ছে—আহা বেচারা! ও কি জানত এত সব কাণ্ড ঘটবে ? একবার ভাবল, সরে পড়লে কেমন হয় ?

দরজার গায়ে হাতের শব্দ, 'আসতে পারি ঝণ্টুদা ?'

'এসো।'

কেকা আস্তে আস্তে ঢুকল। কিছু বলল না। দু'চোখ-ভরা মিনতি।

রেফারী রবীনবাবু। মাঠে বেরোবার আগে ঝণ্টুকে একা ডেকে নিলেন তাঁর ঘরে। চুপি চুপি কী সব বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'উইস ইউ গুড্ লাক্।'

খেলা শুরু হবার মিনিট পনেরোর মধ্যেই দক্ষিণপাড়া ইলেভেন একটা গোল

খেয়ে গেল। তখন পর্যন্ত উত্তরপাড়া এফ সি-র পেনাল্টি এরিয়া ছাড়িয়ে কোনো বলই আসেনি।

গোল খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠল দক্ষিণপাড়া। দর্শকরাও যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। মাঠের চারধারে কোদাল দিয়ে লাইন কাটা আছে। সেটা পেরিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে কিছু কিছু লোক। লাইন্স্ম্যানদের সাধ্য কী আটকায়?

রেফারী এরকম অবস্থা আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। কুহুর বাবাকে বলে রেখেছিলেন, তাঁর দারোয়ান মহাবল সিংকে দরকার হলে ভিড় ঠেকাবার কাজে লাগানো হবে। সে তার জমকালো গালপাট্টা, মোটা গোঁফ, বিশাল ভুঁড়ি আর ভাঁটার মত দুটো চোখ নিয়ে মোতায়েন ছিল। রবীনবাবু ডেকে চুপি চুপি কী বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সে লাইন ক্লিয়ার করতে লেগে গেল।

হঠাৎ উত্তরপাড়ার গোলের কাছে ভীষণ গণ্ডগোল। কী ব্যাপার? মহাবল সিং গোলকীপারকে রামধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মাঠের বাইরে! প্রায় সারা মাঠের লোক রা-রা করে তেড়ে এল, 'কাঁহে ধাক্কা মারা?'

'জরুর মারেগা। বাঁশিওয়ালা বাবুকা হুকুম—কোই লাইনকা ওপর ইয়া অন্দর নেই আয়েগা।'

'আরে ও বাবু তো খেলতা হ্যায়। বহুৎ বড়া খেলোয়াড়।'

'কাঁহা খেলতা হ্যায়। হাম তো দেখা তব্সে লাইনকা উপর খাড়া হ্যায়।'

খেলা থামিয়ে ছুটে এলেন রেফারী।

উত্তরপাড়া এফ সি-'র খেলোয়াড় আর তাদের পক্ষের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল—এর প্রতিকার চাই।

ও-পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হল। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট খোদ এসে এদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন। এমন সময় কোথা থেকে গোটাকয়েক ঢিল এসে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। মারামারি লাগে আর কী। বেগতিক দেখে লম্বা হুইসল বাজিয়ে দিলেন রেফারী। খেলা শেষ।

না, ঝণ্টুর কিচ্ছু লাগেনি। রাত্রে সবাই যখন একসঙ্গে খেতে বসেছে, কেকা বলল, 'দারোয়ান ব্যাটার বদমাইসি আছে। অত জোরে ধাক্কা দেয়!'

ঝণ্টু উত্তর দিল, 'মোটেই জোরে দেয়নি।'

'তাহলে পড়ে গেলেন কেমন করে?'

ঝণ্টু হাসিমুখে মেজকার দিকে ফিরল। তিনি বললেন, 'ভাগ্যিস পড়েছিল। তা নাহলে মোহনবাগানের মান থাকত কোথায়? আর কুহুর কাছে কেকারই বা মুখ থাকত কেমন করে?'

ফ্ল্যাট রেস

সেদিন শুনলাম কুহু আর কেকাতে আড়ি হয়ে গেছে। হামেশাই হয়ে থাকে। যেখানে যত ভাব, সেখানে তত আড়ি। ওরা তো ছেলেমানুষ। বড়রাও কম যান না। এই তো কদিন আগে মিসেস কাঞ্জিলাল বলছিলেন ওঁদের 'গৃহলক্ষ্মী ক্লাব'-

এর মেম্বার ছিল পঞ্চাশ, কমে কমে পঁয়ত্রিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণটা কী? না; এর সঙ্গে ওঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ, সি ব্লকের সঙ্গে ডি ব্লকের যাতায়াত নেই।

ছোটদের অবিশ্যি আড়ি থেকে ভাব হতে দেরি হয় না। কিন্তু কুহু আর কেকা এবার বেশ কিছুদিন ধরে যে যার বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। ব্যাপার কী? একটা দিন মুখোমুখি বসে বকবক করতে না পারলে যাদের ভাত হজম হয় না, তারা হঠাৎ এরকম নন-কোঅপারেশন করে বসে আছে কেন?

বেড়াতে বেড়াতে গেলাম কুহুদের বাড়ি। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক করে বোঝাতে চোখ ছলছল করে বলল, 'কেকাটা আমার মণ্টুদাকে অপমান করেছে।'

'বল কী!'

'হ্যাঁ, দেখুন না, সেদিন কাগজে ছবি বেরিয়েছে মণ্টুদার। ওদের ক্লাবের স্পোর্টসে লঙ জাম্পে ফার্স্ট হয়েছে কিনা। কেকাকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। তুই আমার বন্ধু, খুশী হবি তো? তা না। ঠোঁট উলটে বলল, 'এ যে তোর মণ্টুদা বুঝলি কী করে? কতগুলো লোক ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।'

'ছবিটা না হয় ভালো ওঠেনি। তাই বলে আমার মণ্টুদাকে ভূত বলবে!'

আমি বললাম, 'তাই তো, ভারী অন্যায়।'

'আরো কী বলল, শুনুন, না। 'খুব যে মণ্টুদা মণ্টুদা করিস, নিয়ে আয় না একবার, দেখি কত বড় স্পোর্টসম্যান। এই তো আসছে মাসে আমাদের মাঠে স্পোর্টস হচ্ছে। মেজকাকে বলে ওর নামটা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।' আচ্ছা, বলুন তো, মণ্টুদা আসবে এই অজ পাড়াগাঁয়ের পচা স্পোর্টসে নাম দিতে! আর উনি দয়া করে ওঁর মেজকাকে বলে তাকে ঢুকিয়ে দেবেন!'

বলেই কান্না চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আঘাতটা সত্যিই ওর খুব লেগেছে। লাগবারই কথা। কেকাই বা ওসব বলতে গেল কেন? কুহু যে মণ্টুদা বলতে অজ্ঞান সেটা তো সে ভালো করেই জানে।

এবার কেকাকে ধরলাম। সে স্বীকার করল, হ্যাঁ, অনেকটা ঐ ধরনের কথা সে বলেছে। কিন্তু খালি-খালি তো আর বলতে যায়নি। কুহু তার ঝণ্টুদাকে নিয়ে অমন ঠেস দিয়ে দিয়ে বাজে কথা বলল কেন?'

জানতে চাইলাম, 'কী বলেছে কুহু?'

'বলে কিনা খুব তো মোহনবাগানের প্লেয়ার বলে ঢাক পিটিয়েছিলি। তোর মেজকা যদি খেলা বন্ধ করে না দিতেন, দেখা যেত। এসব কথার মানে কী আপনিই বলুন।'

ঘটনাটা আমি জানি। কুহুর মুখে হরদম 'মণ্টুদা এই করেছে, মণ্টুদা ঐ করেছে' শুনে শুনে কেকার কান ঝালাপালা। একদিন আর থাকতে না পেরে বলে বসল, তার ঝণ্টুদাও দুর্দান্ত ফুটবলার, মোহনবাগানে খেলে। আসলে সে ফুটবল মাঠেও যায়নি কোনদিন। কিছুদিন পরেই ঝণ্টু বেড়াতে এল ওদের বাড়ি। তখন ফুটবল মরশুম চলছে। ওদের গ্রামের উত্তরপাড়া এফ সির সঙ্গে

দক্ষিণপাড়া ইলেভন-এর সেমি-ফাইন্যাল। আর যায় কোথায়! সবাই মিলে ধরে বেঁধে তাকে নামিয়ে দিল। কেকাদের পাড়ার টীমের গোলকীপার। কেকা গিয়ে ধরল তার মেজকাকে কী করে মুখ বাঁচানো যায়। তিনি তাঁর ওকালতি বুদ্ধি খাটিয়ে গোলে বল যাবার আগেই এমন একটা গোল বাধিয়ে দিলেন যে খেলাই বন্ধ হয়ে গেল। মাঠের লোকেরা চালাকিটা ধরতে পারল না। কুহুর মনে কিছুটা সন্দেহ হয়ে থাকবে। কথায়-কথায় সেদিন বেরিয়ে পড়েছে। কেকাও পাল্টা ঘা দিয়ে বসেছে।

কুহুকে নিয়ে তার বাড়ির লোকেরা মহা ভাবনায় পড়লেন। কী হল মেয়েটার। মুখে হাসি নেই, কথাটথাও বড় একটা বলে না কারো সঙ্গে। স্কুলে একদিন গেল তো দুদিন গেল না। গানের মাস্টার এলে বলে পাঠায়, 'আমার গলায় ব্যথা।'

একদিন হঠাৎ দেখা গেল, সকাল থেকেই তার ঘরের দরজা বন্ধ। রবিবার বলে নটার সময় চান-খাওয়ার তাগিদ এল না। কিন্তু এগারোটা বাজবার পরেও বেরোচ্ছে না দেখে বৌদি এলেন ডাকতে। তিন-চারবার ডাকাডাকির পর সাড়া এল ভারী গলায়, 'তোমরা খেয়ে নাওগে। আমি আজ খাবো না।'

'কেন, খাবে না কেন?'

'আমার খিদে নেই।'

'দোর খুলবে তো?'

'না।'

তারপর এলেন মা। প্রথমে সাধাসাধি, তারপর রাগারাগি, কুহু কোনটারই জবাব দিল না, দরজাও খুলল না।

কদিন ধরে সারা ব্যাপারটা নাড়াচাড়া করে কুহুর সব রাগ গিয়ে পড়েছিল মণ্টুদার ওপর। ঠিকই বলেছে কেকা। সে-ই কেবল মণ্টুদা মণ্টুদা করে মরে। তিনি কোন্ লাটসায়েব যে একটিবারও তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে পারলেন না! হতে পারে তারা বড়লোক, খাস কলকাতার বনেদী গোষ্ঠী।

কিন্তু কেকার ঝণ্টুদারাও কম বড়লোক বা কম বনেদী নয়। মণ্টু যেমন তালতলার তালুকদার বাড়ির মেজো ছেলে, ঝণ্টুও তেমনি বড়বাজারের বাঁড়ুজ্যে বাড়ির সেজো ছেলে। দুদিকের সম্পর্কটাও একই রকম। মণ্টু কুহুর পিসতুতো ভাই, ঝণ্টু কেকার মাসতুতো ভাই। ঝণ্টু সে সম্বন্ধটা মনে রাখে। এরই মধ্যে দু-দুবার ঘুরে গেল মাসির বাড়ি। আর মণ্টুবাবুর মামা-মামীর কথাও একবার মনে পড়ে না, বোন তো তার পরে।

বাবার কাছে খবর গিয়েছিল। তিনি এসে নরম সুরে ডাকলেন, 'দরজাটা একটু খোল তো মা।'

এবার আর না খুলে পারল না কুহু। বাবা ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল, 'আচ্ছা বাপি, মণ্টুদা আমাদের বাড়ি একবারও আসে না কেন?'

হঠাৎ একথা কেন, বুঝতে পারলেন না ভদ্রলোক। তিনি ভেবেছিলেন, জটিল-রকম কোনো কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। এই গোছের একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে মেয়ে ঘরে দোর দিয়ে না খেয়ে বসে আছে কেমন করে জানবেন? বললেন,

'শুনেছি খুব খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাই হয়তো আসতে পারে না।'

'মোটেই তা নয়। আমরা তো ওদের মত বড়লোক নই, পাড়াগাঁয়ে থাকি। তাই আসে না।'

'কী যে বলিস? মণ্টু মোটেই সেরকম ছেলে নয়। তা এ নিয়ে তুই মন খারাপ করছিস কেন?'

'কেকার ঝণ্টুদা কত আসে ওদের বাড়ি, কেমন হৈ-চৈ করে। আর—' বাকী-টুকু আর বলতে পারল না। দু-চোখে আঁচল চেপে ধরল।

বাবা এবার বুঝলেন, ব্যাপারটাকে মোটেই হালকা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বন্ধুর কাছে মেয়ের একটা মান আছে না? বললেন, 'আচ্ছা, আমি তো আসছে সপ্তাহেই কলকাতা যাচ্ছি। দেখা হলে ওকে খুব বকে দিয়ে আসব। আর ওর মাকে বলে আসব শীগগিরই যেন একবার পাঠিয়ে দেয়। তুই কিছু ভাবিসনে।'

শীগগির আর হল না। মামা এত করে বলে গেছেন শুনেও 'আজ যাই কাল যাই' করে মাসখানেক পরে এল মণ্টু। আর ঠিক সেইদিনই এখানকার স্পোর্টস। কুহু তো চটে লাল, 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে?'

মণ্টু হাসল। 'জানিস তো আমার কত কাজ! ডিসেম্বর মাস পড়ে গেছে। রোজই কোনো না কোনো ক্লাবে—'

'আর আমাদের ক্লাবটা বুঝি এতই ফ্যালনা?'

'ফ্যালনা কেন হবে? এই তো ঠিক দিন বুঝে এসে পড়েছি।'

'হুঁ, দুটোয় স্পোর্টস আর বাবু এসে পৌঁছলেন বেলা এগারটায়!'

'তাতে কী হয়েছে? তুই চলে যা না। আমি মামার সঙ্গে ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হবো।'

'শুধু হাজির হলেই হবে না মশাই, আপনাকে নামতে হবে।'

মণ্টু মনে মনে হেসে খুন। মেয়েটা বলে কী!

এই গেঁয়ো স্পোর্টসে পার্ট নেবে মণ্টু তালুকদার! তার ক্লাবের ছেলেরা শুনতে পেলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বয়কট করে দেবে। তাছাড়া মাঠের যা ছিরি! আসবার সময় দেখে এসেছে। আগাগোড়া এবড়ো-খেবড়ো, মাঝে মাঝে গর্ত। এর মধ্যে ছোটে কেমন করে? পাড়াগেঁয়ে ভূত তো। ওরা সব পারে।

কুহুকে বলল, 'কী জানিস, পর পর পনের দিন একটানা দৌড়-ঝাঁপ লাফা-লাফি করে শ্রীচরণ দুটির অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। কটা দিন ছুটি চাইছে।

'তার চেয়ে বল না কেন, ইচ্ছে নেই। একে পাড়াগাঁ তায় ছোট ক্লাব—' ঠোঁট উলটে বলল কুহু।

মণ্টুকে হার মানতে হল, 'আচ্ছা বাবা নামবো। তবে কোনো বড় ইভেন্ট দিতে মানা করিস। ছোটখাটো কিছু একটা—'

বলতে বলতেই ক্লাবের সেক্রেটারি দলবল নিয়ে এসে পড়লেন। বললেন, 'বেশ তাই হবে। আমাদের মাঠে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, তাতেই আমরা ধন্য।'

ঠিক হল, একশ গজ ফ্ল্যাট রেস্‌-এ দৌড়বে মণ্টু।

এ গাঁয়ের ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। তালতলা ইয়ুথ ক্লাবের দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান মণ্টু তালুকদারকে চোখে দেখাই ভাগ্যের কথা। তার ওপরে তার দৌড়ও দেখা যাবে। কাতারে কাতারে লোক এসে জড় হল মাঠে। মাইক তো নেই। একটা ছেলে—চেহারা সরু হলেও, গলাটা বেশ মোটা—মুখে মস্ত বড় এক চোঙা লাগিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'বন্ধুগণ, স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্‌ মণ্টু তালুকদার আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। ১০০ গজ ফ্ল্যাট রেস্‌-এ আপনারা তাঁকে দেখতে পাবেন।'

ঐ ইভেণ্ট্‌টা রাখা হয়েছিল সকলের শেষে, লোকজন আটকে রাখার জন্যে। সারা মাঠ উৎসাহ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। চোঙাওয়ালা পর পর ছটা নাম বলে গেল। সকলের শেষে মণ্টু তালুকদার। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি।

মেয়েদের ভিড়টাও কম নয়। কুহু তো আগেই এসে বসে গেছে একেবারে সামনের সারিতে। কিন্তু 'সে' কোথায়? আসবে নিশ্চয়ই। তবু না দেখা পর্যন্ত মনটা ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। না এলে সব মাটি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল বার বার। ঐ তো এসে গেছে। বড় বড় চোখ করে মণ্টুদাকে দেখছে। কুহু মনে মনে বলল, আনতে পারব না বলেছিল তো? এবার দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো।

স্টার্টার পিস্তলের আওয়াজ করলেন। দৌড় শুরু। সকলের আগে মণ্টু তালুকদার। সারা মাঠ গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ সব চিৎকার যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

অ্যাক্সিডেণ্ট! মণ্টু তালুকদার উপুড় হয়ে পড়ে আছে ট্র্যাকের উপর। সব লোক ছুটে চলেছে সেইদিকে। অত ভিড় ঠেলে কাছে যাওয়া আমার সাধ্য নয়।

সন্ধ্যার পর গেলাম কুহুদের বাড়ি। মাঠেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল 'মণ্টুদা'র সঙ্গে। একবার খবর নেওয়া দরকার।

বাইরের ঘরেই পাওয়া গেল। তক্তপোশে বসে আছে। পায়ে চুনহলুদ লাগিয়ে দিচ্ছে কুহু। পাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে কেকা। আমাকে দেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনি বলুন তো জ্যাঠামশাই, নেহাৎ হাসিতামাশা করে সেই কবে কী বলেছিলাম, আর সেই জন্যে কিনা ওঁর মত একজন এত বড় স্পোর্টসম্যানকে টেনে এনে আমাদের এই পচা মাঠে দৌড় করিয়ে ছাড়ল! কী জেদী মেয়ে বাবা!'

কুহু মাথা নীচু করেই বলল, 'সত্যি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, এরকম মাঠে দৌড়নো ওঁর অভ্যাস নেই। একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে—'

'আহা, তাতে হয়েছেটা কী?' বাধা দিল মণ্টু। আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে। আমি এদের কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, এরকম হামেশাই ঘটে থাকে আমাদের।'

আমি বললাম, 'আমারও একটা ধাঁধা কাটল।'

'ধাঁধা!'

'হ্যাঁ, তোমাদের লংজ্যাম্পে, হাইজাম্প, রিলে রেস, অবস্ট্যাকল রেস, স্যাক

রেস—এসবগুলোর মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ফ্ল্যাট রেস কথাটা ঠিক ধরতে পারিনি। আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেল যখন দেখলাম—'

'আমি ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছি' বলে হো হো করে হেসে উঠল মন্টু। তাকে ছাপিয়ে গেল কুহু ও কেকার খিলখিল হাসি।

কইমাছ

বরাবর দেখা যায় বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষ ধাক্কা গিয়ে পড়ে জেল-খানার উপর।

সেই যে সেবার এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ানো নিয়ে অনেক ট্রামকে ভস্ম হতে হল এবং সেই সঙ্গে দক্ষযজ্ঞের পালা চলল কলকাতার রাস্তায়, তার ফলে একটা বৃহৎ সেনট্রাল জেল রাতারাতি উপচে উঠল। নেতাদের সংখ্যাই শ'দুয়েক। তাঁরা সব ডেটিনিউ, অর্থাৎ জেল খাটতে হবে না। শুধু আটকা থাকবেন অনির্দিষ্ট কাল। খাবারদাবার, কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজন বাবদ তিন রকম অ্যালাউন্স পাবেন। অর্ডার মাফিক মাল যোগাবে জেল।

স্বভাবতই সেই সব মালপত্তর এবং অন্যান্য নানা ব্যাপার নিয়ে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ লেগেই থাকে। সামলাতে গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিমশিম। অন্য কাজকর্ম প্রায় অচল।

সেদিন তাই বেশ খানিকটা আগেই অফিসে এসে বসেছিলেন। সামনে ফাইলের পাহাড়। তারই একটা টেনে নিয়ে ফিতেটা সবে খুলেছেন, 'আসতে পারি ?' বলে ঢুকে পড়লেন পরিতোষ হালদার। ডেটিনিউ ওয়ার্ডের কিচেন-ম্যানেজার।

সুপার সাহেবের জিহ্বাগ্রে যে শব্দটি এসে গিয়েছিল, তাকে বাইরে আনা চলে না। তার বদলে মুখের উপর বেশ একখানা মোলায়েম মুখোস লাগিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন। সব ভালো তো ?'

'ভালো আর থাকতে দিচ্ছেন কই ?'

'কেন, কী হল ?'

'আপনার ঐ ভুজঙ্গকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।'

'নাম ভুজঙ্গ তো ? এক-আধটু ফোঁসফাঁস করে মাঝে মাঝে। তবে আসলে ছেলেটা ভাল এবং খুব কাজের।'

'হ্যাঁ, সেই কাজটা একটু বেশী অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলে এই যা।'

'নতুন কিছু করেছে নাকি সেরকম ?'

'ব্যাপারটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।'

সুপার শুনবার জন্যে তৈরি হলেন।

ম্যানেজার জানালেন, আগামী কালের জন্যে তিনি চারশ' কইমাছের অর্ডার দিয়েছিলেন। ভুজঙ্গ না-মঞ্জুর করে দিয়েছে এবং অর্ডার যে নিয়ে গিয়েছিল—কিচেন-মেট, তাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, 'বাবুদের বলো আমি যদ্দুর জানি,

কলকাতায় বা কাছাকাছি কোন জায়গায় কইমাছের ফ্যাক্টরি নেই।'

ডোটিনিউরা স্বভাবতই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

তাঁর স্টোর-ক্লার্কের এতটা রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুশী হলেন সুপার সাহেব। বাইরে অবশ্য রাগত ভাব দেখাতে হল। ঘণ্টা বাজিয়ে আরদালীকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'গুদামী বাবুকো বোলাও।'

জেলখানার **Store Clerk** অর্থাৎ গুদামী বাবুকে একটি সুবিশাল একান্নবর্তী পরিবারের গৃহিণী বলা চলে। প্রতি বেলায় হাজার চারেক পাত পড়ে তাঁর সংসারে। চাল ডাল তেল নুন থেকে শুরু করে কেরোসিন ফিনাইল ঝাঁটা আলকাতরা ইত্যাদির গোটা ভাঁড়ার তাকে সামলাতে হয়; এবং দরকার মত যোগান দিতে হয়।

একটা বিরাট রিংএ গাঁথা পাঁচসেরি ওজনের চাবির গোছা (বোঝা বলাই ঠিক) কাঁধে ঝুলিয়ে ভুজঙ্গ এসে হাজির। সাহেবের কাছ থেকে কিচেন-ম্যানেজারের অভিযোগ শুনেই বলে উঠল, 'আসল পয়েণ্টটাই যে উনি চেপে গেছেন স্যর।'

'আসল পয়েণ্ট মানে?'

'কই মাছের **specification.**'

Specification কথাটার সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। তাঁকে বহু জিনিসের কনট্রাক্ট করতে হয়, তাতে সেগুলোর মাপ আকার ওজন ইত্যাদির স্পষ্ট উল্লেখ বা **Specify** করা থাকে। সেই মত মাপ বুঝে নেয় জেল। কিন্তু কইমাছের **specification**টা তাঁর ঠিক বোধগম্য হল না। বললেন, 'সেটা আবার কী?'

ভুজঙ্গ বুঝিয়ে দিল, 'ডোটিনিউদের অর্ডারমত প্রতিটি কই মাছ ঠিক এক সাইজের হওয়া চাই। একচুল ছোট বড় হলেই ফেরত। আপনিই বলুন স্যর, কইমাছ কি নাট-বলটু যে সাইজ মেপে তৈরি হবে?'

পরিতোষ স্বীকার করলেন, ছোট বড় হলে পরিবেশনে বড় ঝামেলা হয়।

ভুজঙ্গের দিকে বক্রদৃষ্টি ফেলে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'আপনার কনট্রাক্টরবাবু একটু অনুগ্রহ করলেই দিতে পারেন। এক বাজারে না পেলে দশটা বাজার থেকে যোগাড় করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু তাকে তো আপনারা ঘাঁটাবেন না। তাহলে আসল জায়গায় টান পড়বে।'

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে ভুজঙ্গ প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসব আপনি কী বলছেন?'

তাঁকে হাতের ইশারায় থামিয়ে মামলাটা আপাতত মুলতুবী রাখতে যাচ্ছিলেন সুপার, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন জেলার। সুপারের দক্ষিণ হস্ত।

বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় পাকা। তাছাড়া ভদ্রলোকের উপস্থিত বুদ্ধিটা বেশ ধারালো।

'এই যে পরিতোষবাবু, এত সকালে কি মনে করে?'

ম্যানেজার জেলারের উপর খুশী নন। কোন উত্তর দিলেন না। সুপার

বললেন, 'কইমাছ নিয়ে গোল বেধেছে।'

'কইমাছ নিয়ে! কী হয়েছে ভুজঙ্গ?'

ভুজঙ্গ ব্যাপারটা জানাতেই পরিতোষের দিকে ফিরলেন জেলার, 'এইসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে স্যারকে বিরক্ত করেন কেন? আমার কাছে গেলেই তো পারতেন। চারশ' কই আর এমন কী? পেয়ে যাবেন।'

'এক সাইজের হবে তো?' নিশ্চিত হতে চাইলেন কিচেন ম্যানেজার।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, **exactly of equal size**—ফিতে মেপে কিংবা প্রতিটি মাছ ওজন করে নেবেন।'

একটু থেমে বললেন, 'তবে কিন্তু সময় লাগবে।'

'বেশ তো, কাল না হয় পরশু, কিংবা তার পরদিন দেবেন।'

'আজ্ঞে না, অত শীগগির হবে না।'

'তাহলে কত সময় চান?'

'অন্তত এক বছর।'

'এক বছর! আপনি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন?'

'কী যে বলেন? আপনাদের সঙ্গে তামাশা! **Seriously** বলছি। এক সাইজের চারশ' কই কুড়িটা বাজার ঢুঁড়েও মিলবে না, এটা **common sense**, কাজেই আপনার অর্ডার আমরা **West Bengal Government** এর **Fisheries Department**এ পাঠিয়ে দেবো। তারা পুকুরে ডিম ফেলবে। সে ডিম ফুটবে, বাচ্চা বেরোবে। সেগুলো বড়সড় অর্থাৎ খাবার মত হতে বছরখানেক তো লাগবেই। তবে সাইজের তফাৎ হবে না।'

কোন কথা না বলে গট্‌গট করে বেরিয়ে গেলেন ম্যানেজার। একটু পরেই কইমাছের বদলে রুইমাছের অর্ডার এল ভুজঙ্গের দপ্তরে।

বলরাম ড্রাইভার

'ব্রেক্, ব্রেক্!' আমার বাঁ পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল বলরাম। ততক্ষণে গাড়িটা রাস্তা ছাড়িয়ে ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আসশেওড়া আর বনতুলসীর জঙ্গল। সুতরাং মারাত্মক কিছু ঘটল না।

নতুন ড্রাইভিং শিখছে। রাস্তাটা ডানদিকে অনেকখানি মোড় নিয়েছে। সে খেয়াল ছিল। কিন্তু স্টিয়ারিং কতটা ঘোরানো দরকার ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। তাই এ বিভ্রাট।

মফঃস্বল শহরে চাকরি। রাস্তাঘাটে এমনিতেই তেমন ভিড় নেই। আমার আস্তানা ও অফিস যে অঞ্চলে সে দিকটা এক রকম ফাঁকা বললেই চলে। আনাড়ি লোকের হাতেখড়ির পক্ষে সুবিধা। গাড়িটা পুরনো মরিস্। সেই সঙ্গে একটি পুরনো ড্রাইভারও জুটে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল তার কাছে কিছুদিন তালিম নিয়ে হাতটা একটু সড়গড় হলেই নিজেকে পাকাপাকি ড্রাইভার-পদে বহাল করে নেব। কিন্তু মাসখানেক না যেতেই পর পর এমন কয়েকটা এইজাতীয় 'অ্যাক্-

সিডেণ্ট্' ঘটে গেল যে বাড়ি থেকে ঘোর আপত্তি দেখা দিল। গৃহিণী তো সোজা রায় দিয়ে বসলেন, আমার দ্বারা 'এসব' হবে না। 'এসব' কথাটা তিনি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন—সংসারে 'কাজ' বলতে যা বোঝায়।

আমিও ভেবে দেখলাম আমার হাত দিয়ে কলম পেষা ছাড়া আর কিছুই হবার নয়, সে পরীক্ষা তো বার বার হয়ে গেছে। সবে কলেজে ঢুকেছি, শুরু হল 'নন্‌কোঅপারেশন' আন্দোলন। পাড়ায় পাড়ায় চরকা কাটার ধুম। আমিও লেগে গেলাম। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই চরকা সঙ্ঘের সেক্রেটারী আমাকে বাতিল করে দিলেন—বড্ড বেশী সুতো ছিঁড়ছ তুমি।

প্রাক-বিবাহ জীবনে একবার স্বপাক ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলাম। শখ করে নয়, বাধ্য হয়ে। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন পাচক প্রভুর সাক্ষাৎ মিলত না। তাকে বিদায় দিয়ে পাকপ্রণালীর সাহায্য নিলাম। তার নির্দেশ পুরোপুরি পালনে কসুর হয়নি, ফোস্কা, খুন্তির ছেঁকা ইত্যাদিও অগ্রাহ্য করেছিলাম। কিন্তু গোল বাধাল পাকস্থলী। অত যত্ন করে তৈরি খাদ্যসামগ্রী অস্বীকার করে বসল। সেখানেও ডাক্তার রায় দিলেন, এসব চলবে না।

বলরাম 'ড্রাইভার'-পদে পাকা হয়ে বসল। আমি পিছু হটে এলাম। অর্থাৎ পিছনের সীটে এসে বসলাম। সবাই নিশ্চিন্ত। বলরামও মনেপ্রাণে তাই চাইছিল। সে পাশে বসে থাকবে আর সাহেব কষ্ট করে স্টিয়ারিং ঘোরাবে এটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাছাড়া গাড়িটা ছিল তার প্রাণ। আমার মত আনাড়ির হাতে পড়ে তার গায়ে যে-সব আঁচড়-টাঁচড় লাগত—মাঝে মাঝে ছোটোখাটো চোট—সেগুলো যেন ওর নিজের গায়ে লেগেছে এমন ভাবে ছট্‌ফট করত। ঝেড়ে পুছে ঘষে গাড়িটাকে ঝকঝকে করে রাখত।

কিন্তু অনেকদিনের পুরনো মডেল তো। বাইরেটা ঠিক রাখলে কি হয়, ভিতরে ভিতরে ব্যাধির আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আজ এখানে, কাল ওখানে। বলরাম কিছুটা মেকানিকের বিদ্যাও শিখে নিয়েছিল। টুকটাক ঠোকাঠুকি নিজে হাতেই করত। তাতে যখন কুলোত না, ওর জানাশুনো এক মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে আসত। সে অবশ্য বলত, গাড়ির বয়স হয়েছে, অনেক কিছু বদলানো দরকার কিন্তু বলরাম মানতে চাইত না—ইঞ্জিন দেখেছ ? এ কি তোমার দিশী গাড়ি ? খাস বিলিতি মাল। মরা হাতিও লাখ টাকা। এখানকার গাড়ি মানে তো দেশলাইয়ের বাক্স। এর বডি দেখ—বলে জোরে চাপড় মারত গাড়ির গায়ে।

মাঝে মাঝে গাড়িটা অফিসের পথে বিগড়ে যেত। বলরাম তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে বনেট খুলত—'কিছু না ; কার্বুরেটরে ময়লা এসেছে স্যার', কিংবা 'তেল ওভারফ্লোট (তার ভাষায়) করেছে'। কখনও ঠিক হয়ে যেত, কখনও বা খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে নিজেই ছুটে গিয়ে রিকশা ডেকে আনত।

কোন কোন দিন বাড়ি থেকেই বেরোতে চাইত না গাড়ি। স্টার্টিং-এর গোলমাল। ব্যাটারি ডাউন কিংবা অন্য কোন 'ট্রাবল' যার চিকিৎসা ওর বিদ্যার বাইরে। ব্যাটারি 'দুর্বল' হলে কাছে একটা বস্তি থেকে কিছু ছেলেছোকরা জুটিয়ে নিয়ে

আসত ঠেলে স্টার্ট দেবার জন্যে। ব্যাপারটা এত ঘন ঘন ঘটতে লাগল যে ছেলেগুলো আগেই এসে জড় হত। পাড়ার ভদ্রলোকেরাও জিনিসটাকে বেশ উপভোগ করছিলেন।

তারপর যা ঘটল, একেবারে মোক্ষম ঘটনা। গৃহিনী গিয়েছিলেন সিনেমায়। ঘরের গাড়ি; একা যেতে বাধা নেই। বেরোবার আগে অবশ্য ড্রাইভারের কাছে জেনে নিয়েছিলেন, গাড়ি ঠিক আছে তো? বলরাম পুরো আশ্বাস দিয়েছিল।

ফেরার পথে গাড়ি বেঁকে বসল। রাত নটা বেজে গেছে। অঞ্চলটা ভাল নয়। বলরাম নেমে পড়ল স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে। কোথায় কি করল সে-ই জানে। কিন্তু তার রথ অনড়। রিকশা একটা জোটানো যেত হয়তো। কিন্তু এক-গা গয়না পরে অচেনা রিকশায় উঠতে গৃহিণী স্বভাবতই রাজী হলেন না। তাছাড়া ঐ বলরামই তো যাবে রিকশা ডাকতে। ততক্ষণ একা গাড়িতে বসে থাকাও নিরাপদ নয়। এরই মধ্যে চারদিকে লোক জড়ো হয়ে গেছে, যেমন হয়ে থাকে বিশেষ করে মফঃস্বল শহরে। কৌতূহলী জনতা। কিন্তু গাড়ির দরজা লক্ করে ভিতরে যিনি বসেছিলেন তাঁর মনে হচ্ছিল, তারা কখন দল বেঁধে ঢুকে পড়ে।

ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। হঠাৎ ভিড় ঠেলে একজন লোক এগিয়ে এল। বলরাম চিনল—স্থানীয় মোটর ট্রেনিং স্কুলের টীচার। আমার গাড়িটাও তিনি চিনতেন। বলরামকে দু-একটা প্রশ্ন করে জামা খুলে নিজেই ঢুকে গেলেন গাড়ির তলায় এবং অনেক চেষ্টার পর এঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। আমার স্ত্রী তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'আপনি এখন, বাড়ি ফিরবেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে উঠে আসুন। আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব।'

'না, না; আপনাকে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে। আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

'সে হয় না। আপনি আজ যে উপকার করলেন—'

'ও কিছু না। এ সবই তো আমাদের কাজ।'

আমার স্ত্রী কিছুতেই ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলেন। কথায় কথায় বললেন, 'আপনার গাড়ির অবস্থা ভাল নয়। বড় রকম মেরামত দরকার।'

'আমি কালই ওঁকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলব।'

লম্বা ফিরিস্তি দিলেন মোটর-স্কুলের মাস্টারমশাই। এঞ্জিন ডাউন করতে হবে। ভালভ গ্রাইন্ডিং, প্লাগ পাল্টানো, ডিস্ট্রিবিউটার ঠিক করা, আরো কি সব বড় বড় ব্যাপার। দুটো চাকার অবস্থাও ভাল নয়। অর্থাৎ মোটা অঙ্কের ধাক্কা, যা আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। সুতরাং একে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করলাম। বলরামের ভীষণ আপত্তি। সে বোঝাতে চাইল মাস্টারদের সব বই-পড়া বিদ্যা, হাতেকলমে কাজ করলে তবে তো বুঝবে কোথায় কী গলদ। তার চেনা খুব পাকা মেকানিক আছে কলকাতায়। খবর দিলেই

এসে সব ঠিক করে দেবে।

কিন্তু আমি এবং গৃহিণী মনঃস্থির করে ফেলেছি। মফঃস্বল শহরে ক্রেতা জোটানো মুশকিল। আমার এক আত্মীয়ের গ্যারাজ ছিল কলকাতায়। পুরনো গাড়িকে নতুন সাজে সাজিয়ে বিক্রী করাই প্রধান ব্যবসা। তিনিই আমাকে ভারমুক্ত করলেন। যেহেতু তিনি আত্মীয়, আমার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নীরব থাকাই সমীচীন।

বলরাম গুম হয়ে রইল। আমি তাকে এক মাসের মাইনে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলাম, নিল না। স্থির করল, বাড়ি চলে যাবে। দেশের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। কিছু ধানজমি আছে। দুই ছেলে। তারাই চাষ-আবাদ করে। ও প্রায় গোটা মাইনেটাই পাঠিয়ে দেয়। ছেলেরা সুযোগমত নতুন জমি কেনে।

বলরামের বাড়ি যাবার বিশেষ চাড় ছিল না। চাকরির খোঁজ করছিল। আমিও চেষ্টায় ছিলাম। হঠাৎ জুটে গেল। কিন্তু যখন শুনল একটি বিশেষ দেশী কোম্পানীর নতুন গাড়ি, মুচকি হেসে বললে, 'মরিস, অস্টিন, বুইক চালিয়ে হাত পাকিয়েছি, দিশীটিশী চলবে না স্যর।'

বলরামের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন রাস্তায় একটি লোক সেলাম করল, 'ভালো আছেন, হুজুর?' চিনতে পারলাম। বলরামের চেনা সেই মিস্ত্রীটি, মাঝে মাঝে আমার গাড়ি সারাতে আসত। তার কোন খবর জানে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলল, কিছুদিন দেশেই ছিল। তারপর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কোথায় চলে গেছে।'

ঝগড়ার কারণও শুনলাম। ছেলেরা বলেছিল কিছুটা চাষবাসের কাজ করতে। শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালই। বয়সও এমন কিছু নয়। কিন্তু বলরাম ক্ষেপে গেল, 'বলিস কী! যে-হাত দিয়ে অ্যাদ্দিন মোটর চালিয়ে এলাম সেই হাতে লাঙলের মুঠি ধরব!'

'বেশ তো, লাঙ্গল না ধর খুরপি-টুরপি ধরতে দোষ কী?'

'না, স্টীয়ারিং ছাড়া আমি আর কিছু ধরব না।'

এর কিছুদিন পরে অফিসের কাজে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। ট্যাক্সিতে যাচ্ছি। সামনের গাড়িটা মনে হল চেনা। আর একটু এগোতেই চমক লাগল— এই তো আমার সেই মরিস। নতুন রং করা হয়েছে তবে সেই মেরুন।

কয়েক পা গিয়েই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। তখনো জানি না আরো একটা বড় চমক আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ড্রাইভারের সীটে বসে বলরাম।

আমি ট্যাক্সিটাকে পাশে দাঁড় করালাম। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছিল। পিছনের সীটে একটি ভদ্রলোক ছিলেন। ঐখানে নামলেন। বলরাম খুশী মুখে নেমে এসে আমাকে প্রণাম করে বলল, 'ভাল আছেন, স্যার? মা, খোকাবাবু?'

'সবাই ভাল আছে। তোমার খবর কী?'

'ঐ তো দেখছেন। গ্যারেজের ঠিকানাটা নিয়ে পৌঁছেছিলাম। সেখান

থেকেই খবর পাই কে কিনেছেন গাড়িটা। যেতেই চাকরি হয়ে গেল। ওখানেই থাকি খাই। ওঁরাও খুব ভালবাসেন আমাকে।'

বলতে বলতে ওর নতুন মালিক ফিরে এলেন। বলরামই আমার পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই সাহেবের গাড়ি। আমিই চালাতাম।'

'তাই নাকি! ভারী আশ্চর্য তো! তা আপনার ড্রাইভারটি বেশ। গাড়ির খুব যত্ন নেয়।'

বাকিটা ইংরেজিতে বললেন, 'মাইনেও খুব কম। যা বললাম তাতেই রাজী হয়ে গেল।'

ফালতু

'হরিভূষণদা চলে গেলেন!'

শিপ্রা চমকে উঠল—'কবে!'

রহমান সাহেব বললেন, 'এই তো ভোর পাঁচটায়। আমি সেখান থেকেই আসছি।'

অফিসের এই ঘরটাতেই একটু দূরে বসতেন হরিভূষণ দত্ত। শূন্য চেয়ারখানার দিকে চেয়ে শিপ্রার মনটা উদাস হয়ে উঠল।

এই কদিন আগেও একটা মস্ত বড় ডিবা থেকে পান বিলিয়েছেন সবাইকে। শিপ্রাকেও দিতেন মাঝে মাঝে। সে আপত্তি করেছে, 'আমি তো পান খাই না।' জোর করে হাতে গুঁজে দিতেন, 'খাও খাও। তোমার ঐ মুক্তোর মত দাঁত। দু-একদিন খেলে ছোপ লাগবে না।'

কখনো বলতেন, 'আরে পান তো তোমাদেরই জন্যে। লিপস্টিকের জন্ম আর কদিন? তার বহু আগে থেকে মেয়েদের ঠোঁট রাঙাত এই তাম্বুল রাগ।'

রহমান সাহেব বললেন, 'অফিস ছুটি দিয়েছেন এন. ডি.। তবে চলে যাবেন যাবেন না যেন। একটা শোকসভা গোছের আয়োজন করা হচ্ছে।'

ঘণ্টা দুয়েক বাদে হাউসিং এস্টেটের দোতলায় উঠে সামনের দিকে নজর পড়তেই শিপ্রার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। তাদের ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে মেয়ে-পুরুষের ছোটখাটো একটা ভিড়। কাছে এসে দেখল একটার পর একটা চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার চেষ্টা চলছে। সবাই ওদের কাছাকাছি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে তার সাত মাসের মেয়ে টিঙ্কুর একটানা কান্না। তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর থেকে চাবি বের করল শিপ্রা। দুটো চাবির একটা থাকে তার কাছে, আরেকটা নিয়ে বেরোয় তার স্বামী নিশীথ।

কাছে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল—এ যে অন্য তালা!

তার মানে ভবানী তালা বন্ধ করে বেরিয়েছে। ওদিকে কেঁদে ককিয়ে যাচ্ছে মেয়ে।

শিবুর মা বললেন, মেয়ের কান্না শুনে প্রথমটা কিছু মনে করেননি। হয়তো খিদে পেয়েছে। আয়া দুধ গরম করছে, বোতলটা মুখে ধরলেই থেমে যাবে।

থামছে না দেখে বেরিয়ে এসে দেখেন তালা বন্ধ। তখন বুঝলেন আয়া নেই। এপাশে ওপাশে খবর দিলেন। যার কাছে যে চাবি আছে তাই দিয়ে খুলবার চেষ্টা করছে সবাই।

শিপ্রা সেখানেই বসে পড়ল। এ রকম করে কাঁদলে আর কতক্ষণ বাঁচবে মেয়েটা।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, 'একটা ঝিয়ের ওপর কাঁচ মেয়ে ছেড়ে দিয়ে এই যে তোমরা বেরিয়ে যাও এ কি ঠিক কর মা?'

শিপ্রার দু'চোখ ভরা জল। বলল, 'ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছি মাসিমা, আমরা না থাকলে কখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোবি না। তার জন্যে মাস মাস বেশী টাকা দিই।'

কে একজন বলল, 'ও তো প্রায়ই বেরিয়ে যায় দুপুর বেলা।'

শিবুর মা শিপ্রার কাছেই জানতে চাইলেন, 'কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

'আমি কেমন করে জানবো?'

একটি ছোট মেয়ে বলল, 'চার নম্বর ব্লকের তেতলায় একটা বন্ধু আছে ওর। সেখানে গিয়ে আড্ডা মারে মাঝে মাঝে।'

'চল তো, একবার দেখে আসি,' বলে একটি ছেলে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওদিকের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, 'না না, শুধু একটা মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে আড্ডার ব্যাপার হলে এত দেরি করত না। তার চেয়ে গভীর কোনো আকর্ষণ মনে হচ্ছে। হাতুড়ি-টাতুড়ি নেই কারো ঘরে? তালাটা ভেঙে ফেল।'

সেই মুহূর্তে সামনের রাস্তায় একটা ঝনঝন আওয়াজ কানে এল! মস্ত বড় একটা রিং-এ একরাশ চাবি ঝুলিয়ে বাজাতে বাজাতে চলেছে তালা-মেরামত-ওয়ালা।

কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। মিনিট দশেক চেষ্টার পর খুলে গেল তালা।

ছুটে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিল শিপ্রা। তখন আর তার কাঁদবার মত শক্তি নেই। থেকে থেকে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে।

অন্যদিনের চেয়ে নিশীথও সেদিন বেশ কিছুটা আগে আগে ফিরল। একটু অবাক হল শিপ্রাকে দেখে।

'আজ যে এত সকাল সকাল?'

শিপ্রা জবাব দিল না। টিঙ্কুকে জামা-কাপড় পরাচ্ছিল। পাউডার-টাউডার লাগিয়ে প্রামে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি ওকে একটু দেখো। আমি চায়ের ওদিকে যাচ্ছি।'

'ভবানী কোথায়?'

'নেই।'

'নেই মানে ?'

'ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

'ছাড়িয়ে দিয়েছ ! কখন ? কেন ?'

'জামাকাপড় ছাড়, চা-টা খাও, পরে বলছি।'

তালা খোলার আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরেছিল ভবানী। সঙ্গে সঙ্গে একটা কৈফিয়ত শুরু করেছিল, 'দেশ থেকে আমার দিদি এসেছিল। টিঙ্কুকে ঘুম পাড়িয়ে—'

শিপ্রা তার আগেই তার সাজগোজের বিশেষ বহরটা দেখে নিয়েছিল। মাঝ-পথেই থামিয়ে দিল, 'থাক, আমি তো কিছু শুনতে চাইছি না। আজ পর্যন্ত তোমার যা পাওনা হিসেব করে ঐ রেখে দিয়েছি। তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে এখনি চলে যাও।'

গলার স্বর এত শান্ত এবং বলার ভঙ্গি এত স্বাভাবিক যে ভবানীর বুঝতে কোন অসুবিধা হল না এটা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত এবং এর পরে আর কোনো কথা চলবে না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টাকাটা ও জামা-কাপড় যা ছিল নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

চায়ের টেবিলে বসে স্ত্রীর মুখ থেকে আগাগোড়া সব ঘটনাটা নিঃশব্দে শুনে গেল নিশীথ। তার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'অতঃপর ?'

'অতঃপর আর একটি মাত্র পথই খোলা আছে।'

নিশীথ চোখ তুলল। শিপ্রা নিতান্ত সহজ সুরে যোগ করল, 'আমার চাকরি ছেড়ে চলে আসা।'

'অ্যাঁ!' রীতিমত আঁৎকে উঠল নিশীথ, 'মাথা খারাপ নাকি ? মাস মাস অতগুলো টাকা ! সংসার চলবে কী করে ?'

'সেটা তুমি জান। সে দায়িত্ব তোমার।'

'মানলাম। কিন্তু দায়িত্বটাই তো সব নয়। সামর্থ্য ? এক কাজ কর। তুমি বরং ক'দিনের ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও। আমি দেখি চেনাশোনা সোর্স থেকে একটা ভাল বিশ্বাসী—'

'না, আর কোনো ভবানীর ওপর মেয়ের ভার দেবো না।'

'আহা, সবাই কি এক নাকি ?'

'সব এক। যাক, তুমি এখন বেরোচ্ছ না তো। আমি টিঙ্কুকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

অর্থাৎ যে কথা সেই কাজ। নিজেকে তখন থেকেই আয়ার কাজে বহাল করল শিপ্রা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর নিশীথই আবার কথাটা তুলল, 'তোমার পয়েণ্টটা আমি বুঝতে পারছি শিপ্রা। কোনো লোকের হাতে অতটুকু বাচ্চা ফেলে রেখে আমাদের দুজনের অতখানি সময় বাইরে থাকা চলবে না। তাহলে আমি থাকি। তুমি যেমন বেরোচ্ছিলে বেরোও।'

'মানে ?'

'মানে অতি সহজ। আমার মাইনে তোমার চেয়ে অনেক কম। তা দিয়ে পনর দিনও চলবে না। বরং তোমার আয়ে কণ্টেস্ৃণ্টে কোনো রকমে ডালভাতের সংস্থান হতে পারে।'

'টিঙ্কুকে তুমি সামলাবে ?'

'পারবো না বলছ ? খুব পারবো। দিন কয়েক তালিম দিয়ে দিও। ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।'

'সিরিয়াসলি বলছ ?'

'তবে কি তুমি মনে করছ ঠাট্টা করছি !'

'সে হয় না।' বেশ দৃঢ়ভাবে বলল শিপ্রা, 'তুমি পুরুষ মানুষ, ঘরে বসে বাচ্চা মানুষ করবে, আর আমি চাকরি করতে বেরোব, এ কখনো সম্ভব ? লোকে কি বলবে ?'

'দ্যাখ লোকে অনেক কিছু বলে, যা শুনতে গেলে সংসারে থাকা চলে না।'

সাত দিনের ছুটি ছিল শিপ্রার। তার মধ্যে আরো দুদিন এই নিয়ে তর্ক চলল। নানা ভাবে নানা যুক্তি দিয়ে স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করল নিশীথ, এছাড়া অন্য পথ নেই।

শিপ্রা যে বুঝল না তা নয়। তার বক্তব্য হল, 'এটা ঠিক যুক্তির প্রশ্ন নয়। আসলে তোমার আমার দুজনেরই সংস্কারে বাধবে।'

'কী সংস্কাব ? পুরুষের কাজ বাইরে, আর মেয়েরা ঘর সংসার নিয়ে থাকবে ? তুমি দেখছি সেকেলে ঠানদিদেরও হার মানালে।'

অফিসের কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে হায়ার পারচেজ নিয়মে একটা ফ্রিজ কিনল শিপ্রা। ঠিকা ঝিয়ের সাহায্যে দুবেলার রান্না সেরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে মেয়ে ও তার বাবার জন্যে সব কিছু গুছিয়ে রেখে নটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে।

বেরোবার সময় রোজ একবার করে বলে যায় কখন কি করতে হবে। নিশীথ হাসে, 'আমাকে কি ভাব বল দিকিন ? একেবারে আনাড়ি ?'

'না, তুমি খুব পাকা গিন্নী। এই, তোমার সিগারেট আনতে হবে তো ?'

'না। কালই তো আনলে।'

'দরকার হলে বলো কিন্তু।'

এই 'বলাটা' নিশীথের পক্ষে এখনো ঠিক সড়গড় হয়ে ওঠেনি। নিজস্ব খরচ বলতে ঐ একটাই। তার জন্যে স্ত্রীর কাছে হাত পাতা ! তাই মাঝে মাঝে প্যাকেট খালি হয়ে গেলেও জানতে দেয় না। অনেক দিনের অভ্যাস। গা-টা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করে। তবু চুপ করে থাকে। শিপ্রার যখন মনে পড়ে নিজেই নিয়ে আসে।

ঠিকা ঝি একলা আসে। সে চলে যাওয়ার পর মেয়ের যা কিছু কাজ—স্নান করানো, খাওয়ানো জামা-জাঙ্গিয়া-কাঁথা বদলানো, সব নিজেই করে। চারটে বাজলে আর এক প্রস্থ সাজগোজ। তারপর ট্রামে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

প্রথম প্রথম সব কিছুর মধ্যে একটা নূতনত্বের স্বাদ ছিল। বেশ উৎসাহ নিয়ে করত। ক্রমে সব কিছুই একঘেয়ে এবং পরে বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

মাঝে মাঝে টিঙ্কু যখন কাঁদতে শুরু করে এবং কিছুতেই থামতে চায় না, তখনই বড় অসহ্য লাগে। তাছাড়া এত কাজ সত্ত্বেও নিজেকে বেকার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তাব একটা গ্লানি আছে। নিশীথ অনুভব করছিল, তাতেই যেন দিন দিন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে মনটা।

শিপ্রা ফিরে এলে তার ছুটি। একবার একটু ঘুরতে বেরোয়। বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় বড় একটা যায় না। কোনো পার্কে গিয়ে বসে। কিংবা রাস্তায় খানিকটা উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাফেরা। সব কিছু থেকেই নিজেকে যেন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

একদিন বেরোতে গিয়ে পাশের একটা ফ্ল্যাটের পরদা-ঢাকা জানলার ওধারে নিজের নামটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল নিশীথ। শিবুর মার গলা, 'বৌটাকে ধরেছিলাম ; নিশীথকে তো আজকাল বেরোতে দেখি না বৌমা ! বললে, ছুটিতে আছেন। এ কি রকম ছুটি রে বাবা ? এর কি আর শেষ নেই ? আসলে চাকরি নেই। তাই আর কী করবে ? ঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলছে, ছেলে মানুষ করছে। আর বৌ রোজগার করে খাওয়াচ্ছে। মুখে আগুন অমন ব্যাটাছেলের।'

আরেকদিন যখন মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, পাড়ার এক ফচকে ছোকরা বলে উঠল, 'তা বেশ চাকরি পেয়েছেন দাদা। আমাদের এই রকম একটা জুটিয়ে দিন না।'

নিশীথের চাকরি ছিল একটা খবরের কাগজের অফিসে, বিজ্ঞাপন বিভাগে। মালিক ওকে ছাড়াতে চাননি। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে কিছুদিনের ছুটি নিয়েছিল। তারপর আর ওমুখো হয়নি।

এবার একটা রবিবার দেখে তাঁর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করল এবং চাকরি ছাড়ার আসল ব্যাপারটা খুলে বলল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তাহলে তো আচ্ছা ফাঁদে আটকে গেছেন দেখছি। কিন্তু এ তো আর বরাবর চলতে পারে না। মিসেসকে বুঝিয়ে বলুন এবং দেখে-শুনে আরেকটি লোক রাখুন। আজকাল বেশির ভাগ বাড়িতেই তো বাচ্চারা ঝিয়ের হাতে মানুষ হচ্ছে।'

নিশীথ বলল, 'বুঝিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবে আপনি একটা সুরাহা করে দিতে পারেন।'

'কি ভাবে বলুন ?'

'নাইট শিফটে একটা কাজ দিন।'

'কী কাজ ?'

'প্রুফ রিডিং। এক সময়ে করতাম। অভ্যাসটা কিছুদিন ঝালিয়ে নিলেই চালিয়ে দিতে পারবো।'

সঙ্গে সঙ্গে হল না। কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর ঐ অফিসেই প্রুফ দেখার কাজে বহাল হল নিশীথ। রাত দশটা থেকে দুটো। অন্যান্য বিভাগেও নাইট

ডিউটি আছে। কোম্পানির গাড়ি সবাইকে বাড়ি পেঁছে দেয়।

শিপ্রার শুরু থেকেই আপত্তি ছিল—'রোজ রোজ রাত জাগলে শরীর টিকবে কেন ?'

'রোজ তো নয়, সপ্তাহে চারদিন।'

'তাই বা কম কি ?'

'আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু এ তরফে অসুবিধা যথেষ্ট। রাত তিনটেয় উঠে দরজা খুলতে হয়। কোনো কোনো দিন ঘুম ভাঙে না। নিশীথকে দু'তিনবার বেল টিপতে হয়। আওয়াজটা ভীষণ কানে লাগে।

মাঝে মাঝে টিঙ্কু জেগে ওঠে। তারপর আর ঘুমোতে চায় না। কচি ছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে যা হয়। একদিন বাড়ি ঢুকেই শুনতে হল, 'আর পারিনে বাপু। সারাদিনে এক মিনিট বিশ্রাম নেই। তার ওপরে রাতদুপুরে—'

কথাটা, বিশেষ করে তার বিরক্তি-মাখানো সুরটা নিশীথের ভাল লাগল না। মুখে কিছু বলল না, কিন্তু মনটা খিচড়ে রইল। খাটুনি, বিশ্রামের অভাব এসব যেন শুধু ওর একার। সবাই নিজের দিকটা দেখে।

দিন কয়েক পরে সন্ধ্যাবেলা আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে তিন-চারটি ভদ্রলোক এবং একজন মহিলা গম্ভীর মুখে ঢুকলেন ওদের বসবার ঘরে। একজনের হাই ব্লাডপ্রেসার। রোজ শোবার আগে ঘুমের বড়ি খেতে হয়। একটু রুক্ষভাবেই বললেন, 'আপনার জন্যে তো দেখছি পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে মশাই। রাত-দুপুরে কানের কাছে ইলেকট্রিক 'বাজার' (**buzzer**) বাজতে থাকলে ঘুমোয় কার সাধ্যি ?'

আরেকজন হার্টের রুগী। ডাক্তার বলেছেন, টেক্ কমপ্লীট রেস্ট। কিন্তু ঘরের পাশে এরকম ডিস্টার্ব্যানস চলতে থাকলে—

মহিলাটির গেঁটে বাত। যন্ত্রণায় ঘুম আসে না। আড়াইটে তিনটের সময় একটু তন্দ্রামত এসেছে কি—ঐ বিকট আওয়াজ।

বাকী কজনের অভিযোগ শুনবার আগেই নিশীথ বলল, 'আচ্ছা আজ থেকে আর বেল বাজবে না।'

সেদিন থেকে অফিসেই একটা সোফার উপর বাকী রাতটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'ওখানেই শোবার বন্দোবস্ত আছে।'

'একটা বিছানা তো চাই। আমি গুছিয়ে রেখে দেবো। যাবার সময় নিয়ে যেও।'

'দরকার নেই।' গম্ভীর ভাবে বলল নিশীথ।

'তাহলে শোবে কিসে ?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই স্ত্রীর সামনে থেকে সরে গেল।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বৌমা।'

শিপ্রা অফিস থেকে ফিরছিল। শিবুর মা তাকে রাস্তার একধারে নিয়ে

আরেকটু গলা খাটো করে যোগ করলেন, 'কিছু মনে করো না। তোমাকে নিজের মেয়ের মত দেখি বলেই বলছি। নিশীথ যে সারারাত বাড়ি ফেরে না, এ নিয়ে অনেক কথা উঠছে পাড়ায়।'

'ওর তো নাইট ডিউটি। বাকী রাতটা অফিসে শোবার ব্যবস্থা আছে।'

'তাই বুঝি তোমাকে বুঝিয়েছে ? তুমি বড্ড সরল বৌমা। একালের মেয়ের মত নও। আমাদের খবর কিন্তু অন্য রকম।'

শিপ্রা মনে মনে বিরক্ত হল। কিন্তু কিছু বলল না। তিনি এবার ফিস ফিস করে বললেন, 'সকালে যখন ফেরে কি রকম টলতে টলতে আসে লক্ষ্য করনি ?'

'না, না। টলতে টলতে আসবে কেন ?'

'তুমি খেয়াল করনি। ছেলেটা খারাপ রাস্তা ধরেছে। তুমি একটু শক্ত হও বৌমা। পুরুষমানুষকে অতটা বিশ্বাস করতে নেই। তার ওপরে কাঁচা বয়স।'

বলে কোন একটা দরকারী কাজের নাম করে চলে গেলেন।

শিপ্রা কথাটাকে মন থেকে উড়িয়ে দিতে চাইল, কিন্তু কোথায় যেন একটু রেশ রয়ে গেল।

পরদিন মনে হল নিশীথের পা দুটো সত্যিই যেন ঠিকমত পড়ছে না। মুখ শুকনো, চোখের কোণে কালি। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে। চুলগুলো উসকো-খুসকো।

নিজেকে বোঝাল, বড্ড ধকল যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে। রাত জেগে কাজ, তার উপরে ভাল করে ঘুমোতে পায় না। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই কি—?

পাড়ার তিন-চারটি ছোকরা 'বৌদি' 'বৌদি' করে ভাব জমাতে আসত মাঝে মাঝে। শিপ্রা বিশেষ আমল দেয়নি বলে অনেক দিন তাদের দেখা যায়নি। এবার একদিন এল। রাত নটা। নিশীথ সবে বেরিয়েছে।. বেল্ শুনে শিপ্রা গিয়ে দরজা খুলেই বলল, 'উনি তো বাড়ি নেই।'

'জানি। আপনার কাছেই আমাদের দরকার,' বলল একজন।

শিপ্রা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই বলল, 'কী, বলুন।'

'দেখুন আমরা পাড়ার ছেলে। পাড়ার সবার ভালমন্দ দেখা আমাদের কর্তব্য। তাই বলছিলাম, নিশীথদার হালের চালচলন তেমন সুবিধের নয়।'

'আপনাদের আর কিছু বলবার আছে ?'

'আপনি রাগ করলেন মনে হচ্ছে। কিন্তু—'

বাকীটা না শুনেই দরজা বন্ধ করে দিল শিপ্রা। কিন্তু মনের মধ্যে যে আর একরাশ ক্ষোভ, বিরক্তি, দুশ্চিন্তা—যার কোনটারই কোন স্পষ্ট ভিত্তি নেই—হুড় হুড় করে ঢুকল, তার দরজা বন্ধ করতে পারল না।

পরদিন সকালে চায়ের পাট মেটার সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রার প্রথম কথা হল, 'তোমাকে এ চাকরি ছাড়তে হবে।'

'কেন ?'

'কেন বোঝাতে হলে অনেক সময় দরকার যা আমার হাতে নেই। আর যদি তুমি না ছাড় আমি আজই রিজাইন দিচ্ছি। তারপর যা হবার হবে।'

'তার মানে কতকগুলো বদমাশ লোক আমার বিরুদ্ধে কি সব লাগাচ্ছে আর তুমি তাদের কথায় নাচ্ছ। তেমনি তোমার সম্বন্ধেও—'

'আমার সম্বন্ধে!' চোখ বড় বড় করে তাকাল শিপ্রা।

নিশীথ জবাব দিল না।

শিপ্রা চায়ের কাপপ্লেটগুলো গুছিয়ে তুলছিল। বন্ধ রেখে সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'কী শুনেছ তুমি আমার সম্বন্ধে বল।'

নিশীথ কি একটা বলতে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে কে বেল টিপল।

'আঃ', বলে উঠে গিয়ে দরজা খুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

একটি প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'হাঁ করে তাকিয়ে আছিস যে? চিনতে পাচ্ছিস না?'

'মাসিমা।' বলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নিশীথ এবং ছুটে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনিও ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'থাক, থাক। তুই অত রোগা হয়ে গেছিস কেন?'

শিপ্রাও হাসিমুখে এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিতে তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাকেও তো ভাল দেখাচ্ছে না বৌমা। আমার দিদিভাই কেমন আছে?'

'ভাল।'

'তুমি একা নাকি?' জিজ্ঞাসা করল নিশীথ।

'কী করবো? তোরা তো আর খোঁজখবর নিবি নে, তাই আমিই এলাম।'

তারপর থেমে বললেন, 'কাল 'গেরণ' আছে না? একটা মস্ত বড় দল জুটে গেল। বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। ভাবলাম গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে যাই।'

'খুব ভালো করেছ।'

'তোদের সব খবর কী? দুজনেই তো চাকরি করিস শুনেছি। বাচ্চাটাকে দেখে কে?'

'বসো, জিরোও। তারপর বলছি সব।'

দুদিন ওরা কেউ অফিসে গেল না। গঙ্গাস্নান ইত্যাদি মিটে যাবার পর সন্ধ্যার পর তিনজন একত্র হল। নিশীথই তুলল ওদের সমস্যার কথা।

অল্প বয়সে মা মারা যাবার পর এই মাসির কাছেই সে মানুষ। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। উনি থাকেন বর্ধমানে। নিজের বাড়ি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরা চাকরি-বাকরি ছেলেপিলে নিয়ে বাইরে। একটি অনেকদিনের ঝি নিয়ে উনি একাই থাকেন।

সব মন দিয়ে শুনে বললেন, 'আমাদের কালে সব সংসারেই দু'টি একটি ফালতু মেয়েমানুষ থাকত। পিসী, খুড়ি, বিধবা বড় বোন বা ঐ রকমের কোনো ঝাড়া-হাত-পা নিজের লোক। তারাই ছেলেপিলে মানুষ করত। মায়ের গায়ে বাতাসটুকুও লাগত না। আমার তিনটেকে টেনে তুলেছেন আমার বিধবা জা। এখন দিন বদলে গেছে। এক দ্যাবা আর এক দেবী নিয়ে সংসার। একটা বাচ্চা

হলেই মুশকিল। আয়া-আয়া ছাড়া গতি নেই। তারা মাইনে নেয়, কজে করে। প্রাণের টান বলে যে একটা জিনিস তা আসবে কোত্থেকে ?'

একটুখানি থেমে শিপ্রার দিকে ফিরে বললেন, 'এক কাজ কর। দিদিভাইকে আমার কাছে রেখে দাও। তোমরা ছুটিছাটা হলেই যাবে ! বেশী দূর তো নয়।'

শিপ্রার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরকম একটা প্রস্তাব তার স্বপ্নেরও বাইরে। নিশীথ বলে উঠল, 'তুমি সত্যিই নেবে মাসিমা ?'

'কেন নেবো না ? তোর মেয়ে কি আমার পর ?'

শিপ্রা বলল, 'কিন্তু আপনার যে বড় কষ্ট হবে মাসিমা। এই বয়সে একটা কচি বাচ্চার ঝামেলা—'

'বয়স হয়েছে বটে। তা আমরা তো তোমাদের মত দালদা যুগের মানুষ নই বৌমা। খাঁটি দুধ ঘি খাওয়া শরীর। এখনো কিছু শক্তি রাখি। মুশকিল হত, ও যদি মায়ের দুধ খেত। তা সে সব পাঠ তো তোমরা, নার্সিং হোম না ফার্সিং হোম কি বলে, সেখান থেকেই চুকিয়ে ফেল। এখানেও বোতল টানে, ওখানেও তাই টানবে। বাকী সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার অসীমের ছোট ছেলেটাকে তো এই সেদিন পাঁচ বছরের করে তারপর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এ আমার অভ্যেস আছে।'

আমার শেষ ফাঁসি

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। তার জন্যে আমরা দুঃখ করে থাকি। আহা বেচারা ! আসলে তার যা কাজ তাই সে করে। স্বর্গেও নিস্তার নেই, এইটুকু বলা যেতে পাবে।

লেখক নামক যে জীব তার অবস্থা ঢেঁকির চেয়েও করুণ। তার কাজ লেখা, এ কথা অবশ্যই মানতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে তাকে বেশী করতে হয় বক্তৃতা। তার না আছে বিষয়ের শেষ, না আছে স্থানকালের বিচার। কিন্তু সেজন্যে কাউকে এতটুকু সহানুভূতি প্রকাশ করতেও শোনা যায় না।

শিমুলতলায় গিয়েছিলাম স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। ছোট জায়গা। স্থায়ী বাসিন্দা আর কত, বেশির ভাগই চেঞ্জার। দু-চারদিন ঘুরবে ফিরবে তারপর চলে যাবে। সভা-সমিতির সম্ভাবনা নেই। সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসন 'অলঙ্কৃত করবার' ডাক পড়বে না। পথেঘাটে দু-একটি চেনা মুখ যদি দেখা যায় বড় জোর শুনতে হবে, কবে এলেন ? কেমন আছেন ?

নির্বিবাদে ছিলাম। হঠাৎ একদিন তিন-চারটি যুবকের আবির্ভাব।

দক্ষিণ পাড়ার সঙ্গে উত্তর পাড়ার ফুটবল ম্যাচ। বিজয়ী দলকে মেডেল দিতে রাজী হয়েছেন কে একজন স্পোর্টস্ সম্বন্ধে উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। সেই উপলক্ষে একটি 'ফাংশন' হবে। আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। এই হল তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সারাজীবনে একবারও ফুটবল মাঠে যাবার সৌভাগ্য

আমার হয়নি। খেলতে তো নয়ই, খেলা দেখতেও না। এ বিষয়ে আমি নিতান্তই অজ্ঞ এবং অযোগ্য। ঐ মেডেলদাতা ভদ্রলোকই সভাপতি হবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

ওরা বলল, তিনিই আপনার নাম করেছেন। আপনার অনেক বই পড়েছেন কিনা। বলেছেন, তোমরা গিয়ে ধর। যদি আপত্তি করেন আমি যাবো।

অতএব যেতে হল।

এর পরে আমার সামান্য ডেরা সকাল-সধ্যায় ভক্তমুখর হয়ে উঠল। তাদের নানা ধরনের প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কোথাও ক্ষীণ, কোথাও শূন্য। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, এবং তাদের বয়স অল্প। সুতরাং কৌতূহলের সীমাসংখ্যা নেই।

এমনি একজন একদিন বলে বসল, 'আচ্ছা, আপনি তো অনেক ফাঁসি দেখেছেন।'

ফাঁসি যেখানে দেওয়া হয় আমি যে একদিন সেই উঁচু পাঁচিল ঘেরা রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম, সে খবর তার জানা ছিল। বললাম, 'ফাঁসি দেখেছি মানে? দিয়েছি!'

সে এবং তার সঙ্গীরা আঁতকে উঠল, 'বলেন কি!'

'দিয়েছি মানে, দড়িটা গলায় পরিয়ে ঝুলিয়ে দিইনি। তার জন্য অন্য লোক ছিল। তাকে বলে হ্যাঙ্ম্যান। তবে শেষ ইঙ্গিতটা আমাকে দিতে হয়েছে।'

একটি ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, 'অর্থাৎ সোজাসুজি খুন না হলেও এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং-এর চার্জে আপনি পড়তে পারেন।'

'একজন তো ডাইরেক্ট খুনের চার্জই এনেছিল আমার নামে—'

'কী রকম?' সকলেই উৎসুক হলেন।

'ফাঁসির আসামীকে যখন গ্যালোজ অর্থাৎ ফাঁসিমঞ্চের ওপরে এনে দাঁড় করানো হয়, তখন আমার কর্তব্য হল ওয়ারেন্টটা তাকে পড়ে শোনানো। কোন্ অপরাধে বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। যখন পড়ছি সে বলে উঠল, রেখে দিন ওসব ভণিতা। খুন আমি করিনি, করছেন আপনি। You are the murderer. You are killing an innocent man! ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন।'

সবাই ছেঁকে ধরলেন, এই ধরণের চাঞ্চল্যকর ফাঁসির ঘটনা আরও নিশ্চয়ই ঘটেছে। সে-সব তাদের শোনাতে হবে। আমি বললাম, 'বেশির ভাগই সাধারণ ধরনের ব্যাপার। সব আমার মনেও নেই।'

সেই মেয়েটি রফা করল, 'আচ্ছা, রিটায়ার করার আগে শেষ ফাঁসি যেটা দিয়েছেন, নিশ্চয়ই মনে আছে, তার কথা বলুন।'

আমি জানলার বাইরে চোখ ফেললাম। মনটা বেশ কয়েক বছর পিছনে চলে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছেলেটাকে। প্রথম যেদিন মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এলো, আর শেষ যেদিন তার দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল ফাঁসিমঞ্চের নীচেকার গহ্বরে,

স্পষ্টই চোখের ওপর ভেসে উঠল। না, যাকে চাঞ্চল্যকর বলে তেমন কিছু সে করেনি। তবু তাকে ভুলতে পারিনি।

বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে। নামটা মনে পড়ছে না। ধরা যাক যদুলাল। একটা কোন্ কারখানায় কাজ করত। মজুর বলতে যা বোঝায় তার উপরের স্তরে। Skilled Labour বা দক্ষ শ্রমিক বলা যেতে পারে। কিছু লেখাপড়াও জানত। বাপমায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা অন্ধ, মা প্রথমটা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করত। ছেলের চাকরি হবার পর সে-সব ছেড়ে দিয়েছিল।

বস্তি থেকে ওরা উঠে গিয়ে গলির মধ্যে ঘরভাড়া করে থাকত। পাড়ার লোকেরা ভাল চোখেই দেখত। অনেকের অনেক ফাইফরমাশ হাসিমুখে খাটত যদুলাল। সন্ধ্যার পর বাড়ি থাকত না। যখন ফিরত কোন বেচালপনা কারো চোখে পড়েনি।

পাড়া থেকে দূরে ওদের তিন-চারজনের একটা দল ছিল। মদ খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে হল্লা করত সন্ধ্যার পর। ছোরা দেখিয়ে ছিনতাই করত মাঝে মাঝে। বড় রকমের ডাকাতি বা লুটপাট এসব কিছু নয়। ছিনতাইটা বোধ হয় মদের পয়সা যোগাড়ের জন্যে।

একদিন যখন একটা কোনো গলির মধ্যে হৈহল্লা করছিল, পুলিস তাড়া করে একজনকে ধরে ফেলে। যদুলাল বোধ হয় গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাকে ধরতে পারেনি। যাকে ধরেছিল এবং ঘাড় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সে ওর বন্ধু। একজন সার্জেন্ট ছিলেন পুলিস-পার্টিতে। আসামীকে বোধ হয় দু-একটা ঘা গুঁতো দিয়ে থাকবেন। যদুলাল লুকিয়ে খানিকটা গা-ঢাকা দিয়ে ওদের পেছনে পেছনে চলেছিল। ছোট গলি। লোকজন বিশেষ ছিল না। সেই সুযোগে কোমর থেকে ছোরা বের করে মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিয়েছিল সার্জেন্টের ঘাড়ে। হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মৃত্যু। যদুলাল ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছিল।

খুন-মামলার আসামী। গোড়া থেকেই হাজতে। পাড়ার লোকেরা ওর মাকে পরামর্শ দিয়েছিল, ভাল উকিল দাও। কিন্তু তার অনেক খরচ। সে সব কোত্থেকে আসে? এসব ক্ষেত্রে অর্থাৎ মার্ডার কেসের আসামী যদি অপারগ হয় সরকার তার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করে থাকেন। একজন জুনিয়ার উকিল দাঁড়িয়েছিলেন যদুলালের তরফে। পরিষ্কার খুন, ঘটনাস্থলে হাতেনাতে ধরা পড়েছে অপরাধী। উকিলের বলবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁর একমাত্র বক্তব্য—আসামী প্রকৃতিস্থ ছিল না, যা করেছে মদের ঝোঁকে, তার জন্যে তাকে দায়ী করা চলে না।

এ যুক্তি টেকেনি। পুলিস বোধ হয় আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছিল। যদুলালকে যখন ডাক্তারের সামনে হাজির করেছিল তখন তার মধ্যে নেশার লক্ষণ পাওয়া যায়নি। ডাক্তারি রিপোর্টে সে স্বাভাবিক। যদুলালের উকিল অবশ্য দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, পুলিস ইচ্ছা করেই দেরিতে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু কোর্ট অনাবশ্যক বিলম্বের কোনো প্রমাণ পাননি।

দায়রা আদালতে প্রাণদণ্ড হলে হাইকোর্টে আপীল করা চলে। সেটা জেল

থেকে করার ব্যবস্থা আছে। যদ্‌লালের বেলায় তাই হয়েছিল। হাইকোর্ট নথিপত্র দেখে আপীল পিটিশান নামঞ্জুর করেছিলেন। তার পরে যা করণীয়, প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন, তাও গ্রহণযোগ্য নয় বলে যথাসময়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ।

জেলকোডের নির্দেশ—সুপারিন্টেন্ডেন্টকে প্রতিদিন অন্তত একবার করে **condemned cell** (যেখানে ফাঁসির আসামী থাকে) পরিদর্শন করতে হবে। জানতে হবে তার কোনো নালিশ আছে কিনা। যদুলালের লোহার গরাদে দেওয়া তালাবন্ধ সেল-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সে অত্যন্ত খুশিমুখে বলে উঠত, আমি ভাল আছি স্যার।

তবু কোন কোন দিন বলেছি, কোন রকম অসুবিধে হলে আমাকে বলতে পারো।

তার ঐ এক উত্তর, না না, আমি খুব ভাল আছি, স্যার।

সুপার যখন রাউন্ডে বেরোন তাঁর সঙ্গে একদল লোক থাকে। জেলার থেকে আরম্ভ করে সিপাই পর্যন্ত। তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতে চেয়েছি। তবুও ও ঐ এক কথাই বলেছে, আমার কিছু নালিশ নেই স্যার। আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

মুখে সেই স্বচ্ছন্দ সরল হাসি।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলে ফাঁসির আসামী কম দেখিনি। নালিশ ফরিয়াদও শুনেছি। নানা রকমের অভিযোগ। পুলিসের বিরুদ্ধে, বিচারকের বিরুদ্ধে, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে, যারা চক্রান্ত করে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাদের মৃত্যুর দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এমনি ধারা কত কথা। কেউ চোখের জলের ভিতর দিয়ে শুনিয়েছে তাদের পারিবারিক দুঃখের কাহিনী। আমার কছে অবান্তর, প্রতিকারের কোন উপায়, আমার বা কারো হাতে নেই। তবু শুনে গেছি। কিন্তু যদুলালের মত কাউকে বলতে শুনিনি—আমি খুব ভাল আছি স্যার, আমার কোন নালিশ নেই।

ঐরকম একখানা হাস্যোজ্জ্বল মুখও **condemned cell**-এ আর কোথাও দেখিনি। কাউকে দেখেছি বিষণ্ণ, কারো মুখে নৈরাশ্যের গাঢ় ছায়া, কেউ ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, কেউবা নির্বাক, উদাসীন। 'কেমন আছ ?' আমার এই প্রশ্নকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সব দিক দিয়েই যদুলাল একক অনন্য এবং এক আশ্চর্য বিস্ময়! যেন পরম আনন্দে আছে। অথচ সে তো জানে, তার এই তরুণ জীবনের শেষ দিনটি একেবারে এসে গেছে। এও জানে, তার অন্ধ বাপ আর দুঃখিনী মায়ের সহায়সঙ্গতি বলতে সংসারে আর কিছুই রইল না।

একদিন তার মা এসেছিল দেখা করতে। সেল-এর সামনে ভেঙে পড়েছিল কান্নায়। আমার যে অফিসারটি উপস্থিত ছিল তার মুখে শুনেছি, যদুলাল এতটুকু বিচলিত হয়নি, বার বার বলেছিল, কেঁদো না মা, বাড়ি ফিরে যাও।

আমি ভাল আছি, আমার জন্য ভেবো না।

কি ছিল তার মধ্যে, কোথা থেকে এই জোর সে পেয়েছিল, তা আজও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। এ যদি অভিনয় হয়, তবে অত বড় শক্তিমান অভিনেতাই বা ক'জন আছে জানি না।

'আজ তোমার ফাঁসি' এই রূঢ় খবরটা আগে থেকে কাউকে জানানো হয় না! কিন্তু রাত থাকতেই তার সেল-এর সামনে এবং সেল ইয়ার্ড সংলগ্ন ফাঁসিমঞ্চের ধারে অনেক বুটের শব্দ, লোকের আনাগোনা ইত্যাদি নানারকম তৎপরতা থেকে সবাই জানতে পারে।

চারটে বাজলেই তাকে সেল থেকে বাইরে আনা হয়। তারপর স্নান করিয়ে একসেট নতুন জেলের পোশাক পরানো হয়। যদি কেউ শেষ প্রার্থনা জানাতে চায় তার উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে, সে সুযোগ দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্নধর্মী কয়েদীদের জন্যে একজন করে **Religious Instructor** বা ধর্মোপদেষ্টা আছেন। তিনি গীতা, কোরান বা বাইবেল থেকে কিছুটা পড়ে শোনান।

যদুলালের বেলাতেও রুটিন-মাফিক সব ব্যবস্থা ছিল। সেদিন কিন্তু তার সেই প্রফুল্লতা নেই। কলের পুতুলের মত যা করতে বলা হচ্ছে, করে যাচ্ছে। মুখ গম্ভীর এবং চোখে কিসের একটা চাঞ্চল্য। ওদিকে গীতাপাঠ হচ্ছে, সেদিকে তার কান নেই। বার বার ইয়ার্ডের গেট-এর দিকে তাকাচ্ছে। একবার বলে উঠল, বড় সাহেব কই?

চীফ হেড ওয়ার্ডার জানাল, এখনই আসবেন।

একটু পরেই আমি পোঁছে গেলাম। সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট। যদুলাল যেন ছুটে এলো আমার কাছে। এই প্রথম তার মুখের সেই হাসিটি দেখতে পেলাম না, শুনতে পেলাম না সেই খুশির সুরে বলা—'আমি ভাল আছি স্যার।' তার বদলে কেমন একটা অস্থিরতা। বলল, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে স্যার। আপনি একবার এদিকে আসুন।

একটু দূরে নিয়ে গিয়ে সে বলল, এই যে আমি আজ আমার বুড়ো বাপ-মাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি, এর জন্যে দায়ী কে জানেন?

বললাম, কে?

যদুলাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, মদ। পাড়ায় পাড়ায় মদ তৈরী হচ্ছে। আমার মত কত ছেলের যে সর্বনাশ হচ্ছে, কত সংসার যে ভেঙে যাচ্ছে, আপনারা জানেন না স্যার।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল সে। একটু দম নিয়ে আবার বলল, আপনাকে একটা কথা দিতে হবে স্যার। এই মদ আপনি বন্ধ করবেন। করতেই হবে। বলুন, করবেন?

হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে নজর পড়তে বলে উঠল, উনি কে?

বললাম, উনি একজন হাকিম।

হাকিম? তাহলে আপনিও কথা দিন স্যার, মদ বন্ধ করে দেবেন।

তিনি বললেন, যা বলা স্বাভাবিক, মদ বন্ধ করা কি আমাদের পক্ষে—

কথাটা শেষ করার আগেই আমি তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিলাম যদুলালকে, হ্যাঁ, মদ আমরা বন্ধ করে দেবো, তুমি শান্ত হও।

দেবেন তো ?

নিশ্চয়ই দেবো।

যদুলাল যেন নিশ্চিন্ত হল। রক্তিম মুখের উপর একটা প্রশান্তির ছায়া চীফ হেড ওয়ার্ডারের দিকে চেয়ে বলল, চলুন কোথায় যেতে হবে।

এই অন্তিম মুহূর্তে অনেককে দেখেছি, একেবারে ভেঙে পড়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরব না। জোর করে ধরে নিয়ে যেতে হয় ফাঁসি-চত্বরে। যদুলাল নিজে থেকেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। তবু আইনের নির্দেশে হাত দুটো পেছনে নিয়ে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হল। মাথায় পরানো হল চোখ-মুখ-ঢাকা টুপি।

আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। যদুলাল ফাঁসিমঞ্চের লোহার পাতের ওপর দাঁড়িয়ে। নিশ্চল ও নির্বাক। হ্যাঙ্‌ম্যান শিবু মোটা ম্যানিলা রজ্জুর ফাঁস তার গলায় পরিয়ে দিয়ে জোড় হাত করে আউড়ে যাচ্ছে তার অভ্যস্ত বুলি, আমার অপরাধ নিও না ভাই। আমি হুকুমের চাকর, সরকারের হুকুম—

ওসব থাক ভাই—বলে উঠল যদুলাল, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।

হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে আমার দিকে তাকাল হ্যাঙ্‌ম্যান। আমি হাতের রুমাল-খানা তুলে ধরে মাটিতে ফেলে দিলাম।

শেষ ইঙ্গিত। সেও সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডেলটা টেনে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে ছ'ফুট লম্বা দেহটা মাটির ঢিপির তলায় কোথায় হারিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল শুধু একটা দড়ি। একটুক্ষণ দুলে উঠল—একবার কি দুবার। তারপর সব স্থির!

হ্যাংম্যান

কাল ভোরবেলা আলি হোসেনের ফাঁসি। গত মাসখানেক ধরেই চলেছে তার প্রস্তুতিপর্ব।

বিচারক তো দণ্ড দিয়েই খালাস। তার পর থেকে শুরু হল আমাদের কাজ—আমরা যারা জেল আগলে আছি, এবং তা চলতে থাকবে যতক্ষণ না খালাস পাচ্ছে সেই দণ্ডিত কয়েদী, কখনো জেল থেকে, কখনো বা দুনিয়া থেকে!

আলি হোসেন চলে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে। খানদানি ঘরের ছেলে। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল চাচাতো বোনকে। সুন্দরী, অনুগত স্ত্রী। হঠাৎ কী হল! মাস তিনেক না যেতেই দিল শেষ করে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে বলল, বৌকে খুন করে এলাম, যা করবার করুন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এর বেশী আর কোনো কথাই বেরোয়নি তার মুখ থেকে। থানায় না, কোর্টে না, উকিল বা আত্মীয় স্বজনের কারো কাছেই না। বলেছে, 'কেন' দিয়ে কী দরকার আপনাদের?

করেছি, এইটুকু পেলেই তো হল।

সে না করেছে আপীল, না পাঠিয়েছে মারসি পিটিসন (mercy petition)। হেসে বলেছিল, একটি মাত্র মারসি শুধু চাইবার আছে। যত শীগগির পারেন ঝুলিয়ে দিন।

সেদিক দিয়ে আমাদের ত্রুটি হয়নি। আপীল-টাপীলের ফ্যাকড়া না থাকায় ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে।

তাহলেও ফাঁসির একটা আয়োজন আছে এবং সে পর্বটি মোটেই ছোট নয়। সারাদিন ধরে তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তার পরেও কোথাও কোনো ছিদ্র রইল কিনা আরেকবার খতিয়ে দেখবার জন্যে রাত ন'টার সময় হাজির হলাম জেলখানায়।

ফটক পেরিয়ে দু' গেট্-এর মাঝখানে যে প্রশস্ত জায়গা সেখানে পা দিতেই একটা লোক হন-হন করে এগিয়ে এল, 'সেলাম হুজুর। আমাকে একটু বেরোবার হুকুম দিন। যাবো আর আসবো।'

'কে তুমি ?'

'আজ্ঞে আমি মধু—মধু দাস, হ্যাংম্যান।'

ঢ্যাঙা, কালো রোগামত লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম। মাথায় টেড়ি, পরনে ফর্সা হাফশার্টের নিচে অপেক্ষাকৃত ময়লা ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডাল, চোখে-মুখে ব্যস্ততা। ভোরবেলা একজিকিউশান নামে যে মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপিত হতে চলেছে তার প্রধান হোতা এই হ্যাংম্যান্। মোটা ম্যানিলা রজ্জু দিয়ে তৈরী যে কঠিন ফাঁসটি সযত্নে রাখা আছে আমার আলমারীতে, ফাঁসিমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সেটা আলি হোসেনের গলায় পরিয়ে দেবার অত্যাবশ্যক কাজটি ওর।

ফাঁসি-পর্বের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। জেলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলর, ডেপুটি জেলর, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, চীফ হেড-ওয়ার্ডার এবং সশস্ত্র বাহিনী। তাদের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত হলে তার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু মধু দাসের কোনো বিকল্প নেই। ফাঁস পরাবার জন্যে তার কিছু প্রাপ্তি আছে—নগদ বত্রিশ টাকা। জেল-সুপারের সই করা চিঠি পেয়ে সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে গেছে এবং আজও সন্ধ্যার পরেই এসে হাজির হয়েছে। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে সজাগ। কিন্তু সে তো কয়েদী নয় যে বাইরে যাবার জন্যে আমার অনুমতি দরকার।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গেটকীপারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। সে বলল, 'বড় জমাদার সাহেব ওকে গেট-এ আটকে রাখতে বলে গেছেন।'

'কেন ?'

উত্তর দিল মধু, 'পাছে মদ্-টদ খেয়ে আসি, এই ভয়ে। বুঝুন একবার! আমার কি সে জ্ঞান নেই ? এত বড় একটা দায়িত্ব রয়েছে মাথার ওপর।'

'বাইরে যেতে চাইছ কেন ?'

'ছেলেটার অসুখ, একবারটি দেখে আসবো। এই তো কালীঘাটে আমার

বাসা। আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বো।'

তখনো ইতস্ততঃ করছি দেখে বললে, 'হুজুর নতুন ঢুকেছেন জেলখানায়। আমাকে দেখেননি। তামাম জেল-ডিপার্টের সব বাবুরা আমাকে চেনেন। সব-খানেই আমাকে যেতে হয় তো। এই আমার পেশা। আমার বাবাও এই কাজ করে গেছেন। আমরা জাতিতে ডোম, কিন্তু কোনো ছোট কাজ করি না। মদ-টদ একটু খাই। হুজুরের কাছে মিছে কথা বলবো না। কিন্তু তাই বলে আজ…'

দাঁতে জিভ কেটে দু-কানে হাত দিল মধু ডোম।

আমাদের বড় জমাদার অর্থাৎ চীফ হেড-ওয়ার্ডার রাম অবতার সিং, লোকটি ব্যাপারেই অতি-সাবধানী। প্রায়ই দেখেছি যেখানে ধরে আনা প্রয়োজন, সেখানে সে বেঁধে আনে। অতিরিক্ত কর্তব্যপরায়ণ! এটাও তারই একটা দৃষ্টান্ত বলে মনে হল। তাছাড়া ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ এই লোকটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক করে রাখবার কী অধিকার আছে আমাদের?

মধুকে বললাম, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ হুজুর, তার আগেই চলে আসবো। শুধু ছেলেটাকে এক নজর দেখা।'

আমার সরকারী কোয়ার্টারের সদর দরজায় দুমদাম শব্দ এবং সেই সঙ্গে রিজার্ভ-ওয়ার্ডারের বাজখাঁই গলা। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। জেলর আপশন সাহেবের জরুরী তলব। একরকম ছুটে গিয়ে জেল গেট্-এ ঢুকতেই রুক্ষ প্রশ্ন, 'হ্যাংম্যানটাকে তুমি বাইরে যাবার পারমিশন দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, স্যার! এখনো আসেনি?' বলে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা যেন জমাট বেঁধে গেল। রাত বারোটা চল্লিশ। আপশন বললেন, 'নো; অ্যান্ড আই অ্যাম্ সারটেন, হি ওন্ট্ টার্ন আপ্ টু-নাইট্।…"

'তার বাড়িতে একবার…'

'সেখানেও নেই।'

'তার ছেলের অসুখ বলেছিল।'

'ওরকম বলে থাকে।'

কাছে একখানা চেয়ার ছিল। হাতে একটা অসহায় ভঙ্গি করে সেখানে বসে পড়ে জেলর সাহেব বললেন, 'নাউ, হোয়াট টু ডু?'

এটা প্রশ্ন নয়। হলেও, আমাকে নয়। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এক কাজ কর। রিং আপ ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডার এডওয়ার্ড, ইন্ দা প্রেসিডেন্সি জেল। আমার নাম করে বল, এখুনি যেন চলে আসে। ও একবার একটা ফাঁসি দিয়েছিল। হয়তো কোনো রকমে কাজটা চালিয়ে দিতে পারে।'

ভাগ্যক্রমে এডওয়ার্ডের তখন নাইট ডিউটি এবং জেল গেটেই তাকে পাওয়া গেল। আমার কথায় আসতে চায় না। আপশন গিয়ে অনেক করে বলতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল। কিন্তু আমতা আমতা করে বলল, 'পারবো কি? নাট্টাকে ঠিকমতো প্রেস্ করা। যদি এদিক ওদিক সরে যায়?'

জেলর ভরসা দিলেন, 'যায় যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মরবে না, কিছুক্ষণ ছটফট করবে, এই তো ? তা করুক। হোয়াট্‌স্‌ দা হার্ম ?'

কথা হল, রাত ঠিক তিনটায় হাজির হবে এডওয়ার্ড।

বাসায় আর ফেরা হল না। বাকী রাতটা অফিসে বসেই কেটে গেল। লজ্জায়, দুর্ভাবনায় এবং কী এক আশঙ্কায় সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হবে কি ? যদি না হয় ?

সাড়ে তিনটায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে পড়লেন। সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট্‌। অফিসে ঢুকেই জেলরকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রথম প্রশ্নই হল, 'হ্যাংম্যান আছে তো ?' বাইরে থেকেই তাঁর গলা শুনতে পেলাম এবং বুঝলাম, এবার আমার ডাক পড়বে। কিন্তু পড়ল না। সম্ভবতঃ সময় ছিল না বলে। তখন সকলেরই চিন্তা, আগে আসল ব্যাপারটা মিটে যাক। আমার ব্যাপারটা পরে আসবে এবং যে কঠিন রূপ নিয়ে আসবে তার পূর্বাভাস, মনিব বেরোতে গিয়ে যে দৃষ্টিবাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তার মধ্যেই পাওয়া গেল।

আমরা সদলবলে ফাঁসি প্রাঙ্গণে এসে পড়লাম। মাঝখানে উঁচু ঢিপির উপর সজ্জিত ফাঁসি-মঞ্চ লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। দুধারে দাঁড়িয়ে দুটো লোহার পোস্ট এবং তার উপরে আড়াআড়ি ভাবে লাগানো একটা লোহার রড্‌। তারই সঙ্গে ঝুলছে মোটা দড়ির ফাঁস। তার একদিকে একটা নট্‌ বা গিট্‌ লোহার বলের মতো শক্ত। ওরই কথা বলছিল এডওয়ার্ড। কয়েদীকে যখন চোখমুখে-ঢাকা টুপি পরিয়ে, পিছন দিকে হাতকড়া লাগিয়ে ঐ পাতের উপর এনে দাঁড় করানো হবে, হ্যাংম্যান তার গলায় পরিয়ে দেবে ফাঁস। এমন ভাবে পরাবে, ঐ শক্ত বলের মতো নট্‌টা যেন ঠিক ঘাড়ের উপর থাকে, যাতে করে লোকটা যখন ঢিবির ভিতরকার গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে, এই কঠিন গিঁটটা তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে দিতে পারে। তা না হলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে না।

হ্যাংম্যানের কৃতিত্ব ঐখানে।

ওদিকে কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেল্‌-এর সামনে আলি হোসেন তার শেষ স্নান সেরে নিয়েছে। বাইরে থেকে এই উপলক্ষে যে মৌলবীকে আনা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে, তার অনুচ্চ উদাত্ত কণ্ঠের কোরাণ পাঠ। এদিকে দৃশ্যপট প্রস্তুত। রিজার্ভ চীফ হেডওয়ার্ডার মকবুল খাঁ'র নেতৃত্বে সশস্ত্র ফোর্স 'অর্ডার আর্মস্‌' পোজিসনে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চের উপর 'নায়কের' আবির্ভাব ঘটলেই শোনা যাবে তার গম্ভীর কমাণ্ড্‌—'প্রেজেন্ট্‌ আর্মস!' কী তার তাৎপর্য জানি না। সম্ভবতঃ মৃত্যু পথযাত্রীর উদ্দেশে কারা-বাহিনীর শেষ অভিবাদন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ঘোষ ওয়ারেন্ট হাতে অপেক্ষা করে আছেন। দায়রা বিচারপতির দণ্ডাদেশ। শেষবারের মতো দণ্ডিতকে সেটা পড়ে শোনানো হবে। সুপারের ডান পাশে দাঁড়িয়ে নিখুঁত ইউনিফর্মে সজ্জিত জেলর এবং আমরা তাঁর ডেপুটির দল। সেল থেকে ভেসে আসা কোরাণ পাঠ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। সব স্তব্ধ নিথর।

হঠাৎ পিছনে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। একজন সিপাই এবং সঙ্গে হন্তদন্ত

হয়ে ঢুকে পড়ল মধু ডোম, 'আ গিয়া, হুজুর।' কথাগুলো একটু জড়ানো। জেলর স্থান-কাল ভুলে গিয়ে দাঁত কড়মড় করে একটা অভ্যস্ত অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করলেন। মধু যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাবে এগিয়ে এসে বড় সাহেবের সামনে ফৌজী কায়দায় লম্বা স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল। তিনি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

এবার কণ্ঠে কোনো জড়তা নেই' পা দুটোও কিছুমাত্র টলছে না।

এরই নাম বোধ হয় স্থান-মাহাত্ম্য।

ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে আলি হোসেনের গলায় ফাঁসটা ঠিকমতো পরিয়ে দিয়ে মধু তার মুখস্থ বুলিটা আউড়ে গেল ঃ 'আমার কোনো অপরাধ নিও না ভাই। আমি হুকুমের দাস। হুকুম পালন করছি···।' তারপর হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে অপলক চোখ দুটো তুলে ধরল বড় সাহেবের দিকে। তিনি হাতের রুমালখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতল টেনে দিল হ্যাংম্যান। লোহার পাতখানা সরে গেল এবং মুহূর্ত মধ্যে নিচেকার গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আলি হোসেনের দীর্ঘ দেহ। মোটা দড়িটা শুধু টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চোখের উপর। একটুখানি নড়ে উঠল একবার কি দুবার। তারপর একেবারে স্থির।

আমরা নির্ভাবনার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। শেষ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে। অপারেশন সাকসেসফুল।

তারপর সারা বাংলার বিভিন্ন জেলে মধু ডোমের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সেই একই চেহারা, একই পোশাক। সেদিনকার ব্যাপারটার জন্যে সে বরাবর মনে মনে লজ্জিত ছিল। একদিন বলেও ফেলেছিল, 'একটু গলা ভিজিয়ে নিতে হয় হুজুর। একটা জলজ্যান্ত খুন তো। পুরো জ্ঞান থাকলে করা যায় কখনো ? তবে, ঐদিন ডোজটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই ফিরতে অত দেরি।'

আর কোনোদিন অবশ্য এতটুকু গাফিলতি দেখা যায়নি তার কথায়। কাজেও কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

ঐদিন যে তাকে আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার জন্যে সে মনে মনে আমার উপরে কৃতজ্ঞ ছিল। যত দেরিই করুক তবু ঠিক সময়ে এসে এবং ঠিকমত কার্যোদ্ধার করে দিয়ে সেও যে আমার মুখ রক্ষা করেছিল, তার জন্যে আমিও কম কৃতজ্ঞ ছিলাম না। দুয়ে মিলে আমাদের মধ্যে কেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কোনো জেল থেকে ডাক এলে গিয়ে যদি শুনত, আমি সেখানে আছি, সকলের আগে সে আমার সঙ্গে দেখা করত, 'সব খবর ভালো তো হুজুর ? মা, খোকাবাবুরা কেমন আছেন ?'

আমিও তার ঘরসংসারের খবর নিতাম।

কালক্রমে আমি যখন কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেছি এবং রুমাল ফেলে দিয়ে শেষ ইঙ্গিত দেবার অধিকার লাভ করেছি তখনো আমাদের সম্পর্কটা বিশেষ বদলায়নি।

তারপর একদিন সরকারী চাকরির উচ্চ মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। ফাঁসি-মঞ্চ পড়ে রইল পিছনে। সে রাজ্যের প্রধান পুরুষ হ্যাংম্যানের সঙ্গেও আর কোনো সম্পর্ক রইল না। মাঝে মাঝে মধু দাসের কথা (ডোম বললে সে স্পষ্টতঃ ক্ষুণ্ন হতো) মনে পড়ত। ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম।

বছর কয়েক আগে একদিন কালীঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রামের আশায়। সেই পরিচিত স্বর, 'সেলাম হুজুর।'

চমকে উঠলাম। অনেক দিন বাদে শুনছি বলে নয়, লোকটার দিকে তাকিয়ে। লম্বা দেহটা যেন ভেঙে পড়েছে, চোখ দুটো কোটরে, চোয়ালের হাড় ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। বললাম, 'কেমন আছ মধু ?'

'আর কেমন !'

'কোনো অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি ?'

'না হুজুর, স্রেফ না খেয়ে না খেয়ে এই চেহারা। ছেলেপিলেগুলোকে যদি দেখেন, চমকে উঠবেন।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সেদিন আর নেই, স্যার। কোনো জেল থেকেই আর ডাক আসে না।'

'অন্য লোক ঠিক হয়েছে বুঝি ?'

'অন্য লোক !' যেন গর্জে উঠল সে, 'মধু দাস ছাড়া হ্যাংম্যান আছে নাকি বাংলা দেশে ? আজকাল ফাঁসিই হয় না। আগেকার কালের সেই সব ছোকরা হাকিম তো আর নেই ! তাদের বুকের পাটাই ছিল আলাদা। খুন প্রমাণ হলেই ফাঁসি। এখনকার এই বুড়ো জজবাবুদের সে সাহসই নেই। ফাঁসির হুকুম দিতে হাত কাঁপে। বসিয়ে দেয় 'যাবজ্জীবন'।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আই. সি. এস. জজদের আমলে যত ফাঁসি হতো, পরের যুগে তা অনেক কমে গেছে।

মধু যেন একটু লজ্জিত হল, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, দলে দলে লোক ফাঁসি-কাঠে মরুক এই চাইছি আমি। তা নয়। কিন্তু দুটো-চারটেও যদি না মরে, ছেলেপিলে নিয়ে আমি বাঁচি কি করে ?'

'অন্য কোনো কাজ-টাজ…'

'কী কাজ করবো বলুন ? আমার বৌও এই কথা বলে—শুয়োর চরাও, লাশ কাটো, নর্দমা সাফ করো। আমার জাতের অন্য পাঁচটা লোক যা করে। শুনুন কথা। আরে, আমি যে একটা হ্যাংম্যান। বত্রিশ টাকা সরকারী ফী পাই। আপনাদের মতো সাহেব-সুবোরা কত ভালোবাসেন। আমি কখনো ছোট কাজ করতে পারি ?'

ট্রাম এসে পড়েছিল। উঠে পড়লাম। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেল মধু দাস।

কয়েক মাস পরে আবার দেখা হয়ে গেল মধুর সঙ্গে। না হলেই বোধ হয় ছিল ভাল।

একটা সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। হাজরা রোডে ট্রাফিক জ্যাম, এগোবার

উপায় নেই। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার কালীঘাটের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েক মিনিট চলার পর দেখা গেল, সেখানকার অবস্থা আরো জটিল। ঠিক সামনেই সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের গাড়ি। পিছনে হটবার জো নেই। পর পর অনেকগুলো গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের আবির্ভাব স্বভাবতঃই আমার ড্রাইভারের কৌতূহল উদ্রেক করল। নেমে গেল খবর নিতে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'খুন কেস্। একটা মেয়ে মানুষের মাথা ফেটে গেছে। মেরেছে নাকি তার স্বামী। নাম শুনলাম মধু ডোম।'

মধু ডোম! তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। পুলিস তখন লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। খোলার ঘরের বারান্দার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা কঙ্কালসার নারীদেহ। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কাছেই পড়ে আছে একখণ্ড রক্তমাখা কাঠ। ঘটনাটা মোটামুটি শোনা গেল।

মধু বড় একটা বাড়ি থাকে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দুপুরের দিকে ফিরছিল। সামনেই একটা দশ-বারো বছরের উলঙ্গ ছেলে ম্যানহোলের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গে ময়লা। প্রথমটা চিনতে পারেনি মধু। তার-পর একটু ঠাহর করে দেখল. তারই ছেলে। তেড়ে উঠল, 'একাজ করতে কে বলেছে তোকে ?'

'মা।'

'মা! চল, বাড়ি চল। ম্যানহোলে ঢুকতে লজ্জা করে না ?'

ছেলে গ্রাহ্য করল না। বাকী লোকগুলোর সঙ্গে ওদিকটায় চলে গেল।

হন্ হন্ করে বাড়ি ফিরল মধু দাস। সামনেই পেল বৌকে। শাসিয়ে উঠল, 'কার হুকুমে আমার ছেলেকে ঐ নোংরা কাজ করতে পাঠিয়েছিস ?'

বৌও সমানে তেড়ে জবাব দিল, 'পাঠিয়েছি, বেশ করেছি। তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি, এদিকে…'

'তাই বলে হ্যাংম্যানের ছেলে নর্দমা সাফ্ করবে!'

'অ্যাংম্যান!' শ্লেষে বিদ্রূপে ফেটে পড়ল বৌ, 'তোর অ্যাংম্যানের মাথায় মারি ঝাড়ু।'

'মুখ সামলে কথা কস।' বলে, একটা কুৎসিত গালাগালি যোগ করল শেষের দিকে।

বৌটারও মাথার ঠিক ছিল না। তেড়ে এল এবং মুখ থেকে যা বেরোল তাও কম কুৎসিত নয়।

মধুর হাতের কাছে ছিল একটা কাঠ। তুলে নিতেই বৌও একটা কি ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠটা তার মাথায় গিয়ে পড়ল। এক ঘায়েই খতম।

আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এসে দেখল, বৌয়ের রক্তাক্ত দেহটার দিকে শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মধু ডোম। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পুলিস এসে বাড়িতেই পেয়ে গেল আসামীকে। রান্নাঘরের আড়া থেকে ঝুলছে।

জীবনে অনেক ফাঁসি দিয়েছে হ্যাংম্যান। শেষ ফাঁস পরিয়ে দিল নিজের গলায়। দামী ম্যানিলা রোপ আর কোথায় পাবে? নট্-ফটের ঝঞ্ঝাটও ছিল না। বৌয়েরই একটা ছেঁড়া শাড়ি পাকিয়ে দড়ি বানিয়েছে এবং গলায় পরে ঝুলে পড়েছে।

জরুরী তদন্ত

সকাল থেকেই কাজের চাপ। একবিন্দু ফুরসত নেই। বেশীর ভাগই অবশ্য কাজ নয়, অকাজ—যাকে বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের অফ্‌শুট, তার বিশাল দেহ থেকে যথেচ্ছভাবে গজানো।

আগেকার দিনে পারতপক্ষে থানার কাছে কেউ ঘেঁষত না। এখন কথায় কথায় থানায় গিয়ে হামলা করাই সাধারণ রীতি। কোথাও পান থেকে চুন খসলে তার কৈফিয়ৎ দেবে পুলিস, অর্থাৎ থানার দারোগা। আর সে কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার সকলের—রাম, শ্যাম, যদু, মধু—যার নাম পীপল্ বা জনতা।

ও-সি. অর্থাৎ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যিনি, তাঁর কিঞ্চিৎ সুবিধা আছে। যখন তখন বেরিয়ে পড়তে পারেন। কেন, কোথায়, কাউকে বলবার দরকার নেই। সেকেণ্ড অফিসারকে বেরোতে হলে কারণ দেখাতে হয়। সব সময়ে তা থাকে না। কাজেই থানার ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট বেশীর ভাগ তাকেই পোহাতে হয়!

আগরপাড়া থানার সেকেণ্ড অফিসার অনিল দত্ত বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত এক পেয়ালা চা পানেরও সুযোগ পাননি। মিনিট কয়েকের জন্যে বাসায় গিয়ে সবে কাপটা তুলে নিয়েছেন, একজন সিপাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিল, 'পুলিস সাহেবের ফোন।'

তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন, 'গুড মর্ণিং স্যার।'

'গুড মর্ণিং।'

'একবার আসতে পারেন?'

'এখনি যাচ্ছি স্যার।'

জীপ নিয়ে বেরিয়েছেন ও-সি.। অনিলবাবুকে বাস্-এ করে যেতে হল। ভাবতে ভাবতে চললেন, এই খাড়া তলবের মূলে আর যা-ই থাক কোনো শুভ সংবাদ নেই। এস্-পি'র কণ্ঠে যে গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে যেন কিঞ্চিৎ অসন্তোষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। অসন্তোষের কারণ তো সর্বদাই লেগে আছে। উপরওয়ালার সন্তোষ সাধন কে কবে করতে পেরেছে?

একটা ব্যাপারই বিশেষ করে মনে হল অনিলবাবুর। মাস তিনেক আগের সেই ছিনতাই কেস্‌টা।

সন্ধ্যা হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার হয়নি। থানা থেকে কয়েক গজ দূরে এক গলির মধ্যে এক ছোকরার হাত থেকে দামী ঘড়ি আর পকেট থেকে পার্স ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ল একটা লোক—চোখে কালো চশমা, মুখে চাপ দাড়ি। ছোকরা

চিৎকার করতে যাচ্ছিল, করল না। চলার ধরন দেখে চিনে ফেলল লোকটাকে। ও পাড়ায় বাড়ি। মস্ত বড় মস্তান একজন। চেঁচালে ঘড়ি-ব্যাগের সঙ্গে প্রাণটাও যাবে। দাড়িটা নকল হলেও পকেটে যে ছোরা আছে সেটি আসল স্টীলের তৈরী।

থানায় এল পরদিন। সারারাত বসে ভেবেছে, আসবে কি আসবে না। এজাহারে মস্তানের নামটা গোপন করে গেল, অনেক পীড়াপীড়ির পর চেহারার একটা আভাস দিল, তার থেকেই বুঝতে পারলেন অনিলবাবু। গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাধা মিত্তির তো ?'

ছেলেটা এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হাঁ, কিন্তু কেউ যেন না জানে আমি বলছি।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো বলতেই হবে। আমি না হয় ওকে সন্দেহক্রমে অ্যারেস্ট করে চালান দিলাম। মাল যে পাওয়া যাবে না ধরেই রাখুন। কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখন যদি আপনি ওকে দেখিয়ে না দেন, বা না বলেন, এই-ই ঘড়ির পার্স ছিনিয়ে নিয়েছে, ওতো বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে।'

'আর বললেই কি ওর জেল হয়ে যাবে ?'

'হতেও পারে।'

'তারপর ? এবারে নিয়েছে ঘড়ি, টাকা, আর ফিরে এসে যে আমার বৌ ছিনিয়ে নেবে।'

দারোগা অনিল দত্ত চুপ করে গেলেন। নতুন বিয়ে করেছে বেচারা। তার অবস্থা বুঝলেন। আগেকার দিন হলে জোরালো গলায় ভরসা দিতেন, আমরা আছি কী করতে ? মগের মুলুক নাকি ? এখন আর তা পারেন না।

অ্যারেস্ট করার কথাটা ছোকরার কাছে বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে জানেন, আসলে সেটা প্রায় অসম্ভব। মাধা মিত্তিরের দলটি ছোট নয়। বেশ কিছু ফোর্স নিয়ে গেলেও বোমা, সোডার বোতল, ইঁট-পাটকেলের বেড়া পেরিয়ে ওকে ধরা যাবে না। ধরা যদিবা যায়, ওর পলিটিক্যাল দাদারা ধরে রাখতে দেবেন না। মাধা মিত্তির না হলে তাদের পার্টি চলে না। না ছাড়লে মন্ত্রী মহলে যাবার হুমকি দেবেন। কোথা দিয়ে যে কি বিপদ আসবে কে জানে ? তার চেয়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

তাই বা বাঁচে কই ? অনিল দত্তের অবস্থা অনেকটা কালনেমির মতো। ওপারে রামে মারে, এপারে রাবণ। কিছু একটা করতে গেলেও ফ্যাসাদ, আর না করলে উপরওয়ালার তর্জন-গর্জন, 'কোনো কাজের নন আপনি। এরকম একটা সিম্পল কেস্-এর ইনভেস্টিগেশনে এত সময় লাগে নাকি ?'

যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই হল। এস. পি. ঐ কেস্-এর কথাই তুললেন এবং বেশ কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত বলে বসলেন, 'আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি অনিলবাবু, আপনার কাজকর্ম যদি এই রকম চলতে থাকে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে, এবং সেটা তেমন ভালো স্টেশন নাও

হতে পারে।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন অনিল দত্ত। পুলিস অফিসে গিয়ে যা শুনলেন, একেবারে চক্ষুস্থির। অর্থাৎ বদলি প্রায় স্থির। হেডক্লার্ক গোপনে জানিয়ে দিলেন, 'কাকদ্বীপের সুবল ব্যানার্জি খুব ঘোরাফেরা করছে। এরই মধ্যে বার তিনেক দেখা করে গেছে সাহেবের সঙ্গে। ওরই জায়গায় আপনাকে দেবার কথা হচ্ছে।'

কাকদ্বীপ! সর্বনাশ! সে যে দ্বীপান্তরের নামান্তর।

দোকানে গিয়ে পর পর তিন কাপ গরম চা গলাধঃকরণ করলেন অনিল দত্ত. সেই সঙ্গে গোটা পাঁচেক সিগারেট। একটা কথাই ঘুরতে লাগল তার মাথার মধ্যে, 'সুবল ব্যানার্জি খুব ঘোরাফেরা করছে।'

বেলা একটার কাছাকাছি সাহেব যখন লাঞ্চের জন্যে উঠতে যাবেন, সুযোগ করে আরেকবার দেখা করতে গেলেন অনিলবাবু, 'একটা প্রেয়ার ছিল, স্যার।'

'বলুন।'

'মাঝিহাটার শীতল চৌধুরী বলছিল', ঘাড়ের পিছনটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন অনিলবাবু, 'এতবড় পুকুর কাটালাম, মাছ ছাড়লাম, তা বড়সাহেব তো একবার এদিকে পায়ের ধুলো দিলেন না। শুনেছি, মাছ ধরার ওঁর ভীষণ শখ, পাকা হাত। একবারটি যদি আসেন দয়া করে…'

সাহেব ফাইল দেখছিলেন, দেখতে লাগলেন। অনিলবাবু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মনে হল, কপালের কুঞ্চনগুলো একটু যেন মিলিয়ে গেল, একটু যেন মোলায়েম ছায়া পড়ল চোখের তারায়।

মরিয়া হয়েই মনিবের এই দুর্বল স্থানটিতে হাত দিয়েছিলেন অনিলবাবু। একটা শেষ চান্স নেওয়া। কে জানে, ওঁর হাতের ঐ ছিপের হুইল হয়তো তার ভাগ্যের হুইলটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

'বড় মাছ আছে?' বেশ কিছুক্ষণ পরে জানতে চাইলেন সাহেব।

'খুব বড় না হলেও দশ-পনের সেরী রুই প্রচুর। মাঝে মাঝে ওরা ধরে তো। ছিপ-টিপ ধারে কাছেও আসতে দেয় না।'

'আচ্ছা, একটা রবিবার দেখে ব্যবস্থা করুন। তবে খাওয়া-দাওয়ার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট্ যেন না রাখে। লাঞ্চ আমার সঙ্গে থাকবে।'

আলিপুর থেকে অনিলবাবু সোজা চলে গেলেন মাঝিহাটা। শীতল চৌধুরী লোকটার নামের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো মিল নেই। গরম হয়েই আছে। কারো খাতির করে না। পুলিস সাহেব তার পুকুরে মাছ ধরতে চান শুনে খুশি হওয়া দূরে থাক, সোজা 'না' বলে বসতে পারে। বড় জোতদার, প্রচুর ধান পায়। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে তার একমাত্র সম্পর্ক ঠিকমতো লেভি মিটিয়ে দেওয়া। তা সে দেয়। চাষীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। পুলিসের তোয়াক্কা না রাখলেও চলে।

অনিল দত্তের কপাল ভালো। শীতলের মাথাটা সেদিন যে কারণেই হোক শীতল ছিল। কিছুটা খোশামোদ করতেই রাজী হয়ে গেল। একবার জানতে চাইল, 'আপনাদের সায়েবের কোন্ রাশি?'

'তা তো জানি না। সিংহ-টিংহ হবে বোধ হয়। যে রকম হুঙ্কার দেয় মাঝে মাঝে।'

'মেছো রাশি না হলেই ভালো! হাত কী রকম?'

'কিছু না। একটা বাচ্চা পোনাও ধরতে পেরেছে বলে শুনি নি। শুধু শখ।'

অনিলবাবু যখন উঠে পড়েছেন, শীতল বলল, 'হ্যাঁ দেখুন, ঐ চার-টারের ব্যবস্থা আমিই করবো। ওগুলো আর ওঁকে অতদূর থেকে টেনে আনতে হবে না। জিনিসটা ভালো দেখায় না।'

অনিলবাবু খুশি হলেন, 'তাহলে তো ভালোই হয়।'

শুভস্য শীঘ্রম। পরের রবিবারেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। অনিলবাবু সঙ্গে গেলেন না। সাহেব সেটা পছন্দ করেন না। দলবল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছি অন্যের পুকুরে—এতটা পাব্লিসিটি তাঁর ইচ্ছা নয়। আরদালী মোহন সিং ছাড়া আর কাউকে নিলেন না।

সোমবার ফার্স্ট অফিসে অর্থাৎ সাড়ে দশটা নাগাদ গিয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল অনিলবাবুর। কী হল ওখানে, কি রকম মাছ-টাছ পেলেন মনিব, খুশি মনে ফিরছেন কিনা, এসব খবর নেওয়া দরকার। তাছাড়া, শীতলটাকে বিশ্বাস নেই। কোনো বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছে কিনা কে জানে? ঐ জন্যেই ছিল বেশী ভাবনা।

থানার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে যেতে যেতে বেজে গেল বারোটা। সাহেবের ঘরের সামনেই কোতোয়ালী ও-সি'র সঙ্গে দেখা। গম্ভীর মুখ করে বেরোচ্ছেন।

'ব্যাপার কী দাদা?' জানতে চাইলেন অনিলবাবু।

'সুবিধের নয়। টেম্পার রীতিমতো হট্। কোনো কথা বলতে দিচ্ছে না। কাল শুনেছি স্টেশনে ছিল না। কোথায় কী ঘটল কে জানে?'

অনিলবাবুর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ফিরে গেলেন অফিসে। সেখানেও শুনলেন এই নিয়েই আলোচনা চলছে। হঠাৎ কী হল কর্তার! নিশ্চয়ই বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছে! পরশুও তো এরকমটা ছিলেন না।

মৎস্য-অভিযানের খবর অনিলবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। সবাই যখন এই আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে গবেষণা করছে, তিনি সোজা চলে গেলেন মোহন সিং-এর কাছে। হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিলেন, তাই। একটা মাছও পাননি সাহেব। ফাৎনা একেবারে নট নড়ন-চড়ন। ঠায় বসে সারাদিন। রোদ্দুর ভোগই সার। এতে কার না মেজাজ বিগড়ায়? তবে, শীতল কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। দু-তিনবার এসেছে মাচার ধারে, সাহেবকে তার বাড়িতেও একবার নিয়ে যেতে চেয়েছে। উনি অবশ্য যাননি। তাছাড়া সাহেব যে শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছেন, মাছ দূরে থাক, মাছের একটা ঠোক্কর পর্যন্ত দেখতে পেলেন না, সেজন্যে বারবার দুঃখ জানাতেও কসুর করেনি। সেটাই আরো বেশী লেগেছে সাহেবের। সময় বিশেষে সহানুভূতিরও একটা জ্বালা আছে এবং সেটা আঘাতের চেয়ে বেশী বাজে।

শুনে অনিল দত্ত একেবারে থ। এ যে একেবারে অসম্ভব কাণ্ড। অতো মাছ পুকুরে আছে, সাহেবের মতো পাকা শিকারী! জানতে চাইলেন, 'চার-টার ফেলেছিল তো ?'

মোহন সিং বলল, 'ফেলেছে তো বললে। তাছাড়া আমরাও কিছুটা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাও ছড়ানো হল, কিন্তু মাছের নাম গন্ধও নেই।

অনিলবাবু আর সাহেবের অফিসে গেলেন না। ওখান থেকেই ফিরলেন।

পরদিন ঐ বারোটা নাগাদ আবার গিয়ে উপস্থিত এস্. পি.'র কামরার সামনে। সাধারণতঃ কাটা দরজাটা একটু ফাঁক করে 'মে আই কাম্ ইন, স্যার' বলে ঢুকে পড়েন। আজ আর সে সাহস হল না। একটা শ্লিপ পাঠালেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাক পড়ল। স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এস. পি. ফিরেও তাকালেন না। মিনিট দুই পরে বললেন, 'কী চাই আপনার ?'

প্রতিটি শব্দে রীতিমতো ঝাঁজ।

'ইনভেস্টিগেশানটা সেরে এলাম স্যার! জরুরী কেস, ভাবলাম রিপোর্ট-টা এখনই দিয়ে যাই।'

'ঘড়িটা ট্রেস করতে পেরেছেন ?'

'আজ্ঞে ঘড়ির কেস নয়। সেটাও ক'দিনের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলবো। এ হচ্ছে শীতল চৌধুরীর ব্যাপার।'

'শীতল চৌধুরী!' এবার চোখ তুললেন সাহেব।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এই দেখুন।' বলে, টেবিলের উপর রাখলেন এক বোতল জল।

'কী ওটা ?' কপাল কুঁচকে বিরক্তির সুরে বললেন এস্. পি.।

'কাইন্ড্লি একবার শুঁকে দেখুন স্যার।' বলে অনিল দত্ত ছিপিটা খুলে দিলেন। সাহেব হাত বাড়িয়ে বোতলটা নাকের কাছে নিয়ে বললেন, 'চারের গন্ধ মনে হচ্ছে।'

'এখনো কি রকম ভুরভুর করছে দেখুন স্যার। কাল সন্ধ্যাবেলা কালেক্ট করেছি। তার মানে কত ঝুড়ি ঢেলেছে বুঝুন। সব ওপারটায়, আপনি যেখানে বসেছিলেন তার উল্টো দিকে, অনেকটা দূরে। আপনার মাচার সামনে দু-চার চামচে ছিটিয়ে দিয়েছে। ব্যাটা কত বড় ধড়িবাজ! জানে, অত অঢেল খাবার ফেলে একটা মাছও এপারে শুকনো বড়শী গিলতে আসবে না।'

এস্. পি. কোনো কথা বললেন না। তাঁর মনে পড়ল, ওপারে বেশ কিছু মাছের আন্দোলন লক্ষ্য করেছিলেন বটে। অথচ এপারে কোনো সাড়া পাননি। ফাতনাটা একবারও নড়েনি। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তেমনি বসে বসে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই রাগটা গিয়ে পড়েছিল তাঁর এই বাক-সর্বস্ব অফিসারটির উপর। এরই জন্যে তাঁর এই বিড়ম্বনা, ব্যর্থতা। সারাদিন রৌদ্র ভোগ করে খালি হাতে বাড়ি ফেরা।

এস. পি. চুপ করে আছেন দেখে অনিল দত্ত আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, 'রীতিমতো চিটিং কেস্ স্যার! ফোর-টুয়েনটির চার্জে বাছাধনকে কোর্টে টেনে

আনা যায়। আগেকার আমল হলে অ্যারেস্ট করা যেত। এখন যা দিনকাল। অতটা বোধহয় ঠিক হবে না। তবে মামলা একটা…'

'আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।'

কথার মাঝখানেই দাঁড়ি টেনে দিলেন এস্. পি.। অনিলবাবু একটু নিরাশ হলেন। বুঝলেন, খুব একটা সুবিধা হল না। রাগটা যেন রয়ে গেল। নিজের উপর থেকে ঘুরিয়ে শীতল চৌধুরীর উপর নিয়ে ফেলতে পারবেন, এই আশা নিয়ে এসেছিলেন। তার তো বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বুটে বুট ঠুকে স্যালুট দিয়ে অ্যাবাউট্ টার্ণ করে বেরিয়ে এলেন। দারুণ ছোটাছুটি গেছে এই ক'টা দিন। কোথায় মাঝিহাটা, কোথায় আগরপাড়া, আর কোথায় আলিপুর, নাইবার খাবার অবসর পাননি। সব একেবারে নিষ্ফল। ব্যর্থতার অবসাদে, ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

ফেরার পথে আরেকবার ঢুঁ মারলেন হেড-ক্লার্কের অফিসে। সেখানেও মুখ-ভারের পালা। অন্যদিন বসতে বলে ভদ্রলোক হেসে কথা কয়। আজ মুখও তুলল না। অনিলবাবু নিজে থেকেই বললেন, 'কোনো খবর আছে নাকি দাদা?'

'খবর বিশেষ ভালো নয়। ঐ কাকদ্বীপই বোধহয় টানছে আপনাকে।'

'বলেন কি।'

'অর্ডার এখনো হয়নি। ফাইল সাহেবের কাছেই আছে। কাল কোয়েরী কর-ছিলেন, আগরপাড়ায় ক'দিন হল আপনার। তা, বছর দেড়েকের ওপর হবে, কী বলেন?'

'তার চেয়েও তো কত বেশীদিন থাকে কেউ কেউ।'

'তা, থাকে বৈকি? অনেকে আবার ছ' মাসও থাকে না। কর্তার ইচ্ছায় ধর্ম।'

অনিল দত্ত অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'বছরের মাঝখানে ট্রান্সফার। চারটে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ছে। এদিকে গিন্নীর আবার ছ' সাত মাস!'

উঠতে যাবেন এমন সময় কতগুলো ফাইল-হাতে ঢুকল বড় সাহেবের চাপ-রাশী। কে জানে, এরই কোনো একটা হয়তো তার ভাগ্যনিয়ন্তা। একটু বসে গেলেন। হেড-ক্লার্ক ধীরে সুস্থে হাতের কাজ সেরে ফাইলগুলো খুলতে শুরু করলেন। গোটা দুই পড়ে বেঁধে সরিয়ে রাখলেন। তৃতীয়টা খুলেই খুশির সুরে বলে উঠলেন, 'না, এবারকার মতো আপনার ফাঁড়া কাটল দেখছি। সুবল বাঁড়ুয্যে যাচ্ছে বারুইপুর, সেখান থেকে কানন গুপ্ত চলল কাকদ্বীপ।…… কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।'

'যেদিন আপনার ফুরসত হবে দাদা।'

স্পেশাল চিঠি

কথাটা আমি নরেশের সামনে বলিনি, মনে মনে বলেছিলাম।

অনেককাল তো জেল নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। খুনের অভিযোগ নিয়ে যারা

এখানে এসেছে, তারপর রয়ে গেছে নানারকম দণ্ড নিয়ে—কেউ দশ বছর, কেউ বিশ বছর—আর যারা মাস কয়েকের বেশী থাকতে পারেনি, একদিন রাত্রিশেষে সাড়ম্বরে ফাঁসিমঞ্চে উঠে পরপারে চলে গেছে, তাদের বহুজনকে বহুভাবে জিজ্ঞাসা করেছি, 'খুন করেছিলে ?' একই উত্তর পেয়েছি প্রতিজনের মুখ থেকে, 'না।'

'শাস্তি কেন হল ?'

তার উত্তর নানাজনে নানাভাবে দিয়েছে। কেউ বলেছে জ্ঞাতিবিরোধ, কেউ বলেছে পুলিসের কারসাজি, কেউ উকিল, সাক্ষী কিংবা হাকিমের মুণ্ডুপাত করেছে, কেউ আবার কিছুই বলেনি, ডান-হাতের তর্জনি দিয়ে নিজের কপালটাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

ফাঁসির জন্যে অপেক্ষমান দু-তিনজন বরং তাদের অন্ধকার সেল্-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে গেছে, হ্যাঁ, খুন করেছি। অবিশ্যি কেউ অনুতপ্ত কণ্ঠে, কেউ সগর্বে।

একজন আবার মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে মোটা ম্যানিলা দড়িটা গলায় পরে মুখ-ঢাকা টুপিটার আড়াল থেকে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেঃ খুন আমি করিনি, করছ তোমরা, একজন নিরপরাধ লোককে ঝুলিয়ে দিচ্ছ ফাঁসিকাঠে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন।

এই প্রথম একজন দায়মলি (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত) আমার কাছে স্বীকার করল, সে খুন করেছিল। না, আরেকজনও করেছিল, একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে। তার কথা অন্যত্র বলেছি। সে অপরিণত কিশোর। তাকে সাধারণের দলে ফেলা চলে না। তাছাড়া, তার মন তখন বিক্ষুব্ধ, বিচলিত। কী বলেছিল, হয়তো নিজেই জানত না।

নরেশ জানা তা নয়। সহজ, সুস্থমন, পরিণত-বুদ্ধি যুবক। অন্য দশজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ নয়। আমার কাছে যখন এসেছিল সেদিন, কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটেনি। শান্ত বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে আবেদন নিয়ে এসেছিল, পেশ করবার আগেই আমি তা জানতাম। তাই আসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ডিউ হতে কদ্দিন বাকী ?'

'পাঁচদিন স্যার।'

'ডেপুটিবাবুকে বল দিয়ে দিতে। আচ্ছা, দাঁড়াও আমি বলছি।'

ব্যাপারটা হল, নরেশ দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী, বাইরে থেকে মাসে একখানা চিঠি পেতে পারে। অর্থাৎ গত মাসের পাঁচ তারিখে যদি তাকে কোনো চিঠি দেওয়া হয়ে থাকে, এ মাসের চার তারিখের আগে পরের চিঠিটা পাবে না। এর ভিতরে তার যে-সব চিঠি আসবে, অফিসে জমা থাকবে। আর যদি সে ইণ্টারভিউ না দেয়, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বাইরের কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করে, তাহলে ঐ একমাসের ব্যবধান কমে পনরদিন হয়ে যাবে।

নরেশের ইণ্টারভিউ নেই, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে না। কাজেই সে চিঠি পায় পনরদিন অন্তর। তার মধ্যেই অনেক সময় তার দু-তিনখানা চিঠি এসে জমা হয় অফিসে। সে খবর যখন তার কাছে পেঁছায় (নানাভাবে পেঁছতে

পারে), সে আমার কাছে মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ায়। প্রয়োজন বোধ করলে স্পেশাল অর্থাৎ পাওনার অতিরিক্ত চিঠি মঞ্জুর করবার ক্ষমতা আমার হাতে ন্যস্ত আছে এবং কোনো বিশেষ কারণে তার বেলায় সে প্রয়োজন আমি বোধ করে থাকি। আমার নির্দেশমতো চিঠিপত্র সেরেস্তার ডেপুটি জেলার সেই চিঠির উপরে লেখেন, 'Allowed as a special case.' আমি তার নীচে সই করি। নরেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চিঠিখানা শার্টের পকেটে ফেলে আমাকে একটা নমস্কার করে দ্রুতবেগে চলে যায়।

উল্লেখ করা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন, এই চিঠিগুলো যার কাছ থেকে আসে, সে একটি মেয়ে।

নরেশকে দিয়েই ডেপুটি জেলারবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, 'এমনিতেই পাওনা হয়ে যেত, স্পেশাল কেস্ করবার দরকার হত না। কিন্তু সেদিন একটা ইণ্টারভিউ হয়ে গেল কিনা।'

'ইণ্টারভিউ!' আমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ স্যার, মা এসেছিল', চোখ না তুলেই বলল নরেশ, 'দাদারা অবিশ্যি জানে না। জানলে আসতে দিত না।'

আমরা চুপ করে রইলাম। নরেশ বলল, 'ভাবছি, দেখা না করলেই বোধহয় ভালো হত। যদি জানাজানি হয়ে যায়, খুনী ছেলেকে দেখতে এসেছিল মা, হয়তো বাড়িতে আর জায়গা হবে না।'

ডেপুটিবাবু চিঠিটা ওকে দেবার ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। সেই ফাঁকে বললাম, 'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো করবো করে করিনি। অবিশ্যি তোমার যদি বলতে আপত্তি থাকে…'

নরেশ বলে উঠল, 'জিজ্ঞেস করুন স্যার। আপনাকে বলতে পারি না, এমন কোনো কথাই আমার নেই।'

তখনো একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে বলল, 'বুঝেছি, আপনি কি জানতে চান? হ্যাঁ, খুন আমি করেছি আমার এক বন্ধুকে—ছেলেবেলা থেকে আমরা এক পাড়ায় একসঙ্গে মানুষ, দুজনে দুজনকে ভালোবাসি। অবিশ্যি, খুন করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। চেয়েছিলাম শুধু তার চোখদুটো শেষ করে দিতে। কিন্তু সে নিজেই শেষ হয়ে গেল।'

বলতে বলতে মনে হল, একটু যেন উসখুস করছে। কারণটা বুঝতে পারলাম। চিঠিটা এখনো পায়নি, ওদিকে ডেপুটিবাবু এতক্ষণে সব কিছু রেডি করে রেখেছেন। বললাম, 'আচ্ছা, আজ তুমি যাও। পরে আরেক দিন শোনা যাবে সব কথা।'

দিন কয়েক যেতেই শুনলাম তার খুনের ইতিহাস।

ঠিক কোলকাতায় নয়, শহরতলির কোথায় ওরা থাকত। নরেশ জানা আর হরেন বিশ্বাস। বয়স খুব কাছাকাছি, বাড়িও প্রায় পাশাপাশি। ওরা একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছিল। নরেশ লেখাপড়ায় ভালো, ফি বছর পাস করে ক্লাসে ওঠে, তবে স্বাস্থ্যটা নরম, সাহেবে বলে ডেলিকেট। হরেন শক্ত মজবুত ডানাপটে, কিন্তু লেখা-

পড়ায় মন নেই। তার ঝোঁক শরীরচর্চায়। গঙ্গা বেশীদূর নয় বাড়ি থেকে। সেখানে সাঁতার কাটে, স্কুলের পরে কোথায় যেন ব্যায়াম শিখতে যায়,—ডন, বৈঠক, ডাম্বেল, প্যারালাল বার, ভার তোলা, এইসব।

নরেশ বি এ. পাস করে গেল এবং কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে এক সওদাগরি অফিসে ঢুকে পড়ল। হরেন স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি, কাজ পেল কাছাকাছি একটা কারখানায় লেদ-মেশিনে। হাড়ভাঙা খাটনি, সামান্য মাইনে। তার থেকে দাদার সংসারে কিছু দিতে হয়, বাকী যা থাকে তা দিয়ে পেস্তা বাদাম দূরে থাক, ছোলা ভেজা আদার কুচিও জোটে না।

নরেশের অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, কিন্তু নিজের চেয়ে 'হরেনটার' জন্যেই তার বেশী ভাবনা। একদিন এক মতলব এল মাথায়।

অফিসে যেতে আসতে দেখত, একপাল উঠতি বয়সী ছোকরা কোনো একটা বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, বিড়ি টানে, মেয়েরা যখন স্কুলে যায়, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, এমন দু-চারটা মন্তব্য ছুঁড়ে মারে, যা শ্রাব্য নয়। ছেলেগুলো প্রায় সবই নরেশের চেনা। কেউ কেউ স্কুলে যায়, তবে বেশীর ভাগই ওপাট চুকিয়ে বসে আছে, করবার কিছু নেই। যাঁর বাড়ি, তিনি একজন বুড়ো ভদ্রলোক। এক সময়ে চাকরি-বাকরি করতেন, রিটায়ার করে ঐ বাড়িটা করেছেন —ছেলেগুলোর উপর স্বভাবতই খুব বিরক্ত, কিন্তু ওদের ঘাঁটাতে সাহস করেন না। পাড়ার মধ্যে তাঁর আরেক খণ্ড জমি আছে। ছেলেবেলায় নরেশরা সেখানে খেলাধুলা করত, কিন্তু এখন খালি।

নরেশ একদিন দেখা করল ভদ্রলোকের সঙ্গে এবং প্রস্তাব দিল, ঐ জমিটুকু যদি তিনি দেন, নরেশ এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘুরে কিছু চাঁদা আদায় করে ওখানে একটা ছোটখাটো জিমন্যাসিয়াম বা ব্যায়ামাগার গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য, পাড়ার ঐ বখাটে নিষ্কর্মা ছেলেগুলোকে ওখানে নিয়ে ভেড়ানো। ওসব নিয়ে থাকলে হয়তো মতিগতিটা কিছু ফিরতে পারে। অন্ততঃ পুরোপুরি বয়ে যাবে না।

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন। দান নয়, আপাততঃ কিছু নেবেন না, পরে জিমন্যাসিয়াম যদি দাঁড়িয়ে যায়, তখন একটা ভাড়া ঠিক করতে হবে।

চাঁদা কিছু কিছু উঠতে লাগল। নরেশের একটা সুনাম ছিল পাড়ায়, হরেনের পেশীবহুল দেহ এবং ব্যায়াম-নিষ্ঠা অনেকে প্রশংসার চোখে দেখত। ছেলে জুটতে দেরি হল না। নাম-মাত্র ফী, অবস্থা বুঝে তাও সকলকে দিতে হয় না।

এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিলেন ও-পাড়ার ভবানীবাবু। মোটামুটি ভালো চাকরি করেন। থাকেন বেশ স্টাইলে। নিজের বাড়ি। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়েটির নাম শর্বরী। তাকে দেখা যায়, এবেলা ওবেলা পোষাক বদলাচ্ছে। বাবার সবচেয়ে আদরের সন্তান। নরেশ তাকে চিনত।

সেই পরিচয়েই দেখা করল তার বাবার সঙ্গে। তিনি খুব খুশি হলেন ওদের নতুন প্রচেষ্টার কথা শুনে। এককালীন কিছু ডোনেশন এবং মাসিক

চাঁদার ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

জিমন্যাসিয়াম চালু হল। হরেনও বিপুল উৎসাহে কাজে লেগে গেল। ট্রেনিং-এর দিকটা তার, নরেশের হাতে রইল আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারগুলো।

ভবানীবাবু মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতেন। একদিন শোনা গেল, তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। কিছুই রেখে যেতে পারেননি। চারদিকে দেনা, বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা।

শর্বরী সবে কলেজে ঢুকেছে। ভাই-বোন দুটিই স্কুলে। তার মা বরাবরই অতি শান্ত, নিরীহ, ভালোমানুষ। এতদিন কর্তা ছিলেন, কিছু বুঝতে পারেননি। এবার চোখে অন্ধকার দেখলেন। মেয়েকে কলেজ ছেড়ে রোজগারের ধান্দায় নামতে হল। কিন্তু চাকরি অত সহজ নয়। চেহারা ভালো, গান জানে। কার পরামর্শে সিনেমার দিকে ঝুঁকল শর্বরী। সেখানেও বিশেষ সুবিধা হল না। একমাত্র সম্বল কখনো ক্বচিৎ শখের নাটকে দুটো একটা পার্ট। তাতে আর কি হয়?

শর্বরীর মুখ-চোখ ভালো, লম্বা-চওড়া আছে, গড়নও মন্দ নয়, কিন্তু শরীরটা একটু থলথলে, ইংরাজীতে বলে ফ্ল্যাবি (**flabby**), আঁটসাট নয়, সিনেমা-থিয়েটারে যেটা দরকার। ছেলেবেলা থেকে বেশী দুধ, ঘি, রাবড়ির জের হয়তো। ঐ ত্রুটিটুকু যদি না থাকত, সে অনায়াসে নায়িকার চান্স্ পেয়ে যেত। অন্তত শর্বরীর তাই ধারণা।

নরেশদের আখড়া ছিল খোলা জায়গায়। চারদিকে একটা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু উপরে কোনো আচ্ছাদন দিতে পারেনি। পাশে একটা টালির চালা ছিল—অফিসও বটে, বৃষ্টির সময় মাথা বাঁচাবার জায়গাও বটে।

রবিবার ব্যায়াম হত না। একদিন সকালের দিকে দু' বন্ধুতে মিলে কথাবার্তা বলছিল। শর্বরী এসে হাজির তার বেঁটে ছাত্রীটি নিয়ে। ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পাশের পাড়ার মেয়ে হলেও, এমন একটি আধুনিকার ছাপ ছিল তার চেহারায়, পোষাকে এবং আদব-কায়দায়, যাতে ওরা ঠিক অভ্যস্ত নয়। বসতে বলতেই ভুলে গেল এবং নিজেরাও দাঁড়িয়ে রইল। ফালতু চেয়ার ছিল একখানা। শর্বরী নিজেই সেটি দখল করে ওদের বসতে বলল এবং কোনোরকম ভূমিকা না করে বলল, 'আচ্ছা, আপনারা একটা মেয়েদের সেক্শন্ খোলেন না কেন?'

'মেয়েদের!' আকাশ থেকে পড়ল দুই বন্ধু।

'মেয়েদেরও তো ফিজিক্যাল একসারসাইজের দরকার আছে। শরীর ভালো থাকে, গড়নও ভালো হয়।'

'সে তো নিশ্চয়ই।' সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল নরেশ, 'কিন্তু আমাদের এখানে সে ব্যবস্থা নেই।'

'ব্যবস্থা করলেই হয়। সন্ধ্যার পর ছেলেদের শিফট্ একটু পিছিয়ে দিয়ে একটা ব্যাচ মেয়ে নিতে পারেন।'

'সন্ধ্যার পর কি মেয়েদের এখানে আসবার সুবিধে হবে ? বাড়ির লোকেরা হয়তো পাঠাতে আপত্তি করবেন।'

'তাহলে সকালে করুন।'

'আচ্ছা, আপনার প্রস্তাবটা আমরা ভেবে দেখবো।'

হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করল শর্বরী। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনারা তো এই লাইনে এক্সপার্ট। দেখুন তো, একসারসাইজ করলে আমার কোনো উপকার হবে কিনা। মানে এই…' বলে, দেহের ঊর্ধ্বাংশ থেকে শাড়ির আঁচলটা নামিয়ে ফেলল। শুধু ব্লাউজ ঢাকা বাস্ট-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমি কি চাইছি বুঝতে পারছেন তো ? ফালতু ফ্যাট-ট্যাটগুলো কমিয়ে ফেলতে হবে।' তারপরে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বলল, 'এ দিকটায় দেখুন।'

ওরা কিছু বলল না। নরেশ একবার আড়চোখে তাকাল বন্ধুর দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠল। দুটো নিষ্পলক ক্ষুধার্ত চোখ সামনের ঐ যৌবনপুষ্ট প্রায়-অসংবৃত দেহটাকে যেন গিলে খেতে চাইছে।

শর্বরী শাড়িটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার সেই চেয়ারটাতে বসে পড়ে বলল, 'ব্যাপার কি জানেন ? আমি সিনেমায় নামতে চাই। চান্স পাচ্ছি না। ওরা বলছে, আপনার ফিগার ভালো, কিন্তু আরো শ্লিম্ হতে হবে। কি করে শ্লিম হওয়া যায় বলুন তো ? খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছি। তাতে আবার দুর্বল বোধ করি। মাথা ঘোরে, একটু হাঁটা-চলা করলে হাঁফ ধরে।'

নরেশ বলল, 'দেখুন এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে শুনেছি কোনো কোনো জিমন্যাসিয়ামে মেয়েদের ব্যায়াম শেখাবার আলাদা বন্দোবস্ত আছে। চান তো খবর নিতে পারি।'

'দূরে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। মা'র শরীরটা খারাপ। আমাকে কিছুটা সংসার দেখতে হয়। আপনাদের এটা একেবারে বাড়ির খুব কাছে ছিল। তাই ভাবছিলাম…আচ্ছা, নমস্কার।'

শর্বরীকে যতক্ষণ দেখা গেল হরেন সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'খাসা দেখতে হয়েছে মেয়েটা ; মাইরি বলছি, এরকম একখানা ফিগার খুব কম চোখে পড়ে। সামান্য একটু ঝরে যাওয়া দরকার। তারপর যা দাঁড়াবে…'

বাকীটা আর সম্পূর্ণ করল না। চোখ-মুখের ভঙ্গি আর মুখে একটা শব্দ করে বুঝিয়ে দিল।

নরেশ কি একটা হিসাব দেখছিল, সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ নিজের মনে যেন খানিকটা বোঝাপড়া করে নিয়ে হরেন আবার বলল, 'দ্যাখ, কথাটা কিন্তু ও মন্দ বলেনি। মেয়েদের একটা ব্রাঞ্চ খুললে হয়। এদিকে আজকাল অনেকের ঝোঁক পড়েছে। ছেলেগুলো যেমন প্রায় সব শালা 'ফিরি', একটা পয়সা ছোঁয়াবার নাম-গন্ধ নেই, আমাদেরই যেন কেতাত্থ করতে এসেছে। মেয়ে যদি নেওয়া যায় একেবারে শুকনো হবে না, ওরা কিছু কিছু দেবে।…বলি, শুনতে পাচ্ছিস, না অজ্ঞান হয়ে গেলি ? সত্যি, যা একখানা দেখিয়ে গেল মাইরী…' বলে, মুখে

চকচক করে আচার খাবার মতো আওয়াজ করল।

নরেশ খাতা থেকে মাথা তুলে বলল, 'একটা কথা বলবো।'

'কী, বল না?'

'ও সব মতলব ছাড়ো।'

'কী মতলব?'

নরেশ সে কথার জবাব দিল না।

হঠাৎ একদিন নরেশের কানে এল, হরেন শর্বরীদের বাড়ি যাতায়াত করছে। শুনে সে একেবারে থ হয়ে গেল। তার সেই চোখদুটোর কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করল, ওর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এটা বন্ধ করা। তাকে একবার জানায়নি পর্যন্ত রাস্‌কেলটা! লুকিয়ে গোপনে গিয়ে উঠেছে! পরক্ষণেই মনে হল, হরেন যদি তার কথা না শোনে? সে বন্ধু মাত্র, অভিভাবক নয়। সে বাধা দেবার কে? কিন্তু এ যুক্তি টিকল না। শর্বরীকে যেমন করে হোক ঐ বদমাসটার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

তোমার কিসের গরজ? শর্বরী তোমার কে? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছিল নরেশ জানা। স্পষ্ট উত্তর পায়নি। কিন্তু অন্তরের নিভৃতে শর্বরীর মুখখানা বারংবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। নিজের অজ্ঞাতে এই মেয়েটিকে ঘিরে কখন যে একটি রঙিন ছোপ লেগেছিল তার মনের কোণে, হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল।

সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকে সে অনেক ভেবেছে শর্বরীর জন্যে। সিনেমায় ঢুকলে নষ্ট হয়ে যাবে মেয়েটা। সেই অধঃপাতের পথেই তো পা দিয়েছে। তা না হলে নিজেকে অমন করে বে-আব্রু করে দেখাতে পারে দুজন যুবকের সামনে? না, তার মধ্যে কোনো খারাপ ইঙ্গিত ছিল না। তাদের প্রলুব্ধ করবার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করেনি। এ শুধু শালীনতার অভাব। অবস্থা বৈগুণ্যে যে পরিবেশে গিয়ে পড়েছে, যে সংসর্গে ঘোরাফেরা করছে, সিনেমায় নামবার যে উদগ্র আকাঙ্খা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে, সব মিলে একটি ভদ্রঘরের মেয়ের সে সহজ সম্ভ্রমবোধ তাকে টিকতে দিচ্ছে না, আঘাতে আঘাতে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এখনো হয়তো বাঁচানো যায়।

জানা-শুনো যত জায়গা আছে, শর্বরীর জন্যে একটা ভদ্রগোছের চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা করে চলেছিল নরেশ। কোনোরকমে একটা সংস্থান। অবশ্য তাকে কিছুই জানায়নি। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, খোঁজ পেলে তখন যাবে তার মায়ের কাছে। এমন সময় এল ঐ খবর, হরেনের গোপন অভিযান।

তারপর আরো খবর এল। ঐ পাড়ার একটি ছেলে আসত তাদের আখড়ায়। সে-ই নিয়ে এল। শর্বরীর মা নরেশকে একা ডেকে নিয়ে গোপনে জানাতে বলে দিয়েছেন, হরেন শর্বরীকে তাদের বাড়িতে গিয়ে ব্যায়াম শেখাচ্ছে, এটা তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। পাড়াতেও এই নিয়ে নানারকম কানাঘুষা চলছে। মেয়েটা সে সব গ্রাহ্য করে না, বড্ড একগুঁয়ে, তিনি বড় ভয়ে ভয়ে আছেন। কী যে ব্যায়াম শেখার ভূত চেপেছে ওর মাথায়! কী হবে এসব দিয়ে?

আরো জানিয়েছেন, হরেনকে তিনি মেয়ের অগোচরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে আমল দেয়নি। বলেছে, যারা ঘোঁট পাকাচ্ছে একবার শুধু তাদের নামগুলো আমাকে জানিয়ে দেবেন? তারপর আমি দেখে নেবো।

শুনে আরো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিধবা ভদ্রমহিলা।

নরেশ মনস্থির করে ফেলল, হরেনকে সে সোজাসুজি নিষেধ করে দেবে। সহজে না শুনতে চায়, শোনাতে হবে যেমন করে হোক। এ ধরনের ব্যায়ামের ব্যাপারটা বন্ধ করতেই হবে। তার জন্যে তাদের এতদিনের সম্পর্ক যদি শেষ হয়ে যায় তো হোক।

ছেলেটি তাকে বলেছিল সকালবেলা। হরেন তখন ছিল না। তার মিলএ মর্ণিং ডিউটি চলছিল। সন্ধ্যাবেলা এলেই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। ভিতরে ভিতরে নিজেকে সে তৈরী করে তুলল।

কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না নরেশ, শর্বরী হরেনটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন, সহ্য করছেই বা কেমন করে? একেবারে ছেলেমানুষ নয়। সে কি বুঝতে পারছে না তার এই ব্যায়াম শিক্ষকের (!) আসল মতলবটা কী? হঠাৎ তার মধ্যে এই পরোপকার-প্রবৃত্তি জেগে উঠল কেন? তবে কি বুঝে শুনেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে? কী পেল ওই মিস্ত্রীটার মধ্যে? শিক্ষা, সংস্কৃতি, সুরুচির বালাই নেই, আছে একটা পেশী-বহুল দেহ। ছেলেবেলা থেকে চর্চা করে করে শরীরটা যা বাগিয়েছে সত্যিই দেখবার মতো। তাই দেখেই ভুলল শর্বরী? হয়তো তাই ভোলে মেয়েরা। তাদের চোখে পুরুষের রূপ তার বাহুতে। সুন্দর পুরুষ বলতে তারা বোঝে সবল পুরুষ।

অথবা এও হতে পারে, মেয়েটা বড় কাঁচা। দেহে যৌবন এসে গেছে, মন এখন পিছনে পড়ে আছে। বুঝতে শেখেনি কে কী চোখে দেখছে তার দিকে। হয়তো অতিরিক্ত সরল। তা না হলে আঁচলটা ফস করে খুলে ফেলতে পারে? ওর সঙ্গে একবার দেখা করলে হয় না? আর কিছু নয়, শুধু একটু সজাগ, সচেতন করে দেওয়া। একটু সাবধান হতে বলা—সবাইকে অতটা বিশ্বাস করতে নেই। মানুষ চিনে চলা দরকার।

সন্ধ্যার কিছু আগেই শর্বরীদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল নরেশ। কড়া নাড়তেই শর্বরীর পরের যে ভাই সে এসে দরজা খুলল। নরেশ বলল, 'তোমার মাকে বল, আমার নাম নরেশ জানা, মাঝের পাড়া থেকে আসছি।'

বলতে হল না। তার গলা মা'র কানে গিয়েছিল। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। অত্যন্ত বিচলিত বলে মনে হল তাঁকে। বললেন, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম বাবা, ভগবানই তোমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কী হয়েছে?' উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করল নরেশ।

'যা ভয় করেছিলাম, তাই। তোমাকে তো আগেই সব জানিয়েছি। তোমার ওই বন্ধুটির চোখের দৃষ্টি ভালো নয়, আমি প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। মেয়েটাকে তো স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতটা পারা যায়, বলতে কিছু বাকী রাখিনি। ও শুনল না। তারপর…'

হঠাৎ ওদিকের একটা ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, বেরিয়ে এল শর্বরী। এক নজরে দেখেই নরেশ শিউরে উঠল।

এ কী! এতো প্রকৃতিস্থের চেহারা নয়!

একরাশ এলোচুল ফুটে উঠেছে, সারা কপালময় লেপটে গেছে কুমকুমের টিপ, চোখের কাজল লেগেছে গালে, বেশবাস আলুথালু, দুচোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'ও, এবার বুঝি আবার আপনি এসেছেন?'

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এবং তার মূলে রয়েছে হরেন, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কখন কোথায় কী করল সে, তার মোটামুটি বিবরণটা পাবার জন্যে নরেশ আবার শর্বরীর মায়ের দিকে তাকাল। তিনি যেখানে থেমে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আবার শুরু করতে যাবেন, তার আগেই দু-পা এগিয়ে এসে তর্জনী তুলে চিৎকার করে উঠল শর্বরী, 'কেন আপনি ওই জানোয়ারটাকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে একসারসাইজ করাবার জন্যে?'

'আমি পাঠিয়েছি!' গভীর বিস্ময়ে কথাগুলো কোনোরকমে আউড়ে গেল নরেশ, 'তাই বুঝি বলেছে সে?'

উত্তর দিলেন বিধবা, 'হ্যাঁ বাবা। তা না হলে আমরা তাকে ঢুকতে দিই? আমরা তোমাকে চিনি, তাকে তো চিনি না।'

'ওঁরও সড় আছে এর মধ্যে। এখন ন্যাকা সাজছেন।' তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যোগ করল শর্বরী।

'বিশ্বাস করুন,' আবেদনের সুরে বলল নরেশ, 'আমি কিছুই জানতাম না। আজই শুধু জেনেছি, আপনি যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন, তার কাছে।'

বলতে বলতে শর্বরীর মায়ের দিকে সে ফিরল। দৃঢ় স্বরে বলল, 'কিন্তু আমাকে যদি সব কথা খুলে বলেন, আমি অবশ্যই প্রতিকার করবো, বন্ধু বলে ছেড়ে দেবো না।'

'আর কী প্রতীকার করবে তুমি? এসো, আমার ঘরে এসো, বলছি।'

গোড়া থেকে হরেনের আচার-আচরণের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলেন মহিলাটি।

'প্রথম ক'দিন একসারসাইজের ফিগারগুলো একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজে দেখিয়ে দিত। শর্বরী অনুকরণ করত। ঠিক না হলে কোথায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে মুখে বলে এবং নিজের হাত-পায়ের সাহায্যে বুঝিয়ে দিত। কাছে যায়নি, বা ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেনি। ক'দিন যেতেই একটু একটু করে এগুতে লাগল। তেমন অশোভন কিছু নয়। হাতটা, পাটা, মাথা বা ঘাড়ের কাছটা ধরে ভুলগুলো শুধরে দেওয়া। মাঝে মঝে যে সীমা ছাড়িয়ে যেত না, তা নয়। শর্বরী কৌশলে এবং ভদ্রভাবে যতটা সম্ভব বাধা দিত—ব্যস, ব্যস। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে দেখুন না, আমি ঠিক করছি।

এইদিন বৈকালে এসে একটা নতুন 'একসারসাইজ' শেখাচ্ছিল। শুয়ে পড়ে একটা করে পা আস্তে আস্তে সোজা উপরে তোলা, আবার নামিয়ে আনা। এমন

কিছু শক্ত নয়। গোড়ালির কাছে আঁটা চুড়িদার পায়জামা পরে নিয়েছিল শর্বরী। তাতেই প্রথম আপত্তি তুলল হরেন। বলল, এসব এক্সারসাইজ খাটো জাঙ্গিয়া কিংবা সাঁতারের পোষাক পরে করতে হয়। পায়ের মাসল্ দেখে বুঝতে হবে ঠিকমতো হচ্ছে কি না।

শর্বরী সে কথায় কান দেয়নি। নিজে নিজেই করছিল। হরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ 'কিচ্ছু হচ্ছে না' বলে এগিয়ে গেল…'

শর্বরীর চিৎকার শুনে তার মা যখন রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, তখন সে চলে যাচ্ছে।

নরেশ নিঃশব্দে বসে শুনল। তারপর হঠাৎ ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে ভদ্রমহিলা আবার একটা নতুন বিপদের আশঙ্কা করে থাকবেন। পিছন থেকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলেন, 'এ নিয়ে তুমি কিছু করতে যেও না বাবা। কী লাভ হবে তাতে? শুধু কেলেঙ্কারিটা বাড়বে বৈ তো নয়।'

শর্বরী বোধহয় ততক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সেও ডাকল, 'শুনুন…'

নরেশ দূর থেকে শুনতে পেল, কিন্তু থামল না।

পরের ঘটনাগুলো আমার কাছে আর বিস্তারিতভাবে খুলে বলেনি নরেশ। শুধু সেই প্রথম উক্তির পুনরুক্তি করেছিল ঃ তাকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না স্যার, শুধু সেই চোখদুটো উপড়ে নিতে চেয়েছিলাম। হতভাগাটা মরে গেল।

আদালতে খুনই প্রমাণ হয়েছিল। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মধ্যে চিরকাল যা হয়ে আসছে, এও তাই—এ কথাটি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে ছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর। হাকিমও সেটা অবিশ্বাস করবার হেতু খুঁজে পাননি। তবে, চরম দণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারা ভোগের আদেশ দিয়েছিলেন।

জেল হবার কিছুদিন পরেই নরেশের প্রথম চিঠি যেখানা এল, সেটা শর্বরীর। তারপর ঘন ঘন আসতে লাগল। কি থাকত তার মধ্যে আমি জানি না। নরেশও আমাকে বলেনি। তবে চিঠি এসেছে খবর পেলেই সে যেমন করে আমার কাছে ছুটে আসত এবং চিঠিখানা হাতে পেয়েই তার মুখখানা যে রকম উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, তার থেকে বুঝতে পারি, ওইগুলোই ছিল তার ধরে দাঁড়াবার অবলম্বন। জেলের বাইরেকার যত নিন্দা, ঘৃণা অপমান, অপযশ আর ভিতরকার দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি, সব মুছে দিয়েছিল খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া রুলটানা কাগজের উপর কাঁচা হাতের ক'টি আঁচড়।

বছর দুই পরে চিঠির সংখ্যা কমে আসতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নরেশ আর তখন আমার কাছে আসত না, আসত চিঠিপত্রের সেরেস্তায়। প্রায় খোঁজ নিত তার কোনো চিঠি আছে কিনা।

যাবজ্জীবন দণ্ডের পুরো মেয়াদ কুড়ি বছর। মাসে মাসে কিছুটা করে মকুব করেন জেলকর্তৃপক্ষ। সেগুলো জুড়ে যখন চোদ্দ বছর পূর্ণ হয়, সরকারের

আদেশে প্রত্যেকেই ছাড়া পেয়ে যায়। অর্থাৎ মোটের ওপর এগারো-বারো বছরের বেশী কাউকে বড় একটা থাকতে হয় না। নরেশ ছাড়া পেল আরো অনেক আগে। স্বাধীনতা উপলক্ষে মোটা রকম রেমিশন অর্থাৎ মাপ পেয়েছিল কয়েদীরা।

বেরোবার সময় এমনিই কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শর্বরীর কোনো খবর পেয়েছ?'

'না, স্যার। অনেক দিন চিঠি-পত্তর লেখেনি। নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে আছে। তবে…' বলে, মাথা নীচু করে সলজ্জ মুখে বলল, 'সে আমাকে বার-বার কথা দিয়েছে। আশা করছি শীগগিরই আমরা আপনার পায়ের ধুলো নিতে আসবো।'

শীগগিরই এসেছিল। তবে 'আমরা' নয়, সে একা। আমার বাসায় এসে দেখা করেছিল। আসতেই জানতে চাইলাম, 'শর্বরী কই? কেমন আছে সে?'

'ভালোই আছে।' একটু শুষ্ক ম্লান হাসি হেসে বলল নরেশ।

'তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে, স্যার। তবে তার বাড়িতে নয়, সেখানে সে থাকে না। দেখা হল টালিগঞ্জের একটা স্টুডিওতে।'

'তারপর?'

'প্রথমটা আমাকে চিনতে পারল না, মানে চিনতে চাইল না। বুঝলাম, আমি হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়ায় বিব্রত বোধ করছে। চোখের ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে বলল, অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা ছবিতে চান্স্ পেয়েছি। এখুনি আমার প্রডিউসার এসে পড়বেন। আপনাকে দেখলে হয়তো…ওঁরা সবকিছু শুনেছেন কিনা।

আমি চলে আসছিলাম, ছুটতে ছুটতে এসে ধরল, আর শুনুন, আমার সেই চিঠিগুলো…

আমি আর দাঁড়ালাম না। আসতে আসতে একবার পিছন ফিরে দেখলাম, রূপে, স্বাস্থ্যে, সাজ-পোষাকের জলুসে ঝলমল করছে শর্বরী, কিন্তু তার দু' চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ভয়।

আমি জানতে চাইলাম, "চিঠিগুলো কি করেছ?"

'এই মাত্তর পুড়িয়ে ফেলে এলাম।'

সাদা-কালো

হরলালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বিশেষজ্ঞের বিষয় নিয়ে। তার মতে স্বাধীনতার পর সর্বত্রই স্পেশালিস্টের হিড়িক পড়ে গেছে।

আমি বললাম, 'তাহলেও তোমাদের ডাক্তারির তুলনায় কিছু নয়। তোমাদের কেউ আছেন শুধু চামড়া নিয়ে, কেউ হার্ট, কেউ হাড়গোড়। এই ভাবে চললে বছর কয়েক পরে হয়তো দেখা যাবে ওদের মধ্যে আরো সাব-ডিভিশন হয়ে

গেছে। দাঁতের ডাক্তাররা দু-দলে ভাগ হয়ে পড়েছেন। একদল দেখছেন ওপর পাটি, আরেক দল নীচের।'

'তা মন্দ বলনি। তবে, আমরা যারা মফস্বলে আছি, তাদের স্পেশালিস্ট হলে চলে না। আমাশা থেকে দাদ, আর ফোড়াকাটা থেকে নাড়িকাটা সবই এক হাতে চালাতে হয়।'

'সত্যি, এই ক'দিনে যা দেখলাম, তোমার এই চেম্বারটি একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বিশেষ। রোগের চেয়ে রুগীগুলো আরো বিচিত্র। শুনেছি 'বনফুল'-এর নভেলে যে অত বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের ভিড়, তার মধ্যে বেশ একটা দল প্রথম দেখা দিয়েছিল 'বলাই মুখুজ্যে'র ডাক্তারখানায়। সেখান থেকে সোজা সাহিত্যের দরবারে চলে গেছে। কেমন করে, অনেক সময়ে তিনি নিজেও তা জানতে পারেননি।'

'বলাই মুখুজ্যের মধ্যে একটি 'বনফুল' আছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। আমি যে শুধু ডাক্তার। এই কলমটা কেবল প্রেসক্রিপশনই লিখতে পারে, আর কোনো বিদ্যে নেই। তাই তো তোমাকে এতদিন ধরে আসতে বলছি। তোমার একটি তৃতীয় চক্ষু আছে। সেটি যদি ক'দিন খুলে রাখো, আমার এই চেম্বার থেকে বেশ কিছু খোরাক পেয়ে যাবে।'

ডাক্তার-বন্ধু আমার সাহিত্যের অনুরাগী। যদিও জানি, তার মূলে রয়েছে দুটো জিনিষ—আমার প্রতি তার অনুরাগ এবং আমার লেখার সম্বন্ধে তার অজ্ঞতা বা ভাসা-ভাসা জ্ঞান, তবু তার এই স্তুতিটুকু নিঃশব্দে গ্রহণ করলাম এবং মনে মনে খুশি হলাম।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ছোট মফস্বল শহর। কাছেই কোনো একটা ডোবা কিংবা খানাখন্দ থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। রাত বেশী হয়নি। তবু এরই মধ্যে রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এ সময়ে রুগী-পত্রের সম্ভাবনা খুবই কম। হরলাল আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের পিঠে নিজেকে খানিকটা ছড়িয়ে দিল। স্বাধীনতার পর আমরা কোন্ দিকে চলেছি, কী পেয়েছি আর কী পাইনি, সেইসব পুরনো প্রসঙ্গ, যা দিয়ে আমাদের সন্ধ্যালাপ শুরু হয়েছিল, তাতেই ফিরে গেল। দু-একটা কি কথা হতেই দরজার বাইরে ছাতা বন্ধ করবার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে জনৈকের প্রবেশ।

হরলাল সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাল, 'এই যে আসুন মিস্টার বর্ধন।'

ভদ্রলোকের দিকে ফিরে প্রথমেই আমার নজর পড়ল তাঁর মাথায়। একরাশ ধবধবে সাদা চুল, চারদিকে ঝুলছে, অনেকটা টুপির মতো। একটু বেঁটে, কিন্তু বেশ মজবুত চেহারা, মুখখানা ভারী এবং আঁটসাঁট, শরীরের কোথাও কোনো টসকানোর লক্ষণ নেই। দেহের সঙ্গে মাথাটা একেবারে বেমানান। আমার ঠিক পাশের চেয়ারটায় বসে হরলালকে বললেন, 'এই বুঝি আপনার সেই সাহিত্যিক বন্ধু?'

'হ্যাঁ, ওর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি। সেই কবে থেকে আসবো-

আসবো করছে, অ্যাদ্দিনে ফুরসত হল।'

মিস্টার বর্ধন আমার দিকে ফিরে নমস্কার করে বললেন, 'আমার মাথাটা দেখছেন তো? দেখুন। অনেকেই দেখে। আপনি তো আরো দেখবেন। লেখক মানুষ।'

অনেক দিন আগে, তখন স্কুলে পড়ি, আমাদের গ্রামে 'মেবার পতন' অভিনয় দেখেছিলাম। বিধুকাকা সেজেছিলেন গোবিন্দ সিংহ। অনেকটা এঁর মতো দেখতে। তুলোর চুল এবং পাটের দাড়ি পরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলেছিলেন, গোবিন্দ সিংহ সন্ধি জানে না, রাণা। সেই দৃশ্যটা হঠাৎ চোখের উপর ভেসে উঠল। মনে হল, সেই বিধুকাকাই যেন দাড়িটা কোথাও খুলে রেখে শুধু চুল পরে হরলালের চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, ওটা পরচুলা নয় তো?'

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'এ রকম সন্দেহ কিন্তু কেউ করেনি। বরং কলকাতায় বাস-এ যাতায়াত করতে গিয়ে দেখেছি, লেডিস সীটের আধখানা খালি থাকলে, বালি অর্ধেকটা যিনি জুড়ে আছেন—বেশীর ভাগ তরুণী—মাথার দিকে নজর পড়লেই ডেকে বসতে বলেন। একবার একজনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, থাক না, আপনার অসুবিধে হবে। তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, না, না, অসুবিধে কিসের। আপনি বুড়োমানুষ, কষ্ট হচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ আধ-ডজন আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বুড়ো। কিন্তু তাদের তো এই বস্তুটি নেই।'

মাথার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, তারপর যোগ করলেন, 'সত্যি' আমার এই চুলগুলো একটি পরম সম্পদ। তবে হ্যাঁ,' এবার আবার আমার দিকে ফিরলেন, 'একদিক দিয়ে দেখলে একে পরচুলা বলতে পারেন। এটা আমার নিজস্ব নয়, পরের দান।'

'কি রকম?'

প্রশ্নটা আমার, কিন্তু উত্তরের জন্যে হরলাল এবং আমি দু'জনেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলাম।

মিস্টার বর্ধন বললেন, 'ওটা পেয়েছি জেল থেকে। না-না, যা ভাবছেন তা নয়। ডাক্তারবাবু সাক্ষী আছেন। নোট-জাল বা তহবিল তছরুপ করিনি, স্বদেশী ডাকাতি কিংবা পলিটিক্যাল খুনীও ছিলাম না। ঐসব কর্ম যাঁরা করেছেন, প্রায় সারা জীবন ধরে তাঁদের আগলে রাখতে হয়েছে। কখন কোন্‌টি আবার সেই অর্গল ভেঙে উধাও হন, এই ভাবনায় রাতের ঘুম নামক জিনিসটির সঙ্গে খুব বেশী যোগ রাখতে পারিনি। এটা বোধহয় তারই ফল।'

হরলাল পরিচয় করিয়ে দিল, যদিও তার প্রয়োজন ছিল না, 'মিস্টার বর্ধন একজন পেনসনধারী জেল-অফিসার। **Retired** কথাটা পছন্দ করেন না, বলেন **re-tyred**, অর্থাৎ মোটর এখনো পুরোপুরি সচল, শুধু টায়ার ক'খানা পালটাতে

হয়েছে। এখান থেকে মাইলটাক দূরে ফাঁকা জায়গায় কয়েক একর জমি নিয়ে বাড়ি করেছেন, তার সঙ্গে কৃষি-ফার্ম আর পোলট্রি। চাষবাস, হাঁস-মুরগী নিয়েই আছেন।'

'শুধু আছি নয়, বেশ আছি,' যোগ করলেন মিস্টার বর্ধন, 'সে যাকগে। আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, আমার চুলে আটকে যেটা মাঝ-পথে থেমে গেল, এবার শুরু করুন।'

হরলাল বলল; 'সে এমন কিছু নয়। তার চেয়ে আপনার কথা বলুন। আপনার জীবনের কতসব আশ্চর্য ঘটনা। আমার বন্ধুর কাজে লাগবে।'

বর্ধন বললেন, 'স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে কি যেন বলছিলেন আপনারা ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'স্বাধীনতার ঠিক পরেই চারদিকটা কেমন বদলে গেল এইসব, আজকের দিনে যেটা নেহাত স্টক-সাবজেক্ট, পুরনো কথা। তবে আপনি কী দেখেছেন আপনার জেলখানায়, কী ধরনের পরিবর্তন, সেটা যদি বলেন, আমরা ইণ্টারেস্ট নিয়ে শুনবো। আমাদের কাছে তার সবটাই নতুন।'

'পরিবর্তন ? হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈকি !' একটু ভেবে নিয়ে বললেন মিস্টার বর্ধন, 'জেলের বাইরে যেমন দেখছেন, অনেকটা তারই মতো মামুলি ব্যাপার। তার মধ্যে তেমন রস পাবেন না। স্বাধীনতা আসবার ঠিক পরেই, অনেকটা তার ফলেও বলা যেতে পারে, আমাকে বেশ খানিকটা ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল। সে-গল্প বরং শোনাতে পারি। হয়তো নেহাত মন্দ লাগবে না।'

আমি একটু গুছিয়ে বসে নিয়ে বললাম, 'শুরু করুন।'

হরলাল চাকরকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করল।

মিস্টার বর্ধন বললেন, 'আমার একটা পরিচয় আপনারা জানেন না। একদিক দিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড সিন্‌হা, জগদীশ বোসের সগোত্র। ওঁরা যেমন সকলেই প্রথম ভারতীয়—একজন নোবেল প্রাইজ উইনার, একজন পিয়ার, আর একজন এফ. আর. এস., আমিও তেমনি '—' সেণ্ট্রাল জেলের ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান জেলার।'

'তাই নাকি ! এ তো জানতাম না। ওখানে কি বরাবর সাহেব জেলার থাকতেন ?'

'হ্যাঁ, বরাবর। অথচ জেলারের যিনি উপরওয়ালা, অর্থাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁর পোস্টে অনেক ইণ্ডিয়ান কাজ করে গেছেন।'

'এর কারণ কী ?'

'কারণ বোধহয় এই, ও-জেলে প্রায়ই কিছু সাদা কয়েদী থাকত। কয়েদী হলেও তাদের কোনো কালো চামড়ার তাঁবেদারি না সইতে হয়, এই উদ্দেশ্যে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ জেলারের পোস্টটা সাদার জন্যে রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল। ওয়ার্ডার, মানে ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে পাহারা দেওয়া যাদের কাজ, তাদের মধ্যেও একটা সাদা দল ছিল। তাদের বলা হত ইয়োরোপিয়ান ওয়ার্ডার, চলতি ভাষায় সার্জেণ্ট। তাদের ডিউটি পড়ত সাদা ওয়ার্ডে।

সাতচল্লিশ সালের ১৫ই আগস্টের পর ইয়োরোপিয়ান জেলারের সিংহাসন

টুটেল। আমি এসে 'প্রথম ভারতীয়' দলভুক্ত হলাম। সার্জেণ্টের দলটা তখনো রয়ে গেছে। তার মধ্যে যারা খাঁটি ইংরেজ—সবই ব্রিটিশ ফৌজ থেকে আমদানী—তাদের নিয়ে কোনো বেগ পেতে হয়নি। ভিতরে তাদের যা-ই থাক, বাইরের আচরণে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যার থেকে মনে হতে পারে, ইণ্ডিয়ান জেলারকে তার আগেকার সাদা মনিবের থেকে আলাদা করে দেখছে। ডিউটি বা সাধারণ ডিসিপ্লিন—কোনো জায়গায় কোনো ত্রুটি নেই।

মুশকিল হল একজনকে নিয়ে। তার নাম ডবলিউ. সি. জ্যাকসন। লোকটা বোধহয় দো-আঁশলা, যদিও চেহারায়, কাগজে-কলমে এবং তার নিজের উক্তি অনুসারে নির্ভেজাল সাহেব। ওদের মধ্যে বেশ কিছুবা সিনিয়র। তার মাথার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া এই কালো-আদমীটাকে সে যে বরদাস্ত করতে পারছে না, সেটা নানাভাবে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে লাগল। প্রকাশ্য কিংবা স্পষ্ট কোনো অবাধ্যতা বা বিরোধিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না। সবটাই ছোটখাটো ছ্যাঁচড়ামি, ইংরেজিতে যাকে বলে পিন্-প্রিক্স্, সেই জাতীয়।

সেই সময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন একজন আইরিশ। কাজেই আমার পোজিশনটা হল ঠিক মাটন-স্যাণ্ডউইচের মতো। উপরে সাদা, নীচে সাদা, মাঝখানে এই কৃষ্ণমূর্তি। বেশ হুঁশিয়ার হয়েই চলতে হচ্ছিল। তার আরো একটা কারণ, এই বেশী মাইনের সাহেব-মার্কা পোস্টে আমাকে এনে বসানোর ফলে আমার একদল বন্ধু রাইটার্স বিল্ডিংএর উঁচু মহলে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিলেন। তাঁদের কল্যাণে বড়কর্তারা বিশেষ নজর রাখছিলেন, আমি কি রকম চালাচ্ছি। দেশী সরকারের কাছে সাদা চামড়ার খাতির মোটে কমেনি, বরং কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পারি, ওঁরা আমার পিঠে একটা 'ট্যাকটলেস' ছাপ বসিয়ে সোজা উত্তর বাংলায় চালান করে দেবেন।

সেই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে আমাকে খুব ভেবেচিন্তে এগোতে হয়েছিল।

জেলখানার সবটাই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, একটিমাত্র গেট। তার গুরুত্ব কতখানি নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। ঐ গেট-কন্ট্রোলের ভার থাকত একজন সার্জেণ্টের হাতে। ওদের মধ্যে যারা সিনিয়র, তাদেরই ওখানে বসানো হত। জ্যাকসনের পালা পড়ত ঘন ঘন। গেটের কাজের সঙ্গে জেলারও নানাভাবে জড়িত। সেই সূত্রে রোজ দু-একবার জ্যাকসনকে আমার অফিসে আসতে হত।

একদিন এমনি কোনো প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। বেশ খানিকটা দেরি করে সে এল, যার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। এসে দাঁড়াল আমার টেবিলের গা ঘেঁষে, সাধারণতঃ যেটা দস্তুর নয়। সামনে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে হাত-পা নেড়ে এমন ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল, যেন সে আমার সমান স্তরের অফিসার। ঠিক এই রকম না হলেও, একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে আগেও দেখিয়েছে, ঐদিন সেটা বড় বেশী স্পষ্ট করে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল।

আমার সঙ্গে জ্যাকসনের ব্যবহারটা জেলের কর্মীদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা আমি জানতে পেরেছিলাম। উপর স্তরের কয়েদীরাও এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার সম্বন্ধে চাবি-

দিকে যে ধারণা জন্মাচ্ছে, সেটা আমার গৌরবের নয়। তার চেয়েও বড় কথা, জেলের ডিসিপ্লিনের পক্ষে মারাত্মক। জেলের শাসনযন্ত্রে জেলার হচ্ছে পিভট্, দেহযন্ত্রে যেমন মেরুদণ্ড। ওখানে যদি একবার কোনো দুর্বলতা দেখা দেয়, গোটা স্ট্রাকচারটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে, সময়মতো না সামলালে ভেঙেও পড়তে পারে।

জানেন তো, যাদের নিয়ে আমাদের রাজত্ব, তারা কেউ লক্ষ্মীছেলে নয়। ওখানকার যারা ইনমেট, অর্থাৎ পাঁচিলের ভিতরে যাদের আটকে রেখেছি, কথাটা শুধু তাদের সম্বন্ধে বলছি না, বাইরের ব্যারাকগুলোতে যারা থাকে, আমার সুবিশাল সিপাই-বাহিনী, ভাবনাটা তাদের নিয়েও কম নয়। সেখানেও শক্ত শিরদাঁড়ার প্রয়োজন।

এই ফাঁকে একটা কথা বলে নিই। মাঝে মাঝে দু-চারটে ইংরেজী শব্দ আপনাদের বরদাস্ত করতে হবে। বাংলা ভাষায় আমার দখল অতি সামান্য। তার মানে কিন্তু এ নয় যে, ইংরেজী ভাষা অনেকখানি দখল করে বসে আছি।

আমি বললাম, 'বেশ তো, খিচুড়ি ভাষায় যদি আপনার বেশী দখল থাকে, ওটাই চালিয়ে যান। বর্ষার রাতে মন্দ লাগবে না। যদ্দুর বুঝতে পারছি এর পর আসল খিচুড়িও এসে পড়তে পারে। একটু একটু যেন গন্ধ পাচ্ছি।'

'তাই নাকি?' হরলাল নাক টেনে গন্ধ নেবার চেষ্টা করল, 'কই, আমি তো পাচ্ছি না। লেখকদের একটা তৃতীয় নয়ন আছে জানতাম, একটু আগেই বল-ছিলাম, তৃতীয় নাসারন্ধ্র আছে, তা তো কখনো শুনিনি।'

'শোননি, এবার দ্যাখো। সন্দেহ থাকলে ভেতরে গিয়ে ভঞ্জন করে আসতে পার।'

'আমিও যেন পাচ্ছি।' নাকটা একটু উপরে তুলে খুশিখুশি গলায় বললেন ভদ্রলোক।

আমি ভরসা দিলাম, 'অতএব মা ভৈঃ! আপনি স্টার্ট করুন।'

মিস্টার বর্ধন ফিরে গেলেন তাঁর কাহিনীতে, 'কি বলছিলাম যেন? ও, হ্যাঁ। জেল-ডিসিপ্লিনের কথা আমাকে বিশেষ করে ভাবতে হয়েছিল। তখনি স্থির করলাম, লোকটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর কথার মাঝ-খানেই বললাম, জ্যাকসন্…'

'ইয়েস স্যার।'

'শুনেছি, তুমি আর্মিতে ছিলে?'

'দ্যাটস্ কারেক্ট্।'

'সেখানে নিশ্চয়ই ড্রিল শিখতে হয়েছিল?'

'হয়েছিল বৈকি! শুধু শিখতে কেন স্যার, কয়েক বছর আমাকে শেখাতেও হয়েছিল।'

'কিন্তু ড্রিলের যেটা প্রথম পাঠ—অফিসারের সামনে দাঁড়ানো, সেইটাই যেন তুমি ভুলে গেছ মনে হচ্ছে।'

অনেকটা অন্তরঙ্গ সুরে, তার সঙ্গে যেন গল্প করছি, এমনি ভাবেই শুরু

করেছিলাম। শেষের দিকে হয়তো গলাটা একটু অন্য রকম শুনিয়ে থাকবে।

জ্যাকসন হঠাৎ থমকে গেল! কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপরেই ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে সোজা হয়ে পুরো অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'আই অ্যাম্ সো স-রি!'

কয়েকদিন বেশ কাটল। জ্যাকসনের চালচলনে কোনো ত্রুটি নেই। পোষাক-পরিচ্ছদ ফিটফাট। আদব-কায়দা পুরোদস্তুর ঠিক। তবে, আমাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছিল। প্রয়োজন না হলে সামনে আসত না। তার পর আবার একদিন ধরতে হল।

প্রত্যহ ভোরবেলা ব্যারাক এবং সেলগুলোর তালা খোলবার ঠিক আগে জেলারকে একবার জেলের ভিতরে যেতে হয়। গেটের বাইরে রিজার্ভ ফোর্সের সশস্ত্র স্যালুট্ নেবার পর গেট-সেন্ট্রি বড় পাল্লা খুলে ধরবে এবং ঢোকামাত্র ডিউটিওয়ালা ইয়োরোপিয়ান ওয়ার্ডার যথারীতি স্যালুট করবে—এইটাই দস্তুর। সেদিন ওখানে ছিল জ্যাকসন। সে দেখলাম শুধু উঠে দাঁড়াল। মাথায় হেলমেট বা টুপি নেই। খালি মাথায় হাত তুলে স্যালুট করাটা রীতি নয়। তখন কেবল অ্যাটেনশনের কায়দায় দাঁড়িয়ে গোড়ালি দুটো মাটি থেকে একটু তুলে আবার নামিয়ে নিতে হয়। সেটুকু হয়তো করেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে সে অন্-ডিউটি, সুতরাং পুরো ইউনিফর্মে থাকবার কথা। মাথায় হেলমেট কিংবা অন্ততঃ একটা ফোরেজ্ ক্যাপ্ না-রাখবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না।

সেদিন কিছু না-বলেই ভিতরে চলে গেলাম। ফিরবার পথে তাকে দেখলাম না। সব সময়ে গেটে থাকবার কথা নয়, অফিসের অনেকের সঙ্গেও তার কাজ থাকে। যদিও তখন বিশেষ কেউ আসেনি, তবু হয়তো কোনো অজুহাতে কোথাও গিয়ে ঢুকে থাকবে।

পরদিনও তার গেট-ডিউটি এবং ঐ একই অবস্থায় দেখা হল। মাথা খালি, সুতরাং হাত দিয়ে স্যালুটের কথা ওঠে না। ঐ সময়ে আমার সঙ্গে কয়েকজন করে সিপাই-জমাদার থাকে। তাদের সামনে কিছু বলা যায় না। সুতরাং এবারেও চুপ করে যেতে হল।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অফিসে এসেই, ইউনিফর্মের স্টোরে যে ছোকরা কেরানীটি ছিল, তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'তোমার স্টকে হেলমেট্ আছে তো?'

'আছে স্যার।'

'একটা নিয়ে এসো।'

সে একটু অবাক হল, 'হেলমেট্ নিয়ে কী করবো আমি!'

আমি তাড়া দিলাম, 'তাড়াতাড়ি করো।'

হেলমেট্ আসতেই জ্যাকসনকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'দ্যাখো তো, এটা তোমাকে ফিট্ করে কিনা?'

ঘরে দুজন ডেপুটি জেলার অপেক্ষা করছিল, আর ঐ কেরানীটি তো ছিলই। সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগল। জ্যাকসনও হতবাক। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার তো হেলমেটের দরকার নেই, স্যার।

কিছুদিন আগেই পেয়েছি। ওটা বোধহয় অন্য কেউ চেয়ে থাকবে।'

বললাম, 'আমার কাছে কেউ চায়নি। সকলেরই রয়েছে দেখলাম, কিন্তু দুদিন ধরে লক্ষ্য করেছি, শুধু তোমার মাথাটাই খালি। ওটা তোমাদের ইউনিফর্ম। সকালবেলা অন্ততঃ মাথায় থাকা দরকার। কী বল ?'

ডেপুটি জেলারদের মুখে চাপা হাসি। কেরানীটি ছেলেমানুষ। সে বোধহয় হাসিটা আর চেপে রাখতে না পেরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু জ্যাকসন গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমি নীচু হয়ে কি একটা সই করছিলাম। চাউনিটা একটু উপরে তুলে দেখলাম, লাল মুখখানা আরো লাল হয়ে উঠেছে।

বললাম, 'আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পার। তোমার মতো একজন সিনিয়র ওয়ার্ডারকে এইসব ছোটখাটো ব্যাপার মনে করিয়ে দিতে হয় এটা খুবই দুঃখের বিষয়।'

'ওয়ার্ডার' শব্দটা ইচ্ছে করে ব্যবহার করলাম। জানতাম, যদিও ওদের সরকারী নাম ইয়োরোপিয়ান ওয়ার্ডার, ওটা ওরা পছন্দ করে না। কেন না, একজন সাধারণ সিপাইও ওয়ার্ডার।

জ্যাকসন হটে গেল। এর পরে আর মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করেনি। আমার ইণ্ডিয়ান স্টাফ বেজায় খুশি। আমার কিন্তু সন্দেহ রয়ে গেল, হটে যাওয়াটা তার পক্ষে সহজ নয়, এর জ্বালাও সে সহজে ভুলতে পারবে না।

মাস দুই পরে একদিন আমার বড়সাহেব আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে একখানা আষ্টে-পৃষ্ঠে গালার সীল-মারা সদ্য-খোলা খাম হাতে দিয়ে বললেন, 'হিয়াজ ইজ্ সাম্‌থিং ফর ইউ।'

ঘরে আর কেউ ছিল না। সুপার বললেন, 'বসুন। পড়তে সময় লাগবে।'

ভিতরকার বস্তুটা বের করে পড়লাম। একজন কয়েদীর জবানিতে লেখা বেনামা দরখাস্ত। পাঠানো হয়েছে কারাবিভাগের প্রধান, ইনসপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্-এর নামে। আগাগোড়া আমার শ্রাদ্ধ। হতভাগ্য কয়েদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে নতুন জেলার। তাদের খাবারের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, খাদ্য বলে যা দেওয়া হচ্ছে তা অখাদ্য। সামান্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা তারা এতদিন ভোগ করছিল, বেশীর ভাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সুপারের কাছে নালিশ করবার উপায় নেই। জেলার শাসিয়ে দিয়েছে, তাহলে আর কাউকে ঘরে ফিরে যেতে হবে না। আগে মারধর বলে কিছু ছিল না এখন কথায় কথায় ব্যাটন্। দুর্নীতিতে সারা জেল ছেয়ে গেছে। যারা পয়সা যোগাতে পারে তাদের সুখের অন্ত নেই। তারা খাটনির ধার ধারে না। খায়, দায়, ঘুরে বেড়ায় ! শুধু মাসের গোড়াতে জেলারকে কিছু দিতে পারলেই হল। সিপাইদের মধ্যে একদল দালাল রেখেছে জেলার। শাঁসালো কয়েদীদের চিঠি নিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাকা নিয়ে আসে। সার্জেণ্ট সাহেবরা গেট তালাসী করে সিপাইদের উর্দির ভিতর থেকে এমনিধারা দু-তিনখানা চিঠি ধরে

ফেলেছিল। জেলারের কাছে রিপোর্টও করেছিল। সে-সব ওখানেই চাপা পড়ে গেছে, বড়সাহেব পর্যন্ত পৌঁছয়নি···ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠাস বুনানী, পুরো দু-পাতা অভিযোগ। কিছু কিছু গ্রামারের ভুল আছে, কিন্তু টাইপ নিখুঁত।

শুধু কতকগুলো ভেগ্ অ্যালিগেশন নয়, শেষের দিকে একটা নাম-ধাম-ওয়ালা বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাকে বলে স্পেসিফিক্ ইন্‌স্ট্যান্স্।

মাস কয়েক আগে ইউ. পি.-র এক গদিহীন নবাব দশ বছরের সাজা নিয়ে জেলে এসেছিল। স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার। তার বেগমদের মধ্যে একটি ছিল বাঙালী এবং আধুনিকা। আশ্চর্য নয় যে, তার প্রতি নবাব সাহেবের টানটা ছিল একটু বিশেষ ধরনের, যার ফলে কলকাতার কোনো সাহেবপাড়ায় একখানা বাড়ি, একটি নতুন মডেলের বুইক, আর সেই সঙ্গে একপাল দাস-দাসীর মালিকানা তাকে লিখে দেওয়া হয়েছিল। নবাব প্রায়ই এসে সেখানে কিছুদিন করে কাটিয়ে যেত।

তরুণীটি রূপসী, সুতরাং ভক্তের অভাব ছিল না। তার মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে তার হয়তো একটু গভীর সম্পর্ক থেকে থাকবে। তারপর যা হয়ে থাকে। কে, কী অবস্থায় নবাবের নজরে পড়ে গিয়েছিল, সে-সব ডিটেল্‌স্ আমার জানা নেই। একটু মনে আছে যে নবাব দুজনকেই শেষ করতে চেয়েছিল, রিভলবার থেকে গুলিও ছুঁড়েছিল দুটো। একটি ফসকে যাওয়ায় বেগম বেঁচে গিয়েছিল, তার ভক্তটি রক্ষা পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে না গেলেও হাসপাতাল থেকে আর ফেরেনি।

এই নবাবটিকে সেসন্স্ কোর্ট 'ডিভিসন ওয়ান' অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কয়েদী করে জেলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোর্টের হাতে নেই। ওটা সরকারের এলাকা। যতদিন হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে শেষ সিন্ধান্ত না আসে, আমাদের কোর্টের অর্ডার মেনে চলতে হয়। সেই হিসেবে নবাব প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল।

বেনামা দরখাস্তে এই কেস্‌টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, এক মাস আগে সরকার থেকে হুকুম এসেছে যে, নবাবকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া হল। সে-চিঠি জেলার কোথায় গাপ করে দিয়েছে। নবাব এখনো ডিভিসন ওয়ান। পুরস্কারস্বরূপ একমাত্র জেলারের পকেটেই একটি হাজার টাকা পুরে দিয়েছে নবাবের লোক। চেলারাও বেশ কিছু পেয়ে গেছে।

দরখাস্তের শেষ ক'লাইনে গরীব কয়েদীর পক্ষ থেকে এই প্রার্থনা জানানো হয়েছে, ইনস্‌পেকটর জেনারেল বাহাদুর যেন খোদ এ-বিষয়ে তদন্ত করে যথা-বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

জেনারেল সাহেব অবিশ্যি তদন্তের ভারটা সুপারের ওপরে চাপিয়ে যত সত্বর সম্ভব সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সাহেব পাইপ টানছিলেন। দরখাস্তটা পড়া শেষ করে তাঁর দিকে তাকাতেই

বললেন, 'ঐ নবাব লোকটার কোনো অর্ডার কি এসেছে জানেন ?'

'যদ্দুর জানি আসেনি। এলে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়ত। তাছাড়া অ্যাডমিশন ব্র্যাঞ্চ থেকেও জানাত নিশ্চয়ই।'

'আমিও তো রোজকার ডাক দেখি। বিশেষ করে হেড-অফিস থেকে যে-সব চিঠি আসে, একবার চোখ বুলিয়ে নিই। ও লোকটাকে আমার মনে আছে। অর্ডার এলে খেয়াল থাকত। যাই হোক, আপনি একবার ভালো করে খোঁজ নিন।'

অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারো কাছে কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। গেট-ডিউটিতে দু-তিনজন সার্জেণ্টের পালা পড়ে। হেড-অফিস থেকে ডাক আসে লোক-মারফত। ওরাই সেগুলো বুঝে নেয়। তারপর একটা খাতায় চড়িয়ে ডাকবাবুকে দিয়ে দেয়। তাতে শুধু চিঠিগুলোর মাথায় যে নম্বর থাকে, তারই উল্লেখ করা হয়। ডাকবাবুর কাজ হল, সেগুলো মিলিয়ে নিয়ে সই দেওয়া, অর্থাৎ প্রাপ্তি-স্বীকার করা। সাধারণতঃ সব কটা নম্বরকে এক ব্র্যাকেটে জুড়ে তার পাশে একটা সই বসিয়ে দেয় ডাকবাবু।

ওখানকার সব ক'জন সার্জেণ্টকে আলাদা ভাবে ডেকে জানতে চাইলাম, নবাবের সম্পর্কে কোনো চিঠি ওরা বুঝে নিয়েছে কিনা? সবাই একই কথা বলল, চিঠি দেখবার তাদের সময় হয় না, শুধু নম্বরগুলো মিলিয়ে নেয়। ডাকবাবুকে অবশ্য সব চিঠি পড়তে হয়, রিসিট রেজিস্টারে তুলতে হয় এবং বিষয় অনুসারে বিভিন্ন ব্র্যাঞ্চে বা বিভাগে বিলি করতে হয়। তাকে ডেকে জানা গেল, এ রকম কোনো অর্ডার সে পায়নি। কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো অ্যাডমিশন্ ব্র্যাঞ্চের চার্জে। সেখানেও এ চিঠির কোনো হদিস মিলল না।

তখন আমরা হেড-অফিসের দ্বারস্থ হলাম। গত দেড়মাস দু' মাসের মধ্যে ডিভিসন-ওয়ান কনভিক্ট্ নবাব রিয়াজুদ্দিন খাঁ সম্পর্কে কোনো গভর্ণমেণ্টে অর্ডার তাঁরা পাঠিয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হল। ক'দিন পরেই জবাব এল, অমুক তারিখে সে-অর্ডার জেলখানায় পাঠানো হয়েছে। চিঠির নম্বর, তার একটা নকল এবং যে পিওন-বইতে চড়ে সেটি এসেছে, সবকিছু আনিয়ে দেখা গেল, নবাবকে সত্যিই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করবার যে-হুকুম দিয়েছেন সরকার, সে-হুকুম জেলখানায় পৌঁছেছে মাস দেড়েক আগে এবং সেটি যথারীতি সই করে গ্রহণ করেছে ডব্লিউ. সি. জ্যাকসন।

ঠোঁট কামড়ে যখন ভাবছি, এবার ব্যাটাকে বাগে পাওয়া গেছে, তখন সে এসে লম্বা স্যালুট করে, যে খাতায় লিখে ওরা ডাকবাবুকে চিঠি চালান করে, সেই খাতাটা আমাদের সামনে রাখল এবং দু-কদম পিছিয়ে গিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। জানতে চাইলাম, 'কী ব্যাপার ?'

সবিনয়ে উত্তর দিল, 'দয়া করে তেরো তারিখের এণ্ট্রিগুলো একবার দেখবেন স্যার।'

'কী আছে ?'

'দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

দেখলাম, অন্য সব নম্বরের সঙ্গে সেই নম্বরটিও বেশ পরিষ্কার ভাবে বসানো আছে। একেবারে গোড়ায় বা শেষে হলে মনে করা যেত 'আফটার-এন্ট্রি', মানে পরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে-রকম সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অনেকটা মাঝামাঝি জায়গায় তিনি দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন, এপাশে ওপাশে যেসব অঙ্ক পর পর সাজানো রয়েছে, তাদের সঙ্গে তার চেহারার কিছুমাত্র তফাত নেই। ডানদিকে সবটা জুড়ে এক মস্তবড় সেকেণ্ড ব্র্যাকেট এবং তার পাশে ডাকবাবুর সই ঃ বি. সি. পাইন।

'বি. সি' অক্ষর দুটোর আদিতে কি মানে ছিল, বিপিনচন্দ্র না ভবানীচরণ, বোধহয় কেউ বলতে পারবে না। অর্থাৎ পাইনের বাবা-মা তার যে নাম রেখে-ছিলেন, সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। জেলখানার লোকের মুখে মুখে যেটা ঘুরছে, সেটা জেলের দেওয়া। কোন্ রসিক ব্যক্তির শ্রীমুখ থেকে প্রথম বেরিয়ে-ছিল জানা নেই, তবে ও-রকম লাগসই নাম আর হতে পারে না। 'বোক্‌চন্দর'। কথাটার মধ্যে একটু গ্রাম্যতা দোষ আছে, তবু বলতে বাধা কী?

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। পাইনের বয়স পঞ্চাশ হতে চলল, কিন্তু নামের মহিমা সে বরাবর বজায় রেখেছে।

বি. সি.'র উপরওয়ালারা তার ওপরে খুশি থাকুন আর না থাকুন, মা-ষষ্ঠী তার উপরে অতিশয় প্রসন্ন। তার বেতন-বৃদ্ধি মাঝে মাঝে আটকে গেছে, কিন্তু নিয়মিত বংশবৃদ্ধি কখনো বন্ধ হয়নি। সংসার ও অফিস নিয়ে সে সদাবিব্রত। আমরাও তাকে নিয়ে কম বিব্রত ছিলাম না।

পাইন আসত সকলের আগে, যেত সকলের পরে। সারাক্ষণ ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। যে-যা বলছে, কিছুতে 'না' নেই। কারো সাতে-পাঁচে থাকে না। কারো কথায় 'রা' নেই। তাকে নিয়ে সারা অফিসে খিটখিট, সারাদিন তম্বিগম্বি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে 'বোকচন্দর'কে সবাই ভালোবাসত। পাইনের জন্যে ছোট-বড় সকলের মনেই কেমন একটা 'সফ্‌ট্ কর্ণার' ছিল।

খাতাখানা রেখে দিয়ে জ্যাকসনকে বিদায় করে দিলাম।

ডাকবাবুর ডাক পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিস ভেঙে পড়ল আমার ঘরে।

বললাম, 'নম্বরটা তো আপনি দেখেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পেয়েছেন চিঠি?'

'আজ্ঞে না, স্যার। দুদিন ধরে খুঁজছি, এরাও খুঁজেছেন…'

'এ সইটা তো আপনার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে?'

কোনো উত্তর নেই। আমি আরেকটু পরিষ্কার করে বললাম, 'আমাকে তো ধরে নিতে হবে, চিঠিটা আপনি পেয়েছেন।…কী বলেন?'

'আজ্ঞে, সই যখন করেছি…'

সিনিয়র ডেপুটি জেলার ধমকে উঠল, 'সইটা কি দেখে-শুনে মিলিয়ে নিয়ে

করেছিলে, না আন্দাজে মেরে দিয়েছ ?’

এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব এল না। পিছন থেকে কে যেন দাঁতে দাঁত চেপে ওব সেই জেলের দেওয়া নামটা উচ্চারণ করল।

দুদিনের সময় দিলাম পাইনকে। তার মধ্যে যদি চিঠিটা খুঁজে বের করতে না পাবে তাকে বড়সাহেবের কাছে হাজির করা হবে এবং তিনি যে লিখিত ভাবে কৈফিয়ত তলব করবার অর্ডার দেবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যে-কোনো একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলার মতো সাধারণ অপরাধ এটা নয়। অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ গভর্ণমেন্ট অর্ডার সময়মতো না পাবার ফলে একজন প্রভাবশালী কয়েদী অনেকদিন ধরে এমন কতগুলো অধিকার এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছে, যার পিছনে সরকারী অনুমোদন নেই। তার একটা আর্থিক দিকও আছে, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের যে লোকসান হয়েছে সেটাও বিবেচনা করতে হবে। তার সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, ঐ কয়েদী অথবা তার বাড়ির লোকজনের যোগসাজশে অর্ডারটাকে অসদুদ্দেশ্যে সরিয়ে কিংবা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

এমনি একটা ছোটখাটো বক্তৃতাও আমাকে দিতে হল, জিনিষটা যে কতখানি গুরুতর, বুঝিয়ে দেবার জন্যে। পাইন কিছু বুঝল বলে মনে হল না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটল। পাইনকে সাসপেণ্ড করবার অর্ডার দিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তার কৈফিয়তে সে বলেছিল অর্থাৎ সকলে মিলে তাকে দিয়ে বলিয়েছিল, ঐ চিঠিখানা সে পায়নি, গুড্ ফেইথে অর্থাৎ গেট-সার্জেণ্টের মতো একজন বিশ্বস্ত সহকর্মীর উপর আস্থা রেখে নম্বরগুলো মিলিয়ে না নিয়েই সই দিয়েছে। সুপার সেটা বিশ্বাস করেননি, অথবা মনে মনে সত্যি বলে জানলেও সন্তোষজনক কৈফিয়ত বলে গ্রহণ করতে পারেননি। চার্জসীটও তিনি নিজেই তৈরী করেছিলেন। তার মধ্যে সরকারী কাজে অবহেলা ইত্যাদির সঙ্গে ডিজ্‌অনেস্টির উল্লেখও ছিল। বেনাম দরখাস্তের প্রভাব বোধহয় তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

সেই নামহীন দরখাস্তখানার পিছনে যারই হাত থাক, তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে ঘায়েল করা। ঘটনাচক্রে সব আঘাতটা পড়ল গিয়ে বেচারা ডাকবাবুর মাথায়। সে একেবারে ভেঙে পড়ল। খবর পেলাম, তার বিশাল পরিবারে তখন থেকেই কান্নাকাটি এবং প্রায় অরন্ধনের পালা শুরু হয়ে গেছে।

সারা অফিসে একটা চাপা অসন্তোষ গুমরে উঠেছিল। প্রত্যেকের বিশ্বাস, পাইন আর যাই করুক, ঘুষ নিতে পারে না। ইচ্ছা থাকলেও তার সাহসে কুলোবে না। চিঠিটা সে পায়নি। কিংবা হয়তো তার টেবিল থেকে কেউ সরিয়ে ফেলেছে। তারপর সেটা নিয়ে নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। সে কাজ জ্যাক-সনের পক্ষেও সম্ভব। অর্ডার লোপাট করে শুধু তার নম্বরটা পৌঁছে দিয়েছে ‘বোকচন্দর’এর সেরেস্তায়।

আমার উপরে চাপ পড়ছিল, সাহেবকে বোঝাতে হবে, পাইনের একমাত্র অপরাধ তার নেগ্‌লিজেন্স, চিঠিপত্তর বুঝে না-নিয়ে সই দিয়েছে। তার জন্যে যে শাস্তি হয়, দিন। ডিজ্‌অনেস্ট সে নয়।

এদের কেমন করে বোঝাই যে, সাহেব আমার কথা শোনেননি। এর মধ্যে একটা বেনামা এসেই গোল বাধিয়েছে। গুরুতর গলদ ধরা পড়েছে তাঁর অফিসে। তাঁকেও তো উপরওয়ালার দরবারে মুখরক্ষা করতে হবে। হয়তো আরো একটা কথা ভাবছিলেন তিনি। তাঁর জেলারের গায়ে যে কাদা ছোঁড়া হয়েছে, তার খানিকটা তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গায়েও লেগেছে। লাঞ্ছনা-মুক্ত হতে হলে একটা কাউকে বলি দিতেই হবে। ঐ লোকটা যদি নিজে থেকে গলাটা বাড়িয়ে বসে থাকে, তিনি আর কী করতে পারেন?

আমিই বা কী করবো? পাইন এসে মাঝে মাঝে দাঁড়াত আমার কাছে। তার দৌড় ঐ পর্যন্ত। বলত না কিছু, শুধু দাঁড়িয়ে থাকত। ওকে দেখলেই আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠত সেই বেনামাটা, যার কথা কাউকে বলবার নয়। যদিও তার প্রতিটি বর্ণ মিথ্যা, তবু আমি এ লোকটার কাছে মাথা তুলতে পারতাম না। আই ফেল্‌ট্‌ ভেরী স্মল। মনে হত, ও যেন আমারই অপরাধের ফল ভোগ করতে যাচ্ছে। হি ইজ ওন্‌লী এ স্কেপ্‌গোট্‌।

বি. সি. পাইনের বলির আয়োজন যখন প্রায় শেষ, তখন এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল, আপনাদের শাস্ত্রে যাকে বলে 'ড্রামাটিক'।

রাত প্রায় দশটা। শুতে যাবার আগে খবরের কাগজখানা আর-একবার উল্‌টে পাল্‌টে দেখছিলাম। আরদালী এসে বলল, 'একজন মেমসাহেব এসেছে দেখা করতে।'

'মেমসাহেব! এত রাত্রে! কী চায়?'

'বলছে, খুব জরুরী দরকার।'

বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, ওপাশের একটা চেয়ারে সামনে খানিকটা ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। পরনে বিলিতি পোষাক। ডান হাতের কনুইটা হাতলে ঠেকিয়ে গাল রেখেছে মুঠোর উপর। নিবিষ্ট মনে কি যেন ভাবছে মনে হল। আমার চটির আওয়াজ টের পেল না। গলায় একটু শব্দ করতেই চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'গুড্‌ ইভনিং। বড় অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।'

গলার স্বরে বোঝা গেল তখনো সে বেশ অ্যাজিটেটেড্‌, ভিতরে বেশ একটা চাঞ্চল্য রয়েছে। আমি তাকে এগিয়ে এসে সামনের সোফাটায় বসতে বলে উলটো দিকের কৌচে বসলাম।

মেয়েটির বয়স বেশী নয়, বোধহয় পঁচিশের কিছু উপরে। মুখখানা শান্ত, ভদ্র, কিন্তু বড় পেল্‌, ফ্যাকাশে। রংটাও যেন বড় বেশী সাদা। আমি তার বক্তব্য শোনবার জন্যে মুখ তুললাম। তার হাতে একটা ব্যাগ ছিল, ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, অ্যাটাচি কেস্‌। সেটা খুলে একখানা লম্বা খাম আমার সামনের

টেবিলে রেখে বলল, 'এটা পৌঁছে দেবার জন্যেই আমার আসা। ব্যাপারটা খুব গোপন বলেই আমাকে একটু বেশী রাতের আশ্রয় নিতে হয়েছে।'

'কী এটা ?'

'দয়া করে পড়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

খামের মুখটা খোলা ছিল। ভিতর থেকে বেরোল একটা গোটা ফুলস্কেপ্—আগাগোড়া হাতে লেখা। চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম। একি! এ যে সেই বেনামা দরখাস্ত। হাতের লেখাটাও আমার চেনা।

পড়া থামিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি ?'

'আমি মিসেস জ্যাক্সন্।' শান্ত, ধীর কণ্ঠস্বর। একটু আগে যে চাঞ্চল্য ছিল, সেটা আর নেই।

সেই মুহূর্তে আমার মুখে আর কোনো কথা যোগাল না। হয়তো সেই হতভম্ব ভাবটা লক্ষ্য করে সে বলল, 'আপনি ভাবছেন, স্ত্রী হয়ে স্বামীর এতবড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছি কেন। আমি জানতে পেরেছি, আমারই মতো একজন গরীব কেরানী এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। তাকে সাস্পেণ্ড্ করা হয়েছে। খুব সম্ভব চাকরি চলে যাবে। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা খেতে পাবে না। অথচ সে একেবারে নির্দোষ। আমার মনে হল, এত বড় বিপদে তার পাশে আমার এসে দাঁড়ানো উচিত।'

জ্যাক্সন্ জেল-কোয়ার্টার্সে থাকে না। বাইরে কোথায় বাসা নিয়ে থাকে, বাড়ি-ভাড়া গভর্ণমেণ্ট দেয়। শুনেছিলাম, সে নিজে যাই হোক, স্ত্রীটি খাঁটি ইংরেজ। এই প্রসঙ্গে সে-কথা যে কেন মনে হল, আমার অন্তর্যামী হয়তো বলতে পারবেন, আমি পারবো না। শুধু মনে হওয়া নয়, একটা অবান্তর প্রশ্নও বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ইংরেজ না অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ?'

মেয়েটি যেন লজ্জিত হল, বোধহয় সেই সঙ্গে একটু ব্যথিত। চোখ নামিয়ে বলল, 'আমি ইংরেজ নই। অ্যাংলো হয়তো কিছুটা আছে, যেমন নামটা, এই জামা-কাপড়গুলো।···কোনো দূর পূর্ব-পুরুষের দেহে দু-এক ফোঁটা ইংলিশ ব্লাডও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবু, আমি ইণ্ডিয়ান। আমি আশা করবো, আপনি আমাকে সেই চোখেই দেখবেন।'

'মাপ করবেন', একটু কুণ্ঠার সুরে বললাম আমি, 'আমি অতটা কিছু ভেবে বলিনি, এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'না-না, আপনার কোনো দোষ নেই। ক'দিন আগে পর্যন্ত ঐ 'অ্যাংলো' কথাটাকে আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। মনে করেছি, পুরোপুরি রাজার জাত না হলেও আমরা তার জ্ঞাতি, কিঙ্গস্ম্যান্, হলোই বা বহুদূরের সম্পর্ক ; ইণ্ডিয়ানদের থেকে আমরা আলাদা। আজ যখন তার রাজত্ব গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল, তখন বুঝলাম, ওটা শুধু মায়া, শুধু মোহ। আসলে আপনার ঐ ডাকবাবুর সঙ্গে আমার কোনো তফাত নেই।'

আমি ওর আসল প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম। বললাম, 'আপনি যে এই কাগজটা

আমাকে দিতে এসেছেন, জ্যাক্‌সন্‌ জানে ?'

'না। ওর আজ নাইট ডিউটি। এখন হয়তো গেটেই রয়েছে। আমাকে লুকিয়ে আসতে হয়েছে।'

'কিন্তু জানতে তো পারবেই। তখন ?'

'তখন যা হয় হবে। আমি তার জন্য তৈরী। ছেলেটাকে মা'র কাছে রেখে এসেছি। ওর জন্যেই আমার ভর। নিজের জন্যে আমি ভাবি না।'

'ছেলেটি বুঝি আপনার···'

'হ্যাঁ, আমার আগের স্বামীর। সে মারা যাবার পর একে বিয়ে করেছি। জানেন, ঐ কাগজটা আমিই টাইপ করে দিয়েছিলাম। প্রথমটায় রাজী হইনি। ও ভয় দেখাল, না করলে আমার ছেলেকে গাপ করে দেবে। তখন বাধ্য হয়েই শুধু ছেলেটার জন্যে···' বলতে বলতে থেমে গেল। দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

আমি বললাম, 'আপনি এখনো ভেবে দেখুন মিসেস জ্যাক্‌সন্‌, এই অবস্থায় আপনার এতখানি বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে কিনা ?'

'আমি সব ভেবে দেখেছি, মিস্টার জেলার। দেখে মনস্থির করেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি শুধু আমাকে কথা দিন, সেই নির্দোষ লোকটিকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দেবেন।'

'এর পরে তার আর কোনো বিপদ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আপনার স্বামীর চাকরি চলে যেতে পারে।'

'গেলে আর কী করবো ?'

মৃদুস্বরে এই কটি কথা বলেই সে উঠে পড়ল। আমি তাকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম এবং সেখানে দাঁড়িয়েই দেখলাম, রাস্তায় পড়ে সে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, তারপর দ্রুতপায়ে কুয়াশা-ঢাকা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্দুক

সুকুমারের চিঠি। লিখেছে জেল থেকে। চিঠির গায়ে তার ছাপ আছে, কিন্তু সুরে কোথাও ছোঁয়া লাগেনি। সেই আদি ও অকৃত্রিম সুকুমার।

'শুনে সুখী হবে, তোমার ভবিষ্যৎ-বাণী শেষপর্যন্ত ফলে গেছে। এক হতভাগাকে সত্যিই চাপা দিয়ে ফেলেছি। প্রাণটা অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে যায়নি। আমি যেটুকু বাকী রেখেছিলাম হাসপাতালের ডাক্তার সেটা তৎক্ষণাৎ পূরণ করে দিয়েছে। তবু এতবড় একটা কাজের প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে শ্রীঘরটা একা আমারই প্রাপ্য।

তুমি ভাবছ, সুকুমারটা কি পাষণ্ড! কী করবো বল ? কেউ যদি পণ করে বসে সে মরবে, আর ঠিক ঐ সময়ে আমারই হাতে মরবে, আমি তাকে বাঁচাই কেমন করে ? তবে একটা সান্ত্বনা আছে। শুনেছি, অপঘাতে মরলে পুনর্জন্ম

নেই। অর্থাৎ লোকটাকে মেরে বাঁচিয়ে দিলাম। আবার এসে র‍্যাসন-ব্যাগ হাতে করে লাইন দিতে হবে না।

কেমন আছি? তা, মন্দ কী? খাচ্ছি-দাচ্ছি নামমাত্তর কাজকর্ম করছি। দুটি একটি বন্ধুও জুটেছে। তার মধ্যে বিশেষ একজনকে তোমায় দেখাতে চাই।

অতএব আসছে বুধবার বেলা চারটায় সোজা চলে এসো।'

একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীর সঙ্গে দেখা করবার নিয়মকানুন কী, সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়ে চিঠি শেষ করেছে।

সুকুমার আমার অনেক কালের বন্ধু। সে কী করে, সেটা বলার চেয়ে কী না করে, বলা অনেক সহজ। আপাততঃ তার প্রয়োজন নেই। তার হাজার রকমের কাজে এবং অকাজে সকল সময়ের সঙ্গী একখানা মান্ধাতার আমলের অস্টিন গাড়ি। দুচারবার তাতে চড়বার দুর্ভাগ্য আমারও ঘটেছে। 'দুর্ভাগ্য' শুধু এজন্যে বলছি না যে, তার কলকব্জার যা অবস্থা, তাতে নিয়ে যে-কোনো যাত্রা মহাযাত্রায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। তার চেয়ে বড় কারণ, সুকুমারের ড্রাইভিং অ্যাকসিলারেটারে পা পড়লে স্পীড সম্বন্ধে তার কোনো হুঁশ থাকে না। ট্রাফিক সিগন্যাল মানা না মানা তার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে। লালবাজারের নোটিস প্রতি সপ্তাহেই দু-একখানা তার চিঠির বাক্সে পাওয়া যায়। জরিমানাটাও জলভাত। তার থেকেই বলেছিলাম, বরাবর টাকা দিয়ে পার পাবে না। একদিন নির্ঘাত জেলে যেতে হবে। তাই গিয়েছে।

বুধবার সাড়েচারটে নাগাদ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সুকুমারের সঙ্গে 'মোলাকাত' হল। ওখানে উঁচুক্লাশের কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার কোনো আলাদা ঘর নেই। জেলার সাহেবের অফিসটাই ইণ্টারভিউ-রুম। অনেকগুলো জানালা, আগাগোড়া তাদের জাল লাগানো। ওধারে একটা বারান্দা, তার পরেই জেলের ইয়ার্ড, ব্যারাক, রাস্তা, ওয়ার্কশপ। জানালার এপাশে কয়েকখানা করে চেয়ার। তারই একটাতে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই ওপাশের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুকুমার। কথাবার্তা চালাতে কোনো বাধা নেই। যে-কথা শুধু দুজনের, জালেঘেরা জানালার এপিঠ থেকে ওপিঠে আনাগোনা করবে, একজনের মুখ থেকে আরেকজনের কানে, আর কেউ শুনতে পাবে না, তাও বলা চলে। সবচেয়ে বড় বাধা, হাত বাড়িয়ে আরেকটা হাত ধরা যায় না। শুধু ঐ ক্ষুদ্র রূঢ় লৌহবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে আঙুলের 'একটুকু ছোঁয়া'। তাই নিয়েই দু'তরফকে খুশি থাকতে হবে। যতটুকু পাওয়া যায়!

সুকুমারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাশের জানালাতেই এমনি একটি চম্পক তর্জনী চোখে পড়ল। ওপারে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ। চোখ দেখে বুঝলাম ওটুকুতে তার মন ভরছে না, আরো পেতে চায়। কিন্তু তার উপায় নেই। তারের বাঁধ ওর বেশী পথ ছেড়ে দেবে না।

স্বভাব ও আচরণের দিক দিয়ে সুকুমার সার্থকনামা। এরই মধ্যে কর্মীদের

সঙ্গেও ভাব জমিয়ে ফেলেছে। আমাকে এগিয়ে দেবার নাম করে, ভিতর দিকের বিশাল কপাটে যে ফোকর আছে, যার নাম উইকেট গেট, সেটা পার হয়ে বাইরের গেট পর্যন্ত চলে এল। আমি তার কানে কানে বললাম, 'কাকে যে দেখাবে বলেছিলে?'

কথা না বলে চোখের ইঙ্গিতে পাশের টেবিলটা দেখিয়ে দিল। ঢুকবার সময় ওখানে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্টকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। দু' গেটের মাঝখানে, একটা দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঐটাই তার অফিস। এখন দেখলাম, তার চেয়ারখানা খালি। টেবিলের লম্বা দিকটার দু'ধারে দুটো চেয়ার যারা অধিকার করে আছেন তাদের একজন সুকুমারের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর পোষাক অর্থাৎ ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। বয়স বোধহয় তিরিশের এদিকে, কিংবা দু-একবছর ওদিকেও হতে পারে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। ফর্সা রং, একটু যেন ফ্যাকাশে। মাথা নীচু করে বসে আছে দৃষ্টিও মাটির দিকে। মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, ডৌলটি চাপা, কোমল এবং ভদ্র। চিবুকে, কপালে একটি আভি-জাত্যের ছাপ আছে।

অন্যজন মহিলা, বয়স যুবকটির চেয়ে অন্ততঃ সাত-আটবছর কম। রূপসী না হলেও সুদর্শনা। সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য এবং যৌবন সুপরিস্ফুট। কিন্তু মুখখানা শুকনো, গণ্ডদুটি নিষ্প্রভ। দীপ্তিহীন চোখ। তার কোলে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে। ডান-হাতখানা অলস ভাবে টেবিলের উপর পড়ে আছে। তাতে একগাছা সোনার সরু চুড়ি ছাড়া আর কোনো আভরণ নেই। একটুখানি সামনে ঝুঁকে একদৃষ্টে যুবকটির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এ কী রকম ইন্টারভিউ। সুকুমার দাঁড়িয়েছিল আমার প্রায় গা ঘেঁষে। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্বামী-স্ত্রী?'

মাথা নেড়ে সে জানাল, 'হ্যাঁ।'

জানতে চাইলাম, 'এদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কেন? ওঘরে ভিড় ছিল বলে?'

'না।' বলে, দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো দুটো ক্রাচের দিকে ইঙ্গিত করল সুকুমার। আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির দিকে আরেকবার তাকালাম। তার পায়ের দিকটা ছিল টেবিলের তলায়। স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না।

সুকুমার আমাকে নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ-ও একটা অ্যাক্সিডেন্ট, আমাকে যে জন্যে আসতে হয়েছে। কিছুটা অবিশ্যি তফাত আছে। বাড়ি গিয়ে বলবো।'

সুকুমারের জেলের মেয়াদ ছিল ছ'মাস। তার থেকে আবার মাসখানেকের উপর মাপ হয়ে গেল জেল-কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে। তার মধ্যে আমার আর সেই জানালায় গিয়ে বসবার সুযোগ হয়নি। বাড়ি ফিরে ও-ই এল আমার সঙ্গে দেখা

করতে। ক্লাচের ইতিহাস শুনলাম।

সুকুমার যা বলেছিল সেটা গল্প নয়, একটা নিরেট কঠোর ঘটনা, অর্থাৎ দুর্ঘটনা, কিন্তু বলবার গুণে তার মধ্যেও গল্পের রস সঞ্চার করা যায়। সুকুমারের সে-গুণ আছে, আমি তার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং আমার পাঠকজনকে সে পরিমাণে বঞ্চিত থাকতে হবে। কি করবো? নিরুপায়। সুকুমারকে লিখতে বলবো, সর্বনাশ। তাহলে হয়তো সে আমাকেই তার মোটরের তলায় চাপা দিয়ে বসবে।

সঞ্জীব লাহিড়ী—সুকুমারের 'কারাবন্ধু', যাকে সেদিন দেখে এলাম—উত্তর বাংলার কোনো এক মহকুমা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। কবে, কোন্ ঊর্ধ্বতন পুরুষে কিঞ্চিৎ জমিদারি ছিল। জমিদার মাত্রেরই কোনো না কোনো উপসর্গ থাকে। লাহিড়ীদের ছিল সংস্কৃত-চর্চা। সঞ্জীবের যখন জন্ম হল তার আগেই জমিদারির শেষ চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার উপসর্গের লক্ষণস্বরূপ এক আলমারী জীর্ণ মলিন সংস্কৃত গ্রন্থ বৈঠকখানার এককোণে কোনো রকমে টিকে আছে। কী করে যে ছিল, সেইটাই আশ্চর্য। কেন না, সঞ্জীবের বাবার অন্যান্য অনেক বিষয়ে যত দুর্বলতাই থাক, দেব ভাষার প্রতি তার কণামাত্রও দেখা যায়নি।

সেটা দেখা দিল তাঁর পুত্রের মধ্যে। তার জন্যে অনেকখানি দায়ী সঞ্জীবের স্কুলের বৃদ্ধ হেড-পণ্ডিত। তিনিই নাকি লুপ্তগৌরব লাহিড়ী বংশের একমাত্র সম্পদ ঐ আলমারীটির দিকে তাঁর কিশোর ছাত্রের কাঁচা মনে অনেকখানি আকর্ষণ সঞ্চার করেছিলেন।

যে কারণেই হোক সঞ্জীব সংস্কৃতে এম. এ. পাস করল এবং কালক্রমে মফস্বল কলেজে একটা চাকরিও পেয়ে গেল।

তারপর বিবাহ-পর্ব। এইখানটিতে লাহিড়ীরা বরাবরই একটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এসেছেন। সেটি হল 'বংশ'—একটি অর্থহীন রহস্যময় বস্তু, অন্য সময়ে যা কোনো কাজে লাগে না, কেউ খোঁজও করে না, কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে রক্ষণশীলেরা শুধু নয়, নব্যপন্থীরাও যাকে নিয়ে হঠাৎ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ঘটকেরা সসম্ভ্রমে মাথা দুলিয়ে বলে, যে-সে বংশ নয়, অমুক জায়গার অমুক! পাত্র-পাত্রীর পিতাদের মনেও কোনো বিশেষ বংশের পৌত্রী কিংবা বিশেষ গোষ্ঠীর প্রপৌত্র বিচিত্র মূল্য ও তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়।

অবস্থা পড়ে গেলেও বিয়ের বাজারে লাহিড়ীদের ঐ মূলধন কিছুটা তখনো ছিল, যার দৌলতে সঞ্জীবের বাবা তাঁর এই প্রথম পুত্রের জন্য এমন ঘর থেকে কনে নিয়ে এলেন, যেখানে একজন মফস্বল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক কেবলমাত্র তার বিদ্যা বা পদের জোরে বরাসনে গিয়ে বসতে পারত কিনা সন্দেহ।

সঞ্জীবের শ্বশুর পুলিস বিভাগের লোক। ওর যখন বিয়ে হল তখন তাঁর পঁচিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে, এবং তাঁর বছর কয়েক আগে থেকেই তিনি জেলা-পুলিসের সর্বোচ্চ পদ দখল করেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে ছোট মেয়ে

সর্বাণী পুরোপুরি পুলিসী আবহাওয়ায় মানুষ। সংসারের আরেক দিকে আরেকটা অন্য ধরনের আবহাওয়াও ছিল, যার কেন্দ্র তার মায়ের ঠাকুর-ঘর এবং বাবার একটি নবলব্ধ গুরুদেব। কিন্তু সেটা এত মৃদু এবং সংকীর্ণ যে সন্তানদের উপর তার প্রভাব এসে পেঁছায়নি।

বড়সড় হয়ে অর্থাৎ স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকবার পর বিয়ে হলেও সে সম্পর্কে সর্বাণীর মতামত কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা বোধহয় ওদের পারিবারিক রীতি নয়। ও নিজে থেকেও কাউকে কিছু বলতে যায়নি। দিদিরা সব যার-যার শ্বশুরবাড়ি। দু'-একজন বৌদিদি অবশ্য ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে অতখানি সখ্য বা অন্তরঙ্গতা হয়তো তার ছিল না।

সঞ্জীবের একটি পরিহাস-রসিকা শ্যালিকা বিয়ের রাতেই তার নতুন নামকরণ করেছিল—পণ্ডিত মশাই। সম্ভবতঃ তার মৌলিক কারণ বরের সংস্কৃত অধ্যাপনা। নামটা মুখে-মুখে চালু হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার সম্পর্কীয়া কেউ নাকি খোঁজ করেছিল, তার মাথার পিছন দিকে ঘন চুলের আড়ালে কোথাও একটি শিখা লুকানো আছে কিনা। সঞ্জীব যথারীতি এই জাতীয় স্থূল রসিকতা গায়ে মাখেনি, তৎক্ষণাৎ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সর্বাণীর পক্ষে হয়তো সেটা সম্ভব হয়নি। ঐসব ঠাট্টা-তামাসার সঙ্গে জড়ানো একটা হুল তার গোপন মনের কোনো কোণে বিঁধে গিয়ে থাকবে। স্বামীর ঘর করতে যখন এল, সেটাকে ফেলে আসতে পারেনি।

পুলিশ সাহেবের সরকারী প্রাসাদ ছেড়ে সর্বাণী এসে উঠল উত্তর বাংলার এক অখ্যাত মহকুমার পনেরো টাকা ভাড়ার টিনের বাড়িতে। ও অঞ্চলে তখনো পাকা বাড়ি বড় বিরল। ভাগ্যক্রমে ওরা যেটা পেল তার মেঝেটা পাকা, কিন্তু দেওয়ালগুলো বাঁশের। অর্থাৎ এক ধরনের বাঁশ চিরে চাটাই বুনে শাল কাঠের ফ্রেমে বসানো বেড়া। ওটাই ওখানকার চলন। সামনের রাস্তাটা কাঁচা-পাকা। চারিদিকে খোলামেলা। আশে-পাশে জায়গাও রয়েছে অনেকখানি। তার খানিকটা ঘিরে নিয়ে সঞ্জীব একটি ছোটোখাটো বাগান করেছিল। একদিকে ফুল, আরেকদিকে শাকসব্জি। কলেজ থেকে ফিরে ওটাই ছিল তার কাজ এবং শখ, চলতি কথায় যাকে বলে 'হবি'।

সর্বাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত, ওর মধ্যে কোনো রস পেত না। সঞ্জীব একটু-আধটু চেষ্টা করেছিল তাকে ভেড়াবার জন্যে। বলেছিল, একবার ঢুকে দ্যাখ না, খুব ভালো লাগবে। কাছাকাছি অনেক বাড়িতে সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রী-পুরুষেরা মিলে বাগান করছে—এমন কয়েকটা দৃষ্টান্তও দিয়েছিল, কিন্তু সর্বাণীর মধ্যে এদিকে কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। ঐ প্রসঙ্গে একদিন সে বলেছিল, ঐ মাটি কোপানো আর কাদা ঘাঁটার মধ্যে কী যে কবিত্ব আছে, আমি বুঝি না। আসলে তো ওটা চাষাভূষোর কাজ। মালীরা করে। বাবা যেখানে যেখানে গেছেন দুজন করে মালী থাকত আমাদের। ফুল করত, তরকারী করত। কত বড় বাগান! দুজনে পারবে কেন? মাঝে মাঝে একদল করে সিপাই আসত রিজার্ভ থেকে।

বাবা কখনো ক্বচিৎ একবার ঘুরে দেখে আসতেন। আমরা সাতজন্মেও কোনো-দিন বাগানে নামিনি।

সর্বাণীর কোনো কাজ ছিল না। সঞ্জীবের একার আমলে যে রান্নার লোকটি ছিল, তাকেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। সে-ই সব করত। দেখাশুনোর নামে তার উপরে খানিকটা তম্বি চালানো ছাড়া রান্নার ব্যাপারে গৃহিণীকে বিশেষ কিছু করতে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটি বিলিতি ধরনের বিশেষ রান্না দিয়ে স্বামীকে তাক লাগিয়ে দিত। অনভ্যস্ত রসনার উপর সেই উপদ্রবগুলো নীরবে সহ্য করেই তার নিস্তার ছিল না, উচ্চকণ্ঠে তারিফ করতে হত। তা না হলে নেহাত টিকিধারী পণ্ডিতের দলে গিয়ে পড়তে হয় এবং পুলিস সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার মুখরক্ষা হয় না।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও এই মুখ ও মন রক্ষার দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল সঞ্জীব। তাছাড়া সংসারের শান্তিরক্ষা সম্ভব ছিল না। অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছিল, যা তার পক্ষে সহজ নয়। পকেটের উপরেও চাপ কম পড়েনি, যার ফলে বাবার কাছে মাসে মাসে যে মনিঅর্ডার যেত, তার অংকটাকে কমিয়ে আনতে হয়েছিল। নতুন একটা টিউশানি দিয়েও সে ঘাটতি পূরণ করা যায়নি। ওদিকে অসন্তোষও জমে উঠছিল। তবু এদিকের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত না হয়, এইটাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

একদিন সন্ধ্যার পর পরীক্ষার খাতা দেখছিল সঞ্জীব।

সর্বাণী ওদিকে বসে উলকাঁটা নিয়ে কী একটা বুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমাদের দেশের বাড়িতে বন্দুক নেই ?'

'বন্দুক !' হঠাৎ চমকে উঠল সঞ্জীব, 'বন্দুক কী হবে ?'

'কেন, কত কাজে লাগে ? শিকার-টিকার করা যায়। তাছাড়া, এ রকম ফাঁকা জায়গায় বাড়ি···'

'শিকার কে করবে ?'

'তুমি করবে। আমিও যেতে পারি সেই সঙ্গে। দাদা বা জামাইবাবুরা যখন শিকারে বেরোত, আমাকে নিয়ে যেত। এই এত পাখী মেরে এনেছি।' সে দু'হাত দিয়ে শিকারের পরিমাণটাও দেখিয়ে দিল।

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জানো ?'

'জানি না মানে ? সবাই বলে আমার হাতের টিপ খুব ভালো। রাইফেলও চালাতে পারি। আমাদের হাবিলদার তিলকধারী সিং কি বলতো জানো ? দিদিমণি খুব বড় শিকারী হবে, বাঘ মারবে···' বলে, খিলখিল করে হেসে উঠল। সঞ্জীব খাতা আর পেনসিল ফেলে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর মুখের পানে। দু'চোখ ভরা শুধু বিস্ময় নয়, এক ধরনের বিহ্বলতা।

সর্বাণী ওসব কিছু লক্ষ্য করল না। হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমরা তো শুনেছি এককালে জমিদার ছিলে। একটা বন্দুক নেই ?'

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল। অন্ততঃ সঞ্জীবের তাই মনে হল।

সে পরীক্ষার খাতায় চোখ নামিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'না।'

'আমার সব জামাইবাবুদের বন্দুক আছে। সেজোর তো তিনটে। একটা রাইফেল, দুটো ডাবল-ব্যারেল। তুমি একটা কিনে ফ্যাল না ? কত আর দাম ?'

সঞ্জীব খাতা দেখতে শুরু করেছিল। কথাগুলো কানে গেল, কিন্তু জবাব দিল না। সর্বাণী মিনিটখানেক অপেক্ষা করে বলল, 'লাইসেন্সের কথা ভাবছ ? সে যোগাড় হয়ে যাবে। এমনিতে যদি দিতে না চায়, বাবা একবারটি বলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে।...বাবাকে লিখবো ?'

'এখন থাক।'

'কেন, থাকবে কেন ?' আব্দারের সুরে বলল সর্বাণী।

তৎক্ষণাৎ দেবার মতো আর কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে সঞ্জীব আপাততঃ যা মনে এল বলে দিল, 'ভেবে দেখি।'

সর্বাণী ব্যাপারটাকে ঐখানেই থামতে দিল না। ক'দিন পরে কথায় কথায় আবার ঐ প্রসঙ্গ তুলল। সেই সঙ্গে কিছু নতুন খবরও দিল। সেজো জামাইবাবু আসছেন। সঙ্গে তাঁর ভাই এবং আরো কে একজন।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা বড় বিল আছে। ভর্তি শিকার ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস, হরিয়াল, তিতির এবং আরো অনেক রকম পাখী। এইসব তথ্য সর্বাণী আগেই সংগ্রহ করেছে; একটা লোক বালিহাঁস বিক্রী করতে এসেছিল তার কাছ থেকে, এবং জামাইবাবুকে লিখেও জানিয়েছে। তিনি চিঠি পেয়েই সদলবলে শিকার-যাত্রার তোড়জোড় শুরু করেছেন। অবিশ্যি এখনো কিছু দেরি আছে। তার আগেই বন্দুকটা কিনে ফেলা দরকার। তা না হলে কুটুম্বের কাছে মান থাকে না।

সঞ্জীব শুনে অবাক হল, তার সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছে সর্বাণী। সে নাকি শিকার, দল বেঁধে মোটরে স্টীমারে বেড়ানো, পিকনিক—সবকিছুতেই ভীষণ উৎসাহী, ঠিক আজকালকার ছেলেরা যেমন হয়ে থাকে। বন্দুক কেনা হচ্ছে এবং শিকারের নামে এখন থেকেই মেতে উঠেছে।

'এসব কথা লিখতে গেলে কেন ?' সঞ্জীবের প্রশ্নে বিরক্তির সুরটা চাপা রইল না।

'বাঃ, অন্যায়টা কি লিখেছি ?' সর্বাণীর উত্তরেও খানিকটা পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ পেল। একটু থেমে একই সুরে বলল, 'সবাই 'পণ্ডিত-পণ্ডিত' করে, সেটা বুঝি আমার খুব ভালো লাগে ?'

একটা হতাশাময় নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া এর পরে আর কী বলবার ছিল সঞ্জীব লাহিড়ীর ?

কিন্তু বলবার কিছু না থাকলেও করতে হল অনেক কিছু।

মহকুমার মালিক এস ডি. ও-র সঙ্গে সঞ্জীবের সামান্য পরিচয় ছিল। একদিন সোজা তার অফিসে গিয়ে বলল, 'আমাকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স দিতে হবে।'

'হঠাৎ !' বেশ খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন এস. ডি. ও.।

'হঠাৎ নয়। অনেকদিন থেকেই ভাবছি, আসবো আপনার কাছে। এবার আর না এসে পারা গেল না।'

'বন্দুকের এমন কী দরকার পড়ল? কোনো বিপদ-আপদের আশঙ্কা করছেন কী?'

'আজ্ঞে না, একটু শিকার-টিকারে বেরোবার ইচ্ছা ছিল।'

'শিকা-র !'

উচ্চারণের ধরণ থেকেই বোঝা গেল ব্যাপারটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। মুখে অবশ্য বললেন, 'একটা দরখাস্ত রেখে যান। লাইসেন্স দেবার মালিক তো আমি নই। ওটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ করে থাকেন। আপনার অ্যাপ্লি-কেসন ওখানে পাঠানো হবে।'

'কদ্দিনে পাওয়া যাবে?'

'তা, সময় লাগবে। তাছাড়া পাবেনই যে, তাও জোর করে বলা যায় না। গান-লাইসেন্সের ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট আজকাল বেশ কড়াকাড়ি করছেন।'

দরখাস্ত দাখিল করার দিন সাতেক পরেই আবার তাকে যেতে হল মহকুমা হাকিমের কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। অফিস থেকে জানা গেল, 'সেটা পুলিসে গেছে।'

'পুলিসে !'

'হ্যাঁ, এন্‌কোয়ারি হচ্ছে।' সংক্ষেপে জানিয়ে দিল লাইসেন্স-ক্লার্ক।

সঞ্জীবের মেজাজ চড়ে গেল। তার সম্বন্ধে কী এন্‌কোয়ারি করবে পুলিস? চুরি-ডাকাতিও করে না, ওদিকে 'স্বদেশী'র সঙ্গেও কোনো সংস্রব নেই।

পরের সপ্তাহেই একদিনের ছুটি নিয়ে সদরে চলে গেল সে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা হল এ. ডি. এম্-এর সঙ্গে।

লাইসেন্স মঞ্জুরির দায়িত্বটা নামে কালেক্টরের হলেও, কাজটা করেন অ্যাডি-শনাল। ওখানে তখন যিনি ছিলেন, ঐ পদে সদ্য-উন্নীত আই. এ. এস.। বয়স অল্প। সঞ্জীবের বক্তব্য শুনবার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক মিনিট তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী করেন?'

'আমি একজন প্রফেসর।'

'কদ্দিন চাকরি করছেন?'

'বছর পাঁচেক।'

'কী পড়ান?'

'সংস্কৃত।'

এ. ডি. এম্-এর ওষ্ঠের কোণে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। পাইপ টান-ছিলেন। সেটা মুখে রেখেই বললেন, 'আপনার হঠাৎ শিকারের শখ হল যে?'

হাসিটা সঞ্জীবের দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রশ্নটাও কানে লাগল। কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে বলল, 'শখটা কী খুব অন্যায়?'

'অন্যায় নয়, তবে একটু আশ্চর্য লাগছে। অধ্যাপক মানুষ, তার ওপরে

সংস্কৃতের অধ্যাপক ! তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

তার বৃত্তির উপর কটাক্ষ যদি আজ প্রথম সইতে হত, হয়তো বিঁধত না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এর বারংবার প্রয়োগ, বিশেষ করে শ্বশুরগোষ্ঠীর দিক থেকে, সঞ্জীবের মতো শান্ত মানুষের মনেও জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এবার তারই খানিকটা নিঃসৃত হল, 'আপনার এই সব অবান্তর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই না। শুধু জানতে চাই, সংস্কৃতের অধ্যাপককে গান-লাইসেন্স দেওয়া হবে না, এরকম কোনো আইন আছে কি ?'

'না, তা নেই।' পাইপটা এবার মুখ থেকে নামিয়ে নিলেন এ. ডি. এম, 'তবে লাইসেন্স যিনি চান, তাঁর মেজাজ-টেজাজগুলো একটু দেখে নিতে হয় বৈকি। বাধাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেইখানে।'

'তার মানে, লাইসেন্স আমি পাবো না ?'

অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর অতিরিক্ত আর কিছু বললেন না। বোধহয় অনাবশ্যক মনে করলেন। ঘণ্টা বাজিয়ে চাপরাসীকে ডেকে একটা কাগজের টুকরো তার হাতে তুলে দিলেন। সঞ্জীব বুঝল, বাইরে যারা অপেক্ষা করে আছে, তাদের একজনের ডাক পড়ল। আর বসে থাকা নিষ্প্রয়োজন বলে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে এল।

বাসা থেকে বেরিয়েছিল ভোরবেলা, ফিরতে রাত হল। সমস্ত দিন প্রায় অনাহারে, দারুণ পথশ্রমে শরীর ভেঙে পড়েছে, তার উপর মনের ঐ অবস্থা। ঘরে ঢুকতেই সর্বাণী এল প্রায় ছুটতে ছুটতে, 'পেলে ?'

'না।'

'অ্যাঁ !'

সর্বাণী শূন্যের উপরেই বসে পড়তে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। বলল, 'কী সর্বনাশ ! আমি যে জামাইবাবুকে লিখে দিলাম, লাইসেন্স পাওয়া গেছে, দু-তিনদিনের মধ্যেই বন্দুক কেনা হবে। কবে পাওয়া যাবে বললে কিছু ?'

'পাওয়া যাবে না।'

'সে কি ! দেবে না বলে দিলে ?...আমি আগেই জানি। এই জন্যেই বলেছিলাম, বাবাকে লিখে দিই। তাহলেও বোধহয় হত না। যাকে-তাকে কি আর গান্-লাইসেন্স দেয় ?'

সঞ্জীব চকিতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, এরকম কুৎসিত মুখ সে কখনো দেখেনি। তার প্রতিটি কুঞ্চন থেকে একরাশ ঘৃণা, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য ও বিদ্বেষের কলুষ-রস উপচে পড়ছে। তীব্র ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়, কিংবা যা মুখে আসে তাই বলে ওকে বের করে দেয় ঘর থেকে। কিন্তু কোনোটাই হল না। পাছে ঐ জাতীয় কিছু করে বা বলে বসে, তাই সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ বুকে চেপে নিজেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

'ঐরকম ড্রাস্টিক্ কিছু করলেই সেদিন ভালো হত,' মন্তব্য করেছিল সুকুমার, 'অন্ততঃ আমি হলে তো তাই করতাম।'

'কী করতে ? বৌএর গালে চড় বসিয়ে দিতে ?'

'হ্যাঁ, তাই দিতাম। ব্যাপারটা বিশ্রী হত নিশ্চয়ই, কিন্তু আখেরে দুজনেরই উপকার হত। ওদের অবস্থাটা ভেবে দ্যাখো। সঞ্জীবের মনে যে জ্বালা জমে উঠেছিল, তার অনেকখানি তাপ বেরিয়ে গিয়ে সে বেচারা সুস্থ হতে পারত, আর ঐ মেয়েটাও খানিক কান্নাকাটি চেঁচামিচি করে শেষপর্যন্ত ঠিক পথে এসে যেত। বুঝত, এ করে চলবে না। কিন্তু মুশকিল কোথায় জানো ? ঐ সঞ্জীব লাহিড়ীর মতো ভদ্র, শিক্ষিত, কালচার্ড মানুষ কোনো অবস্থাতেই সভ্যতার খোলসটাকে ছাড়তে পারে না। একদিন হয়তো ছাড়ে, মানে ছাড়তে বাধ্য হয়, when it is too late. যাক সে কথা !'

সুকুমার তার গল্পের বাকী অংশে ফিরে গেল।

দু-তিনদিন পরেই সঞ্জীবের সেজো ভায়রা এসে পড়লেন। সঙ্গে তাঁর ভাই এবং একটি অনুচর। দুজনেই শিকারী। কুশল প্রশ্নাদির পরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখি ভায়া, কী বন্দুক কিনলে ?'

সঞ্জীব কোনো জবাব দেবার আগেই সর্বাণী বলে উঠল, 'আর বলবেন না, জামাইবাবু। যেতে পারলে তো ? কলেজে কী সব গোলমাল চলছে। প্রিন্সিপ্যাল কিছুতেই ছাড়লেন না।'

'ও, তাই নাকি ?, যাকগে, তার জন্যে কী ? যোগেনের জেফ্রিজটা তুমি নিও। খুব ভালো বন্দুক।'

যোগেন অনুচরটির নাম।

'জামাইবাবুর' ছুটি মাত্র তিনদিন। যেদিন এলেন তার পরেরদিন সকালেই প্রথম অভিযানের আয়োজন করা হল। দুখানা ঘোড়ার গাড়ী। তার একটার মাথায় প্রচুর খাবার-দাবার। অন্যান্য সবঞ্জামও কম নয়। সঞ্জীব বেচারা মফস্বল কলেজের জুনিয়র টীচার। পকেটের অবস্থা কোনোকালেই পুষ্ট নয়। তার উপরে মাসের শেষ। দায় উদ্ধারের জন্যে একজন সহকর্মী বন্ধুর কাছে হাত পাততে হল। তাতেও কুলোতে চায় না। সর্বাণী দু'হাত দিয়ে বেপরোয়া অতিথি-আপ্যায়ন করে চলেছে, আর সঞ্জীব ভাবছে তিনটে দিন কবে শেষ হবে।

শিকারীর দল তাকে ধরে টানাটানি কম করেনি। বাঁচিয়ে দিয়েছে সর্বাণী নিজেই। স্বামীর বিদ্যা তো সে জানে। ওঁদের পীড়াপীড়িতে যদি বন্দুক ধরতেই হয়, সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। কলেজে স্ট্রাইক চলছে, ছুটি নেওয়া চলবে না, এই মিথ্যা অজুহাতই দেখাতে হয়েছে বারবার। তাছাড়া স্বামীর শূন্যস্থান সে-ই বহুগুণে পূরণ করে দিল। পরপর কয়েকদিনই তার বহু-বাঞ্ছিত সঙ্গ এবং হাসি পরিহাস আমোদ উৎসাহের উচ্ছ্বাস দিয়ে শিকার-পার্টিকে অভিভূত করে রাখল।

তিনদিনে হল না। আরো দুদিন বাড়তি ছুটি উপভোগ করে 'জামাইবাবু' বিদায় নিলেন। অনুচরটিও গেল তাঁর সঙ্গে। একজন রয়ে গেল—সঞ্জীবের ভায়রা

ভাই-এর ছোট ভাই—সর্বাণীর প্রদীপদা। বয়সে ওর চেয়ে বোধহয় দু-তিনবছরের বড়, সবে বি. এ. পাস করেছে, ভীষণ আমুদে স্বভাব, সারাদিন হৈ-চৈ, গান-বাজনা, ঠাট্টা-তামাসা, হাসি-গল্পে মশগুল করে রেখেছিল সর্বাণীকে।

'সত্যি, এতসব মজার কথাও তুমি জানো প্রদীপদা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে।'

'ভয় নেই, আমি চলে গেলেই খিল খুলে যাবে। আবার তো সেই একটানা না হাসার পালা।'

সর্বাণী চুপ করে রইল। কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপরে আবার প্রদীপের গলা শোনা গেল, 'কী করে যে তোমার দিন কাটে, আমি ভেবেই পাই না।'

ওরা দুজনেই ছিল সর্বাণীর শোবাব ঘরে। একটু আগে সঞ্জীব ছেলে পড়াতে যাবার জন্য রওনা হয়েছিল। শাক-সবজির ক্ষেতটা অনেকদিন দেখা হয়নি। তাই ওদিক দিয়ে ঘুরে পিছনের বেড়ার গায়ে বাখারির দরজা খুলে ঢুকে পড়েছিল বাগানের মধ্যে। কথাগুলো তার কানে গেল। মনে মনে আরো শুনবার কৌতূহল হল। কিন্তু এর পরে সেটা উচিত হবে না বলে তাড়াতাড়ি সেই পিছন দিক দিয়েই বেরিয়ে চলে গেল।

সারাদিন বাড়িতে কাটিয়ে বেলা পড়তেই ওরা বেড়াতে বেরিয়ে যেত। সঞ্জীবের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করত না। সন্ধ্যা হয়ে যেত ফিরতে। নির্জন খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াত। কখনো হয়তো ঘন হয়ে বসত গিয়ে কোনো গ্রামের কোলে ঝিল বা পুকুরের পাড়ে। এ নিয়ে কানাঘুষা শুরু হল। তার কিছু কিছু সঞ্জীবের কানেও পৌঁছল। কিন্তু সে কাউকে কিছুই বলতে পারল না।

শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানোটা ক'দিন যেতেই বোধহয় একঘেয়ে মনে হল। তখন আবার নতুন করে চাপল শিকারের ঝোঁক। প্রদীপ বলল, 'কই, আপনার বন্দুক আনতে গেলেন না তো সঞ্জীববাবু? এখনো কি আপনাদের ধর্মঘট মেটেনি?'

সর্বাণী খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসছ যে?' প্রদীপ সত্যিই ধরতে পারেনি এর মধ্যে হাসির কী আছে।

'ধর্মঘট না' হাতি!'

'তার মানে?'

'লজ্জার কথাটা জামাইবাবুকে আর বলি কেমন করে। তাই একটা গুল মারতে হয়েছিল। বন্দুক তো আর বিনি লাইসেন্সে কেনা যায় না।'

'সে কি! লাইসেন্স নেননি নাকি?'

'দিলে তো নেবেন।'

'এখানে ওখানে কতকগুলো পলিটিক্যাল ডাকাতি হবার পর নতুন লাইসেন্স আর দিতে চাইছে না গভর্মেণ্ট। যাক গে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। একটা বন্দুক তো রয়েছে। এটাই তিনজনে পালা করে চালানো যাবে। চলুন, কাল একবার ঘুরে আসি। আপনার হাত তো শুনেছি অব্যর্থ। তাহলেও মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।'

সর্বাণীর সুন্দর ঠোঁট দুখানা হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছিল। প্রদীপের নজরে পড়েনি, সঞ্জীব লক্ষ্য করল। কীসের হাসি, তাও তার কাছে লুকোনো রইল না। পরক্ষণেই সে প্রায় ছুটতে ছুটতে ভিতরে চলে গেল, বোধহয় হাসিটা আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না। সেই চলে যাবার দুপ-দাপ শব্দটা বিপুল বেগে সঞ্জীবের বুকে এসে বাজল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে সহজ ভাবেই বলল, 'আমার সময় হবে না। আপনারা যান।'

'একটা দিন সময় করতে পারবেন না ?'

প্রদীপের অনুরোধটা সত্যিই আন্তরিক। সে বিষয়ে সঞ্জীবের মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না। কী উত্তর দিল জানবার আগে সুকুমারের খানিকটা ভাষ্য শুনতে হল।

'তুমি যখন একটু লেখো-টেখো,' শুরু করল সুকুমার, 'মানুষের মন, অর্থাৎ তোমরা যাকে বল হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে নাড়াচাড়া কর, তখন এটা নিশ্চয় মানবে যে, টাটকা বিয়ে করা বৌ-এর সামনে নিজের অক্ষমতা (তা, সে যে বিষয়েই হোক) কাবুল করা বড় কঠিন। বিশেষ করে, সেটা যদি আবার এমন কারো কাছে হয়, স্ত্রী যাকে 'হিরো' বলে মনে করে, এবং এমন বিষয়ে হয়, স্ত্রীর কাছে যার মূল্য অনেক, তখন তাকে প্রায় অসম্ভব বলে ধরে নিতে পার।'

সঞ্জীব যে বন্দুক ধরতে জানে না, এটুকু স্বীকার করা অন্য সময়ে বা অন্য ক্ষেত্রে কিছুমাত্র বাধত না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে ঐ ছেলেটার সামনে, সর্বাণীর ঠোঁটের বাঁক এবং ছুটে যাওয়ার বিশেষ ভঙ্গীটি চোখে পড়বার পর সেই সামান্য কথাটা আর বলা গেল না। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে সে বলল, এ ক'দিনে হয়ে উঠবে না, আসছে সপ্তাহে চেষ্টা করবো।

তখন হয়তো কিছু না ভেবেই সময় নিয়েছিল। তারপর যা কাণ্ড করল তা রীতিমতো হাস্যকর, অন্ততঃ সঞ্জীবের মতো লেখকের পক্ষে।'

আমি বললাম, 'ওসব থাক। তারপরে কি ঘটল তাই বল।'

'কেন, থাকবে কেন ?' ছদ্ম প্রতিবাদের সুরে বলল সুকুমার, 'আমার এই ফাইন্ অ্যানালিসিস, তোমরা যাকে বল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তোমার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ? ভাবছ, ওটা তোমাদের একচেটে অধিকার ? বেশ, তাহলে শোনো'··· বলে, যেখানে এসে থেমেছিল, সেখান থেকে সূত্রটা আবার তুলে নিল ঃ

সঞ্জীবের এক স্কুলের বন্ধু কিছুদিন আগে ওখানে পি. ডবলিউ ডি.'র ওভারসিয়ার হয়ে এসেছে। শিকারে খুব শখ। একটা দোনালা বন্দুকও আছে। মাঝে মাঝে পাখি মারতে বেরোয়। দু-একদিন সঞ্জীবকেও টানবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। পাখির মতো একটা নির্দোষ নিরীহ প্রাণী, আপন মনে আকাশে উড়ে বেড়ায়, হঠাৎ গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, এ দৃশ্য সত্যিই তার কাছে দুঃসহ।

তবু একদিন বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল, 'তোর এই বন্দুকের মারপ্যাঁচগুলো একটু শিখিয়ে দে তো।'

'বলিস কি ! হঠাৎ এ দুর্মতির কারণ ?'

'সঙ্গদোষ।' বলে, বন্ধুর দিকে আঙুল তুলল সঞ্জীব।

'বেশ, বেশ। এ্যাদ্দিনে তাহলে সাবালক হলি!'

সেইদিনই হাতেখড়ি হয়ে গেল। পরপর কয়েকদিন ধরে গোটাকয়েক পাঠ দিয়ে ওভারসিয়ার বন্ধুটি বলল, 'নিশানা ঠিক হতে সময় লাগবে। ওটা অভ্যাসের ব্যাপার। মাঝে মাঝে যদি আমার সঙ্গে বেরোস, দু'মাসের মধ্যে তোকে পাকা শিকারী বানিয়ে দেবো।'

পরের সপ্তাহে 'যাবো' না বললেও 'চেষ্টা করবো' বলে রেখেছিল সঞ্জীব। কিন্তু প্রদীপের তরফ থেকে আর কোনো তাগিদ এল না। সঞ্জীবের বিশ্বাস, সর্বাণী তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল। তারা এদিকে নিয়মিত বেরোচ্ছিল। এবার আর ঘোড়ার গাড়ীতে নয়, সাইকেলে। ওরই একটা পুরনো সাইকেল কিছুদিন থেকে অচল হয়ে পড়েছিল। সামান্য গোলমাল। প্রদীপ দু-তিনদিন তার পিছনে খেটে নিজেই সব ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। দু'চোখ ভরা বিস্ময় ও প্রশস্তি নিয়ে সর্বাণীই এ সুখবরটা স্বামীর কাছে গিয়ে জানিয়েছিল, 'তুমি তো সাইকেলটা ফেলে রেখে দিয়েছিলে। ও হাত দিতে না দিতেই দিব্যি চালু হয়ে গেল। দোকানে দিলে এরই পেছনে একমুঠো টাকা বেরিয়ে যেত।'

অর্থাৎ সামান্য একটা মেরামতের কেরামতি দেখিয়ে আনাড়ি অধ্যাপকের উপর আর একহাত নিয়ে নিল ছোকরা।

একেই বলে ঘটনা-চক্র!

ওদের শিকার-যাত্রার তোড়জোড়টা শুরু হত ভোরবেলা, সঞ্জীবের চোখের উপর। সাইকেলের সামনের দিকে বাঁধা হত টিফিন-ক্যারিয়ার আর চায়ের ফ্লাসক্, আর পিছনের ক্যারিয়ারের উপর সতরঞ্জি পাট করে তৈরী হত সর্বাণীর আসন। কোমরে আঁচল জড়িয়ে পা ঝুলিয়ে বসে ডান হাত দিয়ে প্রদীপকে শক্ত করে জাপটে ধরত। তা না হলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারত সঞ্জীব। তবু চোখের উপর এই দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে তাকে বিঁধতে থাকত। কোনো কাজে মন দিতে পারত না। এ যেন তার পৌরুষের উপর এক উদ্ধত চ্যালেঞ্জ…শুধু চ্যালেঞ্জ নয়, ধিক্কার।

একদিন বলেই ফেলল সর্বাণীকে, 'তোমরা বরং ঘোড়ার গাড়ীতেই যেও।'

'কেন? সাইকেলে তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধার কথা নয়। ওভাবে যাওয়াটা বড় দৃষ্টিকটু।'

'দৃষ্টিকটু!' দপ্ করে জ্বলে উঠল সর্বাণী, 'তার চেয়ে বল না কেন, তোমার ঐ পাণ্ডিতি গোঁড়ামিতে বাধছে? নজরটা একটু বড় করবার চেষ্টা কর, বুঝলে?' বলে, ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল এবং বেশ খানিকটা সোরগোল করে, প্রদীপকে দু-বার তাড়া দিয়ে, তাকে একরকম টেনে নিয়ে সাইকেলে গিয়ে উঠল।

সঞ্জীবের মুখে একটা কড়া উত্তর এসে গিয়েছিল, সেটা মুখেই রয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলেছিল, কথাটা যখন উঠেছে, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। সে সুযোগ আর হল না!

কী একটা পর্ব উপলক্ষে কলেজে সেদিন ছুটি। হাতে কোনো কাজ নেই। বেরোবার তাড়া নেই। ঠাকুর চা নিয়ে এসেছিল, ফিরিয়ে দিল। খাবার প্রবৃত্তি

চলে গিয়েছিল। একটা খুরপি নিয়ে বাগানে গিয়ে নামল। মিনিট পাঁচেকের বেশী টিকতে পারল না। হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করল। ক্যাম্প-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় একবার বসল। কয়েক মিনিট যেতেই কে যেন ঠেলে তুলে দিল। হঠাৎ মনে পড়ল ওভারসিয়ার বন্ধুর কথা। ঘরে ঢুকে আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা টেনে নিয়ে মাথা গলিয়ে বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে পড়ল।

ভাদ্রের শেষ। সকালের দিকটা একটু মেঘলা ভাব ছিল। বেলা হতেই কেটে গেছে। তার ফলে রোদের তেজ বেড়েছে। হাওয়া নেই। সূর্য প্রায় মাথার উপর। খোওয়া-ওঠা রাস্তায় পাঁচ মাইল সাইকেল চালিয়ে ঘেমে নেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যখন সেই শিকারওয়ালা বিলের ধারে গিয়ে পৌঁছল, সঞ্জীব তখনো জানে না, কেন এসেছে, ওদের সঙ্গে দেখা হলে তার বক্তব্য বা করণীয় কী? বন্ধুর কাছ থেকে সাইকেলখানা চেয়ে নিয়ে, লক্ষ্যহীন অস্থির মনে শুধু একটা অদম্য উত্তেজনার বশে দ্রুতবেগে ছুটে এসেছিল।

এদিক ওদিক চেয়ে কোথাও ওদের দেখতে পেল না। রাস্তা আগেই শেষ হয়ে গেছে। লম্বা ঘাসে ঢাকা অসমান মেঠো জমি। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। সঞ্জীব সাইকেলটা দু'হাতে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলল। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ঘাসগুলোও ছোট। ডানদিকে একটা বিশাল গাছ। সেদিকে মোড় ফিরতেই নজরে পড়ল, তার গায়ে দাঁড় করানো একটা বন্দুক, আর ঠিক নীচে একটা পাখি। ঘাড়টা ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে। একপাশের অনেকখানি জায়গা রক্তমাখা।

সঞ্জীবের বুকের ভিতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই ঘাড়ভাঙা পাখিটার দিকে।

বাঁদিকে একটা ঝোপের মতো। তার আড়াল থেকে মানুষের গলার আওয়াজ কানে আসতেই নিজের অজ্ঞাতসারে চমকে উঠল সঞ্জীব। দু-পা এগোতেই চোখে পড়ল, ঘাসের উপর দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সর্বাণী, প্রদীপের মাথাটা তার কোলের উপর। ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে কি বলতেই প্রদীপ হো-হো করে হেসে উঠল। সর্বাণীও যোগ দিল তার সঙ্গে। সহসা এদিকে চোখ তুলতেই হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে মাঝপথে থেমে গেল।

প্রদীপকে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে দাঁড়াল। লুটিয়ে পড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে বেশ-বাস ঠিক করতে করতে বলল. 'তুমি!'

সঞ্জীব কোনো জবাব দিল না, স্ত্রীর কথা যেন শুনতেই পায়নি। প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ বুঝি বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি?'

প্রদীপ এতক্ষণ নিঃসাড় হতভম্বের মতো একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সহসা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। হাসবার মতো মুখ করে বলল, 'আজ্ঞে না, অনেক ঘুরে ঘুরে ঐ একটা পাওয়া গেছে। ও-ই মেরেছে ওটা। আমার একেবারে নিষ্ফল যাত্রা।'

'নিষ্ফল কেন বলছেন?' বলে, একটু পিছিয়ে এসে বন্দুকটা হাতে তুলে

নিল সঞ্জীব।

প্রদীপ খুশি হয়ে বলল, 'আপনি একবার ট্রাই করবেন নাকি? দেখুন না? গুলি ভরাই আছে।'

'না-না, উনি কি ট্রাই করবেন?' প্রদীপের দিকে ফিরে তিরস্কারের সুরে বলে উঠল সর্বাণী, 'বন্দুক ধরেছেন নাকি কোনোদিন? খালি খালি গুলি নষ্ট হবে।'

'না, নষ্ট হবে না।' বলতে বলতে অভ্যস্ত হাতের ঝাঁকানি দিয়ে বাঁটটা কাঁধের সামনে চেপে ধরে নিশানা নিল সঞ্জীব।

প্রদীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কী করছেন?' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে বন্দুকটা কেড়ে নিতে ছুটে এল। তার আগেই গুলি বেরিয়ে গেছে।

'উঃ!' বলে, দু'হাতে হাঁটুর উপরটা চেয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সর্বাণী। স্বামীর বিদ্যা তো সে জানে। তাই কিছুই বুঝতে পারেনি, সরে যাবার চেষ্টাও করেনি।

পাখিমারা গুলি, যার নাম ছর্‌রা, একদিক দিয়ে মানুষের পক্ষে বড় মারাত্মক। ওর ভিতরকার খুদে-খুদে লোহার দানাগুলো যেখানে ঢোকে প্রায় সেখানেই থেকে যায়, বেরিয়ে যেতে পারে না। সর্বাণীর বেলাতেও তাই হয়েছিল। ও-গুলোকে বের করতে গিয়ে হাঁটুর উপর থেকে গোটা পা-টাকে কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

প্রদীপ গোড়া থেকে ব্যাপারটাকে নিছক একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিল। যে মানুষ কোনোদিন বন্দুক ধরেনি, সে হঠাৎ পাখি মারতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। এর জন্যে অনেকখানি দায়ী তার নিজের ভুল। অতবড় আনাড়ির হাতে বন্দুক দেওয়া তার ঠিক হয়নি।

সঞ্জীবের উপরে চারদিক থেকে চাপ এসেছিল, সে-ও যেন ঐ কথাই বলে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সর্বাণীও বারবার সেই অনুরোধ করেছিল। সঞ্জীব কারো কথা শোনেনি। থানা থেকেই আদালত পর্যন্ত দৃঢ়, স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছে সর্বাণীই ছিল তার আক্রমণের লক্ষ্য, তাক্ করেছিল বুকের দিকে, গুলিটা ফসকে গিয়ে পায়ে লেগেছে।

বিচারের সময় মামলার এগজিবিট হিসাবে বন্দুকটা পেস্কারের টেবিলের পাশে দাঁড় করানো থাকত। সেই দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, ঐ জিনিসটা যার নাম বন্দুক, আমার জীবনে একটা মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে এসেছিল। আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু হতে না হতে ও তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জর করে দিয়েছে। সেই গুলিবিদ্ধ অচল বোঝাটাকে বয়ে বেড়ানো আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ঐ বন্দুক দিয়েই তার মূলে আঘাত করেছিলাম। আমার অভিশপ্ত দাম্পত্য-বন্ধনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম।

বিচারক এই প্রলোপোক্তিকে কি ভাবে নিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। তবে আঘাত গুরুতর হলেও সে অনুপাতে কঠোর সাজা দেননি। মাত্র তিনবছরেব জন্যে জেলে পাঠিয়েছিলেন।

সর্বাণী যতদিন হাসপাতালে ছিল ততদিন অন্য সকলে পালা করে এসে মাসে

মাসে সঞ্জীব লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করে যেত। তারপর থেকে ও-ই আসে। চিঠি-পত্র না লিখলে মাসে দুটো করে ইন্টারভিউ মঞ্জুর করেন জেল-কর্তৃপক্ষ। সঞ্জীব চিঠি লেখে না। কাজেই সর্বাণীর সঙ্গে তার দেখা হয় পনর দিন অন্তর। ক্রাচ নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট হয় বলে গেটের মধ্যে ঐ টেবিলটাতেই ওদের বসানো হয়। ফিরিঙ্গি সার্জেন্ট, জেলখানায় যার নাম চীফ্ ডিসিপ্লিন অফিসার, কিঞ্চিৎ ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেন। অর্থাৎ লাহিড়ী-দম্পতিকে একা রেখে চলে যান।

প্রথম দিকে সঞ্জীব দু-একবার বলেছিল, এত কষ্ট করে ঘনঘন আসবার দরকার কী? আমি তো ভালোই আছি।

সর্বাণী সে-কথায় কান দেয়নি। তাই এখন আর কিছু বলে না। ওর মুখের দিকেও চোখ তোলে না। সর্বাণী নীরবে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখদুটো ভিজে ওঠে। নির্দিষ্ট সময়টুকু ফুরিয়ে গেলেই ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। সঞ্জীব তখন কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে। তারপর তার সেল্‌এ গিয়ে শুয়ে পড়ে।

•

পাগল

শ্রাবণের রাত, কিন্তু আকাশভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন। মাঝে মাঝে ভাসমান ভেলার মতো দু-একখণ্ড ছিন্ন মেঘ। একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘর আলোয় আলোময়। প্রথমেই চোখ পড়ল, আমার পশ্চিমের জানালার ওপারে নারকেল-সুপারির ঘন বনের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একখানা সুগোল স্বর্ণথালা, দীর্ঘ নৈশ পরিক্রমায় কিঞ্চিৎ ম্লান। হঠাৎ মনে হল, আমারও নৈশ রাউন্ডের পালাটা আজ সেরে ফেললে হত। বর্ষা-ঋতুর মেজাজের ঠিক নেই। কালই হয়তো আবার বৃষ্টিবাদল শুরু হবে। শেওলা-ধরা রাস্তাগুলো মারাত্মক রকম পিছল হয়ে উঠবে।

এ হেন মনোরম দৃশ্য দর্শনে যে-কোনো লোকের মনে কবিত্বের উদয় হবে, এইটাই স্বাভাবিক। আমার যে এমন একটা অদ্ভুত গদ্যময় 'আইডিয়া' মাথায় এল, তার কারণ মাসে অন্ততঃ একবার ঐ 'রাউণ্ড' কর্মটি আমার অবশ্য কর্তব্য। গভীর রাত্রে সারা জেলময় টহল দিয়ে দেখতে হয়, আমার বিশ্বস্ত প্রহরীকুলের ক'জন জেগে আছেন।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাঁক ঘুরে সেল-ব্লকের দিকে রওনা হয়েছি, কানে এল আবেগ-কম্পিত গভীর কণ্ঠের আবৃত্তি, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতার কটি লাইন ঃ

হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো
কহেনি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী-কুঞ্জে,
তরুরে ঘিরেছে লতা।

এত যে গোপন মনের মিলন
ভুবনে ভুবনে আছে,
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ
প্রথম কাহার কাছে।

থমকে দাঁড়ালাম। কে ও! 'স্বদেশীবাবুরা' অনেকেই তো জেলে আসবার পর হঠাৎ কবি হয়ে ওঠেন জানি। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাস বিচিত্র নয়। কিন্তু বর্তমানে তারা কেউ এখানে নেই। সবাই সাধারণ শ্রেণীর বন্দী। চীফ হেডওয়ার্ডার আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'গোপেন পাগলা, হুজুর। সারারাত ধরেই চলছে। আজ 'পূর্ণমাসী' কিনা?'

Lunacy'র উপর Lunar influence আছে শুনেছি। যদি থাকে চন্দ্রের সঙ্গে পাগলের এই জ্ঞাতি-সম্পর্কের মূল কোথায়, সেসব বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। আমরা, জেলের লোকেরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ণিমার দিনে সমুদ্রে যেমন উত্তাল জোয়ার দেখা দেয়, তেমনি উদ্বেল চাঞ্চল্য জাগে পাগলের মনে। রহস্য ও গভীরতার দিক থেকে উভয়ের হয়তো কোনো মিল আছে। যাই হোক, আমাদের 'মেণ্টাল' ওয়ার্ডের কর্মীরা আগে থেকেই সতর্ক হয়ে থাকেন। বেশীর ভাগ পাগলকে সেদিন সেল্‌-এর বাইরে আনা বারণ। কাছাকাছি যাওয়াটাও নিরাপদ নয়, কি জানি কি ছুঁড়ে বসে। চীফ আমাকে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল, 'এখন আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই, হুজুর।'

আমি তখন মুগ্ধ হয়ে শুনছি:

মেঘের মতন আপনার মাঝে
ঘনায়ে আপন ছায়া,
একা বসি কোণে জানিত বাঁচিতে
ঘন-গম্ভীর মায়া।

বললাম, 'কী আর করবে? চল না, দেখে আসি।'

আমাদের দিকে নজর পড়তেই মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গোপেন চ্যাটার্জী:

হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ,
হাসিয়া সবাই কহে,
যে কথা রটেছে একটি বর্ণ
বানানো কাহারো নহে।

'হেঁ-হেঁ, আমার কাছে চালাকি চলবে না, বাবা। সব ধরে ফেলেছি।... উঃ!'

সহসা যেন কোনো উৎকট যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। 'মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না...' বলতে বলতে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ল, সমস্ত দেহটা অসাড় হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'একটু জল, আমাকে একটু জল দে মতিদা। মতিদা...ও, সে

তো নেই।'

চীফকে বললাম, 'জল চাইছে নাকি ?'

'না হুজুর, ঐরকম করে মাঝে মাঝে। এখন কি ওর জ্ঞান আছে ? শুনেছি, ওর বাড়ির লোকগুলো বড্ড মারধর করত। সারাদিন বেঁধে রেখে দিত। দেখুন না, শেকলের ঘষা লেগে-লেগে বাঁ হাতের ওপর দিকটায় কি রকম ঘা হয়ে গেছে।'

গোপেন চ্যাটার্জী নন-ক্রিমিন্যাল ল্যুনাটিক। অর্থাৎ ওর বিরুদ্ধে কোনো ক্রাইম বা অপরাধের অভিযোগ নেই। ওর একমাত্র অপরাধ, ও পাগল। কয়েক দিন আগে এস. ডি. ও.'র ওয়ারেণ্ট বলে জেলে ভর্তি হয়েছে। অর্ডার শীটে যে সামান্য পরিচয় আছে, তার থেকে জানা যায়, লোকটি বি. এ. পাস। এক সময়ে স্কুলমাস্টার ছিল। পরে কী কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বই-এর দোকান দিয়েছিল। বছর তিরিশেক বয়স। ঘরে তরুণী স্ত্রী আর বাপের আমলের একটি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। বছর তিনেক আগে একবার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ওষুধপত্র খেয়ে সেরে যায়। কিন্তু লোকটা কোনোদিনই ঠিক স্বাভাবিক নয়। বড্ড খেয়ালী আর একগুঁয়ে। অত্যন্ত পড়াশুনার ঝোঁক।

গত কয়েক মাস ধরে আগের সেই রোগটা আবার দেখা দিয়েছে এবং ক্রমশ বেড়ে বেড়ে বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তাকে বাড়িতে রাখা স্ত্রীর পক্ষে বিপদজনক। তাছাড়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা এবং ব্যয় বহনও তার সম্পূর্ণ অসাধ্য। বাধ্য হয়েই তাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

এস. ডি. ও. মোটামুটি পুলিস তদন্তের পর আদেশ দিয়েছেন, গোপেন চ্যাটার্জীকে ইণ্ডিয়ান ল্যুন্যাসি অ্যাক্টের দ্বাদশ ধারায় জেলহেফাজতে স্থানান্তরিত করা হোক। সেখানে সে সিভিল সার্জনের অবজারভেশন অর্থাৎ পরীক্ষাধীন থাকবে। তিনি যথাসময়ে তাঁর অভিমতসহ রিপোর্ট দাখিল করবেন।

রাউণ্ডের পরদিন সকালে অফিসে বসে কাজ করছি। আরদালী এসে জানাল 'একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, সঙ্গে একটি মহিলাও আছেন।'

ডেকে পাঠালাম। ভদ্রলোকটি প্রায় মধ্যবয়সী। বেশ সপ্রতিভভাবে ঘরে ঢুকে সঙ্গিনীকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি গোপেন চ্যাটার্জীর স্ত্রী।'

হঠাৎ কণ্ঠে ও চোখে-মুখে অনেকখানি উদ্বেগ টেনে এনে প্রশ্ন করলেন, 'ও কেমন আছে স্যার ?'

মেয়েটির মুখে বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তার ছায়া চোখে পড়ল না। সাজ-পোষাকের মধ্যে বাহুল্য না থাকলেও এমন একটি সযত্ন পারিপাট্য লক্ষ্য করলাম, স্বামীর এই অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে যেটা কেমন যেন বেমানান বলে মনে হল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ওর কে হন ?'

'আমি ? মানে, গোপেনের ? সম্বন্ধী। এর দাদা।' বলে, তরুণীটির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

'আপন দাদা ?'

'আজ্ঞে না, জ্ঞাতি সম্পর্ক। সাক্ষাৎ আপন বলতে এর বিশেষ কেউ নেই। দু-একজন যারা আছে, তারাও···বুঝতেই তো পাচ্ছেন স্যার, বিপদ দেখে সরে দাঁড়িয়েছে। আমি আর তা পারলাম না। খবর পেয়েই কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসতে হল। যাক সে কথা। গোপেনকে আপনারা কবে নাগাদ রাঁচি পাঠাচ্ছেন স্যার?'

'সে এখনো অনেক দেরি!'

'অনেক দেরি!' বেশ কিছুটা নিরাশ হলেন ভদ্রলোক। তরুণীর মুখেও খানিকটা দুর্ভাবনার ছাপ পড়ল। তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান?'

জবাব না দিয়ে সে তার জ্ঞাতি-দাদার মুখের পানে তাকাল। তিনি বললেন, 'দেখা করে আর কী হবে? ওসব কি আর চোখে দেখা যায়? আমিই সইতে পারি না, ও তো স্ত্রী···তার ওপরে ছেলেমানুষ।'

ওরা উঠবার আয়োজন করতেই, আমি ভদ্রলোককে সোজাসুজি প্রশ্ন কবলাম, 'ওকে কি খুব মারধর করা হত?'

দুজনকেই যেন চমকে উঠতে দেখা গেল। চোখে-মুখে কেমন একটা ত্রাসের চিহ্ন। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, 'না-না, মারধর কে করবে?'

'মতি কে?'

'মতি! ও, হ্যাঁ। মতি ওদের চাকর ছিল একসময়ে। কিছুদিন হল চলে গেছে।'

'নিজেই চলে গেছে না ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'না। মানে, কাজকম্মে গাফলতি দেখে ও-ই বোধহয়···'

জ্ঞাতি-ভগিনীর দিকে তাকিয়ে কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি প্রস্থান কবলেন।

ডক্টর মিত্রকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি পাগলের পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যেমনি জটিল, তেমনি রহস্যময় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্মান্তিক। তার অতি সামান্যই আমরা উদ্ধার করতে পারি। পুরোটা যদি পাওয়া যেত, ঐ এক-একটি পাগল নিয়ে লেখা যেত এক-একখানা মহাভারত।

গোপেন চ্যাটার্জীর বিকৃত মানসের পিছনেও যে কোনো দুর্ভেদ্য রহস্য দাঁড়িয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার কোনো আভাসও কি কোনোদিন পাওয়া যাবে না? মতি হয়তো কিছুটা বলতে পারত। খোঁজ করবার জন্য পুলিসের সাহায্য নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময়ে সে নিজেই এল মনিবের সঙ্গে দেখা করতে।

সিভিল সার্জনের নির্দেশে গোপেনকে তখন সেলের বাইরে আনা একদম নিষেধ। মতিকেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। তবু গেলাম। ওকে দেখেই গর্জে উঠল গোপেন, 'এই হতভাগা, কোথায়

ছিলি অ্যাদ্দিন ? তোকে আমি ডিসমিস করবো। এরা আমাকে ধরে-ধরে মারে, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখিস, না ?'

মতির দু' চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, 'এখানে তো আর তারা আসতে পারছে না। এই বাবুরা কত যত্ন করে তোমার দেখাশুনো করছেন। এদের কথা শুনে আর ক'টা দিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকো। তারপর একটু ভালো হলেই বাড়ি নিয়ে যাবো।'

'বাড়ি!' চোখদুটো কেমন উদাস হয়ে উঠল গোপেন চ্যাটার্জীর, 'আমার আবার বাড়ি কোথায় ? না-না, বাড়িঘর আমার কিছুই নেই। **I have no home.'** হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, 'এই যে স্যার, কেমন আছেন ?'

'ভালো। আপনিও তো আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে গেছেন দেখছি।'

'ভালো ! কী হবে ভালো হয়ে ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল সে। তারপরেই বলল, 'আপনারা আমাকে বই পড়তে দেন না কেন ?'

'বই পড়বেন আপনি ?'

'হ্যাঁ। **I want to read and read and know things which nobody has ever known.'**

প্রথম দিকে ওর পীড়াপীড়িতে জেল-লাইব্রেরী থেকে দু-একখানা উপন্যাস পাঠানো হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তার একটা পাতাও নেই, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাইরে উড়িয়ে দিয়েছে। মেট আপত্তি করাতে বলেছিল, সব মিছে কথা লিখেছে'। কেউ কিচ্ছু জানে না।

চাকরটিকে অফিসে ডেকে এনে দু-চারটি প্রশ্ন করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

গোপেনের বাপের আমলের চাকর মতি দাস। অল্প বয়সে মা মারা যাবার পর ও-ই তাকে মানুষ করে তোলে। ছোট থেকেই একটু পাগলাটে ধরনের। নানারকম উদ্ভট খেয়াল মাথায় লেগেই আছে। আব্দার-উৎপীড়নের অন্ত নেই। অনেক সময় বাপও সেগুলো বরদাস্ত করতে পারতেন না। ওকেই বেশীর ভাগ সইতে হত। তিনি যেদিন চলে গেলেন, তারপর থেকে সবটাই ঐ চাকরের ঘাড়ে এসে পড়ল।

কর্তা বেঁচে থাকতেই ছেলেকে বি-এ. পাস করিয়ে এই শহরে স্কুলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। গোপেন কিছুতেই রাজী হল না। তারপর হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে খুলে বসল একটি বইএর দোকান। বেশী করে বই পড়া যাবে, ঐ ছিল তার প্রধান বাতিক। একটি লোক রাখা হল। দোকান দেখাশুনো সে-ই করে, ও এক কোণে বসে বসে পড়ে। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে বসল। সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল কোনো এক গ্রামে, শহর থেকে দিনমানের পথ। সেখানেই একটি বাপ-মা-মরা পরের বাড়িতে মানুষ হওয়া বয়স্থা মেয়েকে

পছন্দ করে রাতারাতি বিয়ে করে নিয়ে এল।

পরদিন থেকে গোপেন একেবারে অন্য মানুষ। আগে কোথায় থাকত তার ঠিক নেই, খাবার সময়ও বাড়ি ফিরত না। এবার আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। অনেকদিন দোকানেও যাওয়া হয় না। যখন তখন শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। বইএর নেশা পড়ল গিয়ে বউএর উপর। সারাদিন দুজনে মিলে হাসিগল্প, খুনসুড়ি।

বৌ বেচারী বিপদে পড়ল। গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। তার ইচ্ছা রান্না-বান্না, কাজকর্ম করে, মাঝে মাঝে এবাড়ি-ওবাড়ি সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গেও একটু মেশে, কিন্তু গোপেন ছাড়বার পাত্র নয়। কখনো যদিবা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিংবা জোর-জুলুম করে রান্নার দিকে যায়, কিংবা ভাঁড়ার গোছাতে বসে, মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই জোর তলব। একটু দেরি হয়েছে কি নিজেই এসে তাড়া লাগায়, অনেক সময় হাত ধরে টানাটানি করে। বৌ লজ্জায় মরে যায়, চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করে, 'আঃ, করছ কি! কাজ রয়েছে না?' 'থাক কাজ' বলে এক-রকম জোর করেই ধরে নিয়ে যায়। কখনো বারান্দায় নিয়ে বই খুলে বসে. 'শোনো না, কী সুন্দর লিখেছে এইখানটা?'

মতিরও এসব বাড়াবাড়ি ভালো লাগত না। মাঝে মাঝে বোঝাতে চেষ্টা করত, দোকানটার দিকে নজর না দিলে সব যে যেতে বসেছে। সংসার চলবে কেমন করে? বৌকেও বলত, অত আস্কারা দিও না. বৌদিদিমণি। একটু শক্ত হও। চারদিকে যে নিন্দেয় কান পাতা যায় না।

বৌ কথা বলত না, কিন্তু মুখখানা পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠত।

এর পরে শুরু হল মান-অভিমান, তার সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি। গোপেন কোনো কোনোদিন না খেয়েই দোকানে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বৌও ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। মতি দুপক্ষকেই ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে। দু-চারদিন ভালোয় ভালোয় কাটে। আবার একদিন কথা বন্ধ। গোপেন রাত কাটায় বাইরের ঘরের তক্তপোশে আর বৌ শোবার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে পড়ে থাকে।

এই অবস্থা যখন চলছে তখন এলেন 'শালাবাবু'। গোপেনের চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড়, কিন্তু চেহারায় তারুণ্যের জলুস। অবস্থা ভালো, দিল খোলা, খরচপত্রে দরাজ হাত। এদিকে কথাবার্তায় যেমন আমুদে, তেমনি চটপটে। তার সামনে কারো গোমরা মুখে থাকবার উপায় নেই।

'শালাবাবু'র আসবার পরের ইতিহাস বলতে গিয়ে মতি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাই আমিও আর পীড়াপীড়ি করলাম না। উঠবার আগে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, 'ওসব বড় ঘরের বড় ব্যাপার, বাবু। আমি চাকর, আমার কিছু না বলাই উচিত। তবে ছেলেটার জন্যে বড় দুঃখ হয়। এতটুকু থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

'শালাবাবু' করিতকর্মা লোক। দুদিন আদালত মহলে ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেলেন যে, পাগলের আসল ভাগ্য-নিয়ন্তা সিভিল সার্জন। তাঁরই কলমের

উপর নির্ভর করছে গোপেনের ভবিষ্যৎ গতিবিধি। খোঁজ নিয়ে জানলেন, তখন ঐ পদটি যিনি অলংকৃত করছিলেন, তিনি প্রৌঢ় হলেও বিপত্নীক। জ্ঞাতি-ভগিনীকে সঙ্গে করে সন্ধ্যার দিকে ঘনঘন তাঁর কুঠিতে গিয়ে আবেদন-নিবেদন শুরু করলেন, যাতে করে এই দুঃস্থ পরিবারের মুখ চেয়ে ছেলেটাকে যত শীঘ্র সম্ভব রাঁচি পাঠিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে ফল হল। সিভিল সার্জন গোপেনের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যে-রকম গরম গরম 'নোট' দিতে লাগলেন, তাতেই বুঝলাম, 'শালাবাবু'র সিদ্ধিলাভে আর দেরি নেই। ডাক্তার সাহেবের 'নোট' পড়ে এস. ডি. ও. সাহেবও তৎপর হয়ে উঠলেন এবং রাঁচি মেণ্টাল হসপিটালে একটি বেড সংগ্রহ করতে সাধারণতঃ যতটা সময় লাগে, তার অনেক আগেই গোপেন চ্যাটার্জীর জায়গা হয়ে গেল।

গোপেন চলে যাবার ক'দিন পরে মতি এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। এর আগেও মাঝে মাঝে মনিবকে দেখে গেছে এবং আমাকেও দেখা দিয়ে গেছে। এবারে ওর সঙ্গে ছিল দোকানের সরকার। তার হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। বলল, 'দোকান ওরা বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা টানার মধ্যে এই কাগজগুলো ছিল। বাবু বসে বসে লিখত। আপনার কাছে যদি রেখে দেন···'

বললাম, 'আমি ওগুলো দিয়ে কী করবো ?'

কর্মীটি মতির মুখের দিকে তাকাতে সে বলল, 'রেখে দিন বাবু। যদি কোনোদিন ভালো হয়ে ফিরে আসে।'

বাণ্ডিলটা তখনকার মতো আমিও ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম। ক'দিন পরে খুলে দেখবার কৌতূহল হল। কয়েক শীট্ আলগা কাগজ। হাতের লেখাটা হিজিবিজি ধরনের। এখানে সেখানে চোখ বুলিয়ে মনে হল, ছাড়া-ছাড়া গোছের ডায়েরী জাতীয় রচনা। মাঝে মাঝে এক-একটা তারিখ বসানো আছে। সেই হিসাবে পর পর সাজিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম ঃ

১২/৮/৪২

মতিদা জিজ্ঞেস করছিল, ও-বাবু আর কতদিন থাকবে ? আমি বললাম, কেমন করে জানবো ? শুনে গজগজ করতে করতে সে চলে গেল। তাহলে কি আমার মতো ও-ও কিছু সন্দেহ করেছে, মন্মথ আর বীণার মধ্যে ?···না না, এসব আমার ঈর্ষাকাতর ছোট মনের নীচতা। বীণা আমাকে আর যেন সইতে পারছিল না। **I was too much for her.** আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মন্মথবাবু এসে আমাদের দুজনকেই মুক্তি দিলেন। তাছাড়া ভদ্রলোক ভারী হাসিখুশী, সংসারে এই রকম হাল্কা মানুষের দরকার আছে। আমার মতো স্বভাবগম্ভীর **serious type**এর পুরুষের কাছে মেয়েরা সহজ হতে পারে না।

২০/৮/৪২

মতিদা বলছিল, পাড়ায় বড় নিন্দে হচ্ছে। 'শালাবাবু'কে এবার চলে যেতে বলা দরকার। আমি ধমকে উঠলাম, তা কেমন করে হবে ? কুটুম্ব মানুষ না। ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল—কুটুম্ব !

সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি করছে ওরা। মন্মথ লোকটা ভালো নয়। কিন্তু বীণা ?

বীণা তাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন ? তবে কি সে-ও ? ছিঃ ছিঃ, এসব কী ভাবছি আমি ? বীণা যে একান্তভাবে আমার।

২৫/৮/৪২

নিজের এই সন্দিগ্ধ মনের জন্যে নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু দুপুর-বেলা হঠাৎ এসে পড়ে যা দেখলাম, তাই বা উড়িয়ে দিই কেমন করে ?

১/৯/৪২

মনে হচ্ছে, বীণা আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বাধা দেবো কি ? না, দেখা যাক। কিন্তু কেমন করে বুঝবো ওরা কতদূর এগিয়েছে। আমার সামনে তো ওরা নিজেদের মেলে ধরতে পারে না, বরং ইদানীং যেন একটু সাবধান হয়ে চলছে।

এক কাজ করলে কেমন হয় ? বছর কয়েক আগে একবার আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বীণা তা জানে। আমার ঠাকুর্দা পাগলা গারদে ছিলেন। সে কথাও ওকে বলেছি। আজ থেকে আমি আবার পাগল হয়ে যাই না কেন ? কথাটা নিজের কাছেই বড় হাস্যকর ঠেকছে। তা হোক। তবু একবার দেখতে চাই। সে কি এত ঠুনকো ? একবার নিজের চোখে যাচাই করে দেখতে চাই।

দুনিয়া বড় সাবধানী। তার অনাবৃত সত্য রূপ দেখতে হলে আত্মগোপনের প্রয়োজন। আমি তো অদৃশ্য হবার মন্ত্র জানি না। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতার 'কবি'ও আমি নই, যাকে দেখে…

'হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে যে কোনো কথা বোঝে।' আমার হাতে একটিমাত্র উপায় আছে,…পাগলের সাজ, নিজেকে গোপন করবার সবচেয়ে সহজ আবরণ।

আর একটা কাজ করতে হবে। মতিকে এখানে রাখা চলবে না। ও এসব বুঝতে পারবে না, ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ও এই সময়ে আমাকে ফেলে বাড়ি যেতে চাইবে কি ? যেমন করে হোক পাঠাতেই হবে।

৭/৯/৪২

আশ্চর্য ফল পেয়েছি। আমার আবরণের সামনে ওদের আবরণ খুলে পড়ে গেছে। হাসছি, গাইছি, আবোলতাবোল বকছি। বীণা প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়ে-ছিল। বোধহয় ভেবেছিল, এবার নানারকম উৎপাত শুরু করবো। জিনিসপত্র ভাঙবো, ফেলবো, হয়তো মারধর করবো। সে-সব কিছু করছি না দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মন্মথও খুশি। আমি উৎপাত করতে চাই না, শুধু দেখতে চাই।

কিন্তু এ কী দেখছি ! এ কী দেখলাম !

আমার শোবার ঘরের দক্ষিণে ঐ খোলা বারান্দায় কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বীণা আসবার পর মৃদু জ্যোৎস্নায় মাদুর বিছিয়ে কত নিভৃত সন্ধ্যা সেখানে আমরা কাটিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যা গড়িয়ে মধ্যরাতের সীমানায় গিয়ে ঠেকেছে, জানতে পারিনি। কাল দেখলাম, সেই মাদুরখানা পেতে ওরাও গিয়ে ঘন হয়ে বসল সেইখানটিতে। আমাকে দেখে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করল না। হেসে উঠলাম, যদিও সে হাসি আমার নিজের কানে শোনাল ঠিক কান্নার মতো। বীণা চমকে

উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে দিতে চাইল। মন্মথ তাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, কী হল, ভয় পেলে নাকি? আরে, ও তো একটা পাগল।

সত্যিই তো, আমি পাগল, আমার কোনো অনুভূতি নেই।

১০/৯/৪২

এ আমার কী হল! অভিনয় করতে গিয়ে এ কোন্ ব্যাধি টেনে আনলাম! মাথার মধ্যে কী তীব্র যন্ত্রণা, শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছে! ওদের এই স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা আমি আর সইতে পারছি না। দেখলেই সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে, মাথায় খুন চেপে যায়। সেদিন ছুটে গিয়ে বীণার হাত চেপে ধরেছিলাম। ও চেঁচিয়ে উঠল। মন্মথ দৌড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে নিল। আমার মুখের উপর ঘুষি মেরে ফেলে দিল শানের উপর। তারপর সে কি বেপরোয়া লাথি!

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ওরা যখন ঘুমুচ্ছিল, কোনোরকমে দোকানে চলে এসেছি। সর্বশরীরে ব্যথা। তার চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। তবে কি সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাবো? মতিদা আসছে না কেন? এখনো কি সময় হয়নি? ক'দিনের ছুটি, তাও ভুলে গেছি। কোনোকিছুই যেন মনে করতে পারছি না।

এর পরে আরো কিছু লেখা আছে। অত্যন্ত অস্পষ্ট, পাঠোদ্ধার করা শক্ত। সম্ভবত গুছিয়ে লিখবার মতো মন বা মাথার অবস্থা আর ছিল না। পাগল সেজে দুনিয়াটাকে দেখতে চেয়েছিল গোপেন চ্যাটার্জী। দেখবার পর সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে গেল।

গোপেন চলে গেছে প্রায় বছরখানেক। তার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। হঠাৎ রাঁচি মেণ্টাল হসপিটাল থেকে একটা চিঠি এসে হাজির। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাচ্ছেন, 'আপনার জেল থেকে অমুক তারিখে গোপেন চ্যাটার্জী নামে যে এন-সি-এলটিকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আগামী ১৭ই তারিখে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। খবরটা যেন তার আত্মীয়স্বজনদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়।'

গোপেনের স্ত্রীর সন্ধানে লোক পাঠালাম। সে ফিরে এসে জানাল, বাড়িতে তালা বন্ধ। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বলেছে, তারা এখানে বরাবর থাকে না, মাঝে মাঝে আসে।

১৭ই সকালের স্টীমারে গোপনের আসবার কথা। সে এল না। তার বদলে এল তার চিঠি। খামের উপর কেবল আমার সরকারী পদের উল্লেখ থাকলেও ভিতরটা ব্যক্তিগত ঃ

শ্রীচরণেষু,

মতিদা একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার কাছে আপনার কথা শুনলাম। তার থেকে, কেন জানি না, আপনাকে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হল।

আপনি শুনে থাকবেন, আমি ভালো হয়ে গেছি। কিন্তু একথা কেমন করে

বোঝাবো, এইটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। তবে, এর সব পরিণাম আমি একাই মাথা পেতে নিলাম, আর কাউকে সেটা ভুগতে হবে না। দুনিয়াটা এমনিতেই এত জটিল, নিজেকে দিয়ে সে জটিলতা আর বাড়াতে চাই না। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

হতভাগ্য গোপেন।

সেইদিনই কিছুক্ষণ পরে মেণ্টাল হাসপাতালের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল ঃ গত রাত্রে গোপেন চ্যাটার্জীকে তার শয্যায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা বর্তমানে তদন্তাধীন। ফলাফল যথাসময়ে জানানো হবে।

অন্য লোক

বড় থানায় বদলী হয়ে আসবার পর থেকে রোজই বাসায় ফিরতে দেরি হচ্ছিল। অনেক কাজ। এ অঞ্চলের লোকগুলোও বিশেষ শান্তশিষ্ট নয়। তার উপরে, যাকে রাজনৈতিক চেতনা বলে, সেদিক দিয়ে বেশ এগিয়ে গেছে। রাত আটটা-ন'টার আগে ও-সি• উঠতে পারেন না।

ইদানীং সেটা দশটা-এগারোটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। গোড়া থেকেই সহিংস আন্দোলন, ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে যাচ্ছিল পুলিসী তৎপরতা। যে রাতে ফোর্স নিয়ে বেরোবার দরকার হত, উৎপলবাবু সময়মতো বাসায় খবর পাঠিয়ে দিতেন।

সেদিন ন'টা আন্দাজ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সতী মদনকে ডেকে বলল, 'দ্যাখতো, থানা থেকে কেউ এল বোধহয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি থানা থেকেই আসছি।'

'ওমা, তুমি।' স্বামীর গলা শুনে সতী নিজেই এসে দরজা খুলল, 'কী ব্যাপার, এত সকাল সকাল যে? আজ বেশী খুশী মনে হচ্ছে যেন।'

সত্যি, এতটা উৎফুল্ল উৎপল বোসকে অনেকদিন দেখা যায়নি। যখনই ফেরেন, হয় ব্যস্ত, গম্ভীর; নয়তো ক্লান্ত, বিমর্ষ। স্ত্রীর সঙ্গেও বড় একটা কথা হয় না। আজ একেবারে অন্য মানুষ। একগাল হেসে বললেন, 'দারুণ খবর আছে। বেশ কড়া করে এক কাপ চা কর দিকিন।'

'তা করছি। কিন্তু খবরটা কি, শুনবো না?'

'আসল গোদাটাকে ধরে ফেলেছি। আমার এই এতবড় এলাকায় গোটা মুভ-মেণ্ট চালাচ্ছিল ওই একটা লোক। পাত্তা পাওয়াই যাচ্ছিল না। কী একখানা ব্রেইন, আর তেমনি সাহস। অবিশ্যি আমিও তাকে তাকে ছিলাম। আজই দুপুরবেলা খবর এল…'

গোটা পুলিস-অ্যাকশানের একটা সবিস্তার বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন উৎপল-বাবু! সতী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'দাঁড়াও, পরে শুনবো। আগে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি।' আসলে-এসব কাহিনী সে শুনতে চায় না।

প্রথমটুকু শুনেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। পাছে মুখের উপরেও তার ছায়া পড়ে, স্বামী দেখতে পান, তাই তাড়াতাড়ি সরে গেল তাঁর সামনে থেকে।

চায়ের জল তখনও ফোটেনি। বাইরে থেকে সরকারী ডাক্তারের সাড়া পাওয়া গেল। উৎপলবাবু বসবার ঘরে যাবার আগে বলে গেলেন, 'দু-কাপ পাঠিও।'

চাকরের উপর চায়ের ভার দিয়ে এদিকের দরজার আড়ালে কান পাতল সতী।

ডাক্তার এসে বসতেই উৎপলবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন ?'

'অনেকগুলো ইনজুরী। দুটো বেশ মারাত্মক।'

'রাতের মধ্যেই হয়ে যাবে না তো ?'

'না, অত শীগগির কিছু হবে না। জ্ঞান-ট্যান বেশ রয়েছে দেখলাম। তবে, পালস্ খুব উইক। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে তো।'

উৎপলের কণ্ঠে একটা স্বস্তির সুর শোনা গেল, 'যাক, সকাল পর্যন্ত টিকলেই হল। কোনোরকমে নৌকায় তোলা। তারপর যা হয় হোক।'

চা খেতে খেতে একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন, 'যাই বলুন মশাই, চেহারা দেখে ভদ্দরলোককে মোটেই টেরারিস্ট বলে মনে হয় না।'

'কী মনে হয় ?' কৌতুকের সুর উৎপলবাবুর।

'কোনো নিরীহ আর্টিস্ট, কিংবা গোবেচারী অধ্যাপক।'

ও. সি. হেসে উঠলেন, 'তা, মন্দ বলেননি। কিন্তু চেহারা যাই হোক, সুরঞ্জন মজুমদার লোকটা যে কি ভীষণ, আজ হাতে-হাতে প্রমাণ না পেলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।'

সুরঞ্জন মজুমদার! কপাটের আড়ালে চমকে উঠল সতী। চোখের উপর ভেসে উঠল লম্বা ছিপছিপে গড়নের একটা সাধারণ চেহারার মানুষ। কিন্তু অসাধারণ দুটি চোখ। গাঢ় কালো মণি দুটোয় যেন স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। যখন-তখন উপচে পড়ছে কৌতুক-হাসির ঝলক। এই তো সেদিনের কথা। ইণ্টার্ণী হয়েছিলেন উত্তর বাংলার কোনো গ্রামে। সেখান থেকে পালিয়ে কোথা দিয়ে কেমন করে একদিন গভীর রাত্রে এসে উঠেছিলেন তাদের বাড়িতে। পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ সীমান্তে একটা গ্রাম। বেশীর ভাগ বাসিন্দা মুসলমান, শুধু তারা কয়েক ঘর হিন্দু। তার কাকার সঙ্গে কি করে যেন গোপনে যোগা-যোগ হয়েছিল। কোনোকালে অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন কাকা। তিনিই বলে পাঠিয়েছিলেন ক'দিন ওখানে বিশ্রাম নিতে। সারাদিন লুকিয়ে থাকতেন ভদ্রলোক তাদের গোয়াল-ঘরের একপাশে খড়ের গাদার পিছনে। সেখানে বসেই দুটো খেয়ে নিতেন। খাবার পৌঁছে দেবার ভার ছিল সতীর উপর। সবে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে তখন। শিশুকাল থেকে কাকার ভক্ত। তাঁর কাছে শুনে শুনে দেশ-হিতৈষণার যে রূপটি এতদিন তার কল্পনায় বাসা বেঁধেছিল, এই সুরঞ্জন মজুমদারের মধ্যেই সেটা প্রথম সমূর্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর মতো সতীও সেদিন ভেবে পায়নি এই মানুষের হাত থেকে কেমন করে বেরিয়ে আসে পিস্তলের গুলি, ঐ শান্ত চোখ দুটির মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে হিংসার আগুন।

খাবার নিয়ে সে যখন যেত, প্রথম দু-একদিন তার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। চোখ তুলে মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিন্তু এমন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ওঁর ব্যবহারে, কথাবার্তায়, বিশেষ করে সজীব সুন্দর হাসিটির মধ্যে যে জড়তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগেনি। মনে হত, যেন উনি ওদের কতদিনের চেনা, পরমাত্মীয়।

রাত ন'টার পর চারদিকের লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন তিনি বেরিয়ে আসতেন ওই খড়ের গাদার আড়াল থেকে। গল্পের আসর বসত ভিতর দিকের একটা ঘরে। কত মজার মজার কথা যে বলতেন ভদ্রলোক! হেসে লুটিয়ে পড়ত সতী। কোনো কোনোদিন আসরের চেহারা একেবারে বদলে যেত, যখন শোনাতেন তার নানা দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী, যার স্তরে স্তরে জড়িয়ে থাকত প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার পালা। সতী, তার মা, কাকা, ভাইবোনেরা যেন নিশ্চল পাথর হয়ে যেত।

দিন সাতেক মাত্র ছিলেন সুরঞ্জন। তারপর একদিন ভোরে উঠে সবাই দেখল তিনি চলে গেছেন। তার আগে কাউকে কিছু বলেননি। শুধু বোধহয় কাকা জানতেন। তার আগের দিন যখন খাবার নিয়ে যায়, সতীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, তোমাকে যদি পেতাম আমাদের কাজে।

আমাকে! চমকে উঠেছিল সতী, কিন্তু আমি তো আপনাদের কিছুই জানি না।

জানতে আর ক'দিন লাগে? আসল দরকার প্রাণ। এই ক'দিনেই দেখলাম সেটা তোমার আছে।

একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চে সতীর সারা দেহ কেঁপে উঠেছিল।

বছর কয়েক পরে পুলিসের দারোগার সঙ্গে যখন তার বিয়ে স্থির হল, সুরঞ্জন মজুমদারের সেই কথাগুলো নিশ্চয়ই মনে পড়েছিল। তবে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ হয়নি। তার বদলে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল একটি বাঁকা হাসি। এই রকমই ঘটে থাকে সংসারে। বিধাতার কৌতুকবোধ বড় প্রবল।

কিছুদিন আগে কাকা মারা গেছেন। বাবা তো গেছেন সেই কোন্ ছেলেবেলায়। মাথার উপর কেউ নেই। অতবড় মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাতে গিয়ে তার মা'র আর অত কিছু বাছবিচার করার মতো অবস্থা ছিল না। তিনি শুধু দেখেছিলেন, ছেলেটি সরকারী চাকরে, মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পাবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেলেন ও. সি.। পরপর অনেকগুলো রাত প্রায় ঘুমোতে পারেননি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাঁর নাকডাকা শুরু হল।

সতী রান্নাঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কয়েকখানা লুচি ভেজে ফেলল। তার সঙ্গে আলু-ছেঁচকি। দুধটা ফুটিয়ে নিল। তারপর ডেকে পাঠাল

মদনকে। অনেকদিনের পুরনো বিশ্বাসী চাকর। মনটা ভালো। মা'র উপরেই টানটা বেশী। যখন যা 'হুকুম' হবে একেবারে একপায়ে খাড়া। কিন্তু এই মুহূর্তে যে প্রস্তাব এল, শুনেই চোখ কপালে তুলল। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বাবু যদি জানতে পারেন ?'

'বাবু তো ঘুমোচ্ছেন।'

'কিন্তু হাজত-ঘরের পাহারায় যে সিপাইটা আছে, সে কি আর আমাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে ?'

সেটা অবশ্যই ভাববার কথা। সতী একটুখানি চিন্তা করে বলল, 'চুপিচুপি দেখে আয় তো কে আছে।'

সিপাইদের মধ্যে কয়েকজন তার খুব অনুগত। তাদের কেউ যদি থাকে সেইটুকুই সতীর ভরসা।

মদন ফিরে এল হাসতে হাসতে, 'কাছেধারে কেউ নেই মা। ওদিকে কে একটা নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দিন, একবার দেখি চেষ্টা করে।'

টিফিন ক্যারিয়ার তো দেওয়া চলে না। লুচি তরকারী রইল কলার পাতায় জড়ানো, তার উপরে ন্যাকড়া বাঁধা। কাঁচের গেলাসে এক গেলাস দুধ। মদন গিয়ে হাজতের জানালায় দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'বাবু।'

একটা মৃদু গোঙানির শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়া এল না। আরো কয়েকবার ডাকার পর উত্তর এল, 'কে ?'

'আপনার খাবার এনেছি।'

'চাই না।'

'নিন না। মা নিজে হাতে তৈরী করে পাঠালেন।'

'কি বলছ ?' মাথা তুললেন সুরঞ্জন।

মদন বলল, 'মা দিয়েছেন। আমাদের বড় দারোগাবাবুর পরিবার। লুকিয়ে পাঠিয়েছেন, আর কেউ জানে না।'

'তুমি কে ?'

'আজ্ঞে, আমি ওঁদের চাকর।'

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর বললেন, 'তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো, আমার কিছু লাগবে না।'

মদন আর কি করে ? ফিরে এল খাবার নিয়ে। সতী সব শুনল। কয়েক সেকেন্ড কি ভাবল। তারপর একটুকরো কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি লিখল ঃ আমি সতী। কোনোরকম উপায় থাকলে নিজেই যেতাম। খাবারটুকু খেয়ে নিন। তা নাহলে আমি রাগ করবো।'

কী ভেবে আবার শেষের কথাদুটো কেটে দিয়ে তার বদলে লিখল, 'ভীষণ দুঃখিত হবো।'

মদন যখন চলে যাচ্ছিল ডেকে ফিরিয়ে বলল, 'দাঁড়া, এই টর্চটা নিয়ে যা। পড়া হলে বলিস, টুকরোটা যেন ছিঁড়ে ফেলেন।'

ছোট্ট একটা টর্চ। তার আলোয় চিঠিটা পড়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন

সুরঞ্জন। বললেন, 'গেলাসে কী আছে ?'

'দুধ।'

সুরঞ্জন শুয়ে শুয়েই কোনোরকমে এগিয়ে এলেন জানালার ধারে। গরাদের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দাও।'

এক ঢোঁক এক ঢোঁক করে খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'খাবার আর এখন খেতে পারছি না। ওটা তুমি খেয়ে নিও, কিংবা আর কাউকে দিও। মাকে বলো, আমি সব খেয়ে নিয়েছি।'

চিঠির কথা মদনকে আর বলে দিতে হল না। সুরঞ্জন কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন এবং সেগুলো মদনের হাতে দিয়ে বললেন, 'দূরে কোথাও ফেলে দিও।'

এসব বিয়াল্লিশ সালের কথা। পাঁচবছর পর এল স্বাধীনতা। তার থেকে দেশের সাধারণ মানুষ কিছু পাক না-পাক, একদল সরকারী চাকুরের কপাল খুলে গেল। মাথার উপর থেকে সাহেবরা পাড়ি দিল স্বদেশে, মুসলমানেরা সরে গেল বর্ডারের ওপারে। তাদের মসনদ তো খালি থাকতে পারে না। নীচু-ওয়ালারা উঠে এসে দখল করল সেগুলো। বেশকিছু দারোগা কয়েক লাফে পুলিস সাহেব হয়ে বসলেন।

আর কিছু ভাগ্যবান লোক, যাঁরা দেশের কাজে জেল খেটেছেন, গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেই হোক, কিংবা বোমা-পিস্তল ছুঁড়েই হোক, তাঁদেরও একটা দল সোজা গিয়ে দখল করলেন মন্ত্রীত্বের গদি। গণতন্ত্রের কল্যাণে শাসনতন্ত্রের মালিক। অপ্রতিহত ক্ষমতা। কেউ কেউ তারই নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন।

উৎপল বোস তখন মালদ'র এস্. পি—জেলা পুলিসের বড় কর্তা। ইংরেজ আমলে তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল তাঁদের ভাষায় ল্য অ্যাণ্ড অর্ডার—শান্তি রক্ষা, চোর-ডাকাত-গুন্ডারের দমনে রাখা। সে ধারা বদলে গেছে। স্বাধীনতার পরে তাঁদের প্রধান কাজ দেশসেবা, অর্থাৎ মন্ত্রী, তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ ও অনুচরদের তাঁবেদারি।

আবগারী-মন্ত্রী এসেছেন জেলা-সফরে। সব কাজ ফেলে তাঁকে নিয়েই আছেন এস. পি.। কোথায় সভা, কোথায় পার্টি, কোথায় দলীয় বৈঠক। মন্ত্রী একা নন। তাঁর সঙ্গে আছেন দলের কয়েকজন পাণ্ডা। সকলেই আছেন সার্কিট হাউসে। ঘি, মাখন, পাঁঠা, মুরগী, কেক, সন্দেশের যোগান দিতে হচ্ছে সেখানে। সেটাও জেলা-কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। নিজের পকেট থেকে কি আর দিচ্ছেন তাঁরা ? নানাভাবে 'ম্যানেজ' করতে হচ্ছে।

ক'দিন থেকে এইসব নিয়ে এস. পি. এমনই ব্যস্ত যে সময়মতো খেতেও আসেন না। সেদিন সকালে বেরোবার সময় সতী বলল, 'তোমাদের মন্ত্রী যাবেন কবে ?'

'কি করে জানবো ? বোধহয় আর দেরি নেই। আসল কাজ, যে জন্যে এসে-ছিলেন, সেটা হয়ে গ্যাছে।'

'কি সেটা ?'

'মদ-গাঁজার দোকানের লাইসেন্স বিলি।'

'সেটাও কি মন্ত্রীরা করেন নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। এইগুলোই তো প্রধান কাজ ওঁদের। মাইনে-টাইনে তো আর বেশী নয়। মানে, বেশী নিতে পারেন না। সাধারণ লোককে দেখাতে হবে তো, দেশের জন্যে কতবড় ত্যাগ স্বীকার করছি আমরা। এদিকে…'

হঠাৎ থেমে গিয়ে গলা খাটো করে যোগ করলেন উৎপলবাবু, 'এ লোকটা একেবারে বেপরোয়া। কি করেছে জানো ? এখান থেকে অফিসিয়ালি যে লিস্ট তৈরী হয়েছিল, পুরোটাই বাতিল করে দিয়েছে। তারা কেউ লাইসেন্স পেল না।'

'কারা পেল তাহলে ?'

'সব শাঁসালো পার্টি। কিছু অবিশ্যি দলের লোকদেরও দিতে হয়েছে। তাহলেও যা শুনছি, পকেট বেশ ভারী করেই যাচ্ছে।'

'বল কী !' চোখ কপালে তুলল সতী।

উৎপলবাবু হেসে চলে গেলেন।

পরদিন মন্ত্রীর সম্মানে একটা বড় পার্টি দিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল। সরকারী বেসরকারী চাঁইরা সবাই রইলেন পিছনে। পদস্থ অফিসারদের স্ত্রীরাও নিমন্ত্রিত। সতী সাধারণতঃ এগুলো এড়িয়ে চলে। কিন্তু এবারে আর আপত্তি করল না। স্বামীর আগ্রহ। তাছাড়া মন্ত্রীটির অনেক কীর্তি-কাহিনী শোনবার পর তাঁকে একবার দেখবার ইচ্ছা হল।

নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে তাকে আসতে দেখা গেল। চারদিকে ঘিরে একরাশ অনুচর। সহাস্যে হাতজোড় করে ঢুকলেন। বেশ লম্বা চেহারা, চওড়াও সেই অনুপাতে। মুখের দিকে চেয়ে সতীর দুচোখ কুঁচকে উঠল। তিনি ? দূর ! এই রকম দুটো ভাঁজ ছিল নাকি তাঁর চিবুকের নীচে ? আর এই ফুটবলের মতো দুটো গাল ? এই ভুঁড়ি ? কী এক আশ্চর্য স্বপ্নময় আবেশ ছিল তাঁর চোখ-দুটিতে। আর এর ? অনেকটা কাছে এসে বসবার পর ভালো করে তাকিয়ে দেখল সতী। কেমন একটা ঘোলাটে স্থূল লোলুপ দৃষ্টি।

কিন্তু তবু যেন স্পষ্ট আদল আসে।

আবকারী-মন্ত্রীর নামটাও সতী জানত না। প্রয়োজন হয়নি। কৌতূহলও ছিল না। মন্ত্রী মানে মন্ত্রী। তাঁর নাম দিয়ে কি হবে ? এবার জেনে নিল পাশের মহিলাটির কাছ থেকে। সমস্ত মনটা হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল। তার পরেই কেমন একটা অস্থিরতা বোধ করল। মনে মনে বলল, কেন এলাম মরতে ? না-দেখা, না-জানাই তো ছিল ভালো।

কিছুক্ষণ পরেই উঠে পড়ল সতী। ভিতর থেকে কে যেন ঠেলে তুলে দিল।

উৎপলবাবু ফিরলেন রাত ন'টার পর। বাড়ি ঢুকেই সোজা অন্দরে, 'শুনছ ?'

'কি হল ?' সতী শুয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

'কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। চিনে ফেলেছে আমাকে!'

'কে?'

'কে আবার? ঐ একসাইজ মিনিস্টার, সুরঞ্জন মজুমদার। বটদিয়া থানায় যখন ছিলাম, ওকেই তো ধরে এনে হাজতে পুরেছিলাম। সেই সঙ্গে জোর ঠ্যাঙানি। সেই আগস্ট মুভমেন্টের সময়। তুমি জানতে না?'

'বাঃ, আমি কেমন করে জানবো কাকে কখন ধরে এনে হাজতে পুরেছ?'

'আরেকটা কথা বলছিল ভদ্রলোক, তোমাকে নাকি চেনে!'

'আমাকে! আমাকে কেমন করে চিনবে?'

'কী জানি? এক হতে পারে, সেই যে কোন্ এক ইন্টার্নী পালিয়ে এসে লুকিয়েছিল তোমাদের বাড়ি, তোমার কাকা তখন বেঁচেছিলেন। তার চেহারাটা মনে আছে? এ সে নয় তো? এও কিন্তু মস্তবড় টেরারিস্ট ছিল এককালে।'

সতী মাথা নেড়ে বলল, 'না-না, সে অন্য লোক।'

রাইটার

আগের দিন মহকুমা জেল থেকে যে-সব কয়েদী চালান হয়ে এসেছে তাদের 'হিষ্ট্রি-টিকেটগুলো' দেখতে গিয়ে জেলারবাবু লক্ষ্য করলেন, একখানা টিকিটের উপর দিকে অনেকখানি জায়গা কালিমাখা…দোয়াত উল্টে গেলে যেমন হয়। তবে, আপাততঃ তিনি যেটা চাইছিলেন, 'previous occupation' কী, সেটা পড়া যায়। স্পষ্ট লেখা আছে writer। তার ঠিক পরের অংশ এবং সেই সঙ্গে কোন্ অপরাধে কতদিনের সাজা ইত্যাদি তথ্য গাঢ় কালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। তা যাক। ওঁর এখনকার কাজ হল 'খাটানি পাশ' করা, অর্থাৎ কাকে কি কাজ দেবেন ঐ টিকিটে লিখে দেওয়া। সেই জন্যেই আগেকার পেশাটা জানা দরকার। খানিকটা সুবিধা হয়।

নাম-ঠিকানায় কালি পড়েনি। কয়েদীটিকে ডেকে পাঠালেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গড়ন, মুখে অল্প দাড়ি, প্রায় ঘাড় পর্যন্ত চুল, একটু এলোমেলো, মনে হল ইচ্ছাকৃত। চেহারায় হাবভাবে বেশ কিছুটা স্মার্টনেস আনবার চেষ্টা রয়েছে বোঝা যায়।

'তোমার নাম অনিল হালদার?' জিজ্ঞাসা করলেন জেলার।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

'রাইটার, মানে পদ্য-টদ্য লেখ নাকি?'

'এক-আধটু', লেখক-সুলভ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল অনিল, 'বেশীর ভাগ গল্প-উপন্যাস লিখি।'

'বেশ, বেশ। তা, জেলে এলে কেমন করে? আদি-রসের ব্যাপার বুঝি?'

অনিল উত্তর না দিয়ে মাথা নোয়াল। মুখের সেই হাসিটি অনেকখানি বিস্তৃত হল।

'ভালোই তো', মৃদু হেসে বললেন জেলারবাবু, 'ওসব বই শুনেছি বাজারে পড়তে পায় না। কিন্তু এ মামলায় তো জেলে আসা লাগে না শুনেছি। জরিমানা দিলেই চুকে যায়।'

'আমি ইচ্ছা করেই এলাম। একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে চাই।'

'বেরিয়ে গিয়ে কাজে লাগাবে? তবে তোমার যা লাইন, এখানে তার সুযোগ-সুবিধে কিছুই নেই। একেবারে নীরস, নারীশূন্য জগৎ।···সে যাক। এখানেও তোমাকে রাইটারের কাজ দেওয়া হল। আমরা বলি 'convict writer'। কয়েদীদের চিঠিপত্তর, দরখাস্ত লিখবে, অফিসের বাবুদের সাহায্য করবে।'

একজন কেরানী জেলারবাবুকে কাগজপত্র এগিয়ে দিচ্ছিল। সে বলল, 'রাইটার তো আমাদের রয়েছে স্যার।'

'তা হোক। একজন লেখককে তো আর মাকু চালাতে, র‍্যাঁদা ঘষতে কিংবা গম পিষতে দেওয়া যায় না।'

অনিল বলল, 'আমার একটা অনুরোধ আছে স্যার।'

'বল।'

'আমাকে দয়া করে সেল'এ থাকবার অনুমতি দিন। ব্যারাকে অনেক লোকের মধ্যে···'

'তোমার লেখার ব্যাঘাত হবে। বেশ, 'সেল'এই থাকবে তুমি।'

'আমদানী' সেরেস্তার ডেপুটি জেলার নিখিল সেন বাংলায় এম. এ. পাস করে সবে ঢুকেছেন চাকরিতে। এখনও সাহিত্যজগতের খবর-টবর রাখেন। লেখকদের সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, শ্রদ্ধাও আছে। তাঁরই দপ্তরে কাজ পড়ল অনিলের। খাতির করে বসালেন। (অফিসারের সামনে কয়েদীদের দাঁড়িয়ে থাকাই সাধারণ রীতি) বললেন, 'আপনার কোনো বই তো এখনো পড়বার সৌভাগ্য হয়নি আমার। দু'একটা নাম করুন তো। ভাবছি আনিয়ে নেবো।'

'খালি-খালি পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অনিল, 'আমি বেরিয়ে গিয়েই পুরো একসেট বই পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। আস্তে আস্তে পড়বেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। এখন নতুন কিছু ভাবছেন নাকি?'

'না, তেমন কিছু···'

'তাহলে শুরু করুন। লেখার পক্ষে জেল একেবারে আইডিয়াল জায়গা। নেহেরুর 'Discovery of India' তো এখানে বসেই লেখা। কাজকর্ম আপনাকে কিছু করতে হবে না। এই, ওঁকে এক দিস্তে সাদা কাগজ দিয়ে দাও তো।' অফিসে যে সিপাই কাজ করে তাকে নির্দেশ দিলেন ডেপুটিবাবু।

মাঝে মাঝে নিখিল সেন যখন রাউণ্ডে বেরোন, অনিলের সেলব্লকে গিয়ে খোঁজখবর নেন, 'কি রকম এগোচ্ছে লেখা? কোনো অসুবিধে নেই তো?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধে আর কী? তবে···'

'বলুন।'

অনিল ইতস্ততঃ করতে লাগল। ডেপুটি জেলার ভরসা দিলেন, 'আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই, অনিলবাবু। আমাকে সব বলতে পারেন।'

'বেয়াদবি মাপ করবেন স্যার! জানেন তো, লেখাটা যেমন নেশা, তার পেছনে তেমনি আর দু-একটা নেশার যোগান না দিলে…'

'নেশা!'

'হ্যাঁ, মানে একটু সিগারেটের ধোঁয়া, কখনো দু-এক কাপ চা।'

'স্মোকিং তো এখানে চলে না। আর চা-ও…আচ্ছা হয়ে যাবে'খন।'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো স্যার।'

'ধন্যবাদে কী হবে? তার চেয়ে অনেক বড় কিছু দিতে হবে। যাবার আগে একখানা উপন্যাস অন্ততঃ শেষ করা চাই।'

খালাসের আগে কয়েদীদের খাতাপত্র সেন্সর করিয়ে নিতে হয়! জেলখানার আইন। নড়চড় চলবে না। তার মানে, অনিলের লেখাগুলোকে রেখে যেতে হবে। তখন… তখন তো আর অতবড় একটা বাণ্ডিল পড়ে দেখা সম্ভব নয়। রসিদ দেওয়া হবে। পরে একদিন সেটা দেখিয়ে যে-কেউ এসে নিয়ে যেতে পারবে।

নিখিলবাবু বললেন, 'সেন্সর করা অবিশ্যি আমার কাজ নয়। তবে এটা আমিই দেখবো। অনেকদিন ধরে আগ্রহ নিয়ে বসে আছি।'

'কিন্তু স্যার', মুখ কাঁচুমাচু করে বলল অনিল, 'আমার যে কূলে এসে ভরাডুবি!'

'কি রকম?'

'প্রায় শেষ করে এনেছিলাম বইটা। এই সময়ে বাধা পড়লে…'

'মুড চলে যাবে', নিজেই স্বীকার করলেন নিখিলবাবু, 'আচ্ছা দেখি, কী করা যায়।'

তাঁর চেষ্টাতেই ব্যাপারটাকে 'স্পেশাল কেস' হিসাবে গণ্য করলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁকে বোঝানো হল, এ তো রাজনীতিক রচনা নয়, সাহিত্য, অর্থাৎ লিটারারী ম্যাটার্স, নিতান্তই নিরামিষ। সরকারের কোনো ভাবনা নেই।

'আপনি আসবেন স্যার। ঠিকানা তো অফিসেই আছে। দোতলা বাড়ি। সামনে একটু বাগান করেছি। গেটের গায়ে নাম লেখা আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না। যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।'

'নিশ্চয়ই যাবো,' অনিলকে গেটের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন নিখিলবাবু, 'আপনার লেখা আপনারই মুখ থেকে শুনবো, এ কি কম কথা!'

বারো বাই দুই বাই এফ গগন চৌধুরী লেন, বারাসত। অনেক খুঁজে খুঁজে বের করলেন নিখিল সেন। কিন্তু এ তো একটা বস্তি। নম্বরে ভুল আছে নিশ্চয়ই। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন? নিরর্থক। এরকম জায়গায় একজন লেখকের পক্ষে থাকা অসম্ভব। কাছেই থানা। সেখানে গিয়ে বরং খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

ও. সি. নিজেই ছিলেন। নামটা শুনে কপাল কুঞ্চিত করলেন, 'কি রকম

দেখতে বলুন তো ?' বর্ণনা শুনে জানতে চাইলেন, 'ঠোঁটকাটা ?'

'হ্যাঁ, ওপরের ঠোঁটে একটা কাটা দাগ আছে বটে।'

'রাইটার বলেছে বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিকই বলেছে। তবে, ওর পরে আর একটা শব্দ আছে—'কনস্টেবল'। সেটুকু চেপে গেছে। এখানেই ছিল। অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানা সিপাইদের আমরা অফিসের কাজে লাগাই। তাদের বলা হয় 'রাইটার কনস্টেবল'।

নিখিলবাবু শুনে থ। কালি-ঢালা টিকিটের রহস্যটা এবার বোঝা গেল। বললেন, 'কেস্‌টা কী ?'

'চুরি। তবে, মারাত্মক কিছু নয়, একটা খাসী। হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল বস্তির লোকগুলো। জনতার ব্যাপার। বুঝতেই পারছেন, থানা ঘেরাও করে ফেলল। সেণ্ডআপ না করে উপায় ছিল না। জেল হয়ে গেল, চাকরিটাও গেছে।'

ট্রেনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে মিহি-মোটা নানা সুরের ফেরিওয়ালার চিৎকার, ভিখারীর বেসুরো গান। হঠাৎ একটা চেনা গলা কানে যেতেই চমকে উঠলেন নিখিলবাবু।

'মাইসোর চন্দন ধূপ। খাঁটি চন্দনকাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরী। মনমাতানো গন্ধ…'

কাছে আসতেই বললেন, 'অনিলবাবু যে, কী খবর ?'

প্রথমে একটু চমক! সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠল ধূপওয়ালা, 'আমাকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর কাকে বলবো ?'

'কিন্তু আমার নাম তো অনিল নয়। তাছাড়া আপনাকে কখনো দেখেছি বলে মনেও হয় না।'

'বলেন কি! এতদিন কাটিয়ে এলেন আমাদের ওখানে।'

'আপনি ভুল করছেন।' বলে, আর দাঁড়াল না। ভিড়ের মধ্যে থেকে দরাজ গলায় হেঁকে চলল, 'মাইসোর চন্দন ধূপ। খাঁটি চন্দন কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরী। মাত্র পঞ্চাশ পয়সা প্যাকেট।'

দণ্ডিত বিচারক

তখনও সরকারী চাকরির জোয়াল কাঁধ থেকে নামেনি। সেটা টানতেই প্রায় সারাদিন কেটে যেত। লেখার অবসর মিলত সন্ধ্যার পর। তার আগে নদীর ধারে বা খোলা মাঠে একটা চক্কর দিয়ে নিতাম। এদিকে পা যেমন চলছে, ওদিকে মাথার ভিতরেও একটা চলন-ক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাকে তখনই এসে কলমের মুখে ফেলতে না পারলে আর ধরা যাবে না।

সেদিন একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরে সবে টেবিলে গিয়ে বসেছি, দ্বারদেশে

গৃহিণীর আবির্ভাব। বুঝলাম, হয়ে গেল। কলমের মুখে যে আসার জন্যে তৈরী হচ্ছিল সে আর এল না। আপাততঃ যিনি এলেন তাঁর মুখ থেকে ছেলেদের অবাধ্যতা, চাকরবাকরের চুরি, জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দর, কিংবা মিসেস অমুকের সদ্য তৈরী কোনো নতুন প্যাটার্নের গয়না, এরই একটা কোনো লম্বা ফিরিস্তি শোনবার জন্যে গুছিয়ে বসলাম।

কিন্তু উনি সেদিক দিয়ে গেলেন না। বেশ কিছুটা উদ্বেগের সুরে বললেন, 'নিখিলবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না তো!'

'এই কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন। তুমি আছো কিনা জিজ্ঞেস করেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।'

'একটু বসতে বললে পারতে।'

'বলেছিলাম। কোনো সাড়া দিলেন না। কী একটা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেলেন। আগেও তো এসেছেন ক'বার। বেশ হাসিখুশি। বসেন, গল্প করেন। এরকম তো কখনও দেখিনি। একা থাকেন। বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর-টবর এসে থাকবে হয়তো।

নিখিল সেন অ্যাডিশনাল সেসন জজ। বেশীদিন আসেননি। দেখাও খুব একটা হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। অতি সজ্জন ব্যক্তি। শান্ত, ভদ্র, মোলায়েম স্বভাব। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে। বসতে বলার পরেও সাড়া না দিয়ে চলে যাবেন, এরকম তো হবার কথা নয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

তাছাড়া, নিখিলবাবু সন্ধ্যার পর কখনো বেরোন না। লেখেন। আমার মতো অসার জিনিস নয়, অনেক বেশী জটিল, দরকারী ও গুরুভার বস্তু। জাজমেণ্ট। কোর্টে সময় পান না। সকালবেলায় তাড়াহুড়োর মধ্যেও হয়ে উঠে না। একটি কোলাহলহীন পল্লীর একা ঘরে রাত্রির নিরালা অবসরে নিবিষ্ট হয়ে বসেন। সাধারণ মামলা হলে স্টেনোকে ডিকটেশন দেন। কিন্তু যে-সব মামলায় প্রতিটি পদক্ষেপে ভেবে ভেবে এগোতে হয় এবং এগোতে এগোতে ভাবতে হয়, সেখানে নিজের হাতে লেখেন। সেজন্য সময় অনেক বেশী লাগে।

কোর্টেও সহকর্মীদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী সময় নেন। সাক্ষীর জবানবন্দি নেবার পর পুরোটা আবার তাকে তার নিজের ভাষায় তর্জমা করে পড়ে শোনানো হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সব ঠিক আছে কিনা। বেশীর ভাগ বিচারকই অত হাঙ্গামায় যান না, সাক্ষীর বাংলা বয়ান ইংরাজীতে লিখে নিয়ে তার নীচে অম্লান বদনে বসিয়ে দেন: '**Read out and admitted as correct**'—পঠিত এবং সত্য বলিয়া স্বীকৃত। আসলে পঠনকার্যটি উহ্যই থেকে যায়, আর 'স্বীকৃতি'স্বরূপ পেশকার হাত বাড়িয়ে হাকিমের ঐ সার্টিফিকেটের নীচে সাক্ষীর একটা সই বা টিপসই গ্রহণ করেন। সে বেচারা জানেও না কী সই করল।

স্বভাবতঃই নিখিল সেনের কোর্টে মামলা চলে ধীর বেগে। উকিলদের

অনেকক্ষণ আটক থাকতে হয়। তাঁরা বিরক্ত হন। আইনে তো অনেক কিছু লেখা আছে। সব অক্ষরে অক্ষরে মানতে হলে চলে ? আসলে এটা ওঁর একটা বাতিক। কেউ কেউ—তার মধ্যে নিখিলবাবুর সহকর্মীও আছেন কিছু কিছু…ঠাট্টা করে বলেন, 'উনি নিজেকে বড় বেশী 'conscientious judge' অর্থাৎ বিবেকবান বিচারক বলে মনে করেন।'

কিন্তু কী লাভ হল ? 'Slow' অর্থাৎ নিড়বিড়ে বলে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কথা শুনতে হয়। বছরে কে কতগুলো মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরেছেন, তার একটা হিসাব নাকি চেয়ে থাকেন হাইকোর্ট। সে ব্যাপারেও শোনা যায়, ওঁর রেকর্ড তেমন ভালো নয়। তবে, ঐ উকিল মহলই আবার বলাবলি করেন, কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী দু'রকম মামলাতেই আপীলে ওঁর রায় প্রায়ই বহাল থাকে। ভদ্রলোক সময় কিছুটা বেশী নেন বটে, কিন্তু যা লেখেন তার উপরে হাইকোর্টের বাঘা-বাঘা জজেরাও আঁচড়টি কাটতে পারেন না।

রাত আটটা নাগাদ সেন সাহেবের বাসায় গিয়ে পেঁছিলাম। তখনও ফেরেননি। চাকরটি, যে ওঁর রান্নাবান্না দেখাশুনো সবকিছু করে, উদ্বিগ্ন মুখে দরজার বাইরে সিঁড়ির উপর বসে আছে। জানতে চাইলাম, 'কোথায় যেতে পারেন সাহেব ?'

সে বলল, 'মাঝে মাঝে আপনার ওখানে ছাড়া কোথাও যান না। আপনি একটু বসুন স্যার, হয়তো এখনি এসে পড়বেন।'

আমি বসলাম না। আর কিছুটা গেলেই একটা বেশ বড় মাঠ। আমি কখনও কখনও বেড়াতে গেছি সেখানটায়। সন্ধ্যার পর লোকজনের আনাগোনা কম। শুধু দু-চারজন রেলের প্যাসেঞ্জার তাড়াতাড়ি থাকলে রাস্তা ঘুরে না গিয়ে ঐ পথে শর্টকাট করে। ঐ সময় কোনো গাড়িও ছিল না। চারদিক খোলা নির্জন। মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ। তাই ধরে কিছুটা এগোতেই দেখি, আবছায়া জ্যোৎস্নায় একজন লোক বেশ জোরে-জোরে পা ফেলে একবার ডান দিকে যাচ্ছে, আবার বাঁ দিকে ফিরছে। কাছে গিয়েই চিনলাম, সেন সাহেব। আমাকে দেখে থামলেন। চোখে-মুখে এমন একটা চাঞ্চল্যের ছাপ, যা এর আগে কখনও দেখিনি। বললেন, 'ও, আপনি! চলুন, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।'

আমি বললাম, 'বাড়ির খবর সব ভালো তো ?'

'ভালো। বাসায় যাবেন ? তার চেয়ে আসুন না এখানেই বসি।'

'বেশ।'

আশ্বিনের প্রথম। মাটি শুকনো কিন্তু রুক্ষ নয়। বেশ একটা কোমল ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। তার উপরে মৃদু চাঁদের আলো। পরিবেশটি মনোরম। সেন সাহেবের অবশ্য সেদিকে কোনো নজর ছিল না। মুখোমুখি বসবার পরেই প্রথম কথা হল, 'আজ একটা ডেথ্ সেণ্টেন্স্ দিয়ে

এলাম।' বলে, একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মনে হল। কিন্তু হাসির রেখাগুলো ফুটল না।

আমি হালকা সুরেই বললাম, 'আপনাদের কাছে সে আর এমন নতুন কী? খুনীরা খুন করবে, আপনারা ফাঁসির হুকুম দেবেন, আর আমরা ঝুলিয়ে দেবো। এটাই বরাবর চলে আসছে এবং চলবে।'

সেন সাহেব এসব দিকে গেলেন না। আগের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'এ কেসটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। দুটো রাত ঘুমোতে পারিনি। লোকটা যে গিল্টি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জুরি অবিশ্যি দু-ভাগ হয়ে গেছে। তবে, মেজরিটি আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু অর্ডারটা দেবার পর কেবলই মনে হচ্ছে, ভুল করিনি তো? ভেতরে ভেতরে কী রকম একটা অস্থিরতা বোধ করছি। আপনাকে আমি ফ্যাক্টগুলো বলতে চাই।'

'আমাকে বলতে চান!' শুনে আমি তো থ। আমি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আইনকানুন কী বুঝি? বিশেষ করে এমন একটা জটিল খুন-মামলার ব্যাপার, ওঁর মতো একজন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বিচারক তা নিয়ে বিচলিত।

সেন সাহেব বোধহয় আমার মনোভাবটা বুঝলেন। বললেন, 'এ রকম মামলা বড় একটা দেখা যায় না। আইনের কূট প্রশ্ন বিশেষ কিছু নেই। সেগুলো নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সব ঘটনা জানবার পর একজন চিন্তাশীল মানুষ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এই লোকটা সম্বন্ধে কী রায় দেবেন? সে খুন করেছে না করেনি? এইটুকুই শুধু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।'

আমি বললাম, 'আপনি বলতে চাইছেন. আমি নিশ্চয়ই শুনবো এবং আমার বুদ্ধিতে যা আসে বলবো। শুধু একটা কথা। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যা মনে করে, যাকে বলে 'কমনসেন্স ভিউ', সেটা তো আপনি জুরির কাছেই পাচ্ছেন। যদ্দূর জানি, জুরি-ট্রায়ালের উদ্দেশ্যও তাই।'

সেন সাহেব হাসলেন, বললেন, 'কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, কমনসেন্স জিনিষটাই যে সবচেয়ে 'আনকমন'। আর জুরির সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। চার্জ বোঝাবার সময়েই ওঁরা বুঝে নেন 'জজ সাহেবের' মতটা কী এবং সেই ঘাড় কাত করেন। তবু যে মতভেদ হয় তার অনেক কারণ। সে-সব থাক্। আপনি শুনুন:

ঘটনাটা ঘটেছিল জিলা-শহর থেকে দূরে একটা গ্রামে। বাসিন্দারা প্রায় সবাই গরীব চাষী। সামান্য জমিজমা নির্ভর। চাষবাসের সময় যখন আসে, মহাজনের গদি থেকে টাকা ধার করে। ফসল ওঠার ঠিক আগটায় তার লোক আসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যতটা পারে আদায় করতে। একটা লোকই আসে ফি বছর। তার নাম লছমন সিং।

গ্রামের এককোণে একটা খালি বাড়ি। মালিকরা থাকে না। তারই বাইরের দিকের ঘরটা ভাড়া নেয়। নিজে রান্নাবান্না করে খায়। লোকটার ওপর সবাই অসন্তুষ্ট। একে তো তার কাজটাই অত্যন্ত অপ্রিয়, তার ওপরে কথাবার্তা

ব্যবহার মোটেই ভালো নয়। টাকা দিতে না পারলে মা-বোন তুলে গালিগালাজ করে। স্বভাবচরিত্রও খারাপ। মেয়েমানুষ-ঘটিত ব্যাপারেও দু-একবার জড়িয়ে পড়েছিল। টাকার জোরে বেরিয়ে গেছে।

একদিন সকালে উঠে দুজন চাষী যখন মাঠে যাচ্ছে, দেখতে পেল, লছমন সিংয়ের লাশ পড়ে আছে তার বাসার সামনে রাস্তার উপর। ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিস এল। যথারীতি 'জোর তদন্ত' শুরু হল। শাঁসালো পার্টি। সুতরাং ব্যাপারটা শুধু থানার হাতে রইল না। জিলার কর্তারাও তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাড়িটার একদিকে খোলা মাঠ, লোকবসতি নেই। আরেক দিকে খান তিনেক বাড়ি, তাও খানিকটা ছাড়া-ছাড়া। সেইগুলোতেই বিশেষ মনোযোগ দিল পুলিস। সকলের এক কথা, 'আমরা কিচ্ছু জানি না।'

'চিৎকার-টিৎকারও শুনতে পাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

ঠিক পাশে যে বাড়িটা, তার দূরত্ব প্রায় শ-খানেক হাত। দুখানা খুপরি মতো ঘর। পিছনের ঘরে থাকে দুটি বিধবা—মা ও মেয়ে। খুব গরীব। আর সামনের ঘরে থাকে একটি চোদ্দ-পনর বছরের ছেলে, ওদের কী রকম আত্মীয়। তার নাম আবদুল। মাইলখানেক দূরে একটা মাদ্রাসা আছে, সেখানে পড়ে। খাওয়া-থাকার খরচ বাবদ ঐ বিধবাদের কিছু টাকা দেয় তার অভিভাবকেরা।

পুলিস দেখে মেয়েমানুষ দুটি তো কান্না জুড়ে দিল। ছেলেটাও প্রথমে বলেছিল সে কিছু জানে না, ঘুমিয়ে ছিল তার ঘরে। সকালে লোকজনের গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখে ঐ কাণ্ড। কিন্তু তার হাবভাব দেখে আই. ও. অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসারের সন্দেহ হয়। থানায় নিয়ে নরম-গরম দু'রকম পদ্ধতি চালাবার পর সে শেষপর্যন্ত স্বীকার করে সে দেখেছে। যে খুন করেছে তাকেও সে চেনে। যে গাঁয়ে তার মাদ্রাসা সেখানে বাড়ি। একটু গুণ্ডা গোছের লোক, সবাই ভয় করে চলে। নামও বলে দিল, ইয়াকুব। সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তাদের সে চেনে না। ইয়াকুবকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিল পুলিস। আর কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চালাল বেশ কিছুদিন। পাওয়া গেল না।

থানায় সে যা বলেছিল, নিম্ন-আদালতেও তারই পুনরুক্তি করল আবদুল। তারই উপর নির্ভর করে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াকুবকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। যথাসময়ে মামলা উঠল সেন সাহেবের এজলাশে।

আবদুলের জবানবন্দির মূল কথা হল: 'ঐদিন রাত্রে তার জ্বর এসেছিল। ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে উঠে মেঝেতে রাখা মাটির কলসী থেকে জল খাচ্ছিল। তখন কত রাত সে জানে না। গেলাসের বাড়তি জলটা ফেলতে গিয়েছিল, মাটির দেয়ালের গায়ে একটা জানালা মতো ছিল, তার ভিতর দিয়ে!

হঠাৎ নজর পড়ল, সিং যে ঘরটায় থাকে তার সামনের বারান্দার নীচে একটা লোক চিত হয়ে পড়ে আছে, মুখে কাপড় গোঁজা। দুজন লোক দুটো পা চেপে

ধরেছে, আর একজন ধরেছে মাথার দিকটা, আর ঐ ইয়াকুব (কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীকে সনাক্ত করল) দায়ের মতো কী একটা দিয়ে লোকটার গলা কাটছিল। তখন আকাশে চাঁদ ছিল এবং ঐ জায়গায় তার আলো এসে পড়েছিল। ইয়াকুবের মুখ ছিল এ বাড়ির দিকে, আবদুল যেখানে থাকে, এবং দু-তিনবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। তাতেই চিনতে পেরেছিল তাকে। তারপরেই ঘরে এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভীষণ ভয় করছিল তার। যদি ওরা তাকে দেখে ফেলে থাকে অমনি করে তাকেও হয়তো কেটে ফেলবে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, বিছানা ছেড়েও ওঠেনি।'

আসামীপক্ষের বক্তব্য ঃ 'সবটাই মিথ্যা এবং শেখানো বুলি। ঐ বয়সী একটা ছেলের পক্ষে অতরাত্রে জেগে থাকা, জানালায় গিয়ে খালি-খালি উঁকি মারা একেবারে অসম্ভব। জ্বরটা নিছক তৈরী। জল খাওয়া বা জানালা দিয়ে সেটা ফেলতে যাওয়াও স্রেফ বানানো। তার ওপরে সব চেয়ে যেটা আসল কথা, ঐ রাত্রে সামান্য চাঁদের আলোয় অতদূর থেকে সে যে বর্ণনা দিয়েছে, চর্মচক্ষে তার কিছুই দেখা সম্ভব নয়। লোক চিনতে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

জ্বর সম্পর্কে সরকারপক্ষ থেকে মাদ্রাসার বৃদ্ধ মৌলবীকে সাক্ষী মানা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, জ্বর আসতে আবদুল ঐদিন সকাল সকাল ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল।'

বাড়ির মেয়েছেলে দুটির সাক্ষ্যেও তার সমর্থন ছিল। কলসীতে জল রাখার কথাও তারা স্বীকার করেছিল। তাদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখতে পাননি কোর্ট।

এসব গেল গৌণ বিষয়। আসল ব্যাপার হল ঐ চাক্ষুষ প্রমাণ। তার সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জজ সাহেব স্বয়ং উভয় পক্ষের উকিল সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। যে পক্ষের যে তিথিতে এবং পোস্টমরটেম রিপোর্ট অনুযায়ী যে সময়ে খুনটা হয়েছিল, ঠিক তখনই তিনি গিয়েছিলেন। আবদুলের ঘর, জানালা, সেখান থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। আবদুলকে মেডিক্যাল কলেজ আই ইনফার্মারিতে পাঠিয়ে তার চোখ পরীক্ষার রিপোর্টও আনিয়ে নিয়েছিলেন।

আবদুলের জবানবন্দি যখন নেওয়া হয়, তখন তার বয়ানই শুধু রেকর্ড করেননি ; তার বলবার ধরন, প্রশ্নের উত্তরে তার প্রতিক্রিয়া, হাবভাব, চোখ-মুখের অবস্থা, ওঁরা যাকে বলেন 'ডিমীনার', সব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন।

'বার'এর একজন প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবদুলকে দুদিন ধরে প্রচণ্ড জেরা করেছিলেন। ছোটখাটো ব্যাপারে দু-একটি সামান্য গরমিল (যা না থাকলেই বরং সন্দেহ হতে পারে, সাক্ষীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করা হয়েছে) ছাড়া ছেলেটির সাক্ষ্যে কোনো অসঙ্গতি বের করতে পারেননি তিনি।

আবদুল সরকারপক্ষের একক সাক্ষী। আসামীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রমাণ নেই। আসামী দোষী না নির্দোষ নির্ভর করছে ঐ চোদ্দ-পনর বছরের

একটি ছেলের সাক্ষ্যের উপর। আইনের দিক থেকে তাতে কোনো বাধা নেই। একজন সাক্ষীই যথেষ্ট, যদি তার উক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাকে নিঃসংশয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়। এক্ষেত্রে ঐ বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপরেই মূল প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে আছে। বিচারকের মনে যদি প্রত্যয় জন্মে থাকে, আবদুল যা বলেছে সব সত্য, তার কোনো অংশ তার বা অন্য কারও রচনা নয়, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত হবে, অ্যাকিউজ্‌ড্ ইজ গিলটি, অর্থাৎ আসামী দোষী। আর যদি তার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকে, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আর কোনো কারণ থাক আর না থাক, ঐ সন্দেহের সুযোগ (বেনিফিট অব ডাউট) দিয়ে তাকে মুক্তি দিতে হবে।

·

নিখিল সেন তাঁর সামনে উপস্থাপিত উভয় পক্ষের সমস্ত তথ্য বক্তব্য যুক্তি তর্ক সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তিনি নিজে যে-সব উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, যা দেখেছেন, বুঝেছেন, সেগুলোও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলেন। আবদুলকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। বয়স? সেটাও বরং তার স্বপক্ষেই যাচ্ছে। অতএব তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে, আসামী অপরাধী। যে খুনের অভিযোগে তার বিচার চলছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

জুরিদের অধিকাংশ মেম্বারই তাঁদের 'গিলটি' অভিমত আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের আরো একটা আবেদন আছে, আসামীকে যেন চরম দণ্ড না দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর হাত বাঁধা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা প্রমাণিত হলে তার দণ্ড মৃত্যু। অবশ্য লঘুতর দণ্ড দেওয়া যায়, যেমন যাবজ্জীবন কারাবাস, যদি অপরাধের পিছনে তেমন কোনো লঘুকারক কারণ থাকে, ওঁদের ভাষায় '**extenuating factors**'—আকস্মিক প্রবল উত্তেজনা, তীব্র প্ররোচনা, আক্রমণ, সম্মানের উপর গভীর আঘাত, অল্প বয়স বা ঐ ধরনের অন্য কিছু। এক্ষেত্রে তার সবটারই অভাব। একটা নিরস্ত্র অসহায় লোককে চারজনে মিলে খুন করেছে। স্থির মস্তিষ্কে। লোকটা অত্যাচারী বা দুশ্চরিত্র হতে পারে! কিন্তু তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ঘটাবার মতো প্রমাণ আসামী-পক্ষ দেখাতে পারেনি।

সুতরাং ফাঁসির আদেশ দিতে হল। নিখিল সেন তাঁর দীর্ঘ রায়ের শেষে সে আদেশ শান্ত অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু তারপরই কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। ভুল হল না তো? একটিমাত্র অর্বাচীন সাক্ষী, আর কোনো প্রমাণ নেই। 'কিন্তু আইনেতে সেটা কোনো বাধা নয়।' 'তাহলেও।' 'সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।' 'তবু।' 'বেনিফিট অব্ ডাউট কি দেওয়া চলত না?' 'কেমন করে? ডাউটের স্কোপ কোথায়?' 'একটা লোক দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে'। 'উপায় কী? সেও তো একটা লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অপরাধের সঙ্গে সমতা রেখেই তো দণ্ড দিতে হবে।' 'তা ঠিক, কিন্তু...'

কিছু মামুলী কাজ ছিল। সই-টইএর ব্যাপার। পেশকার কাগজপত্র পেশ করেছিল। কিন্তু সেন সাহেবের মনের মধ্যে তখন তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে। কোনো কিছুই যেন মাথায় ঢুকতে চাইল না। উঠে পড়লেন, বাসায় এসে কোর্টের পোশাক ছেড়েই ছুটলেন আমার খোঁজে। না পেয়ে, মাঠে। যে ওঁকে বুঝবে, ওঁর সমমর্মী এমন কারও কাছে নিজেকে মুক্ত করে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হতে পারছিলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় মিস্টার চৌধুরী ?'

মামলার বিবরণ শেষ হতেই আমার মুখের উপর তীক্ষ্ন সাগ্রহ দৃষ্টি ফেললেন সেন সাহেব, 'আপনি হলে কি করতেন ?'

আমি মনে মনে হাসলাম। যেন কতবড় একজন জজ আমি, কত মামলা করেছি ? কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। আসল কথা, ওর মন তখন একটা কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যাকুল। দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললাম, 'ফাঁসির হুকুম দিতাম।'

'ঠিক বলছেন ?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া এ কেস'এ আর কী জাজমেন্ট হতে পারে ?'

নিখিলবাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন মনে হল। কিন্তু বোঝাটা যেন পুরোপুরি নামল না।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করতে হলে সেটা সাত দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে। এই-ই নিয়ম।

পরদিন কনডেম্‌ড্ সেল'এ (যেখানে ফাঁসির আসামীদের রাখা হয়) গিয়ে সদ্য দণ্ডিত কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপীল করবে ?'

লোকটা অসহায়ভাবে বলল, 'কিন্তু আমার তো টাকাপয়সা নেই হুজুর।'

বোঝা গেল, এতদিন যারা ওর খরচপত্র চালাচ্ছিল তারা আর উৎসাহী নয়। হয়তো মনে করছে, যে মরতে চলেছে, তার পিছনে খরচপত্র করা নিছক অর্থদণ্ড। আমি বললাম, 'ইচ্ছা করলে জেল থেকে আপীল করতে পারো। তাতে কোনো খরচ নেই।'

সেই ব্যবস্থাই হল। কয়েদীদের আপীল, দরখাস্ত ও চিঠিপত্রাদি লিখবার জন্যে কিছু লেখাপড়া জানা কয়েদী আছে। তাদের বলা হয় 'কন্‌ভিক্‌ট রাইটার' বা কয়েদী-লেখক (লেখক কয়েদী নয়)। তাদের বিদ্যা অতি সামান্য, আইন-কানুনের জ্ঞান নেই। তারা যা লেখে তার মধ্যে কোনো আইনগত প্রশ্ন বা নিম্ন-আদালতের যুক্তি-খণ্ডনের চেষ্টা—ওসব কিছুই থাকে না। একটা বাঁধা গৎ আছে—হুজুর, অধীন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীরা আক্রোশবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। অতএব মহামান্য জজ বাহাদুরের নিকট কাতর প্রার্থনা, অধীনকে বেকসুর খালাস দিতে আজ্ঞা হয়।

ইয়াকুবের তরফ থেকে এই রকমের একটা আপীলই পাঠানো হল। তার সঙ্গে রইল দণ্ডদাতা বিচারকের রায় এবং অন্যান্য নথিপত্র। আমার অফিস থেকে দরখাস্ত করে সে-সব আগেই আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

খুন-মামলার আপীলের ফল আসতে খুব একটা দেরি হয় না। বিশেষতঃ আপীলকারী যেখানে ফাঁসির দড়ির দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে। এটা যেন আরও তাড়াতাড়ি এল।

দেড়টা আন্দাজ সবে অফিস থেকে ফিরছি, জেলারবাবুর টেলিফোন: 'এই মাত্তর ইয়াকুবের খবর এসে গেল স্যার। বেকসুর খালাস।'

হাইকোর্টের রায় পরে আসবে। অর্ডারটা লাল খামে (সেইটাই নিয়ম) করে জরুরী ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেন সাহেব তখন কোর্টে। ফোন করলাম। এজলাসে ফোন থাকে না। অফিসে গিয়ে ধরতে হয়। যে কেরানীটি ধরল, খবর দিতে চায় না। বলল, 'উনি কেস করছেন।'

'বলুন, খুব জরুরী। জেলা-সুপারিন্টেন্ডেন্ট কথা বলবেন।'

খবরটা দিতেই মহা উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলেন জজসাহেব, 'কী বললেন! ছেড়ে দিয়েছে? উঃ, বাঁচালেন মশাই! জানেন, কতরাত ঘুমোতে পারিনি।'

জেলারবাবু এলেন বিকেলবেলা। বললেন, 'নেহাত কপালগুণে বেঁচে গেল লোকটা।'

'কী রকম?'

'খুন ওই করেছে।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'যাবার সময় বলে গেল। প্রথমে জমাদারকে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর আমার সামনেও সোজা কবুল করল, আমিই কেটেছি শালাকে। আরও তিনজন ছিল। তারা চেপে ধরেছিল।'

'ওটা হয়তো বাহাদুরি দেখাবার জন্যে বলেছে।'

'না স্যার। তাহলে কি আর আমি বুঝতাম না? এতকাল এত কয়েদী ঘাঁটলাম!'

একবার মনে হয়েছিল, সেন সাহেবকে জানিয়ে দিই। তারপর ভেবে দেখলাম থাক্। তিনি বিচার ভুল করেছেন, হাইকোর্ট তাঁর সুচিন্তিত রায় বাতিল করে দিয়েছে, একথা শুনেও যদি একজন কৃতী অভিজ্ঞ বিচারক স্বস্তি পেয়ে থাকেন, তিনি ভুল করেননি, এ খবর দিয়ে আর সেটা নষ্ট করি কেন?

একটি হাঙ্গার-স্ট্রাইকের নেপথ্য কাহিনী

অফিস থেকে বেরিয়েছি। তখনই সে ঢুকল। কালো ঘেরাটোপ-ঢাকা কয়েদী-গাড়ী থেকে নেমে এসে দাঁড়াল সেন্ট্রাল জেলের আউটার আর ইনার গেটের মাঝখানে; লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। প্রশস্ত বুক, ঈষৎ সোনালী রঙের কোঁকড়ানো চুল নেমে এসেছে কাঁধের উপর। তার উপরে বিশাল পাগড়ি। আধময়লা জোব্বার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল দেহশ্রী। নামটাও জমকালো।

সৈয়দ আফজল খাঁ। পাঠান না আফগান ঠিক জানি না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোনো প্রান্তে তার দেশ। কৌতূহল হল। ওয়ারেন্ট চেয়ে নিয়ে দেখলাম, ৩৯৬ আই. পি. সি.। ডাকাতির সঙ্গে নরহত্যা। শুনলাম, তিন-চারটে মারাত্মক মারাত্মক মামলার সঙ্গে সে জড়িত। তাই কোর্টে যাওয়া-আসার পথে প্রিজনভ্যানের মধ্যেও তার হাতে পড়ত হাতকড়া। একদিন এই নিয়ে লেগে গেল পুলিসের সঙ্গে। হাবিলদার বলল, 'হাতকড়া খুলে দিলে কোন্‌দিন তুমি লাফিয়ে পড়ে ছুট্ দাও, কে জানে?'

'যদি দিই, আটকাতে পারবে?' বলে, এক-দুই-তিন ঝটকায় ভেঙে ফেলল হাতকড়া। কিন্তু সে লাফিয়েও পড়ল না, ছুট্‌ও দিল না। শুধু দেখিয়ে দিল, সে সবই পারে। তারপর থেকে কোর্টের পথে তার ডাইনে-বাঁয়ে লেগে থাকত দু'জন করে রাইফেলধারী গুর্খা।

যেমন বিশাল বপু, তেমনি বিপুল ছিল তার দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার। কিন্তু আফজল খাঁর দীর্ঘ হাজতবাসের মধ্যে ওদিকটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। শহরের প্রান্তে ওদের মস্তবড় ঘাঁটি। সেখান থেকে ওর বন্ধুরা নিয়মিত যোগান দিত ডেকচি-ভর্তি খাসী বা ভেড়ার মাংস, মোটা-মোটা চাপাটি, আর সেই সঙ্গে আঙুর-আনার-কাজু-মনাক্কার প্যাকেট। বিচারাধীন আসামীর বাইরে থেকে খাদ্য-প্রাপ্তি আইনসিদ্ধ। কিন্তু জেল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অধিকার চলে যায়। তখন সে পুরোপুরি জেলের পোষ্য। সুতরাং সাত বছরের মেয়াদ নিয়ে যেদিন কোর্ট থেকে ফিরে এল আফজল খাঁ, উভয় দিকেই সমস্যা দেখা দিল। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী-খাদ্য তিন প্রকার: বেঙ্গল ডায়েট (দু'বেলা ভাত), বিহার ডায়েট (একবেলা ভাত, একবেলা রুটি), আর পাঞ্জাব ডায়েট (দু'বেলাই রুটি)। প্রথামতো ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ ডায়েট নেবে তুমি?'

আফজল খাঁ গম্ভীরভাবে বলল, 'আফগান ডায়েট।'

ডাক্তারের কোডে এ হেন বস্তুর উল্লেখ নেই। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা হল, পাঞ্জাব ডায়েট। ডাক্তারের বোধহয় মনে হয়েছিল, এই পেশোয়ারী পাহাড়টিকে আর যেখানেই হোক্ অন্নভোজী এলাকায় ফেলা যায় না। আফজল নালিশ জানাতে এল আমার কাছে। সোজাসুজি মন্তব্য করল, 'আপ্‌কা জেহ্‌লমে ইন্‌সাব্ নেহি হ্যয়।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কেন, কি অবিচারটা দেখলে তুমি?'

'আপ্‌কা বেঙ্গল ডায়েট হ্যয়, বিহার ডায়েট হ্যয়, পাঞ্জাব ডায়েট ভি হ্যয়, আফগান ডায়েট কেঁও নেই হোগা?'

সঙ্গত প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আফগান ডায়েট কি পদার্থ, খাঁ সাহেব?'

'*লিখ্ লিজিয়ে*', বলে, একটা দৈনিক খাদ্য-তালিকার ফিরিস্তি দিয়ে গেল আফজল খাঁ: 'সেরভর দুম্বারা গোশ্‌ত্' বিকল্পে খাসীর মাংস থেকে শুরু করে আটা মাখন দুধ মসলা পেস্তা বাদাম ফলমূল এবং সকলের শেষে এক প্যাকেট সিগারেট যোগ করে যখন থামল, হিসাব কষে দেখলাম, তার দাম কম করে ধরলে ছ'টাকা বারো আনা। একজন সাধারণ কয়েদীর রোজকার বরাদ্দ শুধু বারো

আনা কিংবা তার চেয়েও কম। সুতরাং আফজল খাঁ'র দাবি পূরণ যে আমাদের সাধ্যের বাইরে একথা স্পষ্ট করেই জানাতে হল। সেও ঠিক তেমনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে গেল যে, এ ছাড়া এবং এর চেয়ে কম কোনো খাদ্য সে গ্রহণ করবে না।

শুরু হল হাঙ্গার-স্ট্রাইক।

সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। আমার হাসপাতাল পরিক্রমার পালা। অন্য সব ওয়ার্ড থেকে দূরে এক কোণে আফজল খাঁ'র ছোট ঘরটিতে গিয়ে দেখলাম, তার নাসিক-ভোজনের আয়োজন চলছে। একটা বেশ বড় বালতি-ভরা দুধ। সঙ্গে ডিম, কমলালেবু ইত্যাদির পরিমাণও রীতিমতো রাজসিক। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাঙ্গার-স্ট্রাইকের রুগী আপনার ক'জন?'

'আজ্ঞে একজন।' বলে, ডাক্তার একটু হাসলেন। কৌতূহল হল। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। 'ফিড' শুরু হল। একটা বড় জগে করে ফানেলের মধ্যে মিশ্র রসায়ন ঢালা হচ্ছে, আর দুটো নল বেয়ে সেটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে উন্নত নাসারন্ধ্রে। এক-একটা জগ শেষ হয়, আর চেঁচিয়ে ওঠে আফজল, 'আউর দেও!' জগ ভরতে যেটুকু দেরি, তার মধ্যে আবার হুঙ্কার দেয়, 'আউর দেও।' এমনি করে গোটা বালতিটা নিঃশেষ হয়ে গেল।

আফজল খাঁ'র অনশন যে একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার অফিসারদের মতে, যে লোকটি সারাজীবন ধরে শুধু মণ-মণ মাংস চিবিয়ে এসেছে, সে নাক দিয়ে দুধ গিলে কতদিন থাকবে। পেটের ক্ষিদে না হয় মিটল, দাঁতের ক্ষিধে মেটাবে কি দিয়ে? কিন্তু দেখলাম, আমরা ভুল করেছি। মাস কেটে গেল। আস্তে আস্তে শয্যার সঙ্গে মিশে গেল সেই বিশাল দেহ, কিন্তু মন রইল অটল। পুরোপুরি আফগান ডায়েট না হলেও, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তার কাছাকাছি কোনো খাদ্য-তালিকা মঞ্জুর করা অসম্ভব হবে না, এ রকম একটা আভাস তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

একদিন কী একটা প্রয়োজনে বিকালে একবার যেতে হয়েছিল জেলখানায়। হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আফজল খাঁকে দেখে যাবার ইচ্ছা হল। একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে তার ছোট ঘরটিতে। সেই মৃদু আলোয় তার রক্তহীন মাংসবিরল দীর্ঘ দেহটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। হঠাৎ মনে হল সে বেঁচে নেই, পড়ে আছে শুধু একটা চর্মাবৃত কঙ্কাল। ধীরে ধীরে খাটের পাশে যে চেয়ারখানা ছিল, তার উপরে গিয়ে বসলাম। একবার শুধু সে তার নিষ্প্রভ চোখদুটি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পড়ে রইল তেমনি নিস্পন্দ নিথর মৃতদেহের মতো। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, 'খাঁ সাহেব!'

'সাব্!'

'এমনি করে জান্ দিয়ে কী লাভ?'

'এ জান্ রেখেই বা লাভ কী?' ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল আফজল।

চমকে উঠলাম। তবে কি এই আত্মহত্যার পিছনে আর কোনো নিগূঢ় কারণ আছে? আফগান ডায়েটটা শুধু অভিনয়? বললাম, 'এ কথা কেন বলছ? সাত বছর কতটুকু সময়? দেখতে দেখতে চলে যাবে। জোয়ান বয়স তোমার। নতুন করে ঘর বাঁধবে। গোটা জীবনটাই তো সামনে পড়ে আছে।'

ক্ষীণ আলোকে মনে হল, তার বিবর্ণ ওষ্ঠের কোণে যেন জেগে উঠল একটু-খানি মৃদু হাসির আভাস। তেমনি ধীরে ধীরে সে বলল, 'ঘর আমার ভেঙে গেছে সাব্।'

'তোমার বাপ-মা আছে?'

'যখন দেশ ছেড়েছি, তখনও ছিল। তারপর কি হয়েছে জানি না।'

'জেনানা?'

'না সাব্, শাদি হয়নি আমার।'

'যাকে চেয়েছিলে, তাকে পাওনি বুঝি?'

আফজল খাঁ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। শুধু শোনা গেল মৃদু দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। তারপর উদাসকণ্ঠে বলল, 'সে-সব ব্যাপার চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে। আজ নতুন করে সে-কথা তুলে কোনো লাভ নেই সাব্।'

বললাম, 'সংসারে কিছুই কোনোদিন চুকে যায় না, আফজল খাঁ। ভাঙা-গড়াই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। যাক্, রাত হল এবার আমি উঠি।'

আফজল খাঁ শীর্ণ হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করল। আর কোনো কথা বলল না।

দিন তিনেক পরে সন্ধ্যাবেলা আমার বাংলো-সংলগ্ন বাগানে একটা বাঁধানো চত্বরের উপর বসেছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষণ-সিক্ত গাছপালার উপর সন্ধ্যার করুণ ম্লানিমা। সেদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, চারদিকে যা কিছু দেখছি সব যেন কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনার অদৃশ্য সূত্র দিয়ে গাঁথা।

টেলিফোন বেজে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার! আফজল খাঁ আমার দর্শন-প্রার্থী। আজই! হ্যাঁ, এখনই।

সেই ছোট্ট ঘরখানায় স্তিমিত আলোয় বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনে গেলাম আফজল খাঁ'র ক্ষীণকণ্ঠের গুঞ্জরণ। বিশেষ কোনো ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়নি তার কথা। আমার অনুচরদের যখন ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম, সে বলল, 'আপ্ জেহ্‌লকা বড়া সাব্, ময় আপ্ কা কয়েদী…'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আজকের সন্ধ্যাটা অন্ততঃ সে-ব্যবধান আমাদের না-ই বা রইল খাঁ সাহেব।'

এরপর আর কিছু না বলে সে সোজা চলে গেল তার অতীত কাহিনীতেঃ

'সৈয়দ বংশের ছেলে। ঘরে খাবার-পরবার অভাব নেই। আফজল ছেলে-বেলা থেকেই একটু খেয়ালী এবং বেপরোয়া। রূপ এবং স্বাস্থ্য—এর কোনো-টাতেই খোদা তার বেলায় কার্পণ্য করেননি। তাছাড়া তার রাইফেলের নিশানা

ছিল নির্ভুল এবং শিকারের নেশা দুর্নিবার। রুক্ষ, কঙ্করময় তাদের দেশ। কোথাও নেই একবিন্দু শ্যামলিমা। তবু অদ্ভুত মায়া ছিল তার সেই দেশের ওপর। বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে তার ভারি ভালো লাগত। এমনি এক উদ্দেশ্যবিহীন পথচলার ফাঁকে খেজুর বনের ছায়ায় তার সঙ্গে দেখা। মাথায় জলের ঘড়া। ফিরছিল দূরের কোনো ঝরনা থেকে। আওরত! কিন্তু রক্তমাংসের গড়া নয়। বস্‌রাই গোলাপের কোমল পাপড়ি দিয়ে তৈরী তার দেহ। আর মুখখানা? আফজলের মনে হল, সেটাও ঠিক মুখ নয়, একটি সদ্য-স্ফুট শিশির-ধোয়া রক্ত গোলাপ। প্রথম দিন কোনো কথা হয়নি। হয়েছিল শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়। চোখের ভিতর থেকে একঝলক বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে ঘাগরা দুলিয়ে সে উঠে গেল চড়াই পথ বেয়ে। আফজলও ফিরে এল। কিন্ত সে শুধু তার দেহ। তার সবটুকু দিল্‌ সে রেখে এল ঐ ঢালু পাহাড়েব বাঁকে।

তারপর আবার দেখা হল। তারপর আবার···এবং তারপরে বারংবার। পরিচয় হল। আস্তে আস্তে হল প্রাণ দেয়া-নেয়া।

আসমানী। (নামটা আমাব দেওয়া নয় বাবুসাব্‌. বলেছিল আফজল, ওব বাপ-মা'ই রেখে গিয়েছিল। তা না হলে ঐ-নামেই ডাকতাম আমি। সে তো এ দুনিয়াব নয়, আসমানেব)—আসমানী কুমারী নয়, এক বৃদ্ধ রুগ্ন সর্দারের বিবি। সমস্ত দিন তাব সেবা কবে তাব রূঢ় গঞ্জনা সয়ে-সয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল একটু আলোব জন্যে, একটু হাওয়াব জন্যে। খোদা মেহেরবান্‌। তার জীবনের সেই আলো আব্‌ হাওয়া নিয়ে এল আফজল। ওর প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কোমল কণ্ঠে বীণার মৃদুতান তুলে এই ভাষায় সে কথা বলত। ঊষর উদাস মাঠের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে শুনে যেত আফজল, শুধু কান দিয়ে নয়, সমস্ত অন্তর দিয়ে।

একদিন কি খেয়াল হল আফজলের। বলে উঠল, চল, তোমার সর্দারকে দেখবো।

কেন, সর্দারনীকে দেখে বুঝি আশ মিটছে না? চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল আসমানী।

এইটুকুতে কি আশ মেটে আসমানী? গাঢ়স্বরে বলল আফজল, সবটুকু না পেলে দিল্‌ ভরে না, শুধু হাহাকার করে বুকের ভিতরটা।

কাছে টেনে নিয়ে আসমানীর মাথাটা সে চেপে ধরল বুকের উপর, যার ভিতরে তোলপাড় কবছে তাজা রক্তের ঢেউ। আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুষ্ক স্বরে বলল আসমানী, কিন্তু আমাব যে হাত-পা বাঁধা আফজল। এর বেশী তো আমার দেবার কিছু নেই।

টস্‌টস্‌ করে মুক্তাধারার মতো ঝরে পড়ল চোখের জল। আতরমাখা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিল আফজল। হাত বুলিয়ে দিল আনার ফুলের মতো কোমল পেলব দুটি রক্তাভ গণ্ডে।

একদিন সত্যিসত্যিই সর্দারকে দেখতে গেল আফজল। বারান্দায় খাটিয়ার উপর পড়ে আছে একটা বিপুল মাংসপিণ্ড। যেমন কুৎসিত, তেমনি অসভ্য লোকটা। ওকে দেখেই রুখে উঠল, কে তুমি? কি চাই? তারপর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ও, তুমিই আমার সুন্দরী বিবির রোশনাই দেখে মেতে উঠেছ। সুবিধা হবে না, মিঞা সাহেব। একদিন স্রেফ পুড়ে মরবে। তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। বেঘোরে প্রাণটা দিয়ে লাভ কি?

আফজলের কানে এর একটা কথাও যায়নি। সে দাঁড়িয়েছিল আচ্ছন্নের মতো। এরই সঙ্গে ঘর করে আসমানী! ঐ কদাকার দেহটার পরিচর্যা করবার জন্যেই কি খোদা তাকে আসমান থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন?

ফিরবার পথে আসমানীর সঙ্গে দেখা। কি একটা বলতে গেল আফজল, কিন্তু গলায় তার স্বর ফুটল না। আসমানীর মুখে ম্লান হাসি। বলল, দেখলে আমার ঘর?

এ ঘর ভেঙে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে আসমানী। চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। চলে যাই কোনো দূর দেশে। কেউ জানবে না, কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না।

তোমায় তো বলেছি আফজল, সে উপায় আমার নেই। ঐ বুড়ো যদ্দিন বেঁচে থাকবে, এখান থেকে আমার নড়বার পথ বন্ধ।

কেন?

আমার বাবা যে আমাকে দেনার দায়ে বাঁধা দিয়ে গেছে ঐ সুদখোর লোকটার কাছে। যতদিন ও ছেড়ে না দেয়, ওর সংসারে থেকেই সে-ধার আমাকেই শুধতে হবে।

এ সমস্যার হঠাৎ কোনো সমাধান আফজলের চোখে পড়ল না। কিন্তু তার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল আসমানীর সেই অসহায় করুণ মুখখানা। সমস্ত চেতনার মধ্যে জেগে রইল শুধু একটি কথা, যেমন করে হোক আসমানীকে বাঁচাতে হবে।

কিছুদিন কেটে গেল। পর পর ক'দিন নির্দিষ্ট গোপন স্থানে আসমানীর দেখা পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা হল আফজলের। অসুখ-বিসুখ করেনি তো? পরদিন আবার গিয়ে উঠল সেই সর্দারের বাড়ি। আসমানীর কোনো সাড়া নেই। ওকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বুড়ো সর্দার, আবার এসেছিস, শয়তান?

কেন মুখ খারাপ করছ খালিখালি? ঝাঁজিয়ে উঠল আফজল, আসমানী কোথায়?

ওঃ, বড্ড দরদ দেখছি, বিকৃতকণ্ঠে বলল সর্দার। তারপর গর্জে উঠল, আসমানী কোথায় তা জেনে তোর কি হবে রে, কুত্তা?

খবরদার! গাল দিও না বলছি, রুখে উঠল আফজল।

তবে রে হারামীকা বাচ্চা!

খাটিয়ার পাশে ছিল নাগরা। তারই একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আফজলের দিকে। জুতোটা সজোরে গিয়ে লাগল ঠিক তার মুখের উপর।

আফগান-রক্ত টগবগ করে উঠল। একমুহূর্ত কি যেন ভাবল আফজল খাঁ। তার পর ছুটে গেল বাইরে। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল তার গুলি-ভরা রাইফেল। তুলে নিয়েই টেনে দিল ট্রিগার। অব্যর্থ সন্ধান।

হঠাৎ কিছুক্ষণ সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল আফজল। তারপর দেখল, খাটিয়ার উপর পড়ে আছে সর্দারের রক্তাক্ত প্রাণহীন অসাড় দেহ। তার উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আসমানী। তার বুকের বসন ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখের তারা থেকে ঠিকরে পড়ল অগ্নিশিখা। তীরের মতো ছুটে এল তার তীক্ষ্নস্বর, নির্লজ্জ, কাপুরুষ। মনে করেছ, আমার স্বামীকে খুন করলেই আমি তোমার হাতে ধরা দেবো। এই ছিল তোমার মতলব, না ?

শান্ত অনুনয়ের সুরে বলল আফজল, বিশ্বাস কর আসমানী, কোনো মতলব নিয়ে আমি আসিনি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে শাদি করতে চাই। কিন্তু তার জন্যে তোমার স্বামীকে খুন করবো ? না-না, শুধু অপমান সইতে না পেরে রাগের মাথায়·

বেরিয়ে যাও, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মতো গর্জে উঠল আসমানী, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। খুনী, ডাকু, শয়তান··

সেইদিনই কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানের পথে বেরিয়ে পড়ল আফজল খাঁ।

আফজল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আসল কথা কি জানো সাব্, নিজের মনটাকেই বুঝতে পারেনি আসমানী। ঐ বুড়ো জানোয়ারটাকে সে যে কতখানি ভালোবেসেছিল সেটা প্রথম জানতে পারল তখন, যখন তার বুকের পাশ দিয়ে বিঁধে গেছে আমার রাইফেলের গুলি।'

শহরের উপকণ্ঠে ওদের যে-দলটা ছিল, জেল হবার পরেও তারা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত আফজল খাঁ'র সঙ্গে। ইদানীং আর আসেনি। হয়তো তারা উঠে গেছে অন্য কোথাও। কিংবা হয়তো দেখা করবার প্রয়োজন আর নেই। আফজল খাঁ'র ঘরে সেই সন্ধ্যাটি যেদিন কাটিয়ে এলাম, তার ক'দিন পরেই একজন দর্শনপ্রার্থী এসে উপস্থিত। হাঙ্গার-স্ট্রাইক যারা করে, বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিষিদ্ধ। সুতরাং মোলাকাতের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হবার কথা। তবু লোকটাকে ডেকে পাঠালাম। চেহারা এবং পোষাক দেখে মনে হল সে পাঠান। বলল, 'আফজল ওর ছেলেবেলার দোস্ত্, দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে কিছু, পাশাপাশি গ্রামে বাড়ি। জেলের মধ্যে না খেয়ে আছে, এই খবর পেয়ে দেশ থেকে ছুটে এসেছে ওকে একবার দেখবার জন্যে। এবার হুজুর, অর্থাৎ আমি যদি দয়া করে···'

তার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই তার চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'আসমানীকে চেনো ?'

লোকটার মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'চিনি। কিন্তু হুজুর তাকে…'

'কোথায় আছে সে?'

'আছে আমাদের দেশেই। আগের মরদটা খুন হবার পর নিকা করেছে তারই এক চাচ্‌তো ভাইকে।' আমাকে নীরব দেখে যোগ করল, 'সেই শয়তানীটার জন্যেই তো দোস্ত্‌কে দেশ ছাড়তে হল। একদিন খুব ভাব ছিল দুজনের। তার পর কি যে হল ওরাই জানে? হঠাৎ রটিয়ে দিল, তার বুড়ো সর্দারকে নাকি খুন করেছে আফজল।'

লোকটা কিছুকিছু উর্দু জানে। আর একটু কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, 'দ্যাখো খাঁ সাহেব, তোমার দোস্তের অবস্থা ভালো নয়। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে। কিন্তু জেলের মধ্যে যারা খানা ছেড়ে দেয়, বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের দেখা করবার হুকুম নেই। তোমার বেলায় সে হুকুম আমি দিতে পারি…'

খাঁ সাহেব কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর-কা বহুত মেহেরবানি।'

বললাম, 'কিন্তু সে মেহেরবানি আমি দেখাতে পারি শুধু একটি শর্তে।' শর্তের বর্ণনা দিলাম। শুনে মুখ চুন হয়ে গেল পাঠান সর্দারের। মাথা নেড়ে বলল, 'একথা আমি বানিয়ে বলবো কেমন করে? এর কোনোটাই যে সত্যি নয়।'

গম্ভীর ভাবে বললাম, 'বেশ, না বলতে পারো বোলো না। তোমার দোস্তের সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হল না।'

কিছুক্ষণ আপন মনে কি ভাবল পাঠান। তারপর বলল, 'আমি রাজি আছি, হুজুর।'

আমি নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম হাসপাতালের সেই ঘরটিতে। ঘরে ঢুকবার আগে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম সেই শর্তের কথা, 'দেখো খাঁ সাহেব, জবান দিয়েছ। কথার খেলাপ যেন না হয়।'

'কভ্‌ভি নেহি', দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল পাঠান।

ভাবহীন দুটি ঘোলাটে চোখ দিয়ে দোস্তের মুখের দিকে চেয়ে রইল আফজল। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। পাঠানের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলল, 'নিজের হাতে কেন জান্ দিচ্ছিস, দোস্ত্? এই দেখবো বলেই কি অতদূর থেকে ছুটে এলাম। কি জবাব দেবো তোর মা'র কাছে? সে বুড়ী যে…'

গলায় একটা কাশির শব্দ তুলে আর একবার জানিয়ে দিলাম আমার শর্ত। চকিতে আমার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার সে চোখ ফেরাল দোস্তের মুখের উপর। বলল, 'তোর আসমানী যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল, আফজল।'

'কি বল্‌লি!' যেন কবরের ভিতর থেকে উঠে এল ভগ্নস্বর। নিষ্প্রভ চোখের তারায় ফিরে এল একঝলক প্রাণের জ্যোতি, মরণাহত মুখে একবিন্দু রক্তের আভাস। আর একটু কাছে সরে গিয়ে বলল পাঠান সর্দার, 'তুই তো চলে এলি

দোস্ত্, আর আসমানী আজও তোরই পথ চেয়ে বসে আছে। নিকে করবার জন্যে কত সাধাসাধি! খানদানি ঘরের কত জোয়ান ছেলে, ফিরেও দেখল না। তার মুখে শুধু এক কথা, 'সে ফিরে আসুক আর নাই আসুক, তার জন্যেই অপেক্ষা করতে হবে।'

আফজলের চোখ ছাপিয়ে, শীর্ণ গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। বুকের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে এল গভীর নিঃশ্বাস। শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে বাল্যবন্ধুর একটা হাত ধরে বলল, 'সেই এলি, আর ক'দিন আগে এলি না কেন দোস্ত্? বড্ড দেরি হয়ে গেছে ভাই, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

এবার এগিয়ে এসে বললাম আমি, 'কে বললে দেরি হয়ে গেছে? আমি বলছি তুমি বেঁচে উঠবে। আবার দেশে ফিরে যাবে। যাকে চাও, তাকে নিয়েই ঘর বাঁধবে!'

'হাঁ সাব্, সেই দোয়াই কর। আমি বেঁচে উঠতে চাই,' তীব্র আগ্রহের সুরে বলল আফজল, 'আমার তো মরলে চলবে না। দাও, তোমাদের কি খাবার আছে।'

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার পর আফজল খাঁকে যখন হাজির করা হল হাঙ্গার-স্ট্রাইকের মতো মারাত্মক অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করবার জন্যে, সে হঠাৎ ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার হাতে যা-কিছু শাস্তি আছে সাব্, সবই মাথা পেতে নেবো। ডাণ্ডা বেড়ি, খাড়া হাতকড়া, ডিগ্রি বন্ধ্, যা তোমার ইচ্ছে। শুধু যে-ক'টা রোজ মাপ পেয়েছি সাত বছরের সাজা থেকে, সেটুকু যেন কেড়ে নিও না। যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে যেতে দাও। তুমি তো সবই জানো।'

ছেঁড়া হার

গুরুং সাহেব তাঁর 'চিতা' শিকারের গল্প শোনাচ্ছিলেন এবং এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে আমার নতুন চাকরটি কখন চা দিয়ে গেছে খেয়াল করেননি। একফাঁকে পেয়ালাটা অবশ্য টেনে নিয়েছিলেন। চাকরটি যখন খালি পেয়ালা নিতে এল, তার মুখের দিকে চেয়ে সরবে চমকে উঠলেন, 'ভক্তা না! তোকে তো চেনাই যায় না রে! রীতিমতো ভদ্রলোক বনে গেছিস। তুই এখানে কী করছিস?'

প্রশ্নটা তাঁদের পাহাড়ী ভাষাতেই করেছিলেন গুরুং সাহেব। ভক্তা অর্থাৎ ভকৎ চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'নোক্রি করছি সাহেবের কুঠিতে।'

তার হাসি ও কথার সুরে একটুখানি ব্যঙ্গের ছোঁয়া ছিল বলে মনে হল, যাকে বলে স্লিং। অর্থাৎ, তোমরা না চাইলেও আমরা চাকরি পেতে পারি।

দুঁদে ও ঝানু পুলিস অফিসার দেওপ্রসাদ গুরুংয়ের মুখ গম্ভীর হল। ভক্তা চলে যেতেই আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, 'এটা কিন্তু আপনি

ঠিক করলেন না মিস্টার চৌধুরী। ওর অ্যান্টিসিডেণ্ট জানেন ?'

'কিছুটা জানি। এই জেলেই ছিল, ক'দিন আগে বেরিয়েছে।'

'তার আগেও চার-পাঁচবার হয়ে গেছে।'

'তাও শুনেছি।'

'তারপরও আপনি ওটাকে বাড়িতে এনে তুলেছেন! একটা পাকা জেলঘুঘু। এ কনফার্মড্ ক্রিমিন্যাল! আমি বুঝতে পারছি, আই কোয়াইট রিয়ালাইজ, বয়স আপনার অল্প, ছেলেটার কান্নাকাটি শুনে মুভ্‌ড্ হয়েছেন, অসহায় গরীব মনে করে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু আপনি এ জাতটাকে চেনেন না। সবে ঢুকেছেন তো! আপনার সিনিয়ার অফিসারদের জিজ্ঞেস করবেন, তাঁরা চেনেন। চুরি এদের পেশা। তার চাইতেও বেশী বলতে পারেন, ইট ইজ দেয়ার ওয়ে অফ লাইফ।'

এর উত্তরে অনেক কথা বলা যেত। 'ওয়ে অফ লাইফ' কেন হল? পেট থেকে পড়েই তো চুরি করতে শুরু করেনি ও। প্রথম বারের দারিদ্র্য হয়তো ওর নিজের, যদিও পিছনে অনেক কারণ, অনেক ফ্যাক্টরস থাকতে পারে। তারপব? তারপর তো আপনারাই ওকে একটু একটু করে ঠেলে দিয়েছেন এই পথে। জেল খেটেও তো নিস্তার নেই। রাত-দুপুরে আপনার অনুচরেরা গিয়ে বাড়ির সামনে হাঁক-ডাক করবে। সাড়া দিতে একমিনিট দেরি হলে তাদের শ্রীমুখ থেকে যে ভাষা বেরোয়, সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। তাবপর কাছাকাছি কোথাও একটা চুরি-টুরি হতে যা দেরি। প্রথম কড়া পড়বে ওরই হাতে, যেহেতু ও জেল-খাটা দাগী। এব চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? অন্য প্রমাণ যদি দরকার হয়, তাও তো আপনার হাতের মধ্যে। যাকে বলবেন সে-ই সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। হলফ করে বলবে, এই লোকটাকেই স্যুটকেস মাথায় করে বেরোতে দেখেছি!

আরও বলতে পারতাম, শুধু আপনি কেন, আমরা, অর্থাৎ পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক, সৎ-সাধু-সজ্জন ব্যক্তি বলে যারা নিজেদের মনে করি, তারাও যেমন করে পারি ঐসব ছাপ-মারা চোরগুলোকে আবার জেলে না পুরে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তার জন্যে একটু মিথ্যে বলতে হয় সেটা কিছু দোষের নয়। আমরা তো জানি, সাপের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা যায়, কিন্তু পুরনো চোরের সঙ্গে এক পাড়ায় থাকা যায় না। আর কাজকর্ম? সে-সব আশা করাই অন্যায় ওদের পক্ষে। কে নেবে সে ঝক্কি?

কিন্তু এসব কিছুই আমি বললাম না। বলে কী লাভ? গুরুং সাহেবের মতো একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডি. এস. পি. শুনে শুধু হাসবেন বৈ তো নয়। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোধহয় মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, 'বন্ধু হিসেবে আপনাকে সাবধান হতে বলা আমার কর্তব্য। তাই বলছি, আমাদের এই বন্ধুটিকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিন। তা না হলে একদিন সকালে উঠে দেখবেন, আপনার সর্বস্ব বগলদাবা করে ব্যাটা রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে বোধহয় ওর মজুরি পোষাবে না। আমি একা মানুষ। সর্বস্ব কথাটা শুনতে গালভরা হলেও আসলে বিশেষ কিছু নয়। গোটাকয়েক সাধারণ জামাকাপড় আর হাঁড়িকুড়ি। দাম কষলে গোটাকয়েক টাকার বেশী হবে না।'

ব্যাপারটাকে এমন হাল্‌কাভাবে নিচ্ছি দেখে গুরুং সাহেব খুশি হলেন না।

যাদের মেয়াদ অল্প, কিংবা ভারী মেয়াদের শেষের দিকে এসে পৌঁছেছে, তাদের জেলের বাইরে কাজে লাগানো হয়। সেই ভাবেই ভক্‌তাকে আমার ফুল ও সবজি বাগানে 'পাশ' করা হয়েছিল। বাগানের কাজ সামান্য। রোজ আধ-ঘণ্টার বেশী লাগত না। বাকী সময়টা সে আমার ঘর-গৃহস্থালির পিছনে ব্যয় করত। আমার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করেনি। আমার একটি 'কেষ্টা' অবশ্য ছিল। কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। রান্নাবান্না থেকে জুতো-ঝাড়া তারই করণীয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তার প্রায় সবগুলোই উঠল গিয়ে ভক্‌তার হাতে। কেষ্টার ভাগে রইল শুধু মাসান্তে তলব-গ্রহণ। আমার সংসারের চেহারা ফিরে গেল। একই ধরনের গুটিকয়েক বাঁধা খাবার কোনোরকমে গলাধঃকরণ করে জীবনধারণ করছিলাম! এবার দেখলাম, তাদের স্বাদ-গন্ধ পালটে গেছে, আকার-প্রকারেও নতুনত্ব দেখা দিয়েছে এবং সেগুলো বেশ উপভোগ্য, অর্থাৎ রেলিশ করে খাওয়া যায়।

ভক্‌তাকে আমি সামনাসামনি কখনো দেখিনি, এমনকি বাড়ির ভিতরেও না। সকালবেলা সে যখন আমার বাগানে এসে ঢুকত, তখন আমি অফিসে বেরোচ্ছি। দুপুরে যখন ফিরতাম, তার আগেই বাইরের কয়েদীদের ভিতরে যাবার ঘণ্টা পড়ে গেছে। বিকেলেও তাই। আমরা যখন কাজে ব্যস্ত, ওরা তখন আমাদের কুঠিতে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেত। তার সঙ্গে দেখা বা কথাও কোনোদিন হয়নি। কখনো কখনো যখন বেরোচ্ছি, দূরে বাগান থেকে একটা সেলাম। সব কয়েদীরাই যা করে থাকে। উত্তরে আমিও আঙুলটা তুলতাম।

পাঁচ-ছ'মাস এমনি নেপথ্যে থেকে ভক্‌তা আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ছোট-বড় প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিল। আমার অভ্যাসগুলোও তার জানতে বাকী ছিল না এবং সেই মতো সব কিছু তৈরী থাকত। কখনো কিছু বলতে হয়নি। তবু কোথাও এতটুকু ত্রুটি চোখে পড়েনি। সে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হুঁশিয়ার এবং চৌকস কাজের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হত, শুধু দক্ষতা নয়, একজন জেল-অফিসারের প্রতি আনুগত্য দেখাবার যে কয়েদী-সুলভ মনোভাব তাও নয়, তাছাড়াও আরো কিছু আছে তার এই নিখুঁত নিরলস কাজগুলোর মধ্যে। কী বলবো তাকে? একটু দরদ? কিংবা একটু সেবাযত্ন? একটা ছেলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে এসেছে একা, দেখাশুনা করবার কেউ নেই, তার উপরে এক ধরনের টান? সে-সব কি আছে ওদের? কিংবা কে জানে, সবই হয়তো আমার কল্পনা।

যাই হোক, কেষ্টাকে বলে রেখেছিলাম, ভক্‌তাকে বলিস, খালাস হবার পর

যেন দেখা করে আমার সঙ্গে। তার পরদিনই বিকেলবেলা আমার বেরোবার কিছু আগে সে এল। বললাম, 'কেষ্টা বাড়ি যাবো-যাবো করছে, তুমি আসবে? কি কি করতে হয় সবই তো জানো।'

সে কিরকম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। প্রস্তাবটা আর একটু খোলসা করে ব্যক্ত করলাম, 'তলব ও যা পাচ্ছিল তুমিও তাই পাবে।'

ভক্‌তা তখন কিছু বলল না। মুখটা তার হঠাৎ যেন কুঁচকে গেল। তারপরেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দেখলাম, তেমন তেমন ক্ষেত্রে পুরনো পাকা চোরের (গুরুং সাহেবের ভাষায়, 'confirmed criminal') বুক থেকেও কান্না ঠেলে ওঠে এবং সেটা লুকোবার জন্যে পালাতে হয়।

কিছুমাত্র থেকেই আমার একাকীত্ব ঘোচাবার চেষ্টা চলছিল। সরকারী চাকরি, তখনকার দিনে মোটামুটি ভালোই বলা চলে। তার উপরে দার্জিলিঙের মতো জায়গায় একখানি সুন্দর বাংলো। চেহারাটা কার্তিকের মতো না হলেও ফেল্‌না নয়। সুতরাং অনূঢ়া কন্যার পিতামাতারা একটু বেশী তৎপর হয়ে উঠবেন এটাই প্রত্যাশিত। এদিকে আমার অভিভাবকেরাও সচেষ্ট ছিলেন। শুভদিন স্থির হয়ে গেল। ভক্‌তা কোত্থেকে কি খবর পেয়েছিল সে-ই জানে। সম্ভবত আমার বন্ধুরা যে মাঝে মাঝে আমার বৈঠকখানায় বসে সরবে নানারকম সরস মন্তব্য করতেন তার থেকেই সে বুঝে নিয়েছিল। শুভকাজের স্থান কলকাতা। যে তারিখে রওনা হবো তার আগের দিন রাত্রিবেলা গুটি-গুটি আমার ঘরে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে বললাম, 'কী রে?'

কোনো জবাব নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কিছু বলবি?'

উত্তরে জানাল, সে আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে চায়। একদিক দিয়ে তাতে আমার সুবিধা। ওর মতো একটি চটপটে কাজের লোক বিয়ে-বাড়িতে দরকার। কিন্তু তখন মে মাস, কলকাতায় প্রচণ্ড গরম। সেই কথাই বললাম ওকে, 'তুই তো কখনো দার্জিলিঙের বাইরে যাসনি?'

'কার্সিয়াংএ গিয়েছি। শিলিগুড়িতেও ঘুরে এসেছি একবার।'

'তবে তো খুব হল! কলকাতা কি জিনিস জানিস না তো! টিকতে পারবি, না পালিয়ে আসবি?'

'না হুজুর, পালাবো কেন? আপনার সঙ্গে ফিরবো।'

সেবারে গরমের প্রতাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভক্‌তার চোখ জবাফুলের মতো লাল, আঙুলের ডগা ফুলে উঠেছে। সে-সব গ্রাহ্যের মধ্যেও সে আনল না। সারাদিন চরকির মতো ঘুরছে। সব কাজেই ভক্‌তা। একটা দিন না যেতেই সকলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। বরযাত্রীর দলেও চলল সে। নতুন তৈরী পাহাড়ী পোষাক-পরা ভকৎ বাহাদুর সুনোয়াত বরের বিশেষ অনুচর। কনের বাড়িতেও সে বসে থাকার পাত্র নয়। গিয়েই কাজে লেগে গেল এবং কোনো এক ফাঁকে কাকে যেন ধরে তার ভাবী 'মাইজী'কেও একটা সেলাম

দিয়ে গেল। সবাই শুধু অবাক নয়, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিয়ের পরেই পুরী। আমার শ্বশুর মহাশয়ের কর্মস্থল। তিনি এবং বাড়ির অন্যান্য সকলে কলকাতার বাড়িতেই রয়ে গেলেন। কাজেই ওটা হল আমাদের হনিমুন। ভক্তা চলল আমাদের সঙ্গে, রান্নাবান্না কাজকর্মের ভার নিয়ে। সেখানে গিয়ে গরমের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেল বেচারা। আজন্ম পাহাড়ী মানুষের প্রথম সমুদ্র-দর্শন। ভক্তার আনন্দ দেখে কে? তাই বলে কাজের বেলায় এতটুকু খুঁত নেই। বিশেষ করে তার মাইজীর কোথাও কোনো অসুবিধা সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না। নীতাও ওকে পেয়ে ভীষণ খুশি। ওইখান থেকেই ভক্তা তার দক্ষিণ-হস্ত হয়ে দাঁড়াল।

দার্জিলিঙে আমি আর ভক্তা ফিরলাম আগে। কিছুদিন পরে নীতাও তার দাদার সঙ্গে এসে পোঁছল। ট্রেন থেকে নেমেই এদিক-ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভক্তা আছে তো?'

'আছে বৈকি!'

'স্টেশনে এল না?'

'স্টেশনে এলে তোমার জন্যে রান্না করবে কে? তাছাড়া ঘর-দোর সাজানোর ব্যাপারেও ফাইনাল টাচ চলছে দেখে এলাম।'

নীতা হাসল। শুধু খুশি নয়, আশ্বস্ত হল। স্টেশন থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, 'আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, ভক্তা না থাকলে এই পাহাড়ী অঞ্চলে থাকবো কী করে? একেবারে একা। তোমার তো আবার দুবেলা অফিস!'

নীতা যা ভেবে নিশ্চিন্ত হল, সেটাই যে অন্যদিকে গভীর দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, সমস্যার সমাধান বলে যাকে সে মনে করছে, আমাদের কাছে সে-ই হবে প্রচণ্ড সমস্যা, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম? কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে তুললেন আমার কর্তারা। আমার ঠিক উপরের পদে যিনি ছিলেন, জেলের চীফ এক্জিকিউটিভ, বয়স্ক বিজ্ঞ লোক, আমাকে স্নেহ করেন, সর্বদা খোঁজ-খবর নেন, একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাংলোয়। দু-একটা অন্য কথার পর বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন, 'দ্যাখো মলয়, অ্যাদ্দিন যা করেছ তা করেছ, সে-সব আলাদা ব্যাপার। এবার বৌমা এসেছেন। ছেলেমানুষ, বেশীর ভাগ সময় একা থাকতে হয়। ঐ রকম একটা বদমাশকে বাড়িতে রাখা আর কোনোমতেই উচিত হবে না। তার ওপরে ও মদ-টদ খায়। ওটাকে তাড়াও।'

একেবারে গোড়াতে ভক্তাকে যখন চাকরি দিই, তখনো তিনি সেটা স্বভাবতই পছন্দ করেননি। এবারকার আপত্তি অন্য রকম। ইঙ্গিতটাও স্পষ্ট। তবু আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিচ্ছি না দেখে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন, 'এ নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরও ঐ মত। তাছাড়া তুমি যা করছ সেটা আসলে **harbouring a criminal**, পিনাল কোড্'এর ধারায় পড়ে। পুলিস

তোমাকে ফ্যাসাদে ফেলতে পারে।'

তার চেয়ে ওর প্রথম যুক্তিটাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। মদ-টদ খাওয়ার ব্যাপারটা আমার অজানা ছিল না। পাহাড়ী মাত্রেই খায়। বাড়িতে বাড়িতে চোলাইয়ের ব্যবস্থা আছে। আমাদের ডাক্তার থাপার বাড়িতেও সে কর্মটি নিয়মিত চলে। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, ডাক্তার, তোমাকে কোন্‌দিন জেলে যেতে হবে। ডাক্তার হেসে বলেছিল, তা মন্দ কী? পুলিসের বড়কর্তারাও থাকবেন আমার সঙ্গে। আমি তো অল্পস্বল্প চালাই, তাঁদের বাড়িতে রীতিমতো ভাটি-খানা আছে, দেখে এসো।

নীতাকে সব জানালাম। ভক্‌তা যে মাঝে মাঝে 'ধেনো' টেনে আসে তাও বললাম। মনে করেছিলাম ভয় পাবে। মাতালকে সব মেয়েই ভয় করে। কিন্তু সে এ ব্যাপারটাকে আমল দিতেই চাইল না। বলল, 'সে তো ঐ বাসনমাজা নানীটিও টানে। ওটা ওদের রোজকার 'মেনু'। কিন্তু ভক্‌তাকে কোনোদিন এতটুকু বেচালপানা করতে দেখেছ?'

তা অবশ্য দেখিনি। শুধু দু-একদিন চা-টা দিতে এলে গন্ধ পেয়েছি। নীতা আসবার পরেও একদিন পেয়েছিলাম, সেইদিনই আড়ালে ডেকে নিয়ে বেশ কড়া করে বলে দিয়েছিলাম, ওটা ছাড়তে হবে। তা না হলে আমিই তোকে ছাড়িয়ে দেবো। ও কানে হাত দিয়ে বলেছিল, আর কোনোদিন ওসব ছোঁবো না।

এর মধ্যে একদিন ভক্‌তা কাজে এল না। কাগঝোরায় কোন্‌ একটা বস্তিতে ওর বাড়ি। রাত্রে চলে যেত, ভোর হতেই চলে আসত। একটা দিন দেখে পরের দিন আরদালীকে পাঠালাম ওর খোঁজে। সে খবর নিয়ে এল, ভক্‌তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। থানায় ফোন করলাম, ও. সি. বললেন, কাছাকাছি কোথায় একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহক্রমে ধরা হয়েছে। উপযুক্ত জামিন দিলে ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই। আমিই জামিন হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। আমার উপর-ওয়ালাদের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হল।

যদিও জানি, তার এই গ্রেপ্তার হয়তো অহেতুক, কোথাও কিছু হলে 'দাগী'-গুলোর উপরেই পুলিসের নজর পড়ে, তবু ভক্‌তাকে নিয়ে মনের মধ্যে যে অস্বস্তি চলছিল এরপরে সেটা আরও কিছুটা বাড়ল। এমনি সময়ে একদিন সে বেশ কিছুটা বেলা করেই কাজে আসছিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিল সেই পরিচিত গন্ধটা নাকে লাগল। বললাম, 'দাঁড়াও।'

সে ততক্ষণে সামনের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে দাঁড়াল। আমি ধমকের স্বরে বললাম, 'উস্‌ রোজ তুম্‌কো মানা কিয়া। ফিন্‌ আজ দারু পিকে আয়া হ্যায়?'

'নেহি সাব্‌, হাম দারু নেই পিয়া।' বেশ কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল ভক্‌তা।

সাধারণতঃ যে রকম নরম সুরে সে কথা বলে থাকে তার থেকে আলাদা। আমার কাছে সেটা ঔদ্ধত্য বলেই মনে হল। স্বভাবতঃই মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। গলাও চড়ল, 'কেয়া! তেরি ইয়ে হিম্মত, তু মুঝে দিমাগ্‌ দেখাতা

হ্যায় ?'

'কাঁহা দিমাগ্ দেখায়া সাব্ ?'

চেঁচামেচি শুনে নীতা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরের ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ?'

আমি কিছু বলবার আগেই ভক্তা যেন খানিকটা অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, 'দেখিয়ে মাইজী, সাব্ ঝুটমুট হামকো বদনাম দেতা হ্যায়।'

এই ন্যাকামিটা আরো বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বলে দিলাম, 'তোর চাকরি এখানেই খতম। তোকে আর ভেতরে যেতে হবে না।'

ভক্তা বোধহয় এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। একবার আমার ও একবার নীতার মুখের দিকে তাকাল, আর কিছু বলল না। বারান্দা থেকে নেমে ধীরে ধীরে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তখনো দৃষ্টির আড়ালে যায়নি, হঠাৎ খেয়াল হতে আরদালীকে দিয়ে বলে পাঠালাম, ঐ ক'দিনের তলব যেন সে আসছে মাসের গোড়ায় এসে নিয়ে যায়। সে কোনো সাড়া দিল না। যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভাবে চড়াই পথ বেয়ে উপরে উঠে গেল।

তলব নিতে সে আসেনি। কয়েকদিন অপেক্ষা করে আরদালীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে শুনল, ভক্তা ঐ বস্তি থেকে চলে গেছে। কোথায়, কেউ বলতে পারে না।

বৈকালিক অফিস থেকে যেদিন একটু সকাল সকাল বেরোতে পারতাম, নীতুকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম। বেশীর ভাগ ম্যাল'এ। অনেকখানি পথ। সন্ধ্যার পর জনবিরল। গুর্খা আরদালী সঙ্গে থাকত। ইতিমধ্যে একটি হিন্দুস্থানী 'মহারাজ' জুটে গিয়েছিল। সে থাকত রান্নাবান্না নিয়ে। কখনো কখনো কেনা-কাটার প্রয়োজন থাকলে তাকেও নিয়ে যেতাম। বাড়ি থাকত তালা-বন্ধ। খানিকটা নীচেই সিপাইদের গারদ। আমার বাংলোর ধার দিয়ে ওঠা-নামার পথ। চুরি-চামারির আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না।

একদিন রাত আটটা নাগাদ ফিরে দেখি, আমাদের শোবার ঘরের তালা খোলা। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। বেশ মনে আছে, আমি নিজের হাতে বন্ধ করে বেরিয়েছি। নীতা ছুটে এল। এদিক-ওদিক ক্ষিপ্র দৃষ্টি ফেলে বলল, 'তোমার স্যুটকেস ?'

আমি বললাম, 'মরুকগে স্যুটকেস (যদিও আমার গোটা দুই গরম সুট এবং কিছু টাকাও ছিল তার মধ্যে), তোমার ট্রাঙ্কটা আছে কিনা দ্যাখো।'

নীতা খাটের নীচে উঁকি দিয়ে বলল, 'আছে।'

আরদালী এসে বাক্সটা টেনে বের করল। তালাও ঠিক আছে। ওর মধ্যেই নীতার সব গয়না। প্রাণে খানিকটা জল এল। আর কিছু গেছে কিনা খুঁজে-পেতে দেখলাম। না, সব যেমন ছিল তেমনি আছে।

আমার ধারণা ছিল, স্যুটকেসের মধ্যে জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু নেই।

নীতা মনে করিয়ে দিল, তার তলায় একসেট রুপোর বাসন ছিল—বিয়ের দান, আর ছিল আমার স্কুল ও কলেজে পাওয়া গোটাচারেক সোনার মেডেল। বিশেষ করে ওগুলোর জন্যেই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। নীতারও। অর্থমূল্য ছাড়া ওর আর একটা দাম আছে। বাকী জিনিস আবার নতুন করে করা যাবে, কিন্তু ঐ ক'টি মহার্ঘ বস্তু আর ফিরে আসবে না।

খবরটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। সকলেই একবাক্যে রায় দিল, এ ভক্তা ছাড়া আর কেউ নয়। অন্য কোনো চোর হলে তালাটা ভেঙে ফেলত। ওর আর সে কষ্ট করতে হয়নি। ডুপ্লিকেট চাবি আগে থেকেই তৈরী ছিল। ঠাকুর যে আজ থাকবে না সে কথাই বা অন্য লোকে জানবে কেমন করে? নিশ্চয়ই অনেক দিন থেকে তাকে-তাকে ছিল। আজ সুযোগ পেয়েছে, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাঁসিল।

যথারীতি পুলিসে খবর দেওয়া হল। সেই রাত্রেই তারা হানা দিল ভক্তার বস্তিতে এবং আরো কয়েক জায়গায়, তার সম্ভাব্য আস্তানা বলে যেগুলো মনে করল পুলিস। গুরুং সাহেব অগ্রণী হয়ে একজন দক্ষ অফিসারের উপর তদন্তের ভার দিলেন। কিন্তু ভক্তা নিরুদ্দেশ। আমার ক্ষতি যতই হোক, ও নিয়ে আর মাথা ঘামানো নিরর্থক বলে মনে হল। ভক্তাই হোক আর যে-ই হোক, চোর হয়তো একদিন আমার জেলে এসে ঢুকবে, কিন্তু আমার জিনিসগুলো তো আর ফিরে পাবো না।

নীতা প্রতিবেশিনীদের কথায় কোনো জবাব দিল না, কিন্তু আমাকে বেশ দৃঢ়ভাবেই বলল, 'ভক্তা এ কাজ করেনি। সে তো জানত, খাটের তলায় ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে আমার সব গয়না আছে। সে সেইটাই ফেলে গেল!'

আমি বললাম, 'হয়তো তাড়াতাড়িতে পেরে ওঠেনি। হাতের কাছে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে।'

*

বদলির চাকরি। দার্জিলিঙের মেয়াদ একদিন ফুরোল। একটা কলমের খোঁচায় উত্তরের শীর্ষ থেকে নেমে গেলাম দক্ষিণের পাদদেশে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। পূর্ব-পশ্চিমের জিলাগুলোয় দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে এক শুভ্র শরৎ-প্রভাতে পৌঁছলাম এসে কলকাতায়। অনেক দিন ছুটি নিইনি। কোথাও ঘুরে এলে কেমন হয়? ইতিমধ্যে কয়েক ধাপ পদোন্নতিও হয়েছে। সপরিবারে আরাম করে বেড়াবার মতো সম্বলও দুর্ঘট হবে না। আমার প্রস্তাব ছিল গয়া, কাশী, দিল্লী, হরিদ্বার। কিন্তু ভোটে হেরে গেলাম। ছেলেদের ইচ্ছা দার্জিলিং, তাদের বাবার প্রথম কর্মস্থল। পাহাড়ের গায়ে, পাইন বনের ধারে, লাল টিনে ছাওয়া সেই ছোট্ট সুন্দর বাংলোটি, যেখানে তাদের মা নতুন বৌ হয়ে ঢুকে ছিলেন, অনভ্যস্ত হাতে সংসার পেতেছিলেন, সেটা তারা দেখতে চায়। তাছাড়া 'দার্জিলিং ইজ দার্জিলিং,' তার কি কোনো তুলনা আছে? নীতাও সোৎসাহে সায় দিল, 'তাই চল। একেবার দেখে আসি পুরনো জায়গাটা। কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! অনেকেই তো ওখানকার বাসিন্দা—ন্যাড়া

গোঁসাই, শোভনাদি, বোসবাবুরা, ডাক্তার ভঞ্জ—খুব জমে যাবে আবার !'

আস্তানা ছিল হোটেলে। সেটা শুধু খাওয়া (তাও মাঝে মাঝে রাস্তায় সেরে নেওয়া হত) আর ঘুমোবার জন্যে। বাকী সময়টা শুধু ঘোরা। পুরনো বাবুদের কেউ গত, কেউ জীবিত। কিন্তু নীতা যা ভেবেছিল, আগের মতো তেমন জমল না। অবিশ্যি তা-ই হয়ে থাকে। দশবছর আগেকার আমি আর আজকের আমি কি এক ? তা যদি না হয়, অন্যের বেলায় সেটা আশা করা যায় না।

ডাক্তার ভঞ্জ থাকেন খানিকটা দূরে, কাগঝোরার ওদিকটায়। ছেলেরা গেল বার্চহীলে, আমরা দুজনে তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। চোখে কম দেখেন। প্রথমটা ঠিক চিনতে পারলেন না। পরিচয় দিতেই এসে দুজনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বসালেন। নীতাকে বললেন, 'এই চেয়ারটাতেই বসতে তখন, মনে আছে ? দ্যাখো, এখন ধরে কিনা !'

নীতা তেড়ে উঠল, 'খবরদার, আজ মঙ্গলবার, অমন করে খুঁড়বেন নাদ বলছি।'

ডাক্তার ভঞ্জ হেসে উঠলেন, 'বালাই ষাট, খুঁড়বো কেন ? বরং আশীর্বাদ করছি, দিন দিন আরো উন্নতি হোক।' বলে, দু'হাত অনেক খানি ফাঁক করে দেখালেন।

নীতা করুণ সুরে বলল, 'সত্যি, কী করি বলুন তো ডাক্তারকাকা ? এই কটা ভাত খাই, ঘি-মাখন ছুঁই না। তবু দেখুন...'

'কে বলেছে তোমাকে এসব করতে ?' ধমকে উঠলেন ডাক্তার, 'পেট ভরে খাবে। কিচ্ছু মোটা হওনি তুমি। ঠিক আছো। আর 'তন্বী' হতে হবে না আজকালকার মেয়েদের মতো।' আমার দিকে ফিবে বললেন, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো ভাবছিলাম। দু-একদিনের মধ্যেই জেলখানায় খবর নিতাম, কোথায় আছো এখন। ঠিক সময় বুঝেই এসে গ্যাছ। কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে সংসারে !'

দরকারটা কী জিজ্ঞেস করতে যাবো, তার আগেই তিনি বললেন, 'সেই ভকতাটাকে মনে আছে, তোমাদের বাসায় কাজ করত ?'

আমি আর নীতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল। ডাক্তার ভঞ্জ মিনিট খানেক থেমে আস্তে আস্তে বললেন, 'মাস খানেক হল সে মারা গেছে। খুবই ভুগছিল শেষদিকটায়। চলতে পারত না। বোধহয় কোথাও চুরি-টুরি করতে গিয়ে একটা পা খুইয়ে আসতে হয়েছিল। ভিক্ষে ছাড়া গতি ছিল না। তাই-বা কে দেয় ? ঘরে একটা বৌ ছিল, ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গিয়েছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে আমার কাছে আসত মাঝে মাঝে। আমি এক-আধটু দেখতাম। একদিন এসে কাগজে জড়ানো কী একটা আমার টেবিলের উপর রেখে বলল, আমি মরে গেলে এই জিনিসটা আপনি চৌধরী সাহেবকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই যে জেলখানায় যার বাড়িতে আমি কাজ করতাম ! আপনি তো প্রায়ই যেতেন সেখানে।

আমি বললাম, কী এটা ?

সে কাগজটা খুলে দেখাল, ইঞ্চি চারেক লম্বা একটা ছেঁড়া হার। একটু হেসে বলল, গোটাটাই লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। বৌ-মাগী কি করে জানতে পেরে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আমি গিয়ে ধরলাম। টানাটানিতে ছিঁড়ে গেল। বেশীটাই সে নিয়ে পালাল। বাকী এইটুকু আমি আমার গলার ফোকরে রেখে দিয়েছিলাম। জেলে থাকতে এরকম অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতাম আমরা। টাকা-পয়সা সোনার জিনিস। সিপাইদের দিয়ে গাঁজা বিড়ি চরস-টরসও আনিয়ে নিতাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে পেলি এটা ?

সাহেবের কুঠি থেকে চুরি করেছিলাম। মাইজীর গলার হার।

তা, ফিরিয়ে দেতে চাইছিস কেন রে ? সে সাহেব তো কবে চলে গেছে। এতে তোর বেশ কয়েকদিন চলে যাবে।

ভক্‌তা সে কথার কোনো উত্তর দিল না। আরেকবার জানাল, জিনিসটা কিন্তু আপনি ঠিক দেবেন ডাক্তারবাবু।

'বোঝো এবার।' বলে, হাসতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ ডাক্তার। কিন্তু হাসিটা যেন ঠিক ফুটল না। আলমারি খুলে একটা ছোট প্যাকেট বের করলেন।

আমি বললাম, 'আমরা আর এ দিয়ে কী করবো ? আপনি বরং ওটা কোনো চ্যারিটেবল ইনস্‌টিটিউশনে…'

আমার কথা শেষ হবার আগেই নীতা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল জিনিসটা। তার কাণ্ড দেখে আমি তো থ! সে যে এতটা লোভী হতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি। রাস্তায় বেরিয়ে বলল, 'তোমকে আমি বলিনি, পাছে বকুনি খাই। এই হারটা একদিন বেড়িয়ে এসে তাড়াতাড়িতে তোমার স্যুটকেসে রেখে দিয়েছিলাম।'

আমি চুপ করে রইলাম। ওর সঙ্গে কথা বলতে সত্যিই ইচ্ছা করছিল না। কাগঝোরার পুলটা যখন পার হচ্ছি, নীতা এদিক-ওদিক চেয়ে দূরে একটা বস্তির দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওখানেই বোধহয় সে থাকত, তাই না ?'

আমি কোনোদিকে না চেয়েই বললাম, 'হবে, আমি ঠিক জানি না।'

'একটু দাঁড়াও।' বলে, নীতা রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তীব্র গর্জন করে ছুটে চলেছে ঝরনা। সেদিকটা একবার দেখল। তারপর তার হাতব্যাগের ভিতর থেকে সেই কাগজের মোড়কটা বের করে নীচে ফেলে দিল। কিছুক্ষণ সেইখানেই চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার পাশে ফিরে এসে বলল, 'চল।'

মাংস

শহরতলির এ অঞ্চলটায় কিছুদিন থেকে চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। দোকানের তালা ভেঙে, ধনী গৃহস্থের জানালার গ্রিল কেটে বড় রকম বার্গলারীও হয়ে গেছে দু-তিনটে।

থানার বাবুদের সেই মামুলী সাফাই, পলিটিকাল হাঙ্গামা থামাবো, না

চোর-ডাকাত ধরবো ?

এস. পি. এসে ঘুরে গেছেন দু'বার। তাঁর বিশ্বাস, সবই একটা পুরনো, পাকা গ্যাঙের কাজ। ধরা পড়ছে না, তার কারণ সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে বসে আছে। তারপরেই একজন নতুন অফিসার পাঠিয়েছেন। সাব-ইনস্পেক্টর অনুপম ঘোষ। তিন-চারবছর হল ঢুকেছে পুলিসে। বুদ্ধি আছে, কাজ করবার আগ্রহ আছে, এবং সব চেয়ে বড় কথা, 'অনেস্ট' অর্থাৎ সৎ। অন্ততঃ এখনো আছে। পরে কী হবে বলা শক্ত।

অনুপম আসবার পরেও দুটো কেস্ হয়ে গেল। কাউকে ধরতে পারেনি। তবে, কিছু সন্দেহজনক সূত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু তার উপরে নির্ভর করে অ্যারেস্ট করা চলে না। রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে চেঁচাতে থাকবে। অ্যারেস্ট যদি বা করে, ধরে রাখতে পারবে না। কোর্টে গেলেই জামিন। কিংবা কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই পাড়ার 'দাদারা' এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

এদিকে উপর থেকে ক্রমাগত চাপ পড়ছে। সার্কেল ইন্স্পেক্টর এসেছিলেন সেদিন। বলে গেছেন, 'আর সাতদিন সময় দিয়েছেন পুলিস সাহেব। এর মধ্যে কদ্দূর কি করতে পারবে, তার ওপরে নির্ভর করছে তোমার সমস্ত কেরিয়ার।'

অনুপম রাউণ্ড বাড়িয়ে দিল। পালা করে দুজন সিপাই নিয়ে এপাড়া-ওপাড়া টহল দিয়ে বেড়াল। কোনো কোনো রাত্রে দু-খেপ। ঘুম-টুম উঠল শিকেয়।

ক'দিন পরেই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে। নামী সোনা-রুপোর দোকান। গোটা পাঁচ-ছয় বড় বড় মজবুত তালা ঝুলছে দরজার গায়। সবগুলো খোলা হয়ে গেছে—ঠুকে নয়, অ্যাসিড দিয়ে গালিয়ে—বাকী শুধু একটা। এমন সময় অনুপম হঠাৎ গিয়ে পড়ল, 'হ্যাণ্ডস্ আপ।' একজন পালাল আরেকজন আর পারল না। হাত তুলে দাঁড়াল পিস্তলের মুখে।

হুইসিল বাজাতে সিপাই দুটিও এসে পড়ল। একজন হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এযে বটুবাবু।'

অনুপম টর্চ ফেলল লোকটার মুখে। চেনা-চেনা বলে মনে হল তারও। থানাতেই দেখে থাকবে বোধহয়।

বটুবাবুর মুখে একগাল হাসি। প্রায় গলে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'থানার সবাই আমাকে চেনেন স্যার। আপনি নতুন এসেছেন কিনা, এখনো আলাপ-পরিচয় হয়নি। আমারই গলতি। এবারের মতো মাপ করে দিন। কালই আপনার সঙ্গে দেখা করবে …'

'লে চলো।' সিপাইদের কড়া নির্দেশ দিল অনুপম। হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি পরিয়ে বটুবাবুকে থানায় নিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হল।

অনেকদিন রাত জাগার পর অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছিল অনুপম। মা'র ডাকা-ডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বসল। চারদিক অন্ধকার। বাবার অসুখ চলছে ক'দিন থেকে। সেই কথাটাই মনে হল সকলের আগে। দরজা খুলে বাইরে আসতেই মা

শুকনো মুখে বললেন, 'বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন তোকে। খুব নাকি জরুরী দরকার। আমি বললাম, এই তো সবে এসে শুয়েছে। সিপাই বলে গেল, তাহলেও তুলে দিতে বলেছেন বড়বাবু। এ এক আচ্ছা চাকরি জুটেছে বাপু। ফ্যাসাদ লেগেই আছে। রাত্তিরে যে একটু ঘুমোবে ছেলেটা তারও যো নেই।' বলতে বলতে তিনি ওদিকে চলে গেলেন। অনুপম সার্টটা গায়ে গলাতে গলাতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

থানার অফিসে একা বসে আছেন ও. সি.। অত্যন্ত গম্ভীর। অনুপম গিয়ে দাঁড়াতেই ভারী গলায় বললেন, 'বসুন।' তারপর আর কথা নেই। অনুপম রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে। পুরো পাঁচ মিনিট পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে নীরবতা ভঙ্গ করলেন বড়বাবু, 'আপনি চাকরিতে ঢুকবার আগে ইংরেজ আমলে এসব চলত। আমরা অনেক করেছি। উপরওয়ালারা নজর দিতেন না। কেউ কেউ বরং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সে-সব কারবার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট যখন চায় না দেশের লোক হৈ-চৈ করে, তখন কী দরকার? আমাদের চাকরি বাঁচানো নিয়ে কথা। কী বলেন?'

সে তো অবশ্যই। কিন্তু এই তত্ত্ব-কথা শোনাবার জন্যেই কি তাকে গভীর রাতে ঘুম থেকে টেনে তোলা হয়েছে? অনুপম চুপ করে রইল। তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বড়বাবু আবার শুরু করলেন, 'তবু আমরা, যারা পুরনো লোক, মাঝে মাঝে আগের অভ্যেস ছাড়তে পারি না। কিন্তু আপনারা নব্যতন্ত্রের অফিসার। এতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলবেন, একেবারেই ভাবা যায় না।'

অনুপম তখনো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তবে বেশীক্ষণ নয়। এর পরেই বড়বাবু অনেকখানি স্পষ্ট হলেন, 'দু'চারটে কীল, ঘুষি কিংবা একটা-দুটো রুলের ঘা যদি বসান, কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু এ কী করেছেন মশাই! লোকটাকে একেবারে আধমরা করে ফেলেছেন!'

এবার একেবারে আকাশ থেকে পড়ল অনুপম, 'কোন্ লোকটা?'

বড়বাবু হাসলেন, 'আমার কাছে আর লুকোচ্ছেন কেন, অনুপমবাবু? আসুন।'

সহকারীকে নিয়ে চললেন হাজতের দিকে। দরজার সামনে গিয়ে জোরাল টর্চ জেলে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন?'

অনুপম শিউরে উঠল। লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। পিঠময় রক্ত। কেটে কেটে বসে গেছে চাবুকের দাগ।

'এ কী করে হল!' অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মতো বলল অনুপম। বড়বাবু সে-কথার জবাব না দিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'পালাবার-টালাবার চেষ্টা করেছিল কি? কিংবা চড়াও হয়েছিল আপনার ওপর?'

অনুপম মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে এতটা মারধর করবার কী কারণ দেখাবেন আপনি?'

'আমি ওকে মারিনি। আই ডিড্‌নট টাচ হিম।'

'আপনি না মারুন, আপনার হুকুমে সিপাইরা মেরেছে। ইট্‌স্‌ অল দি সেম্‌।'

'না, মারবার হুকুমও আমি দিইনি, আমার সামনে কেউ মারেওনি।'

বড়বাবু আবার মুচকে হাসলেন। লোকটার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'অ্যাই···।' সে মাথা তুলে তাকাল।

'কে মেরেছে তোকে? ঠিক কথা বলবি। মিথ্যে বললে ডবল সাজা হয়ে যাবে।'

সে উঠে বসে হাত দিয়ে অনুপমকে দেখিয়ে দিল। অনুপম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'আমি মেরেছি তোমাকে!'

আসামী চুপ করে রইল, যার অর্থ—হ্যাঁ।

'কোথায়?'

'থানার সামনে, পুকুর পাড়ে। দুজন সিপাই পাশে দাঁড়িয়েছিল।'

এর পরে আর কী বলবে অনুপম? বড়বাবু ফিরে যেতে যেতে বললেন, 'ও ব্যাটা চোর। ন্যাচারালি ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। সিপাই দুটোকে ডেকে ঘটনাটা জানবার চেষ্টা করলাম।'

'কী বললে তারা?'

'ঐ কথাই বলল। আরেকবার ডাকাচ্ছি আপনার সামনে।'

'দরকার নেই।' বেশ কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলল অনুপম।

বড়বাবু ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনার বয়স অল্প। সহজে উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। তবু বলছি, এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ব্যাপারটা যে খুব সিরিয়াস নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।···এবার আমাকে কী করতে বলেন?'

'আমি আর কী বলবো? আপনি যা ভালো বোঝেন করুন।'

'আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। যদি চেপে যাই, আমার নিজেরই বিপদ। কেন না, ব্যাপারটা চাপা থাকবে না। অতগুলো ইনজুরী রয়েছে। আর যদি আসামীর স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করে ওপরে পাঠাই, ডি-এস্‌-পি অজয় গুপ্ত আসবে এনকোয়ারীতে। তাকে তো আপনি ভালো করেই জানেন। তারই বা দোষ কী? হাওয়া যেদিকে বইছে, সেই দিকেই তো চলতে হবে। ফস্‌ করে আপনার সাস্‌পেনশন অর্ডার এসে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ৩২৪ কিংবা ২৬ ধারায় মামলা দায়ের হবে।'

অনুপমের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বাবার ঐ অবস্থা। বোনের বিয়ে দিয়েছিল বছর দুয়েক আগে, মোটা টাকা দেনা করে। মাস তিনেক হল একটা কচি বাচ্চা কোলে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। আরো চারটে ভাই-বোন। সবগুলো পড়ছে। মা আছেন। গোটা সংসারের ভার তার একার উপর।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনুপম। বড়বাবুর কথায় চমক ভাঙল। তিনি বলছিলেন, 'একটা পথ অবশ্য আছে।'

ও.সি.র মুখের উপর সাগ্রহ দৃষ্টি ফেলল অনুপম। তিনি একটু থেমে তার-পর যোগ করলেন, 'ঐ আপদটাকে ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেবো !' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অনুপম।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, কথাটা আগে শেষ করতে দিন। ওর বদলে আরেকটাকে এনে পুরলেই হল। আমাদের কিছু করতে হবে না, ও-ই জুটিয়ে দেবে। তার নামে মামলা চলবে। আপনার সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। আপনার দিকে চেয়েই বলছি। আপনার সাংসারিক অবস্থা তো আমি জানি।'

অনুপমের প্রবল ইচ্ছা হল, সামনের ঐ প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে শুধু দুটো কথা লিখে দেয়ঃ 'আই রিজাইন'। তারপর সেটা ঐ লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু হাত উঠল না। যেমন ছিল তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। থানা থেকে বাসায় ফিরতে একটা ঝোপ পেরোতে হয়। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো সিপাই, তার সঙ্গে যারা রাউণ্ডে ছিল। একজন হাতজোড় করে বলল, 'আমাদের অপরাধ নেবেন না, স্যার। বড়বাবু গারদ থেকে ডাকিয়ে নিয়ে শাসিয়ে দিলেন, 'বটু যা বলছে তোমাদেরও তাই বলতে হবে। তা না হলে চাকরি থাকবে না।'

আরেকজন অনুনয়ের সুরে যোগ করল, 'গরীব মানুষ, স্যার। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি।'

অনুপম জানতে চাইল, 'লোকটাকে মারল কে ?'

'উনি নিজেই, আবার কে। সবটাই অবিশ্যি আপসে। ওর ওপর খানিকটা রাগও ছিল পাওনা-টাওনার ব্যাপারে। এই সুযোগে মনের ঝাল মিটিয়ে নিলেন।'

অন্য সিপাইটি বলল, 'কিন্তু লোকটাকে ধন্যি বলতে হবে! বেতের মুখে পিঠের মাংস উঠে এল, একটা 'রা' পর্যন্ত করল না।'

'তা, কয়েক টুকরো মাংসের বদলে যদি এতবড় একটা মামলার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়, 'রা' করতে যাবে কেন ? তাছাড়া মার-টার ওদের লাগে না.' বলল অন্যজন।

ঐদিনই একটা জরুরী তদন্ত ছিল। সেটা সেরে একবার সদরেও যেতে হবে। সকাল সকাল বেরোনো দরকার। মাকে আগের দিনই বলে রেখেছিল অনুপম। তিনি তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচ দিয়ে ডাল-ভাত-আলুভাজা করে দিলেন। সে খেতে চাইল না। মায়ের পীড়াপীড়িতে গিয়ে বসল। দু-এক গ্রাস মুখে দিতেই গা পাক দিয়ে উঠল। আসামীর মাংস-উঠে-যাওয়া রক্তাক্ত পিঠটা তখনো চোখের উপর ভাসছিল।

রাত ন'টা নাগাদ ফিরে আসতেই সাত-আট বছরের ছোট বোনটা ছুটতে ছুটতে এসে হাত জড়িয়ে ধরল। চোখ-মুখ থেকে উপচে পড়ছে খুশির ঝলক। বলল, 'জানো দাদা, আজ আমাদের মাংস রান্না হয়েছে।'

'মাংস !' সকালবেলার দৃশ্যটা মনে পড়ল অনুপমের। তাকিয়ে দেখল, সকলের মুখেই লোলুপ খুশির আমেজ।

মা-ও হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'একজন লোক দিয়ে গ্যাছে দুপুর-বেলা। বলল, বটুবাবু পাঠিয়েছে। বাবু চেনেন। তুই আর দেরি করিসনে। হাত-মুখ ধুয়ে আয়। ওবেলা তো দুটো গেরাস মুখে না তুলেই উঠে পড়লি।'

লৌহ কপাটের বাইরে

সেই লোকটাকে আপনার মনে আছে? থাকবারই কথা। তবু বলা যায় না। কত অজস্র চরিত্র ছড়িয়ে আছে আপনার রচনায়। কত বিচিত্র ধরনের নরনারী। সবগুলো কি আর স্মৃতির কোঠায় সাজানো আছে? লেখকও তো মানুষ। তাঁর মনেরও ধরে রাখার শক্তির একটা সীমা আছে। কোনো কোনো সৃষ্টি সেখানে অক্ষয় হয়ে থাকে। আবার কিছু হয়তো তার ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে যায়, কিন্তু হারায় না। কোনো পাঠকের মনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই যেমন, সেই লোকটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। অথচ ধরে রাখা দূরে থাক, তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল। সকলেই তাই দেবে। আমিও একটা তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো মনোভাব নিয়ে তার দিকে তাকাইনি। আজও যে তাকে অন্য চোখে দেখছি তা নয়। তবু সে আমাকে ছাড়ছে না।

লোকটা হচ্ছে আপনার সেই অনামা পত্রলেখক, যে গভীর রাত্রে তার রুগ্না স্ত্রীকে চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর শিকল টেনে গাড়ি থামিয়ে গার্ডের কাছে ভালো মানুষ সেজেছিল: 'আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফার্স্ট ক্লাস কুপে। উপরে-নীচে দুটো বার্থ। গার্ড জানতে চাইলেন, 'কোথায় ছিলেন তিনি?'

'এই নীচের বার্থে।'

পুলিস কেস দায়ের করেছিল, কিন্তু আসামীকে আটকাতে পারেনি। তার উকিল জজ সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন, পতিব্রতা সেবাপরায়ণা স্ত্রী। আজীবন স্বামীকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই ছিল তার ধর্ম ও সাধনা (সে বিষয়ে অনেক বিশ্বাস্য সাক্ষ্য-প্রমাণও হাজির করেছিলেন)। সে যখন দেখল, তার দেহে যক্ষ্মা এসে বাসা বেঁধেছে, প্রতিদিন তাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, তখন স্বামীর জীবনে একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছিল।

আর, ঐ লোকটা তার এই বীভৎস দুষ্কর্মের সমর্থনে যে কথা আপনাকে লিখেছিল আজও আমার তা মনে আছে: নিছক ইউটিলিটি বা প্রয়োজন ছাড়া 'স্ত্রী' নামক পদার্থটাকে আমি আর কোনোদিক থেকে দেখিনি।···সেই ইউটিলিটির কষ্টিপাথরে তার দাম অনেক দিন থেকেই কমে আসছিল। আজ যখন সেটা শূন্যে এসে ঠেকল, তখন একটিমাত্র প্রশ্নই আমার মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠল, একে দিয়ে আমি করবো কী?···

থাক তার কথা। এবার নিজের প্রসঙ্গে আসি। তার আগে এইটুকু শুধু বলে রাখি, ওর সঙ্গে আমার কোথাও একটু মিল আছে।

না, খুন বা ঐ রকম কোনো অপরাধ আমি করিনি। তবু যা করেছি শুধু নৈতিক দিক দিয়ে গর্হিত নয়, পিনাল-কোডের সংজ্ঞা অনুসারে ক্রাইম। অথচ আজও আমি জেলের বাইরে রয়ে গেছি। আপনার সেই পত্রলেখক নিশ্চয়ই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি ? থাক্, ভণিতা অনেক হল। যা বলতে চেয়েছিলাম, শুরু করা যাক।

বি. কম. পাস করে যথারীতি চাকরির সন্ধানে ঘুরছিলাম। অনেকেই যেমন ঘোরে। রোজ এগারোটা নাগাত, অর্থাৎ বাস-ট্রামের বাদুড়ঝোলা একটু যখন কমের দিকে, তখন বেরিয়ে পড়ে অফিস পাড়ায় ধরনা দেওয়া। ফল কোথাও সোজাসুজি 'না', কোথাও একটু ক্ষীণ ভরসা ঃ 'এখন কিছু নেই, মাসখানেক পরে খবর দেবেন।'

এমনি এক 'খবর নেবার' তাগিদে একদিন একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলাম। বাস-এর দরজার বাইরে তিনটি স্তর। তৃতীয় স্তরে আমি। ডান হাতে রডটা ধরতে পেরেছি, ডান পা'টা কোনোরকমে ছুঁয়ে আছে পাদানির একটা কোণ, বাকী দেহটা শূন্যে। আমার সামনে যে তরুণটি তার অবস্থা আর একটু বেশী ঝুলায়মান।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা ট্যাক্সি এসে তার বাঁ হাতে ধাক্কা মারতেই সে ছিটকে পড়ে গেল। ট্যাক্সি যথারীতি উধাও। বাসটা কিছুদূরে গিয়ে থেমে গেল। তার থেকে নেমে আসা কিছু লোক (তার মধ্যে আমি) এবং কিছু পথচারী ঘিরে ফেলল ভদ্রলোককে। আমি শুধু এক নজরে তাকে দেখতে পেলাম। তারপরেই ভিড়ের ধাক্কায় সরে আসতে হল! খানিকটা সোরগোল। তার মধ্যেই দেখলাম, কয়েকজন ধরাধরি করে তাকে একটা গাড়িতে তুলল এবং বোধহয় কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেল।

যে কাজে বেরিয়েছিলাম তাতে বাধা পড়ল। ছেলেটির কথা ভেবে মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অফিস পাড়ায় আর গেলাম না। ফিরতে গিয়ে সেই জায়গাটা চোখে পড়ল, যেখানে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটি। খানিকটা রক্ত, ছেঁড়া জামার টুকরো, আর তার পাশে একখানা লম্বা বাদামী রঙের খাম। নিছক কৌতূহলবশেই তুলে নিলাম। উপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপানো একটি বিখ্যাত কোম্পানীর নাম। অর্থাৎ সেখান থেকেই আসছে ওটা। মাঝামাঝি জায়গায় টাইপ করা—শ্রীঅমিতোষ সরকার এবং তার ঠিকানা। চিঠিটা বোধহয় দরকারী। গায়ে ছাপ রয়েছে 'Under certificate of posting'.

চিঠিটা কার ? যে পড়ে গেল তারই হবে হয়তো। পকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কিংবা অন্য কারো হওয়াও অসম্ভব নয়। বাস থেকে হুড়মুড় করে একদল লোক বেরিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কারো পকেট থেকেও পড়তে পারে। যারই হোক, আমার উচিত তাকে পৌঁছে দেওয়া। ঠিকানা তো রয়েছে,

এবং জায়গাটা আমার বাড়ি থেকে খুব দূরেও নয়। তার চেয়ে আরো সহজ ডাকে ছেড়ে দেওয়া। আজ না হোক কাল পেয়ে যাবে।

কিছুদূর গিয়েই একটা ডাক-বাক্স পেয়ে গেলাম। খামখানা পকেট থেকে বের করতে ছাপানো নামটা আবার চোখে পড়ল। বেশ বড় কোম্পানি। কী থাকতে পারে এর মধ্যে? নিয়োগপত্র? অর্থাৎ কোনো একটা চাকরি পেয়ে গেছে ভদ্রলোক। ইণ্টারভিউ লেটারও হতে পারে। অথবা চাকরি না দেবার জন্যে মামুলী দুঃখপ্রকাশঃ 'we regret to say'···ইত্যাদি, যা আমি অনেক পেয়েছি।

যাই থাক না কেন, আমার তাতে কী? তবু একটা অদম্য কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে। একবার দেখতে দোষ কী? একটুখানি জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলেই খামের মুখটা খুলে যাবে। চিঠিখানা বের করে চোখ বুলিয়ে আবার ভরে দেওয়া। যদি চাকরি হয়, ডাকে না দিয়ে বরং নিজে গিয়ে এই ভাগ্যবান লোকটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসা যাবে।

কাছেই একটা পার্ক ছিল। ও সময়ে কোনো লোকজন নেই। একটা জলের কলও ছিল একধারে। গাছের নীচে বেঞ্চির উপর বসে আস্তে আস্তে খামের মুখটা খুলে ফেললাম। ছোট্ট চিঠি। পড়তে আর কতক্ষণ গেল? সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড চমক। নিয়োগপত্রঃ

'শ্রীঅমিতোষ সরকারকে অ্যাকাউণ্টস বিভাগে ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করা হল।'

কেরানী হলেও এর মাইনের অংকটি লোভনীয়। অতবড় কোম্পানি। আজই বেলা বারোটায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

হাতে ঘড়ি ছিল। এগারোটা প্রায় বাজে। এখনই এটা ঐ অমিতোষ সরকারের হাতে পৌঁছনো দরকার। কিন্তু কেমন করে? তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবো? কী লাভ? সে তো বেরিয়ে পড়েছে। আর যে ছেলেটি পড়ে গেল সে-ই যদি অমিতোষ হয়, তাহলে? কে জানে, কোথায় আছে সে, কেমন আছে?

পিসীমা বলতেন, মানুষের মনে 'সু'-এর চেয়ে 'কু'-টাই আগে আসে। হয়তো তাই। আমারও মন বারবার বলতে লাগল, এই অমিতোষই চলে গেল হাসপাতালে। কোন্ হাসপাতাল তা তো জানি না। খোঁজ নিলে বোধহয় জানা যেতে পারে।

আমার এক বন্ধুর একটা দোকান ছিল কিছুটা দূরে। তার ফোন আছে। অ্যাক্সিডেণ্টের কথা শুনে ব্যবহার করতে দিল। ভদ্রলোককে আমি চিনি এই-টুকুই শুধু বললাম তাকে। দু-তিন জায়গায় চেষ্টা করার পর একটা হাসপাতালে খোঁজ পাওয়া গেল। ফোনে যিনি সাড়া দিলেন, ঠিকানার কথা কিছু বললেন না। আর জানালেন, রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার বেশী আর কিছু তার জানা নেই।

ঐ দোকানে বসেই টেলিফোন গাইড হাতড়ে দেখলাম। 'অমিতোষ সরকার'

বা 'এ. সরকার' বলে কোনো নাম নেই। বাড়ির লোকেরা হয়তো কোনো খবর পাননি। যদি পেয়েও থাকেন, আমার কাছে যখন ঠিকানা আছে, এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে আমি যেটুকু পেলাম জানিয়ে দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য।

এই সংকল্প নিয়েই দোকান থেকে বেরিয়েছিলাম। চলতে চলতে মনের ভিতরটায় কী যে হয়ে গেল কাউকে বোঝাতে পারবো না। সব চিন্তা আচ্ছন্ন করে কোথা থেকে যেন একটা সরীসৃপ মাথা তুলে উঠল। আমার বুকের মধ্যে তার কুৎসিত চেহারাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকে তাড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেমন করে যেন সে আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল। আমি শুনতে পেলাম, সে বললে, 'দৈবক্রমে যে স্বর্ণ সুযোগ তোমার হাতে এসে গেল তাকে এমন করে হারাতে চলেছ! সোজা চলে যাও ঐ কোম্পানির অফিসে। বল, তুমিই অমিতোষ সরকার। কী বলছ? আগে যদি ইন্টারভিউ হয়ে থাকে? হয়তো হয়েছে। কিন্তু অত লোকের মধ্যে তার চেহারাটা কি তারা মনে করে রেখেছে? একটা চান্স নিয়ে দেখতে দোষ কি? তোমার বাড়ির অবস্থা ভেবে দেখেছ? বিধবা মা একটা প্রাইমারী স্কুলের টীচার। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। ছোট বোন পড়া ছেড়ে হেঁসেলে ঢুকেছে, টুইশানি করে ছোট ভাইটার স্কুলের খরচ চালাচ্ছে। বি, কম,'এ অনার্স পেয়েছিলে। একবছর ধরে কত জায়গায় কত চেষ্টা করেছ। এমনি একটা কেরানীগিরিও জোটাতে পারোনি। আজ ভাগ্য সেটা একেবারে তোমার হাতের মধ্যে এনে দিল। তাকে হেলায় হারিও না।

মাঝে মাঝে মনে হত, না, এ ঠিক হচ্ছে না, এ অন্যায়। শুধু অমিতোষকে নয়, এই কোম্পানিকেও আমি প্রতারণা কবে চলেছি। তখনই হয়তো ডাক পড়ত চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের ঘরে, কিংবা একটা জরুরী কাজ এসে হাজির হত টেবিলে।

নিজেকে অমিতোষ সরকার বলে চালাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কেউ কোনো সন্দেহ করেনি। প্রথম প্রথম সহকর্মীদের মুখে অমিতোষ বাবু ডাকটা শুনে চমকে উঠতাম। আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেল। প্রায় ভুলেই গেলাম আমি সুমন্ত সান্যাল।

একদিন শুধু এক বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছিলাম। পাশের টেবিল থেকে যতীন-বাবু ডেকে চলেছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। তিনি উঠে এলেন, 'কী মশাই, কার ধ্যান করছেন? যে রকম তন্ময় হয়ে ভাবছেন, কোনো বিশেষ জন না হয়ে যায় না। কংগ্র্যাচুলেশনস্।'

আরো দু-একজন এসে চেপে ধরল, 'অ্যাফেয়ারটা' কদ্দিন ধরে চলছে, কদ্দুর এগোল, কোথায় থাকেন, শ্রীমতী কী করেন·· ইত্যাদি। আমি হাসি মুখে চুপ করে রইলাম। অর্থাৎ প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলাম তাদের অনুমানই ঠিক।

দেখতে দেখতে তিন-চার মাস কেটে গেল। চাকরিতে আমার সুনাম হয়েছে। কর্তারা খুশি, কয়েকজন বন্ধুও লাভ করেছি। তাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন।

সবাই বলাবলি করছেন, কিছুদিনের মধ্যেই আমি পাকা তো হবোই, সেই সঙ্গে একটা লিফ্‌ট পেয়ে যাবো। আমারও সেই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। ভুলে যেতে বসেছিলাম, যার উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেই ভিতটাই তো কাঁচা, যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

অফিসে পৌঁছতে সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাজিরা খাতায় সই করছি, একজন যুবক পাশে এসে দাঁড়াল। মুখটা যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ বাঁ হাতের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠলাম।

একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন পিঠ বেয়ে নেমে গেল। পরনে ফুল শার্ট, হাতার নীচের দিকটা ফাঁপা। অর্থাৎ কনুই থেকে বাকী অংশটা নেই। জিজ্ঞেস করল, 'ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরটা কোন্‌দিকে?'

এ যে আমারই মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবু এম-ডি'র ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে ভিজিটরস স্লিপ হাতে দিয়ে নাম লিখতে বললাম। যখন লিখছিল, মনে হল অক্ষরগুলো কালি দিয়ে নয়, আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। বেয়ারাকে বলে লোকটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

নিজের চেয়ারে আর বসলাম না। ড্রয়ারে কিছু নিজস্ব কাগজপত্র ছিল। তুলে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি, যতীনবাবু বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো হে?'

'একটু বেরোচ্ছি, দাদা।'

সেই আমার শেষ বেরিয়ে আসা।

আমি জানি, সবাই আসত না। প্রমাণ দিতে হবে তো যে ঐ হাতকাটা লোকটাই আসল অমিতোষ, আর আমি নকল! তাছাড়া আমি যে এতদিন ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছি, সকলের আস্থা অর্জন করেছি, তার কোনো দাম নেই? হয়তো ওর কোনো দাবিই শুনতেন না কর্তৃপক্ষ। আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু পারলাম কই? কে যেন ভিতর থেকে আমাকে ঠেলে বের করে দিল.

বাড়িতেও টিকতে পারলাম না। কী বলবো মাকে আর বোনকে? আমার চাকরি গেছে? সে যে বড় লজ্জার কথা। আমি ঠগ, **Imposter**; এতদিন যা গোপন রেখেছি, তাই-বা বলি কেমন করে?

মা টের পেলেন। বুঝতে পারলেন, আমার ভিতরে কিসের একটা দ্বন্দ্ব চলছে, আমি ছটফট করছি। একদিন সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন, 'তোর কী হয়েছে সুমি, আমাকে বল।'

'কিছু হয়নি মা।'

তারপর একদিন কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নানা জায়গা ঘুরে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। পেট তো

চালাতে হবে। এক কাঠের ব্যবসায়ীর গদিতে চাকরি পেয়েছি। প্রথমে মনে করেছিলাম, বাঁচা গেল। এখানে কেউ আমাকে চেনে না, কেউ ধরতে পারবে না। পুলিস না, আত্মীয়স্বজন না, আমার সেই কোম্পানীর লোকজনও না। কিন্তু সকলের হাত থেকে পালালেও নিজের হাত থেকে পালাবো কেমন করে?

আপনি তো কত অপরাধী নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, জেনেছেন তাদের নিগূঢ় জীবন কাহিনী। আমারও সব কথা শুনলেন। এবার বলুন আমি কী করবো?

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

"ভীষণ ভাল খবর। কী খাওয়াবে বল।"

মহাদেও শুকুল কাগজ পড়ছিল। একপাশে সরিয়ে রেখে দেখল রায় রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। অর্থাৎ খবরটা দেবার জন্যে তাকে অন্ততঃ তিরিশ মাইল বেগে সাইকেল ছোটাতে হয়েছে। সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে যোগ করল. চ্যাটার্জি চলে যাচ্ছে।

—ঠিক জানো?

—ঠিক মানে? কে, ষ্টোন থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসে গ্যাছে। নিজের চোখে দেখে এলাম। তার মানে তুমি এবার পাকছ। তোমার ওপরে তো আর কেউ নেই।

শুকুলের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। কিন্তু বাইরে বেশ খানিকটা নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে বলল, কাঁচা পাকা তো আর ওপর-নীচের ওপর নির্ভর করে না। সবটাই মনিবের মর্জি। তুমিই না বলেছিলে কোন একজন বাঙালী লেখকের লেখা—দুনিয়ার সব কিছুই সময় হলে পাকে, যেমন কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা মাথা—শুধু চাকরির বেলায় সে নিয়ম চলে না। চাকরি পাকা হয় কালধর্মে নয়, তৈলধর্মে। —আমি বলিনি, তবে কথাটা মিথ্যে নয়, আমাদের বস্‌টিও কিঞ্চিৎ তৈলভক্ত।

—তুমি তো সবই জানো ভাই, সরাসরি না হলেও এর ওর হাত দিয়ে তেল ঢালতে আমি কিছু কসুর করিনি! আর কাজকম্ম?

সেদিক দিয়েও কোনো দোষত্রুটি কেউ ধরতে পারেনি। কিন্তু কী যে চায় লোকটা। সেবার দেখলে তো? ঐ সমর বোস আমার দু' বছরের জুনিয়ার। কি রকম ল্যাং মেরে এগিয়ে গেল।

—এগিয়ে গেল, তার কারণ বোস তার মিসেসটিকে ঠিক সময় বুঝে এগিয়ে দিয়েছিল। আসলে তিনিই কাজ হাঁসিল করে বেরিয়ে এলেন। তুমিও যদি অমনি—

একটু থেমে শ্রোতার মুখের পানে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল রায়। গলা নামিয়ে বলল, ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। ব্যাচেলার মানুষ, বয়স হচ্ছে, বিয়ে-থা করবে বলেও মনে হয় না। ফেয়ার সেক্‌স্‌ সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। কিন্তু কোনোরকম বদ-দোষটোষ আছে বলে

শুনিনি। নাইট ক্লাবে-টাবেও যায় না। অফিসে যেসব মেয়ে আছে, তাদের কারো সঙ্গে কোনো অভদ্র ব্যবহার করেছে বলেও শোনা যায়নি। ওর ইচ্ছে মাঝে মাঝে দু-একটা সন্ধ্যা তোমাদের মত সিনিয়র স্টাফের কারো বাড়িতে গিয়ে একটু বসা। তাদের স্ত্রীরাও থাকেন। এক কাপ চা বা কফির সঙ্গে কিছুক্ষণ একটু গল্প-গুজব। বোস অবিশ্যি একটু ছোট-খাট পার্টিও দিয়েছিল। বেছে বেছে কিছু মিস্টার অ্যান্ড মিসেসদেরও নেমন্তন্ন করেছিল। আমাকে ডাকেনি। আমার তো আর মিসেস-ফিসেস নেই। তোমাকে নিশ্চয়ই ডেকেছিল।

—হ্যাঁ; কিন্তু আমি যাইনি।

না যাবার কারণটা যে মিসেস-ঘটিত সেটাও ব্যক্ত করল শুকুল। সেই সঙ্গে আরো কিছু পারিবারিক খবর, যা প্রণব রায়ের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও আগে কখনো বলেনি। তবে ঐ ব্যাপারে মহাদেও শুকুলের মনে কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে আছে, যা তাকে স্বচ্ছন্দ হতে দিচ্ছে না। এটুকু জানতে রায়ের বাকী ছিল না। ওরা দু'জনেই বেশ বড় ও নামী কমার্শিয়াল ফার্মের কিছুটা উপরের স্তরের লোক। রায় বছর কয়েক আগে সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেণ্টেটিভ থেকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে গিয়ে পৌঁছেছে। শুকুল সেইখানেই পড়ে আছে বেশ কিছুদিন। এতদিনে কনফার্মড্‌ হবার কথা। হচ্ছে না। তার আগে যারা ঢুকেছে তাদের মধ্যে দু-তিনজন তাকে ছাড়িয়ে গেছে। একজন তো ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের গদিতে গিয়ে উঠেছে।

মহাদেও শুকুল কাজের লোক। বুদ্ধি আছে, পরিশ্রম করতে পারে, চটপটেও কম নয়, কিন্তু তার বেশির ভাগ সহকর্মীর মত 'চটকদার' নয়। হয়তো সেই কারণে সে অফিসে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে আছে। অথবা বলা যেতে পারে ঐ কোণটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে। সমস্তরের লোকেদের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য আছে কিন্তু ততটা অন্তরঙ্গতা নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রণব রায়, যদিও তাদের বয়সের তফাৎ সাত-আট বছর।

রায় প্রায়ই আসে ভড় বাড়িতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করে, চা—খাবার খায়। আগে আগে 'শুকুল'-এর পর একটা 'দা' যোগ করত, ইদানীং তাও করে না। সে জানে এবং লক্ষ্য করেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে মহাদেও শুকুল একমাত্র তাকেই জানে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এতদিনের এতটা ঘনিষ্ঠতা, তবু শুকুল তার বৌকে কোনোদিন ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি। অথচ তিনি বাড়িতেই আছেন এবং প্রচুরভাবে আছেন, ইংরেজিতে যাকে বলে **very much in existence.** একটু চড়া গলায় কথা বলেন ভদ্রমহিলা, তার অনেক কিছুই পরদা ভেদ করে বসবার ঘরে এসে ঢোকে। তিনটি ছেলে-মেয়ে শুকুলের। বয়স সাত থেকে তিনের মধ্যে। মার হাতের চড়টা-চাপড়টা পিঠে পড়ে—এবং সেটা বেশ উদারভাবেই পড়ে—তাদের গগনবিদারী চিৎকার, কিংবা 'নকর ও দাই'দের ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে মালিকানীর একটু দেহাতী ধরনের তর্জন-গর্জন মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তাকে প্রায় অচল করে দেয়। শুকুলের মুখে তখন কতগুলো বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। কখনো পরদার উপর একটা অসহায় দৃষ্টি।

মাঝে মাঝে এও বোঝা যায় বন্ধুর সামনে সে বেশ খানিকটা লজ্জিত বোধ করছে। বোধহয় কিছু একটা বলতেও গেছে দু-একদিন। কিন্তু বলেনি।

সেদিন ঐ জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং পরদার ওধারে একটা অস্বাভাবিক নীরবতা শুরু থেকেই টের পাচ্ছিল রায়। হয়তো সেই কারণে শুকুল মনে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল এবং নিজেকে অতখানি মেলে ধরতে পেরেছিল বন্ধুর কাছে। তাছাড়া রায় যে খবরটা বয়ে এনেছিল এবং 'কাজ হাঁসিলের' পন্থা হিসাবে যে ইঙ্গিত দিয়েছিল সেই সূত্রেই তার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় খোলাখুলি তুলে ধরা ছাড়া শুকুলের বোধহয় আর কোনো উপায় ছিল না।

মহাদেও শুকুল দ্বারভাঙ্গা জেলার কোনো এক দূর গ্রামের গরীব পরিবারের ছেলে। বাপ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু যে মহাদেও শহরের স্কুলে ভর্তি হল এবং হবার সুযোগ পেল তার পেছনে ছিল তার এক শিক্ষকের (যিনি ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়) আনুকূল্য ও নিজের কৃতিত্ব। পিতৃদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বি-এ পাস করে বেরিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই তাঁর একটা প্রচণ্ড ও অলঙ্ঘ্য ইচ্ছার বোঝা ঘাড়ে না তুলে পারেনি। বেশি কিছু নয়, তাঁরই কোনো বাল্যবন্ধুর একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কন্যা। শুধু বর্ণ নয়, নববধূর মুখশ্রী সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীরা যে মত ব্যক্ত করেছিল সেটা গোপনে এবং নিজেদের মধ্যে, বরের মার সামনে বলবার মত নয়। কিন্তু দুদিন না যেতে তিনি নিজেই দেখলেন বধূমাতার মুখশ্রীকে ছাড়িয়ে গেছে তার মুখ। সোজা বাংলায় যার নাম চোপা। তারা নাকি এদের চেয়ে বংশে ও অবস্থায় বড়। নিজের বাপের বাড়ির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে সে যখন-তখন শ্বশুর-শাশুড়ীর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ত। মহাদেও বেঁচে গিয়েছিল। সে তখন কলকাতায় চাকরির সন্ধানে ঘুরছে। চাকরিটি যেই জুটল, বাপ-মা বললেন, 'বাবা, এবার একটা বাসা কর। তা না হলে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে।' বৌএরও সেই মত। তার 'মরদের' যখন 'নকরি' হয়েছে, ভাল 'নকরি', তখন সে আর গাঁয়ে বসে বুড়োবুড়ির তাঁবেদারি করতে যাবে কেন?

রাজেশ্বরী যে তাদের চেয়ে আরো বিশুদ্ধ ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে সেটা একদিক দিয়ে 'শাপে বর' বলে মনে করল শুকুল। পরপুরুষের সামনে সে কখনো বেরোবে না। স্ত্রীর 'মুখশ্রী' নিয়ে তার ভাবনা ছিল না, ভয় ছিল তার 'শ্রীমুখ' নিয়ে। সেখান থেকে কখন কী 'বাক্যসুধা' নির্গত হবে, কে জানে! প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সহকর্মীরা বেড়াতে আসত। একা এলে 'মিসেস' কেন বেরোচ্ছে না তার একটা কারণ ভেবে-চিন্তে খাড়া করা যেত। কিন্তু মুশকিল হ'ত স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এলে। তখন বাধ্য হয়েই শুকুল স্বামীটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে স্ত্রীটিকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকত। আলাপ করিয়ে দিত 'আমার বন্ধু অমুকের স্ত্রী।' কিন্তু ও পক্ষ থেকে এইসব 'আজকালকার বেহায়া মেয়েমানুষের' সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা বা আগ্রহ জেগে উঠবে, এটা আশা করাই অন্যায়। মেয়েমহলে কোনো কথাই চাপা থাকে

না। ব্যাপারটা জানাজানি হতে সময় লাগেনি। তখন আর কেউ আসত না। শকুলও বেঁচে গেল।

রায় যখন উঠল বেশ রাত হয়েছে। এতক্ষণ ধরে যে কাহিনী শুনল সে সম্বন্ধে কিছু বলল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, বৌদি বুঝি এখানে নেই ?

শকুল হাসল—সেটা কি এতক্ষণেও বুঝতে পারেনি ?

রায় সে হাসিতে যোগ দিল না। মনে হ'ল যেন কিছু একটা ভাবছে। জানতে চাইল, কবে ফিরছেন ?

—তা দশ-বারো দিন তো লাগবেই। বাপের বাড়ি গেছে। ভাইএর বিয়ে পরশু।

—তুমি যাচ্ছ না ?

—না। ছুটি পাইনি বলে কাটিয়ে দিয়েছি।

চার-পাঁচ দিন পরে রায় সন্ধ্যার দিকে ঘরে ঢুকতেই শকুলের কড়া অনুযোগ —ব্যাপার কী বল তো ? সেই যে গেলে আর এমুখো হবার নামটি নেই !

—ব্যাপার তো তোমার।

—আমার ! তার মানে ?

—শোনো, ভেতরের খবর যতটা পাওয়া গেল নর্মাল কোর্সে কিছু হবে না। সিনিয়রিটির কোনো প্রশ্ন নেই। জি. এম. যাকে যোগ্য মনে করবে তারই গলায় মালা পড়াবে। ওকে হাত করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।

—জানি, এবং সে উপায় আমার হাতে নেই বলেই ও নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ঘনশ্যাম দাস অরোরার মত রাঘব বোয়ালের খাঁই মেটাবার সাধ্য আমার নেই, কোনোকালে হবেও না।

—ঐটা তুমি ভুল শুনেছ। লোকটার আর যা-ই দোষ থাক টাকা-পয়সার লোভ নেই।

—তার বদলে আর যা চায়, মানে তুমি সেদিন যা বলেছিলে, আমার বেলা সে প্রশ্নই ওঠে না। সেটা তুমি ভাল করেই জান। যাক্, এবার তোমার খবর বল। বাইরে-টাইরে যাচ্ছ নাকি এর মধ্যে ?

রায় কোনো উত্তর দিল না। ভাবতে লাগল। দু-একবার একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর মৃদু হেসে বলল, একটা কথা বলবো ?

—বল না।

—ব্যাপারটা শুধু তোমার আর আমার মধ্যে থাকবে। কেউ জানবে না। একেবারে টপ্ সিক্রেট।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ভূমিকা-টুমিকা ছেড়ে এবার বলে ফেল দিকিনি।

কিছুটা শুনবার পরেই একেবারে লাফিয়ে উঠল শকুল—তুমি ক্ষেপেছ ! তাই কখনো হয় ?

—কেন হবে না শুনি ? যে দেবতার যে পুজো। তুমি তো বামুনের ছেলে। নিশ্চয়ই দেখেছ, মা কালীর রক্তজবা না হলে চলে না, আর শিবঠাকুরের চাই ধুতরো ফুল।

—তাই বলে তুমি যা বলছ—

—কিছু অন্যায় বলিনি। এমন কিছু কঠিনও নয়। সে সব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।······তাছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার বাপ-ঠাকুরদার আমলের 'উচিত অনুচিত' কি তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছ ? তাঁদের সংস্কার, আদর্শ, রীতিনীতি সবকিছু থেকে অনেক দূরে চলে আসনি ? এই মাত্তর তুমি অরোরাকে ঘুষ দেবার কথা বলছিলে। ক্ষমতা থাকলে হয়তো চেষ্টা করেও দেখতে। কথাটা যদি তোমার বাবার কানে যেত—

—ওরে বাপরে ! শোনামাত্তর সোজা গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ।

—তবে ? আমরা যে যুগে এসে পড়েছি, তার ধর্ম মেনে নিয়ে সেই ধারা বেয়ে চলতে হবে। এখন আর ন্যায়-পথ বলে কিছু নেই, থাকলেও সেখান দিয়ে কেউ চলে না। চলতে গেলে পড়ে পড়ে মার খাবে। এগোতে পারবে না, যেটা তোমার লক্ষ্য সেখানে কখনো পৌঁছাতে পারবে না। **Honesty is the best policy** এই জাতীয় **maxim** স্কুলের ছেলে-মেয়েদের Essay বই ছাড়া অন্য কোথাও দেখতে পাচ্ছ ? ওটা তাদেরও কাজে লাগে না, পরীক্ষার হল-এ উল্টোটাই বরং কাজ দিচ্ছে। আর 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' এই নীতি বাক্যটিও শুধু এক জায়গায় টিকে আছে। আদালতের কাঠগড়ায়। সাক্ষী দিতে গেলে আওড়াতে হয়। কিন্তু সবাই জানে ওর আসল মানে হ'ল 'মিথ্যা বই সত্য বলিব না।'

এতক্ষণে একটানা বকে গিয়ে রায় বোধহয় একবার দম নেবার জন্যে থামল। শ্রোতার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। সোফার পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে সিগারেট টেনে চলেছে।

—কী হ'ল দাদা, এত বড় একটা লম্বা বক্তৃতা শুনে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

—উঁ ?—চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল শুকুল। আস্তে আস্তে বলল, তোমার ঐ বক্তৃতা এখন পুরনো হয়ে গেছে। ও সবই আমি জানি। কিন্তু জানা আর করা তো এক জিনিস নয়।

—করার ভার আমার। সে তো গোড়াতেই বলেছি। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দিন তিনেক পরে জেনারেল ম্যানেজার অরোরা সাহেবের চেম্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শুকুল—'আসতে পারি স্যার ?'

—কাম ইন।······ইয়েস ? ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন জি. এম.।

—আসছে শনিবার বিকেলে কি আপনার কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে স্যার ?

—না ; কেন বল দিকিনি ? এবারে চোখ তুললেন অরোরা।

—আমার বাড়িতে সামান্য-একটু চায়ের আয়োজন করেছি। দয়া করে যদি একবার—

—কী ব্যাপার ?

—আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা আপনি আমাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেন। অনেকদিন থেকেই বলছে আমাকে। আমি ঠিক সাহস করিনি স্যার।

অরোরা সাহেব হেসে উঠলেন—এতে ভয়ের কী আছে? তোমার স্ত্রীর যখন এত ইচ্ছা. আই মাস্ট রেসপেক্ট হার উইশেজ। ক'টার সময়?

—ছটা।

—ও-কে। আই উইল গো।

শনিবার ওদের ছুটি। বেলা দশটা নাগাদ চৌরঙ্গী পাড়া থেকে একটি ভাল বাবুর্চি সঙ্গে করে এসে পড়ল রায়। মেনু আগের দিনই ঠিক হয়ে গেছে। জিনিসপত্র কতক এসেছে, কতক আসছে। বাবুর্চি সব বুঝেসুঝে নিল। শুকুলের নকর আর দাই—এতদিন যারা কাজ করছিল তাদের কয়েক দিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। 'মাইজী' ফেরার ঠিক আগে এসে পড়বে। রায় আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। 'গোটা তিনেক নাগাদ আসছি' বলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

—ঐ সময়টা তুমি থাকলে বল ভাল হ'ত ভাই—অনুনয়ের সুরে বলল শুকুল। এ সম্বন্ধে আগেই কথা হয়ে গেছে। রায় বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা ঠিক হবে না। তার সামনে সাহেব তেমন 'ফ্রী ফীল' করবে না। সেই কথাই আরেক-বার বোঝায়। শুকুল তখনো 'কিন্তু কিন্তু' করছিল; রায় মুচকি হেসে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? যাকে নিয়ে আসছি সে একাই সবটা ম্যানেজ করে নেবে। তোমার কাজ শুধু হাজির থাকা আর জায়গা বুঝে এক-আধটু হেঁ হেঁ করা ব্যাস্।

ঠিক তিনটাতেই এসে পড়ল প্রণব। ট্যাক্সি করে এসেছে। তার পিছনে একটি মহিলা। শুকুল বাইরের ঘরেই ছিল। উঠে দাঁড়াতেই পরিচয় করিয়ে দিল, 'মিস্টার শুকুল, মিস্ সুপর্ণা ঘোষ।" নমস্কার বিনিময়ের পরেই সরাসরি কাজের কথা পাড়ল রায়—ব্যাপারটা তো আপনাকে আগেই বলেছি মিস্ ঘোষ, মিস্টার শুকুল একজন পদস্থ অফিসার। ওর বস্, মানে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারকে চায়ের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মিসেস শুকুল নিজে উপস্থিত থেকে মান্য অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন করবেন এটাই দস্তুর। কথাও ছিল তাই। কিন্তু হঠাৎ বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকে দেশে চলে যেতে হয়েছে। এদিকে টী-পার্টি তো আর অপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর না থাকাটা বস্ মোটেই ভালভাবে নেবেন না। কাজেই—বাকিটা বলবার আগেই সুপর্ণা মুখ টিপে হাসল—আমাকে তাঁর হয়ে প্রক্সি দিতে হবে। এই তো?

—শুধু প্রক্সি নয়, তার রোলটা আগাগোড়া প্লে করতে হবে। সেটা আর আপনাকে বলতে হবে কেন? স্টেজে ছাড়াও আপনি তো মাঝে মাঝে রেডিওতে অভিনয় করে থাকেন। কোনো আর্টিস্ট যদি আসতে না পারেন, অন্য একজন নামেন তাঁর জায়গায়। তার আগে একজন গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন—"নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে—" অ্যাণ্ড সো অন্।

আকাশবাণীর একজন বিশেষ ঘোষকের কণ্ঠ ও বলার ধরন এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে শোনাল যে শুকুল ও সুপর্ণা দুজনেই হেসে উঠল। রায় তেমনি গম্ভীরভাবেই বলল, আপনার বেলায় কিন্তু কোনো ঘোষণা বা জানাজানি হবে না। বরং আমাদের গেস্ট জানবেন আপনিই নির্ধারিত শিল্পী। বুঝলেন তো?

সুপর্ণা মাথা নেড়ে জানাল—বুঝেছি। তারপর গল্পচ্ছলে রেডিওর কথাই পাড়ল—সেদিন আমাকে অমনি এক নির্ধারিত শিল্পীর রোলে নামতে হয়েছিল। মেইন পার্ট। যার করবার কথা, বিখ্যাত আর্টিস্ট, নামটা আর করতে চাই না। আপনারা সবাই জানেন। এ. আই. আর. থেকে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। ড্রামা সেকশনের খোদ কর্তা বলে পাঠিয়েছেন, ভীষণ জরুরী, না গেলে চলবে না।

রায় বলল, আমাদের এটা তার চেয়েও জরুরী। এবার তাহলে আপনি রেডি হতে থাকুন। তার আগে যদি আর কিছু জানবার-টানবার থাকে—

—জানবার আর কী? ভদ্রলোক একা আসছেন না তাঁর স্ত্রীও থাকবেন?

—স্ত্রী কোথায়? কনফার্মড ব্যাচেলার। চল্লিশের ওপর বয়স। তাহলেও মেয়েদের ব্যাপারে, কী বলবো?

—থাক, আর বলতে হবে না। আমি বুঝে নিয়েছি। শুধু একটা ছোট্ট মুশকিল হ'ল, হিন্দীটা এখনো তেমন রপ্ত করতে পারিনি। ইংরেজিও—

—কী দরকার? আপনি বাংলা বলবেন। অরোরা অনেকদিন আছে কলকাতায়। পরিষ্কার বাংলা বলে। বোঝে তো বটেই।

—কিন্তু, শুকুলের দিকে তাকাল সুপর্ণা, উনি তো বোধহয়—

—হ্যাঁ, উনি বিহারের লোক, কিন্তু ওঁর স্ত্রী বাঙালী।

শুকুল চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল, রায় তার দিকে চেয়ে ঘন ঘন চোখ টিপছে।

শুকুলের বাড়িতে আলাদা খাবার ঘর নেই। ডাইনিং চেয়ার-টেবিলের প্রশ্নই ওঠে না। বসবার ঘরেই সব ভাড়া করে এনে বসানো হয়েছে। নতুন পরদা ফুল-টুলের ব্যবস্থাও আছে। সুপর্ণা সেগুলো একটু তদারক করল, এখানে-ওখানে সামান্য এক-আধটু নাড়া-চাড়া করে বলল, দেখুন ঠিক হয়েছে তো?

—চমৎকার! উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল রায়, এ না হলে হয়? সবকিছুর বেলাতেই ফাইন্যাল টাচ হ'ল ফেমিনিন টাচ। আচ্ছা এবার তাহলে চলুন আপনাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দেওয়া যাক। আপনার শাড়ি জামা, এবং যাকে বলে প্রসাধন সামগ্রী সব এই সুটকেসে আছে। আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন। একবার বরং দেখে নিন।

'ঠিক আছে' বলে উঠে পড়ল সুপর্ণা। প্রণবও শুকুলকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে তিনজনে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

—এটিকে পেলে কোথায়?—বাইরের ঘরে ফিরে এতক্ষণে প্রথম কথা বলল শুকুল।

—অনেক কষ্টে জোটাতে হয়েছে দাদা। নামকরা অ্যাকট্রেস। ভাল ভাল অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে বেড়ায়। ভীষণ ডিমাণ্ড। আজকেই কোথায় যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুটা বেশী কবুল করে রাজী করিয়েছি। চেহারা দেখেছ? এর ওপর সেজেগুজে যখন বেরোবে, দেখো। কী স্মার্ট! তেমনি ফরওয়ার্ড। আর গলাটা? অরোরা যে-সব ব্যাড়িতে যায় তাদের গিন্নিদের তো

আমার দেখা আছে। এর পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। ব্যাটা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, দেখে নিও।

রায় বিশেষ অত্যুক্তি করেনি। অরোরা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি, মহাদেও শুকুলের মত ঐ রকম একটা সেকেলে ধরনের ম্যাড়মেড়ে চেহারার লোক, যাকে প্রায় গেঁয়ো বললেই চলে, তার এমন একটি ব্রাইট বৌ থাকতে পারে। কেবল রূপের জলুস নয়, এর চাহনি, এর হাসি, চলা ফেরা, কথাবার্তা—সবকিছু থেকেই যেন একটা দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। শুধু বিস্মিত নয়, অনেকটা যেন বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক।

—কই, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না—সুপর্ণার সুরেলা কণ্ঠে মধুর অভিযোগের সুর, চিত্রিত ভ্রূযুগলে ছদ্মশাসন, ওষ্ঠে রঙিন হাসি।

—খেয়ে কুলোতে পারছি কই?—বলে, একটা কাটলেটের টুকরো কাঁটায় গেঁথে মুখে পুরলেন অরোরা সাহেব। চিবোতে চিবোতে মুখ তুলে বললেন।

—আপনি তো বসলেন না আমাদের সঙ্গে।

—এই তো এবার বসবো।

ডাইনিং চেয়ার, হাতল নেই। অতিথির চেয়ারের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে একেবারে তাঁর গা ঘেঁষে বসল। বাহু গলা এবং তার নীচেও কিছুটা অংশ অনাবৃত। খেতে খেতে পাশের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল—আপনাকে আর একটা কাটলেট দিই?

—সর্বনাশ! এর পরে আরো?

—জাস্ট একটা: প্লীজ—অনুরোধের সুরে অনেকখানি আবদার ঢেলে দিল সুপর্ণা। তারপরেই মিষ্টিগলায় ঝঙ্কার তুলে ডাকল—বয়। কাটলেট এল। অরোরা আর 'না' বলতে পারলেন না।

'টী' তো নয়, রীতিমত 'হাই-টী'। তার সঙ্গে হাসি-গল্পের আসর। ভোজন পর্বের পরেও তার জের চলল কিছুক্ষণ। তার মধ্যে গৃহকর্তার ভূমিকা অতি সামান্য। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা। কথার স্রোত বইয়ে দিলেন 'গৃহিণী'। তার যেন আর শেষ নাই।

যতটা সময় কাটাবেন বলে এসেছিলেন তার বেশ কিছুটা পরে বিদায় নিলেন অতিথি। 'শুকুল দম্পতি' তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেখানে বসেও তিনি ওদের আরেক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন এবং সেটা সুখী ও পরিতৃপ্ত মনের ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ পরেই রায় এসে পড়ল। মিসেস শুকুলের ভোল পালটে সুপর্ণা ঘোষ (আসল নাম সরলা, বিমলা কিংবা ঐরকম একটা কিছু) তখন যাবার জন্যে তৈরি। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর কিছু বখশিশ এবং অনেক ধন্যবাদ নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রায়ও একলাফ দিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে—কনগ্রাচুলেশনস।

—মানে? এরই মধ্যে এতখানি উচ্ছ্বাসের হেতুটা ঠিক ধরতে পারল না শুকুল। রায় তার হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,

কেল্লা ফতে।

—আঃ, ব্যাপারটা কী, বলবে তো ?

—গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হয়ে গেল।

—অ্যাঁ! তাই নাকি ?

—তবে আর বলছি কি ?···খাবার টাবার কিছু আছে ?

—সব আছে। ঐ তো। বাবুর্চিকে দিয়ে সাজিয়ে রেখে দিয়েছি।

—আচ্ছা, দাঁড়াও। তাজ্জব খবরটা আগে জানিয়ে দিই। আশ্চর্য যোগাযোগ। রেড সিগন্যাল দেখে সাইকেল থেকে নেমেছি। ঠিক পাশেই কালো বুইক। দেখে ফেলেছে। অন্যসময় হলে না দেখার ভান করে চলে যেত। কিন্তু মুখ দেখেই বুঝলাম বেশ খোশমেজাজে আছে। 'রায় না ?' একটা গুড্ ইভ্‌নিং দিলাম। 'তুমি এদিকে থাক নাকি ?' 'আজ্ঞে না স্যার, আমি থাকি নর্থে। একটু শুকুলের ওখানে যাচ্ছি।' ইচ্ছা করেই বললাম। 'ও, তাই নাকি ? আমি তো সেখান থেকেই আসছি। হি ইনভাইটেড মী টু টী। খুব খাওয়ালে। ভেরী নাইস পীপল। পারটিকুলারলী হিজ ওয়াইফ।'

'হ্যাঁ, স্যার মহিলাটির ব্যবহার-ট্যবহার বেশ ভালো।'

'ওহ্, শী ইজ ওয়াণ্ডারফুল !'

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল। হতভাগা সিগন্যাল তখন গ্রীণ হয়ে গেছে। যা বুঝলাম ওর হয়ে গেছে। তার মানে তোমারও হয়ে গেছে ধরে নিতে পার। ঠিক দাওয়াই পড়েছে এবার।

শুকুল হাসিমুখে বলল, দ্যাখ। আমার নসিব আর তোমার হাতযশ।

কয়েকদিনের মধ্যেই শুকুলের মনে হ'ল ভাগ্যের চাকা বোধহয় ঘুরতে আরম্ভ করেছে। ডেপুটি সেল্‌স্ ম্যানেজার গুপ্তাসাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই ওর কাজকর্মের সরাসরি সম্পর্ক। বললেন, অনেকদিন তো বাইরে যাওনি, এবার আসামের দিকটা ঘুরে এসো। কবে বেরোবে ?

—যেদিন বলবেন।

চলে আসছিল। আবার ডেকে ফেরালেন। গলা খাটো করে বললেন, জি. এম. তোমার কাজকর্মের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। আমার যতটা বলবার বলেছি·· উইশ ইউ গুড লাক্।

পরদিন টুরে বেরোবার আগে কাগজপত্র গোছাচ্ছে। জি. এম.-এর কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চুপি চুপি বলে গেল, কাউকে বলবেন না। আপনার পার্সনাল ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন সাহেব।

আর এক টুকরো আশার আলো। খবরটা তখনই রায়কে না জানিয়ে পারল না। প্রণব ভীষণ খুশী—"আমি বলি নি ? ঘুরে এসো। মনে হচ্ছে তার আগেই অর্ডার বেরিয়ে যাবে।"

লম্বা প্রোগ্রাম। দিন দশেক লেগে গেল ফিরতে। তার আগেই সপুত্র-কন্যা রাজেশ্বরী ফিরে এসেছে। ভাই-এর বিয়ে মিটে গেছে। তার ছোট ভাইটির কলেজে গরমের ছুটি চলেছে। সে-ই এসেছে দিদিকে রেখে যেতে। অফিসের

বেলা হয়ে গিয়েছিল, কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হ'ল না। নাকে-মুখে দুটো গুঁজেই বেরিয়ে পড়ল শুকুল।

ওদিকে কাজের পাহাড় জমে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। তারই মধ্যে পিওন এসে একটা বন্ধ কভার দিয়ে গেল। উপরে ওর নাম। বুকের ভিতরটা নেচে উঠল। সত্যিই তাহলে অর্ডার বেরিয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল। ভুল দেখছে না তো! আরেকবার পড়ল। না, ঠিকই দেখেছে। অর্ডার ঠিকই। তবে বিষয়টা কনফারমেশন নয়, বদলি। তাও আবার বম্বেতে, যেখানে কেউ যেতে চায় না। কোম্পানী বাড়িভাড়া বলে যা দেয় তাতে 'বাড়ি' দূরে থাক এক চিলতে বারান্দাও মেলে না। তার উপরে সব জিনিস আগুন। সবচেয়ে সাংঘাতিক খবর ছিল শেষের দিকে। সেলস থেকে সরিয়ে ঠেলে দিয়েছে অ্যাকাউণ্টস-এ। অর্থাৎ স্রেফ কেরাণীগিরি। ট্যুরফুর নেই, কোনদিক থেকে দুটো নয়া পয়সা আসবার পথ নেই। বসে বসে অঙ্ক চোষো।

এতবড় সর্বনাশ কী করে হল!

বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরেই গুম হয়ে বসে রইল। চাকর চা নিয়ে এসেছিল, ফিরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল রাজেশ্বরী। বেশ খুশী-খুশী ভাব—ওবেলা তো এসেই ছুটলে। খবরটা দেবার ফুরসৎ পেলাম না।

শুকুল ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল। কে জানে এখানে আবার কোন 'সুখবর, অপেক্ষা করে আছে। রাজেশ্বরী সামনের সোফাটায় বসে বলল, তোমার অপিসের বড়সায়েব এসেছিল।

—বড় সাহেব! প্রায় লাফিয়ে উঠল শুকুল, কবে? কোথায়?

—এই তো দিন চারেক হ'ল। আমরা যেদিন ফিরলাম তার পরদিন সন্ধ্যের একটু পর। রাকেশ ছিল। ঐ এনে বসাল এই ঘরে।

—তারপর? রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল শুকুল। এবার রাকেশ নিজেই এগিয়ে এল। বড় বড় চোখ করে বলল, বিশাল কালো রঙ-এর গাড়ি নিজেই চালিয়ে এসেছেন···

—ধ্যুৎ, গাড়িফাড়ির কথা কে জানতে চাইছে? কী বললে তাই বল।

—বললেন, মিসেস শুকুল আছেন? আমি বললাম, আছেন।

—আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবো। আমার নাম অরোরা, মিস্টার শুকুল যেখানে কাজ করেন সেই ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। উনি আমাকে—

—শোন কথা! ভাইয়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিল রাজেশ্বরী, তুই ম্যানেজার-ফ্যানেজার যাই হোস, তাতে আমার কী? আমি তোর সাথে দেখা করতে যাবো কিসের জন্য?

—তাই বুঝি বলে পাঠালে?

—বলতাম বৈকি! তা ঐ ছেলেটা যে অন্য কথা বোঝালো। সায়েব-সুবো মানুষ: ও তো জানে না যে আমরা ওদের মত যার তার সামনে বেরোই না। চটে যাবে আর ইচ্ছে করলে তোমার 'নকরি'ও নিয়ে নিতে পারে। তাই এলাম।

—অ্যাঁ! এবার রীতিমত আঁৎকে উঠল শকুল। —তুমি বেরোলে ওঁর সামনে!

—কী করবো? অনেকটা যেন অসহায়ভাবে নরম সুরে বলল রাজেশ্বরী, তোমার 'নকরি' বড় না আমার মান বড়?

—যাক, তারপর কী হ'ল বল।

—খানিকক্ষণ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ইঞ্জিরিতে কী যেন বলল রাকেশকে। কী বলল রে?

—বললেন, এঁকে নয়, আমি মিসেস শকুলকে চাইছিলাম। আমি বললাম, ইনিই তো মিসেস শকুল। কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি সব পরিচয়-টরিচয় দিলাম। তারপর গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

বন্ধু ও প্রিয়া

॥ এক ॥

বিভূতি তার সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই সন্দীপ দেয়ালের দিকে তাকাল। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মুখ টিপে হেসে বলল, তোমার হাঁটুতেও বুঝি ঘড়ির স্প্রিং লাগানো আছে?

—কী রকম?

—ওদিকে লম্বা কাঁটাটা লাফ দিয়ে বারোর ঘরে পেঁছিল, এদিকে তুমিও একটি লাফ মারলে।

—ওরে বাপরে! আজ এক সেকেণ্ড দেরি করবার উপায় নেই।

—আসবেন বুঝি?

—হুঁ, বলে বিভূতি তার সার্টের পকেট থেকে দু'খানা রঙিন কাগজ বের করে দেখাল। চোখে মুখে খুশীর ঝলক। সন্দীপ কলমের ডগায় টুপি পরাতে পরাতে বলল, বেশ আছো।

চলি, বলে ডান হাতটা উপরে তুলে পা বাড়াতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট সাহেবের পিওন এসে তার বিহারী বাংলায় জানাল, সায়েব ডাকছেন।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারি বরাট সাহেব। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ফাইল পার করা। তার জন্যে প্রতিদিন কতগুলো বাড়তি ঘণ্টা অফিসে বসে পার করেন এবং অন্যকে করান, সে হিসেব নেই, হুঁশও থাকে না।

বিভূতি মুখখানা কালো করে পিওনের পিছন পিছন কাছেই একটা কাঠের খুপরিতে গিয়ে ঢুকল, রাইটার্স বিল্ডিং-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারিদের অফিস বলতে যা বোঝায়, এবং বেরিয়ে এল মুখে আরেক পোঁচ কালি মেখে। হাতে একতাড়া কাগজ। সন্দীপ তখনো ছিল। বলল, কী ওগুলো?

—কী আবার! ওব গুষ্টির পিণ্ডি। এখ্খুনি নাকি না দিলে হবে না।

—তা কী করে হবে? পিণ্ডদানের তো একটা কালাকাল আছে।

বিভূতি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভাবছিল। মনের অবস্থাটা মোটেই রসিকতা উপভোগের উপযোগী ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং চাকরিতেও কয়েক ধাপ উঁচু হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর দিকে চেয়ে হতাশভাবে বলল, এখন কী করি বলুন তো সন্দীপদা ?

—গিয়ে বল যে আমার একজন বান্ধবী অপেক্ষা করছে। তাকে নিয়ে ছ'টার শোতে সিনেমায় যেতে হবে।

—যান, এসব সিরিয়াস ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

—তাহলে আর কী করবে ? টিকেটের পয়সা জলে নিক্ষেপ, এবং বান্ধবীর ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন।

—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? (বিভূতির চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল) টিকেট দু'খানা আপনাকে গছিয়ে দিই।

—তারপর ?

—আপনি ওকে শিয়ালদ স্টেশন থেকে ছবিঘরে নিয়ে যাবেন। কাজেই তো।

—অ্যাঁ! রীতিমত চমকে উঠল সন্দীপ।

—তাতে দোষ কি ?

—দ্যাখ বিভূতি, ল' কলেজে থাকতে বন্ধুত্বের খাতিরে প্রক্সি যে দু-চার বার দিইনি তা নয়। সে রিস্ক্ নিয়েছি। কিন্তু তুমি যে বিপদে ঠেলতে চাইছ—মাপ করো ভাই, ও আমার দ্বারা হবে না।

—না, সন্দীপদা, আমার এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে। আমার বিপদটা একবার বোঝবার চেষ্টা করুন।

এগিয়ে এসে সন্দীপের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। সন্দীপ বিরক্তির সুরে বলল, আরে তুমি কী পাগল হয়েছ ? আমি তাকে চিনি না, কখনো দেখিনি। শেয়ালদ স্টেশনে কোথায় খুঁজে বেড়াবো ? আর, আমার সঙ্গে তিনি যাবেনই বা কেন।

—খুব যাবে। আপনাকে সে চেনে, মানে আমার কাছে আপনার কথা শুনেছে।

—এই মাটি করেছে ! কী বলেছ তুমি আমার কথা ?

বিভূতি ততক্ষণে একটা কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করে দিয়েছে। মুখ না তুলেই বলল, বলেছি, আমাদের সন্দীপদা একটি গুণ্ডা। তাকে দেখলেই পালাবে।

কাগজখানা আর টিকেট দুটো জোর করে সন্দীপের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, থাকে কামারহাটি, ওর কাছেই কোন একটা কলেজে বি. এ. পড়ে। কলকাতার কিচ্ছু জানে না। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো ?

—তা তো পারছি। আমার অবস্থা যে তার চেয়েও কাহিল। এসব আমার একেবারেই আসে না, জানো তো ?

—তার জন্যে ঘাবড়াবেন না। রেণুই সব ম্যানেজ করে নেবে। চালাক আছে। নর্থ স্টেশনে টিকেট কাউণ্টারের পাশে থাকবে। পাতলা, ফর্সা, চোখে

সোনালী ফ্রেমের চশমা।

বরাট সাহেবের পিওন এসে তাগিদ দিল, সায়েব বোলছেন কেতনা দেরি হোবে ?

—বলগে, হয়ে গেছে।

পিওনের পিঠে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সীটে গিয়ে বসল। পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে লম্বা করিডোরের প্রায় শেষে সন্দীপকে ধরল এবং চুপি চুপি বলল, একটা ট্যাকসি নিয়ে নেবেন।

—সে বুদ্ধি তোমার না দিলেও হ'ত।

কাউণ্টারের পাশে "পাতলা' ফর্সা, সোনালী চশমা" একজনই পাওয়া গেল। একাধিক হলে খুবই বিপদে পড়ত সন্দীপ। এখনো নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হ'ল না। একবার এগিয়ে দু'বার ইতস্ততঃ করে বলে ফেলল, আপনি কি কামারহাটি থেকে আসছেন ?

—হ্যাঁ; কেন বলুন তো ?

—আমি বিভূতির কাছ থেকে আসছি।

—"ও ও। কী হয়েছে তার ?"—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

—না, না, কিছু হয়নি। অফিসের কাজে আটকা পড়ে গেছে। একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে রেণুকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার উপরে একটি বিনম্র মৃদু হাসি। "আপনি সন্দীপবাবু ?" বলে নমস্কার করল।

সন্দীপ প্রতি-নমস্কার করে বলল, দেখুন না কী মুশকিল। ও আসতে পারল না, এদিকে আপনি এসে অপেক্ষা করছেন। বাধ্য হয়ে আমাকে—

—ভালোই হ'ল। এই সুযোগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ওর কাছে আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। ভীষণ শ্রদ্ধা করে আপনাকে।

—ছেলেটা বড় ভালো। চলুন, ছ'টা বাজে। শুধু চিঠি পৌঁছে দেওয়া নয়, ছবি দেখাবার হুকুমও রয়েছে আমার ওপর। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

—না, না; সে কী কথা ! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াই তো ভাগ্যের কথা !

ছবিটা প্রেমমূলক। সন্দীপের পাশে বসে দেখতে রেণুকার একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। আড়চোখে দু-একবার তার মুখের দিকে চেয়ে জানতে কৌতূহল হচ্ছিল ! ওঁরও কি তাই ? ঠিক বুঝতে পারেনি। একটু অন্যমনস্ক লাগছিল। যেন ছবির দিকে মন নেই। অন্য কিছু ভাবছেন। কী ভাবছেন, কে জানে ?

সন্দীপ সত্যিই অন্য কথা ভাবছিল। একেবারে অচেনা এবং অনাত্মীয়া একটি তরুণীকে নিয়ে পাশাপাশি বসে ছবি দেখা তার জীবনে এই প্রথম। কখনো ইচ্ছা হয়নি, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে ইচ্ছার পিছনে কোনো চেষ্টা যুক্ত হয়নি। এসব বিষয়ে সে একেবারে আনাড়ী। নিজে থেকে সুযোগ যখন আসেনি, এগিয়ে গিয়ে সুযোগ করে নেবার মতো মনের গড়ন তার নয়। তাই

তিরিশ পেরিয়েও সে সম্পূর্ণ নারী-সঙ্গ-বর্জিত। মা নেই, বাবা আছেন পুজো-পাট নিয়ে। দাদারা আলাদা বাড়িতে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং বধূবেশে কোনো নারী এসে তার সঙ্গিনীর অভাব পূরণ করবে, সে সম্ভাবনাও ক্রমশঃ পিছিয়ে গেছে। দু-একটি আত্মীয় বন্ধু, গোড়ার দিকে যারা এদিকে কিঞ্চিৎ আগ্রহ দেখিয়েছিল, তেমন কোনো সাড়া না পেয়ে ধরে নিয়েছে, সন্দীপ একাই থাকতে চায়। সেও নিজেকে সেইভাবেই তৈরি করে নিয়েছিল।

মেয়েদের আকর্ষণ করবার মতো প্রকৃতি বিধাতা তাকে দেননি। অন্ততঃ তাই তার বিশ্বাস। চেহারায় ও স্বভাবে সকলের আগে যেটি চোখে পড়ে, সেটি নিটোল গাম্ভীর্য। কথাবার্তায় রস আছে, কিন্তু সেটা হালকা রস নয়। মেয়েরা তাকে শ্রদ্ধা করে সম্ভ্রম করে, কিন্তু তার সান্নিধ্যে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সেও এ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে যে দু-একটি মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, তাদের মধ্যে কোনো গভীরতার দেখা পায়নি। ওদিকটায় ওদের অভাব আছে, মেয়ে মাত্রেই কিছুটা লঘুচিত্ত, এইরকম একটা ধারণাই তার গড়ে উঠেছিল।

এই মেয়েটির মুখ দেখে সন্দীপের মনে হয়েছিল, এ হয়তো সেই সাধারণ দলে পড়ে না। এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা দেখা মাত্র ফুরিয়ে যায় না, যাকে আর একটু তলিয়ে দেখতে এবং জানতে ইচ্ছা করে। লক্ষ্য করছিল, ছবির মধ্যে যেখানে একটু করুণ কিংবা গভীর স্পর্শ আছে, সেখানেও বেশির ভাগ দর্শক, বিশেষ করে দর্শিকা, শব্দ করে হাসছিল। সবই যেন ফান, মজা ছাড়া আর কিছুই যেন উপভোগ্য নয়। এই মেয়েটি হাসছিল না। নিবিষ্ট হয়ে দেখছিল। তার মানে, লঘু ছাড়া অন্য জিনিসও ওর অনুভূতিকে স্পর্শ করে, ওর কাছে তার একটা আপীল আছে।

এই মেয়ের সঙ্গে বিভূতির কি করে ভাব জমল, সেটা একটু আশ্চর্য মনে হ'ল সন্দীপের কাছে। বিভূতি স্বভাবচঞ্চল, দু-দণ্ড স্থির হয় বসতে পারে না, হাসি-গল্প হৈ-চৈ নাচ-গান ছাড়া থাকতে পারে না, মেয়েদের মধ্যেও সে সেই জিনিসই খোঁজে। তবে তার মনটি একেবারে স্বচ্ছ, কোথাও কোনো মালিন্য নেই, কোনো বাঁক নেই, সবটাই স্পষ্ট ও সরল। আর একটা জিনিস আছে বিভূতির মধ্যে, ইংরেজীতে যাকে বলে লাভেবল্ নেচার, যেজন্যে তাকে অত ভালো লাগে। হয়তো রেণুর আকর্ষণও সেইখানে।

টিকেট কেটে রেণুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল বললেন না তো?

—ছবি?

—হ্যাঁ।

—ভালো লেগেছে। আপনার?

—দেখুন, আমি ছবিটবি বড় একটা দেখি না। আজ আপনার সঙ্গে বসে দেখলাম। সন্ধ্যাটা বেশ কাটল।

কথাটা ভারী মিষ্টি লাগল রেণুকার কানে। মনের ভিতরেও অনেকখানি খুশী ছড়িয়ে পড়ল। ছবি নয়, ওঁর ভালো লেগেছে তার সঙ্গ। আজকের এই

সন্ধ্যাটি তার কাছেও স্মরণীয় হয়ে রইল।

এই ধরনের কথা, এর চেয়ে অনেক অন্তরঙ্গ কথা রেণুকা বিভূতির মুখে কতদিন শুনেছে। কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা স্থূলতা আছে। বড় বেশী স্পষ্ট, খোলাখুলি, বেআবরু। শুনলে গা সিরসির করে, কিন্তু মনটা মাধুর্যে ভরে দেয় না, আজ এই মাত্র যার স্পর্শ অনুভব করল। বিভূতির কথায় যেন কোনো আর্ট নেই। একই কথা সোজাসুজি বলা আর একটু সুন্দর আবরণে সাজিয়ে বলায় যে কত তফাৎ তা সে জানে না।

চলন্ত ট্রেনে বসে আর একটা জিনিস ভাবতে ভাবতে গেল রেণুকা। বিভূতির তুলনায় ইনি কত ভদ্র, কত সংযত। সিনেমার দুটো সীটের মাঝখানে যে হাতল, যার উপর সে হাত রেখেছিল, ওঁর হাতখানাও সেখানে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছেন। ওপাশে একটা মোটা মানুষ ওদিকের সব হাতলটা জুড়ে রেখেছিল। ওঁকে পুরো আড়াইটা ঘণ্টা প্রায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়েছে। রেণুকার ইচ্ছা করছিল, বলে, এখানে হাত রাখুন না? আমার কোনো অসুবিধা নেই। লজ্জায় বলতে পারেনি। কি জানি কী মনে করবেন!

বিভূতির সঙ্গে যেদিন প্রথম ছবি দেখে, সেই দিনটা মনে পড়ল। সারাক্ষণ ধরে তার উদ্যত কনুই ও বাহুভাগ মাঝখানের হাতলের উপর এবং মাঝে মাঝে হাতল ছাড়িয়ে তার দেহের স্পর্শ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। রেণুকার যে ভালো লেগেছিল তা নয়। চেষ্টা করেছিল যতটা সম্ভব ওদিক ঘেঁষে যতখানি এড়ানো যায়। তারপর ক্রমশঃ সয়ে গেছে। আর এড়াবার চেষ্টা করে না। বিভূতি তার পুরো সুযোগ নিয়ে থাকে। স্বাস্থ্যবান প্রাণোচ্ছল যুবক। তার এই ঘন-সান্নিধ্যে রেণুকার তরুণ দেহে কোনো শিহরণ তোলে না, মনে কোনো সাড়া জাগায় না, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে তার সঙ্গে একথাও সত্য যে, মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার চেয়ে তার এই যৌবনপুষ্ট তনুর প্রতিই বিভূতির আকর্ষণ বেশী। সেই দিকে চেয়েই সে তার মন যোগায়, তার মুখে খুশী ফোটাবার চেষ্টা করে। আর মনে হয়, ও যেন বড় খেলো, বড় ভাসা-ভাসা, বড় চঞ্চল। ও যদি সত্যিই তাকে ভালবেসে থাকে, হয়তো বেসেছে, তার মধ্যে আবেগ যতখানি, অনুভূতি তার চেয়ে অনেক কম। সে ভালবাসা যতটা উচ্ছল ততখানি গভীর নয়।

দু' সপ্তাহ পরেই নর্থ স্টেশনের সেই কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রেণুকা। তার জন্যে সে পর পর দু'খানা চিঠি পেয়েছে। বিভূতি ছুটতে ছুটতে এসে তাকে দেখেই আনন্দে ফেটে পড়ল, চিঠি পেয়েছ তাহলে? রেণু দুটো আঙুল তুলে দেখাল। তারপর বলল, তোমার বুঝি মনে হ'ল, একটা চিঠিতে আমি আসবো না?

—তা কেন? কি জানি, যদি না পাও? ডাকের চিঠি, মারাও যেতে পারে।

—বেশ গেল। একদিন না হয় না-ই পেলে আমাকে?

—ওরে বাপরে! তাহলে আমি মারা যাবো। বলে, সেই স্টেশনের ভিড়ের

মধ্যেই ওর হাতে এমন চাপ দিল যে, রেণুকা একটা অস্ফুট চীৎকার করে বলে উঠল, আমার হাতটা কি লোহা ?

—কে বললে ? এক তাল মাখন !

—খুব হয়েছে। চল, কোথায় যেতে হবে।

—সিনেমায় চল। মেট্রোতে একটা খুব ভালো ছবি এসেছে। 'এ' মার্কা ছবি।

—না, ওসব আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে এসো, বেড়াই।

—কোথায় যাবে ?

—চল ইডেন গার্ডেনে কিংবা গঙ্গার ধারে।

—বেশ।…এই, ট্যাক্সি……

—আবার ট্যাক্সি কী দরকার ?

—ঐ তো বাস-ট্রামের অবস্থা। উঠতে পারবে ?

—কেন, এখানে কোথায় যেন ট্রাম-ডিপো আছে—

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে বিভূতি। রেণুকা উঠতে উঠতে বিরক্তির সুরে বলল, খালি খালি কতগুলো টাকা না ওড়ালে আর চলছিল না !

—খালি খালি মানে ? ভিড়ের কষ্টটা বুঝি কিছু না ? তাছাড়া ট্যাক্সিতে যেমন—

থেমে যেতেই রেণু মুখ তুলে বলল, কী ?

—থাক ; শুনলে তুমি আবার বকতে শুরু করবে !

ইঙ্গিতটা ওর চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছিল রেণুকা, তাই কিছু না বলে আর একটু ধারের দিকে সরে গেল। বিভূতির কাণ্ডজ্ঞান বড় কম। ড্রাইভার এবং দু' পাশের লোকজন—কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায় না। এই মুহূর্তে আর একটা কাণ্ড করল।

পকেট থেকে দু'খানা সিনেমার টিকেট বের করে জানালা দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

রেণুকা চমকে উঠল—এ কী করলে !

বিভূতির মুখে একগাল হাসি, যেন ভারী একটা মজা করে ফেলেছে। বলল, ইডেন বা গঙ্গার ধারে বেড়াতে টিকিট লাগে না।

—কী আশ্চর্য ! টিকিট কিনে ফেলেছ জানলে ওখানেই না হয় যাওয়া যেতো।

—তা হয় না ; আমার কাছে দু'খানা টিকিটের চেয়ে একজনের ইচ্ছার দাম অনেক বেশী।

কথা ক'টি যে রেণুকার ভালো লাগল না তা নয়, তবু বাইরে গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। কবে তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে, বলতে পার ?

বিভূতি হাসিমুখে রেণুকার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বলল, তোমাকে কার মতো দেখাচ্ছে বলবো ?

—কার মতো ?

—ঠিক আমাদের বরাট সাহেব !

এবারে রেণুকাও হেসে ফেলল। বরাট সাহেবের কথা সে অনেক শুনেছে। বলল, আবার বুঝি খুব বকুনি খেয়েছ ?

—বকুনি বলে বকুনি! চাকরিটাই বোধ হয় নিয়ে নিত, সন্দীপদা গিয়ে কোনোরকমে বাঁচিয়ে দিলেন। ও, ভালো কথা, সন্দীপদা সেদিন তোমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছেন।

—যাও, যত সব বাজে ঠাট্টা।

—সত্যি বলছি। অবিশ্যি, ঠিক সোজাসুজি বলেননি। সেটা ওঁর ধরন নয়। একটু ঘুরিয়ে বলেছেন।

—"কী বলেছেন ?"—রেণুকার মনে অদম্য কৌতূহল।

—আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা, বললেন, আই কংগ্রাচুলেট ইউ ! সত্যি, আমার বন্ধুভাগ্য খুব ভালো। একদিকে সন্দীপদা, আরেক দিকে—

বলে রেণুকার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। সে বাধা দিল না।

ইডেনের ছায়া ঢাকা পথে বেড়াতে বেড়াতেও সন্দীপের কথা ঘুরে-ফিরে এসে পড়ছিল। বিভূতিকে জানতে না দিয়ে সুকৌশলে রেণুকাই তাকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে আসছিল এই প্রসঙ্গে।

'সন্দীপদার বাড়িতে তার বাবা, আর ঠাকুর-চাকর ছাড়া কেউ নেই। দিন কাটে অফিস আর পড়াশুনো নিয়ে। আড্ডা নেই, ক্লাব নেই, মাঝে মাঝে বাইরে চলে যান। চাকরিতেও খুব উন্নতি করেছেন। এরই মধ্যে অনেককে ডিঙ্গিয়ে হেড্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হয়ে গেছেন। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী হতেও খুব বেশী দেরি নেই। বিয়ে-থা করেননি। কে খোঁজ করে ? বাবা ধম্ম-কম্ম নিয়ে আছেন, দাদারা আলাদা। মা তো অনেকদিন হল নেই। আগে আগে দু-চারটে ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, কেউ গা করেনি। এখন যদি কেউ বিয়ের কথা পাড়ে হেসে বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি। এ বয়সে কারো পাণিপীড়ন মানে সত্যিই পীড়ন।' অথচ বয়স আর কত ! তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে, আমার চেয়ে মাত্তর পাঁচ-ছ বছরের বড়।"

…এমনি অনেক কথা বলেছিল বিভূতি।

॥ দুই ॥

রেণুকার দিদি চন্দনার শ্বশুরবাড়ি কামারহাটির পাশে। নিজের দিদি নয়, ওর মেজোমামার বড় মেয়ে। বিয়ে হয়েছে পাঁচ-ছ বছর, একটি বাচ্চা। রেণুর সঙ্গে খুব ভাব। মামাতো বোন হওয়ায় দু'দিকেই সুবিধা। স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে দেওয়া যায়, মায়ের পেটের বোনের কাছে যা সব সময়ে চলে না। কিছু স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কিছু গোপন রেষারেষি, হয়তো কিছু প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ছোঁয়া সেখানে সব কথা অকপটে বলতে দেয় না। বিষয় বুঝে একটু রেখে-ঢেকে বলতে হয়। বিশেষ করে, যেখানে মনে হবে, এটা বাবা-মার কানে যেন না ওঠে, সেখানে অন্ততঃ না থামলে বিপদের সম্ভাবনা। এসব ক্ষেত্রে সম্পর্কের দূরত্বই বরং দু'জনকে আরো নিকটে

টেনে আনে।

রেণুর বেলায় তাই হয়েছিল। নিজের দিদিকে যা বলত না, তার অনেক বেশী গিয়ে বলত চন্দনাদিকে। বিভূতির কথা প্রায়ই হত, এবং তার মধ্যে কিছুই প্রায় বাদ পড়ত না। একটু-আধটু পড়লেও চন্দনা সেটা তার বয়স বুদ্ধি এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নিত। জায়গা বুঝে দু-একটা চটুল ফোড়ন দিয়ে বোনকে একটু রাঙিয়ে দিত। মাঝে মাঝে অভিভাবিকার ভাবনাও থাকত তার মধ্যে। একটু গভীর সুরে বলত, তোর কথা শুনে শুনে যা বুঝছি, ছেলেটা বড় কাঁচা, বড় অপলকা। ভাবছি, ভার সইবে কি না।

একদিন বলল, আমার নাম করে আসতে বলিস তো। একবার দেখবো।

বিভূতি শুনে খুব খুশী। পরের সপ্তাহেই ছুটে গিয়ে দেখা করেছিল চন্দনাদির সঙ্গে। সারাটা বিকেল হৈ-চৈ করে, চা-খাবার খেয়ে, নিজে থেকেই আবার আসবার কথা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। তার পরেও আরো দু'বার কামার-হাটি যাতায়াত করেছে। রেণুকাদের বাড়ি নয়, চন্দনার কাছে। রেণু তাকে তাদের বাড়িতে কখনো যেতে বলেনি, বাবা-মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়নি। চন্দনাই নিষেধ করেছিল—এখন থাক না! আরো কিছুদিন যেতে দে।

এতদিন চন্দনা শুধু বিভূতির কাহিনী শুনেছে, সে কি বলল, কি করল; এবার শুনল সন্দীপের কাহিনী। দেখা মাত্র একদিনের, কথাও দু-চারটির বেশী নয়, কিন্তু শোনা অনেকখানি, এবং শোনার উপর ভিত্তি করে গড়াও হয়তো কিছু ছিল, সজ্ঞানে নয়, নিজের অজানতে, এসব ক্ষেত্রে একটি তরুণীর মন যা করে থাকে। সব মিলিয়ে বলা যা হ'ল, তার বিস্তৃতি কম নয়। তার উপরে চন্দনা নিজের চোখ দিয়ে যা দেখল, সেটুকুও জুড়ে দিল। তখন কিছু বলল না। বিভূতির বেলায় যা করে থাকে, খানিকটা সরস তামাশা, তাও করল না, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

দু-চার দিন পরে রেণু যেই গেছে, যেমন যায়, ওকে দেখেই হঠাৎ বলল, সেই ভদ্দরলোকের ঠিকানাটা দিতে পারিস?

—কোন ভদ্দরলোক?

—ঐ যে তোর নতুন বন্ধু।

—ছি, কাকে যে কী বল, তার ঠিক নেই।

চন্দনা হাসিমুখে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের মুখটা দেখে নিল, তারপর বলল, আচ্ছা, না হলেন বন্ধু, তাঁর ঠিকানাটা আমার দরকার।

—আমি কোত্থেকে দেবো?

—কেন, বিভূতিকে বললেই দিয়ে দেবে।

—যদি বলে, কী করবে ঠিকানা দিয়ে?

—ও, তাও তো বটে। আচ্ছা, ওকে আমার কাছে আসতে বলিস। আর—বলে, একবার তাকাল ওর দিকে।

—থামলে যে?

—মাস দুই ওর সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ রাখ।

রেণু একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, কী ! খুব কষ্ট হবে ?

রেণু সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, তোমার মতলবটা কী বল তো ?

—মতলব আবার কী ! তুই পারবি কি না বল । ও চিঠি লিখবে, অমুক জায়গায় থেকো । তুই যাবি না, চিঠিরও উত্তর দিবি না । বড্ড মন খারাপ করবে, না রে ?

—ভীষণ ! ভাবছি পাগল টাগল না হয়ে যাই ! সত্যি বলছি, দিদি, মাঝে মাঝে কী যে বোরিং লাগে, জানো ?

—তা তো লাগবেই । একখানা খুব ভালো শাড়িও পাঁচবার পরতে ইচ্ছে করে না । যে গানটা খুব পছন্দ, তাও কয়েকবার শুনবার পর একঘেয়ে হয়ে যায় । তবু ওগুলো বদলানো যায় ; একটা ভালো না লাগে, আরেকটা পরো, আরেকখানা শোনো । সবকিছুর বেলায় তো সেকথা খাটে না । বিশেষ করে একটা জিনিস । সেখানেও কিছুটা বদলাবদলি চলে । কিন্তু সব ঐ গোড়ার দিকে । একবার বেছে নেওয়া হয়ে গেলে যতই বোরিং লাগুক যমে ছাড়বে না ।

রেণুকা সবটা মন দিয়ে শুনে বলল. তোমার বক্তৃতাটি বেশ, কিন্তু লক্ষ্যটা ঠিক বুঝতে পারছি না ।

—আপাতত না বুঝলেও চলবে ।

॥ তিন ॥

সন্দীপ ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছিল, বিভূতি বেশির ভাগ সময় গম্ভীর হয়ে থাকে, কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কখনো বা বিনা কাজে খানিকটা বাইরে ঘুরে আসে । প্রায়ই বরাট সাহেব ডেকে পাঠান, এবং সেখান থেকে যখন ফেরে, মুখ দেখেই বোঝা যায় নেপথ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে । সাজপোশাকের দিকে সে বরাবর একটু বেশী মনোযোগী । বর্তমানে সেখানেও সুস্পষ্ট অবহেলা ।

দু-চার দিন অপেক্ষা করে একদিন একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী বিভূতি ?

—কই, কিছু না তো !

—বলতে না চাও, সে আলাদা কথা । তবে 'কিছু না' বলেই তো সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।

বিভূতি একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এখন নয়, আপনার বাড়ি গিয়ে বলবো ।

পরদিন সন্ধ্যার পর সন্দীপ একটানা শুনে গেল—প্রায় দু' মাস হতে চলল, বার বার চিঠি লিখেও রেণুর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছে না । কামারহাটিতে ওর এক দিদি থাকেন । তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেও সুবিধা হয়নি । তিনি বললেন, ও একটু ব্যস্ত আছে, সামনে পরীক্ষা । পরে দেখা করবে । আসলে বোধ হয় ইচ্ছা করেই আসছে না ।

সব শুনে, ভিতরে ভিতরে বন্ধুর জন্যে একটু চিন্তিত হলেও, (কেননা,

তার পক্ষে ব্যাপারটা খুব লঘু নয়) বাইরে সহজ করে দেবার চেষ্টা করল সন্দীপ—সেইজন্যে হাঁড়িমুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে আছে, তাই আসছে না।

—চিঠির একটা উত্তরও তো দিতে পারে।

—হয়তো সত্যিই পরীক্ষা-টরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছে।

—পরীক্ষা মানে কলেজের ট্যার্মিন্যাল না কি। সেসব কবে চুকে গেছে।

সন্দীপ একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, তোমরা কদ্দুর এগিয়েছ বল তো ?

—মেয়েরা তো কিছু পষ্ট করে বলে না। তবে যদ্দুর বুঝেছি, ওর কোনো আপত্তি নেই। শুধু বি. এ. দেবার অপেক্ষা।

—গার্জেনরা কী বলেন ?

—রেণুর আসল গার্জেন ওর বাবা-মা নন, ঐ দিদি। তার ওপরে সব ভার। ও-ই বলেছে, আমাকে তার খুব ভালো লেগেছে। আমারও তাই মনে হয়েছে।

সেদিন আর কোনো কথা হ'ল না। দিন কয়েক পরে সন্দীপ ছুটির পর বাড়ি যাবার পথে বিভূতিকে বলল, সন্ধ্যার পর একবার যেও।

—কেন ?

—এমনিই বলছি। গল্প-টল্প করা যাবে।

বিভূতি বুঝল, শুধু গল্প করবার জন্যে সন্দীপদা তাকে ডেকে পাঠাননি। একটু চিন্তিত হয়েই গেল।

সন্দীপ এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করল, ওদিকের খবর কি ?

—একদম চুপ। আর একটা চিঠি লিখেছি। যদি তার মন বদলে গিয়ে থাকে, খোলাখুলি জানাতে বলেছি। কোনো জবাব নেই।

—জবাব দিয়েছে। সে নয়, তার দিদি। তার কথাই কি তুমি বলেছিলে সেদিন ? নামটা বোধ হয় চন্দনা।

—হ্যাঁ, ঐ সেই দিদি। কী লিখেছেন ?

বিভূতির আগ্রহাকুল চোখের দিকে চেয়ে সন্দীপ বলল, তোমার কথা কিছু নেই। আমার সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

বিভূতির মুখটা হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল। একটা ক্ষীণ অস্ফুট আওয়াজও বোধ হয় বেরিয়ে এল তার ভিতর থেকে, যদিও সেটা কোনো ভাষা নয়, আর চোখ দুটোয় একটা অর্থহীন বিহ্বলতা ফুটে উঠল। সন্দীপ তৎক্ষণাৎ আর কিছু বলল না। বোধ হয় বন্ধুকে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হবার সময় দিল। তারপর কী বলা যায় যখন ভাবছে, বিভূতিই তাকে, বলতে গেলে, প্রায় বিস্ময়ে অভিভূত করে দিল। আশ্চর্য কোমল সুরে বলল, আপনাকে একটা কথা বলবো, সন্দীপদা ?

—বল।

—আপনি আপত্তি করবেন না। রেণুকে তো আমি অনেকদিন ধরে দেখছি, ওরকম মেয়ে হয় না। চেহারার কথা বলছি না। ওর মতো কিংবা ওর চেয়ে ভালো দেখতে ঢের মেয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু অমন সুন্দর মন ! ঐ রকম বুদ্ধি ! কত সহজে কত দরদ দিয়ে সবকিছু বুঝে নেয় !

বিভূতির মুগ্ধ কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, আমি ঠিকই বলছি সন্দীপদা, রেণু আপনার অযোগ্য হবে না। বলেন তো, আমি এ চিঠির উত্তর দিয়ে দিচ্ছি।

"এ কী রকম হল ?" সন্দীপের কণ্ঠে ছদ্ম বিস্ময়ের সুর। "তোমার এ কথাগুলো তো ঠিক ছকে মিলছে না বিভূতি ! এইচ. জি. ওয়েলসের একটা বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে তিনি একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন—তোমরা দু'জন পরম বন্ধু, **a woman comes and you are enemies.** আমি তো সেইটাই আশা করছিলাম—আজ থেকে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।"

—"কী যে বলেন !" ঠিক হাসি নয়, হাসবার মতো মুখ করল বিভূতি।

তারপরেই সে উঠতে চাইছিল। কিন্তু সন্দীপ তাকে চেনে, তাই যেতে দিল না। একরকম জোর করেই রেখে দিল, সে রাতে আর মেস্‌এ ফিরতে দিল না। মাঝে মাঝে এ বাড়িতে রাত কাটানো বিভূতির পক্ষে অবশ্য নতুন নয়।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালবেলা চায়ের পাট সেরে দু'জনে গিয়ে বসল সন্দীপের শোবার ঘরের সামনের বারান্দায়। সন্দীপ বলল, "বুঝলে বিভূতি, তোমার ঐ রেণুর কথা কাল আমি অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি। একটি মেয়েকে নিয়ে এত সময় কাটানো আমার এই প্রথম। মেয়েটিকে খুব বেশী দোষ দিতে পারলাম না। শুধু একটি বন্ধু নিয়ে যখন চলে, সেই রোমান্সের বয়সও পার হয়ে এসেছে। ফিজিক্সের ভাষায় ও এখন গ্যাস বা বায়ুস্তর থেকে সলিড্ অর্থাৎ নিরেট বস্তুর সন্ধান করছে। শুধু উড়ে বেড়ানো নয়, শক্ত মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ানো। সেখানে আশ্রয় হিসেবে তোমার চেয়ে আমি বেশী নম্বর পাচ্ছি। বয়সের জন্যে অবিশ্যি খানিকটা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য সব দফায় সে ঘাটতি পূরণ করেও কিছু উপরে আছি। হিসেবের ব্যাপার। অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

সামনে কিছু দূরে একটা ছোট্ট পার্ক। সেখানে কতগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছিল। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সন্দীপ আবার তার পূর্ব সূত্রে ফিরে গেল—"কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, বিভূতি। তোমাকে যেমন আমি চিনি, সেও নিশ্চয়ই এতদিনে চিনতে পেরেছে। তোমার ভিতরে যা কিছু আছে, তার জানতে বাকী নেই। জেনেও এমন একটা জিনিস যে-মেয়ে শুধু অঙ্কের ফর্মুলায় ফেলে বাতিল করে দিতে পারে, তার বুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করবো, কিন্তু ঐ যে বললে "একটি সুন্দর মন," ওখানে আমি একটি শূন্য ছাড়া তাকে আর কোনো নম্বর দেবো না। ঐ 'মন' বা হৃদয় বলে কোনো বস্তু তার নেই। থাকলেও সেটা কখনো জানবার চেষ্টা করেনি।

এতক্ষণে বিভূতির মুখে কথা শোনা গেল। ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, আমার মনে হয়, ঐ দিদির পাল্লায় পড়ে—

—তাহলে তো আরো মারাত্মক। একজনের পাল্লায় পড়ে এত শীগগির যার অন্তরের সব রঙ মুছে যায়, সব দীপ নিবে যায়, আমাকে তুমি তার পাল্লায় ফেলতে যাচ্ছ ? রক্ষে কর বাপু।

বিভূতি চুপ করে বসেছিল। এবার তার দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বলল সন্দীপ, তোমার আঘাতটাকে আমি লঘু করে দেখছি না বিভূতি। তবে জানি, সেটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হবে না। আজ না হলেও, ক'দিন পরেই বুঝবে, এমন কিছু বোধ হয় হারালে না, যার জন্যে তোমার মতো ছেলের সত্যিই আপসোস করা সাজে।

গল্প হিসাবে এইখানেই বোধহয় এ কাহিনীর সমাপ্তি-রেখা টেনে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা গল্প নয়, আরো কিছুদূর এর জের টেনে চলতে হবে। পাঠক-পাঠিকারা 'ইন্-আর্টিস্টিক' বলে নাসিকা কুঞ্চন করবেন জানি। কী করবো ? জীবন তো আর্ট মেনে চলে না।

সন্দীপ ও বিভূতির যে বন্ধুত্ব, তার প্রথম পত্তন ওদের পাঠ-জীবনে, যখন একজন ছিল কলেজের ছাত্র, আরেকজন স্কুলের। তার মধ্যে খানিকটা গুরু-শিষ্য ভাবও ছিল। অর্থাৎ ভালবাসার সঙ্গে ভক্তি ও স্নেহের মিশ্রণ। সেটা বরাবর রয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই বয়সের তফাৎ এবং চাকরির অসাম্য ওদের বন্ধুত্বে কোনোদিন ফাটল ধরাতে পারেনি, বরং উভয়ের ভিতরকার জোড়গুলোকে শক্ত করে তুলতে সাহায্য করেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে সিমেণ্টিং। মাঝখানে কিছুদিন বিভূতির জীবনে একটি রেণুর আবির্ভাব দুই বন্ধুর জীবন-দর্শনে কিছু আলাদা স্রোত নিয়ে এসেছিল। তার অন্তর্ধান, এবং যেভাবে সেটা ঘটল—দুয়ে মিলে ওদের আবার সেই পূর্ব-সম্পর্কের বৃত্তের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

নারী সম্পর্কে একটি দার্শনিক অনীহা একসময়ে উভয়ের মধ্যেই ছিল। রেণুকা এসে একজনকে তার থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধুর স্বাদ এনে দিয়েছিল। পরবর্তী অভিজ্ঞতা সেই মাধুর্যের সবটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে রেখে গেল শুধু তিক্ততা।

অতঃপর দুই বন্ধু "শত হস্তেন—" সাবধান বাণী উচ্চারণ করে শাড়ি পরিহিত জগৎ থেকে সভয়ে সরে দাঁড়াল।

পুজোর ছুটিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া—ওদের বরাবরের নিয়ম। সে-বার গিয়েছিল শিমুলতলা। তার কারণ এ নয় যে, জায়গাটির জল-হাওয়া ভালো, কিংবা তার চারদিক ঘিরে নাতিদূরে ছোটনাগপুরে ছোট ছোট পাহাড়গুলো যে বলয় রচনা করেছে, (লাট্টু পাহাড়ের কাঁধে চড়ে যার পুরো নকশাটা পাওয়া যায়) সে দৃশ্যটি অতি মনোরম ; এও নয় যে, রামপাখী-ভুকদের ওটা রাম-রাজত্ব। তার প্রধান কারণ, ওখানে বিজলি বাতি নেই। ওরা এটা হাড়ে হাড়ে জানে যে বাংলার বাইরে দুদিনের তরে বেড়াতে-আসা মানুষগুলোর মধ্যে বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, একটা প্রবল আসঙ্গলিপ্সা জেগে ওঠে, এবং প্রায়-অচেনা অথবা মুখ-চেনারা রাস্তাঘাটে পথ আগলে 'এই যে কবে এলেন' বলে দীর্ঘ আলাপ জুড়ে দেয়, বাড়ি চড়াও করতেও ছাড়ে না। এখানে সে সম্ভাবনা দেখা দেবে না। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পথচারী মাত্রেই ভূত। বাড়িতে বাড়িতেও প্রায় তাই। কালিমাখা

হ্যারিকেনের ওপাশে নিজের স্ত্রীকেও চেনা দায়। সুতরাং নির্বিবাদে নিজের মনে ক'টা দিন কাটিয়ে দেবার মতো এমন স্থান আর নেই।

বাজারের ভিতর দিয়ে যে ধুলোর রাস্তাটা তিলুয়ার দিকে চলে গেছে, তার থেকে একটা পথ উঠেছে উত্তরে—কিছুটা গাছপালা ঘেরা সহজ চড়াই। তার পরেই ওখানকার অভিজাত পল্লী। বাঁদিকটা ঢালু, ডানদিকে সারি সারি বাড়ি। খানিক এগিয়ে গেলে আবার উৎরাই। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা নেমে গিয়ে মিশে গেছে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের কোলে। সেখানে গিয়ে পড়লে বহুদূরে শ্রুত গানের কলি মনে পড়ে যায়—'এ পথ গেছে কোনখানে?'

ঐ পল্লীতে 'রিজ' বলে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটা এমন কিছু আহা-মরি নয়, কিন্তু তার অবস্থানটি বড় সুন্দর! সন্দীপ একদিন বলেছিল, এখানে দাঁড়ালে 'ইটারনিটি' বলতে কী বোঝায়, তার একটু আভাস পাওয়া যায়। বিভূতিও ঐ পথে বেরোবার এবং ফিরবার মুখে বাড়িটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে যায়, কখনো গেটের সামনে একটু দাঁড়ায়। একদিন বলেও ফেলেছিল, বাড়িখানা কিনে ফেলুন সন্দীপদা।

সন্দীপ হেসে বলেছিল, এ নিয়ে ক'খানা বাড়ি কেনা হ'ল, বিভূতি?

—না; সত্যি। এরকমটা আর কোথাও দেখিনি।

উক্তিটি অবশ্য নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নবার উচ্চারিত হয়েছে।

এমনি একদিন সকালবেলা মাঠের দিকে যাবার মুখে দু'জনেই ওখানে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গেটের ভিতর থেকে একটি সাদর অভ্যর্থনা ভেসে এল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন না।

একটি প্রায়-মধ্য-বয়সী সুবেশ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, আপনাদের প্রায়ই দেখি, হয় এদিকে না হয় ওদিকে চলেছেন। এই পাড়াতেই থাকেন বুঝি?

সন্দীপ বলল, আজ্ঞে না, আমরা আছি স্টেশনের ওপার।

—ও, ওদিকটা আমাদের এখনো যাওয়া হয়নি। আসুন।

—আমরা একটু বেড়াতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

—সে তো দেখতে পাচ্ছি। এখানে বেড়ানো ছাড়া আর কাজটা কী? দু' মিনিট বসে যান। ওরে······

একটা নাম ধরে ডাকলেন। একটি ভৃত্য আসতেই দু'খানা চেয়ার আনতে বললেন। একখানা আগে থেকেই ছিল। এর পরে আর না-বসে পারা যায় না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক। একটু বেশী বকেন, আর মিনিট কয়েকের আলাপেই অন্তরঙ্গ হতে পারেন। বললেন, আপনাদের দু'জনকেই কেমন যেন নিরিমিষ মনে হয়। একা একা ঘোরেন। সঙ্গে তো কাউকে দেখি না।

বিভূতি 'নিরামিষ' কথাটার মানে প্রথমটা ধরতে পারেনি, এবার পারল। বলল, আজ্ঞে আমরা একাই।

—তাই বলুন। আমিও মশাই, অনেকদিন একাই কাটিয়েছি। কিছু ব্যবসা-

ট্যবসা আছে। তাই নিয়েই ছিলাম। আজ বম্বে, কাল বাঙ্গালোর, তার পরদিন কানপুর। সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ডুবে আছি। তারপর হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, কার জন্যে কী করছি! তখন ঝপ করে বাঁধা পড়ে গেলাম। আমার এক বন্ধুর শালী; সেই দিল জুটিয়ে। প্রথমটা খুব ভয় হয়েছিল, জানেন? এত কাল খোলা মাঠে চরে বেড়িয়েছি, এই বুড়ো বয়সে আবার বাঁধন-ছাঁদন সইবে তো? ক'দিন পরেই দেখলাম, এ বড় সুখের বাঁধন। যার হাতে পড়েছি, কী বলবো মশাই, বহু ভাগ্য করলে তবে এরকমটা মেলে। একেবারে মাথায় করে রেখেছে। ওকে বাদ দিয়ে এখন আর একটি দিনও চলে না।

সন্দীপ বলল, আমরা তাহলে এখন উঠি। রোদ বেড়ে যাচ্ছে।

—বলেন কী! একটু চা না খাইয়ে কখনো ছাড়তে পারি? তাছাড়া আসল মানুষটির সঙ্গেই তো আলাপ হ'ল না। বাজারে গেছে। ও-ই সব করে, আমি খাই-দাই ঘুরে বেড়াই। এই তো, নাম করতে-না-করতেই এসে গেছে।

গেটের কাছে গলার আওয়াজ পেয়েই চমকে উঠেছিল বিভূতি। একবার তাকিয়েই কাঠ হয়ে গেল। সন্দীপ প্রথমটা চিনতে পারেনি। বন্ধুর দিকে নজর পড়তেই বুঝতে পারল। আগের চেয়ে একটু ভারী হয়েছে। তাতে বরং ভালোই দেখাচ্ছে। বেশভূষার বহর লক্ষণীয়।

ও তরফও হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। সেটা শুধু ক্ষণিকের। তারপরেই একটি উল্লাসময় মধুর চমক—"একি! আপনারা কখন এলেন?"

"তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?"—স্বামীও কম অবাক হননি।

—পরিচয় মানে! নিকট সম্পর্ক। দাদা হন আমার।

—আরে বল কি! একেবারে একজোড়া বড় কুটুম্ব! কি খাওয়াবে, আগে বল। ওঁরা কি আসতে চাইছিলেন নাকি? জোর করে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছি।

'এক মিনিট' বলে রেণুকা দ্রুতপায়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। দু'হাত ভর্তি বাজারের জিনিস।

সেইদিকে চেয়ে বিভূতির মনে হ'ল, রূপ, ঐশ্বর্য এবং গৌরবে মণ্ডিত একটি সমূর্ত সাফল্য তার চোখের উপর দিয়ে চলে গেল।

প্রচুর জলযোগ এবং প্রচুরতর আপ্যায়নের পর দু'জনে যখন বাসার দিকে চলল, বেশ বেলা হয়েছে। পথে কোনো কথা হ'ল না। ঘরে ফিরে জামাটা ছেড়ে ফেলে দেরিতে আসা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সন্দীপ বলল, রেণুকা তাহলে ঠকেনি।

বিভূতিকে মনে হ'ল কিসের মধ্যে যেন নিবিষ্ট হয়ে আছে। ধীরে ধীরে যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে বলল, আমি ভাবছি ঐ ভদ্দরলোকের কথা। একেই বলে সুখী মানুষ।

দূরপাল্লার গাড়ি ; কামরাটা বেশ বড়। ওরা বসেছিল ওধারের শেষ বেঞ্চিতে, একটা ধার ঘেঁষে। মহিলাটি ছিল জানালার পাশে। এত দূর থেকে পুরোটা দেখা যাচ্ছিল না। তবু অরুণার মনে হ'ল, 'সে'-ই হবে। তার মতো অন্য কেউও হ'তে পারে। অনেকটা একরকম দেখতে কত লোকই তো আছে। তাছাড়া সে এখানে আসবে কেমন করে ? সাজ-পোশাক দেখে তো মনে হয় না দূরে কোথাও যাচ্ছে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে চোখ দুটোকে সরিয়ে নিল। কিন্তু তারা শুনল না। বারবার গিয়ে পড়ছিল ঐ জানালার ধারটিতে। কৌতূহলটা থামতে চাইছিল না।

জানালার ধারের মহিলাটি কিন্তু একবারও এদিকে দেখছিল না। পাশের দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসি-গল্পে মেতে ছিল। অরুণার সঙ্গে চোখাচোখি হলে বোঝা যেত 'সে' কি না। হলে ওকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলত। কিন্তু সে রকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অরুণা যে একবার উঠে গিয়ে কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা করবে তাতেও মুশকিল। তার তিনটি শ্রীমান মিলে যা কাণ্ড করছে। তিনটি বলা ঠিক হ'ল না। বড়টি বড় হয়েছে ; তাছাড়া এমনিতেও বেশ শান্ত, নিজের মনে থাকে, লাফালাফি হৈ-চৈ-এর মধ্যে নেই। কিন্তু পরের দুটি রীতিমত বিচ্ছু। দু-মিনিট অন্তর জায়গা বদলাচ্ছে, কখনও জানালায় গিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে, কখনও দরজার হাতল ধরে টানাটানি করছে, তারপরেই অকারণে ঢুকে পড়ছে বাথরুমে। ওদের সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে অরুণা। এতক্ষণে এগিয়ে হঠাৎ-দেখা সম্ভাবিত বাল্য-বন্ধুর খোঁজ নেবে, সে ফুরসৎ কোথায় ?

গাড়ি ব্যাণ্ডেলে পৌঁছল। কুলি ডেকে সচল ও অচল মিলে ছ-সাতটি মোট-ঘাট সামলে নামাটাই এক বিষম ব্যাপার। মিনিট কয়েক অন্যদিকে তাকাবার অবসর হ'ল না। যখন হ'ল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল অরুণা, ওরা তিনজনও নেমে পড়েছে এবং উল্টোদিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। পিছনটা দেখে এবং চলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে অনেকখানি নিঃসন্দেহ হ'ল। কিন্তু এসব রেখে যায় কেমন করে ? তাই বলে এতকাল পরে এত কাছে এসেও দেখা হবে না ! এত ভাব ছিল দু'জনের ! বড় ছেলেকে ডেকে বলল, কানু, একটা কাজ করতে পারবি ?

কি মা ?

ওই যে মেয়েটি যাচ্ছে না, দৌড়ে গিয়ে ওকে বলবি, আপনার নাম কি সুলেখা ? আমার মা জানতে চাইছে।

কানু চোখ নামিয়ে বলল, আমি পারব না ; আমার লজ্জা করে।

লজ্জা করে ! ঝাঁজিয়ে উঠল অরুণা, ব্যাটাছেলে হয়েছিস কি করতে ! যেমন মেনীমুখো বাপ, তেমনি হয়েছে ছেলে।

তার ও তার বাবার পৌরুষের উপর এই যুগপৎ আক্রমণ, কানুর বয়সী

ছেলের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। সে সেকেণ্ডখানেক গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চলতে শুরু করল। মা পিছন থেকে তাড়া দিল, তাড়াতাড়ি যা।

প্রশ্ন শুনে মহিলাটি অবাক—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নাম সুলেখা। কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

মা জানতে পাঠিয়েছে।

মা! কে তোমার মা ? কোথায় ?

হাত তুলে দেখিয়ে দিতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল সুলেখা। কয়েক সেকেণ্ড লাগল বোধহয় চিনতে। তারপরেই জড়িয়ে ধরে বলল, তুই! কী আশ্চর্য! এখানে কি করছিস ? কোথায় যাবি ?

যাব না, এলাম।

এই গাড়িতে ?

তোর সঙ্গে একই কামরায়।

তাই নাকি ? কই, দেখতে পাইনি তো !

আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু এত দূরে বসেছিলাম—

ও হ্যাঁ ; একেবারে ওধারটায় একজন মহিলা বসে ছিল বটে। গিন্নী-বান্নীর মতো দেখতে। কেমন করে জানব, তুই !

মতো কেন, সত্যিই তো গিন্নীবান্নী। ছেলে দশ বছরে পড়ল। অ্যাদ্দিন তবু শাশুড়ী ছিলেন মাথার ওপর। গেল বছর চলে গেলেন। তোর খবর কী ? কোথায় যাচ্ছিস দল বেঁধে ? বলে, সিঁথির দিকে চোখ তুলল অরুণা।

সুলেখা লক্ষ্য করে বলল, ওখানে কী দেখছিস ? এখনও কেউ জোটেনি কপালে।

তার মানে জোটাতে চাসনি। সঙ্গে ওরা কে ?

কলিগ্ ; এক অফিসে কাজ করি। তোর কথা বল। কোত্থেকে এলি ? কত্তাকে তো দেখছি না।

তার সময় কোথায় ? একগাদা পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত। মা'র শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দেখতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল দু'দিন থেকে আসব। তা এগুলোর জন্যে পারলে তো ? এই, ও কি হচ্ছে ? শেষের উক্তিটি ছোট নন্দন-দুটির উদ্দেশ্যে। মিনিট কয়েক চুপ করে ছিল। বোধহয় নতুন মানুষ দেখে। তারপর যথারীতি কাজে লেগে গেছে। মা'র অগোচরে তার ব্যাগ খুলে চাবির গোছাটি সংগ্রহ করে দু'জনে মিলে ট্রাঙ্কের তলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

অরুণা বড় ছেলেকে বলল, বাঁদর দুটোকে একটু সরিয়ে নিয়ে যা না, কারও সঙ্গে যে একটু কথা বলব, তারও কি উপায় আছে ?

আহা, কেন বকছিস ওদের ? এস, তোমরা আমার কাছে এস।

সেটা অবশ্য ওদের পছন্দ হ'ল না। দাদার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে ওদিকটায় চলে গেল। সুলেখা বলল, এই তিনটি, না, আরও আছে ?

এর ওপরে আরও !···বড় বড় চোখ করে আঁৎকে উঠল অরুণা।

আমার কিন্তু বেশ লাগছে তোকে দেখে।

তা তো লাগবেই ! আমার অবস্থায় পড়িসনি তো। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিস। একেবারে ছাড়া গোরু। ···বলে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, বন্ধুদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস বললি না তো ? চার্চ দেখতে ?

উঁ ? একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুলেখা, না চার্চ দেখতে নয়। শুনলে তুই হাসবি।···মাছ ধরতে।

মাছ ধরতে ! অরুণা হাসল না, দু'চোখ কপালে তুলল।

এখান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ঝিল আছে না ? সেখানে। আগেও এসেছিলাম একবার। ছিপ-টিপ ওখানে রাখা আছে একজনের বাড়িতে।

অরুণা তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বলল, মেয়েমানুষে মাছ ধরে ? ছিপ ফেলে ?

দোষ কী ? তাছাড়া আসলে ওটাই তো মেয়েমানুষের ধর্ম।

অরুণা বুঝতে পারল না। বলল, তার মানে ?

মাছ ধরার ব্যাপারটা জানিস তো ? গোড়াতে কিছুদিন ধরে চার ছড়ানো, মাছকে ভুলিয়ে টেনে আনার জন্যে। তারপর টোপ ফেলে বসে থাকা, অপেক্ষা করা। অনেক মাছ আসে, ঘুর-ঘুর করে দু-চার বার শুঁকে চলে যায়, টোপ গেলে না। তারপর একটা হঠাৎ লোভ সামলাতে না পেরে গিলে বসে। তখন তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে, মানে রাশটা কখনও টেনে, কখনও একটু ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় তোলার চেষ্টা। সবাই কি আর ওঠে ? বেশির ভাগই ছিটকে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যের জোর থাকলে একটা হঠাৎ ধরা পড়ে, ঘরে আসে। বান্ধবীর মুখের পানে চোখ তুলে হাসল সুলেখা।

অরুণা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। মুখ টিপে হেসে বলল, তোব ব্যাপারটা কী ?

কেউ টোপ গেলেনি, না, গিললেও ঠিকমত খেলিয়ে তুলতে পারিসনি ?

সে সব আরেকদিন। এবার চলি। ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

আরেকদিন নয়, আজই ফেরার পথে। ওঁরা চলে যাবেন, তুই থাকবি আমার কাছে। এখান থেকে দশ মিনিটের পথ।

না ভাই, আজ হবে না। কাল আবার আফিস আছে তো। একটা ছুটির দিন দেখে আসব।

কেন বাজে বকছিস ? আমার বাড়িতে যাবি না, তাই বল।

তুই দেখছি ঠিক তেমনি আছিস অরুণা। তেমনি কথায় কথায় অভিমান, বিশ্বাস কর। সত্যিই আসব। বিয়ের পরে তো তোকে আর দেখিনি। এত ভাল লাগছে ! তোর সব কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে, তোর উনি, ছেলে-পিলে, ঘর সংসার···। ঠিকানাটা লিখে দে।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক আর ব্লাউজের আড়াল থেকে বেঁটে কলমটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।

অরুণা রায় আর সুলেখা পাল একসঙ্গে পড়ত। আলাদা স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে একই দিনে ভর্তি হয়েছিল আশুতোষের মর্নিং সেকশনে।

সেইদিনই আলাপ এবং কিছুদিন যেতে-না-যেতেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বাইরের দিক থেকে দু'জনের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। অরুণা রোগা, বেশ ফর্সা, ভাসা-ভাসা টানা দুটো চোখ, একটু লম্বাটে ধরনের মুখ, কোমর ছাড়িয়ে ঘন চুল। সুলেখা মোটা-সোটা গোলগাল, বব করা চুল, রং চাপা, একটু কালোর দিকেই বরং বলা চলে। অরুণার বাবা রিটায়ার্ড পোস্ট-মাস্টার, ছোট্ট একখানা বাড়ি করেছেন বালিগঞ্জের দিকে, সামান্য পেন্‌সনে কোনোরকমে সংসার চলে। সুলেখার বাবা নামী অ্যাডভোকেট, ভবানীপুরে মস্তবড় বাড়ি। লেখাপড়াতে অরুণা রীতিমত ভাল ছাত্রী, অল্পের জন্যে স্কলারশিপ পায়নি। সুলেখা মাস্টার-টাস্টার রেখে টায়ে-টায়ে সেকেণ্ড ডিভিশনে উতরে গেছে। অরুণার পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এবং ভালভাবে পাস করে একটা চাকরি-বাকরি জোটানো অবশ্য প্রয়োজন, যাকে বলে মাস্ট; গুটি তিনেক ভাই-বোনের মধ্যে সে-ই বড়। সুলেখার কাছে কলেজে আসা-যাওয়া এবং সেই সূত্রে কিছুটা পড়াশুনা তার দৈনন্দিন রুটিনের অঙ্গ বিশেষ। অর্থাৎ খাওয়া-পরা, খেল্যাধুলো, গান-বাজনা, বেড়ানো, সিনেমা দেখা, পার্টি-টার্টিতে যাওয়া ইত্যাদি দশটা ব্যাপারের মধ্যে ওটাও একটা। আসল লক্ষ্য একটি উৎসব-রাত যেদিন সে পদবী বদল করে পুরনো বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

কিন্তু জীবন কি প্ল্যান মেনে চলে? অন্ততঃ ওদের বেলায় চলল না। ডিগ্রি কোর্সের সেকেণ্ড় ইয়ারে উঠতেই অরুণার বিয়ে হয়ে গেল। ওদের কে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় এসেছিলেন ওর বাবার কাছে কি কাজে। মেয়ে তখন কলেজ থেকে ফিরছে। এক নজর দেখেই বললেন, এটি কে?

আজ্ঞে, আমার মেয়ে; কলেজ থেকে ফিরল।

কি পড়ছে জেনে নিয়ে বললেন, বে-থার চেষ্টা করছ? অরুণার বাবা হাসলেন, ম্লান হাসি, যার অর্থ শুধু চেষ্টাতেই যদি মেয়ের বিয়ে হ'ত! আত্মীয়টি বললেন, আমার প্রসন্নের সঙ্গে লাগিয়ে দাও না। দিন-আনা দিন-খাওয়া অবসরপ্রাপ্ত পোস্ট-মাস্টারের মনে হ'ল ভুল শুনলেন না তো? প্রসন্ন বছর দুই আগে এম. এ. পাস করেছে, কোন একটা কলেজে পড়ায়, অতি সৎ, চরিত্রবান ছেলে, এ সবই তিনি জানেন। আর তাঁর বাবা এই জমকালো চেহারার ভদ্রলোকটি ভাল চাকরি করতেন পুলিশের উপর মহলে। ব্যাণ্ডেলে মস্ত বড় বাড়ি, পুকুর বাগান জমি-জমা। ব্যাঙ্কের অঙ্কটি ঠিক জানা নেই, তবে অনুমান করা শক্ত নয়।

ঐখানে বসেই পাকা কথা দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। অরুণা রাজী হতে চায়নি। কিন্তু যখন বুঝল কোনো দূর-ভবিষ্যতে চাকরি করে বাবাকে সে সাহায্য করবে ভাবছে তার চেয়ে এই বিয়েতে মত দিলেই তাঁর বেশি সাহায্য হবে, তখন আর আপত্তি করেনি। নাম-মাত্র খরচায় বিয়ে হয়ে গেল। এমন পাত্রে এমন ঘরে অরুণার বাবা-মার কাছে যা স্বপ্ন, হয়তো তার নিজের কাছেও।

ওদিকে সুলেখার বাবা একদিন কোর্ট থেকে ফিরে বুকে ব্যথা বলে শুয়ে পড়লেন আর উঠলেন না। তারপর বোঝা গেল বাইরে থেকে ওদের যতটা শাঁসালো বলে দেখাত ভিতরটা তেমনি ফাঁপা। ভাগ্যিস মা আগেই গিয়েছিলেন।

দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জন দাদার একটি চাকরি সূত্রে আমেরিকায়, আরেকটি এখানেই ডালপালা বিস্তার করে বসে গেছেন এবং সবটাই প্রায় বাবার ঘাড়ে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। ভাগের ভাগ সামান্য কিছু পেল সুলেখা। তার সঙ্গে সদ্যপ্রাপ্ত এম. এ. ডিগ্রি সম্বল করে একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। পুঁজি ফুরোবার আগেই শর্ট-হ্যান্ড শিখে ফেলল এবং চাকরিও জুটে গেল একটা। বিলিতী সওদাগরী অফিস। মাইনে ভাল।

মাসখানেকের মধ্যেই এসে গেল সুলেখা। খবর-টবর না দিয়েই। অরুণা যত না খুশী তার চেয়ে বেশি অবাক। সুলেখা যে সত্যিই আসবে তার এই পাড়াগেঁয়ে বাড়িতে এবং এত শীগগির সে একবারও ভাবেনি। ছুটির দিন নয়, এক দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। সকালে উঠেই তোর কথা মনে পড়ল। বেরিয়ে পড়লাম।

খুব ভাল করেছিস। চল, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওঁর সঙ্গে গল্প-টল্প কর, চা-টা খা। আমি ততক্ষণে রান্নাটা সেরে ফেলি। আজ আবার ওঁর সকাল সকাল কলেজ।

প্রসুনবিকাশ ঘোষ নামক ভদ্রলোকটি অধ্যাপক, কিন্তু বাকপটু নন, যদিও বক্তৃতা তার পেশা। তার পরিধি ঐ ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার বাইরে ক্বচিৎ মুখ খোলেন। একটি উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা প্রগল্‌ভা মহিলার সামনে তার অবস্থা রীতিমত কাহিল হয়ে উঠল। কথাবার্তা যেটুকু হ'ল তা অপর পক্ষকেই চালাতে হ'ল। তিনি কোনোরকমে উত্তর দিয়ে গেলেন। তাতেই মনে হ'ল যেন ঘেমে উঠেছেন তিনি।

এটা লক্ষ্য করে 'আচ্ছা আপনি কাজ করুন' বলে সুলেখা যখন উঠল, ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

চলে এলি যে? মাছের কড়ায় খুন্তি চালাতে চালাতে বলল অরুণা।

উনি পড়ছেন। তাই আর ডিস্টার্ব করলাম না।

পড়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, বিরক্তির সুরে বলল অরুণা, আসলে ও ভীষণ মুখচোরা।

ভালই তো।

ভাল না ছাই। তুই একটু বোস, আমার এখুনি হয়ে যাবে।

না, না, তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। তুই আস্তে আস্তে রাঁধ। আমি বরং বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি। বাব্বা, কত বড় বাড়ি তোদের! তোর বাচ্চারা কোথায় গেল?

বড়টা বোধহয় পড়ছে। বাকি দুটো; এই তো এই মাত্তর ছিল এখানে। তোকে দেখে পালিয়েছে। একেবারে বুনো।

বুনো হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই বশ মানল সুলেখার কাছে। নতুন মাসির কোল ঘেঁষে বসে বড় বড় চোখ করে ল্যাজকাটা বাঘের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল। তারপরেই ফরমাশ হ'ল, এবার ভালুকের গল্প বল। তারপর সেখানেই শেষ নয়, ভালুকের পরে এল সিংহ এবং শেয়াল আসবার

আগেই তাদের মা এসে হাজির হ'ল।

খুব জ্বালাচ্ছিস তো মাসিকে ?

না, না, জ্বালাবে কেন ? তুই ওদের বড্ড বকিস অরুণা। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। অতটুকু ছেলে, দুষ্টু তো একটু হবেই, কিন্তু কি মিষ্টি দেখেছিস। কেমন ঠাণ্ডা হয়ে বসে গল্প শুনছে।

ঠাণ্ডা! একটা দিন থাক না, টের পাবি ঠাণ্ডা কাকে বলে। যা, তোরা খেলা করগে।···সত্যি ভাই, তিনটেতে মিলে আমার হাড়ে কালি দিয়ে ছাড়ল। এরপরেও কি নিস্তার আছে ? এদিক-ওদিক চেয়ে গলা খাটো করল অরুণা, এবার বলছে, একটা মেয়ে চাই। ইচ্ছে করে কোথাও পালিয়ে যাই। আর আমি পেরে উঠছি না।

সুলেখা মুখ টিপে হাসল, ভদ্দরলোককে দেখে তো মনে হ'ল—

ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু ঐ—আসল জায়গায় একেবারে অন্য মানুষ।

তুই তো শক্ত হতে পারিস।

শক্ত! তাহলেই হয়েছে। এমন সব কাণ্ড করবে, বললে তুই বিশ্বাস করবি না।

সন্ধ্যার পর ফেরার গাড়িতে বসে একমাত্র ফেলে আসা এই একটি দিনের ছবিগুলো যখন চোখের সামনে পর পর সাজিয়ে দেখল সুলেখা, একটা কথাই মনে হ'ল, অরুণা মুখে যা-ই বলুক, আসলে সে সুখী, স্বামী পুত্র ঘর সংসার নিয়ে পরিপূর্ণ। সারাদিনে তার নিঃশ্বাস ফেলার অবসর মেলা ভার।

কিন্তু যখন মেলে সে নিঃশ্বাস তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

রিক্‌শায় উঠবার সময় অরুণা বলেছিল, আবার আসিস। সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আসব। মাঝে মাঝে এসে একটা দিন এদের মধ্যে কাটিয়ে যেতে সত্যিই একটা তাগিদ বোধ করছিল মনের মধ্যে। শুধু তাগিদ নয়, লোভ। অরুণাকেও একদিন সময় করে ছুটির দিন দেখে আসতে বলেছিল ওর ফ্ল্যাটে। আমি তো যেতে পারলে বাঁচি। একটা দিন একটু হাড় জুড়োয়, সাগ্রহ উত্তর অরুণার, কিন্তু আমার অবস্থা তো দেখে গেলি। এসব ফেলে নড়বার উপায় আছে ?

এর পরের কথাগুলো মনে করে মনে মনে হাসল সুলেখা—তোকে দেখলে হিংসা হয়। বেশ আছিস। একেবারে ঝাড়া হাত পা। যা খুশি কর, যেখানে খুশি যাও। পেছন থেকে টেনে ধরবার কেউ নেই। আর আমাকে দ্যাখ, আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি।

ফ্ল্যাটে ফিরে চারদিকটা বড় বেশী ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ল। এতদিন তো হয়নি। এই তিনখানি ঘর—একটি শোবার, একটি বসবার, আরেকটি খাবার। শোবার ঘরের কোলে ছোট্ট একফালি দক্ষিণ খোলা বারান্দা, ধারে ধারে বসানো বেল, জুঁই, রজনীগন্ধার টব, প্রতি ঘরে যত্ন করে সাজানো আধুনিক রুচির আসবাব,

দরজা, জানালায় সুদৃশ্য পরদা, সব মিলিয়ে এমন একটি শোভন সুরম্য পরিবেশ, যার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল সুলেখা। যেখানেই যাক, মন পড়ে থাকত এই ছোট্ট বাসাটির দিকে। কখন ফিরে এসে প্রশস্ত সোফা কিংবা কৌচের গভীর নরম বুকে, অথবা ছুটে গিয়ে ধরা দেবে কোমল শয্যার শুভ্র আলিঙ্গনে। বন্ধুরা ঠাট্টা করত, তুই বড্ড ঘরকুণো।

কি করব ভাই, হেসে কবুল করত সুলেখা, আমি আমার এই ফ্ল্যাটের প্রেমে পড়ে গেছি। একে ছেড়ে কোথাও গিয়ে মন টেকে না।

আজ তার কী হ'ল কে জানে! কেমন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখল সব। প্রতিটি বস্তুর ওপর যে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল কালও মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, হঠাৎ যেন উবে গেছে। মনে হ'ল এগুলো যেন বড় কৃত্রিম, নির্জীব, কোথাও কোনো প্রাণের স্পর্শ নেই।

চোখের ওপর ভেসে উঠল আরেকটা বাড়ির ছবি। চব্বিশ ঘণ্টা, যাকে বলে কাগ পড়ছে চিল উড়ছে। শোভা নেই, শৃঙ্খলা নেই। বিছানা বালিশ জিনিস-পত্র সব অগোছালো, অবিন্যস্ত। দুটি অতি দুরন্ত শিশু ছুটছে, লাফাচ্ছে, এটা ফেলছে, ওটা ভাঙছে, আর তাদের পিছনে সমান তালে চেঁচিয়ে চলেছে তাদের মা। তারই মধ্যে অথচ তার থেকে বহু দূরে বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসে আছে একটি মানুষ, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত।

ছবিটা যেন চোখের সামনে থেকে সরতে চাইছিল না।

একটি বয়স্কা ঝি আছে সুলেখার। সারাদিনের। রান্নাবান্না, সব কাজ করে। সিঁড়ির পাশে একখানা ছোট্ট ঘর আছে, সেখানেই শোয়। জানতে চাইল কফি বা চা কিছু দেবে কি না। সুলেখা না বলাতেই চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সরিৎবাবু ফোন করছিলেন। জানতে চাইলেন কখন ফিরবে তুমি।

তুমি কী বললে?

বললাম, কলকাতার বাইরে গেছেন, হয়তো একটু রাত হবে।

আচ্ছা, তুমি যাও।

সরিতের সঙ্গে সুলেখার ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। চার-পাঁচ বছরের কম নয়। সেটা যে একটু বিশেষ ধরনের তাদের অন্তরঙ্গ মহলের অজানা নয়। সরিৎ ভাল চাকরি করে, বয়স বেশী নয়, চেহারা ভাল, গাড়ি আছে, নিজেই চালায়। তার পাশে সুলেখাকে প্রায়ই দেখা যায়। সিনেমা-রেস্তোরাঁয়, পার্টি-জলসায়, গঙ্গার ধারে, বটানিকস্‌এও 'ডাব্‌ল এস্‌' (বন্ধুমহলে ওদের সংক্ষিপ্ত নাম) পুরনো হয়ে গেছে। সরিৎ মাঝে মাঝে এই ফ্ল্যাটে রাত কাটায়, এ কথাও গোপন নেই। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, সেটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং ও নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। 'মাঝে মাঝে'-টা কবে বার বার হয়ে দাঁড়াবে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

ঝি চলে যেতেই সুলেখার মনের ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল। সরিৎ ফোন করেছে, সে আসছে, সে ওকে অমুক জায়গায় অপেক্ষা

করতে বলেছে—ঝিয়ের মুখে এখবর কতবার শুনেছে, এবং যখনই শুনেছে, অন্তরের মধ্যে একটা মধুর পুলকগুঞ্জন শুনতে পেয়েছে। আসঙ্গ লিপ্সায় বুকের ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ তার কোনোটাই অনুভূত হ'ল না। তার জায়গায় কিসের যেন একটা ক্লান্তি ও অবসাদ এসে জুড়ে বসল। হঠাৎ মনে হ'ল, এত বছর ধরে সে কোনো পুরুষ-হৃদয়ের অধিকার পায়নি। সে শুধু প্রণয়িনী, নর্ম-সহচরী। তার বেশী আর কিছু নয়।

সরোর মা!

হঠাৎ উঁচু গলার ডাক শুনে ঝি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল।

শোন, সরিৎ যদি আবার ফোন করে, কিংবা এসেও পড়তে পারে, তাকে ব'লো দিদিমণি বলে পাঠিয়েছে, আজ আর ফিরবে না। তারপরও সরোর মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে ধমকে উঠল, বুঝতে পারছ কী বললাম?

সে ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার খাবার দেব?

না; আমার খিদে নেই। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। বলে শোবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

যন্ত্র

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। প্রফেসরের দেখা নেই। মেয়েরা দলে দলে গোল হয়ে, কেউ বেঞ্চ বা হাইবেঞ্চে বসে, কেউ পাশে দাঁড়িয়ে তুমুল আড্ডা জমিয়ে তুলেছে। চারদিক থেকে নানা কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে দুটি শব্দ—'এই, শোন্—' এদের যেটা চিরন্তন রীতি। পৃথিবীতে দুটি জাত আছে, নারী ও পলিটিশিয়ান, যারা শুধু শোনাবে, শুনবে না।

এই মুহূর্তে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। একটে মেয়ে গিয়েছিল অফিসে খবর আনতে। ফিরে এসে অধ্যাপকের মঞ্চের উপর চড়ে তীক্ষ্ণস্বরে জানিয়ে দিল, জেম আসছেন না। সঙ্গে সঙ্গে সব কলবব বন্ধ। যে যেখানে ছিল হুড়মুড় করে গিয়ে ঘিরে ধরল তাকে। সবগুলো চোখ ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল—কি ব্যাপার বল তো?

ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ—মেয়েটির চোখের কোণে ঠোঁটের বাঁকে চাপা হাসি। তার মধ্যে রহস্যময় ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিতে খুশী হবার মতো মনের অবস্থা তখন কারুর নয়। সে-ও বোধহয় নিজেকে আর একটু ব্যক্ত করবার জন্যে উৎসুক। বলল, বি. কে. সি'র সঙ্গে সেই যে একটা—কী বলব?

কে একজন বলে উঠল, ড্যাশ্!

এক পশলা হাসির ঝঙ্কার।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেই ড্যাশ্টা উঠে গেল আর কী! কাজেই জেম্ আর আসছেন না।

সেই সুরসিকার কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "অর্থাৎ ফিল আপ্ দি গ্যাপ্-এর কোয়েশ্চেনটায় পুরো নম্বর পেলেন জনাদি।"

জনা মজুমদার। সংক্ষেপে জে. এম্.।

মেয়েরা তাকে আরো সংক্ষেপ করে নিয়েছিল, জেম্। নামকরণটা অর্থহীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল জনা। তাছাড়া চেহারায়, সাজপোশাকে, চলনেবলনে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যে তার রীতিমত রূপসী ছাত্রীরাও এই তরুণী অধ্যাপিকাকে ঈর্ষার চোখে না দেখে পারত না। তার তুলনায় বি. কে. সি. অর্থাৎ বাংলার অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকিশোর চন্দ নেহাত ম্যাড়মেড়ে। এই দুটি নামের মাঝখানে একটি যোগচিহ্ন বসিয়ে সিঁড়িতে করিডোরে, কমন-রুমে পিছনের বেঞ্চিতে যেদিন গোপন কানা-ঘুষা শুরু হ'ল এবং সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য আলোচনার স্তরে গিয়ে পৌঁছল, অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। বি. কে. সি-র মধ্যে কী দেখল জেম্!

এবারে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ নাক সেঁটকাল। কারো কারো চোখ উঠল কপালে। কিন্তু অনেকেই খুশী হ'ল। সংসারে সুখসমাপ্তিই বেশির ভাগ মানুষের কাম্য। অলস্ ওয়েল দ্যাট্ এণ্ড্স ওয়েল্।

আর ক্লাস নেই। হৈ চৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল মেয়েরা। কেউ কেউ চলল নীরবে, পা দুটিও মন্থর। যেতে যেতে হয়তো একটু ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল মনের কোণে। তাদের জীবনে জেম্-এর মতো একটি 'ড্যাশ্'-এর আবির্ভাব ঘটে থাকবে। কে জানে কেমন করে ভরতি হবে সে ফাঁকটুকু? হবে কি না তাই বা কে বলতে পারে? যদি হয়, যে শব্দটি সেখানে বসাতে চেয়েছিল সেটি হয়তো বসানো যাবে না, যে-কোনো একটিকে বসিয়ে দায় চুকিয়ে ফেলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের চেয়ে জীবনের প্রশ্ন অনেক বেশী অনিশ্চিত!

কলেজের ঠিক সামনেই বাস্-স্টপ। অন্যদিন সেখান থেকেই উঠে পড়ে দীপালী। আরো অনেক মেয়ে ওঠে। আজ বন্ধুদের ভিড়টা এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল ফুটপাথ ধরে। নিতান্ত অবান্তর এবং অভাবিত একটা দৃশ্য মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল, যার জন্যে একটু একা থাকবার প্রয়োজন।

দিন কয়েক আগেকার ঘটনা। শেয়ালদার মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে দীপালীকে রোজ নর্থ স্টেশনে বিরাটীর গাড়ি ধরতে হয়। ওদিন এ-পারের ফুটপাথ দিয়ে ফলের দোকানগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বাবা আরেক দফা জ্বর থেকে উঠেছেন। ভীষণ অরুচি। ক'দিন থেকে বলছিলেন, একটু আমসত্ত্ব পেলে তাই দিয়ে দুটো ভাত খেতে পারেন। মা শুনেও চুপ করে ছিলেন। সংসারের যা অবস্থা, ঐ বাড়তি কয়েক আনা পয়সা খরচ করতে গেলে অনেক জায়গায় টান পড়ে। কোথায় হাত দেবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফয়সালাটা দীপালীই করে ফেলল। অনেকটা আপনা থেকে হয়ে গেল, বলা চলে।

পর পর দু'দিন বাস কণ্ডাকটর ভাড়া চাইতে এল না। ভিড়ের চাপে আসতে

পারল না তার কাছে। গোটা কয়েক পয়সা বাঁচল, কিন্তু মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। ভাড়াটা তার দেয়। নিজে গিয়ে যেচে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাবে কেমন করে? সেখানেও তো ঐ ভিড়ের প্রশ্ন। তবু খানিকটা কষ্ট করলে হয়তো হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেত পয়সাটা; অন্ততঃ চেঁচিয়ে বলতে পারত, টিকেট দিন। কী দায় পড়েছে তার? নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল দীপালী। ভাড়া আদায় করা ওদের দায়িত্ব। ওরা যদি তা পালন না করে, সে কেন গায়ে পড়ে অত কষ্ট করতে যাবে? তাছাড়া অনেকেই তো দেয় না, ইচ্ছা করে গা ঢাকা দেয়, দিচ্ছি দিচ্ছি বলে নেমে পড়ে। তার কলেজের মেয়েরাও আছে সেই দলে। তবে তারই বা এমন মনখারাপ করবার কী আছে? এ যুগে অত নীতি-বাগীশ হওয়া চলে না।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই টিকেট ফাঁক দেয় দীপালী। যখনই দেয়, মনের একটা কোণ খুঁত খুঁত করতে থাকে।

পরক্ষণেই আরেকটা দিক এসে তাকে থামিয়ে দেয়।

এমনি করে কিছু পয়সা জমল। বাবার আমসত্ত্বের ব্যবস্থা হ'ল।

প্যাকেটটা হাত-ব্যাগে পুরে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দীপালী।

ফুটপাথের অনেকখানি জুড়ে নানা রকমের সওদা সাজিয়ে ফেরিওয়ালারা নানা সুরে চিৎকার করছে। হঠাৎ কানে গেল একটা অন্যধরনের সুর। অনেকটা নীচু, যেন চেঁচাতে অভ্যস্ত নয় লোকটি, হয়তো সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'ভালো ব্লাউজ আছে, নেবেন? তাছাড়া ছেলেদের প্যাণ্ট, মেয়েদের ফ্রক—'

দীপালী চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। কথাগুলো তার উদ্দেশ্যে নয়। তার একটু পিছনে একজন প্রৌঢ়া মহিলা আসছিলেন। তার দিকে চেয়ে বলছিল লোকটি। এ স্বর যে তার অনেক কালের চেনা। শুধু কি স্বর, মানুষটা আরো বেশী। কিন্তু অনেক বদলে গেছে। না যদি চিনত, নিজেকে দোষ দিতে পারত না।

কানুদা। তাদেরই গ্রামের (এখন আর তাদের নেই, চিরকালের তরে হারিয়ে গেছে) পুব পাড়ার বোসেদের বাড়ির বড়ছেলে। জম-জমাট অবস্থা ছিল। সবাই বলত বড়বাড়ি। লতায় পাতায় জড়ানো কি একটা সম্পর্ক ছিল দীপালীদের সঙ্গে। কানুদার বাবা সেটা স্বীকার করতেন না? ও করত। সেই সুবাদে মাঝে মাঝে আসত তাদের বাড়ি। বাইরে থেকে দরাজ গলায় 'খুড়িমা' বলে এক হাঁক দিয়েই ভিতরে চলে আসত। মা খুব খুশী হতেন। বাবা বাড়ি থাকলে সস্নেহ সমাদরে ডেকে নিয়ে বসাতেন। দীপালীর তখনকার মনেও এক ঝলক হঠাৎ খুশী ছড়িয়ে পড়ত। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করে উঠত। কাছে যেতে ইচ্ছা করত, কিন্তু পা দুটো যেন কিছুতেই চলতে চাইত না। মা ডেকে পাঠাতেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াত।

কানুদা তখন ঢাকায় পড়ে। আসছে বছর বি. এ. দেবে। কত গল্প করত কলেজের, হোস্টেলের, আরো নানা জায়গার, নানা বিষয়ের। খেলা-ধুলাতেও

মস্ত নাম-ডাক ছিল কানু বোসের। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য। কত ভক্ত তার! ছেলে, মেয়ে দুই-ই। দীপালীর চৌদ্দ বছরের জীবনে অতি অনায়াসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল কানুদা। তাকে ঘিরে বাবা-মার মনেও যে একটি ভীরু আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়েছিল, কিন্তু বোসেদের ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে মাথা তুলতে সাহস করেনি, সে খবরও জানত দীপালী। তারপর এল সাতচল্লিশের সর্বনাশ। জন্ম জন্ম ধরে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই মাটি যেন রাতারাতি পায়ের তলা থেকে সরে গেল। শুধু একা দীপালীদের নয়, তাদের মতো লক্ষ লক্ষ নরনারীর। তবু আরো তিনটা বছর নানা রকম লাঞ্ছনা সয়ে কোনোরকমে ভিটে আঁকড়ে পড়েছিলেন ভবনাথ পাল। পঞ্চাশের ধাক্কা যখন এল, আর পারলেন না। মেয়েটাকে নিয়েই বেশী ভাবনা। একদিন রাত্রির অন্ধকারে স্ত্রী-কন্যা এবং দুটি শিশুপুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন 'বর্ডার'-নামক এক অজানা, অনিশ্চিত লক্ষ্যের উদ্দেশে।

তার আগে বড়বাড়ির বড়কর্তা জগৎ বোসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, আপনিও চলুন দাদা, আর থাকা ঠিক নয়। কথাটা তিনি তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, তিনখানা গাঁয়ের সব মিঞার টিকি, থুড়ি, দাড়ি এই হাতে বাঁধা। আসুক না দেখি, কার কত বড় বুকের পাটা!

ভবনাথ অত সাহস করলেন না। প্রতিবেশী মুসলমানেরা কোনো ভরসা দিতে পারল না। কেউ কেউ বরং বলল, আর দেরি করবেন না পালমশাই, আমরা আপনাদের বাঁচাতে পারব না।

দীপালীরা চলে এল। টাকাকড়ি সামান্য যা সঙ্গে আনতে পেরেছিল, সারা পথে ছড়াতে ছড়াতে আসতে হ'ল। তা না হলে মান-প্রাণ নিয়ে এপারে এসে পৌঁছতে পারত না।

আসবার সময় কানুদার সঙ্গে দেখা হ'ল না। সে তখন ঢাকায়। তারপরেও অনেকদিন তাদের খবর পায়নি। এই মাস কয়েক আগে কে যেন বলছিল তার বাবাকে, ওদের চলে আসবার মাসখানেক পরেই জগৎ বোসকে খুন করে টাকাকড়ি জিনিস-পত্তর সব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা। বাড়ির লোকেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে বলতে পারল না।

আরেকবার পিছনের দিকে চোখ ফেরাল দীপালী। ভিড়ের আড়াল থেকে ভালো করে দেখল। কোথায় গেছে সে রঙ? সারা মুখখানা রোদে পোড়া, কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চোখের সে জ্যোতি নেই, যেন কত বয়স হয়ে গেছে এই ক'টা বছরের মধ্যে। একবার ইচ্ছা হ'ল দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে। কিন্তু যদি চিনতে না পারে? সামনে দিয়েই তো এল। চিনল কই? একটু অভিমান হ'ল। পরক্ষণেই সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল দীপালী। ছিঃ ছিঃ, কী ছোট মন তার! কানুদা তাকে চিনবে না? 'দীপু'কে ভুলে যাবে? তাই কখনো সম্ভব? কত মেয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ করে একজনকে লক্ষ্য করেনি। করার কথাও নয়।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে আবার সামনের দিকেই পা চালিয়ে দিল। ফিরে যাওয়া

হ'ল না। লজ্জায় পড়বে কানুদা। কোথায় ছিল আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো মনে মনে বিরক্ত হবে, যেমন অনেকেই হয়, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়-স্বজন। আজকের দুঃস্থ রূপটা আপনজনের কাছে ব্যক্ত হোক, এটা কিছুতেই সইতে পারে না। দেখা হলেই 'কি ছিল' তাই নিয়ে মিথ্যা দম্ভ, 'কী হয়েছে' তাকে ঢেকে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা। কানুদাও কি তাই করবে কে জানে! মানুষ বড় বদলায়। বাইরের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটাও। জীবনের শ্রী যখন চলে যায়, মনের উপরেও সেই মালিন্যের ছাপ পড়ে।

তাছাড়া, কী হবে দেখা করে?—যেতে যেতে নিজের মনকে বোঝাল দীপালী, তাতে আজ কোনো তরফেই কোনো লাভ নেই। ট্রেনে উঠে ভাগ্যক্রমে একটা কোণ জুটে গেল। চোখের উপর রইল মাঠঘাট, গাছপালা, বাড়ি-ঘর, আর মন জুড়ে রইল ফুটপাথে ফেলে আসা সামান্য একটা দৃশ্য, এবং তাকে ঘিরে কতদিনের কত কথা!

আসবার দিন যদি থাকত কানুদা! হয়তো তাদের সঙ্গে চলে আসত। একটি অসহায় বুড়োমানুষের সঙ্গে অতবড় বিপদের মুখে তাদের ছেড়ে দিত না।

বিপদ কি শুধু ওপারে? এপারে পৌঁছেও কত ঝড় গেছে তাদের উপর দিয়ে। কত লাঞ্ছনা, কত গ্লানি, কত অভিশাপ।

ধুবুলিয়া ক্যাম্পের সেই দিনগুলো মনে পড়লে সারা শরীর পাক দিয়ে ওঠে। সবে পনরোয় পা দিয়েছে তখন। স্বপ্ন দেখবার বয়স। দু'চোখ মেলে যা দেখবে, সব রঙীন, রমণীয়। তার জায়গায় কী দেখে এল, মানুষের কী বীভৎস রূপ, জীবনের কী কুৎসিত ছবি! আঘাতে আঘাতে সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। চূর্ণ হয়ে গেল সব বিশ্বাস, সব শ্রদ্ধা।

অথচ লোকগুলো যখন এল, ঠিক এল নয়, দলে দলে শিশু থেকে বুড়ো নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষগুলোকে কারা যেন বাক্স-প্যাঁটরার মতো গাদা করে এনে ফেলল একটা বিশাল রোদে-পোড়া মাঠের মধ্যে, গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট খুপরির গর্ভে, যার নাম রিফিউজি ক্যাম্প, তখনো তারা বাইরে যাই হোক, মনের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে যায়নি। শ্রদ্ধা-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, একের প্রতি অন্যের সমবেদনা, লজ্জা-সঙ্কোচ, আব্রু, সংযম, ন্যায়-অন্যায় বোধ—সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু মৌলিক উপাদান, সবই তাদের ছিল। এখানে বসে বসে দেখতে দেখতে সব হারিয়ে ফেলল। কী ভয়াবহ সে বিবর্তন! পরিবেশের এমন প্রচণ্ড শক্তি, মনুষ্যত্বের সর্বশেষ বিন্দুটুকুও যেন নিংড়ে বের করে নিল অত-গুলো নরনারীর বুকের ভিতর থেকে। কেউ আর মানুষ রইল না।

দীপালীর বয়স তখন পঞ্জিকার মাপে পনরো, কিন্তু অভিজ্ঞতার খাতায় অনেক বেশী। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, তার চারদিকে একদল নখী, দন্তী, শৃঙ্গী অহরহ উদরের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছলে বলে কৌশলে দুটি অন্ন-সংগ্রহ। তার জন্যে কে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, যেখানে নামতে হয় নামবে। ক্ষুধা। ক্ষুধাই একমাত্র চরম সত্য জীবনে। আর তার সঙ্গে জড়ানো—

মনে আসতেও সারা দেহ কুঁচকে ওঠে দীপালীর—সেও আরেক রকমের ক্ষুধা। আরো ভয়াবহ, লজ্জাহীন, আব্রুহীন, বাছবিচারহীন।

তার কবলে পড়ে কত ফুলের মতো মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আজও তাদের কারো কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কলকাতার জনারণ্যে। বাইরেটা দেখে বোঝা যাবে না, দীপালী জানে ভিতরে ভিতরে এখনো তারা সেই অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ওখানে একবার নামলে আর কূলে ওঠা যায় না। সবাই কি বাধ্য হয়ে নেমেছিল? কেবল মাত্র অবস্থার বিপাকে পড়ে? না। কেউ যে স্বেচ্ছায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, এই কঠোর সত্যটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দীপালী জানে। কিন্তু কি ছিল তার পিছনে, প্রলোভন, না প্রবৃত্তির তাড়না, কিংবা অন্য কিছু, তার জানা নেই। দীপালীও হয়তো একদিন ওদের দলে গিয়ে ভিড়ত। হাতে-খড়ি তো ওখান থেকে হয়ে গিয়েছিল। সেই মেঘে ঢাকা বিকেলটা যদি মুছে ফেলা যেত জীবন থেকে! কিছুতেই তা হয় না। উঠতে বসতে যখন তখন সে সামনে এসে দাঁড়ায়, গাঢ় ছায়া ফেলে ঢেকে দেয় অনাগত দিনের সমস্ত আলো।

তখন সবে এসেছে ক্যাম্পে। পাশের ঘরের একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। রোজ বিকেলে তার এক দাদার সঙ্গে বেড়াতে যেত। একদিন বলল, যাবি? চল না একটু ঘুরে আসবি। দীপালী বলেছিল, না; মা বকবে।

—আচ্ছা, আমি বলছি মাসিমাকে।

দীপালীর মা মেয়েকে চোখে চোখে রাখতেন। কখনো বেরোতে দিতেন না। সেদিন বোধহয় মায়া হ'ল। সারা দিন রাত একটা ছোট্ট গুদামের মধ্যে বন্ধ থেকে থেকে এরই মধ্যে আধখানা হয়ে গেছে মেয়েটা। বললেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস।

মা মনে করেছিলেন, প্রকাশ্য দিনের আলোয়, চারিদিকে এত লোক গিজগিজ করছে, ভয় কিসের? তিনি জানতেন না, গভীর অরণ্যে যেমন দিন রাত বলে কিছু নেই, সেখানকার অধিবাসীরা বাধা-বন্ধনহীন, সকলের সামনে সব কিছু করতে পারে, এই ধুবুলিয়ার মাঠের মানুষগুলোও তেমনি বনচারী পশুর মতো বন্ধন-মুক্ত। লোক-লজ্জার অন্তরালটুকুও চলে গেছে। দীপালীও কি ভাবতে পেরেছিল সেকথা?

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছিল ঠিক, কিন্তু চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে বাধা দিতে গিয়ে দেখল চারদিকের চোখে সেটা অতি বেমানান, হাস্যকর।

মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করলে পাছে নগ্ন সত্যটা সাপের মতো বেরিয়ে পড়ে, তাই বোধহয় তাকে ঝাঁপির মধ্যেই থাকতে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ওখান থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়া যায়।

বিরাটীর এই জবর-দখল কলোনীর সন্ধান যেদিন এল, ক্যাম্পের কয়েকজন লোক গোপনে খবর নিয়ে এল ভবনাথের কাছে, তিনি প্রলুব্ধ হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারলেন না। ঐ 'জবর' কথাটায় বাধল। জোর করে

পরের জমি দখল করবেন ? মাস্টার মানুষের মন সায় দিল না। কিন্তু দীপালীর মা-র মনে এতটুকু দ্বিধা দেখা দিল না। তাতে কী হয়েছে ? এত লোক যাচ্ছে।

ভবনাথ অন্য যুক্তি পাড়লেন, পরে যদি বিপদে পড়তে হয় ? মালিক এসে যদি জোর করে তুলে দেয় ?

—সে তখন দেখা যাবে।

বিপদ সত্যিই এসেছিল। একবার লাঠিসোঁটা নিয়ে মালিকের লোক, আরেকবার পুলিশ। কিন্তু ততদিনে অনেক লোক এসে বসে গেছে। মারধোর খেয়েও উঠল না। তারপর রফা হয়ে গেল সরকারের সঙ্গে। কাউকে উঠতে হবে না। কিছুদিন আগে পাকা দলিল এসে গেছে। ওরা বলে অর্পণ-পত্র।

প্রথমে সকলের সাহায্যে একটি টিনের চালা তুলেছিলেন ভবনাথ, কিছুদিনের মধ্যে ঐ কলোনীর স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেলেন, তার সঙ্গে গোটা দুই টিউশানি। তারই উপর ভরসা করে কো-অপারেটিভ থেকে কিছু ধার নিয়ে দু'খানা ঘর তুলেছেন। পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে, উপরে টালি। ছেলে-মেয়েরাও পড়াশুনো করছে। কোনো রকমে চলে যায়। ইদানীং শরীরে ভাঙন ধরেছে। প্রায়ই অসুখে পড়েন। বয়সও হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা মেয়ের বিয়ে।

মেয়ে অবশ্য তা ভাবছে না। তার লক্ষ্য একটি চাকরি।

বি. এ. পরীক্ষার এক বছর দেরি। এখন থেকেই খবরের কাগজ দেখে দরখাস্ত পাঠাতে শুরু করেছিল। জবাব বড় একটা আসত না। একদিন একখানা সরকারী খাম এসে হাজির। খুলে, খুশী হবার কথা, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অথচ দরখাস্ত যেদিন করে তারপর থেকে আশায় আশায় দিন গুণছে। তার অঙ্কুর যখন দেখা দিল, ভিতর থেকে আর চাড় এল না।

শেষকালে পুলিশ হবে ! পুলিশের দারোগা !

সবে তখন পুলিশ বিভাগে একটি নারী-বাহিনী গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। তার মধ্যে থাকবে কয়েকজন সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর। দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে অন্ততঃ আই. এ. পাস, দীর্ঘাঙ্গী, সবলদেহী তরুণীদের কাছ থেকে। দীপালী যেমন সব জায়গায় দেয়, তেমনি এখানেও একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল। ইণ্টারভিউ-এর ডাক এসে গেছে।

ইতিমধ্যে 'নারী-পুলিশ' কথাটা হাসি-ঠাট্টা এবং কোথাও বিরূপ সমালোচনার খোরাক যোগাতে শুরু করেছিল। খবরের কাগজে কার্টুন দেখা দিয়েছিল দু' চারটা। রক্ষণশীল মহলে প্রচুর ক্ষোভ। একটি ভদ্রঘরের মেয়ে পুলিশের পোশাক পরে চোর-ডাকাত ধরতে বেরোবে ! দৃশ্যটাই অশোভন। তাছাড়া পুলিশ হলেও সে মেয়ে, যুবতী মেয়ে। তাকে রক্ষা করবে কে ? রক্ষিকা যদি ভক্ষিতা হয়, তখন ?

বাবা-মাকে না জানিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এল দীপালী। সংসারের দিকে চেয়েই মনস্থির করে ফেলল। বাবা আর বেশী দিন নেই। ছোট ভাই দু'টো স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। এদিকে চাকরির যা বাজার ! এত দরখাস্ত তো পাঠাল।

সাড়া বলতে এই একটি। একে অবহেলা করা যায় না।

ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে অনেকটা ভরসা পেল। তার মতো আরো মেয়ে এসেছে। সকলেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। যেমন তেমন একটা চাকরি চাই। ভেঙে-পড়া কিংবা ভেঙে পড়তে উদ্যত সংসারকে তুলে ধরার মতো যাহোক একটা খুঁটি। অশক্ত বাপ-মা, অক্ষম কিংবা অপোগণ্ড ভাইবোনদের অভাবের গ্রাস থেকে কোনোরকমে বাঁচাবার জন্যে কোনো একটা অবলম্বন। তার চেহারা নিয়ে বাছ-বিচারের অবকাশ কোথায়? মাস গেলে কয়েকখানা নোট। তার অঙ্কটাই শুধু দেখতে হবে। এখানে যেটা পাওয়া যাবে নেহাত মন্দ নয়। মাইনে, ভাতা, বাড়ি-ভাড়া, সস্তা দরে রেশন, সব মিলিয়ে তাদের মতো একটি ছোট্ট সংসারকে টেনে-টুনে চালিয়ে নেওয়া যাবে। তাহলে আর কী চাই?

ইণ্টারভিউ-এর ধরন দেখে দীপালীর মনে হ'ল চাকরিটা হয়ে যাবে। নারী-পুলিশের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনসপেক্টর। পোশাকের একটা ধারণা পাওয়া গেল। খাকী ট্রাউজার, তার উপরে একই রং-এর বুশ-সার্ট, কোমরে বেল্ট, টেনে বাঁধা খোঁপার উপর টুপি, পায়ে কালো শু। কী কিম্ভূত না দেখাবে! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। যে যুগে এসে জন্মেছে, মেয়ের মেয়েত্ব আর রইল না।

ইণ্টারভিউ যিনি নিচ্ছিলেন, বোধহয় কোনো উঁচুদরের পুলিশ অফিসার, কিন্তু কথাবার্তায় ভদ্র, ব্যবহারে মোলায়েম, হাসিমুখে প্রায় ঐ ধরনের কথাই বলেছিলেন—আপনারা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করবেন, অথচ বলবেন, তোমাদের আর আমাদের ডোমেইন আলাদা, তোমরা রোদে পোড়ো, বৃষ্টিতে ভেজো, আমরা ঘরে বসে সাজি আর সাজাই—তা কেমন করে হবে? আপনি হয়তো বলবেন, কেন, আমরা কি বাইরে বেরোচ্ছি না? চাকরি-বাকরি করছি না? করছেন। কিন্তু তার সীমানাটা বড় ছোট। ডাক্তারি, মাস্টারি, নার্সিং কিংবা বড়জোর কেরানী-গিরি। ওটা আরো বাড়াতে হবে।

আরেকজন বললেন, সেটা এমন কিছু নতুন নয়। আমরা যাদের 'নিম্ন শ্রেণী' বলি, হাটে-বাজারে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় যারা গতর খাটিয়ে খায়, তাদের মেয়েরা তো বরাবরই পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমান তালে কাজ করে আসছে। সেই একই জিনিস এবার দেখা দিচ্ছে আরেকটু উপর স্তরে। যুগের প্রয়োজনেই দিচ্ছে।

দীপালী মনে কবল বাবা-মাকে আগে থাকতে একটু আভাস দিয়ে রাখা দরকার।

ভবনাথের বুকে সর্দি বসেছিল। সে-ই কলেজ থেকে ফিরে রোজ খানিকটা করে পুরনো ঘি মালিশ করে দেয়। সেদিন খানিকক্ষণ দেবার পর একটু সুস্থ বোধ করতে তিনি বললেন, এবার থাক মা। আর কত কষ্ট করবি আমার জন্যে।

—কষ্ট কিসের? সামান্য একটু মালিশ। কয়েক সেকেণ্ড থেমে বলল, এরপর একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলে, তখন তো তোমার কাছে একটু বসতেও পাব না।

ভবনাথ চুপ করে রইলেন। মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তিনি জানতেন, দীপালী চাকরির চেষ্টা করছে। সেটা তাঁর একেবারেই ইচ্ছা নয়, কিন্তু সংসারের দিকে চেয়ে বাধা দিতেও পারেননি।

দীপালীই আবার কথা পাড়ল—হয়তো শীগগিরই একটা পেয়ে যাব।

—কী চাকরি?—এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ভবনাথ।

—অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছি। একটা নিশ্চয়ই লেগে যাবে!...আজকাল তো সব রকম চাকরিই পাচ্ছে মেয়েরা। পুলিশ পর্যন্ত হচ্ছে।

—পুলিশ! হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। নারী-পুলিশ! ঝ্যাঁটা মার দেশের কপালে! যেমন হয়েছে আমাদের গভর্নমেণ্ট, তেমনি হয়েছে মানুষগুলো।

—চাকরিগুলো কিন্তু মন্দ নয় বাবা। আমি খবর নিয়েছি।

ভবনাথ চমকে উঠলেন। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন স্ত্রীকে, ওগো, শুনছ—

দীপালীর মা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকতেই বললেন, তোমার মেয়ে কি বলছে শোনো—

মা জিজ্ঞাসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। সে চুপ করে রইল। ভবনাথই বললে, তোমার মেয়ে পুলিশ হবে। নারী-পুলিশ!

মা কিন্তু চমকেও উঠলেন না, ভয়ও পেলেন না। বেশ সহজভাবে বললেন, তা, কি করবে? পুলিশ-ফুলিশ যাহোক একটা কিছু হতে তো হবেই।

ভবনাথের মুখে আর কোনো কথা সরল না। স্ত্রীকে তিনি এতটুকু থেকে চেনেন। কথাগুলো যে তার অন্তরের কথা নয়, তাঁর চেয়ে কে বেশী জানে!

চিঠি সত্যিই এসে গেল। বাড়ির সকলেই জানল। কেউ কিছু বলল না। ভাই দুটো দিদিকে এড়িয়ে চলল। মা তাদের গোপনে সাবধান করে দিলেন, আশেপাশের লোকগুলো যেন না জানতে পারে।

চাকরিতে যোগ দিতে যেদিন বেরোবে, মাকে প্রণাম করল দীপালী। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বাবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ভাইয়েরা বেশ কিছুটা আগেই স্কুলে বেরিয়ে গেছে।

পুলিশ হলেও অফিসের কাজ। লালবাজারে দশটা পাঁচটা ডিউটি। কিন্তু আসতে হয় ইউনিফর্ম পরে। ফলে যেখানে সেখানে 'ট্রাফিক জ্যাম'। শুধু ভিড় নয়, তার ভিতর থেকে নানা সুরের রসিকতা, বিদ্রূপ।

দীপালী বেরোত তার সাধারণ পোশাকে। বৌবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে থাকত সরকারী খাকী সাজ। সেজে নিয়ে কাজে যেত, আবার ফিরে এসে ওগুলো ছেড়ে রেখে ট্রেন ধরতে ছুটত।

এরই মধ্যে আরো কয়েক লাখ উদ্বাস্তু এসে ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা আর তার আশপাশ। খালি জায়গা পেলেই রাতারাতি জবর-দখল। জমির মালিকের কানে যখন খবরটা পৌঁছল, তার আগেই সমস্ত জায়গা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে সারি সারি টিন-টালি-চাটাই-হোগলার চালা। ভিতরে ঘর-

কন্নার কলরব। বাইরে নানা রকম ব্যস্ততা—মাপ-জোখ, রাস্তাঘাট তৈরির আয়োজন, কমিটি বৈঠক। উড়ে এসে জুড়ে বসার কোনো লক্ষণ নেই।

মালিক যদি কোর্টে যান, যথারীতি এবং যথাকালে ইজেক্‌ট্‌মেণ্ট অর্থাৎ উচ্ছেদের অর্ডার বেরোবে। কিন্তু উচ্ছেদ করবে কে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব মালিক সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাদের বেলায় হয়তো পুলিশী সাহায্য মঞ্জুর হবে। কিন্তু পুলিশ এলেই পুরুষেরা প্রায়ই গা-ঢাকা দেয়, এগিয়ে আসে মেয়েরা। কোথাও কোথাও রীতিমত নারী-বাহিনী, এবং বাক্যবাণই তাদের একমাত্র অস্ত্র নয়, তার সঙ্গে অবাধে চলতে থাকবে দা, বঁটি, নোড়া, কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি কিংবা ইট-পাটকেল। অর্থাৎ পুরুষ-পুলিশের হটে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই।

কিন্তু সরকার তো আর হটে আসতে পাবেন না। আইনকে বলবৎ করা তার প্রাথমিক দায়িত্ব। ল' মাস্ট্‌ বি এনফোর্সর্ড। অতএব ডাক পড়ল নারী-পুলিশের।

টালিগঞ্জের দিকে কার একটা পোড়ো বাগান দখল করে বসেছিল উদ্বাস্তুরা। তাদের তুলতে হবে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু তেজ প্রচুর। একটি মাঝারি গোছের পুলিশ ফোর্স পাঠাতে হয়েছে। বন্দুকও আছে কিছু, অফিসারদের কোমরে রিভলবার। তিনটি মেয়ে অফিসার রয়েছে ঐ সঙ্গে। তারাও সশস্ত্র। উদ্দেশ্য অবশ্য মারধোর নয়, যে-সব মেয়েরা তেড়ে আসবে তাদের ভিতর থেকে কিছু গ্রেপ্তার।

পুলিশের সাড়া পেয়ে সারা কলোনীতে চেঁচামেচি, ছুটোছুটি লেগে গেল। একদল মেয়েই বেশি সোচ্চার। ঠিক সামনে তাদেরই জাতের পুলিশ দেখে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর শুরু হ'ল গালাগালি, টিটকারি। 'লজ্জা করে না!' 'পুলিশ সেজে রাস্তায় বেরিয়েছিস!' 'ঘরে কি তোদের মা বোন নেই?' ...ইত্যাদি, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু, যা শ্রাব্য নয়।

ওসব গায়ে মাখতে গেলে চলে না। মেয়ে অফিসারেরা চালাগুলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'দীপু!'

দীপালী চমকে উঠে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কাউকে ঠাহর করতে পারল না। কিন্তু এ স্বর তো কোনোদিন ভুলবার নয়। ঠিক সামনে তক্তপোশের উপর যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁকেও প্রথমটা চিনতে পারল না। পরনে ছেঁড়া থান, মাথায় একরাশ রুক্ষ পাকা চুল, কোটরে ঢোকা চোখ, তার ভিতরে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সারা দেহ কঙ্কালসার। কেমন একটা ভাঙাভাঙা গলা শোনা গেল—কেন যাব, কোথায় যাব? ওখান থেকে মেরেধরে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিল, এখান থেকেও তাড়িয়ে দেবে? আমি যাব না।

এবার চিনল দীপালী। সারা অঞ্চলে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বড়বাড়ির বড়গিন্নী।

'অ্যারেস্ট হার!'...আবার চমকে উঠল দীপালী। কোথায় যেন চলে গিয়ে-

ছিল। উপরওয়ালার হুকুম এক মুহূর্তে তাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সারা দেহে যেন একটা তিক্ত স্রোত বয়ে গেল। নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ইচ্ছা হ'ল এই খাকীর খোলশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এখান থেকে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, বাবা আর উঠতে পারছেন না, এ-জীবনে আর পারবেন না।

পিছন থেকে আবার গর্জে উঠল সেই স্বর—হোয়াট আর ইউ ডুইং! টেক্ হার টু দি ভ্যান্।

হাত দুটো বাড়িয়ে সেই অস্থিচর্মসার বৃদ্ধাকে জাপটে ধরল দীপালী এবং টানতে টানতে নিয়ে চলল অদূরে অপেক্ষমান পুলিশ-ভ্যানের দিকে।

•

ধস

দার্জিলিং যাওয়া কেয়ার এই প্রথম নয়। এর আগে দু'বার ঘুরে এসেছে। প্রথম গিয়েছিল বাবা-মার সঙ্গে, পরের বার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে। দু'বারই শিলিগুড়ি থেকে মোটরে। কেয়ার ইচ্ছা ছিল রেলে যাওয়ার, বিশেষ করে প্রথমবার। তখন স্কুলে পড়ে। ছোট ছোট পাল্কির মতো গাড়িগুলো দেখেই ইচ্ছা করছিল, 'চড়ে বসি'। বড়রা রাজী হননি। বাবা বলেছিলেন, দূর, ওটা আবার রেল নাকি! গরুর গাড়িও ওর চেয়ে আগে যায়।

কেয়া বুঝতে পারেনি, তাড়াতাড়ি যাওয়াটাই কি বড় হ'ল? আস্তে আস্তে যাওয়া মানে দেখতে দেখতে যাওয়া। ঐ দেখাটাই আসল। সে শুনেছিল, রেলে বসে হিমালয়কে যেমন দু'চোখ ভরে, সারা প্রাণ ভরে দেখা যায়, মোটরে তা মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এই রেল লাইনটাই এক বিস্ময়। এঁকে বেঁকে, উঁচুতে উঠে, নীচে নেমে, কখনো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার পিছনে হটে এসে গাড়িগুলো যখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আরেকটা জিনিস ভারি তাজ্জব মনে হয়েছিল কেয়ার। ঐ খুদে এঞ্জিনগুলোর হুঙ্কার। আকারে ছোট হলে কি হয়, প্রতাপ প্রবল। হিং টিং ছট্‌এর সেই লাইনটা মনে পড়ে গিয়েছিল—এতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়!

এবার সে একা যাচ্ছে দার্জিলিং। রেলেই যেতে হবে শিলিগুড়ি থেকে। একটা গোটা মোটরের অনেক ভাড়া। শেয়ারেও যাওয়া যায় না কতগুলো অচেনা লোকের সঙ্গে। কেয়ার খুশী হবার কথা, কিন্তু হ'ল না। মনে তার সুখ নেই। এবারকার যাওয়া আনন্দের যাওয়া নয়, বাধ্য হয়ে যাওয়া।

একা যাওয়াটা মার বিশেষ পছন্দ নয়। বড় ছেলেকে বলেছিলেন, দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আয় ঠাকুরঝির কাছে।

"কী যে তুমি বল মা," ঝাঁজিয়ে উঠেছিল সন্দীপ, "ওর বয়সী মেয়েরা একা একা অ্যাটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাচ্ছে, আর ও এই ঘরের পাশে দার্জিলিং যেতে পারবে না? কচি খুকী আছে নাকি এখনো?"

দাদা ঠিকই বলেছে। কেয়া আর কচি খুকী নেই, বড় হয়েছে। এবার বাইশ

বছরে পড়ল। লেখাপড়াও শিখেছে কিছুটা। বি. এ. পাস করেছে গতবার। বড় হয়েছে বলেই তার মধ্যে একটা বড় জিনিস গড়ে উঠেছে—তার নাম মন। একটা স্বাধীন মতামত দেখা দিয়েছে তার, একটা নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। সেকথা কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না। সেখানে সব অভিভাবক সগোত্র, সমমত—'ও ছেলেমানুষ, ও কী বোঝে ?' দাদাও সেই দলে।

সন্দীপ যখন তাকে একান্তে পেয়ে বলল, কি রে, ভয় পাচ্ছিস নাকি ? কেয়া জবাব দিল না, মুখ ফিরিয়ে নিল। তার বিশ্বাস, দাদা একটু চেষ্টা করলে তার যাওয়াটা আটকাতে পারত। বোনের এই অভিমানটুকু বুঝতে পারল সন্দীপ, কিন্তু কোনো ভরসাই দিল না। অসহায়ভাবে বলল, বাবাকে তো জানিস, এক বার যখন জিদ ধরেছেন। এখনি এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? ঘুরে আয় ; তারপর দেখা যাবে।

কেয়া জানে, দাদার এই 'দেখা যাবে'র কোনো মূল্য নেই।

পিসেমশাই বুড়ো মানুষ। ষ্টেশনে আসতে পারবেন না। কিন্তু পিসীমাকে আশা করেছিল কেয়া। তিনি নেই। এদিক ওদিক যখন দেখছে, একটি পনরো-ষোলো বছরের মেয়ে এসে তাকে প্রণাম করল। কেয়া তার হাত ধরে তুলে বলল, রুপা না ? এত বড় হয়ে গ্যাছ ! একেবারে শাড়িটাড়ি পরে—প্রথমটা তো চিনতেই পারিনি।

"অন্য দিন পরি না। আজ আপনি আসছেন—"

"ও, আমার অনারে ? তা, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে। একেবারে ফুল-ফ্লেজেড্ লেডি।"

রুপা খুব খুশী। নিজের সামনেটা পিছনটা দেখে শাড়ির ভাঁজটাজগুলো রিভাইজ এবং ঠিকঠাক করে নিল। তারপর কেয়ার খুব কাছে সরে এসে চুপি চুপি বলল, আপনি না—ভী-ষ-ণ সুন্দর হয়েছেন দেখতে। মিস্টার ব্যানার্জি একবার দেখেই পছন্দ করে ফেলবেন।

কেয়ার মুখের উপর একটি ম্লান ছায়া পড়ল। রুপা অতশত লক্ষ্য করল না। বলল, এরই মধ্যে দু'দিন এসে ঘুরে গেছেন।

কেয়া এতটুকু মেয়ের কাছে ধরা পড়তে চাইল না। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, তাই নাকি ?

"হ্যাঁ, আপনার খোঁজে।"

"আমার খোঁজ কেন, তোমার খোঁজেও তো হতে পারে।"

"ধ্যেৎ ; আমি কি বলেছি জানেন ?"

"কী ?"

"বলেছি, কেয়েদির আসতে এখনো অনেক দেরি আছে। শুনে ভদ্দরলোকের মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল।"

বলে, খিল খিল করে হেসে উঠল।

কেয়া বুঝল, মেয়েটি বয়সের তুলনায় একটু বেশী পাকা। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বলল, পিসীমা, পিসেমশাই ভালো আছেন ?

রূপা বলল, জ্যাঠাইমা তো এখানে নেই। গোরখপুর গেছেন, ওঁর কে এক দিদি আছেন, তাঁকে দেখতে। তাঁর অসুখ কিনা। আর জেঠু চুপচাপ শুয়ে আছেন।

রমানাথ রায়ের বাড়িটা স্টেশন-লেভেল থেকে অনেক নীচে। চারদিকে বাড়ি-ঘরও কম। একটা নেপালী বস্তি আছে কিছুটা দূরে। জায়গাটা সস্তায় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া অতটা প্লেন জমি দার্জিলিংএ দুর্লভ। বাড়িটা ছোট্ট, খানচারেক ঘর। তার বেশী দিয়ে হবেই বা কী? নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী। রূপা ওঁদের এক গরীব আত্মীয়ের মেয়ে। মা নেই, ওঁরাই মানুষ করেছেন, একেবারে মেয়ের মতো। স্কুলে উপরের দিকে পড়ে। বেশ চালাক-চতুর, কাজেকর্মে চৌকশ। তাই তো বৃদ্ধ রুগ্ণ স্বামী আর সংসারে সব ওর হাতে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পেরেছেন মিসেস রায়।

এখান থেকে বাজার বেশ দূরে, অনেকখানি চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। তবে এঁদের বড় একটা দরকার হয় না। বস্তি থেকেই প্রায় সব কিছু পান—মাটন, ডিম, দুধ, ঘি করবার জন্যে ঢেলা মাখন। বাড়ির চারধারে বড় কম্পাউন্ড, সেখান থেকে আসে তরিতরকারি। ওঁদের আর প্রয়োজন কতটুকু? বাকীটা বিক্রি হয়। মালী আছে, সে-ই সব করে। তাছাড়া একটি চাকরও আছে, আর আছে একটি অনেক দিনের নানী (ঝি), আপনজনের বাড়া।

পরদিন বিকেলেই প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি এসে উপস্থিত। মাউন্ট্ এভারেস্ট হোটেল থেকে অনেকখানি উৎরাই। কানপুরে একটা মস্ত বড় কাপড়-কলের বড় চাকরে। টেক্সটাইল এঞ্জিনিয়ারিংএ বিলিতী ডিগ্রী আছে, তার উপরে ল্যাংকাশায়ারের ট্রেনিং। মিসেস রায়ের ছেলেবেলাকার সইএর ছেলে। তিনিই লিখেছিলেন, তুমি তো ভাই দার্জিলিংএ আছ। বাংলা দেশ, বেড়াতেও যায় অনেক লোক। দেখো তো ভাই, একটি ভালো ঘরের ভালো মেয়ে পাও কি না আমার পদুর জন্যে!

মিসেস রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, আর দেখতে হবে কেন? আমাদের কেয়াই তো রয়েছে। সব দিক দিয়ে মানিয়ে যাবে।

দেখাশুনোর ব্যাপারটা কোথায়, কেমন করে ব্যবস্থা করা যায়, এই নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে, আপনা থেকেই তার সুযোগ জুটে গেল। তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে এল প্রদ্যোৎ। মা বলেছিলেন সইএর বাড়িতে উঠতে মিসেস রায়ও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোতের সেটা মনঃপূত হ'ল না। হোটেলেই উঠল। মিসেস রায় দাদা বৌদিকে চিঠি লিখে দিলেন, কেয়াকে যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা স্বভাবতঃই এ সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। কোথায় পাওয়া যাবে এরকম ছেলে? যেমন কৃতী, তেমনি দেখতে-শুনতে (কেয়ার পিসীমা ছেলের একটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন), তেমনি জানাশুনোর মধ্যে। কেয়াকে যদি চোখে লেগে যায়, খরচপত্রের দিকে তাঁরা কিছুমাত্র কার্পণ্য করবেন না।

কেয়া এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিল। প্রথমটা ক্লাস কামাই, পরে শরীর খারাপ—এই ধরনের দু'-একটা ওজর দেখাবার চেষ্টা করেছিল। বাবা সব নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রদ্যোৎ আসতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল রূপা। দু'চোখে একটি বিশেষ ইঙ্গিত করে বলল, এসে গ্যাছেন।

"কে ?" বুঝতে পারলেও না-বুঝবার ভান করল প্রদ্যোৎ।

রূপা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, খবর পেলেন কী করে ? বুঝেছি, একেই বলে ইনটিউশন, আমাদের হেডমিস্ট্রেস বলছিলেন সেদিন।···বসুন, একটু দেরি হবে।

রমানাথবাবু দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রূপাকে ডেকে বললেন, ওদের চা-টা দে, আর বেলা পড়বার আগেই একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয়।

প্রদ্যোৎ আর কেয়ার দিকে ফিরে যোগ করলেন, কাছেই একটা ছোট্ট ন্যাড়া পাহাড় আছে, যেখানে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার এমন একটি ভিউ পাবে, যা অবজারভেটরী হিল্ বা অন্য কোনো জায়গা থেকে পাবে না। আমি যখন সুস্থ ছিলাম রোজ গিয়ে বসে থাকতাম সেখানে। দার্জিলিংএর সব চেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় মহিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা। খুব ভালো সময়ে এসেছ তোমরা। মেঘ-টেঘ তেমন নেই। সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাবে। যাকে বলে নিবাবরণ রূপ।

তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। রূপা বলল, কোনদিকে যাবেন ? জেঠুর ঐ ন্যাড়া পাহাড়ে না গেলে কিন্তু উনি মনে মনে কষ্ট পাবেন। তবে যদি না গিয়ে বলে দেন, বাঃ, কী সুন্দর ! এ রকমটা আর দেখিনি, তাও পারেন।

কেয়া বলল, না, না, তা কেন বলবো ? চল না, দেখে আসি।

প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল শহরের দিকে ওঠা। বটানিক্যাল গার্ডেন, ম্যাল, অবজারভেটরী হিল। সেটা চেপে গিয়ে বলল, বেশ তো।

ন্যাড়া পাহাড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রূপা বলল, আরেকটু নীচে নামলেই শ্মশান। যাবেন নাকি ?

"না, না, শ্মশানে গিয়ে কী হবে ? ওটা আবার একটা বেড়াবার জায়গা নাকি ?" বেশ জোরের সঙ্গে আপত্তি জানাল প্রদ্যোৎ।

রূপা মুখ টিপে হেসে বললে, ভয় প্যাচ্ছেন বুঝি ?

"ভয় পাবো কেন ? ভয়-টয় আমি পাই না। ওসব জায়গা আমার ভালো লাগে না। কখনো যাইনি।"

কথার সুরে রূপার মনে হ'ল, ভদ্রলোক সত্যিই একটু ভয় পেয়েছেন।

চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দার্জিলিং পুরো শহর হয়ে গেছে। মানুষের হাতে মার খেয়ে খেয়ে প্রকৃতি সেখান থেকে পলায়মানা। কোথায় গেছে বার্চ হিলের সেই শান্ত-গম্ভীর নিথর-নির্জন বৃক্ষশোভা ? বড় বড় ইমারতে ছেয়ে গেছে গোটা অঞ্চল, আর তার মধ্যে কিলবিল করছে মানুষ। এতদূরে জনারণ্যের চাপ এসে পৌঁছয়নি। তাই অরণ্যের শ্যামল রূপটি অনেকখানি অক্ষত।

বেশ ভালো লাগছিল কেয়ার। দু'চোখ মেলে দেখতে দেখতে চলেছিল।

একটা মোড়ে এসে দু'ধারে গাছপালা ঘেরা একটা সরু পথ দেখিয়ে বলল, এ রাস্তাটা কোথায় গেছে রূপা ?

"ওঠা গেছে কালিম্পংএর দিকে। পাহাড়ীরা ওখান দিয়ে শর্টকাট করে। দু'ধারে হাজার রকমের গাছপালা, আগাগোড়া মস্ দিয়ে মোড়া। ভারী মজা লাগে দেখতে। গাছগুলো যেন শীতের ভয়ে সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাই নাকি! চল তো দেখি কি রকম।"—উৎফুল্ল হয়ে উঠল কেয়া। প্রদ্যোতের মুখের ভাব আর চলার ধরন দেখে মনে হ'ল, তার মোটেই ইচ্ছা নেই ঐ জংলা পথে ঢুকতে। কিন্তু 'না' বলাটা সৌজন্যে বাধে বলেই বোধ হয় এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল পথটা বেঁকে গেছে, সামনের দিকটা বন্ধ। রূপা বলল, বছর দেড়েক আগে ভীষণ ল্যান্ড্ শ্লিপ হয়েছিল এখানটায়। একটা গোটা পাহাড় ধসে পড়ে পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ কিছু লোকও চাপা পড়েছিল।

"ল্যান্ড্ শ্লিপ!" চমকে উঠল প্রদ্যোৎ। "তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই।"

রূপা হেসে উঠল। তারপর সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলল, ভয় নেই আপনার। ল্যান্ড্শ্লিপ হয় বর্ষাকালে। এ সময়ে হবে না।

গাছ থেকে টুপ করে একটা কি পড়ল ওদের সামনে। প্রদ্যোৎ বলে উঠল, কী ওটা ?

"জোঁক।"

"জোঁক! কী সর্বনাশ! এ কোথায় নিয়ে এসেছ! গাছের ওপর থেকে জোঁক পড়ে!"

"তাই তো পড়ে। সেঞ্চল লেক্-এ গিয়ে দেখুন না। এখানে তো একটা দুটো। ওখানে জোঁকের বৃষ্টি হচ্ছে।"

জোঁক জিনিসটা কেয়ারও বিশেষ পছন্দ নয়। সে বলল, চল, এবার ফেরা যাক।

ফিরে এসে আরেক দফা চা। তারপর ওদের দু'জনকে ড্রইংরুমে রেখে চলে গেল রূপা। ওদিকে তার অনেক কাজ।

রাত্রে বেশ ঠান্ডা পড়ল। খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে রূপা বলল, এখনি যেন কম্বল মুড়ি দেবেন না। আমি একটু পরেই আসছি।

"না, না, কম্বল মুড়ি দেবো কী ? এসো না, তোমার যখন খুশি।"

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে ঝুপ করে কেয়ার পাশে বসে পড়ল রূপা। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে স-ব বলতে হবে।

"কী স-ব!" বিস্ময়ের সুর কেয়ার।

"দেখুন, আমার চোখকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।"

"কী দেখেছ তুমি ?"

"আপনি আগাগোড়া গোমড়া মুখ করে বসেছিলেন। আর ভদ্দরলোকের কী

চেষ্টা একটু হাসাবার জন্যে। কথাবার্তাও কিছু বলেননি আপনি। শুধু 'হুঁ' 'হাঁ', আর 'না'।"

"তাছাড়া আর কী বলবো ?"

"তাছাড়া আর কী বলবো! আমাকে বুঝি ছেলেমানুষ পেয়েছেন? না, সত্যি কেয়াদি, বলুন না। এঁকে আপনার পছন্দ নয়, বুঝতে পারছি। তার মানে, আরেকজন কেউ আগে থেকেই—তাই না ?"

"ওসব বাজে কথা থাক। এসো, দার্জিলিংএর গল্প করি।"

রূপা খানিকটা সরে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস সুরে বলল, থাক, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি যাই।

"অমনি বুঝি রাগ হ'ল মেয়ের!" বলে, ওর হাতটা ধরে ফেলল কেয়া। খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, সে সব কথা জেনে তুমি কী করবে ?

"দেখি কিছু করতে পারি কি না।"

সেরকম কোনো আশা অবশ্য ছিল না কেয়ার। কিন্তু তার মন তখন এমন ভারাক্রান্ত যে কারো কাছে সে ভারের কিছুটা নামিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। এই মেয়েটি তাকে ভালবাসে। তারও ওকে শুরু থেকেই ভালো লেগেছিল। তাই যদিও ও সত্যিই ছেলেমানুষ এবং দু'জনের পরিচয় অতি সামান্য, তবু ওর কাছেই জীবনের কয়েকটি গোপন পাতা খুলে ধরল। রূপা যা আন্দাজ করেছিল আরেকজনের আবির্ভাব ঘটেছে তার ভাগ্যাকাশে, কিন্তু ভাগ্য তাদের দিকে মুখ তুলে চাইছে না। উভয় তরফেই কথা দেওয়া হয়ে গেছে। বাধ সাধছেন বড়রা, যা হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাবা। তাঁর ইচ্ছা তাঁর মনোমতো একটি 'ভালো' পাত্র। এর চেয়ে 'ভালো' আর কে আছে? রূপার মুখে প্রবীণা অভিভাবিকার গাম্ভীর্য। সেই সুরেই বলল, পাত্তর হিসেবে ওঁরা তাকে নিরেস মনে করছেন কেন? কাজ-টাজ কিছু করেন না বুঝি?

"করে; একটা প্রাইভেট কলেজে পড়ায়।"

"প্রফেসর! সে তো খুব ভালো চাকরি। ইনিই বা কী? ভারী তো একজন এঞ্জিনিয়ার!"

"তুমি তো বলছ ভালো চাকরি। ওঁরা দেখছেন, সে তিন অঙ্ক, ইনি চার।"

"তার মানে ?"

"মানে, সে ছ'শ টাকা মতো পায়, আর এর মাইনে হাজারের ওপর। ইনি প্রায় ছ ফুট, আর সে বেচারা পাঁচ ফুট ছয়। সে যে সবদিকেই খাটো।"

"দেখতে ?"

কেয়া চোখ বুজল। শিয়ালদ স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে দেখা নিশীথের শ্যামবর্ণ শুকনো মুখখানা স্মরণ করে তার মুখেও একটা করুণ মালিন্যের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, না, দেখতেও সে এমন কিছু অপরূপ নয়।

"আর, ইনিই বা কি আহা মরি?" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রূপা, "সাদা, ফ্যাকাশে রং, ঘোড়ার মতো মুখ, কামিয়ে কামিয়ে গাল দুটো কালচে ধরে গেছে,

খাঁড়ার মতো নাক, শণের মতো একমাথা চুল, গায়ে মাংস নেই, এদিকে এই লম্বা তালগাছ ! আমার তো একটুও ভালো লাগে না ভদ্দরলোককে।”

ঠোঁট বেঁকিয়ে কপাল কুঁচকে পাকা গিন্নীর মতো রায় দিয়ে দিল।

মিসেস রায় ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁর এক ভাই, বয়সে প্রৌঢ়, আর একটি যুবক ভাইপো। কেয়াকে দেখে খুব খুশী। চিবুক ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কন্যা-সমা ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখখানা ভালো করে দেখে আরো খুশী হয়ে উঠলেন। স্বগতোক্তির মতো বললেন, পছন্দ অমনি না করলেই হ'ল !

রূপা ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। বলে উঠল, আগের চেয়ে আরো কত সুন্দর হয়েছে কেয়াদি। স্টেশনে প্রথম দেখে আমার তো তাক লেগে গিয়েছিল।

“হবে না ? কী রকম সুন্দরের বংশ !”

কেয়ার দিকে চেয়ে আড়ালে চোখ টিপল রূপা। অর্থাৎ এই ফাঁকে নিজের সম্বন্ধেও একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব প্রকাশ করলেন জ্যাঠাইমা। তা তিনি পারেন। যৌবনে তিনিও কেয়ার মতো কেন, বোধ হয় তার চেয়েও রূপসী ছিলেন।

রূপাকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রদ্যোৎ এসেছিল কি না, ক'দিন এসেছিল, ওদের দু'জনের আলাদা দেখাশুনো হয়েছে কি না, তাকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করা হয়েছে তো ? ইত্যাদি। রূপা কেয়ার দিকটা বাদ দিয়ে বাকী সবটুকু জানিয়ে দিল জ্যাঠাইমাকে।

খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই চাকর সঙ্গে করে বাজার করতে বেরোলেন মিসেস রায়। ঐ সঙ্গে মাউণ্ট্ এভারেস্টেও যাবেন। প্রদ্যোৎকে বলে আসবেন, পরদিন এখানে লাঞ্চ খাবে। তাঁর বেরোবার ঘণ্টা তিনেক পরে প্রদ্যোৎ এসে হাজির। রূপা জিজ্ঞাসা করল, জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

“না তো। তিনি ফিরেছেন নাকি ?”

“আপনার হোটেলেই তো গেলেন।”

“আমি লাঞ্চের পরেই বেরিয়ে পড়েছি। বড্ড মিস্ করা গেল।”

“তাতে কী হয়েছে ? সন্ধ্যার আগেই তো ফিরছেন। ততক্ষণ—” বলে চাপা হাসির সঙ্গে চোখে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। তারপর জুড়ে দিল, “এখ্-খুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।…হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাকে বলা দরকার।”

শেষ বাক্য দুটি বলবার ধরনটা এমন সিরিয়াস অর্থাৎ গুরুগম্ভীর যে, প্রদ্যোৎ শুনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। বাড়িতে আছেন রমানাথবাবু, তিনি তো শয্যাগত। আর আছে কেয়া। অতিথি দু'জন বেরিয়েছেন শিকারে। ওদের বাড়ি থেকে অনেকখানি নীচে কোথায় একটা জঙ্গল আছে। পাখি-টাখি পাওয়া যায়। এখানে হঠাৎ এসে পড়বার মতো কেউ নেই। তবু ভিতর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল রূপা। প্রদ্যোৎ বসেছিল সোফায়। তার ঠিক সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটুখানি কি ভাবল। মুখখানায় একটি শোকের ছায়া ফুটিয়ে তুলল। তারপর করুণ দুটি চোখ তুলে বলল, ব্যাপারটা বড় স্যাড্। সেদিন সেই ল্যাণ্ড্‌শ্লাইডের কথা বলছিলাম না আপনাকে ? তাতে

অনেক লোক চাপা পড়ে মারা যায়। আমার জ্যাঠাইমার ভাই আর ভাইপো ছিলেন তার মধ্যে।

"বল কী!" চমকে উঠল প্রদ্যোৎ।

"ওঁরা, শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেননি। তিনদিন পরে মাটি কেটে ডেড্‌বডি বের করে নীচের ঐ শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হয়। আজ থেকে ঠিক দেড় বছর আগে।"

দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ ফেরাল রূপো। তারপর আবার ফিরে গেল তার কাহিনীতে—"সেই থেকে জ্যাঠাইমা যেন কেমন হয়ে গ্যাছেন। বড্ড ভালবাসতেন ভাই আর ভাইপোকে। নিজের ছেলেপুলে নেই তো। লোকজন এলে বলেন, 'তোমরা ব'সো। শিকারে গ্যাছে আমার ভাই আর ভাইপো। এখ্‌খুনি এসে পড়বে।' উনি নাকি দেখতেও পান, তারা আসছে। আমাদের নানীও নাকি দেখেছে।"

"অ্যাঁ!" প্রদ্যোতের গলা থেকে একটা আঁতকে ওঠার শব্দ হ'ল। ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একরাশ ভয় এসে জমা হ'ল চোখের তারায়।

"ঐ যে জ্যাঠাইমা এসে গ্যাছেন। আপনি যেন এসব কথা তুলবেন না তাঁর কাছে।" বলে উঠে গেল রূপো। এগিয়ে গিয়ে প্রদ্যোতের আসার খবরটা বাইরে থেকেই জানিয়ে দিল জ্যাঠাইমাকে।

মিসেস রায় ঘরে ঢুকেই সস্নেহ কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন, "এই যে, কতক্ষণ এসেছ বাবা?"

প্রদ্যোৎ কি রকম অদ্ভুত গলায় বললে, এই তো।

আমি অন্য রাস্তায় গিয়েছিলাম বলে দেখতে পাইনি। এক রাস্তায় হলেও হয়তো মিস্ করতাম। যা ফগ্ বাইরে। দু'হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি ব'সো। আমি এগুলো ছেড়ে আসছি। পদুকে চা দিসনি রূপা? কেয়াকে দেখছি না। সে কোথায় গেল?"

দুটো গেট বাড়ির। একটা উপরে উঠবার রাস্তায়, আরেকটা ডাউনে, অর্থাৎ ভাঁটার দিকে, রাস্তাটা যেখানে নীচে নেমে গেছে। মিসেস রায় ঢুকেছিলেন প্রথম দরজা দিয়ে। ভিতরে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বললেন, এই যে ওরাও এসে গ্যাছে। আমার ভাই আর ভাইপো। এসে অবধি তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল। আলাপ হলে তুমিও খুশী হবে। ভাইপোটা তোমারই বয়সী, ভারী আমুদে।

প্রদ্যোতের বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। চোখ দুটো আপনা থেকেই চলে গেল নীচের দরজার দিকে। কাচের কপাটের ওপারে দুটি আবছায়া নরমূর্তি, হাতে বন্দুক! আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে!

মিসেস রায় ড্রইংরুম পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই উঠে পড়ল প্রদ্যোৎ। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলেই কুয়াসার মধ্যে মিলিয়ে গেল!

একটু পরেই ফিরে এলেন মিসেস রায়। সঙ্গে তাঁর ভাই আর ভাইপো। শূন্য ঘর দেখে অবাক। "একি! কোথায় গেল ছেলেটা?"

ঘরের বাইরে একবার উঁকি মেরে ডাকলেন, রূপা!

রূপা এল ছুটতে ছুটতে—কী, জ্যাঠাইমা?

"প্রদ্যোৎ কোথায় গেল, জানিস? তোকে কিছু বলে গেছে?"

"না তো। কোথায় আর যাবেন? ঘুরতে-টুরতে গেছেন হয়তো। এখনি এসে পড়বেন।"

"ঘুরতে যাবে কীরে! এই মাত্তর বলে গেলাম বসো। সরোজ আর দীপুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ভারী আশ্চর্য তো।"

যুবকটির মন্তব্য শোনা গেল, "মাথায় বোধহয় একটু ছিট আছে।"

"একটু নয়, বেশ একটু।" যোগ করল রূপা।

"সেকী!" মিসেস রায় রূপার দিকে ফিরলেন।

"হ্যাঁ, ক'দিন ধরে দেখছি তো। কেমন কেমন যেন।"

"তাহলে আর এগিয়ে দরকার নেই দিদি।"

ধীরভাবে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, "একটা ছিটগ্রস্ত ছেলেকে জামাই করা যায় না।"

মিসেস রায়কে বড় চিন্তান্বিত দেখাল।

রমানাথবাবুর কানে যখন খবরটা গেল, তিনি বললেন, আমারও কিন্তু মনে হয়েছিল ছেলেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কথাবার্তাতেও তেমন ইমপ্রেসড হতে পারিনি। যখন জিজ্ঞেস করলাম, দার্জিলিং-এ কী কী ভালো লাগল বল। একগাদা কি সব বলে গেল, কাঞ্চনজঙ্ঘার নামটা একবারও করল না।

সেদিনটা এই আসে এই আসে করে আশায় আশায় কাটল। পরদিন লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে হোস্টেলে চিঠি রেখে এসেছিলেন। সময় পেরিয়ে গেল। প্রদ্যোৎ এল না। বিকেলে ম্যানেজারকে চিঠি দিলেন। উত্তর এল, তিনি কালই চলে গেছেন।

শুনেই কেয়ার ঘরে ছুটে গেল রূপা। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে এক পাক নেচে নিল। কেয়া যত বলে, ব্যাপার কী? নাচ আর থামে না। তারপর হাতে তুড়ি দিয়ে বলল, কেল্লা ফতে।

"মানে?" ভ্রূ তুলল কেয়া।

"মানে, ল্যান্ডশ্লিপ্, ধস্।…এখনো বুঝলে না? তাহলে শোনো। তার আগে কী দেবে বল।"

একটি রেখা

সাড়ে ন-টা নাগাদ ডাক আসে। ঘড়ি না দেখেও বিদ্যুৎ সময়টা ঠিক বুঝতে পারে। কেমন করে যেন টনক নড়ে ওঠে। টেবিলের টানা থেকে চিঠির বাক্সের চাবিটা হাতে নিয়ে সদর দরজার দিকে যেতে যেতে একটা ক্ষীণ আশা জেগে ওঠে মনের কোণে। ক্রমশঃ সেটা মিলিয়ে যায়। বাক্সের কাছে গিয়ে দেখা দেয় নৈরাশ্য।

না, কিছু নেই। যদি বা থাকে খামের চেহারা এবং শিরোনামা দেখেই ভিতরকার বার্তাটি অনুমান করে নেয়। সেই একই কথা—ইট ইজ রিগ্রেটেড দ্যাট···। চাকরি হয়নি, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে কোনো সেক্রেটারী, ম্যানেজার বা প্রিন্সিপ্যাল। ব্যর্থতার চেয়ে এই ভণ্ডামিটাই অসহ্য মনে হয় বিদ্যুতের। সোজাসুজি লিখলেই হয়, 'তোমাকে নেওয়া হবে না,' তার সঙ্গে এই 'রিগ্রেটের' ভণিতা কেন?

এইটাই সভ্য সমাজের রীতি। রূঢ় সত্যের উপর একটা মিথ্যার আবরণ লাগাতে হবে। কুইনাইনের উপর সুগার-কোটিং। তোমার আসল চেহারাটা যেন কেউ দেখে না ফেলে। তার উপর একটি মোলায়েম মুখোশ লাগিয়ে নাও। বাস্‌এর ভিড়ে ঠেলে ঠুলে এগোতে গিয়ে আশপাশের লোকগুলোর পা মাড়িয়ে দিতে বাধা নেই। শুধু মুখে বলতে হবে 'সরি'। তারই নাম 'কার্টসি', যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সভ্যতার ইমারত।

দু খানা খাম ছিল ডাকবাক্সে। একখানা বিদ্যুতের, আর একখানা ওর বাবার। তাচ্ছিল্যভরে প্রথমটা খুলে আধা-ফুল্‌স্কেপ চিঠিখানায় চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল—'অ্যাঁ!' আরেকবার পড়ল। না, ভুল দেখেনি। কলেজের চাকরিটা সত্যিই হয়ে গেছে। একবারও আশা করে নি। দূরে মফঃস্বলেই হয় না, আর এ একেবারে কোলকাতায়। একটু শহরতলির দিকে। তবু বাড়ি থেকেই যাওয়া চলবে। একবার শুধু বাস্‌ বদল। হলই বা। একেই বলে লাক্‌।

বাবা বাড়ি নেই। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছেন। এতক্ষণে জোর আড্ডা জমে উঠেছে পাশের গলিতে হরিসাধন বাবুর বৈঠকখানায়। গগনবাবু, মথুরবাবু—এঁরাও আছেন নিশ্চয়। অবসর-ভোগী বৃদ্ধদের দল। কাগজ পড়তে পড়তে চলছে আলোচনা। বিষয় সেই একটি—কোথায় এলাম, কোথায় চলেছি আমরা! পনর মিনিট ট্রেন লেট বলে প্যাসেঞ্জাররা ষ্টেশন মাষ্টারকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে, দিন দুপুরে সদর রাস্তায় গুণ্ডারা ছুরি মারছে পুলিশ অফিসারের বুকে, কথায় কথায় ফ্যাক্টরির মজুররা ম্যানেজারকে ঘেরাও করছে, ভাইস্‌ চ্যান্সেলারের নাকের উপর ঘুষি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা।···আরো কত দেখতে হবে কে জানে? এই হয়তো সেই মহাপ্রলয়ের সূচনা, কলিযুগে ঋষিরা যার কথা বলে গেছেন। কিছু থাকবে না। বিধাতার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ লক্ষ্য করেছে, বাবা যখন বাড়ি ফেরেন, সাড়ে দশটা—এগারটা নাগাদ, সারা মুখ থম থম করছে উত্তেজনায়। এই কালটাকে যেন সইতে পারছেন না। যখন তখন যার তার উপর ফেটে পড়েন। সামান্য কারণে, অনেক সময় বিনা কারণে। পরে সেটা নিজেই বুঝতে পারেন। বলেন, নাঃ, আড্ডায় আর যাচ্ছি না। খালি খালি প্রেশার বাড়িয়ে লাভ কি? কাল থেকে ঐ খবর কাগজগুলোও আর ধরছি নে। তাতিয়ে তোলাই যেন ওদের একমাত্র কাজ। একটাও কি ঠাণ্ডা খবর, মিষ্টি খবর থাকতে নেই?

পরদিন আবার কাগজ আসা মাত্র সকলের আগে খুলে বসেন। চা খেয়েই লাঠিখানা নিয়ে গুটি গুটি চলে যান হরিসাধন মুখুজ্যের বসবার ঘরে। নেশা।

আফিমখোররাও রোজ বলে ছেড়ে দেবো। ছাড়তে পারে কি ?

বাবার চিঠিখানা তাঁর ঘরে টেবিলের উপর রেখে বিদ্যুৎ চলে গেল মায়ের কাছে, রান্নাঘরে। বড় ছেলে তড়িৎকে খাইয়ে অফিসে রওনা করে দিয়ে তিনি তখন বাকী রান্নাগুলো সেরে রাখছিলেন। বিদ্যুৎ কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতেই অবাক হয়ে বললেন, এ কী! হঠাৎ পেন্নাম কেন ?

"চাকরি পেয়ে গেছি।"—খুশির সুরে বলল বিদ্যুৎ।

"অ্যা! কোথায়, কী চাকরি ?" বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন অন্নপূর্ণা।

"বাগুইহাটি কলেজে।"

"প্রফেসর ?"

"লেকচারার।"

"ঐ একই হল। এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চাইলেন।" বলে ঘরে গিয়ে আলমারী খুলে একটা টাকা বের করে ছেলের কপালে এবং তার নিজের কপালে ছুঁইয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রাখতে রাখতে বললেন, "কালই কালীঘাটে গিয়ে ষোল আনার পুজো দিয়ে আসতে হবে। কত কাল থেকে ডাকছি মাকে।"

বিশ্বেশ্বরবাবু ফিরলেন যথারীতি এগারটা নাগাদ। ঘরে ঢুকে চিঠিখানা পড়েই পায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন—ওগো, শুনছ ?

পাশের ঘর নয়, পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায় সে ডাক। অন্নপূর্ণা ছিলেন স্নানের ঘরে। সেখান্ থেকেই সাড়া দিলেন কী হল আবার ?

"বেরিয়ে এসো না ? মস্তখবর আছে ; শীগগির।"

দারুণ উত্তেজনা ; তবে ক্রোধের নয়, উল্লাসের। ভিজে কাপড়ের উপর তোয়ালে জড়িয়ে বাইরে এলেন অন্নপূর্ণা।

"খোকার চাকরি হল। আমার সেই ছেলেবেলাকার বন্ধু জগন্নাথ। অনেক করে লিখেছিলাম তো। একেবারে ঠিকঠাক করে চিঠি দিয়েছে। এই দ্যাখ।"

"কী চাকরি ?"

"অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ কেমিষ্ট একটা বেশ বড় ফার্মে।"

"কী আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে আরেকটা চাকরির খবর এসেছে।"

"তাই নাকি ?" হো হো করে হেসে উঠলেন বিশ্বেশ্বরবাবু।

"সেই যে হিন্দুস্থানীরা বলে না, খোদা যখন দেন একেবারে ছপপর ফুঁড়ে দেন। কী চাকরি ওটা ?"

"প্রফেসর। …বাগুইহাটি কলেজে।" খুশী খুশী ভাব অন্নপূর্ণার।

"প্রফেসর !" ভ্রূকুঞ্চিত করলেন বিশ্বেশ্বরবাবু, "পাঁচদিনও রাখতে পারবে না।" চাকরি যদিবা থাকে কোনদিন বোমার ঘায়ে মাথাটা উড়ে যাবে। তার ওপরে আবার বাগুইহাটি! দরকার নেই। তার চেয়ে এটা ভাল চাকরি। বাসা থাকবে বম্বেতে, মাঝে মাঝে আমরাও গিয়ে থাকতে পারবো। কি সুন্দর সহর !

'বম্বে' শুনে মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল অন্নপূর্ণার। বললেন, দ্যাখ, ছেলে কী বলে।

তড়িৎও 'বাগুইহাটিকে' এক কথায় নস্যাৎ করে দিল—"দূর দূর! কলকাতায় মানুষ থাকে?" কি করে যে ডালহৌসি স্কোয়ারে যাই আমি, সে শুধু যারা বাসে-ট্রামে চড়ে, তারাই জানে। ওখানে আবার একটা ছেড়ে আরেকটায় ওঠা। তাছাড়া এই হতচ্ছাড়া সহরে থাকা-খাওয়ার যে সুখ সে তো দেখতেই পাচ্ছ। যা ছোঁবে তাই আগুন। এর তুলনায় বম্বে স্বর্গ। মাইনেও কটা টাকা বেশী। থাকবে আরো বেশী আরামে।

বিদ্যুৎ পড়ল দোটানায়। তার বরাবরের ঝোঁক লেখা পড়ার দিকে। কলেজের চাকরীটা পেলে সেটা চালিয়ে যেতে পারবে। রিসার্চের সুবিধা পাওয়া যাবে। একটা ডক্টরেট যদি জুটে যায় তখন অনায়াসেই ভালো কলেজে আসতে পারবে। তবে কলেজের এবং সেই সঙ্গে গোটা বাংলাদেশের শিকার আবহাওয়া বড় গরম। ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ। একদল তো রীতিমত উচ্ছৃংখল হয়ে গেছে। পড়াশুনা কেউ করছে না, যাদের ইচ্ছা আছে তারাও করতে পারছে না। হাঙ্গামা লেগেই আছে। প্রায় সব কলেজেগুলোই হট্ বেড্ অব পলিটিক্স।

ওদিকে বম্বের চাকরিটা নির্ঝঞ্ঝাট। উন্নতির আশাও আছে। বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া? আজকের দিনে সেটা কেউ ভাবে না। হুট করে ইউরোপে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে ছেলেরা। তবে ও চাকরিতে ঢোকা মানে পড়াশুনোর ঐ খানেই ইতি।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত বাগুইহাটিই স্থির হল। বাবা শুনে বিরক্তির সুরে বললেন, করুক যা খুশি। দাদা বললেন, পরে টের পাবে কতবড় ভুল করল। মা বললেন, যে রকম দিনকাল, বুঝে-শুনে চলিস বাবা। কোন কিছুর মধ্যে থাকিস না।

প্রথম দিন কলেজের গেটে ঢুকতে বিদ্যুতের নজর পড়ল, সারা বাড়িটা যেন স্লোগ্যানের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রং-এর কালিতে, নানা আকারেব হরফে লেখা মতবাদের উদ্ধত ঘোষণা। তার মধ্যে রুচি নেই, সৌন্দর্য-বোধ নেই, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যে শুচি ও শোভনতা, তার লেশটুকুও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিদ্যুৎ চোখ সরিয়ে নিল। ওসব নিয়ে মন খারাপ করা নিরর্থক। ওগুলো সয়ে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে।

ক্যামপাসের ভিতরে এখানে ওখানে ছেলেরা জটলা করছে। তারাও করত তাদের কালে। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা সম্ভ্রম ও শালীনতা ছিল, যার থেকে বোঝা যেত তারা ছাত্র। কিন্তু এদের এই হৈ হল্লার মধ্যে সেই ছাপটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরদিন পড়াতে গিয়ে দেখল ক্লাসরুমের দেওয়ালেও নানা ধরনের স্লোগ্যান—অমুক পার্টির অমুককে ভোট দিন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই, কৃষক মজদুর সব এক হও, ইত্যাদি। বিদ্যুতের মনে হল, সে যেন একটা পলিটিক্যাল র‍্যালীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালের লেখাগুলো যেন সব বড় বড় বক্তা। তারা বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, আর এরা বসে বসে তাই শুনছে। তার বক্তৃতা

এদের কানে যাচ্ছে না। সে শুধু চেঁচিয়ে মরছে!

সেদিনটা গেল। পরদিন ঘণ্টা পড়বার মিনিট পাঁচেক আগে বিদ্যুৎ তার নির্দিষ্ট লেকচার শেষ করে বলল, এবার তোমাদের কাছে একটা অন্য বিষয় পাড়তে চাই। তোমরা এখানে পড়াশুনো করতে এসেছ। তার জন্যে সবার আগে দরকার একটি উপযুক্ত আবহাওয়া, এ কনজীনিয়্যাল ক্লাইমেট। আমার মনে হচ্ছে এখানে তার অভাব আছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি ঐ লেখা-গুলোর কথা বলছি। ওগুলো থাকাতে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে। তার জন্যে যতটা মন দেওয়া দরকার তা দিতে পারছি না, আমিও না, আমার মনে হচ্ছে, তোমরাও না।

কে একজন বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, 'খুব জ্ঞান দিচ্ছেরে।' সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল। আরেকজন বলল, "আপনি কেমিস্ট্রির মাষ্টার", তাই নিয়েই থাকুন। রাজনীতির লেকচার ঝাড়বেন না। আরেকদফা অট্টহাসি।

বিদ্যুৎ আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে 'অভ্যর্থনা' জানাল বিপুল হাততালি ও হট্টগোল।

পরদিন প্রথম ক্লাসে ঢুকবার মুখেই বাধা। চার পাঁচটি ছেলে দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলল, "আপনি নাকি আমাদের স্লোগ্যান নিয়ে আপত্তি করেছেন?"

"তোমাদের স্লোগ্যান সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। ওগুলো ক্লাস-রুমের দেয়ালে লেখায় আমার আপত্তি।"

"ওটা আপনাকে উইথড্র করতে হবে।"

"কেন?"

"স্লোগ্যান আমরা যেখানে খুশি লিখবো। উই হ্যাভ্ এভরি রাইট। আপনার কিছু বলতে যাওয়া মানে অনধিকার চর্চা। উইথড্র করুন যা বলেছেন।"

"না; উইথড্র করবার মত আমি কিছু বলি নি।"

"করবেন না?"—সোজা নাকের উপর তর্জনী তুলল।

"না।"

"আচ্ছা", বলে দলটা শাসিয়ে চলে গেল। বিদ্যুৎ ক্লাসে ঢুকল। সেখানেও গণ্ডগোল। তা সত্ত্বেও পড়ানো শুরু করল। ওদিক থেকে ক্রমাগত বাধা। কেউ শেয়াল ডাকছে, কেউ হো হো করে চেঁচাচ্ছে, একজন পকেট থেকে একটা মাউথ অর্গ্যান বের করে বাজাতে শুরু করে দিল। এদের সংখ্যাটা বেশী নয়। বেশির ভাগ ছেলে চুপ করে বসে আছে। তাদের অনেকের চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন! বোঝা যাচ্ছে, তারা অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে চায়, গণ্ডগোলটা তাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। মুষ্টিমেয় কটা ছেলে যা খুশি করে যাচ্ছে, অধিকাংশের তরফ থেকে সামান্য বাধাও আসছে না।

বিদ্যুৎ গলা চড়িয়ে বলল, যাদের শুনবার ইচ্ছা নেই, তারা অনায়াসে বাইরে যেতে পার। পার্সেণ্টেজ খোয়া যাবে না। উত্তরে নানারকম শ্লেষাত্মক মন্তব্য শোনা গেল, কিন্তু কেউ উঠল না। অগত্যা ক্লাস বন্ধ করে দিতে হল।

কিছুক্ষণ পরে প্রিন্সিপ্যাল বিদ্যুৎকে ডেকে পাঠালেন এবং স্লোগ্যান ঘটিত ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। বিদ্যুৎ আগাগোড়া সব ঘটনাটা খুলে বলবার পর বললেন, ঠিক বলেছিলেন আপনি। কিন্তু চারদিকের হালচাল দেখছেন তো? আমাদেরও তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।

গলা খাটো করে বললেন, ঐটি হচ্ছে পালের গোদা। প্রদীপ বাগচী। ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ওর কথায় গোটা কলেজ ওঠে বসে। আপনার ঐ ব্যাপারটাকে ছুতো করে জেনারেল স্ট্রাইক বাধাবার চেষ্টায় ছিল। আমি বলে কয়ে কোনো রকমে থামিয়ে দিয়েছি। এর পর আর ওদের কাজকর্ম নিয়ে কোনো কথা বলবেন না। করুক ওরা যা খুশি। আমাদের কী? আমরা পড়িয়ে যাবো। ব্যস। কেউ শুনছে কি না শুনছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী?

প্রিন্সিপ্যালের কথায় তাঁর কলেজ পরিচালনারীতির যে আভাস মিলল বিদ্যুৎ তার সঙ্গে একমত হতে পারল না। শুধু তালে তাল দিয়ে কোনো সমস্যাই বরাবরের জন্যে এড়িয়ে চলা যায়না। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যাই হোক, এ নিয়ে সে কোনো আলোচনার মধ্যে গেল না। গিয়ে লাভ নেই।

বি. এ—বি. এস্. সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করেছেন, ছেলেরা নিজের নিজের কলেজে বসে পরীক্ষা দেবে। কারণ? অন্যত্র গিয়ে তারা গোলমাল করে, চেয়ার টেবিল ভাঙে, গার্ডদের মারধোর করে। আশা করা যায় নিজেদের কলেজে সেটা করবে না। 'গোলমাল' এড়াবার কি চমৎকার পথ!

গার্ড দিতে দিতে বিদ্যুৎ মনে মনে হাসছিল। এখানেও তার প্রিন্সিপ্যালের পলিসি। যে সমস্যা সামনে এসে পড়েছে তার পাশ কাটিয়ে যাও। এতে করে যদি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়? সে তখন দেখা যাবে।

এখানে ওখানে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। গোপনে নয়, রীতিমত প্রকাশ্যে। বিদ্যুৎ দুচার জনকে নিষেধ করল, তারা শুনল না। কী করবে সে? ব্যাপারটা এমন ব্যাপক যে বের করে দিতে হলে প্রায় অর্ধেক ছেলে সেই দলে পড়বে। চুপ করে থাকবে?

হঠাৎ নজরে পড়ল ঐ কোণের দিকে একজন বই খুলে লিখছে। বিদ্যুৎ ছুটে গেল—"এ কী করছ!"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন স্যার।"

"না, এ সব চলবে না।"

বিদ্যুৎ বইটা তুলে নিতেই ছেলেটি বলল, "কেন মিছামিছি হুজ্জত করছেন স্যার। আর কোনো প্রফেসার তো আপত্তি করছে না। আপনার এত মাথাব্যথা কিসের?"

সকলের কথা না জানলেও কোনো কোনো অধ্যাপক যে আপত্তি করছেন না, সে খবর বিদ্যুৎও জানে। কাল দুজন প্রবীণ অধ্যাপকের মধ্যে কথা হচ্ছিল। তার কানে গেল—"পরীক্ষার গার্ড দিতে গিয়ে কিন্তু একটা উপকার হচ্ছে, বুঝলেন সন্তোষ বাবু?"

"কী উপকার ?"

"যোগাভ্যাস। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বন্দ হয়ে বসে থাকো। দেখবে না, শুনবে না, মুখ খুলবে না।"

বিদ্যুৎ ততটা পেরে উঠল না। ছেলেটিকে বলল, ওঠো।

"কেন ?" রীতিমত চড়া প্রতিবাদের সুর।

"আনফেয়ার মীনস্ নিলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় না। ইউ আর এক্স্-পেলড্।"—বলে তার খাতাটা তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেল।

আরো চার পাঁচটি পরীক্ষার্থী উঠে এল। কী একটা পরামর্শ হল ওদের মধ্যে। তারপর যে বই থেকে টুকছিল সে গট্ গট্ করে বেরিয়ে চলে গেল। বিদ্যুৎ হলের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মিনিট দশেক পরে বাইরে থেকে কপাটে ঘা দেবার শব্দ পেয়ে ছিটকিনি খুলে দিতেই সামনে দাঁড়িয়ে প্রদীপ বাগচী; সঙ্গে আট দশটি ছেলে। তার মধ্যে যাকে এইমাত্র বের করে দেওয়া হয়েছে, সেও ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে প্রদীপ বলল, "যা, ঢুকে যা।" সে বিদ্যুৎকে একটা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

প্রদীপ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, কেন লাগছেন স্যার আমাদের পেছনে? বুঝতেই তো পারছেন, আপনাদের ঐ ন্যায়, সততা, কর্তব্য-পরায়ণতা আর ঐ ধরনের আরো যে সব বস্তা পচা কথা আউড়ে থাকেন, আমরা তার কোনোটাই মানি না। আপনার সুবিধে না হয় সরে পড়ুন না।

বিদ্যুতের এবার কী করণীয়? এখনই প্রিন্সিপ্যালের কাছে ব্যাপারটা জানাতে ইচ্ছা করল না। সেদিন যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই হয়তো পুনরুক্তি শুনতে হবে। তার চেয়ে একটা লিখিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে। তারপর যা ভাল বোঝেন করুন। কী আর করবেন? প্রদীপ বাগচীকে চটাতে সাহস পাবেন না নিশ্চয়ই।

দিন সাতেক চলে গেল। তার রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না প্রিন্সিপ্যাল। সেও আর ও নিয়ে কোনো কথা তুলল না। বোঝাই তো যাচ্ছে, তার ঐ এক সীট কাগজের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর ড্রয়ারের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। সেখান থেকে বেরোবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু তারপর? এমন করে হার মেনে চলতে হবে তাকে? না, সরে পড়বে, প্রদীপ যা বলে গেল? সেও তো হার।

বাড়িতে কিছু বলা যায় না। বাবা এবং দাদা স্পষ্ট ভাবে নিষেধ করেছিলেন। তাঁদের জোরালো আপত্তি শুনে মাও বোধ হয় মনে মনে ঐ দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাধা দেননি। সেটা কতকটা ছেলেকে কাছ ছাড়া করে অতদূরে পাঠাতে হবে বলে। তবু মায়ের কাছেই এদিকের কিছুটা আভাস দিল। তিনিই একরকম টেনে বের করলেন। কদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, ছেলের হাবভাব মোটেই স্বাভাবিক নয়। কী যেন ভাবছে সব সময়, কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা নেই, মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় একটা কোনো অশান্তি চেপে বসে আছে মনের মধ্যে। প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন। সবটা নয়, কিছুটা। বললেন,

ছেড়ে দে। বম্বের কাজটা হয়তো এখনো হাতছাড়া হয়নি। হলেই বা কী করা যায়? এভাবে কেউ চাকরি করতে পারে?

বিদ্যুৎও তাই স্থির করে ফেলল। কলেজে বেরোবার আগেই ইস্তফা পত্রটা লিখে ফেলল। একলাইনেই সারা যেত। কিন্তু তা না করে বিশদভাবে লিখল কেন ছাড়ছে, অর্থাৎ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। নানারকম প্রভাবে পড়ে ছেলেরা অনেক দিন থেকেই ভুল পথে চলেছে। কর্তৃপক্ষ যদি গোড়ার দিকে তৎপর হতেন, রাশটা একেবারে ছেড়ে না দিয়ে একটু টেনে রাখবার চেষ্টা করতেন, আজ ওরা এখানে এসে পৌঁছত না। ওরা বয়ে গেছে, কারণ ওদের বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে। আজ আর কোনো আশা নেই।

শেষদিকে লিখল, মাসান্তে কিঞ্চিৎ অর্থ—এইটুকুই শিক্ষকদের একমাত্র প্রাপ্য নয়। ছাত্রদের কাছ থেকে আরও কিছু প্রাপ্তি আছে তাদের—কিছুটা শৃঙ্খলা, কিছুটা ন্যায়-অন্যায় বোধ, কিছুটা সম্মান। তা সেখানে নেই, সেখানে শুধু একটা পে-প্যাকেট আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকা যায় না।

কলেজের পথে একটা বাস থেকে নেমে বিদ্যুৎ আর একটা বাস-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে ফিরে তাকাল। একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে রাস্তা পার হচ্ছিল, আর ওদিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছিল একখানা মোটর। ছেলেটা ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক করতেই গাড়িখানা এসে পড়ল তার উপর। হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক দৌড়ে এসে তাকে একটা ধাক্কা মারতে সে ছিটকে গিয়ে পড়ল ফুট-পাথের ধারে, কিন্তু গাড়িটা পাশ কাটাতে গিয়ে যুবকটিকে চাপা দিয়ে দিল।

অনেকের সঙ্গে বিদ্যুৎও ছুটে গেল সেই দিকে। যুবকটি পড়ে আছে। সেখানে বিশেষ কেউ নেই। বিশাল জনতা মার মার করতে করতে ছুটেছে গাড়ির পিছনে। ড্রাইভারের উপর এক হাত নিতে হবে। গাড়িটাও পার পাবে না। সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য।

কাছে গিয়ে দেখল, যুবকটির একটা পা থেঁতলে গেছে! রক্ত বেরোচ্ছে গল গল করে। মুখের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল—প্রদীপ!

একটা ট্যাকসি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। থামতে চায় না। অনেক করে বলে কয়ে ধরে আনল বিদ্যুৎ। তারপর দু'চার জন লোক যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাদের বলে কয়ে অজ্ঞান দেহটাকে ধরাধরি করে তুলল তার পিছনের সীটে।

হাসপাতালে নেবার বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল। ততক্ষণে ডাক্তার ও নার্সরা মিলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং তৎক্ষণাৎ যা-যা করণীয়, সেরে ফেলেছেন। চোখ মেলে প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখল প্রদীপ। তারপর চোখ ফেরাল বিদ্যুতের মুখের পানে। প্রথমটা বোধ হয় চিনতে পারল না। পরক্ষণেই বলে উঠল, স্যার আপনি!

তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চেষ্টা করল। বিদ্যুৎ ওর বাহুতে হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, না, না, উঠো না, শুয়ে থাক। এখন কেমন লাগছে?

"ভালো।"

মুখখানা বেশ মোলায়েম মনে হল। গলার স্বরটিও স্নিগ্ধ। ধীরে ধীরে চোখ দুটোতে কেমন একটা সলজ্জ ভাব ফুটে উঠল। কিছু একটা যেন বলতেও গেল, কোথা থেকে সঙ্কোচ এসে বাধা দিল।

বিদ্যুৎ বলল, সেই ছেলেটা, যাকে তুমি বাঁচাতে গিয়েছিলে, বেঁচে গেছে। তার বাড়ির লোকেরা এসে নিয়ে গেছে তাকে।

শুনে প্রদীপের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছু বলল না।

বিদ্যুতের চোখের উপর ভেসে উঠল আরেকখানা মুখ—রূঢ়, উদ্ধত, চক্ষু-লজ্জাহীন! কানে এসে বাজল কতকগুলো কাটা কাটা কথা, যার প্রতিটি অক্ষর থেকে ঠিকরে পড়ছে শ্লেষ, দুর্বিনয়, ক্ষমতার দম্ভ।

এই কি সেই? বিশ্বাস করতে বাধে।

বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্যুতের মনে হ'ল, না সবটুকু এখনো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়নি, একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। উঠতে উঠতে বলল, তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দাও, আমি খবর দিয়ে দেবো। কলেজেও জানিয়ে দেবো। কিচ্ছু ভেবো না, দুদিনেই সেরে যাবে।

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বাইরে এসে পকেট থেকে বের করল অনেক যত্ন করে লেখা তার রেজিগনেশন লেটার, দুহাতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিল।

জন্মান্তর

এক

হাসপাতালের সামনে এসে রিক্‌শটা থেমে গেল। মাইলখানেক আগে থেকেই ভিড় ঠেলে ঠেলে আসতে হচ্ছিল। এবার আর এগোবার পথ নেই। অতবড় রাস্তার এপার ওপার জুড়ে বসে পড়েছে কয়েক হাজার লোক। মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো। শুয়েও পড়েছে একদল। কারো জ্বর, কারো আমাশা, কারো গায়ে রাইফেল বা মেশিনগানের গুলি, ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো বেয়নেটের ঘা। বেশ কিছু লোক ঐখানেই শুরু করেছে ভেদবমি। 'কলেরা' কথাটা বোধহয় কেতাবে লিখতে রাজী নন সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর। তাই একটা কি কটমট নাম দিয়েছেন অসুখটার। তাতে অবশ্য মরা কারো আটকাচ্ছে না। সময়ও যে কেউ বেশী নিচ্ছে, তা নয়।

লিপিকা রিক্‌শ থেকে নেমে পড়ল। মেডিক্যাল কলেজের ফিফথ্ ইয়ারের ছাত্রী। একবার তাকিয়েই বুঝল, যারা শুয়ে পড়েছে তাদের অনেকেই আর উঠবে না।

গোটা কয়েক স্ট্রেচার কাজ করছে। কিছু কিছু রুগী সরিয়ে নিয়ে তুলছে হাসপাতালে। তার আগে নাড়িটা একবার দেখে দিচ্ছে একদল ছেলে। অর্থাৎ যাদের নিয়ে যাবার দরকার নেই তাদের আর 'কষ্ট দিচ্ছে না।'

তেমনি একটি ছেলের সামনাসামনি পড়ে গেল লিপিকা।

"আপনি!" বিস্ময়ের সুর ছেলেটির।

"এইখানেই তো আমাদের বাড়ি। কোলকাতা যাচ্ছিলাম। আপনি বুঝি কোনো ইউনিটের সঙ্গে—"

"হ্যাঁ, চলে এলাম। কিন্তু যা এলাহী কাণ্ড!"

"আমাদের কলেজের আর কেউ আছে নাকি?"

"কোথায়? আমি একা, বাকীরা অন্য কলেজের।"

একটু কাছে সরে এসে বলল, ভালো লাগছে না। আপনি আসবেন?

লিপিকা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কিন্তু দরকার তো ডাক্তারের।

"আপনিও যেমন! অত ডাক্তার আসবে কোত্থেকে? আমাদের এই কুড়ি জনের ইউনিট, ডাক্তার মাত্র দুটি। বাকী সব আপনার আমার মত হবু"—বলে হেসে ফেলল পীযূষ। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে বলল, আসুন না। হলই বা কদিন কলেজ কামাই।

লিপিকা রয়ে গেল। ইউনিটের ইনচার্জ, ডাক্তার লাহিড়ী খুব খুশী। ওকে বারবার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "দু একটি গার্ল স্টুডেণ্টের বড্ড দরকার ছিল আমাদের। ধন্যবাদটা তোমারও প্রাপ্য।" বলে পীযূষের দিকে চেয়ে হাসলেন। হাসিটি অর্থপূর্ণ।

ঘরে ঘরে ঠাসা রুগী। বেডগুলো আগেই ভরতি হয়ে গেছে। মেঝেতেও পা ফেলবার জায়গা নেই। এবার যাদের আনা হচ্ছে, গাদাগাদি করে পড়ে আছে বারান্দায়। চারদিকে নানান সুরের কাতরানির শব্দ! কতজনকে দেখবে এরা! এই তো শেষ নয়। বর্ডারের ওপার থেকে পিল পিল করে আসছে মানুষ। মানুষ না বলে বলা যেতে পারে মানুষের কঙ্কাল।

মানুষের রোগব্যাধি, দুঃখকষ্ট, ব্যথা-যন্ত্রণা—এককথায় হিউম্যান সাফারিং-এর যেটা বিমূর্ত রূপ, তার সঙ্গে লিপিকার পরিচয় এই পাঁচ বছর। দেখে দেখে গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বুঝল, কিছুই দেখা হয়নি। প্রথমেই মনে হল, পালিয়ে যায়। কী হবে থেকে? কতটুকু কি করতে পারবে তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে?

একজন নার্স এসে বলল, ডাক্তার লাহিড়ী আপনাকে ও-টিতে যেতে বললেন।

হঠাৎ যেন বুকে বল এল লিপিকার। জানতে চাইল, কোনদিকে ও-টি?

"আসুন আমার সঙ্গে। এই মাত্তর সার্জন এসে পৌঁছলেন। পেসেণ্ট এদিকে কাল থেকে পড়ে আছে অপারেশন টেবিলে।"

"কী কেস?"

"কী আবার? গুলি ঢুকেছে পায়ে। সারা পাটা ফুলে ঢোল। অ্যামপুটেশন ছাড়া বোধহয় অন্য পথ নেই। বেশ নামকরা লীডার একজন।"

অপারেশন্ থিয়েটারের সামনে বেশ কিছুটা ভিড়। পোশাক পরা নার্স দেখে কয়েকজন এগিয়ে এল। সবারই মুখে উদ্বেগ। একজন বলল, আমাগো চধরী সায়েব কেমন আছে?

"ভালো আছেন। আপনারা এখানে ভিড় করবেন না।" একটু কড়াভাবেই বলল নার্স। লোকগুলো—অনেক মেয়েও আছে তাদের মধ্যে—সরে গেল, কিন্তু চলে গেল না।

সার্জন ওদের টীচার। লিপিকা তাঁর অনেক অপারেশনে উপস্থিত থেকেছে। সাহায্যও করেছে। বললেন, তুমি? যাক ভালোই হল। কবে থেকে আছ এখানে?

"আজই এলাম স্যার্।"

"কে?" চমকে উঠল পেসেণ্ট। এতক্ষণ চোখ বুজে পড়ে ছিল! এবার যন্ত্রণা-কাতর আরক্ত চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকাল। দৃষ্টিটা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল লিপিকার মুখের উপর। তারপর ক্লান্ত চোখ দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

নার্স ঠিকই ধরেছিল। হাঁটুর খানিকটা উপর থেকে গোটা ডান পা-টাই কেটে বাদ দিতে হল। সুনিপুণ সফল অপারেশন। লিপিকা এবং আর যারা তাকে সাহায্য করছিল সকলের মুখেই একটা স্বস্তির ছায়া লক্ষ্য করলেন ডাক্তার। কাজ শেষ করে ব্যাগটা হাতে তুলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললেন, "শুধু পায়ের ওপর দিয়ে গেলেই রক্ষে। তুমি তো রইলে"—লিপিকার দিকে ফিরলেন—"আজকের দিনটা খুব ক্লোজলি ওয়াচ্ করবে। দরকার মনে করলে আমাকে খবর দিও। আমি লাহিড়ীকেও বলে যাচ্ছি।"

প্রথম কদিন বেশ সংকটের মধ্য দিয়ে কাটল, ডাক্তারেরা যাকে বলেন ক্রাইসিস। তারপর ক্রমশঃ ভালোর দিকে চলল পেসেণ্ট। তার জন্যে অনেকখানি কৃতিত্ব লিপিকার। এই কদিন সে একবার গিয়ে মাকে বলে আসা ছাড়া আর বাড়ি যেতে পারেনি। মেয়েদের ওয়ার্ডে—যেখানে তার কাজ—একবারও যাওয়া হয়নি। এই রুগীর পাশেই কেটে গেছে প্রায় পাঁচটা দিনরাত। কেমন যেন জিদ চেপে গিয়েছিল—ভালো করে তুলতেই হবে এঁকে। এটা তার শুধু দায়িত্ব নয়, অন্তরের তাগিদ।

এই প্রৌঢ় মানুষটির সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড কৌতূহল গড়ে উঠেছিল তার মনে। কাজকর্মের ফাঁকে চোখে পড়েছে, প্রায়ই তিনি তার মুখের দিকে, চলাফেরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করেছিল, বিরক্ত হয়েছিল ভিতরে ভিতরে। তারপর লক্ষ্য করে দেখল, ঐ দৃষ্টিতে আর কিছু নেই, শুধু একটা নীরব অন্বেষণ। কাকে যেন খুঁজছেন মনে মনে। পাচ্ছেন না। তাই বারবার করে দেখছেন। শুধু দেখা নয়, ওর গলার স্বর শুনেও চমকে ওঠেন মাঝে মাঝে, সেই প্রথম দিন যেমন উঠেছিলেন।

একদল মেয়েপুরুষ রোজ ওঁর খবর নিত। একটু ভাল হবার পর দুচার-জনের সঙ্গে দেখা করিয়েও দিয়েছে লিপিকা। 'চধরী সায়েবের' ওপর কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাদের! তার চেয়েও বেশী মমতা। তাদের মুখে ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে। মস্ত বড় পাকা বাড়ি। সংসার করেননি। অথচ একপাল পুষ্যি। তাছাড়া সারা গাঁয়ের গরিব লোকগুলোর খাওয়া-পরার ভাবনা সবটা না হলেও

অনেকটাই ওঁর। অনেক জমিজমা। নিজে দেখাশুনো করেন। ভালো ফসল দেয় তারা। কিন্তু নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু ছাড়া বাকীটা যায় অন্যের ভোগে। তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাও কম নয়।

আরো বলেছিল ওঁর একজন হিন্দু প্রতিবেশী, প্রথম জীবনে এই কলিমুদ্দিন চৌধুরী ছিলেন কট্টর মুসলিম লীগ পন্থী। ঢাকায় পড়বার সময় কি করে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল মুজিবর রহমানের সঙ্গে। তারপর থেকেই বদলে গেল লোকটা। মুজিবর ওকে ইলেকশনে দাঁড়াতে বলেছিলেন। উনি হেসে বললেন, তুমি যা বলবে তাই করবো, যেভাবে চালাবে সেইভাবেই চলবো। তবে গ্রাম ছেড়ে সহরে যেতে বলো না! আমার রাজ্য এই ঝিনাইদ।

যেদিন খবর পেলেন, পাকিস্তানী ফৌজ যশোর সহরের ছাউনি ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, অজস্র অসহায় গ্রামের মানুষ প্রাণ দিচ্ছে তাদের মর্টার আর বেয়নেটের মুখে, অসংখ্য মেয়ে ইন্ধন হচ্ছে তাদের উগ্র লালসার, গ্রামকে গ্রাম পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে দিতে আসছে তারা, কলিমুদ্দিন চৌধুরী গোটা অঞ্চলের জোয়ান ছেলেদের জড়ো করে বললেন, তোমরা গা ঢাকা দাও, লাঠি সোটা বল্লম দিয়ে মেশিনগান বা কামানের সঙ্গে লড়া যায় না। মেয়েছেলে আর বাচ্চা বুড়োদের আমি দেখবো। ছেলেরা চলে গেল। বাকী যারা রইল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নিজের বিরাট বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। স্বাধীন বাংলা'র পতাকা উড়ছিল তার উপরে। নামিয়ে লীগের পতাকা তুললেন। কিন্তু এ কৌশল ব্যর্থ হল। শেষ রাত্রে এল জল্লাদের দল। দরজা ভেঙে ঢুকল। শুরু হল নারকীয় কান্ড, যার বর্ণনা দেবার মত শব্দ কোনো ভাষাতেই পাওয়া যাবে না। যারা কোনরকমে বেঁচে গিয়েছিল সকাল বেলা গিযে দেখল একরাশ মড়ার স্তূপের মধ্যে পড়ে আছেন কলিমুদ্দিন চৌধুরী। জ্ঞান নেই, প্রাণটা তখনো আছে। কোনরকমে একটা গোরুর গাড়ি যোগাড় করে, নিয়ে এল বর্ডারের এপার।

॥ দুই ॥

লিপিকারাও উদ্বাস্তু। একুশ বছর আগে ১৯৫০ এর ধাক্কায় যে কয়েক লাখ হিন্দু কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ওঁর মাও ছিলেন তাদের মধ্যে। ও তখন পেটে। বাবাকে কখনো দেখেনি। একটু বড় হয়ে মায়ের মুখে শুনেছিল, তিনি নেই, ওপারেই তাঁকে ফেলে আসতে হয়েছে। বৌবাজারে গলির মধ্যে একটা ছোট একতলা বাড়িতে সে মানুষ। মা পড়তে যেতেন মেডিক্যাল কলেজে, ও থাকত ঝি-এর জিম্বায়। তারপর বড় হয়ে স্কুলে গেল, স্কুল থেকে কলেজে।

মিসেস্ শেফালিকা ঘোষ তার আগেই ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন এবং অল্প দিনেই ভাল প্রাকটিস গড়ে তুলেছেন।

আপন বলতে এক মা ছাড়া আর কাউকে কোনদিন দেখেনি লিপিকা। একজন বৃদ্ধ শুধু আসতেন মাঝে মাঝে, তার 'ডাক্তারদাদু', যিনি একাই একশ আত্মজনের অভাব পূরণ করে রেখেছিলেন। হঠাৎ একদিন শুনল তিতি মারা গেছেন। লিপিকা তখন স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি।

এতদিন কোলকাতাতেই ছিল ওরা। বছর দুই হল কল্যাণীতে একটা নার্সিং হোম করেছেন ডাক্তার মিসেস্ ঘোষ। তারই এক অংশে কয়েকখানা ঘর নিয়ে ওদের বাস। এখান থেকে রোজ গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ক্লাস করা সম্ভব নয় বলে ওখানে একটা মেয়েদের হস্টেলে থাকে ও। শনিবার-শনিবার বাড়ি আসে।

সেদিন যে কোলকাতায় যেতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে এখানকার হাসপাতালে কাজে লেগে গেছে, ওরই হাতে একটি মরণাপন্ন রুগীর ভার দিয়েছেন ওদের সার্জন—সব কথাই মাকে জানিয়েছে লিপিকা। সেই সঙ্গে ঐ মানুষটির সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছে তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে, তাও মোটা-মুটি বলা হয়ে গেছে। একদিন কথায় কথায় বলছিল, "জানো মা, ভদ্রলোক প্রায়ই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।" মা কপাল কুঁচকে তাকাতেই, হেসে ফেলল,—"না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমার মনে হয়, আমার মত দেখতে কেউ হয়তো ওঁর আছে কোনোখানে, কিংবা ছিল। তারই কথা ভাবেন।"

শেফালিকা আর কিছু বললেন না। ভাবলেন, তাই হবে হয়তো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনেকটা যেন আপন মনে বলল লিপিকা, কদিনের মধ্যেই ডিস-চার্জ করে দেবে! তারপরে ঐ কাটা পা নিয়ে কোথায় যে যাবেন!

মার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভাবে বলল, আচ্ছা মা, এক কাজ করলে হয় না?

"কী?"

"ধর ওঁকে যদি কিছুদিন আমরা এখানে এনে রাখি।"

"এখানে!"

"হ্যাঁ; তিন নম্বর ঘরটা তো কালই খালি হচ্ছে। জানো, এখনো ওঁর বেশ কিছুদিন ট্রিট্মেণ্ট দরকার। কিন্তু হাসপাতালের যা অবস্থা!"

মিসেস্ ঘোষ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, বেশ, কিছুদিন না হয় রইলেন। তারপর?

"এর মধ্যে চেষ্টা-টেষ্টা করে একটা ক্রাচ্ নিশ্চয়ই যোগাড় হয়ে যাবে। উনিও বেশীদিন এখানে থাকবেন না। ওঁর লোকদের বলছিলেন, একটু সুস্থ হলেই ফিরে যাবেন বাংলাদেশে। সেদিন অনেকগুলো ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা মুক্তিফৌজে জয়েন করবে। ওঁকেও তারা চাইছে।"

মেয়ের যখন অত ইচ্ছা, মিসেস্ ঘোষ আর আপত্তি করলেন না।

পরদিন লিপিকার প্রস্তাব শুনে চৌধুরী সাহেব যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না এমনিভাবে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি যা করেছেন আমার জন্যে, তার ঋণই কোনোদিন শোধ দিতে পারবো না। সে বোঝা আর বাড়াতে চাই না।

লিপিকা বলল, আপনি ভুল করছেন। আপনার জন্যে আমাদের আলাদা কিছুই করতে হবে না। নিজেদের নার্সিং হোম। বন্দোবস্ত সব আগে থেকেই আছে। তাছাড়া, বেশীদিন তো আপনি থাকছেন না। আর একটু ভালো হলেই চলে যাবেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও সেই পরামর্শ দিল। চৌধুরীর লোকজনেরাও শুনে খুব খুশী হল এবং এক রকম জোর করেই ওঁকে পাঠিয়ে দিল লিপিকার সঙ্গে।

মিসেস্ ঘোষ কোলকাতায় গিয়েছিলেন কী কাজে। ফিরতেই মেয়ে এগিয়ে গেল গেটের কাছে—"উনি এসে গ্যাছেন মা। দেখবে এসো।"

"এখনি দেখতে হবে?" মৃদু হেসে তিন নম্বরের দিকে পা বাড়ালেন শেফালিকা।

কেবিনটা নিজে হাতে পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল লিপিকা। টিপয়ের উপর ফুলদানিতে তাজা গোলাপের তোড়া. ঘরময় মৃদু ধূপের গন্ধ। চৌধুরী সাহেব বোধহয় ক্লান্তি আর দুর্বলতার জন্যেই চোখ বুজে পড়ে ছিলেন। মিসেস্ ঘোষ ঘরে ঢুকেই একটা অস্ফুট শব্দ করে শিউরে উঠলেন। তাতেই হয়তো রুগীর তন্দ্রা ভেঙে গেল। চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন। লিপিকা ছুটে এসে বাধা দিল—না, না, আপনি উঠবেন না। এদিকে ফিরে দেখল, মা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটে বেরিয়ে গেল।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেকবার ডাকাডাকির পর ক্ষীণস্বরে সাড়া দিলেন শেফালিকা—আমাকে একটু একলা থাকতে দে খুকু।

লিপিকা বসে রইল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। একটু একটু করে রাত বাড়ল। দরজা খুলে একটা কিছু মুখে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে শেফালিকা ভিতর থেকেই বললেন, তুই খেয়ে নে মা। তারপর অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

যখন দরজা খুললেন, রাত এগারটা বেজে গেছে। সারা বাড়ি নিঝুম। দোরের ঠিক বাইরে একটা টুলের উপর বসে ছিল লিপিকা। মার ডাকে ভিতরে গেল। তিনি ওকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলেন, খুকু—

"কী মা?"

"যদি শুনিস্, মার সম্বন্ধে এতদিন যা জেনে এসেছিস সব মিথ্যে, একটা বিশ্রী ইতিহাস আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছি তোর কাছে—"

"তুমি চুপ কর মা। তোমার পায়ে পড়ি। ওসব আমি কিছু শুনতে চাই না।"—কথার মাঝখানেই বাধা দিল লিপিকা।

শেফালিকা মাথা নাড়লেন—"তা হয় না মা। বলতে আমাকে হবেই।"

একটু থেমে বললেন, আমি বিধবা নই। মিসেস্ শেফালিকা ঘোষ আমার মিথ্যা নাম। আর—আর ঐ যাকে তুই নিয়ে এসেছিস, ও তোর বাপ।

লিপিকার মুখে কোনো কথা সরল না। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল মায়ের দিকে।

"একুশ বছর। হ্যাঁ, তার চেয়ে কিছু বেশীই হবে।" ধীরে ধীরে বললেন শেফালিকা। "ওদের যেমন তাড়িয়ে দিচ্ছে ইয়াহিয়ার ফৌজ, তেমনি ওরাও আমাদের মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।" ওদের পাশের গাঁয়েই আমাদের বাড়ি। বাবা ছিলেন ডাক্তার! ওর বাবা একদিন তাঁকে গিয়ে বলল, 'এটা পাকিস্তান, আমাদের দেশ। আপনারা এখানে কেউ নন, বিধর্মী, বিদেশী। পাকিস্তানে হিন্দুদের জায়গা নেই। তবে আপনাকে আমরা রাখতে পারি যদি আপনার ঐ মেয়েকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন।' আমি তখন কোলকাতায় পড়ি, মাসিমার কাছ থেকে। আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'সেটা অসম্ভব! আমরা চলে যাচ্ছি।'

সে সুযোগ আর ওরা দিল না। সেই রাতেই হানা দিল আমাদের বাড়ি। আমার মুখ বেঁধে কাঁধে করে এনে ফেলল ওদের বাড়িতে। বাবা-মা আর আমার ছোট দুটো ভাই—তাদের যে কী হল আজও আমি জানি না।

শেফালিকা একটু দম নিতেই লিপিকা বলল, 'থাক মা, এসব আমি সইতে পারছি না।

থাকলে তো চলবে না মা। আসল কথাই তো বলা হয়নি।

ও তখন বাড়িতেই ছিল। ঢাকায় থেকে বি. এ. না কী পড়ত। আমি জানতাম, হিন্দু মেয়ের ওপর ভীষণ লোভ ওদের। ওকেই দেখেছি আমাদের বাড়ীর সামনে ঘুরে বেড়াতে। শুধু নাকি আমাকে দেখতেই যেত।

সেদিন যখন আমার জ্ঞান হল, চোখ খুলেই দেখলাম ও পাশে বসে আছে। ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি রাজি হও। সারা জীবন দিয়ে তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করবো।' আমি ছিটকে সরে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে ছেড়ে দিন।

কিন্তু ছেড়ে দেবার জন্যে তো ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়নি। আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখল। দিন দুই পরে কী সব অনুষ্ঠান হল ওদের বাড়ি। অনেক লোকজন খেল। তারপর ওর বাবা এসে বলল, আজ থেকে তুমি আমার ছেলের বৌ।

আমার কোনো আপত্তি, কোনো জোর টিকল না। দিন দশেক থেকে ও চলে গেল ঢাকায়।

"তারপর? তুমি এলে কী করে?" রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল লিপিকা।

"তাকে তাকে থাকতাম, কি করে পালানো যায়। একদিন, অনেক রাত তখন। সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি জেগে ছিলাম। হঠাৎ কানে গেল চাপা কান্না। দোতলার জানালায় গিয়ে দেখলাম, অনেক লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। বুঝলাম, ওরা সব হিন্দু। শুধু সেই অপরাধেই ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, লুকিয়ে। মেয়েরা কান্না চাপতে পারছে না।

তখনই এক কাপড়ে বেরিয়ে এসে ওদের ধরলাম—আমাকেও নিয়ে চলো

তোমাদের সঙ্গে।

কীভাবে যে বর্ডার পার হলাম সে কথা থাক। আশ্রয় জুটল রিফিউজী ক্যাম্পে মাস তিনেক পরে টের পেলাম, ওদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু একা আসতে পারিনি। তখনো কেউ জানে না। জানবার আগেই নিজেকে শেষ করে দিতে হবে। সব চেয়ে সোজা উপায় চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া। কদিন গিয়েও ছিলাম রেলের ধারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। বড় ভয় হল। সবে আঠারো বছর বয়স তখন। তারপর একদিন সোজা চলে গেলাম ক্যাম্পের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার রায়চৌধুরীর কাছে।

"ডাক্তারদাদু ?" জানতে চাইল লিপিকা। "হ্যাঁ, উনি আমাদের কেউ নন। অন্ততঃ তখন পর্যন্ত ছিলেন না। কিন্তু কী চোখে যে দেখলেন আমাকে! সব কথা জানিয়ে যখন বললাম, যে আসছে তাকে নষ্ট করে ফেলতে চাই, উনি হেসে বললেন, আমি ডাক্তার। মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, মারতে তো পারি না।"

আমি বললাম, "কিন্তু এ ছাড়া আর কী পথ আছে আমার সামনে ?"

তিনি জোর দিয়ে বললেন, আছে বৈকি ? তুমি নিজেও বাঁচো, যে আসছে তাকেও বাঁচতে দাও। তাতে যদি রাজী থাকো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

প্রথমে একটা কোন আশ্রমে নিয়ে তুললেন। আই, এস, সি-তে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম। ভালো নম্বর ছিল। ওঁরই চেষ্টায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম। নতুন নাম, নতুন ইতিহাস। আমি মিসেস্ শেফালিকা ঘোষ. স্বামীকে মেরে ফেলেছে ওপারের গুণ্ডারা। একা পালিয়ে এসেছি। পেটে তাঁর সন্তান।

তারপর তুই হলি ঐ মেডিক্যাল কলেজেরই প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালে। ভগবান যাকে রাখেন কার সাধ্য তাকে মারে ?—বলে মেয়েকে কাছে টেনে নিলেন শেফালিকা। লিপিকা মায়ের কাঁধে মাথা রেখে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলল, তারপর ?

"তার পরেও ঐ ডাক্তার কাকা। বৌবাজারে বাড়ি ভাড়া করে সোজা নিয়ে তুললেন সেখানে। সব সময়ের ঝি রেখে দিলেন তোর জন্যে। আমার কলেজ চলল। একদিন পাশ করেও বেরোলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাউস-সার্জন, ওঁরই অনুগ্রহে। অত শীগগির যে দাঁড়িয়ে গেলাম, সেখানেও তিনি। আমাকে শুধু দাঁড় করিয়ে নয়, ভালো করে বাঁচবার পথে আরো অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে তিনি একদিন হঠাৎ চলে গেলেন। হাসপাতালে নিজের চেম্বারে কাজ করতে করতে বুকে ব্যথা বলে শুয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না।

এতদিন পরে আমার সব কথা তোকে বলতে পেরে বুকটা আমার হালকা হয়ে গেল, খুকু। সবই তো শুনলি। এবার বল তো তোর মাকে কি তুই ক্ষমা করতে পারবি ?"

"ব্যস, আর একটি কথাও না। এবার বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড় দিকিন। আমি এক কাপ কফি করে নিয়ে আসছি"—বলে জোর করে মাকে

শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল লিপিকা।

পরদিন সকালবেলা। মা তখনো ওঠেননি। লিপিকা নার্সকে জিজ্ঞাসা করে জানল, তিন নম্বরের পেশেণ্ট অনেকক্ষণ আগে উঠে বসে আছেন। তখনই গেল তাঁর ঘরে। চমকে উঠল চোখমুখের দিকে চেয়ে। একটা রাতের ভিতরে এমন করে বদলে যায় মানুষ! কলিমুদ্দিন চৌধুরী ধীরে ধীরে বললেন, আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

লিপিকা সহজভাবেই বলল, আমাকে 'আপনি' বলবেন না। মার কাছে সব শুনেছি। আমি আপনার মেয়ে।

"তুমি!" বলে নিজের অজানতেই যেন ডান হাতখানা ধীরে ধীরে তুলতে চেষ্টা করলেন চৌধুরী সাহেব। তাঁর সারা শরীর কাঁপছিল। লিপিকা কাছে গিয়ে বসল। কম্পিত হাতখানা তার মাথায় পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য মিল চেহারায়, গলার স্বরে। তবু আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি।···

"তোমাকে একটা কাজ করতে হবে মা",—হঠাৎ নিজেকে যেন টেনে তুলে সহজ হবার চেষ্টা করলেন চৌধুরী সাহেব, "কাউকে দিয়ে আমার লোকজনদের একটা খবর দিতে হবে। একটা রিক্শও ডাকতে বলো সেই সঙ্গে।"

"রিক্শ কেন?" জানতে চাইল লিপিকা।

"রোদ উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়তে চাই।"

"কোথায় যাবেন এই শরীর নিয়ে!"

চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন, দেখি, ওরা কোথায় নিয়ে ফেলে।

"না।"—দৃঢ়স্বর লিপিকার, "এখন আপনার যাওয়া হবে না। আগে সুস্থ হয়ে উঠুন, ক্রাচের বন্দোবস্ত হোক, তারপরে যাবেন। সে-সব ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।"

"কিন্তু মা," একটু থেমে তারপর বললেন চৌধুরী সাহেব, "তোমাদের কাছে তো আমার অপরাধের অন্ত নেই। তারপরেও আমাকে থাকতে বলছ!"

লিপিকা একটা কি বলতে যাচ্ছিল। নার্সকে আসতে দেখে থেমে গেল। সে তার কাজ সেরে বেরিয়ে গেলে চৌধুরী সাহেবই আবার কথা বললেন, তোমার মার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ যদি আমার থাকত, তাঁকে শুধু একটি কথা বলতাম—১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পুরো একুশ বছর। এর মধ্যে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে পূবের বাংলায়। তার মনের গোটা চেহারাটাই বদলে গেছে। আজকের এই লোকটা, যাকে তুমি বাঁচিয়ে তুললে, আশ্রয় দিলে, সেও সেদিনকার সেই কলিমুদ্দিন চৌধুরী নয়। এ কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন?

"আপনি এবার চুপ করুন তো। ওসব আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। এই দেখুন, এই কটা কথা বলতেই কপালটা ঘেমে উঠেছে"—বলে লিপিকা উঠে গিয়ে পাখাটা পুরো দমে চালিয়ে দিল।

ফার্স্ট প্রাইজ

কী হল ?

মহিম রায় বন্ধুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ফোলিও ব্যাগটা পাশের সোফায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সামনে যে কৌচটা ছিল তার উপর বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এর পরে উত্তরের আর দরকার ছিল না। তবু বঙ্কু দাশ নেহাৎ কিছু একটা বলবার জন্যেই বললেন, দিলে না বুঝি ?

না।

কী বললে ?

টাকা নেই।

টাকা নেই ! ব্যাটাচ্ছেলে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে আর তার সবটাই কালো। সেখান থেকে কিছু ছাড় না ? তোরই তো সুবিধে। খানিকটা তবু হালকা হলি।

মহিমবাবু হাসলেন, হালকা হবার জন্যে ওর কোন গরজ নেই। ধরে কে ? তাছাড়া শোনা যাচ্ছে হাউস-প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করলে কালো টাকা সাদা বলে মেনে নেবে গবর্মেণ্ট। শীগগিরই নাকি আইন পাশ হচ্ছে পার্লামেণ্টে। ও হয়তো সেই অপেক্ষাতেই আছে। তোমাদের এই নিউ আলিপুরে যে কটা খালি প্লট পড়ে আছে সব কিনে নিয়ে এক একটা দশ বারোতলা ফ্ল্যাট তুলবে। আর ভাড়ার টাকায় বসে বসে খাবে।

যা বলেছ ! সেই সঙ্গে আমাদেরও ফ্ল্যাট করে দেবে, আমি আর আমার মত কতগুলো বুড়ো, যারা চাকরি থেকে রিটায়ার করে সর্বস্ব দিয়ে একখানা বাড়ি করেছে, আর তারই খানিকটা ভাড়া দিয়ে কোন রকমে করে খাচ্ছে।

ঠিক তাই। আমরা তো গেছিই, তোমাদেরও ঘোর দুর্দিন আসছে।

বঙ্কু দাশের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বললেন, তার মানে মধ্যবিত্ত বলে যে একটা জাত এখনো আছে, আসলে যাদের কোন বিত্তই নেই, তারা একেবারে লোপাট হয়ে যাবে।···সে যাকগে ; এবার তোমার খবর বল। পটলডাঙ্গার কারখানাটা চলছে তো ?

এখনো চলছে, তবে শীগগিরই পটল তুলবে। ইউনিয়নের পাণ্ডারা আলটিমেটাম দিয়ে গ্যাছে বোনাস না বাড়ালে স্ট্রাইক। ঐ জন্যই তো টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। তাছাড়া দেনাটেনাও আছে কিছু।

কত টাকা চাই ?

অন্তত হাজার দশেক।

বঙ্কুবাবু মিনিটখানেক কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, এক কাজ কর না কেন ? তোমার স্ত্রীর তো অত গয়না আছে, তার কয়েকখানা হলেই তো সমূহ বিপদ কিছুটা অন্তত কেটে যায়। তার পর আস্তে আস্তে—

মহিম হাসলেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, আমার স্ত্রী জাতিতে স্ত্রীলোক, যারা প্রাণ দেয়, কিন্তু গয়না দেয় না।

বঙ্কু আর ঐ প্রশ্নে ঢুকলেন না, উক্তিটা বোধ হয় মনে মনে মেনে নিলেন। অন্য দিকে গেলেন, ছেলের পেছনেও তো কম টাকা ঢালনি। অত বড় ডাক্তার হয়ে ফিরেছে বিলেত থেকে। বেশ ভাল রোজগার শুনেছি।

আমিও শুনেছি।

এমন একটা সুর ছিল মহিমের মুখের শব্দ দুটির মধ্যে যে বঙ্কু আর ঐ প্রসঙ্গে অগ্রসর হলেন না। বুঝলেন বন্ধুর সেটা ইচ্ছা নয়। তাছাড়া তিনি নিজেও জানেন, 'কর্তব্য' 'কৃতজ্ঞতা' এমন ধারা যে সব কথা তাঁরা তাঁদের কালে জেনেছেন এবং মেনে এসেছেন, সেগুলোকে এখন ডিক্সনারী ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া শক্ত। কর্তব্য যদি কোথাও থাকে সেটা নিম্নগামী। বাপ ছেলের জন্যে করবে, করতে বাধ্য। কিন্তু ছেলে—

বঙ্কুবাবুর চিন্তাসূত্রে হঠাৎ টান পড়ল। মহিম উঠে পড়ে বললেন, চলি।

কোথায় যাবে এখন? বস, একটু চা খাওয়া যাক। তারপর ভেবেচিন্তে একটা কোন উপায় তো বের করতে হবে।

মহিম আবার বসলেন। কথাবার্তা চলল বিশেষ করে সেই মামুলী ধারায়, মোটামুটিভাবে সকলেই যা জানে—স্বল্প পুঁজি বাঙালীরা এপাড়ায় যে সব ছোটোখাটো কল কারখানা গড়ে তুলেছিল, বেশির ভাগই ধার দেনা করে, তাদের অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছে। কতকগুলো তো উঠেই গেছে, বাকীদেরও প্রাণ যায় যায়। কারণগুলোও কারো অজানা নয়। মালিক-শ্রমিকে যে পরস্পর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছিল, অনেকটা ব্যক্তিগত ধরনের, বাইরের লোক এসে তাতে ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে। তারা মুখে বলছে আমরা শ্রমিকের স্বার্থ চাই, কিন্তু আসলে চাইছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং সেটা প্রায়শ রাজনৈতিক। তার ফলে কাজকর্ম কিছু হচ্ছে না এবং দুপক্ষই মার খাচ্ছে।

এই সব শিল্প, সরকারী ভাষায় যার নাম স্মল-স্কেল ইনডাস্ট্রিজ, তাদের দুর্দশার জন্যে সরকারও কম দায়ী নয়। লাইসেন্স বণ্টনে নানারকমের পক্ষপাত দৈনন্দিন ঘটনা। ক্ষমতা হাতে নিয়ে যারা বসে আছেন, তাদের 'খুশি' করতে পারলে তো কিছু পেলে, তা না হলে শূন্য হাতে ফিরে যাও। মাল যারা কিনবে তাদেরও নীচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত সবাইকে 'খুশি' করা চাই। বাঁ হাতে কিছু না পড়লে ডান হাত অর্ডার সই কিংবা বিল পাশ করবে না।

মহিম রায়ের মুশকিল হল এতদিনেও ঐ বাঁ হাতের ব্যাপারটা রপ্ত করতে পারলেন না। নীতিগত আপত্তি যে খুব একটা রয়েছে তা নয়, আসলে সাহসের অভাব। কে জানে আবার কোন্ নতুন ফ্যাসাদে পড়তে হবে? বঙ্কু বলে থাকেন, ঐটাই তোমার বড় গলদ মহিম। যে যুগের যে ধারা। তাই বা বলি কেন? এ জিনিস বাপু সব যুগেই ছিল। "দ্বারী হস্তে মুদ্রা দুই চারি" না গছালে দেব-দর্শন হত না। রাজদর্শন কিংবা রাজানুগ্রহ লাভ করতে হলে আরো ব্যাপক ব্যবস্থা। হাতি-ঘোড়া হীরা-জহরৎ মায় নারী পর্যন্ত। (স্ত্রী-রত্ন কথাটা বোধ-

হয় ওর থেকেই এসে থাকবে।) এটা সব যুগে সব দেশেই ছিল এবং আছে। তফাৎ শুধু নামে। আমরা বলি ঘুষ, পিতামহরা বলতেন উৎকোচ। ইংরেজদের নামটা বেশ গালভারী—Illegal gratification.

ঝোঁকের মাথায় বঙ্কু দাশ আজ আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ব্যবসা প্রসঙ্গে কোন একটা সূত্র ধরে বললেন, দ্যাখ মহিম, কারবার করতে বসে অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। দু-চারটে মিথ্যা কথা, দরকার মত মাঝে মাঝে দু-একটা ধাপ্পাবাজি, কিংবা সাধুভাষায় যাকে বলে প্রতারণা, এগুলো খুব দোষের নয়। কমবেশী সবাই করে থাকে। Honesty is the best policy বলে যে একটা নীতি বাক্য আছে, শুনতে খুব ভাল; কিন্তু স্কুলের পরীক্ষায় essay লেখা ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না।

এরপরে যেসব আলোচনা হল তার একমাত্র লক্ষ্য টাকাটা কি করে সংগ্রহ করা যায়। শেষ পর্যন্ত বঙ্কু যে প্রস্তাব করলেন, মহিমের মন তাতে সায় দিচ্ছিল না। কতকটা নিমরাজী হলেও ভয় কাটল না এবং শেষরক্ষা হবে কিনা তাতেও সন্দেহ রইল। বললেন, যদি ধরা পড়ে যাও কেলেঙ্কারির একশেষ।

বঙ্কুবাবু আশ্বাস দিলেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

টাকাটা সম্বন্ধে প্রতিভারও কম উদ্বেগ ছিল না। সংসারটি নেহাৎ ছোট নয়। তারা দুজন, দুটি মেয়ে একটি ছেলে। বড় ছেলে থেকেও নেই, পায়ে জোর হতেই বৌ ছেলে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে চলে গেছে। সমস্ত ভার বৃদ্ধ স্বামীর একার কাঁধে। সারাজীবন খেটে ঐ কারখানাটা দাঁড় করিয়েছেন। ভালই চলছিল এতদিন। হঠাৎ কী যে হল!

মহিম বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু সুবিধে হল?

না।

কী করবে ভাবছ?

দেখি।

পরদিন ফ্যাকটরী থেকে ফিরে বললেন, আজ এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম।

জ্যোতিষী! বিস্ময়ের সুর প্রতিভার। এসব ব্যাপারে স্বামীর কোন আস্থা নেই, এটাই দেখে এসেছেন এতদিন।

মহিম বললেন, অনেকের মুখে শুনলাম হাত দেখে যা বলেন তা সব নাকি মিলে যায়। ভবিষ্যতে কী হবে তাও বলে দেন।

তুমি হাত দেখিয়েছ?

যা ভিড়, ঢোকাই গেল না। শুনলাম বেশী ফী দিলে বাড়িতে এসেও দেখেন। সেই ব্যবস্থা করে এসেছি। পরশু বেলা দুটোয় সময় দিয়েছে সেক্রেটারী।

কোথায় থাকেন?

শুনলাম তো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। কলকাতায় এসেছেন দিন পনেরো হল। গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন।

বড় বড় চোখ করে শুনলেন প্রতিভা। এত বড় জ্যোতিষীর কথা আগে কখনো শোনেননি।

ঠিক দুটোয় ট্যাকসি এসে থামল বাড়ির সামনে। মহিমবাবু ছুটে গেলেন। প্রতিভা আড়াল থেকে দেখলেন, এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নেমে আসছেন গাড়ি থেকে। লম্বা চুল, বিলম্বিত দাড়ি, পরণে রক্ত রঙের আলখাল্লা, হাত ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দন তিলক। গোড়াতে ভেবেছিলেন তিনিও একবার বেরোবেন জ্যোতিষীর সামনে, কিন্তু ঐ চেহারা দেখে কেমন যেন সাহস হল না। গভীর সম্ভ্রমভাবে দূর থেকেই প্রণাম করলেন।

বাইরের ঘরে একটা সোফায় এসে বসলেন জ্যোতিষী এবং মহিমবাবুকে ইঙ্গিত করলেন পাশে এসে বসতে। ডান হাতটা টেনে নিয়ে প্রথমে খালি চোখে, পরে রিডিং গ্লাস দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, কপালের দিকেও তাকালেন, তারপর ভাঙা গলায় বললেন, একটা নাটবল্টুর ফ্যাক্টরী আছে আপনার ?

আজ্ঞে।

ভাল চলছে না ?

আজ্ঞে না।

টাকার সন্ধানে ঘুরছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পাবেন। একমাস তিন দিন পরে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে আপনার হাতে। এক কাজ করুন—

কী, বলুন।

একটা লটারীর টিকিট কিনুন। সাত দিন পরে কিনবেন। তার আগে নয়।

মহিমবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন জ্যোতিষী, হ্যাঁ, আশু প্রয়োজন মেটাবার মত অর্থও পেয়ে যাবেন, আপনার কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে। ভয় নেই, বিপদ কেটে যাবে।

কী বলে গেলেন ? স্বামী ভিতরে আসতেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন প্রতিভা। জ্যোতিষী যা-যা বলেছেন তার মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে মহিম যোগ করলেন, দূর, ওসব আমার বিশ্বাস হয় না। খালি খালি কতগুলো টাকা নিয়ে গেল।

প্রতিভা কিছুই বললেন না। পাশের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি সবই দেখতে ও শুনতে পেয়েছিলেন। পরদিন সকালে মহিম যখন বেরোবার আয়োজন করছেন, একটা পুঁটলি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার ব্যাগে ভরে নাও। বিক্রী করে, যে দেনাগুলো না দিলেই নয়, মিটিয়ে দাও।

না না, ওসব তুমি রেখে দাও, এই দুর্দিনে ঘরের গয়না বিক্রী করতে আছে ?

তাতে কী হয়েছে ? এগুলো তো আজকাল কেউ পরে না। এমনিতেই ভেঙ্গে গড়াতে হত। তা না করে এর বদলে তুমি একসেট হাল ফ্যাসানের নতুন গয়না এনে দিও আমাকে।

সে দিন কি আর এ জীবনে আসবে মনে কর ?

নিশ্চয়ই আসবে। কী বলে গেলেন জ্যোতিষী ঠাকুর ?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিম একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন বন্ধুর বাড়ি। গয়নার খবরটা জানাতেই প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়লেন বঙ্কু দাশ, বল কি ! প্রথম কিস্তিতেই মাৎ ! ব্যস তাহলে আর মারে কে ? লটারীর টিকিটটাও কিনে ফেল।

সত্যিই কিনব ?

নিশ্চয়ই। কিনে গিন্নীর কাছে দিয়ে দেবে।

তারপর ? রেজাল্ট বেরোলে যখন দেখা যাবে আসলের বেলায় ঢুঢু ?

সে তখন দেখা যাবে। হ্যাঁ শোন, কী নাম যেন সেই লোকটার, যার কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলে ?

বংশীলাল।

ব্যাটা কী করে, কোথায় কিসের কারবার, কটা ছেলে, কটা মেয়ে, কোনো অসুখ বিসুখ আছে কিনা এসব কিছু জানো ?

না ; তবে অসুখের কথাটা না জেনেও বলা যায়। অত টাকা যখন, ডায়েবেটিস আর ব্লাড প্রেশার নির্ঘাৎ থাকবে।

তা যা বলেছ। ও দুটো ধরে নেওয়া যেতে পারে। না থাকলেও লোকে মনে করে—আছে। বাকী যা যা বললাম যোগাড় করবার চেষ্টা কর না।

তোমার মতলবটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওখানে কোন সুবিধে হবে না। সবাই তো আমার গিন্নী নয়, যে ভেল্‌কি দেখিয়ে ভোলাবে ?

কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। তাই বঙ্কুবাবু ও পথে না যাওয়াই স্থির করলেন।

লটারীর টিকেটখানা প্রতিভার কাছেই ছিল। 'ড্র' এর তারিখ পেরিয়ে যেতেই স্বামীর হাতে দিলেন এবং ফলটা জেনে আসবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলেন। মহিমকে বেরোতে হল। যখন ফিরলেন সঙ্গে বঙ্কু দাশ। গেট পেরিয়েই হাঁক ডাক শুরু করলেন, কই বৌদি, কোথায় গেলেন ? শীগগির আসুন।

স্বামীর এই বন্ধুটির সামনে আগে বড় একটা বেরোননি প্রতিভা। যখনই যখনই এসেছেন, শাড়ি পালটে এবং কিছুটা প্রসাধন সেরে নিয়ে তবেই বেরিয়েছেন। আজ আর সে কথা মনে রইল না। একেবারে সাদামাটা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলেন বঙ্কু, কী খাওয়াচ্ছেন বলুন। না, শুধু মিষ্টি মুখ করালে চলবে না, রীতিমত ফিষ্টির আয়োজন করুন।

সারা বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। মেয়েরা ও ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে জড়ো হল বাইরের ঘরে। যে-সে ব্যাপার নয়—রাজস্থান স্টেট লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ ! পুরো এক লাখ টাকা।

বড় মেয়ে বলল, আমাকে কিন্তু পরীক্ষার পরে বিলেত পাঠাতে হবে বাপি, দাদাকে যেমন পাঠিয়েছিলে।

মেজ মেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, দূর, এখন আবার কেউ বিলেত যায় নাকি ? আমি যাব কণ্টিনেণ্ট, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান নাচ শিখব। টাকাটা কিন্তু এখন থেকেই আলাদা করে রেখ, বাপি। হুঁ, শেষে যে বলবে—

ছেলে স্কুলে যায়। তার দাবি আপাতত একটা টু-সীটার গাড়ি।

স্ত্রীর মুখে কোন কথা সরল না। অভিভূত হয়ে বসে রইলেন ; দু-চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল আনন্দধারা। মহিমও হাসি মুখে চুপ করে রইলেন। বঙ্কুই তাঁর হয়ে ছেলেমেয়েদের আশ্বাস দিলেন, হবে হবে সব হবে। ঝি চাকরদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরাও পাবে। তোমাদের মনিব কাউকে অখুশী রাখবে না।

পরদিনই বংশীলাল এসে হাজির। বঙ্কুবাবুর কাছে খবর পেয়ে আর দেরি করেন নি। গেটের বাইরে থেকেই মোটা গলার চিৎকার, আরে, কোরেছেন কী মোশাই, একেবারে কেল্লা ফতে !

বংশীলাল বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রাইজের টাকাটা পেতে কিছুটা তো দেরি হবে, তাই কয়েক বাণ্ডিল নোট একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মহিম যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে কিছু বেশীই এনেছেন, যাতে করে সব দিকের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে কারখানাটা এখন থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারে। হ্যাণ্ডনোট দিতে যাচ্ছিলেন মহিমবাবু। বংশীলাল দু-হাত তুলে বলে উঠলেন, আরে না না। হ্যাণ্ডনোট কী হবে ? এ টাকা আপনার কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তা।

যাবার আগে চুপি চুপি বলে গেলেন, সুদের হারটা যেন ডবল করে দেওয়া হয়। তাতে আর অসুবিধা কী, অতগুলো টাকা যখন মুফৎ এসে যাচ্ছে হাতের মধ্যে ?

দিন তিনেক বাদে আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। বড় ছেলের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। কতকাল পরে, মহিম মনে করতে পারলেন না। সঙ্গে স্ত্রী এবং ছেলে। চারদিকে মালিন্যের ছাপ, পড়ন্ত অবস্থার লক্ষণ। দেখে বারবার অনুযোগ দিল মাকে, এই রকম হাল হয়েছে বাড়িঘরের, আমাকে তো একবার জানালেও পারতে।

একবার নয়, অনেকবারই জানানো হয়েছিল, মা আর সে কথা তুললেন না। তখনই বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আসছে সপ্তাহেই মিস্ত্রী লাগবে বাড়িতে। দরজা জানালা গ্রীল দেওয়াল সব আগাগোড়া রং করা হবে, পালিশ পড়বে ফার্ণিচারে, পাল্টে যাবে ঐ মান্ধাতার আমলের সোফা সেটী, ছেঁড়া ময়লা পরদাগুলোও থাকবে না।

সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, বললেন প্রতিভা।

ছেলে উত্তর দিল, তার জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

একফাঁকে শাশুড়ীকে আলাদা ভাবে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গেল বৌমা।

কথায় কথায় জানাল, পার্ক স্ট্রীটে একটা নতুন চেম্বার খোলার কথা চলছে। ঘর পাওয়া যাচ্ছে, তবে সেলামিই লাগবে পনর হাজার টাকা। তার উপরে অন্যান্য খরচ তো আছেই। সেগুলো না হয় একরকম করে যোগাড় করা যাবে। কিন্তু ঐ সেলামিটা—

প্রতিভা আশ্বাস দিলেন, ঠিক আছে, তার জন্যে আটকাবে না। ঘরটা নিয়ে নিতে বল।

প্রাইজের লিস্ট বেরিয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। টাকাটা পাবার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মহিম এতদিন সময় করে উঠতে পারেন নি। কারখানাটা ঢেলে সাজানো হয়েছে, পুরোদমে কাজ চলছে। তাই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। এর মধ্যে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দু-চারবার তাগিদ এসে গেছে। আর দেরি করা চলে না। পুরুত ঠাকুরকে দিয়ে একটা ভাল দিনও দেখিয়ে রেখেছিলেন প্রতিভা। সেই দিনই টিকেটখানা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লেন মহিম। পিছন থেকে শুনতে পেলেন,—মৃদুকণ্ঠের—দুর্গা, দুর্গা।

প্রথমে গেলেন ফ্যাক্টরীতে, সেখান থেকে বন্ধুর বাড়ি।

বঙ্কুবাবু জানতে চাইলেন, কাজকর্ম কি রকম চলছে?

মহিম বললেন, ভাল। কিন্তু—

আবার কিন্তু কী?

না, মানে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—

তাতে কি হয়েছে? বাধা দিয়ে বললেন বঙ্কুবাবু, **End justifies the means.** কাজ হওয়া নিয়ে কথা; তা, যে করেই হোক। তাছাড়া আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি।

ঠকিয়েছি তো।

একে ঠকানো বলে না। তোমার ফ্যাক্টরী যখন দাঁড়িয়ে গেছে বংশীলালের টাকা তুমি দিয়ে দিতে পারবে, স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও অভাবে পড়বে না। গিন্নীর গয়না? সে তো সারাজীবনের দায়। না নিলেও দিতে হত।

যাক ওসব কথা। এবার শেষটা সামলাই কেমন করে তাই বল।

তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার কাজে চলে যাও। ঐ ব্যাগটা শুধু রেখে যাও আমার কাছে। ওটার মায়া তোমাকে ছাড়তে হবে। ভেতরের কাগজ পত্তর সব নিয়ে যেতে পারো।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। মহিমের তখনো দেখা নেই। ভীষণ উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করছিলেন প্রতিভা। বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ হতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে নেমে আসছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মুখের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠলেন প্রতিভা। অস্ফুট স্বরে বললেন, কী হয়েছে!

চলুন, বলছি।

বাইরের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বঙ্কুবাবু। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, মহিম যখন ট্যাক্সি থেকে নেমে লটারী অফিসের দিকে যাচ্ছিল,

দুটো ষণ্ডামতন লোক এসে হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।...তার মধ্যে ওর টিকিটটা ছিল। পুলিশে অবিশ্যি খবর দেওয়া আছে। তবে—

বাকীটুকু না বললেও বুঝতে অসুবিধা হল না। পুলিশ আর কী করবে।

প্রতিভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মেয়েদুটিও ঘরে এসে ঢুকেছিল। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালের ধারে।

এর আর কোন উপায় নেই ? অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন প্রতিভা।

না, টিকিট যে দেখাবে সে-ই টাকাটা পাবে।

উনি কোথায় ?

আমার ওখানে। এল না। বলল, কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সকলের সামনে ?

যথা সর্ব্বস্ব

বাজারের থলেটা সুধাংশু রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে রেখেছিল। নন্দা তখন ডাল চড়িয়েছে। বেড়ালটাকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি এসে তুলে নিল। ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, মাছ পাওনি বুঝি ?

"পেলে কি হয়, ছোঁবার জো নেই" শোবার ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল সুধাংশু। জামা খুলতে গিয়ে পকেটে কি একটা ঠেকতেই বলে উঠল, ও, তোমার একটা চিঠি আছে।

"আমার চিঠি।" অবাক হল নন্দা। তাকে আবাব চিঠি লিখবে কে ! স্বামীর হাত থেকে খামখানা নিয়ে উলটে পালটে দেখল। অচেনা হাতের লেখা।

খুলে ফেলে প্রথমেই তলার দিকে লেখকের নামটা দেখে নিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুধাংশু সেটা লক্ষ্য করে কাছে সরে এসে বলল, কার চিঠি ?

ঃ "মামার।"

ঃ "মামা !" কপাল কুঞ্চিত হল সুধাংশুর। নন্দার যে কোনো মামা আছেন, কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ল না।

নন্দা ততক্ষণে পড়া শেষ করে চিঠিখানা সুধাংশুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, পড়।

"আমি আবার কী পড়বো ? নতুন খবর কিছু থাকে তো বল।"

"আহা, পড়েই দ্যাখ না।"

খবর ছিল, এবং বেশ দরকারী খবরই বলা যেতে পারে। ঠিকানা রয়েছে ধানবাদ। অবসরের অভাবে দীর্ঘকাল ভাগনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন নি। 'তজ্জন্য' দুঃখ প্রকাশ করে এবং 'তৎসত্ত্বেও' তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করে এসেছেন. জানিয়ে পরে লিখেছেন, কিছুদিন আগে কঠিন অসুখে

পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানের দয়ায় কোনো রকমে প্রাণটা ফিরে পেয়েছেন। শরীর খুব দুর্বল। পুষ্টিকর আহার ও সেবাশুশ্রূষার আশু প্রয়োজন। একান্ত আপনজন ছাড়া কার কাছেই বা সেটা আশা করা যায়? আর নন্দা ছাড়া আপন বলতে কেই বা আছে তাঁর? তাই স্থির করেছেন তার কাছেই এসে পড়ে থাকবেন কিছুদিন। "কতকাল তোমাকে দেখি নাই"—ইত্যাদি।

'কতকাল' কেন কোনো কালেই বোধহয় নন্দা মামাকে চোখে দেখেনি। দেখলেও এমন বয়সে, যার স্মৃতি কারো মনে থাকবার কথা নয়। মার কাছে অবশ্য তাঁর অনেক কথা শুনেছে। সবই নানাজনের কাছে শোনা, এবং সে সব খবরের মূলে কারো প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে বলে জানা যায়নি।

কোলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সেই যে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং আর কখনো ও-মুখো হন নি, মামার সম্বন্ধে এটুকু তথ্য সকলের জানা। বাড়িতেও ফেরেন নি; ফিরবার উপায় ছিল না। বাবা ছিলেন কড়া ও বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার। 'স্বদেশী-ওয়ালা' ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চান নি। 'ছেলেও' তারপর থেকে বাড়ি বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে নি।

মাঝে মাঝে নানারকম খবর ভেসে আসত। তার একটার সঙ্গে আরেকটার মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। কেউ নাকি কোত্থেকে শুনে এসেছে, মামা হরিদ্বারে এক আশ্রম খুলে বসেছেন, কারো কাছে শোনা গেল তিনি আসাম অঞ্চলে খদ্দর প্রচার করছেন। স্বাধীনতার পর ধানবাদ না রানীগঞ্জে কয়লার ব্যবসা করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, এরকম গুজবও একবার শোনা গিয়েছিল।

এ সবই নন্দার বিয়ের অনেক আগের ব্যাপার। বিয়ে হতেই চলে এসেছে ভাটপাড়ায়। পাটকলে কাজ করে সুধাংশু। মাইনে তেমন কিছু নয়। দুজনের সংসার কোন রকমে চলে যায়। তবে বাসাটুকু ভাল। দু কামরা-ওয়ালা কোয়ার্টার্স। সামনে একফালি জমি। ছোট্ট একটি ফুলের বাগান করেছে নন্দা।

ওদিকে মা মারা গেছেন, বাবা গেছেন তারও আগে। বোন নেই। দাদারা দুজনেই বাংলার বাইরে। নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কোনো তরফ থেকেই খোঁজ খবর নেবার পাট নেই। মামা তো বহু আগেই, বলতে গেলে, কিংবদন্তীর পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিলেন।

কদিনের মধ্যেই মামা এসে গেলেন। বয়স হয়েছে। শীর্ণ চেহারা। সর্বাঙ্গে সদ্য রোগমুক্তির ছাপ। ধীরে ধীরে নামলেন রিক্সা থেকে। সঙ্গে একটি ছোট সুটকেশ আর কম্বলে জড়ানো বিছানার বাণ্ডিল। সুধাংশু ছিল না। রিকশর আওয়াজ শুনে নন্দাই বেরিয়ে এসেছিল। আন্দাজে বুঝতে পেরে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। মামা ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, বেঁচে থাকো মা। সেই এতটুকু দেখেছিলাম তোকে। তোর নিশ্চয়ই মনে নেই।

নন্দা জবাব না দিয়ে একটু হাসল। অনুযোগের সুরে বলল, কবে কোন

ট্রেনে আসছেন কিছু জানান নি। জানালে আমরা স্টেশনে যেতে পারতাম। একা একা বাড়ি চিনে আসতে কষ্ট হল।

"কষ্ট আর কী? দু-এক জায়গায় একটু জিজ্ঞেস করতে হয়েছে। জামাই কই?"

"মিল্‌এ গ্যাছে।"

"কখন ফিরবে?"

"সাড়ে পাঁচটায় ছুটি। এখখুনি এসে পড়বে।"

"বাঃ, বাসাটি তো বেশ"; ভিতরে পা দিয়ে খুশীর সুরে বললেন মামা, "কই আমার দাদু দিদি কাউকে তো দেখছি না।"

নন্দা সলজ্জ হাসিমুখে চুপ করে রইল। সেদিকে চেয়ে মামা বললেন, ও এখনো কেউ আসে নি বুঝি? তাহলে আপাতত আমিই তাদের জায়গায় বহাল হলাম। কি বলিস?

বলে, হেসে উঠলেন।

পরদিন জামাকাপড় বের করতে গিয়ে সুটকেস্ খোলা হল। নন্দাকে দিয়েই খোলালেন মামা। বললেন, তলার দিকে একটা প্যাকেট আছে, বের কর। সাবধানে তুলে রেখে দাও। পরে সব বলছি।

"কী আছে এর মধ্যে?" কাগজে জড়ানো, সযত্নে সুতো দিয়ে বাঁধা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জানতে চাইল নন্দা। মামা হাসলেন, একটু যেন রহস্যময় হাসি। ধীরে ধীরে বললেন ওর মধ্যে আমার যথাসর্বস্ব।

সুধাংশুও ছিল ঘরে। মামার অলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীতে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল।

চিঠিটা আসবার পর মামাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। মার কাছে যা-যা শুনেছিল, সবই বলেছে নন্দা। কয়লার ব্যবসা করে ভদ্রলোক যে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, এই মুহূর্তে সেই কথাটাই বোধহয় দুজনের মনে পড়ে থাকবে।

মামা বাইরে গেলে প্যাকেটটা আলমারীতে জামা কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে রাখতে নন্দা চাপা গলায় বলল, শোনো আজই একটা গডরেজের ভালো তালা কিনে এনো। এটা মোটেই মজবুত নয়।

সুধাংশু মাথা নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

মামার একটু ভালোমন্দ খাবার অভ্যাস। ভাগনীর কাছে সেটা অকপটে ব্যক্ত করলেন। তার উপর অসুখ থেকে উঠে অবধি লোভটা আরো বেড়েছে। নন্দাকে পাঁচ রকম রান্না করতে হয়। তাছাড়া তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার জন্যে ফল দুধ—এসব তো আছেই। সে ব্যবস্থা ওরা হয়তো নিজে থেকেই করত। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা না করে মামা ভাগনীকে গোড়াতেই তালিম দিয়ে দিলেন, কী কী ফল তার ভালো লাগে, কখন কোনটা চাই,—"দইটা দুপুর বেলা ভাতের পাতে দিস, দুধটুকু দিস রাত্তিরে খাবার পর, বিকেলে ফলের সঙ্গে একটু ছানা, সকালে চায়ের আগে এক কাপ হরলিক্‌স্—এই হলেই চলবে।"

জামাই কখন বাজারে যায় মামার খেয়াল আছে। জিজ্ঞাসা করেন, কী মাছ আনবে আজ ?

প্রথম দু-চার দিন উৎসাহ দেখিয়েছে সুধাংশু। জানতে চেয়েছে কোন্ মাছ মামার পছন্দ। ক্রমশঃ গলায় আর জোর পাচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, দেখি কি পাই।

"কই মাছ এনো। বেশ বড় বড় কই উঠেছে, দেখলাম সেদিন।"

সকালে ভারী বকম ব্রেকফাস্টের পর এক চক্কর বেড়িয়ে না এলে দুপুর বেলা খিদে হয় না। ঐ সময়টা বাজারটাও ঘুরে আসেন মামা। বাড়ী ফিরে রান্না-ঘরের দরজায় মোড়া নিয়ে বসে কি কি দেখে এলেন তার একটা লম্বা ফিরিস্তি দেন ভাগনীকে, এবং তার মধ্যে কাল কোনটা আনতে হবে তার অর্ডারটাও দিয়ে রাখেন।

প্রথম প্রথম নন্দা আশা করত, বেড়িয়ে ফিরবার পথে একটা কিছু হাতে করে ঢুকবেন মামা—"তোর জন্যে নিয়ে এলাম।" বড় কিছু না হোক, টুকিটাকি গোছের কোনো জিনিস। সে আশা একদিন পূর্ণ হল। গেট থেকেই চীৎকার—'নন্দা'। নন্দা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো।

"চমৎকার দুটো তাল পেলাম এই লোকটার কাছে, একেবারে গাছপাকা। একটাতে বড়া হবে আরেকটা দিয়ে তালক্ষীর। করতে পারবি তো ? চার আনা পয়সা দিয়ে দে লোকটাকে।"

মাসের পয়লা তারিখ মাইনে পেয়ে গোটা টাকাটাই সুধাংশু স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। যখন যেমন দরকার চেয়ে নেয়। নন্দাকে বেশ হিসাব করে চালাতে হয়। কোনো কোনো মাসে শেষের কদিন টান পড়ে। স্বামীকে জানতে দেয় না। একটা 'রিজার্ভ ফাণ্ড' আছে তার। সেখান থেকে চালিয়ে দেয়। একদিন সকালে বাজারের টাকা দিতে গিয়ে নন্দা দেখল সেই তুলে রাখা কৌটোটার তলায় একখানা ছোট নোট আর কিছু খুচরো পয়সা পড়ে আছে। সুধাংশুকে ইশারায় ডেকে নিল ঘরের মধ্যে। ফিসফিস করে বলল, আমার হাতে আর কিছু নেই।

"বল কী।" মুখ শুকিয়ে গেল সুধাংশুর, "আজ সবে এগার তারিখ।"

"কী করবো বল। তুমিই তো আনছ সব হাতে করে। মাসের গোড়ায় যা দিয়েছিলে তা তো গ্যাছেই, আমার হাতে কিছু ছিল, এই দ্যাখ—" কৌটোটা কাত করে দেখাল।

"এখন উপায় ?"

"কোথাও ধার-টার পাও কিনা দ্যাখ।"

"কে দেবে ধার ? আর তাতে কদিনই বা চলবে ?"

নন্দা জবাব দিল না। কৌটোটা আলমারীতে তুলে রাখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল মামার সেই প্যাকেটটার দিকে। স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল। দেখল, সেও ঐ জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনে চোখাচোখি হল। দুজনেরই মনে হল, মামাকে বললে হয় না, এ সময়ে যদি কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলল না। সুধাংশু বেরোল ধারের সন্ধানে।

মাঝে একদিন শরীরটা খারাপ বোধ করলেন মামা। ডাক্তার এলেন, জুট মিলের রেসিডেণ্ট ডাক্তার। বিলাতী ডিগ্রি আছে। বললেন, প্রেশারটা অনেক বেশী রয়েছে, হজমও ঠিকমত হচ্ছে না। খাওয়া দাওয়ায় কড়াকাড়ি দরকার।

যা খাচ্ছিলেন, তার অনেক কিছুই বাতিল করে দিয়ে গেলেন ডাক্তার। তিনি চলে যেতেই মামা তাকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন—"হুঁ! চটকলের ডাক্তার তো, কত আর বিদ্যে হবে। 'খাওয়া কমাও', আরে, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী? তুই ওসব কিছু শুনবি না নন্দা। যা খাচ্ছিলাম, তাই খাবো।"

এর দিন কতক পরে গেটের বাইরে গোলমাল শুনে নন্দা বেরিয়ে এসে দেখল, রিকশর উপরে সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছেন মামা। সঙ্গে পাড়ার দুটি ছেলে। তাদের কাছে শোনা গেল, বাজারের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলেন। তারা ছুটে এসে দেখে জ্ঞান নেই, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। না, শুকনো রাস্তা, পা পিছলে পড়েছেন বলে মনে হলো না! মাথা-টাথা ঘুরে গিয়ে থাকবে। তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে রিকশয় তুলে নিয়ে এসেছে।

ছেলে দুটির মধ্যে একজন গেল ডাক্তার ডাকতে, আরেক জন ছুটল সুধাংশুকে খবর দিতে।

ডাক্তার এসে বললেন স্ট্রোক। তবে প্রথম আক্রমণ বলে ততটা মারাত্মক হয় নি। সেরে উঠবেন আশা করা যায়, যদিও বেশ সময় লাগবে। শুধু কি সময়? তার সঙ্গে ব্যয়বহুল ব্যাপক চিকিৎসা।

সুধাংশু এবার খোলাখুলি বলল নন্দাকে, আর পারছিনে। এবার ঐ প্যাকেটের শরণ না নিয়ে আর উপায় নেই।

"কিন্তু ওঁকে না বলে,—ওর মধ্যে কী আছে, না আছে—"

সুধাংশুর মনে হল, কথাটা ঠিক। ওঁকে না জানিয়ে ওটা খোলা যায় না। আর এ অবস্থায় জানানোও মুশকিল। এখনো পুরো জ্ঞান ফিরে আসে নি। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে?

নন্দা বললে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকা ধার নাও।"

"কী যে বল! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকা চাইলেই পাওয়া যায় নাকি? গ্রাউণ্ড দেখাতে হবে তো। মামা শ্বশুরের অসুখ কোন গ্রাউণ্ড নয়।"

"মামা শ্বশুরের অসুখ কেন বলতে যাবে? বলবে স্ত্রী অসুখ।"

শুনেই বুকের ভিতরটা ছ্যাক করে উঠল সুধাংশুর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে। অনেক দিন পরে যেন দেখল তাকে। এ কী হয়ে গেছে নন্দা। দুচোখ ভরা ক্লান্তি, তার নীচে এক রাশ কালি।

কণ্ঠার হাড় দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের সে উজ্জ্বল রং কোথায় গেল! সত্যিই অসুস্থ নন্দা। যে ঝড় বয়ে চলেছে তার উপর দিয়ে, এতদিন যে বিছানা নেয়নি সে শুধু মনের জোরে।

নন্দাও দুচোখ মেলে দেখছিল সুধাংশুকে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলল, নিজের অসুখও বলতে পার। কিন্তু তা হলে যে আবার ছুটি নিতে হয়। এখন অন্তত সে উপায় নেই।

এবারকার মত ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন মামা। অনেক কাঠ খড় পোড়াবার পর। ডাক্তারের ফী না লাগলেও দামী দামী ওষুধ লেগেছে অনেক। পথ্যের পিছনেও কম যায় নি। যখন খুব বাড়াবাড়ি নার্সও রাখতে হয়েছিল। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের দেনা তো আছেই। তার উপর দোকান বাকি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধার। কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে দেয়নি সুধাংশু। নন্দাও কোন দিকে চায়নি। দুজনেরই মনে মনে ভরসা এক জায়গায়। তা নাহলে হয়তো এতটা পারত না।

সেদিন ছিল রবিবার। সুধাংশুর ছুটি ; বাড়িতেই রয়েছে। মামা পিঠের নীচে গোটা দুই বালিশ চাপিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নন্দা এসে দাঁড়াল খাটের পাশে।

"এসো মা, বোসো" স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিছানার কোণ-টা দেখিয়ে দিলেন। "তোরা যা করলি, আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

"ও কথা বলবেন না। কী আর এমন করেছি আমরা" সময়োচিত প্রতিবাদ জানাল নন্দা। একটু থেমে বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম মামা। আপনি কিছু মনে করবেন না।

"না, না, মনে করবো কেন ? বল, কী বলবি।"

নন্দা আরো মিনিট খানেক ইতস্ততঃ করল। তারপর আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে কুণ্ঠার সুরে বলল, "আপনার জামাই তো তেমন কিছু পায় না। চটকলের চাকরি, সামান্য মাইনে। কিছু ধার দেনা হয়ে গেছে।"

"সে তো হবারই কথা। এত বড় একটা অসুখ গেল।"

"তাই বলছিলাম, এ সময়ে যদি কিছু—, আপনার ঐ প্যাকেটটা আনবো ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম তোকে বলবো ওটা নিয়ে আয় আর সুধাংশুকেও ডাক। আমার যা বলবার এখনি বলি। কে জানে, কবে ডাক আসে ?"

নন্দা প্রায় ছুটে গিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে এল। হাসি মুখে সুধাংশুকেও ইঙ্গিত করল আসতে।

মামা বাণ্ডিলটা হাতে করে মিনিট কয়েক কি ভাবলেন। বোধ হয় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পিছনে ফেলে আসা দীর্ঘ দিনগুলোর উপর। তারপর বললেন, "আমার কোনো কথাই তোমাদের বলা হয় নি। বলবার আছেই বা কী ? ঘর সংসার করিনি। সারাটা জীবন কেটে গেছে পথে ঘাটে। সাধ্যমত দেশের সেবা করবার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতা যখন এল, বন্ধুরা বলল, এতদিন তো ঘুরে বেড়ালে, এবার একটু গুছিয়ে বসো। কিছু টাকা দিলেন পার্টির কর্তারা। কয়লার কারবার শুরু করলাম। পোষাল না। ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেলাম। তারপর—'

বাণ্ডিলটা তুলে দিলেন ভাগনির হাতে। বললেন, 'খোলো। ওরই মধ্যেই আছে আমার সব কিছু।'

নন্দার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্ষীপ্র হাতে খুলে ফেলল সুতোর বাঁধন। মোড়কটা সরাতেই ভিতর থেকে বেরোল একটা ফুলস্‌ক্যাপ সাইজের

খাতা, তার নীচে কিছু চিঠিপত্র। সেগুলো হাতড়ে দেখল। খামটাম বা ঐ জাতীয় কিছু নেই। খাতার পাতাগুলো উলটে গেল। ভিতরেও কিছু নেই।

হতাশ জিজ্ঞাসু চোখে মামার দিকে তাকাতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, 'ঐ খাতাটা তোমরা রেখে দাও। আমার সারা জীবনের সাধনা। একখানা মহাকাব্য। ছাপিয়ে বের করো। মামা যখন থাকবে না, ওরই মধ্যে তাকে খুঁজে পাবে।'

ঘেরাও

সারা বছর রক, সিনেমার কিউ, ফুটবল-ক্রিকেট, পার্টি মীটিং, প্রসেশন ইত্যাদি পুরোদমে চালিয়ে পরীক্ষার মুখে আমাদের শ্রীমানদের যে অবস্থায় পড়তে হয়, আমার অবস্থা তার চেয়েও সঙ্গীন। তারা বোধ হয় সর্ষের ফুল দেখে, আমার চোখের সামনে ঘোর অন্ধকার।

কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের খপ্পরে পড়ে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করেছিলাম। প্রথমটা একটু আপত্তি তুলতে তিনি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন "কিছুই নয়, মাসে মাসে আট দশ খানা করে স্লিপ। দুদিন বসলেই হয়ে যাবে।"

হবার কথা ; কিন্তু আসলে হয় না। জীবন বীমার বার্ষিক কিস্তিও গায়ে লাগে না, যদি মাসে মাসে কিছু কিছু করে জমিয়ে রাখা যায়। কিন্তু কজন তা করে ? হঠাৎ হুঁশ দেখা দেয় নোটিশ পাবার পর। এও অনেকটা তাই।

পরের কিস্তিটা একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। এদিকে মাথায় কিছু নেই। গত সংখ্যায় নায়ক-নায়িকাকে যেখানে এনে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে তাদের আবার কোথায় নিয়ে তুলবো, ভেবে পাচ্ছি না। প্লটটাকে টেনে টেনে একটি মোড়ের মাথায় এনে দাঁড় করিয়েছি। তারপর কোন রাস্তা ধরবো, তাও ঠিক করে উঠতে পারছি না। কিছুদিন আগে একটা নতুন মুখ, যাকে বলে পার্শ্ব চরিত্র, আমদানী করেছিলাম। তার নামটাও মনে পড়ছে না।

এক প্রবীণ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। তাঁর কোনো উপন্যাসের সন্ধিস্থলে এসে ভাবনায় পড়লেন, ততঃ কিম, তারপর কী ? অনেকগুলো অধ্যায় জুড়ে যে তরুণ যুগল তাঁর কুশলী লেখনীর মুখে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে, এবার তাদের কোথায় নিয়ে যাবেন ? অনেক ঘুরিয়েছেন ছেলে মেয়ে দুটিকে। দার্জিলিং ছাড়িয়ে ঘুম পাহাড়ে নিয়ে তুলেছেন, সেখানে থেকে নামিয়ে এনেছেন পুরীর জনবিরল সমুদ্র-সৈকতে, বসিয়ে দিয়েছেন নিউ আলিপুরের অভিজাত গৃহের সুসজ্জিত ড্রইংরুমে এবং তার পরেই গড়ের মাঠের অন্ধকারে ঢাকা গাছের তলায় ঘন সান্নিধ্যে। নৌকা বিহারেও নিয়ে গেছেন আউটরাম ঘাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার। পাছে বুর্জোয়া লেখক বলে দুর্নাম রটে সেই ভয়ে কিছু দিন কসবার এক খোলার বস্তিতেও নিয়ে যেতে হয়েছে। খোলা নর্দমার কুৎসিত পাঁক, ছেঁড়া কাঁথার ভাপসা গন্ধ এবং বারোয়ারী কলতলার বে-আব্রু মিছিল ঘিরে যে জীবন তার স্বাদও এনে দিয়েছেন ওদের জীবনে। এবার কী করণীয় ?

রাত একটা বেজে গেছে। সারা বাড়ীতে কেউ কোথাও জেগে নেই, রাস্তা নির্জন হয়ে গেছে। সাহিত্যিক একা জেগে বসে ভাবছেন। তিনি যে স্রষ্টা, দ্বিতীয় বিধাতা, তাঁর চোখে ঘুম নেই। মাথায় কলম ঠুকছেন কিন্তু তার ভিতরটা বোধহয় জমাট বেঁধে গেছে, কিছুই বেরোচ্ছে না।

পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন স্ত্রী। সারাদিনের কাজকর্মের পর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। বন্ধুবর ভাবলেন গৃহিণী সচিব মিত্র···। এই বিপদে একটা উপায় বাতলে দিতে পারবেন হয়তো।

উঠে গিয়ে ডাকলেন, ওগো শুনছ?

"কী বলছ?"—অসময়ে ঘুমভাঙ্গার বিরক্তি জড়ানো সুর।

"এদের নিয়ে এখন কী করি বলতো?"

"কাদের নিয়ে?"

"এই ছেলে মেয়ে দুটো—উদয়ন আর তমিস্রা?"

বন্ধু পত্নী স্বামীর উপন্যাস পড়েন নি। (কোন পত্নীই বোধহয় পড়েন না) কিন্তু বুঝলেন ওরা কে। ঐ রকম বিদকুটে নাম গল্প উপন্যাসের পাতায় ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?

সাহিত্যিক তাঁর নায়ক নায়িকার জীবনধারার একটা মোটামুটি বিবরণ শোনালেন স্ত্রীকে। তিনি নিঃশব্দে শুনে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীর শান্ত স্বরে বললেন "বিয়ে দিয়ে দাও। সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরুক দুটোয়।" বলেই পাশ ফিরে শুলেন।

এই সহজ স্বাভাবিক সমাধানটি বন্ধুবরের পছন্দ হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমার উপন্যাসে এটা চলবে না। বিয়ে দিলেই তো ফুরিয়ে গেল। তার-পর আর পাঠকের কৌতূহলকে জীইয়ে রাখা যায় না। কিন্তু আমাকে যে এখনও অনেকদিন চালাতে হবে। বর্তমানে কলেবরটাই উপন্যাসের প্রধান গুণ।

তাছাড়া বিয়ে ব্যাপারটা এ যুগের পাঠক পাঠিকার কাছে নেহাৎ জলো। 'বিবাহের চেয়ে বড়' কিছু না দিতে পারলে 'সেকেলে লেখকের' দলে গিয়ে পড়তে হবে। সাধ করে সর্বনাশ ডেকে আনি কেন?

দুটো দিন যে ভাববো, সে সময়ও নেই। একেবারে শিরে সংক্রান্তি। সম্পাদক বারবার তাগিদ দিচ্ছেন। প্রেস বসে আছে। সব ম্যাটার তৈরী, শুধু আমার এই 'কিস্তির' অপেক্ষা। আর একটা দিন দেরী হলে ঠিক সময়ে কাগজ বের করা যাবে না। নামী পত্রিকা, সে দুর্ঘটনা ওঁরা ঘটতে দিতে রাজী নন।

একটি মাত্র উপায় আছে। একটা সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি—"লেখকের অসুস্থতা নিবন্ধন 'জীবন যজ্ঞ' উপন্যাসটি এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।"

কথাটা মিথ্যাও নয়। বর্তমানে আমার যে অবস্থা,—শারীরিক না হলেও মানসিক—তাকে কোন মতেই সুস্থ বলা চলে না।

সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম, এবং ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটি পেশ করলাম। ঝড়ের মুখে পড়তে হবে আশঙ্কা করছিলাম। তার কোন লক্ষণ না দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হলাম। তারপর আশ্বস্ত। এবারকার মত বেঁচে গেলাম তাহলে।

প্রবীণ সম্পাদক মহাদেব বাবু আমার বক্তব্য নিঃশব্দে শুনে গেলেন, এবং বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রুক্ষ, হতাশ বা বিহ্বল দৃষ্টি নয়, কেমন যেন একটু আনমনা। কী একটা যেন ভাবছেন মনে হল।

মিনিট কয়েক পরে হাতের কাজ গুটিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন. আসুন আমার সঙ্গে।

"কোথায় !"

"একটু ঘুরে আসি চলুন।"

নিরুত্তাপ স্বর। যেন কিছুই হয়নি। কোথায় একরাশ অভিযোগ, অনুযোগ না 'একটু ঘুরে আসি চলুন !' আমি তো একেবারে থ।

যন্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে পড়লাম ওঁর গাড়িতে। উত্তর কোলকাতা থেকে ভবানীপুর। পথে আগাগোড়া নীরব হয়ে রইলেন মহাদেব বাবু। রকম সকম কেমন যেন রহস্যময়। দু একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও কোন কথা তুললাম না।

একটা কোন গলির মধ্যে মাঝারি ধরনের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। মহাদেব বাবু নেমে গিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললেন, আসুন।

কড়া নাড়তেই একটি চাকর এসে সদরের কপাট খুলে দিল। আমরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে সোজা তেতলার ছাদে উঠে গেলাম !

পাশাপাশি দুখানা ঘর, তালাবন্ধ। সামনে অনেকখানি খোলা ছাত। আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে মহাদেব নীচে নেমে গেলেন। মিনিট পনের সময় গেল ফিরে আসতে। সবিনয়ে বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন।

সেই চাকরটি আগেই এসে একটা ঘর খুলে দিয়েছিল। ঢুকে পড়ে আমাকেও ভিতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

ঘরখানা বেশ বড়। সাজানো গোছানো। ওদিকে দেওয়াল ঘেঁষা শোবার খাট, বিছানা, পাশে টিপয়, আলোর স্ট্যাণ্ড। এদিকে লিখবার টেবিল, চেয়ার, বই-এর আলমারী। জানালার ধারে একখানা ইজি চেয়ার।

আমি চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ওঁর দিকে। সম্পাদক বললেন, আমার এক বন্ধুর বাড়ি। এখানে শোয়, আর লেখাপড়া করে। কদিনের জন্যে বাইরে গ্যাছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। পাশেই বাথরুম, ওদিকে খোলা ছাদ। খাবার-দাবার ঠিক সময়ে আসবে। আর—

বাকীটুকু শেষ করবার আগেই একটি তরুণী এসে ঢুকল। মহাদেববাবু বললেন, এটি আমার বন্ধুর মেয়ে মিণ্টু। আপনার দেখাশুনা করবে, কিন্তু বিরক্ত করবে না। আমি কাল বিকেলে ঠিক পাঁচটার সময় আসবো। ততক্ষণে আপনার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। ফিরবার পথে আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে যাচ্ছি ·····তাহলে আমি এবার চলি, মিণ্টু !

মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা কাকাবাবু।'

'তোমার ওপর সব ভার রইল।'

'আপনি কিছু ভাববেন না।'

আমার দিকে না তাকিয়ে এবং কোনো কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সম্পাদক দ্রুত পায়ে প্রস্থান করলেন।

মেয়েটির হাতে ছিল একটা প্যাড। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর রাখল। আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, আপনি কী কলম দিয়ে লেখেন? সরু না মোটা?

বললাম, মোটা।

'আমিও তাই। তাহলেও আর একটা সরু পার্কার রেখে গেলাম।'

টেবিলের উপর একটা টাইমপিস্ টিক্ টিক্ করছিল। সে দিকে চেয়ে বলল এগারটা বাজে। আপনি এখন চান করে নেবেন কি?

'না।'

'তাহলে একটু কফি দিই?'

'কফি আমি খাই না।'

'চা?'

'দরকার নেই।'

'বাথরুমে তোয়ালে, তেল, সাবান, পাজামা সব কিছু দেওয়া আছে। আমি ঠিক আধঘণ্টা পরে আসবো। তার আগে যদি কোনো দরকার হয় এই কলিং বেল-এর বোতাম টিপে দেবেন।'

আড় চোখে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। মুখময় একটা চাপা হাসি। এসে অবধি চেপে রাখতে চেষ্টা করছিল। এবার অনেকটা বিস্তৃত হল।

ছাতের উপর এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ। কৌতূহলবশে ঠেলে দেখলাম। ওপাশ থেকে ছিটকিনি তোলা। অর্থাৎ আমি বন্দী। আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে. ঘেরাওড্। তফাৎ এই, চারদিকে একটানা হেঁড়ে গলায় অশ্রাব্য শ্লোগ্যান শুনে কান ঝালাপালা হবে না। তার বদলে মাঝে মাঝে শুনতে হবে একটি মিষ্টি কণ্ঠের টুকিটাকি প্রশ্ন! তার মধ্যে কিছুটা হয়তো মধুর শাসন। তা মন্দ কী!

কিন্তু ঐ হাসিটা? আমার এই অসহায় বন্দীদশা দেখে যে কিছুতেই চাপা থাকতে চাইছে না? দু চোখ দিয়ে বলছে, কেমন জব্দ? তা হোক। সুন্দর মুখের সব হাসিই সুন্দর।

ধার

তিনদিন ডাক খোলা হয়নি। খান-পনরো খাম, পোস্টকার্ড, প্যাকেট জড়ো হয়েছে টেবিলের উপর। সোমেশবাবু একবার চোখ বুলিয়েও দেখেননি। সময় হয়নি। লোকে শুনলে অবশ্য বলবে ওটা নেহাৎ বাড়াবাড়ি। গড়ে রোজ পাঁচ-ছখানা চিঠি পড়তে আর কত সময় লাগে? কিন্তু সোমেশবাবু জানেন, এবং

তাঁর মত অবস্থায় যাদের পড়তে হয় তারাও বুঝবেন ঐ সময়টুকু দেওয়া সত্যিই কত কঠিন। শুধু সময় নয়, তার সঙ্গে কিছুটা মনও তো দিতে হবে। সেটা আরও কঠিন। আপাততঃ মন নামক বস্তুটিকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে টেনে এনে একটা জায়গায় বন্ধক দিতে হয়েছে। তার নাম লেখা, পুজোর লেখা।

উপায় কী? বছর বছর পুজো সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, লেখকের সংখ্যা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। লেখক অবশ্য আছে, বাড়ছেও, কিন্তু পুজো সংখ্যা-প্রকাশকদের লিস্টিতে তাদের নাম নেই। সেখানে যাঁরা জাঁকিয়ে বসে আছেন তাঁদের সংখ্যাটা মুষ্টিমেয়। কয়েকজন নামী লেখক। বাড়তি চাপটা পড়ছে গিয়ে তাঁদেরই উপর।

সোমেশ মজুমদার সেই নামীদের একজন। প্রতিষ্ঠিত লেখক। বাজার আছে। বিভিন্ন পুজো-বার্ষিকীতে প্রতি বছর তিনটি উপন্যাস ও গোটা-দশেক গল্প লিখে থাকেন। এর উপরে আছে দু-চারটি খাতিরের লেখা, সেখানে কোন প্রাপ্তি নেই, এবং এ-পাড়া ও-পাড়ায় দুর্গোৎসব-স্যুভেনিরে গোটাকয়েক শুভেচ্ছাবাণী।

বয়স হয়েছে এবং প্রতি পুজোয় এক বছর করে বাড়ছে। ওদিকে লেখনীর ধার পড়ে যাচ্ছে। নিজেই বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় যা অবশ্য প্রয়োজন সেটা হচ্ছে উৎপাদন হ্রাস। লেখা কমানো।

কিন্তু নতুন নতুন কাগজের দাবি মেটাতে গিয়ে 'কোটা' আরও বাড়াতে হয়েছে। উপন্যাস দুই ছাড়িয়ে তিন-চার-এ উঠেছে, গল্পও বেড়ে গেছে।

চিঠি পড়ার সময় কোথায়?

চিঠিগুলোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কী আছে তার মধ্যে। সব সময় খোলার দরকার হয় না। বেশির ভাগ সম্পাদকের তাগিদ, কিছু কোন সাহিত্যে বাসর বা গানবাজনার আসরের নিমন্ত্রণ-পত্র, দু-চারটি জানা-অজানা সাময়িক পত্রিকা এবং প্রায় প্রতি ডাকেই একখানা দুখানা সুদৃশ্য খাম, যত্ন করে লেখা নাম ঠিকানা—ভক্ত পাঠক বা পাঠিকার মুগ্ধ প্রশস্তি। একসময়ে যখন বয়স কম ছিল, ঐ খামগুলো দেখেই মনটা খুশী হয়ে উঠত, খুলে পড়তেও ভাল লাগত। এখন বুঝতে পারেন মনটা যেন কেমন শুকনো আর ভোঁতা হয়ে গেছে, ছোটখাটো আনন্দগুলো সেখানে আর তেমন সাড়া জাগায় না। তবু প্রশংসার একটা মোহ আছে। তারই আকর্ষণে চিঠিগুলো পড়েন, উত্তরও দেন।

এমনি একখানা খাম কদিন থেকে এসে পড়ে আছে স্তূপের মধ্যে। শিরোনামার অক্ষরগুলো অচেনা। কিন্তু বাঁদিকে হেলানো ঐ বিশেষ ধাঁচটি ওঁর পরিচিত। ভিতরকার বিষয়বস্তুও অজানা নয়। নতুন পাঠিকারা যা বলে থাকেন। তবু তুলে নিয়ে ধারটা ছিঁড়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেত। 'থাক' বলে রেখে দিয়েছেন। একটু ফুরসত যখন হল প্রথমেই ওটা টেনে নিলেন।

কয়েকটি মাত্র লাইন। পড়েই একটা চমক লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিষণ্ণ

হয়ে উঠল। চিঠিখানা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন সোমেশবাবু। তারপর আবার পড়লেন—

শ্রীচরণকমলেষু,

আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার বাবাকে হয়তো মনে পড়বে। তাঁর নাম শ্রীমনোহর দত্ত। প্রায় পঁচিশ বছর আগে জয়শ্রী এবং অন্য দু-একটি মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখতেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল।

কিছুদিন থেকে তিনি শয্যাগত। উঠে বসে লিখতে কষ্ট হয়। তাঁর নির্দেশে আমি এই চিঠি লিখছি। আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা। একটি বিশেষ অনুরোধ আছে।

এ সময়ে আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। তবু যদি কিছুটা সময় করে অল্পক্ষণের জন্যে আমাদের বাসায় আসতে পারেন আমরা সকলেই বিশেষ বাধিত হব।

প্রণতা দীপ্তি দত্ত।

মনোহর দত্ত! হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। পঁচিশ বছর নয়, ভুল করেছে মেয়েটি, কিংবা মনোহরের নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই। বছর তিরিশেক আগে তাঁরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে লিখতে শুরু করেন। দুজনেরই প্রথম লেখা বেরিয়েছিল 'জয়শ্রী'তে।

সোমেশ মজুমদার সদ্য এম. এ. পাস করা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শহুরে ভাবধারায় লালিত। মধ্য কলকাতার একটা বোর্ডিঙে থাকে। সকালে-বিকেলে ছাত্র পড়ায় আর দুপুরে কোট-প্যান্ট পরে ডালহৌসি-পাড়ায় বড় বড় আফিসে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তার গল্পের বিষয় ছিল রোম্যান্স্ ও কল্পিত প্রেম।

মনোহর দত্তের জন্ম নিম্নবিত্ত পরিবারে। আই. এ. পাস করে আর পড়া হয়নি। দূর পল্লীঅঞ্চলে এক মাইনর ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। আর গল্পে ছিল তারই মত একটি দুঃস্থ সংসারের ছবি। তার মধ্যে কল্পনার রং যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল রূঢ় বাস্তবের অনুভূতি। পড়ে অন্য অনেক পাঠকের মত যেমন তারিফ করেছিলেন সোমেশবাবু, তেমনি বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটু ঈর্ষাবোধ না করে পারেননি।

তখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু মনোহর দত্ত ও সোমেশ মজুমদার দুজনে দুজনের প্রতি ভিতরে ভিতরে একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ অনুভব করত। দুজনে ভিন্ন পথের পথিক। হয়তো আকর্ষণের আসল কারণটা সেইখানে।

মনোহর লিখত খুব কম। সে তুলনায় সোমেশ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতি সংখ্যায় না হলেও দু-তিন মাস অন্তর তার গল্প বেরোত জয়শ্রীতে।

মিষ্টি কাহিনী, প্রচুর ভাববিলাস ও উচ্ছ্বাসময় ভাষা। মনোহরের গল্পের মানুষগুলো যেমন অতি সাধারণ, ভাষাও তেমনি সাদামাটা অলঙ্কারহীন। মনোহর ভাবত, সোমেশ যেখানে বিচরণ করে সেই রূপৈশ্বর্যময় রঙিন জগতে সে কখনও উঠতে পারবে না। সোমেশ জানত মনোহরের চারদিকে যে সরল

অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গ জীবনধারা সেখানেও সে কোনদিন পৌঁছতে পারবে না।

বছরখানেক পরে দুজনের দেখা হল জয়শ্রী আফিসে। সম্পাদকই দুজনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে সুযোগটা করে দিয়েছিলেন। তার পর থেকেই একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। মনোহর মাঝে মাঝে আসত সোমেশের বোর্ডিঙে, সোমেশেরও ইচ্ছা ছিল মনোহরের গ্রামের বাড়িতে একবার বেড়িয়ে আসবে। সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

সোমেশ মজুমদারের প্রথম গল্পের বই যখন বেরোয়, তার কিছুদিন পরে একই প্রকাশক মনোহর দত্তের একটা গল্প-সংকলন বের করেছিল। তখন 'জয়শ্রী' ছাড়া অন্যান্য কাগজেও ওদের লেখা বেরোচ্ছে এবং একটি মাঝারি ধরনের মাসিকপত্রে সোমেশ মজুমদারের ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু হয়েছে। ভাল চাকরিও জুটে গেছে একটা।

এর পর থেকে মনোহর ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগল। কলকাতায় আর আসত না। এলেও জয়শ্রী আফিসে কিংবা সোমেশের বোর্ডিঙে তাকে দেখা যেত না। লেখাও বেরোত কালেভদ্রে। কিন্তু যা লিখত্ তার মধ্যেই একটা গভীর ও তীব্র জীবনবোধের দীপ্তি ঝলমল করত। চিঠিপত্র সে কোনদিনই বড় একটা লিখত না। ইদানীং তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জয়শ্রী সম্পাদক দুখানা চিঠি লিখে উত্তর পেলেন না। সোমেশ লিখেছিল। সে চিঠিরও একই অবস্থা।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল মনোহর চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজীর সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স আন্দোলনে যোগ দিয়ে কানপুর না আমেদাবাদ কোথায় যেন চলে গেছে। সেই শেষ। মনোহর দত্ত হারিয়ে গেল শুধু সাহিত্য-জগৎ থেকে নয়, সোমেশ মজুমদার এবং তার মত আরও কত অনুরাগী বন্ধু ও পাঠক-পাঠিকার জীবন থেকে।

সোমেশবাবুর হাতে তখন অনেক লেখা বাকি। দ্বিতীয় উপন্যাসখানা সবে শুরু করেছেন, বেশির ভাগ গল্পে হাত দিতেই পারেননি। ভাবেনওনি কী লিখবেন, কী নিয়ে লিখবেন। ওদিকে বৃহৎ বৃহৎ বার্ষিকী আসন্ন-প্রকাশ। দিন-তারিখের বিজ্ঞাপন পড়ে গেছে। বিভিন্ন কাগজ থেকে তাগিদ আসছে। রোজ সন্ধ্যায় লোক এসে ধরনা দিচ্ছে বৈঠকখানায়। যা পাচ্ছে, পাঁচ-ছয়-সাত পাতা, তখনি নিয়ে চাপিয়ে দিচ্ছে প্রেসে।

অতি ব্যস্ত লোকেরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন, মরবার ফুরসত নেই। সবাই জানে ওটা একটা কথার কথা। সোমেশ মজুমদার স্বীকার করেন না। সত্যিই যদি মৃত্যু এসে আজ শিয়রে দাঁড়ায় তাঁকে বলতে হবে, একটু সবুর কর ভাই, এই স্লিপটা শেষ করতে দাও।

কিন্তু হাতের চিঠিখানাকে সে কথা বললেন না। অসমাপ্ত 'স্লিপ' পড়ে রইল টেবিলের উপর। কলমের মাথায় টুপি পরিয়ে কলমদানির গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। জামাটা গায়ে গলিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, গৃহিণী নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। একমাসের উপর স্বামীকে

তিনি ঘরের বাইরে পা দিতে দেখেন নি। নামমাত্র আহার ঐখানেই চুকিয়ে ফেলেন। বাথরুমটা ঘরের সংলগ্ন। সবিস্ময়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

—একটু বেরোচ্ছি।

—সে কী!

দুটো কাগজের নাম করে বললেন, ওদের ওখান থেকে এখুনি লোক আসবে। একটু আগে টেলিফোন করেছিল।

—বিকেলে আসতে বলো।

বলতে বলতে নীচে নেমে গেলেন সোমেশবাবু। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা আছে কিনা দেখে নিলেন। রাস্তার নামটা অচেনা, অঞ্চলটা চেনেন। সেখানে গিয়ে বাড়িটা খুঁজেপেতে বের করতে হবে।

সে কাজটা দেখলেন বেশ কঠিন। চেতলা দিয়ে একশবার যাতায়াত করেছেন। কিন্তু ভিতরে অর্থাৎ যাকে বলে ইনটিরিয়ারে কখনও ঢোকেননি। সেখানে যে এত গলি-ঘুঁজির গোলকধাঁধা, ধারণাই ছিল না। নম্বরের উপর নির্ভর করে বাড়ি খুঁজে পাওয়া সেখানে অসম্ভব। কোলকাতায় তখন যে অবস্থা চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাওয়াও নিরাপদ নয়। বেশির ভাগ পথচারীর চোখে সন্দেহ। কেউ কেউ পাল্টা প্রশ্ন করে—কোত্থেকে আসছেন? কার বাড়ি যাবেন? কী করেন তিনি? শহরের পাড়ায় পাড়ায় অদৃশ্য পাঁচিল উঠে গেছে, অন্য পাড়ার লোক সেখানে অবাঞ্ছিত কিংবা তার চেয়েও বেশি, দুশমন, একবার গিয়ে পড়লে কখনও কখনও প্রাণটি রেখে আসতে হয়—সকালের কাগজ খুলে এমনিধারা খবর মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে, কিন্তু তার আসল চেহারাটা দেখা ছিল না।

সোমেশবাবুর কী হাল হত বলা শক্ত। তাঁকে বাঁচিয়ে দিল একমাথা পাকা চুল। ঐ পাসপোর্টের জোরে তার গন্তব্য গলির একটা হদিস পেয়ে গেলেন। যে ছেলেটি দিল সে তাঁর বয়সকে খাতির করছে, তাঁদের যৌবনকালে যাকে বলা হত রেস্‌পেক্ট ফর এজ, এই ভেবে পুলকিত হবার মত ভীমরতি তাঁর হয়নি। ওটা আর কিছু নয়, 'বুড়ো' বলে এক ধরনের তাচ্ছিল্য এবং হয়তো তার সঙ্গে মেশানো কিছুটা অনুকম্পা।

যত এগোচ্ছেন, গলিটাও তত সরু হয়ে যাচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে, জায়গায় জায়গায় বেশ পিছল। দু'ধারের বাড়িগুলোয় শ্যাওলা জমেছে। কতকগুলো থেকে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তারই একটার গায়ে প্রায়-মুছে-যাওয়া নম্বরটা দেখে আস্তে আস্তে কড়া নাড়লেন সোমেশবাবু। খুলে দিল একটি মেয়ে। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলেন। কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের সর্বাঙ্গে এমন একটা দৈন্যের ছাপ এত কাছ থেকে কখনও দেখেননি। শীর্ণ লম্বাটে মুখের উপর একটুখানি ম্লান হাসির আভাস ফুটে উঠল। সোমেশবাবু বললেন, আমার নাম—

—আমি জানি। আসুন। কদিন থেকে বাবা বারবার বলছেন, চিঠিটা বোধ হয় আপনি পাননি।

ঢুকেই একটা ফালিমত বারান্দা। সেটা পেরিয়ে ছোট্ট একখানা ঘর। দরজা

থেকেই মেয়েটি খুশির সুরে বলে উঠল, বাবা উনি এসেছেন।

'অ্যাঁ' বলে যে লোকটি বিছানার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কঙ্কালের সঙ্গে তার তফাত শুধু এইটুকু যে তার উপরে একটা চামড়ার আবরণ থাকে না এবং সে কথা বলে না। সোমেশ মজুমদার শুধু তাকিয়ে রইলেন। মুখে কোন কথা সরল না।

মনোহর থেমে থেমে বললেন, আমি জানতাম আপনি আসবেন। অনেক কথা বলবার ছিল। সে শক্তি নেই। শুধু একটা অনুরোধ—

গলাটা ক্ষীণ, অনেকটা বাচ্চা ছেলের মত সরু এবং জড়ানো জড়ানো। হঠাৎ থেমে যেতে সোমেশবাবু বললেন, আপনি এতটা অসুস্থ, আমাকে একটা খবরও তো দেননি। তুমিও একবার জানাতে পারতে।

মেয়েটির দিকে ফিরলেন। সে-ই যে দীপ্তি জিজ্ঞাসা না করেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সে মুখ নীচু করল, কোন উত্তর দিল না।

মনোহর বললেন, ও অনেকবার বলেছে। আমিই মানা করেছি। আপনাকে শুধু শুধু বিব্রত করা। এবার যে কষ্ট দিলাম, সে অন্য কারণে।

বলে থামলেন। একটু বোধ হয় সময় নিলেন সঙ্কোচের বাধাটা কাটিয়ে উঠবার জন্যে। তারপর বললেন, লেখা তো অনেককাল ছেড়ে দিয়েছি। কিছুদিন আগে কী খেয়াল হল, একটা গল্প লিখেছি। আমার জীবনের শেষ গল্প। ভাবছিলাম যদি কেউ নেয়। অনেক কাগজ তো বেরিয়েছে আজকাল। কিছু টাকারও দরকার ছিল। মেয়েটার চাকরি নেই এই তিন মাস!

সোমেশবাবু আবার দীপ্তির দিকে ফিরলেন, কোথায় চাকরি করতে তুমি?

—একটা প্রাইমারী স্কুলে। নকশালরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

মনোহর যোগ করলেন, ছেলেটাও ঐ দলে পড়ে কোথায় চলে গেছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে? এদিকে আমি পড়ে আছি।

সোমেশবাবু জানতে চাইলেন, গল্পটা আছে আপনার কাছে?

—আছে। মেয়েকে দিয়ে দু-তিন জায়গায় পাঠিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় পড়েও দেখেনি।

একটা কাঁচ-ভাঙা দেয়াল আলমারি ছিল তক্তপোশের ওপাশটায়। দীপ্তি তার ভিতর থেকে একটা বাণ্ডিল বের করে এনে সোমেশের হাতে দিল। ভাঁজ খুলতেই চোখে পড়ল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'অস্তাচল'। সোমেশ যখন পাতা উল্টে দেখছেন, মনোহর বললেন, সেদিন হঠাৎ মনে হল আপনি হয়তো এর একটা গতি করে দিতে পারবেন। তাই মেয়েকে বললাম, একটা চিঠি দে।

সোমেশ যখন উঠে পড়লেন, দীপ্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল। দোরগোড়ায় এসে থামলেন। মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে কী ভাবলেন, তারপর পার্সের ভিতর থেকে খানকয়েক নোট বের করে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না দীপ্তি। তোমার বাবা আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওঁর চিকিৎসার জন্যে—

দীপ্তি মাথা নেড়ে বলল, বাবা নেবেন না। সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। বিহার গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী। একসঙ্গে জেলে ছিলেন ওঁরা। তিনি অনেক পীড়া-

পীড়ি করলেন, বাবার ঐ এক কথা—আমি কারও দান গ্রহণ করি না।

সোমেশ বললেন, কিন্তু আমি তো এটা দান হিসেবে দিচ্ছি না। সে স্পর্ধাও আমার নেই। সামান্য কটা টাকা ধার দিচ্ছি। উনি সেরে উঠলে—

—না, ধারও নেবেন না বাবা।

সোমেশবাবু শেষ চেষ্টা করলেন, তাহলে এটা আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। ওঁকে না-ই বা জানালে।

—সে হয় না, কাকাবাবু। আপনি আমাকে মাপ করবেন।

রাস্তা পর্যন্ত নেমে এসে দীপ্তি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, সময় পেলে আবার আসবেন।

ট্যাক্সিতে উঠেই গল্পটা পড়তে শুরু করলেন সোমেশবাবু, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্ময় হয়ে গেলেন। একটা কথাই মনে হল, সেই প্রথম জীবনে যা হত, সেখানে তিনি পৌঁছতে পারেননি, এবং কোনদিন পারবেন না।

পুজো সংখ্যার 'পাওনা' যারা বুঝে নিতে এল, তাদের প্রত্যেককে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সোমেশবাবু, দৈবক্রমে একটি আশ্চর্য গল্প তাঁর হাতে এসে গেছে—শক্তিমান লেখক, একসময়ে খ্যাতিও ছিল, তবে অনেক বছর লেখেননি বলে নামটা তেমন পরিচিত নয়। এ জিনিষ তাঁর হাত থেকে বেরোবে না। নিজের লেখার বদলে সেটাই তিনি দিতে চান। কাউকে রাজি করাতে পারলেন না। তিন-চার জন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলেন। কেউ কেউ লেখাটা একবার দেখতেও চাইলেন না, কেউ শুধু লেখকের নামটা দেখে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। সোমেশ মজুমদার ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হলেও আশ্চর্য হলেন না। তিনি তো জানেন ওঁদের কাছে ঐ নামটাই আসল, বস্তুটা অবান্তর। বাড়ি ফিরে নিজের কাজে মন দিলেন।

মাঝখানে খানিকটা সময় এই ভাবে চলে যাওয়ায় পুজোর চাপটা একটু বেশী করে পড়ল। তবে শক্ত ঘাড় তো। শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠলেন।

মহালয়া কেটে গেল। ছোট-বড় সবগুলো পুজো সংখ্যাই বেরিয়ে গেছে। লেখকেরা তাঁদের পাওনাগণ্ডা বেশির ভাগ বুঝে পেয়েছেন। কিছু কিছু দক্ষিণা তখনও বাকী। একটি নামী কাগজের দপ্তর থেকে একজন পিয়ন একখানি চিঠি নিয়ে এল মনোহর দত্তর বাসায়।

সবিনয় নিবেদন,

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসোমেশ মজুমদার মহাশয়ের নির্দেশে আমাদের পুজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত 'অস্তাচল' গল্পটির সম্মানমূল্য বাবদ দুইশত টাকা পাঠাই-লাম। প্রাপ্তি স্বীকার করিলে বাধিত হইব।

বিনীত

সম্পাদক : 'জনমানস'

মনোহর চিঠিটা নিয়ে পিয়ন-বুকে সই দিলেন। টাকাটার জন্যেও একটা রসিদ দিলেন।

দীপ্তি বাড়ি ছিল না। যখন ফিরল মনোহর বললেন, আমার বালিশটা একটু তুলে দে তো মা।

—কেন ?

—আমি একটু বসব। একখানা চিঠি লিখতে হবে।

—তার জন্যে বসতে হবে কেন ? আমাকে বল না। আমি লিখে দিচ্ছি।

—না, এ চিঠি আমিই লিখব। তোকে আর এর মধ্যে জড়াব না।

মেয়ে বাপকে চেনে। জিদ ধরলে তাঁর কাছে নতিস্বীকার না করে উপায় নেই।

কয়েক লাইনের চিঠি। তা হলেও বেশ কষ্ট হল লিখতে।

প্রীতিভাজনেষু,

সম্পাদকের চিঠি ও টাকাটা পাবার আগেই 'জনমানসে' প্রকাশিত 'অস্তাচল' গল্পটি আমার চোখে পড়েছে। আমার মেয়ে পাড়ার কোন বাড়ি থেকে পড়তে নিয়ে এসেছিল।

আপনি আপনার নামটি আমাকে ধার দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছেন। বাধ্য হয়ে দিয়েছেন, এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না, সবই বুঝতে পারছি।

আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি কারও কাছ থেকেই ধার নিই না। কারণ, এ জীবনে শোধ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। আপনি হয়তো বলবেন, এ তো টাকাকড়ি বা জিনিসপত্র নয়, শুধু একটা নাম। তবু তো ধার এবং মূল্যবান ধার। টাকাটা ফেরত পাঠালাম। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

প্রীতিধন্য মনোহর।

দীপ্তিকে ডেকে বললেন, চিঠি আর টাকাটা আজই সোমেশবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

রক্ত রেখা

মাঠের মাঝখানে না হলেও রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। শীতের সন্ধ্যা। চারিদিকটা ক্রমশঃ নির্জন হয়ে উঠছে। কাছাকাছি আবছা আলোয় যাদের মৃদু-গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল—বেশির ভাগ যুগল-মূর্তি, তারা অনেকেই উঠে গেছে। তাদের কেন্দ্র করে যে মৌমাছির দলটি ঘোরাঘুরি করছিল, তারাও সরে পড়েছে।

নীপা এতক্ষণ নিজের মধ্যেই ডুবে ছিল। মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠা এবং কিছুটা বিরক্তি নিয়ে দেখছিল রাস্তার দিকে—কী হল রণেশের! এবার ভয় ভয় করতে লাগল। দিনকাল ভাল নয়। আর বসে থাকা ঠিক নয়। উঠতে যাবে ঠিক সেই সময়ে দূরে ল্যাম্প-পোস্টটার কাছে পরিচিত চলার ভঙ্গীটি চোখে পড়ল। হন-হন করে এগিয়ে এল রণেশ—'কতক্ষণ এসেছ ?'

'অনেকক্ষণ। তোমার এত দেরি যে ?'

রণেশ উত্তর না দিয়ে বসতে যাচ্ছিল। নীপা উঠে পড়ে বলল, 'এখানে না, ওদিকটায় চল।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। রণেশের ঘোর আপত্তি—'দূর ঐ একগাদা লোকের মধ্যে বসে কথা হয় নাকি ?'

'কথা খুবই হয়, তবে—' মুখ টিপে হেসে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল নীপা। ইঙ্গিতটা হাসিমুখে নীরবে মেনে নিল রণেশ। বলল, 'তাহলে চল, একটা কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসা যাক।'

'না', বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করল নীপা, 'রোজ রোজ' অমনি পয়সা নষ্ট করতে হবে না। তোমার অত দেরি হল কেন, বললে না তো?'

রণেশ জবাব দিল না। একটি গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল মুখের উপর। রাস্তার আলোয় লক্ষ্য করল নীপা। উদ্বেগের সুরে বলল, 'ওদিকের খবর সব ভাল তো?'

'এখন পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটেনি। তবে লক্ষণ বিশেষ ভাল বলা যায় না।'

'কেন কী হল আবার?'

'সেই ছাঁটাই নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল না?'

'সেদিন তো বললে, সব মিটমাট হয়ে যাবে।'

'এখানকার কত্তাদের হাবভাব দেখে তাই মনে হয়েছিল। এরা বোধহয় মেটাতেই চায়। যাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে তারা চটে থাকলে শেষ পর্যন্ত ফার্মেরই লোকসান, সেকথা এরা বোঝে। কিন্তু ওপরে বসে যারা পলিসি ডিক্টেট করে তাদের বুদ্ধি অন্যরকম, মেজাজও আলাদা। তারা যে স্ট্যাণ্ড নিয়েছে, তার থেকে একচুল নড়বে না। দরকার হলে গেট বন্ধ করে দেবে।'

'বল কী!' চমকে উঠল নীপা। রণেশ বলল, 'এমপ্লয়িজদের তরফ থেকে স্ট্রাইকের নোটিশ পড়লেই তারাও লক-আউট ডিক্লেয়ার করবে—এই রকম শুনতে পাচ্ছি।'

'তারপর?' শুষ্ক মুখে মৃদুগলায় অনেকটা যেন নিজের মনে বলল নীপা।

তারপর আর কী? দরজা একবার বন্ধ হলে আর যে খুলবে সে ভরসা করা যায় না। খুললেও ছ'মাস-এক বছরের আগে তো নয়ই।'

নীপা কিছু বলল না। সেই ভয়াবহ সম্ভাবনাটা মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল বোধহয়। রণেশের কথা শোনা গেল—'যাক, চল কোথাও বসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে।'

'দাঁড়ালে আবার কোথায়?'

'রাস্তার ধারে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী এসে ধরল। সেই জন্যেই তো এত দেরি।'

'ওঁরা কী বলেন?'

'যা বলে থাকেন। লড়তে হবে, তবে নিজের নিজের কোমরের জোরে। পার্টিফান্ড থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না। তাদের টাকা নেই।'

'তোমাদের কোমরে আর কত জোর?'

'অন্ততঃ এখন তো একটুও নেই'—বলে সামনের একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল রণেশ। নীপাও এগিয়ে গিয়ে বসল তার পাশটিতে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর রণেশ সব ব্যাপারটাকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খুশির সুরে অন্য কী একটা মজার কথা পাড়ল। কিন্তু নীপা কোন উৎসাহ দেখাল না, বলল, 'ভাল লাগছে না; চল বাড়ি যাই।'

চার বছর। না, তার চেয়ে কিছু বেশিই হবে। নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলছে দুজনের। রণেশ প্রথম দুবছর ছিল অ্যাপ্রেন্টিস। মাঝারি গোছের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী ; সামান্য একটা অ্যালাউন্স পেত। বাড়িতে কিছু দিতে হত না। অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল তখন। তারপর মাইনে হল এবং মাসকয়েক না যেতেই বাবা মারা গেলেন। সংসার পড়ল ঘাড়ে। মা আর তিনটি ভাইবোন। খেতে পরতেই কুলোয় না, বিয়ে তো রীতিমত বিলাস। নীপাকে যদি বাড়িতে এনে তোলা যেত, হয়তো চলে যেত কোনরকমে। কিন্তু তা হবার নয়। জাত আলাদা ; মাকে কোনমতেই রাজী করান যাবে না। অপেক্ষা করতে হল মাইনেটা যতদিন আরেকটু ভদ্র স্তরে না ওঠে।

এবারে অনেক হিসাব-টিসাব কষে ওরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিল। বাড়িতে কিছু দিয়েও কোনরকমে শহরতলিতে একখানা ঘর নেওয়া চলবে। একটুকু বাসা। বহুকালের স্বপ্ন দুজনের। সেই যখন একই কলেজে পড়ত, ক্লাস পালিয়ে ঘুরত, আজ বটানিক্‌স্‌এ, কাল দক্ষিণেশ্বরে, তারপর দিন গড়ের মাঠে। তার মধ্যেই পাস করে বেরোল—নীপা বি-এ, রণেশ বি-এসসি। তার আগেই ঠিক হয়ে গেছে, একজনকে ছাড়া আরেকজনকে চলবে না। নীপার দিক থেকে কোন বাধা ছিল না। মা নেই, বাবা এদিক দিয়ে অতিশয় উদার। সোজা বলে দিয়েছেন, আমার কোন পুঁজি নেই, খরচপত্তর করে তোমার বিয়ে দেব, সে আশা করো না, তোমার দাদারা যেমন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়ে সরে পড়েছে, তুমিও তা স্বচ্ছন্দে করতে পার। আমি আপত্তি করব না।

নীপা শুধু একটি বস্তুর দিকে তাকিয়েছিল—রণেশের পকেট। এতদিনে সে মুখ তুলে চেয়েছে। স্বপ্ন সফল হতে আর বাধা নেই। রণেশ তখনো একটু দোমনা ভাব দেখাচ্ছিল, 'এর মধ্যে কুলোতে পারবে তো ?'

'নেহাত না পারি, আমিও বেরোব তোমার সঙ্গে। বি-এ পাশ করেছি, একটা যেমন তেমন মাস্টারিও কি জুটবে না ?'

কথা হচ্ছিল আউটরাম ঘাটে। রেলিংয়ের ধারে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। সামনে ভরা গঙ্গা। রণেশ চোখ ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকাল। সেখানেও কানায় কানায় ভরা জোয়ার। উপচে পড়চে। হাতদুটো এগিয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে লোক ; অতিকষ্টে সংযত করল। ফিস ফিস করে বলল, 'মাস্টারি কেন, অনেক বড় চাকরি জুটবে। একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হল অফিস পাড়ায় রথী-মহারথী-দের নির্জন চেম্বারে। সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে।'

নীপা ওর জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে হাসল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'অসভ্য !'

রণেশ সেদিকে কান না দিয়ে তার আগের কথার জেরে টেনে বলল, 'কিন্তু সেটি হচ্ছে না। চাকরি করতে দেব না তোমাকে।'

'কেন শুনি ?'

'আমার ইচ্ছে।'

'বেশ তাই হবে। আমার তো ভালই। বসে বসে খাব। শখ করে কেউ

চাকরি করতে বেরোয় নাকি ?'

একটা মনোমত ছোট ফ্ল্যাট খোঁজা চলছিল। হঠাৎ ফ্যাক্টরিতে দেখা দিল গণ্ডগোল। মালিক শ্রমিকে এটা সেটা নিয়ে মন-কষাকষি কিছুদিন থেকেই চলছিল। ফস করে কয়েকজনের মাথায় পড়ল ছাঁটাইয়ের ঘা। যে বিরোধ ছিল তলায় তলায়, সেটা এবার প্রকাশ্য সংঘর্ষের চেহারা নিয়ে জেগে উঠল। এদের হাতিয়ার স্ট্রাইক, ওদের লক-আউট।

রণেশ ও তার মত কিছু কর্মী যারা মাঝামাঝি এলাকার লোক, তারা এর কোনটাই চায় না। কিন্তু চাই না বললেই কি এড়ানো যায় ? কোন না কোন দলে ভিড়তেই হবে। গা বাঁচাবার উপায় নেই। ওদিকে রামে মারে. এদিকে রাবণ।

শেষ পর্যন্ত, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, বিরাট তালা পড়ল কারখানার ফটকে। একপক্ষ বলল, আমরা ঢুকব না, আরেক পক্ষ বলল, তোমাদের ঢুকতে দিচ্ছে কে ? রণেশের মত যারা তৃতীয় পক্ষ, তাদের কাছে দুটোর অর্থই এক, অর্থাৎ এখান থেকে অন্ন উঠল।

খবরটা শুনে নীপা একেবারে ভেঙে পড়বে, এই রকম একটা ভয় ছিল রণেশের মনে। কিন্তু দেখে আশ্বস্ত হল সে বেশ সহজ ভাবেই নিয়েছে ব্যাপার-টাকে। মুখ দেখে মনে হল, ভিতরে ভিতরে একটা কিছুর জন্যে তৈরী হচ্ছে। জানতে চাইল, 'কী ভাবছ ?'

'কিছু না'—মাথা নাড়ল নীপা। একটি ম্লান হাসির ছোঁয়া লাগল চোখ দুটিতে।

'ভেবে আর কি হবে ?' আশ্বাস দিল রণেশ, 'আজ থেকেই ঘোরাঘুরি করে দিয়েছি। একটা কিছু জুটে যাবেই। কবে, সেই হচ্ছে কথা। তদ্দিন—'

থেমে যেতেই নীপা মুখ তুলে তাকাল এবং রণেশ সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল. 'তা, এক রকম চলে যাবে।'

এক রকমটা যে কী রকম নীপার ধারণায় এল না। রণেশদের বাড়ির অবস্থা সে জানে। বাবা মারা যাবার পর গোটা দুই ঘর ভাড়া দিয়েছে। সে আর ক'টা টাকা ? তার সঙ্গে ওর ছোট ভাইয়ের টিউশানির রোজগার কুড়ি-পঁচিশ টাকা যোগ করলে যা দাঁড়ায় তাতে দিন দশেক চলবার কথা। বাকী কুড়ি দিন ?

নতুন কাজ জোটানোর ব্যাপারে 'কবে'র প্রশ্নটা যে ছোট নয়, সহজও নয়, তাও নীপার জানতে বাকী নেই। সে দিন তো আর নেই যখন কিছুটা কারিগরি বিদ্যা থাকলেই কলকারখানায় গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো যেত। তার উপরে যার ডিগ্রি আছে, অভিজ্ঞতা আছে, তাকে পায় কে ? কথায় কথায় কাজ ছাড়ত আর ধরত ছেলেরা। তারপর কী যে হল দেশের ! ছোট বড় সব কারখানায় শুরু হল শনির দশা। চলছে না। কারো কাঁচা মাল নেই, কারো তৈরি মাল কাটে না ! লোক নেবে কি ? যারা ছিল তাদেরই জায়গা নেই, কাজ নেই। যেদিকে তাকাও শুধু গোটাও আর হটাও-এর পালা। আর তাই ঘিরে যত বিরোধ বিসংবাদ গণ্ডগোল মার কাট।

রণেশই গোটা ছবিটা কথায় কথায় তুলে ধরেছে নীপার সামনে। সে-ও তো চোখ বুজে নেই। পথে ঘাটে চলে ফেরে। নিজের চোখেই দেখছে সবকিছু, তার থেকে এটা অন্ততঃ বুঝতে পারে সামনেকার দিনগুলো বড় অন্ধকার! এত দিন যে আলোর রেখাটা দেখা দিয়েছিল তাদের দুজনের জীবনে, যাকে লক্ষ্য করে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ হারিয়ে গেছে। সহসা সে আবার এসে দাঁড়াবে, এমন কোনো ভরসাও নেই।

ম্যাঙ্গো লেনের একটা বড় অফিস-বাড়ির সামনে ভিড়ের ভিতরে হঠাৎ একটি চেনা গলার ডাক—'নীপা!' নীপা চমকে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রস্তুতে পড়ল—যেন ধরা পড়ে গেছে। একটা ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। রণেশ এগিয়ে এল—'তুমি এখানে?'

'এমনিই।'

রণেশ ওকে ভালো করে দেখল। বেলা প্রায় বারোটা। স্নান খাওয়া সেরেই বেরিয়েছে বোঝা যায়। চোখে-মুখে সে তাজা ভাবটি স্পষ্ট। বেশ-বাসে পারিপাট্য না থাক, কিছুটা চাকচিক্য আছে। 'সেজেগুজে এসেছে' বলা ঠিক হবে না, তবে সব মিলিয়ে চোখে পড়বার মত!

'ব্যাপার কী বল তো?' রণেশের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর চাপা রইল না! নীপা সেটা উড়িয়ে দিল—'ব্যাপার আবার কী? অঞ্জনা বলে আমার এক বন্ধু আছে না?'

'অঞ্জনা!'

'ও, তোমাকে বলিনি বুঝি তার কথা? সে ঐ অফিসে চাকরি করে! অনেক দিন দেখা নেই, তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। তুমি বুঝি সকালেই বেরিয়েছ? বাড়ি যাবে না? চান-খাওয়া করবে কখন?'

রণেশ ওসব প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি যাই। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে এখুনি!'

বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তার বানানো গল্পটা যে রণেশ বিশ্বাস করেনি, বুঝতে পারল নীপা। অভিমানটুকুও না বুঝবার কথা নয়। যাক গে। পরে আবার যখন দেখা হবে—প্রায়ই তো হচ্ছে—তখন একটা বোঝাপড়া করে নিলেই হবে। কিন্তু এখানে আসবার আসল উদ্দেশ্যটা সে আপাততঃ অনুক্ত রাখতে চায়। তার প্রধান কারণ—ফল অনিশ্চিত। হয়তো শেষ পর্যন্ত সবটাই হবে নিছক পণ্ডশ্রম। সে লজ্জা গোপন থাক তার একার কাছে। শুধু তো লজ্জা নয়, ব্যর্থতার বেদনাও আছে। তা-ও সে একাই বহন করবে। ও-বেচারাকে আর তার মধ্যে টেনে আনা কেন? ওর নিজের বোঝাই কি যথেষ্ট ভারী নয়?

মাস তিনেকের উপর সে অফিসে অফিসে ঘুরছে। প্রথম প্রথম একটা জড়তা ছিল। 'এনকোয়ারী'তে বা 'রিসেপশনে' যারা থাকে, বেশির ভাগ মেয়ে, তবু তাদের কাছেও নিজেকে সহজ ভাবে দাঁড় করাতে পারত না। 'চাকরি আছে কি না'—এই ছোট্ট প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করতেও গলা শুকিয়ে যেত! আস্তে আস্তে

অনেকখানি এগিয়ে গেল। বড়বাবু-টাবুদের কাছে কোন সঙ্কোচই রইল না। সুদৃশ্য ঘষা কাচে ঘেরা সুসজ্জিত কামরায় একা যারা বসেন—ছোট-বড় মালিক, তাদের সামনেও সপ্রতিভ অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দে গিয়ে দাঁড়াল!

চাকরি-জগৎ, তার হালচাল সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে নীপা এখন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সে জানে সে সাধারণ গ্রাজুয়েট, স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন বলতে কিছু নেই, মুরুব্বির জোর নেই, এমন কিছু নেই যার বলে সে অন্য সকলের চেয়ে এক পাও এগিয়ে যেতে পারে। তার চার দিকে ভিড়, কিন্তু সামনের রাস্তাটি অতি সংকীর্ণ।

তবু যে সে লেগে আছে, এ-অফিসে সে-অফিসে ঘুরছে, কোথাও কিছু খালি নেই জেনেও চাপরাশী-আগলানো কাটা দরজা পেরিয়ে বড়-মেজ-সেজ কর্তাদের মসনদে হানা দিচ্ছে, তার মূলে হয়তো ছিল একটা সূক্ষ্ম সম্ভাবনা, যার ইঙ্গিত রণেশই দিয়েছিল তাকে। চাকরির জন্যে প্রথম দরকার—সেটি যার হাতে আছে তার চোখে লাগা। জায়গা আছে কিনা, সেটা পরের প্রশ্ন। না থাকলেও তৈরি হতে কতক্ষণ?

নীপা কি সেই আশা নিয়ে ঘুরছে? প্রশ্নটা সে করত তার নিজের কাছে। উত্তর দিতে গিয়ে প্রথম প্রথম অসুবিধায় পড়ত। মাঝে মাঝে মনের কাছে শুনতে হত—'ছিঃ!' কিন্তু সে পুরনো মন, সেকেলে মন। আস্তে আস্তে সে হটে গেল, এগিয়ে এল এ কালের মন। সে বলল, কী হয়েছে তাতে? দেওয়া নেওয়া নিয়ে সমাজ। তোমার যা আছে, দাও, তার বদলে অন্যের যা আছে, নিয়ে নাও; এরই নাম বিনিময়, এক্সচেঞ্জ। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়া। তোমার এই বিশেষ রূপ, বিশেষ সাজ, বিশেষ বয়স যদি ঐ টেবিলের ওপারে যে লোকটা বসে আছে, তার মুঠি দুটো আলগা করে দিতে পারে, এবং সেখান থেকে তোমার প্রার্থিত বস্তুটি বেরিয়ে আসে, তাতে দোষের কি আছে? ওগুলো ছাড়া যখন দেবার মত তোমার আর কিছু নেই, ঐগুলোকেই কাজে লাগাও।

কিন্তু কাজে লাগল না। টেবিলের ওপারে চোখগুলোয় ঘোর লাগল, লোভ জাগল, ইশারার দেখাও পাওয়া গেল কোথাও কোথাও। বিশেষ সুর এবং অর্থপূর্ণ হাসির আহ্বান এল—'মাঝে মাঝে দেখা করবেন।' নিভৃত সাক্ষাতের আমন্ত্রণ এল পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয়, চৌরঙ্গীর হোটেল-কক্ষে। কখনো কখনো 'লিফ্‌টের অফার'। দু-একটা মুঠিও যে খুলল না তা নয়, কিন্তু তার ভিতর থেকে চাকরি এল না। যা এল তাতে শুধু গা ঘিন ঘিন সার হল নীপার।

এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল, এর মূলে রয়েছে তার বি-এ ক্লাসের পাঠ্যবইতে পড়া ইকনমিকস্‌-এর সেই পুরনো থিওরী—ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। সে যে দাম পেল না, তার কারণ, ওদিকের ডিমাণ্ডের অনুপাতে তাদের সাপ্লাই অনেক বেড়ে গেছে, তার মত আরো অনেকে নেমে পড়েছে এই পথে; ঐ একই উদ্দেশ্যে। জোর কম্পিটিশন। চাকরি-দাতারা তার সুযোগ নেবে বৈকি?

এবার বেশ কিছুদিন পরে দেখা হল রণেশের সঙ্গে। সেই চিহ্নিত জায়গায়।

নীপা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে গেছে, ও আসতে পারেনি। একেবারে চেনা যায় না। চোখ বসে গেছে, গাল ভাঙ্গা, চোয়াল দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গ জোড়া ক্লান্তি। নীপা শুধু চেয়ে রইল। কী বলবে খুঁজে পেল না। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে লাগল। এমন করে আর কতদিন বাঁচবে! হঠাৎ একটা কঠিন অসুখ-বিসুখ করে বসবে। পেটে খাবার নেই, তার উপরে এই ঘোরাঘুরি হয়রানি, দুশ্চিন্তা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন বেরিয়েছ ?'

'ভোরবেলা।'

'তারপর আর বাড়ি যাওনি ?'

রণেশ হাসল। ম্লান হাসি—'গেলেই তো সেই পুরনো প্রশ্ন আর তার পুরনো জবাব। তাই বেশ রাত করে ফিরি।"

আবার দুজনেই চুপ। অনেকক্ষণ পরে নীপা মাটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অ্যাদ্দিন তোমাকে বলিনি। আমিও অনেক খুঁজলাম। কোন অফিসে, স্কুলে যেখানে হোক যেমন তেমন একটা কিছু। কিন্তু—'

রণেশ তেমনি বসে রইল। কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করল না। হয়তো খবরটা সে জানে, আন্দাজ করেছিল, কিংবা কোন কিছুতে বিস্মিত হবার মত দেহের ও মনের জোর আর ছিল না।

নীপার বাড়ি ফিরতে সেদিন বেশ দেরি হল। তার বাবা আগেই এসে গেছেন। ঘরে ঢুকবার মুখে ডেকে বললেন—'কী হল তোদের ? সেই রণেশ না গণেশ জোটাতে পারল কিছু ?'

'এখনো পারেনি।'...যেতে যেতে বলল নীপা।

'আর পেরেছে !'

কিছুদিন থেকেই তিনি মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ওদের সব ব্যাপার জানতেন। নীপাই বলেছিল এবং সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিল, রণেশের একটা ব্যবস্থা হলেই সে চলে যাবে !

নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়বার আগেই সুটকেশ খুলে একেবারে তলা থেকে বের করল একখানা চিঠি। কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে ঐখানে। কেন যে রেখেছিল, নীপা নিজেই জানে না। এতদিনে একবারও খোলেনি, দেখেনি। তেমন কোন ইচ্ছা হয়নি বা দরকার বোধ করেনি। ভুলেই গিয়েছিল একরকম। আজ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তারপর আবার রেখে দিল সেই জামা-কাপড়ের তলায়।

সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। ঐ চিঠিখানাকে ঘিরে কত কি চিন্তার ঢেউ ওঠা-পড়া করতে লাগল মাথার মধ্যে।

দিন কয়েক পরে অনিশ্চিতের অপেক্ষায় না থেকে চিঠি নিয়ে দেখা করল রণেশের সঙ্গে। সেই একই খবর। কোথাও কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়নি।

'আমি যা হোক একটা জুটিয়ে ফেলেছি।' হাসিমুখে বলল নীপা।

'তাই নাকি !'—রণেশের কণ্ঠেও খুশির সুর। হাত বাড়িয়ে দিল—

'কনগ্রাচুলেশন্স্। কোথায় জোটালে বল দিকিন ?'

'দাঁড়াও। সে সব ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আপাততঃ'—বলে রণেশের ডান হাতটা টেনে নিয়ে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে মুঠোটা বন্ধ করে দিল।

'এটা আবার কী হল !'

'একশো টাকা আগাম নিয়ে এলাম।'

'তা আমাকে কেন ?' তোমার 'চাকরির টাকা—'

'আমি কেন নেব ?—এই বলবে তো ? অসুবিধে হয় কাল একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়ে এসো। চাকরি টাকরি পেলে শোধ দিয়ে দেবে। সুদ সমেত।'

বলে, চোখে মুখে ওষ্ঠে একটি বিশেষ হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলল নীপা। 'সুদ' কথাটার মধ্যে হয়তো কোন ইঙ্গিত ছিল। অন্ততঃ সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে রণেশের তাই মনে হল। সে তাকিয়ে রইল। এ ক'মাসে আরো অনেক সুন্দর হয়েছে নীপা।

'যাক গে, শোন।' নড়ে চড়ে বসে আবার শুরু করল নীপা, 'একটা কোন ভালো হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নাও। মাসের শেষে টাকা দেবে। খবরদার, না খেয়ে এমন করে ঘুরবে না, বলে দিচ্ছি।'

'তার মানে রেগুলার কণ্ট্রিবিউশান। কিন্তু তোমার বাবা যখন জানবেন চাকরি করছ—'

'জানবেন কি, জেনে গেছেন। ক'দিন পরেই চলে যাচ্ছি ওখান থেকে।…'

'বল কি ! কোথায় যাচ্ছ ? তোমার খরচপত্তর—'

'সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মশাই। সব ঠিক আছে। মাসে মাসে তোমাকে এই টাকাটা দিয়েও আমার খুব ভালো ভাবে চলে যাবে। বুঝেছ ?'

দিন পনের পরে নীপা তার নতুন ঠিকানা জানিয়ে দিল রণেশকে এবং সেই সঙ্গে লিখল, এ ক'দিন আর যেতে পারছি না। ও মাসের গোড়ায় দেখা করব, আমাদের সেই পুরনো জায়গায়। এর মধ্যে যদি কোন দরকার টরকার পড়ে, জানাতে ভুলো না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিড় রইল অনেক দক্ষিণে, পশ্চিমের রাস্তা থেকেও বেশ কিছুটা তফাত—ময়দানের সেই বিশেষ জায়গাটি। কত বছর ধরে কত সুখ-দুঃখের, আশা-নৈরাশ্যের সাক্ষী ওদের। কাছে এসে দাঁড়ালেই কত কথা মনে পড়ে যায়।

প্রায় দিনই নীপা আসে, রণেশের আসতে দেরি হয়। আজ রণেশ বেশ কিছুটা সকাল সকাল এসে পড়েছিল। চারদিকের জুটীরা তখনো এসে জোটেনি।

একটু পরেই এল নীপা। দূর থেকেই বলে উঠল, 'এত তাড়াতাড়ি যে ?'—

'রোজ রোজ কৈফিয়ৎ দিতে হয়—'

'আজ নেবে বলে বসে আছ ? আচ্ছা, তাহলে শোন।' কাঁধ থেকে হাতব্যাগটা নামিয়ে রেখে মুখোমুখি চেপে বসল। ডান হাতের তর্জনী তুলে বলল, 'এক নম্বর হল—'

হঠাৎ লক্ষ্য করল রণেশের বড় বড় চোখ দুটো ওর মাথার উপর অচল হয়ে আছে। পলক পড়ছে না। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে পড়েছে। যেন কি একটা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু কথা ফোটেনি।

ক্ষণেকের জন্যে মুখখানা নত করল নীপা। হয়তো একটা লালচে আভা খেলে গেল চোখে, কপালে, গণ্ডে। তারপরেই সোজা হয়ে বসে বলল, 'অমন করে দেখছ কী! ও কিছু না। চাকরি পেয়েছি বলিনি? ওটা হচ্ছে তার ব্যাজ। পুলিস বা চাপরাশীদের যেমন থাকে না? তবে সেটা কাঁধে, আমার হল সিঁথেয়।'

রণেশের কানে কথাগুলো ঠিক পেঁছিল কিনা বোঝা গেল না। গেলেও হয়তো মাথায় ঢুকল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

নীপা মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছ কেন? শোনোই না। এর পেছনেও একটা মজার হিস্ট্রি আছে।...সেই যে একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতাম। বলিনি তোমাকে? বেশ ক'বছর আগে তখন এই ভদ্দরলোকের সঙ্গে আলাপ। সেই মেয়েটার মামা। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। বৌ মারা গেছে তিন-চার বছর আগে। আর বিয়ে করেনি, করবার নাকি ইচ্ছেও নেই। কেউ নেই সংসারে। ঠাকুর-চাকর নিয়ে থাকে! অবস্থা বেশ ভাল।

আমাকে দেখে 'ইচ্ছে'টা বোধহয় পালটে গেল। প্রায়ই আসত আমি যখন পড়াতে যেতাম। প্রথমে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারপর সোজাসুজি বলে ফেলল একদিন—আমি কি তার জীবনটাকে সার্থক করতে পারি না?

এতদিন কোন রকমে এড়িয়ে চলা গিয়েছিল। এবার 'দিদি', মানে মেয়েটার মা সুদ্ধ ওকালতি শুরু করলেন। আর ঠেকা গেল না। তাতেও কি নিস্তার আছে? শুরু হল চিঠি। সবগুলোই সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। একটা কেন যেন রেখে দিয়েছিলাম, বোধহয় হঠাৎ কেউ এসে পড়েছিল বলে লুকিয়ে ফেলতে হয়েছিল।

সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করে গিয়ে একটা মতলব এল মাথায়। বাড়ি ফিরে পড়লাম চিঠিটা। ঐ পাড়াতেই অঞ্জনা থাকে। আমার ভীষণ বন্ধু। তাকে তো তুমি চেন। তার কাছে খবর নিয়ে জানলাম, ভদ্দরলোক এখনো তার 'জীবনটাকে সার্থক' করবার মত কাউকে খুঁজে পায়নি। ভাবলাম, একটা চান্স দিলে কেমন হয়। কিছু টাকা আসে, আমাদের যেটা ভীষণ দরকার। রোজগারের যতরকম রাস্তা আছে, সবই তো দুজনে মিলে ঘুরে দেখা গেল। এভাবে আর চলে না। তোমার দিকে সত্যিই আর তাকানো যায় না।'

বলতে বলতে গলাটা ধরে এল নীপার! একটু থেমে আবার শুরু করল—'দেখা করলাম। বললাম, "আমি রাজী আছি। তবে আমার বাড়ির জন্যে মাসে মাসে আলাদা করে একশ টাকা চাই।" সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর।'

'আমি এবার চলি।' এতক্ষণে যেন বাকশক্তি ফিরে পেল রণেশ। উঠতে যাচ্ছিল, খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল নীপা—'কোথায় যাচ্ছ? শোন। আমাকে ভুল বুঝো না। এটা কিছু নয়। তোমার একটা চাকরি-বাকরি হলেই

বেরিয়ে আসব !'

'মানে ?' বিস্ময়ে চোখ তুলল রণেশ।

'সে সব আটঘাট না বেঁধেই কি এতদূর এগিয়েছি ? অত বোকা নই, বুঝলে ? খবর নিয়েছি, লোকটা এতদিন মোটেই উপোস করে বসে নেই, অনেক কীর্তি আছে। অঞ্জনাকে নিয়েও কম কাণ্ড করেনি। এমন সব মোক্ষম প্রমাণ আছে ওর কাছে, হাজির করলেই ডিভোর্স। কোর্টেও বোধহয় যাওয়া লাগবে না।'

রণেশ একটি কথাও বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার তাকালো ওর রক্তাক্ত সিঁথির দিকে। তারপর হন হন করে চলতে শুরু করল।

সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নীপা। হঠাৎ কি মনে পড়তে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা খুলে একখানা সাদা খাম বের করে চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, এ মাসের—'

রণেশ থামল না। ফিরেও তাকাল না। ঐ জ্বলজ্বলে লাল দাগটা যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

দাওয়াই

দরজাটা পুরোপুরি খুলল না। কপাট দুটো একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিল একখানা বসন্তের দাগওয়ালা মুখ। তার থেকে বেরিয়ে এল তিনটি শব্দ— "পুজোর নেখা হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা আবার ভিতরে সরে যাচ্ছিল, অতনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমরা পুজোর লেখার জন্য আসিনি। অন্য কাজ আছে।"

গোপেশ যোগ করল, "খুব জরুরী। বাবুকে যদি একবার--, পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না আমাদের।"

অনুনয়ের সুর। হয়তো সেইজন্যই মুখের সঙ্গে দেহের বাকী অংশটাও আবির্ভূত হল। খালি গা, খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত তোলা আধময়লা ধুতি আঁট করে পরা, চোখে সন্ধানী-দৃষ্টি। মিনিট দুই ধরে সেটা ওদের দুজনের মুখের উপর ফেলে বোধ হয় ভরসা হল এরা কোনো 'পুজো সংখ্যা'র লোক নয়। তবু জানতে চাইল, বাবুর সঙ্গে তাদের কী প্রয়োজন।

অতনু বলল, "সেটা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। বাবুকে বল আমরা একটা ক্লাব থেকে আসছি।"

"কেলাব !" নটবরের মুখে একগাল হাসি, "তাহলে মার সাথে দেখা করুন না। বাবু কেলাবে-টেলাবে যান না, মা যান।"

অতনু আর গোপেশ পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে আপাতত তাতেই রাজী হল।

মিনিট পাঁচেকের বেশী অপেক্ষা করতে হল না। সুমিত্রা হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ? ওঁর এখন যা অবস্থা আমার সঙ্গেও দেখা হয় না। হলেও লাভ নেই। কোনো কথাই মাথায় ঢোকে না।"

অতনু ওদের আসবার উদ্দেশ্যটা খুলে বলল। একটা নামকরা সওদাগরী অফিসের কর্মী ওরা। বেশ বড় ক্লাব। তার মধ্যে একটা ড্রামাটিক সেকশন বা নাটুকে দলও আছে। এবার পুজোর পরে তারা শিখিধ্বজবাবুর 'মঞ্জরী' নাটক-খানা মঞ্চস্থ করবে বলে স্থির করেছে। কিছুটা কাটছাঁট করা দরকার। সেটা ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে। কয়েকটা দৃশ্য বাড়াতে হবে। সেইখানেই হয়েছে মুশকিল।

গোপেশকে দেখিয়ে বলল, "আমার এই বন্ধুর এক-আধটু লিখবার অভ্যাস আছে। বাড়তি অংশটা মোটামুটি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু ডায়ালগগুলো ঠিক জুৎসই হচ্ছে না!"

গোপেশ বন্ধুকে সমর্থন করল, "অত বড় একজন লেখকের ভাষা, আর তার পাশে আমার! বুঝতেই পারছেন। তাই ওঁর কাছে এসেছিলাম। ঐটুকু যদি উনি একটু কষ্ট করে লিখে দিতেন!"

সুমিত্রার নাটকাদি ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ। ওঁদের ক্লাবেও মাঝে মাঝে অভিনয় হয়ে থাকে। উনি নিজে যোগ দেন। বেশির ভাগই সাম্প্রতিক কালের ছোট ছোট নাটক। প্রায় সবগুলোই বক্তব্যপ্রধান। চরিত্র বা সিচুয়েশন গৌণ ব্যাপার! মুখ্য উদ্দেশ্য হল কোনো থিওরি বা মতবাদ; জনাকয়েক মেয়ে-পুরুষের মুখ দিয়ে স্টেজের উপর সেটাকে আউড়ে দেওয়া। যেন কতকগুলো প্রাণহীন পুতুল, নাট্যকার এবং পরিচালক তাদের যেমন খুশি নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

এসব নাটকের বিষয়বস্তু সমসাময়িক ঘটনা বা মানসিকতা থেকে বেছে নেওয়া হয়। স্বভাবতই সেটা দর্শকদের কাছে কিছুটা ক্যাচিং, কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ তাদের মন টানে।

সুমিত্রার ঝোঁক সেই সব নাটকের দিকে যার আবেদন সর্বকালের। তাঁর স্বামীর কিছু নাটক সেই দলে পড়ে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাদের চাহিদা নেই বললেই হয়।

অতনুদের ক্লাব থেকে 'মঞ্জরী' অভিনীত হবে শুনে তিনি খুশী হলেন। মিষ্টিসুরের রোমান্টিক কাহিনী, অনেক চরিত্র, সময়ও লাগবে পুরো তিন ঘণ্টা। বড় বড় ক্লাবের উপযোগী। বললেন, "আমি ওঁকে বলবো, যদিও এসব কাজ উনি করতে চান না। বলেন, ওতে যে সময় লাগবে তাতে একটা নতুন লেখা অনেকখানি এগিয়ে যায়। তাহলেও আমি চেষ্টা করবো যাতে রাজী হন। তবে এখনো দিন-পনরো দরজা খোলা পাওয়া যাবে না। তারপর আপনারা আসবেন।"

তাই এল ওরা। তার আগের দিনই শিখিধ্বজবাবু তাঁর এ মরসুমের চতুর্থ উপন্যাসের শেষ 'স্লিপ' পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর কাছে সকালেই ব্যাপারটা মোটামুটি শুনে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার পর অতনু এবং গোপেশ এসে বিশদভাবে জানাল।

নাটকে প্রেমের দৃশ্য আছে তিনটি। তরুণ নায়কের সঙ্গে তরুণী নায়িকা। ঐগুলোকে যতখানি সম্ভব টেনে বাড়াতে হবে। তাছাড়া আরো কিছু নতুন সিচুয়েশন তৈরী করে অন্ততঃ গোটাতিনেক দৃশ্য জুড়তে হবে, যাতে করে তারা

অনেকক্ষণ দর্শকদের সামনে থাকতে পারে। বেশ জমাট সীন, আধুনিক ধাঁচের ফ্রী ডায়ালগ আর বোলড্ অ্যাকশন—এগুলো না হলে আজকালকার দর্শকরা নিতে চায় না। মুখ বেঁকিয়ে বলে, জ'লো জ'লো!

"আপনি তো সবই জানেন স্যর", বিগলিত সুরে ওদের সার বক্তব্যটা ব্যক্ত করল গোপেশ।

শিখিধ্বজ তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে আরো কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনিই তো নায়ক?"

উত্তর দিল অতনু। সরলভাবে বলল, "আমাদের সব নাটকেই হিরোর পার্ট ওর বাঁধা।"

গোপেশ প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রশ্নের তাৎপর্যটা ধরতে পেরেছিল। কিন্তু ধরা দিতে রাজী নয়, এমনিভাবে বলল, "সেসব কিছু নয়, স্যর। ব্যাপারটা হল, হিরোয়িনের রোলটা করবার জন্যে যে মেয়েটিকে আমরা পেয়েছি তার চার্জ বাজারের তুলনায় অনেকটা বেশী। অত টাকা যখন দিতে হচ্ছে, যতটা খাটিয়ে নেওয়া যায়!"

শিখিধ্বজ জানতে চাইলেন, "অভিনয় করে কেমন?"

"অ্যাভারেজের চেয়ে অনেক ভালো। বেশ সহজ সাবলীল।"

"দেখতে-শুনতে?"

গোপেশ একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে অতনু জবাব দিল, "তা রীতিমত সুন্দরী বলা চলে।"

শিখিধ্বজ বইটা চেয়ে নিলেন। তার মধ্যে কাগজ জুড়ে বাড়তি দৃশ্যগুলোর একটা খসড়া গোপেশ নিজেই করে রেখেছিল। তাতে আর বিশেষ হাত দিলেন না। সংলাপের অংশটায় কিছুটা অদল-বদল করে দিলেন।

পাব্লিক বোর্ড-এ অভিনয় হবে। আর দিন নেই। পুরোদমে রিহার্শাল চলছে। কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার বসাক সাহেবের প্রচুর উৎসাহ। মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন। পার্টও একটা আছে। একসময়ে হিরোর রোল্-এও নেমেছেন। এখন চল্লিশের কোঠায় বয়স। চেহারাও ভারী হয়ে পড়েছে। বয়স্ক চরিত্রে নামেন। যাতেই নামুন অভিনয় করেন ভালো। রিহার্শালে নিয়মিত আসা হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে এসে নিজের ছোট রোলটা করে চলে যান। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার। রোজ সন্ধ্যায় সস্ত্রীক গিয়ে বসেন। বিলিয়ার্ড খেলেন, পান-ভোজনাদি চলে।

মিসেস্ বসাকও চাকরি করেন, ভারত সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরে। এর আগে ।ছলেন কানপুরে! বহু তদ্বিরের জোরে এসেছিলেন কোলকাতায়। তাও বেশ কিছুদিন হল। এর মধ্যে দু-দুবার বদলির অর্ডার এসে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টায় কাটিয়ে উঠেছেন। তৃতীয়টাকে আর ঠেকাতে পারলেন না। পুজোর ঠিক পরেই চলে গেলেন পাটনায়।

বসাক সাহেব একদিন সকাল সকাল রিহার্শালে এসে হাজির। তখন নায়ক-

নায়িকার একটি প্রধান দৃশ্য চলছে। সেটা মুলতুবী রেখে ওঁর পার্টটুকু সেরে দেবে কিনা জানতে চাইলেন ডিরেক্টর। উনি বললেন, "না, না, আমি বসছি। দেখি আপনারা কদ্দুর কী করলেন!"

অভাবগ্রস্ত সংসারের যে-সব মেয়ে এদের মত অপেশাদার থিয়েটারে ঠিকা কাজ করতে আসে, অভিনয় হয়তো তারা মন্দ করে না, কিন্তু ভালো চেহারার অধিকারী বড়ই কম। সেদিক দিয়ে এই মেয়েটি রীতিমত ব্যতিক্রম। এর রূপ আছে, স্বাস্থ্য আছে এবং বয়সও সত্যিই কম; অর্থাৎ মেক-আপ-এর শরণ নিয়ে কমাবার চেষ্টা করতে হয়নি। তার উপরে অভিনয় জানে। কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গি দুই-ই চমৎকার। চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ, বরং একটু বেশী ফরওয়ার্ড।

সেদিক দিয়ে গোপেশকেই বরং আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। প্রগলভা নায়িকার ঘন সান্নিধ্যে ততটা সহজ হতে পারছিল না। হয়তো অত কাছে বস্ বসে আছেন, সেটা একটা কারণ। মেয়েটির বেলায় সেই কারণটাই ছিল নতুন উৎসাহের উৎস। কোম্পানির একজন কর্তা-ব্যক্তি জেনে তাঁর দিকে নজর রেখে তাঁকেই যেন বিশেষ-ভাবে খুশী করবার জন্যে সে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করে যাচ্ছিল।

বসাক সাহেব মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। সেই সব দিনের কথা ভাবছিলেন যখন আফিসের একটি ছোকরাকে নায়িকা সাজিয়ে তাঁর বিপরীতে নামানো হত। নিতান্ত করুণ দৃশ্যেও হেসে ফেলত দর্শকরা। মেয়ে তখনো পাওয়া যেত। কিন্তু এমন সব পল্লী থেকে তাদের জোটাতে হত যেখানে ওঁদের মত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের যাওয়া চলে না। তারপর কিছু ভদ্রঘরের মেয়ে আসতে লাগল এই পথে। বসাক সাহেবও পেয়েছিলেন দু-একজন। কিন্তু তারা যে মেয়ে, বুঝতে হত শুধু গলার স্বর থেকে।

সীনটা যখন শেষ হল, বসাক সাহেব ডিরেকটরকে ডেকে একখানা বই চেয়ে নিলেন এবং অনেকটা অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পার্ট আর বলা হল না।

পরদিন ছুটির খানিকক্ষণ আগে ডিরেকটর মধু ঘোষের ডাক পড়ল তাঁর চেম্বারে। যেতেই বললেন, "দেখুন, আপনাদের ঐ হিরোটিকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। ও আপনাদের ডোবাবে!"

মধুবাবুও গোপেশের ঐদিনকার কাজে খুশী হতে পারেন নি। অফিসের আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন, নাটক সম্বন্ধে যারা আগ্রহী। তাঁরাও সন্তুষ্ট নন। তাছাড়া গোপেশ অনেকটা নিজের মতে চলে বলে মধুবাবু এবং কর্তৃ-স্থানীয় আরো কেউ কেউ 'ছোকরাকে' ঠিক ভালো চোখে দেখতেন না। কিন্তু যেহেতু গোপেশ ইউনিয়নের একজন ছোটখাটো পাণ্ডা, ওর একটি দল আছে, তাছাড়া নাটক নিয়েই খাটছে সারাদিন, অভিনয়ও মন্দ করে না, সেইজন্যে ওকে কেউ ঘাঁটাতে চাইতেন না। ওর বিকল্প বলতে তেমন কাউকে পাওয়াও মুশকিল। সেই অসুবিধাটাই জানিয়ে দিলেন মধুবাবু!

বসাক সাহেব বললেন, "অন্য কাউকে না পেলে, আপনাদের যদি অমত না হয় আমি ঐ রোল্-এ নামতে পারি।"

"আপনি !" প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত যে মধুবাবু বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

"কেন ? পারবো না বলছেন ?"

"না, না ; পারবেন বৈকি স্যার ! আপনার অভিনয় তো আমরা দেখেছি।"

"তবে ? বয়সের কথা ভাবছেন ? সেটা মেক-আপ এ ঢাকা পড়ে যাবে। তার জন্যে কিছু একস্ট্রা খরচ চাই ; সেটা আমি দেবো।"

ডিরেকটর বলবার মত কিছু খুঁজে পেলেন না। বসাক সাহেব বললেন, "তাহলে ঐ কথাই রইল। আজ থেকেই রিহার্শালে যাচ্ছি।"

খবরটা রটতেই সারা আফিস তোলপাড়। মধুবাবু ভিতরে ভিতরে খুশী হলেও বাইরে অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন, "আমি কিছু করতে পারবো না ভাই। তোমরা বরং অন্য কাউকে ডিরেকটর কর।"

সেটা কেউ চায় না। চাইলেও সেদিকে সক্রিয়ভাবে কিছু করতে নারাজ !

তরুণদের দলে উত্তেজনাটা স্বভাবতই বেশী। অতনু প্রমুখ কয়েকজন, গোপেশের যারা বিশেষ বন্ধু, চেষ্টা করল ড্রামা-সেকসনে এমন একটা 'জনমত' গড়ে তুলতে, যার চাপে হয় গোপেশ নায়কের রোল্‌এ ফিরে যাবে, নয়তো অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে। খুব উৎসাহ দেখা গেল প্রথমটা। পরে বেশির ভাগই কেমন যেন থিতিয়ে পড়ল। কারণটা আসলে রহস্যময়। ঐ সুন্দরী অভি-নেত্রীটির সঙ্গে গোপেশের ঘনিষ্ঠতা—হলই বা স্টেজে—কোথায় বোধ হয় একটু সুক্ষ্ম কাঁটার মত বিঁধছিল তার বন্ধুদের মনে।

ইউনিয়নেয় তরফ থেকে কয়েকজন এটাকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে একটা আন্দোলনের পটভূমি রচনা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই একটা ব্যাপার নিয়ে লড়াইটা তেমন জোরদার হবে না। অন্য দু'চারটা ঐ সঙ্গে জুড়ে দিলে সুবিধে হত। আপাতত তেমন কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেল না। সম্প্রতি ভালো বোনাস দিয়েছে কোম্পানী। অন্যান্য দিকেও কর্মীদের দাবীদাওয়া তেমন মুলতুবী নেই। তবু কিছু একটা ছুতো করে হৈ-চৈ বাধানো যায়। তার ফলে নাটকটা বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা কারোরই মনোগত ইচ্ছা নয়। সারা বছরে ঐ একটিমাত্র ফাংশান। চাঁদাও দিতে হয়েছে মোটারকম। তাছাড়া কে জানে নায়িকার রূপ ও অভিনয়-নৈপুণ্যে কট্টর নেতাদের মনেও হয়তো কিঞ্চিৎ রসসঞ্চার করে থাকবে ! এ এমন জিনিস যার কাছে পলিটিকস্‌ও দুর্ভেদ্য নয় !···

নিজের নাটক অর্থাৎ উপন্যাসের নাট্যরূপ শিখিধ্বজবাবু বড় একটা দেখেন না। বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করলে বলেন, "তোমার সারা গায়ে ওরা ছুরি চালাবে, আর তোমাকে তাই হাসি-হাসি মুখ করে দেখতে হবে। কাঁহাতক পারা যায়।

এবার গৃহিণীর পাল্লায় পড়ে আসতে হল। নিজের কিছুটা কৌতূহল ছিল। ভীষণ উৎসাহ ঐ ছোকরাটির। খেটেছেও প্রচুর। দেখা যাক কেমন করে। কিন্তু তার প্রথম দৃশ্যটি যখন এল অবাক হয়ে দেখলেন, সে তো নয়, অন্য লোক নেমেছে তার রোল্‌-এ। তখনই উঠে পড়বেন ভেবেছিলেন। সুমিত্রা আটকে

দিলেন, "বসো নু আর একটু। অত করে নিয়ে এল ওরা। এখনই উঠে গেলে কী ভাববে!"

নতুন নায়কের অভিনয়ও মন্দ লাগল না। শুধু বয়সটা একটু বেশী। তাহলেও একেবারে বেমানান হয়নি। সস্ত্রীক শিখিধ্বজ রয়ে গেলেন।

আরো গোটা-দুই সীনের পর এল সেই বিশেষ দৃশ্যটি, গোপেশের অনুরোধে যেটা তিনি একেবারে আধুনিক ঢংএ লিখে দিয়েছেন। চঞ্চল প্রেমের প্রমত্ত জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছেন নায়ক-নায়িকাকে। দেখতে দেখতে প্রৌঢ় বয়সেও রীতিমত চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করলেন শিখিধ্বজবাবু। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, গৃহিণীর চোখেমুখেও যেন হারানো যৌবনের দীপ্তি-ঝলক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ওদিকে বসাক সাহেব বোধ হয় ভুলে গেছেন যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ঘুরছেন ফিরছেন, সেটা স্টেজ এবং যা করছেন সেটা অভিনয়। একটি সুন্দরী যুবতীর ঘনসান্নিধ্যে তাঁর শিরায় ছুটে চলেছে যৌবনরক্ত: সুদীর্ঘ মান-অভিমান লাস্য-লীলার পর নায়িকা যখন পরিপূর্ণ সমর্পণের ভঙ্গিতে তাঁর একান্ত কাছটিতে সরে এসে মুখখানা নামিয়ে দিয়েছে বুকের উপর আর তিনি দৃঢ় বেষ্টনীতে বন্দী করেছেন তার তনুদেহ, হঠাৎ উইংস্-এর পাশ থেকে কানে এল অত্যন্ত চেনা কণ্ঠের চাপা গর্জন—"বেরিয়ে এসো!" চমকে উঠলেন বসাক সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো নেমে এল। তাকিয়ে দেখলেন হাত তিনেক দূরে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে দুটি রোষ-কষায়িত চক্ষু। মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করতেই লক্ষ্য করলেন চোখ দুটো এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন।

"না, না; এখানে তো 'প্রস্থান' নয়!" সামনের সীটে বসে বলে উঠলেন শিখিধ্বজবাবু। তারপরই দেখলেন ড্রপ নেমে এসেছে। "এ কী হল?" বলে এদিক-ওদিক তাকালেন। সারা হল-এ তখন গুঞ্জরণ চলছে। সকলের মুখেই ঐ প্রশ্ন।

স্টেজ থেকে বেরোতেই স্বামীর ডান হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরলেন মিসেস বসাক এবং বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে চললেন বাইরের দিকে। ডিরেক্টর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রুদ্রমূর্তির দিকে একবার তাকিয়েই মুখ খুলতে সাহস করলেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল, গোপেশ পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। এতক্ষণ কোথাও তাকে দেখা যায়নি। মধুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

"তুমি রেডি?" প্রশ্ন করতেই গোপেশ হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল—"রেডি।"

তৎক্ষণাৎ মাইক বেজে উঠল—"একটি ঘোষণা। এতক্ষণ যিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, অনিবার্য কারণবশতঃ তাঁর পক্ষে বাকী দৃশ্য-গুলোয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁর জায়গায় অভিনয় করবেন আমাদের জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী গোপেশ রায়। আপনারা আসনগ্রহণ করুন। নাটক এখনই আবার আরম্ভ হচ্ছে।"

কলরব করতে করতে ফিরে এল দর্শকেরা। সেই সঙ্গে তুমুল হাততালি।

অভিনয়ের পর বন্ধুরা চেপে ধরল গোপেশকে, "ব্যাপার কী বল তো!"

প্রথমটা সে চেপে যাচ্ছিল, "আমি কী করে বলবো ?" পরে স্বীকার করল, "কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন পাটনা থেকে আসল দাওয়াই আনতে হল।"

"মোক্ষম দাওয়াই ! কিন্তু আনলে কি করে ?"

"বেশী কিছু করতে হয়নি, শুধু একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম—**condition serious. Start at once.** নীচে কর্তার নাম।"

ভয় ছিল, স্টার্ট করবেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারবেন কিনা। তার জন্যে ওঁর চাপরাশীকে পাঁচটা টাকা চা খেতে দিয়ে হাওড়া স্টেশনে মোতায়েন রাখতে হয়েছিল, গাড়ি আসা মাত্তর মেমসাহেবকে একেবারে সোজা স্টেজে এনে হাজির করবে। আর—

"আর কী ?"

"কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ করেছিলাম। মা-কালী মুখ তুলে চেয়েছেন।"

বলে চোখ বুজে জোড় হাত কপালে ঠেকাল গোপেশ।

আরোহী

দ্বিজেন ঘোষ বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে উঠে এসে দরজা খুললেন। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, দড়িপাকানো চেহারা। একমাথা উস্কো-খুস্কো চুল, প্রায় সবটাই সাদা। কাঁচা-পাকা, খোঁচা খোঁচা গোঁপ-দাড়ি; বেশ কয়েকদিন তারা ক্ষুরের মুখ দেখেনি। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত ধনুকের মত বেঁকে গেছে, এবং সেটা যে সবখানিই বয়সের ভারে নয়, দেখলেই বোঝা যায়। মুখে কেমন একটা অপ্রতিভ হাসি। দেখে মনে হবে চেনা লোক, কিন্তু নিজের পরিচয়টা দিয়ে উঠতে পারছে না, কুণ্ঠা বোধ করছে। দ্বিজেনবাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ভটচায্যি মশাই না ?"

কুণ্ঠা-জড়ানো হাসিটি এবার স্বচ্ছন্দ হল—"দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দ্যাখতে-ছিলাম চিনতে পার কিনা।"

"এ কী চেহারা হয়েছে আপনার !"

"চেহারার আর দোষ কি ? যে অবস্থার মধ্যে আছি—"

"আসুন, ভেতরে আসুন।"

সেই একই ইতিহাস, দ্বিজেন ঘোষ যা অসংখ্য বার শুনেছেন এবং বহুক্ষেত্রে নিজের চোখে দেখেছেন। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ছুরির মুখে রাতারাতি জন্ম নিল 'রিফিউজী' বলে যে নতুন জাত, ওপার থেকে সব কিছু হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে এপারে এসে পড়ল, তারই একটি নমুনা তাঁর সামনে বসে। তিনি নিজেও তাই। তফাত এই—পড়বার কিছু পরেই ধরে দাঁড়াবার মত একটা কিছু অবলম্বন হাতের কাছে জুটে গিয়েছিল। রীতিমত বরাত জোর বলা যেতে পারে। ওখানে যা করতেন, এখানেও তাই—কলেজে পড়ান। দক্ষিণাটা অবশ্য অনেক কম। তা

হোক। অনেকে তো কিছুই জোটাতে পারেনি। যেমন, মনে হচ্ছে, এই নকুল ভটচাজ।

"কদ্দিন এসেছেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন দ্বিজেনবাবু।

"তা অনেক দিন।"

"কি করে চলছে ?"

"অ্যাদ্দিন তো যজমানি কইর‍্যাই চালাইছি। এখন আর কুলাইতেছে না। পূজা-আরচা ধম্মকম্মের পাট তো উইঠ্যা যাওয়ায় মধ্যে।"

"বলেন কি ? সার্বজনীন পূজো আর তার জাঁকজমক তো বেড়েই চলেছে দিন দিন। ও, আপনি বোধহয় ও সব পূজো করেন না ?"

দ্বিজেনবাবুদের কুল-পুরোহিত ছিলেন নকুল ভটচাজ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছাড়া আর কোন যজমান তাঁর কাছে নিষিদ্ধ ! সেটা জানতেন বলেই ঐ প্রশ্ন। উত্তরে ভটচাজ বললেন, "করবো না ক্যান ? প্যাটের দায়ে সবই করতে হয়। যজমানের জাত-বিচার করলে আর এখন চলে না। কিন্তু ঐ যে কইল্যা সার্বজনীন না কি, ওরা তো পূজা করে না, করে 'ফাংশন'। পুরুত সেখানে ঢাকের বাঁয়া, না হইলে নয়, তাই ডাকে। যা দেয়—" বলে মৃদু হেসে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন।

দ্বিজেন ঘোষের মনে পড়ল কিছুদিন আগে কোন একটা খবরের কাগজে পড়েছিলেন, 'পুরোহিত' নামে যে একটা শ্রেণী ছিল সেটি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ঐ ব্যবসায়ে কারো ভরণ-পোষণ চলছে না। অথচ তাদের চাহিদা বাড়ছে, কেন না পুজোর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল। ডিম্যাণ্ড বাড়লে তার দামও বাড়বে, বিশেষ করে সাপ্লাই যেখানে সীমিত। পুরুতঠাকুরদের দক্ষিণা এবং অবশ্য প্রাপ্য ঊর্ধ্বগামী হবার কথা। তা হচ্ছে না। কেন, সে সব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাততঃ চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছেন নকুল ভটচাজের মত অভিজ্ঞ পুরোহিতও পোষাচ্ছে না বলে অন্য কাজ খুঁজছেন এবং সেই জন্যেই এসেছেন তাঁর কাছে।

কথায় কথায় জানতে পারলেন, ভটচাজ্যি মশায়ের পরিবার বলতে তিনটি প্রাণী—স্বামী, স্ত্রী ও একটি ছেলে। ছেলেটি বেশ মেধাবী, আগামী বছর হায়ার সেকেণ্ডরী দেবে। স্কুলের মাইনে, বই-খাতা, জামা-কাপড় এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া (তা না হলে খাটবে কিসের জোরে ?) এইটুকু যোগাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন ভদ্রলোক। স্ত্রী এক বাড়ীতে রান্নার কাজ করেন। তাতেও কুলোতে পারছেন না।

দ্বিজেনবাবু ভেবে পেলেন না কি ধরনের কাজ খুঁজবেন পুরুতঠাকুরের জন্যে। এখনকার দিনে যাকে 'লেখাপড়া' বলে সেটা একরকম জানেন না বললেই হয়। কোন্ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যা ?—জিজ্ঞাসা করলে নিরুত্তর থাকতে হবে।

এ বিষয়ে নকুলই তাঁকে সাহায্য করলেন—"দ্যাশে থাকতে কি করতাম না করতাম সে সব ছাইড়্যা দাও। এখানে আমারে চেনে কেডা ? সমাজ বলতেও কিছু নাই যে তার ভয় করবো। যা পার যেখানে পার একটা কিছু জোটাইয়া

দ্যাও। আরদালী চাপরাশি প্যায়দা পিওন—যা পাও।"

"পারবেন ?" কিছুক্ষণ ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন দ্বিজেনবাবু।

"না পারলে চলবে ক্যান ? পাঁচটা নয় সাতটা নয় ঐ একটা। ল্যাখাপড়া শিখ্যা যাতে মানুষ হইতে পারে সেডা তো দ্যাখতে হইব।"

মাথা তুলে বললেন, "নিজের ছাওয়াল বইল্যা কইতেছি না, একবার যদি দাঁড়াইতে পারে, খোকা আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি হয়তো দেইখ্যা যাইতে পারবো না। তোমরা তো রইল্যা। দেইখো আমার কথা ফলে কিনা।"

সেদিন অনেক দূর। তবু, লক্ষ্য করলেন দ্বিজেনবাবু, সেই প্রত্যাশিত ঔজ্জ্বল্যের আভা ঐ শীর্ণ মুখখানায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মনে হল তারই দিকে চেয়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অসাধ্য সাধনেও প্রস্তুত।

ওঁদের কলেজেই একটি বেয়ারার চাকরি খালি ছিল। দ্বিজেনবাবু প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে ধরলেন।

'ভট্টাচার্য' শুনে প্রথমটা তিনি একটু 'কিন্তু কিন্তু' করেছিলেন। ওঁর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করেননি। কিন্তু কাগজে-কলমে বেয়ারা অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা প্রিন্সিপ্যালের থাকলেও আসল নিয়োগকর্তা ইউনিয়ন। সেখানে কিছু বামপন্থী মেম্বর বেঁকে বসলেন। বামুন মানে উঁচুজাত অর্থাৎ সোজা কথায় বুর্জোয়া। একে চাকরি দিলে শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ বজায় থাকে কেমন করে ? অন্য পক্ষের বক্তব্য হল—শ্রেণীবিভাগের আসল ভিত্তি অর্থনৈতিক, caste বা creed নয়। 'বিহারীভাই'দের মধ্যে অনেকে গোরুর গাড়ি চালান, দারোয়ানের কাজ করেন, যাদের উপাধি পাঁড়ে, তেওয়ারী, মিশির। ব্রাহ্মণ হলেও তারা ওয়ার্কিং ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত। রাঁধুনে বামুনরাও সেই দলে পড়ে। 'পুরুত' বলে যে ক্লাস, যাদের বৃত্তি হল সামান্য দক্ষিণা বা মজুরিতে বাড়ি বাড়ি পুজো করে বেড়ানো, তারাও এক ধরনের ঠিকা মজুর বই তো নয়।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অর্থনীতির অধ্যাপক দ্বিজেন ঘোষকে 'রেফার' করা হয়েছিল। তিনি ভিতরের খবর সব জানতেন এবং শেষোক্ত মতে সায় দিয়েছিলেন। আবেদনকারীর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে সেটা কোথাও প্রকাশ পায়নি। তার আগে ভট্টাচাজ্যি মশাইকেও এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল।

পুরোহিত নকুল ভট্টাচার্য কলেজের বেয়ারা পদে বহাল হলেন। তার সঙ্গে ফুরসত মত যজমানিটাও রইল। তবে গৃহিণীকে আর পরের বাড়িতে রান্না করতে দিলেন না।

হায়ার সেকেণ্ডারী ফার্স্ট ডিভিসানে পাস করে বাবার কলেজেই ভর্তি হল প্রশান্ত। তার অবশ্য ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাছাড়া আর উপায় কি ? অন্য কলেজে পড়াবার মত খরচ যোগানো তার বাবার আয়ে কুলায় না। এখানে শুরু থেকেই ফ্রী স্টুডেণ্টশিপ, বইপত্রের ব্যবস্থা দ্বিজেনবাবুর এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা

অধ্যাপকদের বিশেষ নজর, যাকে বলে **personal attention.** অনেক ধরনের 'বিশেষ নজর'ও সে পেয়েছিল তার কোন কোন সহপাঠীর চোখ থেকে এবং সেটা তাকে উঠতে বসতে বিঁধত। ঠিক মুখের উপর না হলেও আড়াল থেকে 'বেয়ারার ছেলে' কথাটা কানেও এসেছে দু-একবার। সঙ্গে সঙ্গে কোন অজ্ঞাত কারণে তার বাবার বিরুদ্ধে একটা বোবা আক্রোশ সারাটা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত, অথচ বলবার বা করবার কিছুই ছিল না।

বাপের পোশাক ছিল খাটো মোটা ধুতির উপর আধময়লা টুইল শার্ট, রবিবারে রবিবারে নিজের হাতে সাবান-কাচা। ছেলের পরনে তার সচ্ছল অবস্থার সহপাঠীদের মত পরিচ্ছন্ন প্যাণ্ট-হাওয়াই শার্ট, তার উপরে ঘন ঘন ডাইং ক্লিনিং-এর নম্বর। দুটো পোশাকই যেন ব্যঙ্গ করত প্রশান্তকে।

স্বামী-স্ত্রী সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন নিরামিষ খেতেন, কিন্তু ছেলের জন্যে মাছ আসত রোজ, মাঝে মাঝে কালীঘাট থেকে কচি মাংস। দেড় পোয়া করে দুধ দিয়ে যেত গোয়ালা। সবটাই ছেলের জন্য তোলা, রাত্রে ভাতের সঙ্গে খাবে।

প্রশান্ত জানত সব। এবং কোন রকম আপত্তি না করে নিঃশব্দে খেয়ে যেত। খেতে গিয়ে পুত্রের অন্তর জুড়ে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার জোয়ার উথলে উঠবে, একথা যদি কেউ মনে করেন, তিনি ভুলের স্বর্গে বাস করছেন। বরং ভিতরটা তার রী রী করে জ্বলত। কেন, তা কি সে জানে? মানুষের মন বড় দুর্বোধ্য।

•

ইকনমিকস্‌এ অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করল প্রশান্ত। সেকেণ্ড ক্লাস: তবে উপরের দিকে। দ্বিজেনবাবু একটু নিরাশ হলেন। আশা করেছিলেন, ফার্স্ট ক্লাস পাবে। হল না। এবার এম. এ.। সব দিক দিয়েই কঠিন। শুধু ছেলের পক্ষে নয়, তার বাবা-মা'র পক্ষেও। কলেজ থেকে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যাচ্ছিল, ইউনিভার্সিটিতে কোনটাই থাকবে না। নকুল ভটচাজ আরো কয়েকঘর যজমানের চেষ্টায় লাগলেন, গৃহিণীও ফিরে গেলেন তাঁর পুরনো রান্নার কাজে।

এম. এ'র ফল আরো খারাপ হল। সেকেণ্ড ক্লাসের নীচের দিকে। বাপ এতেই খুশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরীক্ষায় উতরে গেছে প্রশান্ত, তাঁদের বংশে কেউ কোনদিন যা পারা দূরে থাক স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু দ্বিজেনবাবু একেবারে বসে পড়লেন। তাঁরই বিভাগে একটি লেকচারারের পদ বেশ-কিছুদিন থেকে খালি পড়ে আছে। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে তিনিই রেখে দিয়েছেন বলা যেতে পারে। আশা করেছিলেন প্রশান্তকে ওখানে বসাবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল ঐ পরীক্ষার ফল। এবার কর্তৃপক্ষের গরজেই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোল, ইকনমিকস্‌-এর লেকচারার চাই—ফার্স্ট ক্লাস, অথবা ন্যূনপক্ষে হাই সেকেণ্ড ক্লাস, তার সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স।

দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে প্রশান্ত নিজেই গেল দ্বিজেনবাবুর বাসায়। বলল,

"বাবা পাঠিয়েছেন।" দ্বিজেনবাবু বললেন, "তুমি এসে ভালোই করেছ। ব্যাপারটা তোমার বাবাকে বোঝানো যাবে না, তুমি বুঝবে।"

হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট হিসাবে সব দরখাস্ত অধ্যাপক দ্বিজেন ঘোষকেই প্রথম দেখতে হবে এবং সবদিক দিয়ে বিচার করে যাকে তিনি যোগ্যতম বিবেচনা করেন, তাকে সুপারিশ করে পাঠাতে হবে। সেই খানেই মুশকিল। ফার্স্ট ক্লাস প্রার্থী যদি নাও থাকে, সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের দিকে দাঁড়িয়েছে এরকম কয়েকজন অন্ততঃ অবশ্যই থাকবে এবং তার মধ্যে মফঃস্বল কলেজ থেকে কিছু লোক আসবে যাঁদের তিন চার পাঁচ বছরের পড়াবার অভিজ্ঞতা আছে। তাদের বাদ দিয়ে প্রশান্তকে সুপারিশ করা যায় কেমন করে? যুক্তি তো একটা চাই।

এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন দ্বিজেনবাবু। প্রশান্ত যে বুঝল না, তা নয়; তবু বলল, "কিন্তু স্যার, আমি আপনার ছাত্র, এই কলেজ থেকে পাস করেছি।"

—ঠিক; কিন্তু সে দাবি উঠতে পারে তখনই, যখন কোয়ালিফিকেশনের দিক দিয়ে তুমি বেস্ট ক্যান্ডিডেটের সমকক্ষ। সেখানে অবিশ্যি তোমার কেস্ই প্রেফারেন্স পাবে।

প্রশান্ত চলে যাচ্ছিল, দ্বিজেনবাবু ডেকে ফেরালেন, "বসো। আর একটা উপায় আছে। কিন্তু আমি বলেছি সে কথা যেন কেউ না জানতে পারে।"

—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যর।

দ্বিজেনবাবু মিনিট দুই চুপ করে থেকে বললেন, "ব্যাপারটা ঐ ইউনিয়নের পাণ্ডাদের কাছে তুলতে হবে।"

—ইউনিয়ন! বিস্ময়ে চোখ তুলল প্রশান্ত।

—হ্যাঁ; ক্লাস ফোর এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।

—সেকি! লেকচারার নেওয়ার ব্যাপারে তাদের কী বলবার আছে?

দ্বিজেনবাবু কিছুক্ষণ প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তা নেই। আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। কিছু মনে না কর তো বলি!"

—আপনার কথায় আমি কিছু মনে করব, এ আপনি ভাবতে পারেন স্যর? —প্রশান্তর কণ্ঠে আহত অভিমানের সুর।

দ্বিজেনবাবু তাঁর প্ল্যানটা খুলে বললেন। আর কিছু নয়, শুধু ইউনিয়ন একটা মিথ্যা ধুয়ো তুলবে যে প্রশান্ত ভটচাজ সব দিক দিয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি দিচ্ছেন না। কারণ, তার বাপ এখানে বেয়ারার কাজ করে। এই নিয়ে খানিকটা আন্দোলন চালাতে হবে এবং প্রিন্সি-প্যালের ঘরে একটা ডেপুটেশন পাঠাতে হবে।

শুনে প্রশান্ত একেবারে গুম হয়ে গেল। দ্বিজেনবাবু লক্ষ্য করলেন তার সারা মুখে কে যেন একপোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কোন কথা না বলে সে হঠাৎ উঠে চলে গেল।

দিন কয়েক পরেই কলেজের দেয়াল, গেট, সিঁড়ির ধার সব বড় বড় পোস্টারে ছেয়ে গেল—"প্রশান্ত ভটচাজের চাকরি চাই", "বেয়ারার ছেলে কি অধ্যাপক

হতে পারে না ?" "কর্তৃপক্ষের অন্যায় জুলুম চলবে না"—ইত্যাদি। অ
কয়েকটা কলেজের বেয়ারা আরদালী দারোয়ান এসে আন্দোলনটাকে জোরদ
করে তুলল। ছাত্র ইউনিয়নও যোগ দিল সেই সঙ্গে। তারপর এলেন কয়েকজ
বামপন্থী নেতা। গরম গরম বক্তৃতা চলল গেটের সামনে।

গভর্নিং বডির মিটিং ডাকলেন প্রিন্সিপ্যাল। প্রথম দিন তাঁরা কে
সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। পরের দিন এসে বসতে না বসতেই 'ঘেরাও'

শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নই জয়ী হল। তবে প্রশান্তকে ঐ কলেজে না নি
তার যে ব্রাঞ্চ রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়, সেখানে নিযুক্ত করা হল।

বেশ কিছুদিন থেকে কলেজের চাকরি নকুল ভটচাজের পক্ষে কঠিন হ
দাঁড়িয়েছিল। বয়স হয়েছে, শরীর আর বইছে না। অন্য সব কাজ কোন রক
চালিয়ে নিলেও চারতলা বাড়ির সিঁড়ি ভাঙা—তাও একবার দুবার নয়-
কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। সহকর্মীরা বলছিল, এবার বাড়ি গিয়ে বসু
ছেলের এমন ভাল চাকরি হল। বুড়ো বয়সে কী দরকার এত খাটবার। ভটচাজ
মাথা নেড়ে সায় দিতেন—হু, তাই যাবো। কিন্তু মনে মনে বলতেন, কই, ছে
তো সে কথা একবারও বলে না।

তারপর একদিন নিতান্ত অপারগ হয়েই ছেড়ে দিলেন। সহকর্মীরা বি
অভিনন্দন জানাল—সারা জীবন বড্ড খেটেছেন ভটচায্যি মশাই। তেমনি ত
ফলও পেয়েছেন, ছেলেটা মানুষ হয়েছে, মানুষের মত মানুষ। এবার বিশ্র
নিন, যে ক'টা দিন বাঁচবেন, সুখে থাকুন।

প্রশান্ত ভালই পড়াচ্ছে, এর মধ্যে বেশ নাম করেছে, খবর পেয়েছি
দ্বিজেনবাবু। খুশী হয়েছিলেন শুনে। সেই সঙ্গে একটু ক্ষোভও ছিল—এত
হয়ে গেল, সে তো একটি বারও এল না। তারপরেই নিজেকে বোঝাতেন, ন
কাজে ব্যস্ত আছে, সময় পেলেই আসবে।

কিন্তু সে এল না। একদিন হঠাৎ এলেন তার মা। দ্বিজেনবাবু ব্যস্ত
উঠলেন। এর আগে কোনদিন আসেননি ভদ্রমহিলা। বললেন, "আপনি
করে এতটা পথ—খবর সব ভাল তো ? প্রশান্ত কেমন আছে ?"

ভটচাজ-গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "প্রশান্ত বিয়া করছে।

—তাই নাকি ? কবে হল বিয়ে ?

—আমাগো কিছুই জানায় নাই। বৌ নিয়্যা আলাদা বাসা করছে।

—তারপর আর আসেনি ?

—না। আর কিসের জন্যে আসবে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। দ্বিজেনবাবু আর কিছু বললেন

বলবার আছেই বা কী ? প্রশান্তর মা নিজে থেকেই জানালেন, যখন এম.
পড়ছিল তখন থেকেই নাকি মেয়েটির সঙ্গে জানাশুনো। কথা দিয়েছিল চা
পেলেই বিয়ে করবে। ওর কোন এক বন্ধুর কাছে শোনা এ সব ক

ায়ে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। আঁচলে মুছে ধরা গলায় বললেন, "খোকা এরকম করবে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই বাবা।"

দ্বিজেনবাবুও কি ভাবতে পেরেছিলেন? এম. এ.-তে অত নেমে গেল কেন র কারণটা না হয় বুঝতে পারলেন। কিন্তু তারপর? এই যে ধাপে ধাপে রো নীচে নেমে গেছে—? তাই কি? সে এবং তার বন্ধুরা কিন্তু বলবে সে নেক উপরে উঠে গেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই। সত্যিই সে অনেক উঁচুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাই তাকে ঠেলে তুলে দিয়েছেন—বিশেষ করে তিনি এবং তার হতভাগ্য বা-মা।

পুরুতের ছেলে হলেও প্রশান্ত এ যুগের ছেলে। ন্যায়ধর্মের চেয়ে যুগ-ই তার কাছে বেশী সত্য। পুরনো পচা আদর্শ-টাদর্শের ধার ধারে না। র্তব্য তার কাছে অর্থহীন। একমাত্র লক্ষ্য কার্যোদ্ধার, এবং সেটা যে কোন পায়ে। আসল হল এণ্ড্, মীনস্ সেখানে অবান্তর।

সেই এণ্ড্-এ পৌঁছতে গিয়ে প্রশান্ত ভটচাজ তার বাবা ও মাস্টারমশাইকে গোগোড়া ঠিক একটা মইয়ের মত ব্যবহার করেছে। ওঠবার জন্যে যার একান্ত য়াজন, তারপর অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। তাই দিয়েছে সে। আশ্চর্য অস্বাভাবিক কিছু করেনি।

আশ্চর্য বরং এই যে, তিনি, অর্থনীতির অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষ, চলতি যায় একজন 'বুদ্ধিজীবী', সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত, এত ছেলে য় করছেন বছরের পর বছর, অথচ এই প্রশান্ত এবং তার জাতটাকে চিনতে রেন নি! তার কার্যকলাপে অবাক হচ্ছেন!

দ্বিজেনবাবুর চিন্তাসূত্রে টান পড়ল। কানে গেল ভটচাজ-পত্নীর মৃদু কণ্ঠ "উনি আসলেন না, কোন মুখেই বা আসবেন? আমার তো আর তাই বইল্যা স্যা থাকা চলে না।"

একটু থেমে কুণ্ঠার সুরে যোগ করলেন, "কলেজের চাকরিটা যদি আবার ওয়া যায়! তা না হইলে—"

বাকীটুকু আর শোনা গেল না।

রর গোরু

কারী বইগুলো প্যাকিং কেস্-এ ভরছিলাম। মা ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড্ ড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর ঘুরে গিয়ে পাশের খাটে বসলেন। বুঝলাম, চয়ই কোনো বিশেষ বক্তব্য আছে। এ সময়ে তো তাঁর এতটা ফুরসত হবার া নয়। বক্তব্যটা পরক্ষণেই শোনা গেল—"ওখানে তো শুনলাম দুধ টুধ ওয়া যায় না—"

"কে বললে? হরিণঘাটার অত কাছে।"

"হরিণঘাটার দুধ খেয়ে তো তোমরা মানুষ হওনি বাবা। ওকি আর মুখে

তুলতে পারবে ? তাছাড়া, দাদুভাই—"

"ওর জন্যে একটা ফুডটুড কিনে নিলেই হবে।"

"ফুড্ !" পাশের ঘর থেকে বাবার গলা শোনা গেল, "খাঁটি গোরুর দুধে চেয়ে আর কি ফুড্ আছে বাচ্চাদের ?"

"তাই বলছিলাম কী—" যোগ করলেন মা, "বুধীকে নিয়ে যা।"

"বুধী ! কী সর্বনাশ ! ওকে পুষবে কে ? থাকবে কোথায় ?"

"কেন, একটা চাকর রেখে নিবি ! চরাবে, ঘাস জল দেবে। আর বাসা পেছনে তো অনেকটা জায়গা আছে, শুনেছি। একপাশে একটা চালা তুলে নিবি কত আর খরচ !"

"কি যে বল ? নতুন জায়গায় একটা গোরু টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া তাছাড়া, কে বুক করবে, কে সঙ্গে যাবে ?"

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না"—নেপথ্য থেকে বাবার ভরসা ভেসে এলো, "পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করবো।"

বাবা ও মায়ের মধ্যে মতান্তর ঘটছে না, সারাদিনে এমন একটি বিষয়ও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঐ গোরুর ব্যাপারে আশ্চর্য মতৈক্য দেখ গেল।

মার প্রথম কথাটা অবশ্য খুব খাঁটি। জন্ম থেকে আমরা ভাই বোনেরা খাঁটি দুধ খেয়ে মানুষ। তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের অটুট স্বাস্থ্যে।

জেল ডিপার্টমেণ্টের উঁচুস্তরে চাকরি কবতেন বাবা ! দুটো করে দুধালো গাই রাখবার সরকারী অনুমতি ছিল। জেল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ কোয়ার্টারে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত গোশালার ব্যবস্থাও কবে দিয়েছিলেন সরকার। গোরুগুলোর দেখাশুনোর বেসরকারী ভার ছিল কয়েদীদের হাতে। সব জেল'এই সিপাই বাহিনীতে দু-চারটি 'রাম' বা 'আহির' অবশ্যই জুটে যেত, দোহন কার্যে অভিজ্ঞ। সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাটে এবং বিনা ভাবনায় প্রতিদিন আট দশ সের করে দুধ গোরুর বাঁট থেকে সোজা আমাদের ঘরে এসে উঠত। আমরা তার যথেচ্ছ ব্যবহার করতাম। ক্ষীর, ছানা, দই, পিঠে-পায়েস, রসগোল্লা পান্তুয়ার অঢেল যোগান আসত মায়ের ভাঁড়ার থেকে।

চাকরী যখন শেষ হয়ে আসছে অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে দুধের কথাটাও ভেবে রেখেছিলেন বাবা। তাই কোলকাতা সহরে দেড়কাঠা জমির উপর তিনতলা এমারতের লোভ ত্যাগ করে কাঠা দশেক জায়গা নিয়েছিলেন যাদবপুর থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে সন্তোষপুর লেক্-এর ধারে এবং বাড়ি করতে গিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রয়োজন যতটা দেখেছিলেন, তার চেয়ে তাঁর প্রিয় গাভী দুটির প্রয়োজন কম করে দেখেননি। সুতরাং দুগ্ধ ভাণ্ডার আমাদের অটুট ছিল।

আমার দুই দাদার কর্মস্থল কোলকাতায়। বাড়ি থেকে যাতায়াত করে। তাদের বরাদ্দ ঠিক রইল। আমারও ছিল যতদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। এবার আরেকটু ভালো চাকরি নিয়ে চলেছি কল্যাণীতে। মা বাধা দিতে পারেন না। ছেলে-বৌ-নাতি দূরে চলে যাচ্ছে, তার জন্য ততটা ভাবেননি,

-চাকরির জন্যে যেতেই হবে—তাঁর আসল দুশ্চিন্তা হল দুধ। দুধ ছাড়া সবে কেমন করে ? অতএব বুধীকে নিয়ে যাও। নতুন বাচ্চা দিয়েছে, চার পাঁচ সেরে দুধ দেয়। আর ভাবনা কি ?

কিন্তু আমি ভীষণ ভাবনায় পড়লাম। গোরু রাখার ঝামেলা কি কম ? এখানে না হয় বাবা আছেন এবং ঐ নিয়েই আছেন। ওখানে ? ঘাস, বিচালি, খল-মাড়-গোবর-চোনা-মশা মাছি সব মিলিয়ে এক প্রচণ্ড জবরজং ! ভাবতেই ভয় লাগে।

একমাত্র ভরসা পাপিয়া। এম্ এ পাশ করা বালিগঞ্জের মেয়ে। চাল-চলনে রুচিতে, সাজ-সজ্জায় দুর্দান্ত রকম আধুনিকা। 'কল্যাণী' শুনেই প্রথমটা নাক কুঁচকে চোখ কপালে তুলেছিল। পরে অবশ্য শাশুড়ী-বিহীন স্বাধীন সংসারের সুবিধাগুলো ভেবে দেখে আর আপত্তি করেনি। কিন্তু অমন একখানা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলোয় একটা গোরু নিয়ে গিয়ে ওঠা নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না।

হায়, কী ভুলই করেছিলাম ! নারী চরিত্র বস্তুটাই যে পরস্পর বিরোধী. সেলফ্ কণ্ট্রাডিকশনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবেই যে বিধাতা এই জাতটিকে সৃষ্টি করেছেন, এই সহজ কথাটা কেন মনে পড়েনি, জানি না।

পাপিয়া শাশুড়ীর প্রস্তাবে পরম বশংবদ পুত্রবধূর মত রাজী হয়ে গেল। উপরন্তু আমাকে বোঝাতে এল, নতুন জায়গায় একটা গোরু সঙ্গে থাকার সুবিধে কত ! দুধের ব্যাপারে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আমি বললাম, তা তো গেল বুঝলাম। কিন্তু ওর আনুসাঙ্গিকগুলো ভেবে দেখেছ ?

"দেখেছি গো দেখেছি। ওসব আমি ম্যানেজ করে নেবো। তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না !"

বাড়িটি সত্যিই সুন্দর। তিনখানা ঘর। সামনে বারান্দা। তার কোলে সুসজ্জিত ফুলের কেয়ারী। পিছন দিকে প্রশস্ত খাবার জায়গা, রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম। তার পিছনে অনেকটা জায়গা, পাঁচিল ঘেরা। মাঝখানে সবজির ক্ষেত. ধারে ধারে নানা রকমের ফলের গাছ। সব কলমের চারা, সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাড়িওয়ালা লোকটি আরো চমৎকার, অমায়িক মিষ্টভাষী, মধুরস্বভাব. সৌজন্যে বিনয়ে বিগলিত। প্রথম যেদিন দেখতে আসি, তখনও উনি সপরিবারে বাস করছেন এখানে। এমন সাড়ম্বর সমাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন, যেন আমি ওর ভাড়াটে নই, সম্মানিত অতিথি এবং পরমাত্মীয়। বললেন, বার বছর আছি এই বাড়িতে। এর প্রতিটি ইট কাঠ শুধু নয়, গাছপালা ফুল লতাপাতার সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। আফিসটা উঠে গেল বলে কোলকাতায় যেতে হচ্ছে। বাড়ি ভাড়া দেবার কল্পনাও কখনো করিনি। আসলে তা দিচ্ছিও না। আপনার মতন একজন সজ্জন রুচিবান কৃতী অধ্যাপক দয়া করে থাকবেন, আমার নিজের হাতে তৈরী সব কিছু উপভোগ করবেন, এইটুকু ভেবেই নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে যেতে পারছি।

ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে দাঁতে জিভ কেটে বলেছিলেন, ছিঃ ছিঃ আপনার কাছ থেকে ভাড়া নেবো ! তবে হ্যাঁ, সামান্য কিছু না নিলে তো আপনি থাকতে রাজী হবেন না। সেটা চিঠিতে জানাবো।

বাড়ি দেখে প্যাপিয়া ভীষণ খুশী ! প্রজাপতির মত ঘরে বারান্দায় বাগানে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। সেকেলে ধরনের পালিশ উঠে যাওয়া ভারী ভারী কতকগুলো আসবাব রেখে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ গো, এগুলো কবে নিয়ে যাবে ?

"তা তো জিজ্ঞেস করিনি। শীগগিরই নেবে নিশ্চয়।"

"তুমি বরং আজই একটা চিঠি লিখে দাও। ঐ ন্যাণ্টি জিনিষগুলো না হটালে আমি আমার ফার্ণিচার রাখি কোথায় ?"

আমার চিঠি লিখবার আগেই বাড়িওয়ালার প্রতিশ্রুত চিঠি এসে গেল। সুন্দর ইংরেজিতে সবিস্তারে আর এক দফা সৌজন্য প্রকাশ করে এখানে রেখে যাওয়া জিনিষপত্রের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে যাবতীয় আসবাব পত্রের সঙ্গে রয়েছে তেত্রিশটি ফুলের টব (গাছ সমেত), দুটি খুরপি, একখানা কোদাল, তিন টুকরো টিন, একটি মগ এবং ঐ জাতীয় টুকিটাকি। শেষের দিকে গোলাপ, জবা, পাতাবাহার এবং পিছনকার বাগানের ফলের গাছ-গুলোর সংখ্যা, বয়স, আনুমানিক উচ্চতা ও অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সবিনয়ে 'নিবেদন' করেছেন যে, তালিকা-ভুক্ত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ হেফাজত আমার উপর রইল। প্রতিটি বস্তুর নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে আমি দায়ী রইলাম। তিনি মাঝে মাঝে এসে সরজমিনে তদারক করে যাবেন সব ঠিক আছে কিনা। যে কোন দিন তিনি ফিরে এসে পুনর্দখল নিতে পারবেন এবং যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন আমি যেন তার লিষ্ট্ মাফিক সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে অন্যত্র উঠে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকি।

এই সব সুবিধা সুযোগের বিনিময়ে তিনি একটি নামমাত্র ক্ষুদ্র অঙ্ক (তাঁর ভাষায় **Token amount**) আমার দেয় বলে ধার্য করেছেন।

[পরে জেনেছিলাম অঙ্কটি ওখানকার প্রচলিত বাড়িভাড়ার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী।]

একই ডাকে আরেকখানা চিঠি পাওয়া গেল। বাবা লিখেছেন, "গোরু রওনা হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য পৌঁছিবে।"

একদিকে বাড়িওয়ালা আরেক দিকে গোরু। দুটিই সমান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আপাততঃ দ্বিতীয়টি একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। অর্থাৎ অবিলম্বে একটি চালা চাই। কিন্তু চাই বললেই তো হয়না। কোথায় বাঁশ, কোথায় টিন, কোথায় দড়ি ? বাজারে বেরিয়ে সেগুলো সেদিন দ্বিগুণ দামে সংগ্রহ করা গেল, ঘরামি আর জোটেনা।

তারপর গোয়ালটা উঠবে কোথায় ? পাঁচিলের সব কটি ধার দখল করে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে বাড়িওয়ালার কলমের চারা।

এদিকে বুধী এসে পৌঁছল। অভুক্ত অস্নাত, এবং সেই কারণে বেশ খানিকটা

ক্ষিপ্ত। কাছে গেলে তেড়ে আসে। যে লোকটি সঙ্গে এসেছিল সে কোনো রকমে সামলে পিছনের বাগানে নিয়ে বাঁধল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরিতরকারির ক্ষেত তছনছ।

বাড়িওয়ালার পুরনো ঝিটিকেও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলাম। তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু!

"কী হল?"

"দুটো হিমসাগরের চারা, একটা কাঁঠাল আর একটা কাশীর পেয়ারার গাছ একেবারে মুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছে গরুটা। আমাদের বাবু এসে যদি দেখেন—"

তার পরের অবস্থাটা সে বোধহয় ভাবতেই পারলনা। ব্যাপারটা আমাকেও কম ভাবিয়ে তুললনা। চিঠির সর্তগুলো তখনো মাথার মধ্যে ঘুরছে।

গোরুকে খাওয়ানো এবং দেখাশুনো করবার মত একটা লোক সহজেই পাওয়া যাবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও দেখলাম গোল। কল্যাণীতে গৃহভৃত্য-দের যে সমাজ সেটা পুরোপুরি নারী-কবলিত। অর্থাৎ 'চাকর' বলে কিছু নেই। সব বাড়িতেই ঝি। সহরের বাইরে মাঝেরচর বলে একটি উদ্বাস্তু কলোনী আছে। ঝি সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ভোর হতেই তারা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। বয়স আট থেকে আটান্ন। যে বাড়ির যে রকম প্রয়োজন। যেতে যেতে যার যার কর্ম-স্থলে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যার আগে আবার তেমনি প্রসেশন করে বাড়ি ফিরে যায়। এরা হিন্দু, গো-সেবা এদের কাছে ধর্ম, কিন্তু করণীয় কাজের তালিকায় পড়েনা। ডবল মাইনে কবুল করেও কাউকে পাওয়া গেলনা।

বাবার লোকটিকে বিদায় দেবার পর নিজেকেই বহাল করলাম তার জায়গায়। দু-একটি সহকর্মী আশ্বাস দিয়ে গেলেন, দূরে কোথায় একটা খাটাল আছে। সেখান থেকে যদি একটি ছোকরা সংগ্রহ করা যায়, চেষ্টা করে দেখবেন।

সব চেয়ে বড় এবং জরুরী সমস্যা দেখা দিল পরদিন। তখনো ভোর বেলাকার ঘুমের আমেজ চোখদুটিতে জড়িয়ে আছে। পাপিয়া কখন উঠে গেছে জানিনা। কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকল—শুনছ?"

"শুনছি।"

"ছাই শুনছ। বলি গোরু দুইবে কে?"

তাইতো, ওদিকটা একেবারে খেয়াল ছিলনা। ঐ বিদ্যাটি কখনো আয়ত্ত করিনি। পরখ করেও দেখিনি কোনদিন। অন্যেরা যখন দুইতে বসেছে, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কখনো সখনো। প্রায়-ভোরে-ওঠা ফেনাবহুল বালতির বুকে বাঁট থেকে যখন তীরের মত দুধের ধারা এসে পড়ে, তার মধ্যে একটি মিউজিক আছে। যে দোয় তার হাত দুইটিও তালে তালে ওঠে নামে। সেই সুর ও ছন্দের টানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। দোহন ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতার দৌড় ঐ পর্যন্ত। পাপিয়ার তার চেয়েও কম। তবু সে যখন ঐ কঠিন প্রশ্নটি তুলে ধরল আমার সদ্য-ঘুমভাঙ্গা চোখের সামনে, 'দুধ দুইবে কে?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, "কেন, তুমি!"

"আমি !" আকাশ থেকে পড়ল পাপিয়া, "আমি ও-সব করেছি নাকি কোন-দিন ?"

বলতে পারতাম, তখন যে বলেছিলে, তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না, সব আমি ম্যানেজ করে নেবো।'

বললাম না। সব সময়ে সব কথা বলতে নেই, বিশেষ করে স্ত্রীকে।

একটা সার্ট কোন রকমে মাথায় গলিয়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ার কাউকে চিনি না, পাশের বাড়ির সঙ্গেও পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। কিন্তু গরজ বড় বালাই। কড়া নেড়ে যাকে সামনে পেলাম—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, তরুণ, তরুণী, কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা, সবাইকে ঐ একটি প্রশ্ন 'আপনাদের বাড়িতে কেউ গোরু দুইতে জানেন ?' কেউ মুখ টিপে হাসল, কেউ অবাক হল, কেউ বা স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল মুখে। কিন্তু উত্তর সবারই এক—'না'।

ঘণ্টা খানেক পরে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরতেই তিন বছরের ছেলে বিল্টু ছুটে এল কাঁদতে কাঁদতে—"বাপি, বুধীটা না, মাকে মেরেছে।"

সে কী ! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখলাম পাপিয়া শুয়ে আছে, একটি প্রৌঢ়া মহিলা, সম্ভবতঃ পাশের বাড়ির, তার হাতে জলপটি দিচ্ছেন। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'একটু বরফ হলে ভালো হত, খুব লেগেছে। গোটা হাতটা ফুলে উঠেছে।'

ঘটনার বিবরণ পাপিয়ার নিজের মুখেই শোনা গেল।

"বড্ড চেঁচাচ্ছিল গোরুটা", ক্ষীণ কণ্ঠে বলল থেমে থেমে, "বাঁটে দুধ জমে যন্ত্রণা হচ্ছিল তো। তাই ভাবলাম একটু যদি রিলিফ দেওয়া যায়। বালতিটা নিয়ে কাছে গিয়ে বসতেই ভীষণ জোরে চাট মেরে বসল।"

বরফ নিয়ে ফিরে এসে দেখি বাড়িওয়ালা বসে আছেন। সেদিনের সে স্নিগ্ধ মধুর অমায়িক হাসিটি অন্তর্হিত। মাংসবহুল ভারী মুখখানায় আষাঢ়ের মেঘ থমথম করছে। গম্ভীর ভাবে বললেন, ভিতরের বাগানটা একটু দেখতে চাই।

"যান না !"

"আপনিও চলুন।"

সবটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষতির পরিমাণটা বুঝতে পারছেন ?

বললাম, না, তবে আপনি ফিরে গিয়ে জানাবেন নিশ্চয়ই। তখন পূরণ করবার চেষ্টা করা যাবে।

"সে তো করতেই হবে। তাছাড়া আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।"

"প্রতারণা !"

"আজ্ঞে হাঁ, যাকে বলে চিটিং।"

"কি রকম ?" বিরক্তির সুরটা চেপে রাখতে পারলাম না।

"আপনি বলেছিলেন, আমরা শুধু তিনটি প্রাণী, আমি, আমার স্ত্রী আর একটি বাচ্চা। এই প্রাণীটির কথা তো বলেননি।"

আমি নিরুত্তর। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। এও তো একটা প্রাণী এবং

একাই একশ।

গোরু না ছাড়লে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়ে বাড়িওয়ালা নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

মাইলখানেক দূরে একটা খাটাল লক্ষ্য করেছিলাম। সেখানে গিয়ে ধরলাম মালিককে 'একটা গোরু নেবেন? প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, চার পাঁচ সের দুধ দেয়।'

"কেৎনা দাম?"

"দাম নেই, এমনি দিয়ে দেবো।"

বিশালকায় বিহারী গোয়ালা তার প্রায় ঢেকে যাওয়া ক্ষুদ্র তীক্ষ্ন চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখল এবং বেশ কিছুক্ষণ ফিরিয়ে নিল না! তারপর বলল, "দেখনে সক্‌তা?'

"নিশ্চয়ই, আসুন আমার সঙ্গে।"

না, একেবারে বিনামূল্যে আমার গোদান গ্রহণ করতে রাজী হল না খাটাল-ওয়ালা। সংসারে 'ধর্ম' বলে একটা কথা আছে তো। গোরু সে নেবে, রাখবে. পালবে,—পুষবে, কিন্তু যেহেতু আমি মালিক সুতরাং তার দুধের তিন ভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য। সেটা আমাকে নিতে হবে।

আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম!

দুধ আমাকে গিয়ে আনতে হয় না। সে 'তকলিব' থেকেও খাটালের মালিক আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার 'নকর' রোজ পৌঁছে দিয়ে যায়। পরিমাণটা কখনও কখনও আধসেরে গিয়ে নামে। বলবার কিছু নেই। দুধ দেওয়া না দেওয়া গোরুর 'মরজি'। আর চেহারা? তা নিয়েও মাথা ঘামাই না। যা পাচ্ছি সেটা তো শুধু আমার বুধীর দান নয়, তার মধ্যে তার আশ্রয়দাতার অবদান অবশ্যই থাকবে।

একা

সকলেই মনে করেছিল, আজকে অন্ততঃ 'কত্তার' রোজকার রুটিন কিছুটা বদলাবে। নাতনীর বিয়ে। অত আদরের নাতনী। নটা পনরতে লগ্ন। কিছু-ক্ষণের জন্যেও একবার আসরে এসে বসবেন বৈকি?

কাঁটায় কাঁটায় নটা বাজতে তিন। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় শেষ নজর বুলিয়ে ভাঁজ করে রাখলেন টেবিলের উপর। চশমাটা খুলতে খুলতে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, সত্যেন···

সত্যেন ওঁর নাতি, মেজো ছেলের সেজো ছেলে। অন্য দিন ঘরের পাশেই মোতায়েন থাকে। আজ বিয়ের ব্যাপারে কোথায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে এসে যখন পৌঁছল, ঘড়িতে নটা বেজে দুই। মৃত্যুঞ্জয় তখন বিছানায় উঠে গেছেন। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

সত্যেন জবাব দিল না। দিলে আরো চটে যাবেন দাদু, ঘুমের ব্যাঘাত হবে। নীরবে মশারি ফেলে চারধারটা গুঁজে দিয়ে আলো নিবিয়ে চলে গেল।

ঠিক নটায় এটা তার প্রাত্যহিক কাজ। 'কত্তা' বেঁধে দিয়েছেন। এত লোক রয়েছে বাড়িতে—স্ত্রী, মেয়েরা, বৌমারা, নাতনীরা, চাকর-বাকর—কারো মশারি-গোঁজা ওঁর পছন্দ নয়। কোনো দিকটা কুঁচকে কিংবা ঝুলে থাকে, কোথাও হয়তো একটু ফাঁক থেকে যায়। পাছে মশা ঢোকে, এই ভাবনায় সারারাত ঘুম হয় না। শরীর খারাপ করে।

সত্যেন কলেজে পড়ে। বয়স আঠার-উনিশ। ইংরেজি ছবির ভীষণ ভক্ত। কিন্তু স্টেট্‌স্‌ম্যানের রিপোর্ট পড়েই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। চাক্ষুষ দেখবার উপায় নেই। কখন দেখবে? সন্ধ্যার শোতে গেলে চৌরঙ্গী পাড়া থেকে শ্যামবাজার নটার মধ্যে ফেরা যায় না। নাইট শোতেও নটার আগে বেরোতে হয়। দুপুরবেলা কলেজ পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া এ বাড়ির কাছে মারাত্মক অপরাধ।

একবার একটা কী দুর্দান্ত ছবি এসেছে লাইটহাউস-এ। কী করে দেখা যায়? কত্তার খাস চাকর রাম ভরসা দিল, যাও না, একটা দিন আমি চালিয়ে নেবো।

"পারবি তো?"

"পারবো। আমি তো দেখেছি তুমি কেমন করে গোঁজো।"

"তোকে যদি চিনে ফেলেন?"

"তোমার জামাটা গায়ে পরে নেবো।"

পঁচাশি পেরোলে কি হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্যেন-চক্ষুকে ফাঁকি দেয় কার সাধ্য? ধরে ফেললেন—"তোকে কে আসতে বলল? সে হতভাগাটা কোথায়?"

রাম নীরব। হুকুম হল, "তাকে ডেকে দে!" রাম ডেকে আনল মেজো বৌমাকে। তিনি দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে, অর্থাৎ ছেলেকে তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর বাপের বাড়ি, অসুস্থ বাপকে দেখতে—ইত্যাদি কাহিনী দিয়ে শ্বশুরকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলেন। মৃত্যুঞ্জয় আর কিছু বললেন না। কিন্তু রাত্রে ঘুম হল না। সকালে ডাক্তার ডাকতে হল—ব্লাড্‌প্রেসার বেশ কয়েক ধাপ বেড়ে গেছে।

বিয়ের পরদিন সকালেও চিরাচরিত নিয়মের এতটুকু হেরফের হল না। ঠিক সাড়ে সাতটায় বড় বৌমা এলেন শ্বশুরের প্রাতরাশ নিয়ে। মাপা গেলাসে এক গেলাস ছাগলের দুধ, তার সঙ্গে একখানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট। এ কাজটি বড় বৌমার। তাঁরই মেয়ের বিয়ে, ওদিকে একরাশ কাজ পড়ে আছে। তবু আসতে হল। অন্য কারো হাতে পাঠালে শ্বশুর ক্ষুণ্ণ হবেন। খাবেন হয়তো, কিন্তু খাবারটা ঠিকমত হজম হবে না।

জলযোগ শেষ করে খবরের কাগজটা টেনে নিতে যাবেন, বড় বৌমা বললেন, এবার ওদের নিয়ে আসব বাবা?

মৃত্যুঞ্জয় বুঝলেন, বরকনের কথা বলছেন পুত্রবধূ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না। বোধ হয় ভাবতে লাগলেন, তাঁর বাঁধা রুটিনের কোন্ দফাটাকে সরিয়ে তাদের জায়গা করা যায়। বৌমা কৈফিয়তের সুরে বললেন, সকলের

আগে আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে তো অন্য কিছুই হতে পারে না বাবা।

"আচ্ছা, নিয়ে এসো।"

বর-কনের সঙ্গে এল গোটা পরিবার। কিন্তু তার আকার এত বৃহৎ যে সামান্য অংশই ঘরে ঢুকতে পারল। জায়গার অভাব। বাকী অংশটা ছড়িয়ে রইল বারান্দায়।

প্রণামের পালা শেষ হলে নাতজামাইকে বসতে বললেন, দেয়ালের ধারে যে নীচু তক্তপোষটা পাতা আছে, তার উপর। নাতনী এসে দাঁড়াল দাদুর পাশ ঘেঁষে। তার দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন, এখানে কেন? ওখানে গিয়ে বোস। আই হ্যাভ্ অলরেডি মেড্ ওভার চার্জ। গত রাত থেকেই এ বুড়ো বাতিল হয়ে গেছে।

অন্য সময় হলে নাতনী একটা যুৎসই জবাব দিত। এখন বোধ হয় লজ্জা হল এত লোকের সামনে। নীচু হয়ে দুহাতে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে নীরব প্রতিবাদ জানাল। মৃত্যুঞ্জয় হাসিমুখে দুটো আঙুল দিয়ে তার গালে মৃদু আঘাত করে বললেন, দেখা যাবে এবার কত টান থাকে দাদুর ওপর।

গৃহিণী ছিলেন সামনে। বললেন, নাতনীকেই তো শুধু আদর করছ, নাত-জামাইকে আশীর্বাদ করলে না?

"ও, হ্যাঁ," বলতে বলতে নাতজামাই-এর দিকে ফিরলেন, "আমার বয়স কত জানো? সাতাশি বছর সাত মাস। আশীর্বাদ করি, তুমি যেন তার ওপরে আরো তের বছর যোগ করতে পার। অ্যান্ড্—", চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাভ এ বিগার ফ্যামিলি দ্যান মাইন।"

একটা চাপা হাসি খেলে গেল সকলের মুখে। নতুন জামাই লজ্জায় মুখ নামাল। নাতনী একটি ছোট্ট চিমটি কাটল দাদুর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিলেন মৃত্যুঞ্জয়, পারবি পারবি। তোর ঠাকুমাকে দেখছিস না?

ঘড়ির দিকে তাকালেন মৃত্যুঞ্জয়। ইঙ্গিতটা বুঝতে কারো অসুবিধে হল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নতুন জামাইটিও উঠতে যাচ্ছিল। তিনি বাধা দিলেন, "বসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।···এই যে তোমাকে বললাম, একশ বছর বেঁচে থাকো; তুমি ভাবছ, ওটা একটা কথার কথা; অনেকেই বলে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়। একশ বছর বেঁচে থাকা এমন কিছু কঠিন নয়, ইফ্ ইউ ওনলি নো দি আর্ট ওব্ লিভিং। মুখে যে যা-ই বলুক দীর্ঘজীবন পেতে চায় সকলেই, কিন্তু কী করে পেতে হয় সে রাস্তাটা খুব কম লোকেরই জানা আছে।

দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন মেজ বৌমা। এক হাতে নিক্তি, আরেক হাতে একটা ঝুড়ি। পিছনে চাকরের হাতে ট্রেতে বসানো কতকগুলো ছোটো বাটি। জামাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। মৃত্যুঞ্জয় বললেন, অনেক দিন বেঁচে থাকবার প্রথম সিক্রেট কী জানো? এখনি দেখতে পাবে।

মেজ বৌমা তাঁর কাজ শুরু করলেন। দু-তোলা চাল ওজন করে রাখলেন

একটা বাটিতে। তার সঙ্গে এক তোলা কাঁচা মুগডাল। আর একটিতে রাখলেন কিছু তরকারি—একটি ঢ্যাঁড়শ, দুগাছা বরবটি, কয়েকখণ্ড মোচা, দুটি ডুমুর, একটুকরো আপেল, সব মিলিয়ে চারতোলা। আরো কি সব টুকিটাকি, সবই গুনে কিংবা ওজন করে রাখা হল অন্যান্য বাটিগুলোয়। উনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সব। তারপর মেজ বৌমা চলে গেলেন। পিছনে ট্রে হাতে চাকরটি।

মৃত্যুঞ্জয় ফিরলেন নাতজামাই-এর দিকে—"ঐ হচ্ছে আমার এবেলার খাবার। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন্‌টার কী ফুড্‌ভ্যালু, কিসে কতটা ক্যালরি, সব কষে, হিসেব করে মেনুটা তৈরি করতে হয়েছে। কোনটা কতক্ষণ সেদ্ধ হবে, কী রকম আঁচে, কেয়ারফুলি ওয়াচ করতে হবে। মেজ বৌমা সব জানেন। উনিই করে আসছেন বরাবর।"

হেলানো চেয়ারে এতক্ষণ বেশ সোজা হয়ে বসে কথা বলছিলেন। এবার পিছনের দিকে হেলান দিয়ে পা দুটো একটু ছড়িয়ে বসে বললেন, এসব কাণ্ড দেখে তুমি বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গ্যাছ ?

"না, না : অবাক কেন হবো ? এসব তো বেশ ভালো।"

"তুমি বলছ, 'ভালো'। আমার গিন্নী কি বলে জানো ? 'এসব তোমার বুড়ো বয়সের বাতিক।' ছেলেমেয়ে বৌমারাও বোধ হয় তাই মনে করে। কিন্তু ওরা জানে না, না খেয়ে যত লোক মরে তার চেয়ে বেশী মরে খেয়ে। খাবার আগে তোমাকে জানতে হবে কোন্ জিনিসটা তোমার উপকারী, আর কোন্‌টা উপযোগী। তার চেয়েও বড় কথা, কোন্ জিনিসের কতটা তোমার সিস্টেম নিতে পারে।···সংসারে এসেছি বেঁচে থাকতে। একটু হিসেব করে চললে যদি দশটা বছর বেশী টিকে যাওয়া যায়, মন্দ কী ? সরকার তো আর তার জন্যে পেনসন বন্ধ করে দেবে না ?"

নাতজামাই মুখে বলল, সে তো বটেই! মনে মনে বলল, পেনসনওয়ালা বৃদ্ধের দল সবাই যদি এমনি করে নিক্তি মেপে খেতে শুরু করে এবং পণ করে বসে একশ বছর না পেরোলে নড়বে না, সরকার নিশ্চয়ই আইন করে একটা বয়স বেঁধে দেবে, যার বেশী বাঁচলে আর পেনসন দেওয়া হবে না।

জামাই বেচারা অনেকক্ষণ থেকেই পালাবার ফাঁক খুঁজছিল। দাদাশ্বশুরের বক্তৃতায় ছেদ পড়তে যেমন উঠতে যাবে, তিনি আবার শুরু করলেন, "খাওয়া হল একটা দিক। আরেকটা এবং ইকোয়ালি ইম্পর্ট্যাণ্ট দিক হল রেগুলারিটি, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে ঠিকমত করা। সেদিকেও আমার কড়া নজর আছে। একেবারে ঘড়ি ধরে—"

নাপিত এসে ঢুকল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে। তার সময় হয়ে গেছে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে একদিনের মাইনে কাটা যাবে।

বেঁচে গেল নাতজামাই।

রিটায়ার করবার পর ছেলেরা বলেছিল পেনসন তো ব্যাঙ্কের মারফত নেওয়া যেতে পারে, কি দরকার মাসে মাসে ট্রেজারীতে ধরনা দেবার ? মৃত্যুঞ্জয়-বাবু রাজী হননি। মাসে শুধু ঐ একটি দিন সতীর্থ, সহকর্মী এবং দু-চারজন

সমকালীন বন্ধুদের দেখা মেলে, সে-সব দিনের সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান করতে গিয়ে ফেলে আসা পুরনো জীবনটা নতুন স্বাদ নিয়ে দেখা দেয়। তার ভিতরেও খানিকটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে। ঐ কয়েকটা ঘণ্টা বেশ কিছুদিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দেয়। সে লোভ ত্যাগ করা যায় না।

পঁচাত্তর পেরোবার পর সকলের চাপে পড়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন। তখনো বছরে একবার, এপ্রিল মাসে ট্রেজারী অফিসারের কাছে হাজিরা দেবার নিয়ম। সশরীরে জানাতে হয় আমি বেঁচে আছি। দু-একবার গিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। পরে লাইফ-সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা হল। সেজো ছেলে গেজেটেড অফিসার। সেই দেয় সার্টিফিকেট—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ইজ অ্যালাইভ দিস্ ডে। এটা তাঁরই সই।

নব্বই বছরে পা দিয়ে হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপল ৩রা এপ্রিল নিজেই যাবেন ট্রেজারীতে। কারো মানা শুনলেন না। বাড়ির গাড়ি করে বড় ছেলের মেজো ছেলে (সে ডাক্তার) এবং খাসভৃত্য রাম গেল সঙ্গে।

অনেক দিন পরে বাইরে বেরিয়ে চিরপরিচিত রাস্তাঘাট বাড়িঘরগুলোকে যেন নতুন রূপে দেখলেন। কচি পাতায় ভরে গেছে গাছপালা। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় নব-জীবনের স্পর্শ। নিজের অন্তরের মধ্যেও একটা সজীবত্বের জাগরণ টের পেলেন মৃত্যুঞ্জয়। পৃথিবী বড় সুন্দর, বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে।

ট্রেজারী অফিসার খাতির করে বসালেন। এরকম বর্ষীয়ান পেনসনার তাঁর চাকরিজীবনে আর একটিও দেখেননি। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের খোঁজখবর নিলেন। ট্রেজারি অফিসার কাউকে চিনতে পারলেন না। বললেন, আমি তো বেশী দিন আসিনি। আমার অ্যাকাউন্ট্যাণ্টকে ডাকছি। তিনি অনেক দিন আছেন, হয়তো বলতে পারবেন।

অ্যাকউণ্ট্যাণ্টও বেশির ভাগ নাম শোনেননি। দু-চারটি মনে পড়ল—"কাশীশ্বর রায় ? তিনি তো অনেক দিন হল মারা গেছেন। বিশ্বনাথ হালদার ? তিনিও নেই। মহিমারঞ্জন ঘোষাল গেছেন গেল বছর।"

এমন একজনকেও পাওয়া গেল না, যিনি বেঁচে আছেন।

বাড়ি ফেরার পথে ঐ একটা কথাই জেগে রইল মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে—সবাই চলে গেছে, পড়ে আছেন তিনি একা।

ঠিক পাঁচটায় রোজকার মত ছানা আর ফল নিয়ে এলেন সেজ বৌমা। অন্য দিন মৃত্যুঞ্জয় হাত বাড়িয়ে ডিসটা টেনে নেন। আজ হাত নেড়ে বিরক্তির সুরে বললেন, নিয়ে যাও।

"খাবেন না ?"

"না।" বলে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

শ্বশুরের চোখ-মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেলেন সেজ বৌমা। জরা ও ক্লান্তির চিহ্নগুলো হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উপরে কিসের একটা ছায়া।

মুরারিপুকুর থেকে ফিরেই ভুবন একেবারে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। এর আগে যতবার গেছে, বেশ হাসিমুখ করে ফিরেছে। ওখানে কে কেমন আছে, তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে দু-চারটা কথাবার্তা বলে, তারপর ঘরে ঢুকেছে জামা ছাড়তে। আজকের এই তফাতটা সৌদামিনীর এড়াল না। মনে মনে হাসলেন। টুলির সঙ্গে খুনসুড়ি-টুরি হয়ে থাকবে হয়তো। ঐ মেয়েটার উপরেই যে ছেলের মন পড়ে আছে, সে কথা তিনি জানেন। সেই জন্যেই ফি মাসে দু একবার 'বরদা কাকার ওখান থেকে ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে একটু সাজগোজ করে বেরোয়। বরদা কুণ্ডু ওঁদের আত্মীয় নয়, লতায় পাতায় জড়ানো একটা সম্পর্ক আছে, এই পর্যন্ত।

ছেলে বেরোচ্ছে না দেখে সৌদামিনী দরজার সামনে গিয়ে ডাকলেন, কী হল। এসেই শুয়ে পড়লি যে? শরীর খারাপ করেনি তো?

—না।

—ওরা সব কেমন আছে?

—ভালো।

—উঠে আয়। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। রাত কম হয়নি; নটা বেজে গেছে।

—আমি খাবো না।

—কেন?

—খিদে নেই।

সৌদামিনী মনে করলেন ওরা নিশ্চয়ই মোটা রকম জলখাবার খাইয়ে দিয়েচে। ওদের নজর আছে ভুবনের দিকে। আগেকার দিন হলে অবশ্য বরদা কুণ্ডু তাদের ঘরে মেয়ে দিতে তিনবার ইতস্ততঃ করত। এখন আর সে কথা ওঠে না। জমি-জমা কাজ-কারবার সবই তো ওপারে ফেলে আসতে হয়েছে। তাছাড়া ছেলেও তাঁর ফেলনা নয়। মোটর ড্রাইভারী শিখে একশ পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে। সরকারী লোন নিয়ে মাথা গুঁজবার জায়গাও একটু করে নিয়েছে, তা বলতে গেলে, শহরের মধ্যেই। মেয়েটাকে যে সৌদামিনীর খুব পছন্দ, তা নয়। একটু যেন বেশী বেশী ফরফর করে। কিন্তু কী করা যায়। ছেলের যখন মনে লেগেছে তাঁর নিজের পছন্দ বা অপছন্দর কথা ওঠে না। তাছাড়া আজকাল সব মেয়েই ঐ রকম। তাঁদের কাল কি আর আছে? পায়ের দিকে ছাড়া চাইবে না, সাত চড়ে রা করবে না—সে জাতের মেয়ে এখন পাবেন কোথায়?

সৌদামিনী ঘরে ঢুকে ছেলের ছেড়ে ফেলা সার্ট, প্যাণ্ট আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'খিদে নেই বলে একেবারে না খেয়ে থাকবি? দুখানা রুটি মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে, তার পর শো।'

ভুবন জবাব দিল না। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে পাশবালিশটাকে জড়িয়ে

বেশ গোছগাছ করে শুল।

সৌদামিনী আর কথা বাড়ালেন না।

আসলে, ভুবনের তখন রীতিমত পেট জ্বলছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী জ্বলছে বুকের ভিতরটা। টুলির সেই কথাগুলো ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ন তীরের মত বিঁধছে। সেই বিশেষ খবরটা শোনাবার জন্যেই যেন তৈরী হয়ে বসে ছিল —"জানো! নরেশদার ছবি বেরিয়েছে কাগজে। দেখবে?" উত্তরের অপেক্ষা করেনি। উপচে পড়া খুশীর জোয়ারে ছুটে গিয়ে ও ঘর থেকে নিয়ে এসেছিল একটা বাঁধানো খাতা; তার প্রথম পাতায় কত যত্ন করে লাগানো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কেটে নেওয়া একখানা ছবি—কোন্ এক 'মিতালি নাট্যসঙ্ঘের' 'শেষরক্ষা' অভিনয়ের একটি দৃশ্য। তিনজন অভিনেতা। তার মধ্যে কোনটা যে নরেশ, ভুবন প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। টুলিই দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। গর্বভরে বলল, এই দ্যাখ, কী সুন্দর উঠেছে ছবিটা! তাই না?

—'সখের থিয়েটারের ছবি!' বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ভুবন, 'আমি মনে করেছিলাম কী যেন।'

—'হলই বা সখের থিয়েটার? খবরের কাগজে ছবি বেরোন কি সোজা কথা নাকি! কজনের বেরোয়!'

'আরো দেখবে?'

পরের পাতায় ঐ মিতালি-সঙ্ঘের আর একটা কি অনুষ্ঠানের গ্রুপ ফটো। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নরেশ। 'নরেশদা বলেছে, আরো অনেক ছবি বেরোবে। বেরোলই কাটিং এনে দেবে আমাকে।'—মাথা নেড়ে নেড়ে এই কথাগুলো যখন বলছিল টুলি, তার মুখের রেখা, চোখের দীপ্তি এবং কণ্ঠের সুরে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল তার মাত্র একটি অর্থই করা যায়—খবরের কাগজে ছবি মুদ্রণের মধ্যে যে গৌরব, সেটা শুধু নরেশের নয়, তার এই সপ্তদশী ভক্তটিও তার সঙ্গে সম-গরবিনী।

নরেশ যদি ঐ সময়ে ওখানে উপস্থিত থাকত, ভুবন কি করে বসত, বলা শক্ত। আপাততঃ যতটা সম্ভব বাক্য দ্বারা তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সেই ভাবেই বলল, 'হুঃ, ভারি তো দুটো ছবি! ও রকম আকছার বেরোচ্ছে আজকাল। ইচ্ছে করলে সবাই দু-চারখানা ছাপাতে পারে।'

—'পারে নাকি!' চোখে ও কপালে বিদ্রুপের কুঞ্চন তুলে হাসি হাসি মুখে বলেছিল টুলি, 'বেশ তো, চেষ্টা করে দ্যাখ না একবার?' বলেই আর দাঁড়ায়নি। খাতাটা বন্ধ করে দুহাতে বুকের উপর তুলে নিয়ে যৌবনোচ্ছল দেহে তরঙ্গের দোলা দিয়ে চলে গিয়েছিল অন্য ঘরে। ভুবনের মনে হয়েছিল, যাবার সময় যেন এক তাল অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে গেল তার মুখের উপর।

সকালে উঠে চা খেয়ে ভুবন কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুরারিপুকুর 'দেশপ্রাণ কলোনীর' একখানি ছোট ঘরে একটি বিশেষ দৃশ্য তখনো আর মনের মধ্যে চেপে বসে আছে। ঐ নরেশ তার চিরদিনের 'দুশমন'; 'শত্রু' বললে যেন সবটুকু বলা হয় না। ছেলেবেলা থেকে ওর কাছে সে শুধু হেরেই এসেছে। এক গ্রামের

ছেলে, একই ক্লাসে পড়ত। কিন্তু ভুবন পালের চেয়ে নরেশ সরকার সব পরীক্ষা-তেই বেশ কয়েক ধাপ উপরে। শব্দরূপের 'সাপের মন্তর' আগাগোড়া নির্ভুলে আউড়ে দিত, ভুবন কিছুতেই পেরে উঠত না, উল্টো-পাল্টা হয়ে যেত। ফলে পণ্ডিত মশায়ের কাছে নরেশের পাওনা ছিল পিঠ-চাপড়ানি, আর ওর কপালে জুটত কানমলা। পুরস্কার বিতরণী সভায় নরেশ সব চেয়ে ভালো আবৃত্তি করে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। ভুবনের কাজ ছিল চেয়ার বেঞ্চি টানা, সামিয়ানা খাটানো, আর 'প্রাইজ' বলতে হেডমাস্টার মশাই-এর মুখ ভেংচি।

এই টুলির সঙ্গে ভুবনের ভাব কি আজকের? এ-পাড়া ও-পাড়া বাড়ি। কত বয়স তখন ওদের? নয় আর তেরো। অতটুকু মেয়ের ফাই ফরমাস খেটে খেটে প্রাণান্ত। তালের ডোঙ্গায় চেপে ঝিনাইদ' বিলের মাঝখান থেকে শাপলা ফুল তুলে আনতে হবে। কালী বাড়ির পেয়ারা গাছের মগডালে চড়ে সব চেয়ে বড় পেয়ারাটা পাড়তে হবে, আর সারা গায়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে পাকা পাকা বেতফল সংগ্রহ করতে হবে বাঁড়ুয্যেদের ভুতুড়ে ভিটের বেত ঝোপের ভিতর থেকে। নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নতুন ধামির মধ্যে ঝেঁকে ঝেঁকে টুলিই সেগুলো জারাত এবং বড় ভাগটাই তুলে দিত তার হাতে। আপত্তি করলে বলত, 'নাও না? এত কষ্ট করে পেড়ে আনলে।' মাঝে মাঝে ওর ঠাকুরমার লুকোনো হাঁড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আসত কুলের আচার। কী মিষ্টি খেতে। কিন্তু তার চেয়েও মিষ্টি লাগত ওকে।

একদিন ঠাকুরমশাইদের বুড়ো বটগাছের তলায় সেই ফোকরটার মধ্যে গায়ে গায়ে বসে ওরা কুলের আচার খাচ্ছিল। কদিন আগে ধুমধাম করে বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সেই সব দৃশ্য বোধহয় দুজনারই চোখের উপর ভাসছিল। খেতে খেতে ভুবন হঠাৎ বলে উঠল, 'তোতে আমাতে বিয়ে হবে, কেমন টুলি?'

ওর গায়ে একটা ঠেলা মেরে টুলি বলল, 'যাঃ!'

—'যাঃ কেন?'

—'বা-রে, লজ্জা করে না বুঝি?'

বরের পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ানো শেফালিদির সেই ঘোমটা ঘেরা লজ্জা-রাঙন আনত মুখখানাই বোধহয় ওর মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল।

সেদিনটা কি কারণে ছুটি ছিল। সকালের দিকে টুলিদের বাড়ি গিয়ে দেখে, সে ভীষণ ব্যস্ত। সামনে একখানা খোলা বই, আর হাতের কাছে একটা কাঁসার বাটির মধ্যে কতকগুলো টুকরা টুকরা কাগজ ভিজছে। ও সেই দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভুবন জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কিরে?'

—'জলছবি।'

—'কোথায় পেলি?'

—'নরেশদা দিয়েছে। এই এৎ-তো'—দুখানা হাত অনেকটা ফাঁক করে দেখাল টুলি, 'ওর ছোটমামা আছে কোলকাতায়। সে নিয়ে এসেছে। দ্যাখ না,

কী সুন্দর !’

ভুবনের এ সব ভালো লাগল না। জলছবি না ছাই! তার যদি অমনি একটা ছোটমামা থাকত—কোলকাতার কলেজে পড়া—সে এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো জিনিস এনে টুলিকে তাক লাগিয়ে দিতে পারত। আপাততঃ যখন সে সম্ভাবনা নেই, যে প্ল্যান নিয়ে এসেছিল, সেইটাই বেশ লোভনীয় করে তুলে ধরল। বোসেদের খিড়কির পুকুরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে ছিপ দিয়ে পুঁটি মাছ ধরা। ওদের গোয়াল ঘরের চাল থেকে একখানা বোলতার চাকও ভেঙে এনেছিল। কাপড়ের আড়াল থেকে তুলে দেখাল। হাতে দুজায়গায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে বোলতাগুলো, তাও জানিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। এই মাছ ধরার ব্যাপারে টুলির ভীষণ উৎসাহ। রুপোর মত চকচকে চওড়া চওড়া পুঁটিগুলো যখন ছিপের টানে ছটফট করতে করতে জল থেকে উঠে আসে, তার খুশী আর ধরে না। মাছগুলো সে-ই খুলে নিয়ে খালুইতে রেখে দেয়। টোপ গেঁথে দেয় বর্শার ডগায়।

আজ সে সব কিছু যেন কানেই তুলল না। বোলতার কামড়ে ভুবনের হাতটা বেশ ফুলে উঠেছিল। সেদিকেও একবার ফিরে তাকাল না। আরেকবার তাড়া দিতেই পাকা গিন্নীর মত বলল, ‘বাপরে! আমার কি এখন মরবার ফুরসত আছে? এই এতগুলো ছবি তুলতে হবে, দেখছ না? পারলে হয়। ছিঁড়ে টিঁড়ে গেলে নরেশদা এসে বকবে।’

ভুবন বিরস মুখে উঠে চলে গেল। রাস্তায় পড়ে বোলতার চাকখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলল। আর একবার হার হল নরেশের কাছে।

মনিব লোহার কারবার করেন। রোজ সকালে তাকে ভবানীপুর থেকে মানিকতলায় কারখানায় পৌঁছে দিতে হয়। আজ সমস্ত পথটা ভুবন সেই ছেলেবেলাকার পুরনো দিনের মধ্যেই ডুবে রইল। মনে মনে সংকল্প করল, এবার সে কিছুতেই হার মানবে না। টুলিকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ। তার বাবার কাছে গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে হয়তো তিনি বিমুখ করবেন না। কিন্তু সে পাওয়ায় সুখ নেই। ওরই কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। দেখাতে হবে, ঐ থিয়েটার-ওয়ালা নরেশের চাইতে সে কোন অংশে ছোট নয়। টুলি সেদিন তাকে প্রকারান্তরে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে। সে চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। কাগজে ছবি বেরোনই যদি কৃতিত্বের মাপকাটি হয়, ভুবন দেখিয়ে দেবে সেখানেও সে পিছনে পড়ে নেই।

একখানা নামকরা কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে একটি কর্মীর সঙ্গে ভুবনের পরিচয় ছিল। পাড়ার এক ফটোগ্রাফারের স্টুডিও থেকে ছবি তুলিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। সে জানতে চাইল, উপলক্ষটা কী। খালি খালি তো আর কারো ছবি ছাপা যায় না। ভুবন বোঝাল, ‘উপলক্ষ্য কিছু নয়। তোমরা যেমন টাকা নিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপ, তেমনি ছবি ছাপবে। নিচে লেখা থাকবে—প্রসিদ্ধ লোহ-ব্যবসায়ী বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা এণ্ড কোম্পানীর সুযোগ্য মোটর ড্রাইভার

শ্রীভুবনমোহন পাল। খরচ পত্তর যা লাগে, দেবো।'

বন্ধুটি হেসেই অস্থির। বলল, 'না ভাই, এখানে ও সব চলবে না। অন্য কোনো ছোটখাট কাগজ দ্যাখ।'

তাই করল ভুবন। অপেক্ষাকৃত কম-নামী কাগজের দ্বারস্থ হল। কেউ রাজী হল না। সকলের এককথা—ছবি ছাপাতে হলে একটা কিছু করা চাই। একজন ওকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করে প্রস্তাব করল, 'এক কাজ করুন, 'হারান—প্রাপ্তি—নিরুদ্দেশ' কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তার সঙ্গে ছবি চলতে পারে।'

—'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইল ভুবন।

—'আপনার নাম কি?'

—'ভুবন মোহন পাল।'

—লিখুন,—'ভুবন পাল নামক বাইশ-তেইশ বৎসরের একটি যুবক বাড়ি হইতে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে তাহার ফটো দেওয়া হইল। চার্জ পড়বে—'

চার্জ শুনবার জন্যে ভুবন আর অপেক্ষা করল না।

তাহলে এবারেও কি তাকে হার মারতে হবে—সেই চিরশত্রু নরেশ সরকারের কাছে? টুলির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নীরবে হটে আসতে হবে? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর এই বদখেয়ালের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে, এই বা কেমন কথা? কাগজে যাদের ছবি বেরোয় না, তারা কি মানুষ নয়? কিন্তু এ যুক্তি বেশীক্ষণ টেঁকে না। সেই গর্বোৎফুল্ল চোখদুটি মনে পড়ে—কী একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফটোগুলোর দিকে। এর পরে নিজের একটা ছবির কাটিং না নিয়ে তার কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সৌদামিনী লক্ষ্য করছিলেন, কিছুদিন থেকে ছেলে যেন সব সময়েই মন-মরা হয়ে থাকে। হাসে না, কথাবার্তা বলে না, পেট ভরে খায় না। দুটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে বাসায়, ওঁর বিধবা বড় মেয়ের ছেলেমেয়ে। আগে তাদের নিয়ে হৈ চৈ করত, এখন ফিরেও দেখে না।

একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই ধরলেন ছেলেকে—'তোর কী হয়েছে, বল তো?'

—'কী হবে?'

—'কুণ্ডু মশাইদের বাসায় গিয়েছিলি এর মধ্যে?'

—'না।'

—'তাহলে কালই একবার ঘুরে আয়। অনেকদিন খোঁজ খবর নেই।'

—'তারাও তো একবার খবর নিতে আসে না।'

—'কী যে বলিস! ওখানে খবর নেবার মত আছে কে? ঐ বুড়ো মানুষ আসবে নাকি এতটা পথ ট্যাং ট্যাং করতে করতে!'

আর বলতে হল না। পরদিন বিকালেই বেরিয়ে পড়ল ভুবন। একটা নতুন

আশা জাগল মনে—এতদিনে নিশ্চয়ই সেই ছবির ভূতটা ওর মাথা থেকে নেমে গেছে। মেয়েমানুষের ঝোঁক তো। বাঁধভাঙা বন্যার মত। যেমন বেগে আসে, চলেও যায় তেমনি তাড়াতাড়ি।

মুরারিপুকুরে পৌঁছে মনে হল, না এলেই বোধহয় ছিল ভালো। এবার শুধু ছবি নয়, যার ছবি সে-ই সশরীরে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। সামনে টেবিলের উপর আরেকখানা কাটিং। বোঝা গেল, ঐ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। কুণ্ডুমশাই এবং তার স্ত্রীও উপস্থিত। দুজনেই খুব তারিফ করলেন —ছবির এবং 'ছবিওয়ালার'। তাদের কন্যাটির মুখ দেখে মনে হল, 'নরেশদার' গর্বে এবার বোধহয় ফেটে পড়বে। নরেশ এ-কথা ও-কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, ছবি-টবি উঠল নাকি কোনোখানে?' অর্থাৎ, তার প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। হয়তো সেদিন যা সে বলেছিল, তাই নিয়েই দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা হাসাহাসিও হয়ে গেছে।

নরেশ একটু পরেই উঠে পড়েছিল। ভুবন আরো কিছুক্ষণ বসে যাবে এইটাই ওরা আশা করেছিলেন। কুণ্ডু দম্পতি সেটা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সে আর বসতে পারেনি। একটিবার টুলির সেই হাসিহাসি মুখখানার দিকে চেয়ে আজকের হারটা যেন আরো তীব্র ভাবে লেগেছিল তার বুকে।

॥ দুই ॥

বৃন্দাবনবাবুর বাড়ি যে রাস্তায়, তারই মোড়ের কাছে একজন উপমন্ত্রী থাকেন। তাঁর ড্রাইভার প্রায়ই আসত ভুবনের কাছে এবং একটানা দুঃখের কাহিনী বলে যেত—মন্ত্রীদের ড্রাইভারী করবার মত ঝকমারি কিছু নেই; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদল—বারোমাস মফঃস্বল। আজ মাকড়দ, কাল আরামবাগ, পরশু মেমারী। শুধু শহর বন্দরে হলেও কথা ছিল না। দূর দূর গ্রামে চলে যেতে হয়। ফিরতে কখনো বেলা দুটো, কখনো রাত বারটা। আর সে কি রাস্তা! কোনদিন যে কোন পগারে পড়ে বেঘোরে প্রাণটা যাবে, মা কালীই জানেন।

সেদিনও এই সব কথা হচ্ছিল। ভুবন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোমার মনিবের তো দেখি হরদম ছবি বেরোয় কাগজে।

—'তা বেরোবে না।' বিরক্তি প্রকাশ করল ড্রাইভার, 'মিটিং-এ বক্তৃতা করতে উঠলেন তো দুদিক থেকে তেড়ে এল ক্যামেরা। যত সব।'

—'তুমি কেন ছবি তোলাও না ঐ সঙ্গে?'

—'আমি? দূর, ছবি দিয়ে কী হবে? আর তাছাড়া আমার ছবি ওরা তুলবেই বা কেন?'

—'তবু যদি বল একবার মন্ত্রী মশাইকে?'

—'ক্ষেপেছ?'

ভুবনের উপর তার মনিব খুশী ছিলেন না। ইদানিং যে সে গাড়ি চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সেটা তাঁর লক্ষ্য এড়ায়নি। কয়েকবার সাবধান

করে দিয়েছেন। একদিন তো অ্যাকসিডেন্ট্ হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল গাড়িটা। সুতরাং সে গিয়ে যখন চাকরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করল, সাহা মশাই বিশেষ আপত্তি করলেন না। ওকেই একজন ভালো লোক যোগাড় করে দিতে বললেন। লোক তো হাতের মধ্যেই ছিল। মন্ত্রীর ড্রাইভারকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল। ভুবনের শর্ত ছিল মন্ত্রীর কাজটি তাকে পাইয়ে দেওয়া। সেদিকেও কোনো অসুবিধা হল না। তিনিও এই অনিচ্ছুক লোকটাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভুবনের আগ্রহ দেখে এবং যথারীতি টেস্ট ইত্যাদির পর খুশী হয়ে তাকেই নিয়ে নিলেন। বৃন্দাবনবাবুও মন্ত্রীর ড্রাইভারটিকে পছন্দ হল।

মন্ত্রীর সঙ্গে মফঃস্বলে গিয়ে ভুবন প্রায়ই দেখে ক্যামেরাম্যানদের জীপ আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ছবি তোলবার সুযোগ হয় না। ফটো তো বাইরে নেওয়া হয় না, হয় প্যান্ডেল বা হল-এর মধ্যে, মন্ত্রী যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন। সেখানে গণ্যমান্যরাই তাঁকে ঘিরে থাকে। ভুবনের মত লোকেদের প্রবেশাধিকার নেই।

একদিন হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। বক্তৃতার শেষে চা পার্টির আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। তারপরে একটা গ্রুপ ফটো নেবারও ব্যবস্থা আছে। ভুবন তাকে তাকে আছে, ঠিক সময়ে লাইনে গিয়ে মিশে যাবে। অনেক লোকই সেই সুবিধা খুঁজছিল। এক ফাঁকে সেও তাদের দলে ভিড়ে গেল। একটু পাশের দিকে পড়ে গেল। তা আর কি করা যায়। ফটোগ্রাফাররা এসে ক্যামেরা ফিট করল। কালো ঘেরা টোপের মধ্যে বার দুই আসা যাওয়া করল। তারপর 'রেডি'? বলে খুলে ধরল মুখের খাপটা। ভুবনের মনে হল, এতবড় সাফল্য তার জীবনে আর আসেনি।

সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফিরেই ছুটে গেল মুরারিপুকুর। মন্ত্রীর গাড়ি চালায়, এখবর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। এবার নিয়ে গেল আসল খবর। টুলি অন্য কি সব বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তার মাঝখানেই ভুবন বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলে ফেলল, 'কাল কিংবা পরশু দিনের দৈনিক কাগজগুলো একবার দেখো।'

—'কেন ? কী আছে তার মধ্যে।'

—'বিশেষ কিছু না। এমনিই একবার দেখো ?'

—'ছবি বেরোচ্ছে নাকি তোমার ?' সাগ্রহে জানতে চাইল টুলি।

ভুবন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'কী করব ? মন্ত্রীর টি-পার্টি। লোকগুলো শুনল না। জোর করে ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যামেরার সামনে।'

টুলির মুখখানা খুশীতে ঝলমল করে উঠল। বলল, 'কোন কাগজে বেরোবে ?

—'যুগান্তর, আনন্দবাজার এই সব বড় বড় কাগজে থাকবে নিশ্চয়ই।'

কিন্তু টি-পার্টির ছবি যখন বেরোল কাগজখানা হাতে করে বসে পড়ল ভুবন। মন্ত্রীর ডাইনে বাঁয়ে জন কয়েক করে লোক রেখে বাকী সব কাটা! টুলির

কাছে তাকে আরেকবার অপদস্থ করবার জন্যেই যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করেছে কাগজওয়ালারা !

তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ভুবন এবার ঠিক করল, তার মনিব যখন বক্তৃতা মঞ্চে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, তখন কোনো ফাঁকে তাঁর কাছে চলে যেতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়। ভলাণ্টিয়ারের দল অত্যন্ত সজাগ। সর্বদা পথ আগলে থাকে। একদিন দেখল, মন্ত্রী তাঁর এটাচি কেসটা গাড়িতে রেখে গেছেন। সেটা হাতে করে মঞ্চের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পরদার ফাঁক দিয়ে যেমনি দেখল, ফটোগ্রাফার এগিয়ে আসছে, ভয়ানক ব্যস্তভাবে ভলাণ্টিয়ারদের কাছে গিয়ে বলল, এটা উনি ভুল করে গাড়িতে ফেলে গেছেন, হয়তো কোনো দরকারি কাগজ-পত্তর আছে।

মন্ত্রী বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন। হঠাৎ সেখানে ড্রাইভারকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। ভুবন চামড়ার ব্যাগটা এগিয়ে ধরতেই ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এটা তোমাকে কে আনতে বললে এখানে ? যাও। যেখানে ছিল রেখে দাও গে।'

ফটোগ্রাফার বাধা পেয়ে আগেই হাত নামিয়ে নিয়েছিল।

সেদিন ভাগ্যে যে আরো দুর্দশা লেখা ছিল, সেটা তখনো বুঝতে পারেনি ভুবন। বুঝল, গাড়িতে ফিরে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল প্ল্যাটফরমের পিছনে। সেই ফাঁকে হেডলাইট দুটো উধাও হয়ে গেছে এবং চাকার পাশে যে ঢাকনি লাগানো থাকে তারও চারখানার মধ্যে তিনখানা নেই। তাকিয়েই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্ধকার রাত। অনেকখানি পথ। তার মধ্যে বেশ কিছুটা খানাখন্দ ভরা গ্রামের রাস্তা।

মন্ত্রী এসে সব দেখলেন এবং শুনলেন, কিন্তু ড্রাইভারকে কিছুই বললেন না। সভার উদ্যোক্তারা কোত্থেকে একটা মাত্র হেডলাইট নিয়ে এসে লাগিয়ে দিল। একচক্ষু বাহনটিকে অতি সাবধানে চালিয়ে বাড়ি ফিরতেই মন্ত্রীমশাই প্রথম মুখ খুললেন। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, কাল থেকে তোমাকে আর দরকার নেই। এ কদিনের মাইনেটা ওমাসের পয়লা তারিখে এসে নিয়ে যেও।

ভুবনকে এবার বেশ কিছুদিন বাইরে বেরোতো দেখা গেল না। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে সংসার শুনবে কেন ? ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটি পেট। ঐ এক-জনের উপর নির্ভর, অথচ চাকরি তো চাইলেই পাওয়া যায় না। ড্রাইভার বন্ধুরা কেউ কেউ পরামর্শ দিল, 'ট্যাকসি মালিকদের ধর। খাটতে পারলে রোজগারও ভালো।'

ভুবনের মনে মনে এই লাইনের উপর বরাবর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। 'ট্যাকসি-ওয়ালা' কথাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অবজ্ঞার গন্ধ জড়ানো আছে। যেখানে সেখানে যার তার হাতের ইংগিতে থেমে যাওয়া—সেও যেন মানুষের সাধারণ মর্যাদায় বাধে। বাড়ির গাড়ি যে চালায়, তার মনিব একজন বা একটা পরিবার, আর ট্যাকসি চালকের মনিব রাম শ্যাম যদু মধু সকলেই। এমন কি চৌরঙ্গীর মোড়ে ছেঁড়া পাজামা-পরা ভিখারী ছেলেগুলো যখন প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে

বখশিশের আশায় 'এই, ট্যাক্সি' বলে হাঁক দেয় তার মধ্যেও যেন একটা হুকুমের সুর বেজে ওঠে।

তবু ভুবনকে শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সির চাকরিই নিতে হল।

সেদিনটা বোধ হয় চৈত্র সন্ধ্যা। এলোমেলো উতলা বাতাস। হাওড়া স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ভুবন চলেছিল বালিগঞ্জের দিকে। একটি সুবেশ তরুণের পাশে সুরূপা তরুণী। সম্ভবতঃ সদ্যবিবাহিত। একটা ধার ঘেঁষে ঘন হয়ে বসেছিল তারা। ভুবন পিছন ফিরে তাকায়নি। তবু মাঝে মাঝে ভেসে আসা দুটো একটা টুকরো কথা, একটুখানি চাপা হাসি, চুড়ির ঠুনঠুন, শাসন-ভরা মৃদুকণ্ঠ, তার সঙ্গে জুঁইএর কড়া গন্ধ (সম্ভবতঃ মেয়েটির খোঁপায় জড়ানো মালা থেকে) সব মিলিয়ে তাকে যেন কোন মায়ালোকে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, পিছনের আসনে যারা বসে আছে, তারা যে দুটি অপরিচিত নরনারী, একথা সত্য নয়, তাদের একজন সে নিজে, আরেকটি তার অনেক দিনের চেনা।

ওদের পৌঁছে দিয়ে ভবানীপুরে মালিকের গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল পেছনের সীটে হেলান দিয়ে রাখা একটা মাঝারি সাইজের সুটকেস। লাগেজ ক্যারিয়ারে যে মাল ছিল, সেসব দেখে শুনে নামিয়ে নিতে ত্রুটি হয়নি। ভুলে গিয়েছিল শুধু নিজেদের চোখের সামনে সাবধানে রাখা আসল জিনিসটি। এমনিই হয়। ভুবনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ওর মধ্যে গয়না আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর মনের কোণে জেগে উঠল লোভের কালো ছায়া—এই উঞ্ছবৃত্তির প্লানি থেকে মুক্তির আশ্বাস নিয়ে এসেছে ঐ বাক্সটা। পরক্ষণেই চোখের উপর ভেসে উঠল মেয়েটির সেই ক্ষণিকের দেখা মুখখানা। তখনই উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাড়িটা মনে ছিল। সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই দরজা খুলে গেল এবং হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একদল উদ্বেগ-চঞ্চল মেয়ে-পুরুষ। সেই তরুণটি এগিয়ে এসেছিল। ভুবন দরজা খুলে সুটকেসটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরতেই, সকলে সমস্বরে আনন্দ—কলরব করে উঠল। ভিড়ের একপাশে মেয়েটিও এসে দাঁড়িয়েছিল। ভুবনের হঠাৎ মনে হল, সে নয়, হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে টুলি।

বাড়ির কর্তা—সম্ভবতঃ বধূটির শ্বশুর—দুখানা দশটাকার নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি যে উপকার করলে টাকা দিয়ে তার দাম দেওয়া যায় না। ছেলেপিলেদের জন্যে এই সামান্য—'

'মাপ করবেন' হাত জোড় করে বলল ভুবন, 'আপনারা খুশী হয়েছেন, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

"ও কখনো টাকা নেয়? দেখছ না বাঙালী ভদ্দরলোকের ছেলে"—বলতে বলতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা, বোধহয় বাড়ির গৃহিণী, সামনে এগিয়ে এলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, "একবারটি ভিতরে আসতে হবে, বাবা। একটুখানি মিষ্টিমুখ না করে গেলে, আমাদের মন মানছে না।"

এ অনুরোধ ভুবন এড়াতে পারল না।

জলযোগের পর সেই ছেলেটি এসে বলল, 'আপনার একটা ছবি নেবো।'

ভুবন কিছু বলবার আগেই কর্তা ওধার থেকে যোগ করলেন, 'ছবিটা আর তার সঙ্গে একটা রিপোর্ট কালই যুগান্তর আফিসে পাঠিয়ে দিস।—বাবুকে আমার নাম করে বলিস যেন পরশুকার কাগজেই বেরোয়।'

ভুবন হঠাৎ এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কোনো কথাই বলতে পারল না। তবে কি এতদিন পরে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সত্যিই সফল হতে চলেছে? আজ কার মুখ দেখে ভোর হয়েছিল!

যখন তারা বিদায় দিলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফাঁকা রাস্তা, তার উপরে মন যে স্তরে বিচরণ করছিল, গাড়ির বেগ কোথায় উঠল, একেবারেই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা ভিখারী বুড়ী, যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে দাঁড়াল একেবারে ব্যাম্পারের গা ঘেঁষে। দুর্দম বেগের মুখে সহসা পাশ কাটাতে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল এঞ্জিনটা। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ভুবন জানে না।

লোকজন এসে দেখল, একটা ল্যাম্প পোস্টের পায়ে আছড়ে পড়ে গাড়ির সামনেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। স্টিয়ারিং হুইলের ডাণ্ডাটা সোজা বিঁধে গেছে ড্রাইভারের বুকে।

অতবড় অ্যাকসিডেণ্ট! বিস্তারিত বর্ণনার পাশে ভাঙা গাড়ি এবং নিহত ড্রাইভারের ছবিটাও পরের দিনের সবগুলো বড় বড় কাগজে ছাপা হল। কাঁচের টুকরো লেগে মুখটা দু-তিন জায়গায় কেটে গিয়েছিল। তাহলেও টুলি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে।

নতুন আফিস

অমর দত্ত সরকারী সেরেস্তায় ভাল চাকরি করেন। 'পদস্থ অফিসার' বলা চলে। কিছুদিন আগে 'বাবু'-স্তর থেকে 'সাহেব' কোঠায় উঠেছেন। 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর দক্ষিণের বারান্দায় অবশ্য স্থান পাননি। সেটা আরো বৃহত্তর ব্যক্তিদের এলাকা। উত্তরেই আছেন। যে বিশাল হল-ঘরে বড়, মেজো এবং ছোট কেরানীরা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেন এক সময় তিনিও বসতেন, (এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলের দূরত্বটা পদানুযায়ী), তার এককোণে একটা কাঠের বেড়া দেওয়া খুপরির মধ্যে তাঁর জায়গা হয়েছে। স্প্রিং লাগানো কাটা দরজা। তার বাইরে একজন চাপরাশী টুল পেতে বসে থাকে। 'সাহেব'-এর ঘণ্টা শুনলে উঠে যায়, 'ফাইল'-এর বোঝা নিয়ে বেরিয়ে আসে, নানা টেবিলে পৌঁছে দেয়। ভিজিটর এলে, দরজার গায়ে ঝোলানো ছোট ছোট কাগজের টুকরো থেকে একটা খুলে নিয়ে এগিয়ে ধরে, নাম এবং কি উদ্দেশ্যে দর্শনপ্রার্থী, লিখিয়ে নিয়ে সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়। যার যখন ডাক পড়ে ভিতরে নিয়ে যায়।

দত্ত-সাহেবের টেবিল-জোড়া স্তূপীকৃত ফাইল। যেমন যায়, তেমনি আবার আসে। টেবিল ল্যাম্প কখনো নেভে না। তাঁর সামনে বসে তিনি ঘাড় গুঁজে কখনো পড়ছেন, কখনো নোট লিখছেন। তারই মধ্যে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তাও চালাচ্ছেন। ইংরেজ আমলে এই উৎপাত ছিল না বললেই হয়। মন লাগিয়ে কাজ করা যেত। এখন কারণে অকারণে ভিজিটরের হানা। অকারণেই বেশী। গণতান্ত্রিক সরকার, সুতরাং বলবার কিছু নেই। যারা আসে তাদের প্রত্যেককে জনগণের প্রতিনিধি বলে ধরে নিতে হবে, 'ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে' শুনতে হবে কী তার বক্তব্য, না শুনলেও অন্ততঃ মুখের ভাবে সেটা দেখাতে হবে। ঐটুকু পেলেই তারা সন্তুষ্ট, অফিসারেরও সুনাম। দেখা করার ফলে কাজ কতটা এগলো, সে প্রশ্ন অবান্তর।

বাইরের ভিজিটর ছাড়া বন্ধুদের ভিড়টাও কম নয়। এঘর ওঘর থেকে সমস্তরের সহকর্মীরা আসেন, আপন আপন 'বস্', বিশেষ করে মন্ত্রীদের সম্বন্ধে খোশ গল্পের আসর জমিয়ে তোলেন। সেই সঙ্গে চা চলে, সিগারেট পোড়ে। 'ফাইল'কে অপেক্ষা করতে হয়।

স্প্রিং দরজাওয়ালা খুপরিতে যারা বসেন, তাঁদের দুটো দল—এক, পক্বকেশ, আসন্ন-পেন্সন, যাদের নিচে থেকে ধীরে ধীরে পাহাড়ী পথ ভেঙে উঠতে হয়েছে; দুই, যারা হাল আমলের, অর্থাৎ উত্তর-স্বাধীনতা সংগ্রহ, একটা কি দুটো লাফ দিয়ে এই আসনে এসে বসেছেন। দ্বি-প্রাহরিক আড্ডার মেজাজটা তাদের মধ্যেই বেশী প্রবল। বলতে গেলে জিনিসটাও তাদের আমদানী, বৃদ্ধদের এলাকায় ক্রমশঃ সংক্রমিত।

অমর দত্ত প্রথম দলের লোক। ব্রিটিশ আমলের বদভ্যাসগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অসমাপ্ত ফাইলগুলোর দিকে তাকালে মন খুঁত খুঁত করে। মনে হয়, না, এ ঠিক হচ্ছে না, কর্তব্যে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। ছুটির পরে চাপরাশীকে ডেকে বলেন, এগুলো বাসায় নিয়ে চল। চাপরাশী এ আমলের ছোকরা, স্কুল ফাইনালের বেড়া পর্যন্ত এগিয়েছিল। মনে মনে বিরক্ত হয়! গম্ভীর মুখে কতকগুলো কার্ড বোর্ড কালির ছোপলাগা ময়লা ঝাড়নে বেঁধে সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এ রেওয়াজ আরো অনেক সাহেবের আছে। কারো কারো বাড়িতে ঐ বাঁধন আর খোলা হয় না! বাণ্ডিলটা যেমন যায়, ঠিক তেমনি ফিরে আসে। অমর দত্ত সে দলে পড়েন না। যে কাজ নিয়ে যান, তার বেশীর ভাগ শেষ করেই ফিরিয়ে আনেন।

সকাল বেলা চা পর্ব শেষ করে দত্ত সাহেব যথারীতি ফাইল নিয়ে বসেছিলেন। স্ত্রী একটা ফর্দ হাতে করে ঢুকলেন এবং ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, সারাদিনই দেখি এক গাদা কাজ নিয়ে বসে আছ। তাহলে আর কণ্ট করে আফিসে যাওয়ার দরকারটা কী?

অমরবাবু মৃদু হেসে বললেন—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আফিসে যাওয়ার দরকার তো প্রায় চুকে এল। আর মাত্র কটা মাস।

—তার মানে? ভ্রূকুটি করলেন প্রভাবতী।

—মানেটা তো এমন কিছু কঠিন নয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী পঞ্চান্ন পেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর আফিসের বদলে মাঠং ব্রজেৎ। শুধু চরে বেড়ানো আর হাওয়া ভক্ষণ।

—ওসব বাজে কথা রেখে দাও। আরো অন্ততঃ পাঁচটি বছর চাকরি না করলে চলবে না।···বলে, ডান হাতের পাঁচ আঙুল তুলে ধরলেন। অমরবাবু ছদ্ম আপসোসের সুরে বললেন, কি ভুলই করেছ! গিন্নী না হয়ে যদি আমার মন্ত্রী হতে? দ্যাখ, এখনো যদি হতে পার। পঞ্চান্নকে আটকাবার আর তো কোনো উপায় দেখি না।

প্রভাবতী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। রঙ্গ রসিকতা পছন্দ করেন না। তেড়ে উঠলেন, কেন, বরেন দাসের বয়সটা কত হল, শুনি? তারপর, জগৎ বোস, হরিপদ দস্তিদার, কানাই হালদার—এরা সব কচি খোকা! সবই তো শুনি 'এস্‌টেনশনের' দল। পঞ্চান্ন কবে ভূত হয়ে গ্যাছে। ওরা আছে কি করে?

—ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা সব সরকারের পিয়ারের লোক।

—তুমিই বা কম পিয়ারের কিসে? ওসব মতলব ছেড়ে দাও। পেন্‌সান-টেন্‌সান হবে না, এখন থেকেই বলে রাখছি।

শেষ 'রায়' দেবার ভঙ্গিতে এ প্রসঙ্গের দাঁড়ি টেনে দিয়ে প্রভাবতী আসন্ন পুজোর কেনাকাটার দীর্ঘ তালিকাটি স্বামীর সামনে রেখে বললেন, কেটে ছেঁটে এই পর্যন্ত নামিয়েছি, আর কমানো গেল না। আজ দুপুর থেকেই না বেরোলে চলবে না। মাঝে মাত্তর পঁচিশটা দিন বাকী। এ বাবদ কিছু টাকা রেখে যেও।

ফর্দের দৈর্ঘ্য এবং টাকার অঙ্কে একবার চোখ বুলিয়েই সে চোখ কপালে তুললেন অমরবাবু! কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস করলেন না।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে পঞ্চান্ন-প্রাপ্তিকে সরকারী চাকরির আইনতঃ অবসান বলে গণ্য করলেও উপর মহলে তার ব্যতিক্রমটাই একরকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং প্রভাবতী যদি বোস, দস্তিদার, দাস, হালদারের মত তার স্বামীটিকেও এক্‌সটেনশন—তাঁর নিজস্ব ভাষায় 'এস্‌টেনশনের'—দলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি ভুল করেছিলেন শুধু এক জায়গায়। তাঁর স্বামী সুদক্ষ কর্মচারী, চিরদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, এটা তিনি জানতেন এবং এরই উপর ভরসা করে বসেছিলেন! বোস, দস্তিদার, দাসেরা যে আরো দু-একটি গুণের অধিকারী, যা তাঁর স্বামী আয়ত্ত করতে পারেননি, এই খবরটা তার জানা ছিল না।

৭ই ফেব্রুয়ারী দেখতে দেখতে এসে গেল। তার আগে দত্ত সাহেব আরো দু' একবার 'শেষের সেই দিন ভয়ঙ্কর' সম্বন্ধে স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করবার কথা ভেবেছিলেন। চেষ্টাও করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত মুখ খুলবার ভরসা পাননি। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও মায়ের মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, আমোদ উৎসব কোনো জায়গাতেই সেই মসীচিহ্নিত দিনটির কালো ছায়ার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যায়নি। সে ছায়া পড়েছিল শুধু এক-জনের মুখে। চাকরির অবসান ভেবে নয়, সেজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, সেই

দুঃসংবাদটি তিনি জানাবেন কেমন করে, জানাবার পরের অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে, এই ভেবেই অমরবাবু ক্রমাগতঃ শুকিয়ে যাচ্ছিলেন।

নটা বেজে গেল, উনি বসে বসে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছেন, উঠবার নাম নেই, প্রভাবতী এসে তাড়া দেবেন, কী হল! ঘড়ি কি বলে দেখেছ? চট করে চান করে এসো, আমার রান্না হয়ে এল। উনি ভয়ে ভয়ে বলবেন, 'না হলেও ক্ষতি নেই, আফিস যেতে হবে না।' 'আজ আবার কিসের ছুটি! কেউ ম'ল-ট'ল নাকি?' উত্তরে কি বলবেন তিনি?—কল্পনা নেত্রে এই দৃশ্যটি দেখতেন আর শিউরে শিউরে উঠতেন।

অধস্তন কর্মীরা সময়োচিত বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করেছিলেন। দত্ত সাহেবের উপরওয়ালা এবং সহকর্মীদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। উদ্যোক্তাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, মিসেস দত্তকে প্রধান অতিথি হিসাবে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। অমরবাবু আপত্তি করলেন। বললেন, 'ওঁর শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে। বাইরে বেরোনো বারণ।' তারপরে আর তারা পীড়াপীড়ি করেননি।

সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে মুর্শিদাবাদী গরদের জোড়, একখানি শাল ও একটি রুপা-বাঁধানো লাঠি উপহার পেয়েছিলেন দত্ত সাহেব। সেইগুলো নিয়ে তিনি সোজা গিয়ে হাজির হলেন কাকার বাড়ি। কাকীমাকে বললেন, আমার এক বন্ধু গিয়েছিল কাশ্মীর! তাকে দিয়ে শালখানা আনালাম। কাকা গায় দেবেন। লাঠিগাছাও ওখানকার, ওক কাঠের উপর রুপোর মুণ্ডি। ঐসঙ্গে গরদের জোড়টাও নিয়ে এলাম, প'রে আহ্নিক করবেন।

কাকা কাকীমা খুশীর চেয়েও বেশী হলেন অবাক। ভাইপোর এই উদারতার পরিচয় আর কোনোদিন পাওনা যায়নি।

কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল অফিসের একটি তরুণী কর্মী। রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন। রজনীগন্ধার গোড়েটাও সে-ই গলায় জড়িয়ে দিয়েছিল। সেটা ট্যাক্সিতেই পড়ে রইল। বাড়ি ফিরে দেখেন, গৃহিণী নেই, পাড়ার সখীদের সঙ্গে দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।

অমর দত্তের বাড়িটি পৈতৃক। সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। গৃহিণীর খরচের হাতটি বরাবরই দরাজ। সুতরাং টাকাকড়ি কিছু জমাতে পারেননি। একমাত্র প্রভিডেণ্ট ফান্ড্; তার অঙ্কটি নেহাত ছোট নয়। তিরিশ বছরের চাকরি! একেবারে শুরু থেকে, আইনতঃ যতটা দেওয়া যায়, সেই সর্বোচ্চ অঙ্কটাই দিয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চক্রবৃদ্ধি সুদ।

৮ই ফেব্রুয়ারী যথানিয়মে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন, রাইটার্স বিল্ডিং-এ নয়, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিসে। জানাশুনা সেখানেও কম নেই। প্রভিডেণ্ট ফান্ডের মঞ্জারি ওখান থেকেই হয়। সেই সেরেস্তায় গিয়ে উঠলেন। পুরনো বন্ধুই বেরিয়ে গেল একজন। তাকে বিশেষ করে বলে এলেন, আসছে মাসের পয়লা তারিখের আগেই টাকাটা যেন পাওয়া যায়। বন্ধু আশ্বাস দিলেন। তাই হবে।

প্রভাবতীকে কিছুই জানতে দিলেন না। রোজ নটা বাজতেই খবরের কাগজ ছেড়ে বিনা তাগিদে উঠে পড়েন অমর দত্ত, স্নানাহার সেরে ধড়াচুড়ো এঁটে দুর্গা দুর্গা বলে আগের মতই চোখে মুখে ব্যস্ততার ভাব নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যান। বাড়িটা ছাড়িয়েই গতিবেগ মন্থর হয়ে আসে। ধীরে সুস্থে গিয়ে ট্রাম ধরেন। দু-চারখানা ট্রাম ছেড়ে দেন। কী দরকার ঠেলাঠেলি করে? নিজের আফিসে কখনো যান না, অন্য ডিপার্টমেণ্টে কোনো বন্ধুর খুপরিতে গিয়ে ওঠেন, কখনো এ. জি. আফিসে গিয়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের তাগিদ দেন। তারপর কার্জন পার্কের কোনো ছায়া-ঢাকা বেঞ্চিতে গিয়ে বসেন। পাঁচটা বাজলে বাড়ির পথ ধরেন।

আফিসের কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল দু-একদিন! কাউকে বলেছেন, কিছু কেনাকাটা ছিল, কাউকে বুঝিয়েছেন, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছি। এতদিন তো ফুরসতই ছিল না।

একদিন এক পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। বললেন, কি হে, রাজবেশ ছাড়নি এখনো?

অমরবাবু উত্তর দিলেন, পয়সা দিয়ে করাতে হয়েছিল। যতদিন না ছেঁড়ে, চলুক না? ধুতি পাঞ্জাবির খরচ খানিকটা বাঁচে।

পয়লা তারিখের আগেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের পাওনাটা পাওয়া গেল। বিল্ ক্যাশ করে টাকাটা ব্যাঙ্কেই রেখে দিলেন। তার থেকে মাসে মাসে যে মাইনে পেতেন, সেই পুরো টাকাটা প্রভাবতীর হাতে নিয়ে তুলে দিলেন।

কোলকাতার শীত আর কতদিন? দেখতে না দেখতেই বসন্তের আবির্ভাব। তাও শুধু পঞ্জিকার পাতায় আর তার স্বনাম-ধারী ব্যাধির মরসুমে। গ্রীষ্মের আমেজ যখন শুরু হল, অমরবাবু ঐ বেঞ্চির উপরেই খানিকটা করে গড়িয়ে নেন। দিবা নিদ্রার অভ্যাস কোনো কালে ছিল না। এবার সেটিও হল। কর্মহীন অলস মধ্যাহ্ন কেমন করে কাটায় মানুষ? খালি মাথায় শুতে কষ্ট হয়। একটি রবারের বালিশ যোগাড় করলেন। ফুলিয়ে শিয়রে দেন; তারপর হাওয়া বের করে পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখেন।

এমনি একদিন, সবে ঘুমটা ভেঙেছে, জড়তা তখনো কাটেনি, চোখের পাতা জড়িয়ে আছে, হঠাৎ কানের কাছে যেন বোমা পড়ল—জামাইবাবু না?

ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছোট শ্যালক সন্তোষ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। অমরবাবু চোখ খুলতেই বলল, একি! এখানে শুয়ে আছেন যে?

চট করে কিছু বলতে হবে, অথচ মাথাটা যেন নিরেট বনে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে বললেন, 'বসো'। সন্তোষের চোখে মুখে গভীর বিস্ময়, তার উপর একটি প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা চিহ্ন। হঠাৎ অমরবাবুর মাথা খুলে গেল। বললেন, তাড়াতাড়ি আফিস ছুটি হয়ে গেল। যা রোদ, বাড়ি না গিয়ে, ভাবলাম ছায়ায় একটু বসি। তারপর কখন শুয়ে পড়েছি।

—আফিস ছুটি হল! কই, আমি তো আপনার আফিস থেকেই আসছি! চাপরাশী বলল, কার্ড লাগবে! দিলাম। ভিতরে ঢুকে দেখি অন্য লোক।

—ও, তুমি বুঝি জানতে না? আমি এখন অন্য ঘরে বসি।

সন্তোষ কেমন সন্দিগ্ধ ভাবে বালিশটার দিকে তাকাতে লাগল। অমরবাবু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে সেটাকে আড়াল করে বসলেন। শ্যালক আর কোন প্রশ্ন করল না। সন্দেহটা আর একটু গাঢ় হল—এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে।

পরদিন আবার গেল অমরবাবুর আফিসে, সেই চাপরাশীকেই জিজ্ঞাসা করল দত্ত সাহেব কোথায় বসেন।

দত্ত সাহেব! তিনি তো কবে রিটায়ার করে গ্যাছেন।

—তুমি ঠিক জান?

চাপরাশী উত্তর না দিয়ে শুধু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল—অর্থাৎ এ খবর আমি জানবো না, জানবেন আপনি!

সন্তোষের চাকরিও লালদীঘি অঞ্চলে। সওদাগরি আফিসে। টিফিনের ছুটির সময় ট্রামে চড়ে কার্জন পার্কের সেই বিশেষ জায়গাটিতে গিয়ে দেখল, সে বেঞ্চিতে একজন হিন্দুস্থানী মজদুর গোছের লোক নাক ডাকাচ্ছে। এপাশে ওপাশে খুঁজল খানিকক্ষণ। না, আজ তিনি নেই। আফিসে না ফিরে সোজা গিয়ে উঠল দিদির বাড়িতে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তার জন্যে খানিকটা অনুযোগ শুনতে হল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, জামাইবাবুকে দেখছি না তো? বেরিয়েছেন বুঝি?

—বেরোবেন আবার কোথায়? আফিস আছে না?

—শুনলাম, রিটায়ার করেছেন?

—কে বললে তোকে? 'রিটার' অমনি করলেই হল?

—করেননি তাহলে? কিন্তু দুপুর বেলা পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে দেখলাম যে?

—পার্কের বেঞ্চিতে! ওমা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? পার্কে উনি কি করতে যাবেন। কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস তার ঠিক নেই।…শোন, (এবার গলা খাটো করলেন প্রভাবতী) উনি তো দু'পা বাড়িয়ে বসেছিলেন। চাকরি ছাড়তে পারলেই যেন বাঁচেন। আমি দিলাম না। বোস, দস্তিদার, দাস, হালদার—সব মিনসেগুলো দিব্যি রয়ে গেল, আর তুমি কী দোষ করলে যে, গরমেণ্ট তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে! একবার দিয়ে দেখুক না। ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেল। আফিস যেমন চলছিল, তেমনি চলছে।

সন্তোষ বুঝল, এখানে আর অগ্রসর হওয়া বৃথা। তার চেয়ে জামাইবাবুকেই খুঁজে বের করতে হবে। তিনিও শ্যালকের জ্বালাতেই জায়গা বদল করেছিলেন। দিন তিনেক খোঁজাখুঁজির পর ইডেন গার্ডেনের ঝোপের আড়ালে সেই একই অবস্থায় পাওয়া গেল। মাথায় সেই রবারের বালিশ। আজ আর লুকোবার চেষ্টা করলেন না। ব্যাপারটা সবিস্তারে খুলে বললেন। সব শুনবার পর সন্তোষ বলল, কিন্তু আপনার এই নতুন অফিস আর কদ্দিন চালাবেন? পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে পিঠে ব্যথা ধরে যাবে যে।

—ধরলে আর কি করব ভাই? ওদিকে যে বুকে ব্যথা!

—মানে ?

—বুঝলে না? টাকাপয়সার ব্যাপারটা আসলে গৌণ। মুখ্য হল,—ঐ বোস, দস্তিদার, দাস, হালদার। ওরা যতক্ষণ না বাড়ি গিয়ে বসছে, আমাকেও এই পার্কে পার্কে আফিস করে বেড়াতে হবে।

সন্তোষ উঠে পড়তেই, অমরবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, দিদির কাছে গিয়ে যেন আবার সব বলে দিও না।

—পাগল হয়েছেন! বিয়ে করেছি, বয়সও হচ্ছে। আমারও তো একদিন এই অবস্থা আসতে পারে।

নারী ও স্কুটার

সকালের ডাকে ঐ একখানা চিঠিই ছিল। টাইপকরা পোস্টকার্ডে ক'টি মাত্র লাইন। একবার চোখ বুলিয়েই প্রণবের প্রাণ-মন দ্রুততালে নেচে উঠল। এতদিনে দয়া হল স্কুটার কোম্পানীর। এ যুগের সবই উল্টো। আগে বিক্রেতা বসে থাকত ক্রেতার অপেক্ষায়, এখন ক্রেতাকে গিয়ে দোকানে দোকানে 'কিউ' দিতে হয়। একখানা স্কুটারের জন্যে তাকেও পুরো ছ'টি মাস লাইনে দাঁড়াতে, অর্থাৎ ভদ্র ভাষায়, ওয়েটিং লিস্টে পচতে হয়েছে। মাঝে মাঝে নিষ্ফল তাগিদ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। তাই বলে দীপালী কথা শোনাতে ছাড়েনি। সুযোগ পেলেই কালো চোখে বাঁকা কটাক্ষ ফুটিয়ে তুলে শ্লেষের সুরে টেনে টেনে বলছে, 'কি হল! আপনার স্কুটারের কদ্দূর? কোম্পানী লাটে উঠল কিনা খবর নিন।'

কথা তো নয়, কতকগুলো কুইনাইনের বড়ি। প্রণবকে সবটাই নিঃশব্দে হজম করতে হয়েছে। তাছাড়া আর উপায় কি! একপক্ষের উদ্গিরণ, অপর পক্ষের গলাধঃকরণ—এ না হলে সংসারের ভারসাম্য বজায় থাকে না। তাই দীপালীরা বলবে, আর প্রণবরা শুনবে, নারী-পুরুষের এই ডিভিসন্ অব্ লেবার বিধাতা-পুরুষই স্থির করে দিয়েছেন।

স্কুটার জিনিসটার উপর প্রণবের নিজের যে খুব ঝোঁক, তা নয়। উঠতি বয়সে এই সোচ্চার, প্রচণ্ডগতি একবাহী যানটির দেখা পাওয়া গেলে, হয়তো খানিকটা অশ্বারোহণের শখ মেটাবার ইচ্ছা হত। কিন্তু তখন এর আমদানি হয়নি। আজ চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছে রক্তের স্রোতে ভাঁটার টান শুরু হবার পর, অহেতুক গতি আর অনর্থক গর্জন মনকে তেমন টানে না। দীপালীর এখন সেই বয়স। আঠারোটি বসন্তপুষ্ট দেহের কিনারায় ভরা জোয়ারের ঢেউ উছলে পড়ছে! ঝড়ের বেগে ছুটে চলবার নেশা যদি তার উষ্ণ রক্তে দোলা দেয়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দীপালীকে যদি কলকাতায় থাকতে হত, রাস্তায় বেরিয়ে উদয়াস্ত পেতে হত তার বেগ-ব্যাধিগ্রস্ত জীবন-যাত্রার তিক্ত আস্বাদ, সে নেশা হয়তো বেশিদিন টিঁকত না। কিন্তু সে গ্রামের মেয়ে; এমন গ্রাম, যেখান থেকে শহরের শুধু ডাক শোনা যায়, হাতছানি চোখে পড়ে। দুটোই বড় লোভনীয়।

ডায়মণ্ডহারবার রোড ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে যেখানে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, তার খানিকটা দূরে, পীচ-ঢালা থেকে পশ্চিমে নেমে গিয়ে একটা কাঁচাপাকা রাস্তা এঁকে-বেঁকে গ্রামের মধ্যে চলে গেছে। তারই ধারে একখানা পুকুর-বাগান-ওয়ালা একতলা পুরনো বাড়ি। বুড়ো বাপ সৎমা এবং তার গুটিতিনেক অপোগণ্ড ছেলে-মেয়ে এই নিয়ে দীপালীদের সংসার। কিছু ধান-জমি আছে, তাতে সারা বছর চলে না। বাকী পূরণের জন্যে শ্যামলাল চাটুজ্যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষচর্চা করে থাকেন। সেই সূত্রেই তাঁর বৈঠকখানায় প্রণব গাঙ্গুলীর আবির্ভাব। কনট্রাক্টরি ব্যবসায় কিছুদিন থেকে বড় মন্দা যাচ্ছিল। ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু ধরবে কিনা স্থির করবার আগে একজন ভালো জ্যোতিষীকে হাতটা একবার দেখানো দরকার। এক বন্ধুর মুখে চাটুজ্যেমশায়ের সুখ্যাতি শুনে খুঁজে পেতে এখানে এসে উঠেছিল। জ্যোতিষী ভরসা দিয়েছিলেন, যে-ক'টি গ্রহ এতদিন ধরে তার রাশিচক্রের মোক্ষম স্থানে বসে ক্রমাগত শত্রুতাচরণ করে চলেছিল, তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে ; এবার যাঁরা আসছেন, তাঁরা তার প্রতি অনুকূল ; সুদিন আগত প্রায় ; ঐ ব্যবসায়েই আশু সাফল্যের শুভ যোগ দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং প্রণব লেগে পড়ে রইল। কিছুদিন পরে এই ডায়মণ্ডহারবার রোডেই একটা মনোমত কাজ জুটে গেল। রাস্তাটা আগাগোড়া আরো তিন ফুট চওড়া করা হচ্ছিল, তারই খানিকটা পড়ল ওর ভাগে।

হাত দেখাবার সময় জ্যোতিষী ঠাকুরকে বিশেষ কিছুই দিতে পারেনি। এবার প্রথম বিলের টাকা পেয়ে যে প্রণামী দিয়ে গেল, শ্যামলাল চাটুজ্যে তাঁর জ্যোতিষী-জীবনে তেমন অঙ্ক কোনো মক্কেলের কাছ থেকে পাননি। সেই দিন থেকে এই মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন অনুগত ভক্তটি সরাসরি পুত্র-স্থানীয় সুহৃদের কোঠায় প্রমোশন পেয়ে গেল।

এর কিছুদিন আগের ঘটনা। নতুন কনট্রাক্টের কাজটা পাকা করবার ব্যাপার প্রণবকে এদিকে আসতে হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে জ্যোতিষীর সঙ্গেও একবার দেখা করে গেল। চাটুজ্যেমশায়ের বৈঠকখানায় শীতলপাটি বিছানো জোড়া তক্তপোশ। একপাশে দেয়ালের গা ঘেঁষে কাঁচ-ভাঙা আলমারির মধ্যে পুরনো পঞ্জিকার স্তূপ। দিবা-নিদ্রা সেরে তার সামনে বসে তিনি হুঁকো টানছিলেন। প্রণবকে সাদর অভ্যর্থনা করে হাতপাখাটা এগিয়ে দিলেন। চৈত্র মাস। অনেকটা পথ খোলা মাঠে বাস ছুটিয়ে এসে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে কুণ্ঠার সুরে বলল, 'একটু জল খাবো।'

'জল খাবে?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্যামলাল এবং বামী না বাদলী বলে বার দুই হাঁক দিলেন। কেউ সাড়া দিল না। মিনিট দুয়েক পরে ঘরের ঠিক ওপাশে দরজার আড়াল থেকে একটি মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, 'ওরা তো কেউ নেই বাবা।'

—কে, দীপু? এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো মা।

—আপনি খাবেন?

—আমি না ; প্রণব খাবে।

অপরিচিত নারী-কণ্ঠ শুনে মোহিত হবার বয়স প্রণব অনেক আগেই পার করে এসেছে। সে-বয়স যাদের কাটেনি, আজকের দিনে তারাও, আর যাই হোক, মোহিত হয় না। অন্তঃপুরের অন্তরাল যেদিন থেকে ঘুচে গেছে, যেদিন থেকে নারী আর দুর্লভ-দর্শনা নয়, সর্বত্র-সঞ্চারিণী, সেদিন থেকে, তাকে ঘিরে পুরুষের মনে যে মোহজাল রচিত হত, তার গায়ে বড় বড় ফাঁক দেখা দিয়েছে। একদিন হয়তো আসবে, যেদিন তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সে যাই হোক, শহর থেকে দূরে, স্তব্ধ দুপুরের ছায়া ঢাকা পল্লীপথের ধারে, এই শেওলা-ধরা ভাঙা বাড়ির কোন্ অজানা আড়াল থেকে হঠাৎ-ভেসে-আসা মিষ্টি গলার ক'টি কথা প্রণবের রৌদ্র-ক্লান্ত মনে কেমন একটা আবেশ ছড়িয়ে দিল। শুধু মিষ্টি নয়, তার সঙ্গে এমন একটি মৃদু ঝঙ্কার, যা ক্বচিত শোনা যায়। মনে পড়ল, অনেক দিন আগে, কলেজে পড়বার সময় গরমের ছুটিতে দেশে গিয়ে এমনি দুপুরবেলা যখন তাদের আমবাগানে ঘুরে বেড়াত, ডাল-পালার অন্তরালে একটা কি নাম-না-জানা পাখীর ডাক তার বড় ভাল লাগত। তার সঙ্গে আজকের ঐ সুরটুকুর কোথায় যেন মিল আছে।

স্বপ্ন কেটে গেল। একহাতে জলভরা ভারী কাঁসার গেলাস, আরেক হাতে ঝকঝকে খাগড়াই রেকাবীতে কয়েকখানা বাতাসা নিয়ে একটি মেয়ে নতমুখে এসে দাঁড়াল এবং চকিতে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল তারপর। রেকাবী আর গেলাসটা রেখে দিল তক্তপোষের উপর। একবার আড়চোখে তাকিয়ে প্রণবের মনে হল, শুধু স্বর নয়, যার স্বর, সে তার চেয়ে আরো মিষ্টি। রূপসী বলতে যা বোঝায়, এ ঠিক তা নয়। তবু একটা বিশেষ বয়সে বিনা যত্নে, সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়ে ওঠার একটি নিজস্ব শ্রী আছে, এর কোন অঙ্গ যার অভাব নেই। ঐ একরাশ খোলা চুল, কালো চঞ্চল চোখের তারায় চকিত দৃষ্টি, প্রসাধনহীন ঈষদ্‌দীর্ঘ কপোল, এবং শ্যামচিক্কণ দেহখানা ঘিরে যে চাপা এবং স্নিগ্ধ লাবণ্য আপনা থেকে ফুটে রয়েছে, বড়-শহরের-পথে-ঘাটে-বহুনারী-দর্শন-ক্লান্ত পুরুষের চোখকে সহজেই টেনে নেয়। ইঁট-কাঠ-ঘেরা নাগরিক জীবনের ধূলি-ধোয়া ক্লেদ এবং ঘর্মাক্ত জনতার কুৎসিত কলরব থেকে বেরিয়ে কোন শান্ত গ্রামোপান্তে একটি স্বচ্ছনীয় পুকুরের পারে গিয়ে বসলে মনে যে মধুর প্রশান্তি জাগে, তেমনি একটা অনুভূতি প্রণবকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। চমক ভাঙল জ্যোতিষীর কথায়—'আমার মেয়ে দীপালী। প্রণাম কর।' শেষের অংশ মেয়ের উদ্দেশ্যে।

প্রণব শশব্যস্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'না-না, প্রণাম করবেন কী!'

—করবে বৈ কি? বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাছাড়া, তুমি তো আমাদের পর নও। একান্ত আপন জনের মত।

দীপালী এগিয়ে এসে নত হয়ে ওর আড়ষ্ট পা-দুখানায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে হাতখানা মাথায় ছোঁয়াল।

আত্মীয়-অনাত্মীয় কত নারী কত ভাবে তাকে স্পর্শ করেছে। মনের কোণে সাড়া জাগেনি তা নয়। নানা ধরনের সাড়া। সমস্ত চেতনার মধ্যে এমনি একটা তড়িৎ-শিহরণ বোধহয় এই প্রথম।

রাস্তার কাজ শুরু হবার পর, কখনো সেই উপলক্ষ্যে, কখনো বিনা উপলক্ষ্যে প্রণব প্রায়ই এসে বসত শ্যামলাল চাটুজ্যের এই শীতলপাটি বিছানো তক্তপোষের উপর। চোখ দুটো আর একজনকে খুঁজত। সব দিন যে পেত, তা নয়। মাঝে মাঝে পেয়ে যেত। শুধু দর্শন নয়, তার সঙ্গে একটি প্রসন্ন হাসির অভ্যর্থনা। প্রণবের মনে হত, তার চেয়ে আরো কিছু বেশী। দুচোখ ভরা কেমন একটা বিশেষ আহ্বান—যাকে প্রতিরোধ করা কঠিন। সে-চোখ অনেক দূর তার পিছনে পিছনে যেত, এবং দুদিন না যেতেই আবার সবলে টেনে আনত এই খোয়া-ওঠা গ্রামের পথে।

দীপালীদের বাড়ি থেকে ঐ রাস্তা বেয়ে খানিক দূর এলে একটা উঁচু ঢিবি। তার উপরে মস্ত বড় বাদামগাছ। বিকালের দিকে পুকুরে গা ধুয়ে তাঁতে-বোনা ডুরে শাড়ি আর একটি ছোট্ট সিঁদুরটিপ পরে মাঝে মাঝে সে ওর তলায় এসে দাঁড়াত।

সেখান থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোডের খানিকটা দেখা যায়। সেই দিকে তাকিয়ে গাড়ি-চলাচল দেখত। একদিন প্রণব যখন নীচের পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। আশে-পাশে আর কেউ ছিল না। প্রণব উঠে গেল ঢিবির উপর। কাছে যেতেই দীপালী হাসি মুখে বলল, 'বাবার কাছে যাচ্ছিলেন বুঝি?' বলেই সেই অদ্ভুত চোখদুটো তুলে ধরল ওর মুখের উপর। প্রণবের বুকের রক্তে দোলা লাগল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কেন, আর কারো কাছে আসতে নেই?'

—আর কে?

—জানো না কে?

—বাঃ, আমি কেমন করে জানবো?—কণ্ঠে সেই মাদকতাময় ঝঙ্কার।

—যদি বলি, তুমি?

—আমি! দীপালীর চোখের তারা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। প্রণব বলল, 'হ্যাঁ তুমি।' বলেই হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরল। দীপালী ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে রাস্তার দিকে তাকাল। কে একজন আসছিল সামনে থেকে। হাত ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা সরে গিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ওটা কী গাড়ি বলুন তো?'

প্রণবও সহজ হবার চেষ্টা করল, 'কোনটা?'

—ঐ যে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। কী জোরে যায়!

—ও, ওটাকে বলে স্কুটার।

—আমার ভারী ভাল লাগে।

—তাই নাকি?

'হ্যাঁ,' এবার স্বর নামল। লোকটাও তখন দূরে চলে গেছে। 'চড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।' একমুহূর্ত থেমে প্রণবের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ওতে দুজনেও চড়া যায়। সেদিন দেখলাম এক ভদ্দরলোক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনে একটা মেয়ে। মেয়েটা না—?'

প্রণব লোলুপ দৃষ্টি মেলে ওর মুখের পানেই তাকিয়েছিল! আবার হঠাৎ

থেমে যেতেই লক্ষ্য করল, চোখে গণ্ডে চিবুকে একটা সলজ্জ চাপা হাসির রক্তি-মাভা ফেটে পড়ছে। বলল, 'কী করছিল মেয়েটা ?'

—কিছু না।

—আমি বলবো, কী করছিল ?

—বলুন তো ?

—দু-হাত দিয়ে ভদ্দরলোককে একেবারে বুকের সঙ্গে—

—যান, আপনি ভারী অসভ্য।

প্রণব হো হো করে হেসে উঠল।

এর পরে আবাব যেদিন এল, দীপালী তখন ঢিবির উপর থেকে নেমে আসছে। বলল, 'এই বুঝি আপনার সাড়ে পাঁচটা ?' অভিমানেব সুরটা চাপা রইল না।

—কি করবো, কনডাক্টরটা এমন বেরসিক, বুঝতেই চাইল না, আমি এক-জনকে কথা দিয়ে এসেছি। আমার অবস্থায় তো পড়োনি কোনোদিন। একে শিখ, তায় একধামা দাড়ি।

দাড়ির পরিমাণটা এমন ভাবে দেখাল, দীপালী হেসে গড়িয়ে গেল। তারপর বলল, 'আসেন কেন বাস-এ ?'

—তাছাড়া আব উপায় কি ? ট্যাক্সি এতদূরে আসতে চায় না।

—একটা স্কুটার কিনতে পারেন না ? আপনারই সুবিধে। অন্দূর থেকে কাজ দেখতে আসতে হয়। সময় বাঁচে, কষ্টও কমে।···বলে, মুচকি হাসল। প্রণবের মনে হল, হাসিটা ইঙ্গিতময়। বলল, 'দেখি !'

দীপালী ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছিল। বাড়িব দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

—কোথায় ?

—কোথায় মানে ! এখান থেকেই ফিরতে চান নাকি ?

—চল না, আর একবার পাহাড়ে চড়া যাক।

—না, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখানকার লোকগুলো বড় কুচুটে। তাছাড়া—

—কী ?

—রান্না করতে হবে।

—কেন, তোমার মা ?

—বাপের বাড়ি গেছেন। তাঁর ভাইপোর বিয়ে।

—তোমার ভাই-বোনেরাও গেছে তাহলে ?

—স-ব। বাড়ি একেবারে খালি।

আড়চোখে তাকিয়ে আর একবার হাসল মুখ টিপে। এ হাসিটিও বাঙময়।

বাড়ির সামনে মাদার-কচার বেড়া। একটা ছোট গেটও আছে। সেটা পার হয়ে ভিতরে পড়তেই দেখল, চাটুজ্যেমশাই বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণবকে দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'তুমি একটু বসো, বাবা। আমার সামান্য একটু কাজ আছে। সেরে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই

আসছি।···দীপু, ওকে ভেতরে নিয়ে বসাও, চা-টা দিও। লজ্জা করো না যেন।'

প্রণবকে বৈঠকখানায় তক্তপোষে বসিয়ে দীপালী ভিতরে চলে গেল। কাপড়টা বদলে মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে বলল, 'আসুন।'

—ভিতরে যেতে হবে ?

—বাঃ, এই বাইরের ঘরে একা একা বসে থাকবেন নাকি ? আমি রান্না করবো, আর আপনি আমাকে গল্প শোনাবেন।

বারান্দায় একটা মোড়া ছিল। আঁচলের কোণে বেশ করে মুছে দিয়ে বলল, 'বসুন। চায়ের সঙ্গে কি খাবেন বলুন তো ?'

—কি দেবে আগে শুনি ?

—আপনাকে দেবার মত সত্যিই কিছু নেই। তবু—

—কে বললে নেই ! বলে একলাফে উঠে দাঁড়াল প্রণব। দুহাতে ওর কাঁধ দুটো চেপে ধরে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত দেহখানা যেন লেহন করল এবং পরক্ষণেই সবলে টেনে নিল বুকের উপর।

দীপালী বাধা দিল না। সাঁড়াশি-বন্ধন যখন আপনা থেকেই কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে এল, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'বাবা এসে পড়বেন।'

পরদিনই স্কুটার-প্রার্থীদের অপেক্ষমান তালিকায় আর-একটা নাম যুক্ত হল—প্রণব গাঙ্গুলী। সে অপেক্ষা যে অন্তহীন, দীপালীর জানবার কথা নয়। প্রণবই কি জানত ? জানলে কথাটা আগে-ভাগে ভাঙত না, এবং তার ফলে ঐ বাঁকা বাঁকা কথাগুলোও শুনতে হত না। দীপালীর দোষ কি, সে নিজেও রীতিমত অধীর হয়ে উঠেছিল। সে একটি দিন ছাড়া দীপালীকে অতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আর কখনো পায়নি। দু'দিন পরেই তার সৎমাটি সদলবলে ফিরে এসেছিলেন। ইদানীং মেয়েকে তার সঙ্গে বেরোতে দিতে চাটুজ্যেমশায়ের আপত্তি ছিল না। তাঁর স্ত্রীও, ভিতরে ভিতরে যে মনোভাবই পোষণ করুন, বাইরে কোন আপত্তি করেননি। দু'-তিন দিন ওরা বেরিয়েছিল। বাস্‌এ করে কলকাতায় গিয়ে ট্যাক্সি করে ঘুরেছিল কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু সে শুধু ঘোরা।

প্রণব এবং তার মত আরো অনেকের মতে ট্যাক্সির একটা নিজস্ব নির্জনতা আছে, যা অন্য কোনো যানবাহনের নেই। সামনের আসনে বসে যে চালায়, সে কোন 'জন' নয়, ড্রাইভার মাত্র, গাড়ি-নামক যন্ত্রের একটা অংশ। পেছনের আরোহীদের কাছে তার অস্তিত্বটা শুধু 'মায়া'। অনায়াসে অস্বীকার করা চলে। দীপালী গ্রামের মেয়ে, বেশী লেখাপড়া জানে না। তাই বোধহয় এই দার্শনিক মনোভাব আয়ত্ত করতে পারেনি। পাশের ব্যক্তিটি একটু অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করলেই সামনের দিকে তর্জনী তুলে ধরেছে। প্রণব তর্ক তুলেছে৷ 'কি মুশকিল, ও তো আমাদের চেনে না !'

—নাই বা চিনল। বলে, মাথা নেড়ে একেবারে কোণের দিকে সরে গেছে দীপালী।

এ সান্নিধ্যে সুখ কোথায় ? কী লাভ হল ঘুরে বেরিয়ে ? যাকে একান্ত

করে চাই, তাকে নিবিড় একান্তে না পেলে কার মন ভরে ?

স্কুটার এসে সব সমস্যার সমাধান করে দিল। এতদিন যা ছিল দীর্ঘপোষিত আকাঙ্ক্ষা, আজ প্রাপ্তির মধ্যে তার অবাধ মুক্তি।

প্রণব স্কুটার চালায় আর তৃষিত নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঠিক তার বুকের নীচে দুখানি সুডোল হাতের বেষ্টনী, আঙুলে আঙুলে জড়ানো। পিছনে একটি যৌবনপুষ্ট নারীদেহের প্রগাঢ় কোমল স্পর্শ। গাড়ির বেগ যত বাড়ে—ইচ্ছা করেই বাড়ায় মাঝে মাঝে—একটা অস্ফুট উল্লাসময় মৃদু চিৎকার করে সেই দেহখানা যেন পিষে যেতে চায় তার পিঠের সঙ্গে। একখানি পেলব চিবুক নেমে এসে চেপে বসে কাঁধের উপর, গণ্ডে গণ্ডে মিশে যায়, উষ্ণ নিঃশ্বাসের মাতাল হাওয়া বুকের মধ্যে ঝড় তোলে। সেই উঁচু স্পীড কখনো আবার হঠাৎ নামিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ খোলাচুল উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকে-মুখে-বুকে কাঁধে-বাহুমূলে। তখনই সজোরে চেপে ধরে অ্যাকসিলারেটর। গতির নেশায় নেচে ওঠে রক্তধারা।

তারপর একসময়ে, মাঠের বুকে যখন সন্ধ্যা নামে, দুজনে নেমে পড়ে। রাস্তা থেকে পায়ে চলার পথ ধরে নির্জন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, যেখানে 'সমাজ সংসার মিছে সব।'

প্রথম পরিচয় থেকে প্রায় বছর ঘুরে যাবার পর চাটুজ্যেমশাই একদিন প্রণবকে ডেকে বসিয়ে বললেন, 'তোমার পিতৃদেব তো অনেকদিন হল স্বর্গে গেছেন, বলেছিলে। তাঁর জায়গায় বর্তমানে যিনি তোমার অভিভাবক, তাঁর নাম-ঠিকানাটা একবার—'

প্রণব চমকে উঠল, 'কেন ?'

—বুঝতেই তো পারছ বাবা। পল্লীগ্রামে থাকি—বড় খারাপ সমাজ আমাদের। নানাজনে নানা কথা বলতে শুরু করেছে।

প্রণব মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। শ্যামলাল বললেন, 'এদিকে দীপুও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। আর দেরি করতে চাই না। আগামী মাসের প্রথম দিকেই বেশ ভাল দিন আছে।'

প্রণব মাথা তুলে বলল, 'অভিভাবক বলতে আমার কেউ নেই। সংসারে আমি একা।'

—বেশ, তাহলে দিনক্ষণ এখনই স্থির করে ফেলা যাক। তোমাদের দুজনের হাতই আমি ভালো করে দেখেছি। এরকম মিল দেখা যায় না। আর শুভ-মিলনের পক্ষে এই মাঘই প্রশস্ত কাল।

প্রণব আরো কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'আপনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে। আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে।'

—কি, বল ?

—বিয়েটা রেজেস্ট্রি করে হোক, এই আমার ইচ্ছা।

জ্যোতিষী আকাশ থেকে পড়লেন, 'কেন ?'

—আনুষ্ঠানিক বিয়ের ঝঞ্ঝাট অনেক। সে-সব পোহাবার মত আমার তরফে কেউ নেই।

—তোমার আর ঝঞ্ঝাট কী? বিয়ে হবে আমার বাড়িতে। কুশণ্ডিকার ব্যাপারটাও এখানে সেরে দেওয়া যাবে। বাকী রইল বৌভাত। সেটা করা না করা তোমার ইচ্ছা। না করলেও ক্ষতি নেই।

—তাহলেও, এসব উপলক্ষ্যে সামান্য যেটুকু করা দরকার, তাও ওখানে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে রেজিস্ট্রেশনই ভাল। ওতে আর আপত্তি কি? আকছার হচ্ছে আজকাল।

—তা হচ্ছে, তবে আমাদের পাড়াগাঁয়ে লোকে ওটাকে তেমন মর্যাদা দেয় না। আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি।

ভেবে দেখবার আগেই গৃহিণীর সঙ্গে দেখা। দরজার আড়াল থেকে তিনি সব কথাই শুনতে পেয়েছিলেন। চাটুজ্যেমশাই ভিতরে ঢুকতেই চেপে ধরলেন, 'বেশ তো বলছিল প্রণব। তুমি আবার বাগড়া দিতে গেলে কেন?'

—ভাবছি, লোকে কি বলবে, দীপুই বা কি ভাববে?

—লোকে কিচ্ছু বলবে না, তোমার মেয়েও কিচ্ছু ভাববে না। সে তো পা বাড়িয়ে বসে আছে। কিছুই দেখতে পাও না?

দীপালীর উপর তার এই বিমাতাটি কোনোদিনই প্রসন্ন নন। ইদানীং ওদের এই বেহায়া-পানা এবং সেদিকে স্বামীর প্রশ্রয় রীতিমত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কোনোরকমে এ আপদ বিদায় হলেই তাঁর স্বস্তি। সেটা যে এত সহজে, অর্থাৎ, সংসারের উপর বিশেষ কোনো চাপ না দিয়ে, উনকোটি আয়োজন না করেই মিটে যেতে পারে, তিনি ভাবতেই পারেননি। তাই প্রণবের প্রস্তাবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। সে বিষয়ে স্বামীকে দ্বিধা করতে দেখে জ্বলে উঠলেন। তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'বলি, বিয়ের ওদের বাকী আছে কী যে, তুমি শাস্তর-শাস্তর করছ? বিয়ের আফিসে গিয়ে মেটাতে চাইছে, তাতে দোষটাই বা কি? এই তো সেদিন ও-পাড়ার বিষ্টু বোসের মেয়ে একটা কোন ছোঁড়ার হাত ধরে আফিস থেকে বিয়ে করে এল।'

—কিন্তু বিষ্টু সে বিয়ে মেনে নেয়নি।

—আহা, আজ না নিয়ে থাকে, কাল নেবে।

শ্যামলাল চাটুজ্যেকে চাপে পড়ে 'আজ'ই মেনে নিতে হল, যদিও মন সায় দিল না।

রেজিস্ট্রেশন-আফিস থেকে সোজা শ্যামবাজারে প্রণবের বাসায় গিয়ে উঠবে, দীপালী মনে মনে এই আশাই করে রেখেছিল। বাপের বাড়ি এবং তার চার-পাশের বিরুদ্ধ পরিবেশে নানা রকম বিরূপ সমালোচনার মুখে এসে পড়তে চায়নি। কিন্তু স্কুটার যখন উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণের পথ ধরে শেষ পর্যন্ত সেই ডায়মন্ডহারবার রোডে মোড় নিল, বিস্মিত না হয়ে পারল না। প্রণব সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'দুটো দিন তোমাকে ওইখানেই থাকতে হবে দীপুরাণী।

নতুন ফ্ল্যাটটা পরশুর আগে পাচ্ছি না।'

—নতুন ফ্ল্যাট কেন ? পুরনো বাসা কি হল ?

—সেখানে আমার এক আত্মীয়া আছেন। মাথাটা একটু খারাপ। তাঁর সঙ্গে তুমি থাকতে পারবে না।

—আত্মীয়া ! কই, তাঁর কথা তো শুনিনি কখনো।

—দরকার হয়নি, তাই বলিনি।

—তিনি কোথায় থাকতেন ?

—আপাততঃ ওখানেই। তারপর ওকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলেই ও বাসাটা ছেড়ে দেবো। তাছাড়া ঘরগুলোও ভাল নয়। তোমার কষ্ট হবে।

সেই রাত্রে প্রণব যখন বাসায় ফিরল, তার কিছুক্ষণ আগেই কাছাকাছি কাদের ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে। ঝিকে ছেড়ে দিয়ে সারদা একা জেগে বসেছিল। রাস্তায় স্কুটারের শব্দ পেয়ে দরজা খুলে বলল, 'এত দেরি যে ?'

প্রণব গম্ভীর ভাবে বলল, 'কাজ ছিল।' বলে, শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—জামা-কাপড় ছেড়ে খাবে এসো।

—আমি খেয়ে এসেছি। তুমি খেয়ে নিয়ে এ-ঘরে একটু এসো। দরকারী কথা আছে।

—কী কথা ! সারদার সুরে বিস্ময় চাপা রইল না।

—খেয়ে নাও, তারপরে বলছি।

—আমার আজ খিদে নেই। ওবেলা যা খেয়েছি, তাই হজম হয়নি। তুমি বল।

প্রণব মিনিট দুয়েক জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি বিয়ে করেছি।'

—মানে ! চমকে উঠল সারদা !

—ভয় নেই, তাকে এখানে আনবো না। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আমি আফিস ফেরত রোজ এসে দেখা করে যাবো।

—ঠাট্টা করছ না তো ?

—কথাটা কি ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে ? সিগারেট ধরাতে ধরাতে তেমনি গম্ভীর সুরেই বলল প্রণব। সারদার সুর থেকে মনে হল, যে রকমই শোনাক, ব্যাপারটা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। বলল, 'আজকাল তো শুনেছি, আইন হয়ে গেছে, এক বৌ বেঁচে থাকতে আর-একটা বিয়ে করা যায় না। করতে হলে আগেরটাকে মোছলমানদের মত তালাক দিতে হয়। তুমি তাহলে আমাকে তালাক দিচ্ছ ? কী অপরাধ, শুনি ?'

—বললাম তো তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে।

—ও, তা, বিয়েটা হল কোথায় ?

—কোর্টে রেজেস্ট্রি করে।

আর একটু সরে এল সারদা। এবার আর হালকা সুর নয়, শুষ্ককণ্ঠে বলল,

'সত্যি বলছ ?'

প্রণব কোন উত্তর না দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

—তার আগে আমাকে একবার জানালে না কেন ?…(প্রণব নিরুত্তর) আমি বাধা দিতাম, এই ভয়ে ?

—তোমার বাধা টিকত না। এখন দিতে চাইলেও টিকবে না।

—কেন ?

—তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছে, তার প্রমাণ কোথায় ?

—কি বললে ! যেন আর্তনাদ করে উঠল সারদা।

—চেঁচিও না। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ। হিন্দুমতে বিয়ের কোনো দলিল থাকে না। অস্বীকার করলে প্রমাণ করা শক্ত।

সারদা বসে ছিল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গভীর উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে গেল—'প্রমাণ ! কুলদেবতা শালগ্রামের পায়ের তলায় বসে আমার বাবা যে এই হাতদুটো তোমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, অগ্নি-সাক্ষী করে বেদ-মন্ত্র পড়ে তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে, তার কোনো দাম নেই ?'

বলতে বলতে চোখদুটো জলে ভরে উঠল। প্রণব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, 'না, নেই। ওর কোনোটাই প্রমাণ নয়। নোয়াখালি জেলার সনাতনদি গ্রামের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির সেই শালগ্রাম শিলাটিকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পেলেও কোর্টে এসে তিনি সাক্ষী দেবেন না। অগ্নি সম্বন্ধেও সেই কথা। তাছাড়া আর আর যাঁরা সেখানে ছিলেন, তোমার আমার বাবা-কাকা আত্মীয়-প্রতিবেশীর দল; তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই। দু-একজন থাকলেও কোথায় আছেন, কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করে।'

—আর আমি যে এই পনেরো বছর তোমার ঘর করলাম ! কে না জানে আমরা স্বামী-স্ত্রী ? কে-না জানে—বলতে বলতে ভেঙে পড়ল সারদা।

প্রণব নিঃশব্দে বসে সিগারেট টানতে লাগল। সম্ভবতঃ স্ত্রীকে কিছুটা ধাতস্থ হবার সময় দিল। তারপর বলল, 'এতদিন যারা জেনে এসেছে আমরা স্বামী-স্ত্রী, তারা এবার অন্য কথা জানবে।'

—'অন্য কথা মানে ?' যেন কোনো আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আঘাতে মাথা তুলে বলল সারদা।

—মানে, স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করলেও, আমরা আসলে তা নই। আমাদের বিয়ে হয়নি।

—এত বড় পাপ—এত বড় নির্লজ্জ মিথ্যা মুখে আনতে এতটুকু বাধল না ! জিভটা খসে পড়ল না !

প্রণব মৃদু হেসে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। সারদা বাইরে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত করবার চেষ্টা করে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ দুর্মতি তোমার কেন হল বলতে পার ? আমরা যা করবার তা তো করলেই, আর-একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে গেলে কিসের লোভে ? রূপ ?'

—না, রূপের ওপর আমার কোনো লোভ নেই। ওটা তো তোমারও ছিল, এখনো একেবারে যায় নি। মেয়েমানুষের মধ্যে আমি আর একটা জিনিস খুঁজি, যা তোমার নেই, ওর প্রচুর আছে। কী সেটা, জানতে চাও?

সারদার কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর এল না। গভীর ঘৃণায় তার ওষ্ঠ দুখানা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র জ্বলন্ত শব্দ—'জানোয়ার!'

প্রণব রাগল না, হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বেশ তরল স্বরে বলল, 'গালাগালি হলেও কথাটা কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য। সব মানুষের মধ্যেই একটা করে জানোয়ার থাকে। আমারও আছে। সে তার খোরাক চায়। তুমি তা কোনদিনই পুরোপুরি দিতে পার নি, আজ একেবারেই পারছ না। তোমার শরীরে সে তাগদ নেই। বয়স চলে গেছে, স্বাস্থ্য—'

সারদা আর শুনতে পারল না। দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনেক রাত পর্যন্ত প্রণবের চোখে ঘুম এল না। যা করেছে, তার জন্যে কোনো দুঃখ বা অনুশোচনায় নয়, ভাবতে লাগল, সারদা যদি সত্যিই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে, চেঁচামেচি করে লোক জড় করে, তখন তার করণীয় কী। ভরসার কথা, তাবা যেখানে বাস করে, তার নাম কলকাতা। এখানে প্রতিবেশীর ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘামাতে হলেও, বাড়ি বসে ঘামায়। বেকার ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে একটু-আধটু সাময়িক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। দৃঢ় মনোভাব দেখালে, ইংরেজিতে যাকে বলে ফার্ম স্ট্যাণ্ড, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পাশের ছোট ঘরটা ঠিক শোবার ঘর নয়। বাক্স, তোরঙ্গ এবং সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটির একপাশে মাদুর বিছিয়ে সারদা সেখানে দুপুরবেলা বিশ্রাম করে। কিছুদিন থেকে রাত্রেও শোয়। দু' ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটা খোলা থাকে। আজ সেখানে কপাট পড়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। তখন অনেক রাত। প্রণবের কৌতূহল হল এতক্ষণ তো আলো ছিল না। উঠে গিয়ে একটা কপাট সন্তর্পণে চেপে ধরে ভিতরে তাকাতেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। খোলা তোরঙ্গের সামনে বসে একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি দু'হাত দিয়ে ধরে তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সারদা। প্রণব জানে, ওটা ওদের বিয়ের ছবি। ঐ তোরঙ্গের তলায় কাপড়-চোপড়ের ভাঁজের মধ্যে সযত্নে রাখা আছে এই পনেরো বছর। মাঝে মাঝে বের করে দেখে, তাকেও দেখিয়েছে কয়েকবার। বিয়ের পরে তোলা যুগল ছবি নয়, (সে-রকম একটা তার শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে) তার চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক। বিবাহ-সভার ফটো। টোপর মাথায় যুবক প্রণব, তার পাশে চেলি, অলঙ্কারে সজ্জিতা যুবতী সারদা। বাঁ হাতখানা বরের হাঁটুর উপর রেখে কন্যা-সম্প্রদান করছেন তার শ্বশুর, আর ওদিকে বসে মন্ত্র পড়াচ্ছেন পুরোহিত। সহসা যেন কোন দূর স্মৃতিভারে প্রণবের চোখদুটো স্তিমিত হয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঐ একটি মাত্র অস্ত্র দিয়েই সারদা

তাকে শেষ করে দিতে পারে। হয়তো সেই মতলবই আঁটছে বসে বসে। ঐ জ্বলন্ত প্রমাণটাকে হাতে না করে উপায় নেই। কিন্তু কেমন করে?···

সারারাত জাগরণের পর ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে প্রণবের প্রথমেই চোখ পড়ল, পাশের ঘরের দরজা খোলা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সদরে। আশ্বস্ত হল, ভিতর থেকে খিল বন্ধ। মিনিট কয়েক পরে সারদা কলতলা থেকে বেরোতেই হো হো করে হেসে উঠল। সারদা চলে যাচ্ছিল, হাসি শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল। 'কি ভুলই না করেছি,' হাসি থামিয়ে বলল প্রণব, 'কুলী না তাড়িয়ে যদি সিনেমায় নামতাম, এতদিনে একেবারে লাল। এই দ্যাখ না, প্রথম বাজিতেই জিৎ। নগদ একশো টাকা লাভ। দাঁড়াও, লাভ না কাটাকাটি, এখনি একবার দেখে আসা দরকার। সব হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে তো? আচ্ছা, ঘরে চল, বলছি।'

এগিয়ে এসে বাহু ধরতেই সারদা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল। প্রণব ছাড়ল না, এক রকম জোর করেই তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। খাটের উপর বসিয়ে বলল, 'আমার কিন্তু আগাগোড়াই ভয় ছিল, এই বুঝি সব ধরে ফেললে। এত সহজে তোমাকে বোকা বানাতে পারবো, একেবারেই ভাবিনি। ছিঃ ছিঃ, এই তোমার ধারণা আমার সম্বন্ধে!'

সারদার চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি কেটে গিয়ে দেখা দিল বিহ্বলতা। প্রণব সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'আসল ব্যাপার হল একটা বেট। আমার বন্ধু বিনোদ ঘোষের কথা বলিনি? তারই উদ্ভট খেয়াল। মাথায় চাপল একটা মজা করা যাক। দুজনেই একটু বেশী রাত করে বাড়ি ফিরে বলবো, আরেকটা বিয়ে করে এলাম। যে বৌকে বিশ্বাস করাতে পারবে, তার জিৎ। মানে একশো টাকা লাভ। আর যদি দুজনকেই পারে, কাউকে কিছু দিতে হল না। আমি তো জিতলাম। এবার চল গিয়ে দেখি, সে কি করল। তবে আমার বিশ্বাস, বিনোদ নির্ঘাৎ হেরে যাবে। তার বৌ তো তাকে অবিশ্বাস করে না।'

শেষ কথাগুলোয় একটু অভিমানের সুর ফুটিয়ে তুলে ছদ্ম ক্ষোভের দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সারদার মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'তোমাদের কাউকে বিশ্বাস নেই। তোমরা সব পার।'

উঠে চলে যাচ্ছিল। প্রণব যেতে দিল না। দু'হাতে বন্দী করে ফেলল। সারদা শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'হচ্ছে কি? ওদিকে ঝি আছে না?'

—থাক ঝি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে প্রণব স্ত্রীকে গিয়ে তাড়া দিল, 'এ কি! এখনো জামা-কাপড় পরোনি?'

—আমি কোথায় যাবো?

—বাঃ, তুমি না গেলে সাক্ষী দেবে কে? আমার কথা সে বিশ্বাস করবে কেন?

—তার মানে, আমাকে গিয়ে বলতে হবে, আমি হেরে গেছি। আসলে কিন্তু পুরোপুরি হারিনি। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

—আমি জানি। বলে, বিগতযৌবনা রুগ্না স্ত্রীর বাঁ দিকের গালটা একটু

টেনে দিল প্রণব।

মিনিট কয়েক পরে ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে দরজা থেকে ফিরে এল! 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? স্কুটারে করে যাই চল। নতুন গাড়ি কিনলাম, তুমি তো একদিন চড়লে না।'

—না বাপু, তোমার ঐ স্কুটার-ফুটারে আমি উঠতে পারবো না। যা জোরে চালাও তুমি!

প্রণব জানে এটা ওর মনের কথা নয়। আসলে এই দুরন্ত যানটির প্রতি সারদার একটা গোপন লোভ আছে। বেরোবার মুখে পিছন ফিরে কতদিন তার চোখে সেই লোলুপ-দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে। বলল, 'আচ্ছা, আস্তে আস্তে চালাবো। চল।'

—পড়ে মরবো না তো?

—পড়বে কেন? আমাকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

চকিত দৃষ্টি ফেলে স্বামীর মুখের পানে তাকাল সারদা। মনে হল, সাধারণ অর্থে বললেও কথাটা ঠিক সাধারণ নয়। এর মধ্যে আর একটা নিগূঢ় অর্থ জড়িয়ে আছে। সংসারে এই মানুষটিই তার একমাত্র অবলম্বন। তাকে ধরে থাকলে আর পড়বার ভয় নেই।

বিনোদ ঘোষের বাসা মধ্যমগ্রাম। শিয়ালদ থেকে ট্রেনে যেতে হবে। মেইন স্টেশনের সামনে স্ত্রীকে নামিয়ে দিয়ে প্রণব বলল, 'ঐখানটায় গিয়ে দাঁড়াও, আমি টিকিট নিয়ে আসছি।'

প্ল্যাটফরমের অনেকখানি জুড়ে উদ্বাস্তুদের ঘরকন্না। সেই দিকে সাগ্রহ করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সারদা। বছর কয়েক আগে সে-ও এদের মত বাপ-মা হারিয়ে, ভাইবোন আত্মীয়-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামীর হাত ধরে এখানে এসেই উঠেছিল। অল্পদিনের জন্যে হলেও এ জীবনের স্বাদ সে জানে। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। তাই মাসখানেকর মধ্যে প্রণবের একটা কাজ জুটে গিয়েছিল। সারদা নতুন করে ঘর বেঁধেছিল। সেও হয়ে গেল কতদিন!

টিকিট-ঘরের ওদিকটা বিনা প্রয়োজনে ঘুরে এসে প্রণব ভিড়ের আড়ালে আবার গেটের বাইরে গিয়ে পড়ল। স্কুটারে পা দিয়ে দেখল, সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সারদা বোধহয় তার বিগত জীবনের চিহ্নবাহী একদল অর্ধনগ্ন, রক্তহীন ভিক্ষাজীবী নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। ভালই হল। ওদের সঙ্গে ওর মিল আছে। শুধু অতীতের নয়, কিছুটা বর্তমানের, (ওর ভ্যানিটি ব্যাগের গহ্বরে কয়েকটা টাকা এখনো আছে) এবং হয়তো পুরোপুরি ভবিষ্যতের।

স্কুটার ছুটে চলল আপাতত উত্তরমুখে। বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট ঠিক হয়ে গেছে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে এখনই শ্যামবাজারের পুরনো বাসা ছেড়ে যেতে হবে। সারদা যদি ফিরে যায়, গিয়ে দেখবে তালা বন্ধ। তারপর?

স্কুটারের স্পীড উঠছে পঞ্চাশ থেকে ষাটের কোঠায়। তার সঙ্গে তাল রেখে গর্জন। বেয়াড়া 'তারপর'টা তারই মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

ছাতা

ডাক্তার বামাপদ হালদার হার্ট-স্পেশালিস্ট। সরকারী চাকরি করেন। এক সময়ে মুর্শিদাবাদ সদর হাসপাতালে এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন ছিলেন। তখন দূর দূরান্তর থেকে অনেক দুরারোগ্য হার্টের রোগীর ভিড় জমে যেত। তারপর বাঁকুড়ায় সিভিল সার্জন হয়ে গেলেন। প্রমোশন হল বলে মুখে আনন্দ প্রকাশ করলেও মুর্শিদাবাদের লোকেরা মনে মনে দুঃখিত হয়েছিল। তিনি নিজেও খুশী হননি। এক বন্ধুকে বলেছিলেন। স্টেথস্কোপ ধরব কখন, সারাদিন তো শুধু অফিসে বসে কলম পেষা। তার ওপরে মাসের মধ্যে পনের দিন জীপে চড়ে ধুলো খাও।

তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে অন্ততঃ কয়েকটা করে রোগী দেখে বিদ্যাটা একবার ঝালিয়ে নিতেন। তাতেও বাদ সাধলেন হেড-অফিস।

সকালের ডাকটা তাঁর বাড়িতে আসত। সেদিন একখানা চিঠি পড়ে খানিকক্ষণ থ হয়ে বসে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন স্ত্রীকে এবং আসতেই বললেন, দ্যাখ কি সর্বনাশ। আমাকে এবার জেলে পাঠাতে চান কর্তারা।

—অ্যাঁ! চমকে উঠলেন ইন্দিরা।

—না না; সে জেল নয়। জিজ্ঞেস করছেন আমি '—' সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতে রাজী আছি কি না।

—তাই নাকি! ইন্দিরার চোখে মুখে উল্লাস ছাপিয়ে উঠল। এ তো রীতিমত সুখবর! অমন মুখ চুন করে ভাববার কি আছে?

—আমি ডাক্তার মানুষ, জেলের কি জানি? তাই ভাবছিলাম, 'না' বলে দিই।

—ক্ষেপেছ! কি চমৎকার বাড়ি জানো? তার সঙ্গে মস্ত বড় পুকুর আর তরিতরকারির বাগান। তোমার এখানকার মত একটা টিনটিনে মালী নয়, অনেকগুলো করে কয়েদী পাওয়া যায়। তাছাড়া জেলের চাকরিতে খাতির কত! একগাদা সিপাই সান্ত্রী; কথায় কথায় সেলাম। সব চেয়ে বড় কথা, কলকাতার অত কাছে। সারাজীবন তো শুধু বাইরে বাইরেই ঘুরলাম। এ সুযোগ কখনো ছাড়তে আছে? এখনি উত্তর দিয়ে দাও। আমি প্যাকিং শুরু করছি।

হালদার সাহেবের কোন আপত্তি টিকল না। বাইরের 'উপরওয়ালা' শুধু প্রস্তাব পাঠিয়ে তাঁদের ইচ্ছাটা জানিয়েছিলেন, ঘরের 'উপরওয়ালা' সরাসরি রায় দিয়ে বসলেন। সেই দিনই চিঠি চলে গেল।

দুর্বল হার্ট নিয়ে যার কারবার, তেমন একজন নিরীহ ডাক্তারকে ধরে নিয়ে অতবড় একটা জেলের মাথায় বসিয়ে দেবার তাৎপর্যটা কী, হালদার সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না। বিস্ময়টা কথায় কথায় একদিন একজন বন্ধু ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ করতে তিনি বললেন, ও, তা জানেন না বুঝি? তবে শুনুন, ওর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। 'আই-সি-এস' এর স্তম্ভের ওপরেই

যে বৃটিশ সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। চার্চিল সাহেব বলেছিলেন, স্টীল ফ্রেম। এত বড় অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের গোটা ভারটাই ওদের ওপর। ওরা সবজান্তা। সমস্ত কর্তৃত্ব ওদের হাতে। আজ ডি, এম, কাল ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকালচারাল, পরশু হাই-কোর্ট জজ, তারপর দিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর। আই-এম্-এস্ এর বাঁধাধরা এক রাস্তা। সিভিল লাইনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট্ ছাড়া আর কোথাও ওদের পাত্তা নেই। অথচ, ওরাও তো 'অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস' এর লোক, তার ওপরে, লড়াই লাগলে ওদের ছাড়া গতি নেই। তখন ওরা আসল মিলিটারির সমান সমান—ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনাণ্ট্ কর্ণেল। সেই সব কথা উল্লেখ করে ক্ষোভ জানান হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের কাছে। ভদ্রলোক লোক ভাল ছিলেন। ভেবেচিন্তে বললেন, আচ্ছা ডাক্তারি ছাড়া আরেকটা জায়গা তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হল—সেণ্ট্রাল জেল্। ডাক্তারও বটে, মিলিটারিও বটে। ওখানে তোমাদের মানাবে ভাল।

বামাপদ বললেন, কিন্তু আমরা তো মিলিটারির 'ম'-ও জানি না ; একটা বন্দুকও কোনদিন চোখে দেখিনি।

—আপনারা পাচ্ছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, যাকে বলে **by law of inheritance,** আই-এম-এস এর জায়গায় বি-এম-এস। ওদের এখন পাচ্ছে কোথায় ? সব তো লড়াইতে টেনে নিয়ে গেছে।

নতুন চার্জ নেবার পর ডাক্তার হালদার সকাল সাতটায় ভয়ে ভয়ে অফিসে গিয়ে ঢুকলেন। প্রথমেই 'রিলিজ', অর্থাৎ কয়েদীদের খালাস পর্ব। ঐ দিন যাদের মেয়াদ শেষ হল, তাদের সব লাইন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ডেপুটি জেলর একটি একটি করে নাম ডাকছেন এবং মন্ত্র পড়ার মত গড়গড় করে একরাশ কি বলে যাচ্ছেন। বামাপদ খানিকক্ষণ শুনবার পর বুঝলেন, সেগুলো ওদের নাম, ধাম, বিবরণ, কত মেয়াদ ছিল, কদিন মাপ পেল তার থেকে, ইত্যাদি। তাঁর সামনে দশ সেরী ওজনের একটা বিশাল খাতা। তার মধ্যে ঐগুলো লেখা আছে এবং মিলিয়ে নিয়ে শেষ পংক্তিতে তাঁকে সই করতে হবে। রামের বদলে শ্যাম না চলে যায়, তারই জন্যে এই হুঁশিয়ারি। সেরকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তাঁকেও তার দায়িত্ব নিতে হবে। দেখে শুনে প্রাণ উড়ে গেল বামাপদবাবুর। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন, পাছে কোথাও ভুল হয়ে যায়। ডেপুটি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আই-এম-এস সাহেবরা এসব কিছু দেখত না, শুনতও না ; আপন মনে পাইপ টানত। তার পর ঘস ঘস্ করে সই বসিয়ে দিত।

নাম ধাম মেলাবার পর ডেপুটি কারো কারো হাতে কিছু পয়সা দিচ্ছেন, কাউকে এমনিই বলছেন, যাও। তারই একজন বলে বসল, নালিশ আছে হুজুর।

—কি নালিশ ? জানতে চাইলেন বামাপদ।

—দয়া করে কিছু খোরাকী দেবেন। অনেক দূর যেতে হবে।

এ বিষয়ে জেল কোড্ কি বলে সুপারকে জানিয়ে দিলেন ডেপুটি জেলর। জেল থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে যাদের বাস, তারা কোন খোরাকী পায় না। এ

লোকটার বাড়ি ঘর বলতে বিশেষ কিছু নেই। মাইল দেড়েক দূরে যে বস্তিটা আছে, সেখানে কোথায় থাকে এবং ছোটখাট চুরিচামারি কেস্‌-এ প্রায়ই ওকে জেলে আসতে দেখা যায়।

সে প্রতিবাদ করল, না, হুজুর আমার বাড়ি ধানবাদ! দেখুন না, ওয়ারেণ্টে লেখা আছে।

ওয়ারেণ্ট উল্টে দেখা গেল, তার ঠিকানা লেখা আছে, এলাহাবাদ। লোকটা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল, ঐ একই হল। যে ধানবাদ, সেই এলাহাবাদ।

ডেপুটি আসল ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ধানবাদ বা এলাহাবাদ কোনোটাই ও চোখে দেখেনি। সাজা হবার পর পেশকার যখন ওয়ারেন্টের ঘর ভর্তি করেন, তার প্রশ্নের উত্তরে ওরা যা খুশী বলে দেয়, পরে আর মনে করতে পারে না। সুপার সব শুনবার পর ইংরাজীতে বললেন, কিন্তু ওয়ারেণ্টে যখন রয়েছ, এবং তার নীচে কোর্ট সই করেছেন, তখন ওটাই আমাদের মেনে চলা উচিত।

এলাহাবাদ-এর পথ, খোরাকী মঞ্জুর হল।

খালাস শেষ হবার পর ডেপুটি যখন অন্যান্য কাগজপত্র সই করাচ্ছেন, দরজার সামনে থেকে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, আসতে পারি?

দীর্ঘাঙ্গ প্রিয়দর্শন যুবক। মুখে কিঞ্চিৎ দম্ভের ছাপ, পরণে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ডেপুটি নীচু গলায় বললেন, ডেটেনিউ সুরজিৎ দত্ত, বড় জ্বালাতন করে।

"স্বদেশী" বন্দী অর্থাৎ পলিটিক্যাল প্রিজনারদের খবর সুপার আসামাত্রই পেয়েছিলেন। শ'খানেক ডেটেনিউ, তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ও বিচারাধীন আরও শ'দুয়েক। জেলে বসে আর কিছু করবার নেই বলে, কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে উত্যক্ত করাই তাদের একমাত্র কাজ, একথাও শুনেছিলেন।

সুরজিৎ এসে অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং কোনোরকম ভূমিকা না করে বললেন, আপনার গুদামীবাবুটিকে বদলাতে হবে।

গুদামীবাবু মানে স্টোর-কীপার। এদের প্রয়োজনমত মালপত্রের সরবরাহের ভারও তার উপর! বামাপদ অভিযোগটা জানতে চাইলেন। সুরজিৎ বললেন, শ'দুয়েক কইমাছের অর্ডার দিয়েছিলাম ডেটিনিউ-কিচেনের জন্য। উনি সোজা বলে দিয়েছেন, "দিতে পারবো না, কই মাছের ফ্যাক্টরি নেই আমাদের।"

একটা বিশাল চাবির তাড়া হাতে ঝুলিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকলেন গুদামীবাবু এবং ডেটিনিউর কথার উত্তরে বললেন, "কি রকম কই মাছ চাইছেন, সেটা চেপে গেলেন কেন? স্পেসিফিকেশন (**Specification**) টাও জানিয়ে দিন সাহেব বাহাদুরের সামনে।"—

"স্পেসিফিকেশন আবার কি!" দু'চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি তুললেন সুরজিৎ;

তারপর সুপারের দিকে ফিরে বললেন, "বলছিলাম, মাছগুলো যেন ঠিক এক সাইজের হয়। ছোট বড় হলে ডিস্‌ট্রিবিউশনে অসুবিধা আছে, ছেলেরা বড় গোলমাল করে।"

—"বুঝুন স্যার," সাহেবের কাছে বিচার প্রার্থী হলেন স্টোরকীপার, "দু'শ কইমাছ ঠিক এক সাইজের হওয়া চাই। উনিশ বিশ হলেই রিজেক্ট্‌।"

—"উনিশ বিশ হবে কেন?" খানিকটা ধমকের সুরে বললেন ডেটিনিউ, "আপনার ঠিকাদার প্রভু যদি একটু চেষ্টা করেন, দু'শ এক মাপের কই জোটানো এমন কিছু কঠিন নয়। এক বাজারে না পায়, পাঁচ বাজার থেকে আনবে।"

"কি ব্যাপার? সুরজিৎবাবু কি মনে করে?" বলতে বলতে জেলরবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুপার তাঁকেই খবর পাঠাতে যাচ্ছিলেন। এসে পড়াতে যেন অনেকটা ভরসা পেলেন। বললেন, ওঁদের কই মাছ নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—"কই মাছ? বেশ তো; সাহেবের রাউণ্ড্‌টা হয়ে যাক। তারপর আপনাদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।"

—"না, আপনারা দিতে পারবেন কি না পারবেন, আমি এখনই জেনে যেতে চাই।"

জেলর তখন স্টোর-কীপারের দিকে তাকালেন এবং তার কাছে ডেটিনিউদের দাবীটা জেনে নিয়ে বললেন, "এ আর বেশি কথা কি? দেবো আপনাদের মাছ। তবে তার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে।"

—কতটা সময় চান? একদিন?

—আজ্ঞে না; অন্তত দেড় বছর।

—দেড় বছর !!

—তার কমে হবে না। আপনার অর্ডার আমরা ফিশারী ডিপার্টমেণ্টে পাঠাবো। তারা তাদের রিজার্ভ ট্যাঙ্কে ডিম ফেলবে। সেগুলো ফুটবে, বড় হবে। তা, বছর দেড়েক লাগবে বৈকি?

—আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

—আজ্ঞে না; ঠাট্টা করবো কেন? ঠিক এক সাইজের মাছ পেতে হলে এছাড়া তো আর অন্য উপায় দেখি না।

ডেটিনু রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

সুপারের প্রথম দফা কাজ শেষ হয়েছিল! এবারে রাউণ্ড। সঙ্গে চলেছেন জেলর, জনচারেক ডেপুটি জেলর, ডাক্তার, চীফ হেডওয়ার্ডার এবং আগেপিছে চারজন বেটনধারী ওয়ার্ডার। 'ঈনার গেট' (**Innergate**) পার হয়ে জেলের ভিতরে পা দিতেই একজন কয়েদীর হাতে যে বস্তুটি তাঁর নজরে পড়ল, সেইদিকে কিছুক্ষণ বড়বড় চোখ করে তাকিয়ে বললেন—সাধুভাষায় যাকে বলে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু। মুখ থেকে আপনা থেকেই বোধহয় বেরিয়ে এল—"কি এটা!"

—"আপকা ছাতা হ্যায়," দীর্ঘ সেলাম ঠুকে সবিনয়ে নিবেদন করল চীফ হেডওয়ার্ডার ভীষ্মলোচন সিং। বামাপদ এবার লক্ষ্য করে দেখলেন, ছাতাই

বটে, তবে রামছাতা। আস্ত একটা মোট বাঁশের তৈরী বাঁট, শিকগুলো শিক নয়, গোটা গোটা পাহাড়ী গল্লা বেত (যা দিয়ে চেয়ারের পা তৈরী হয়) আগুনের তাপ দিয়ে বাঁকানো, তার উপরে সাদাকাপড়ের ছাউনি। অর্থাৎ, একটি মাঝারি আকারের সামিয়ানা; তার তলায় জনদশেক মানুষ অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারে। ছত্রধর ব্যক্তিটিও কম দ্রষ্টব্য নয়। ছ'ফুটের উপর লম্বা, চওড়াও সেই অনুপাতে। খাঁড়ার মত নাক, তার নীচে সাদায় কালোয় মেশানো জমকালো গোঁফ। হঠাৎ মনে হবে, বিড়ালের ল্যাজের শেষ দিকটা কেটে লাগিয়ে দিয়েছে ঠোঁটের উপর। দাড়িটা দ্বিখণ্ডিত এবং দুটো ধার তুলে নিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ছাতা নামক সেই বস্তুটি খুলে নিয়ে সে যখন এগিয়ে এল, বামাপদর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠলো। বললেন, "নেহি লাগেগা। হামকো পাস্ টুপি হ্যায়ঁ।" বলে, তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে নিলেন। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। এ কোন্ দেশী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! ছাতার কাজ টুপি দিয়ে সারতে চায়। এরকম ভেতো সাহেব, কয়েদীরা মানবে তো? সিপাইরাও বা ভয় করবে কেন?

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা সরল না। তারপর জেলরবাবু মনে করলেন, ছাতার তাৎপর্য ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন সাহেবকে ওয়াকিবহাল করা তাঁরই কর্তব্য। সেই চেষ্টা করলেন। ছাতাটা যে এখানে টুপির বিকল্প নয়, কারাধ্যক্ষের পদমর্যাদার প্রতীক, তাঁর বিশাল কর্তৃত্বের পরিচয়, এর সঙ্গে এত বড় জেলের ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িত—ইত্যাদি তথ্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনেও বামাপদবাবুর কেমন লজ্জা করতে লাগল। একগাদা পলিটিক্যাল প্রিজনার রয়েছে জেলে। কেউ কেউ তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাদের সামনে দিয়ে মস্ত একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে প্রসেশন করে ঘুরে বেড়ানো! অসম্ভব। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "আপনাদের রাজত্বে এসে যখন পড়েছি, সব সয়ে নিতে রাজী আছি, কিন্তু ওটা চলবে না। না, মশাই, থিয়েটার করা আমার অভ্যাস নেই। ঐ রকম একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ছত্রপতি শিবাজী সাজতে পারবো না।"

দিনচারেক পরে। সোমবার। সুপারের সাপ্তাহিক 'ফাইল'। তামাম জেলের সাধারণ কয়েদীরা ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে লাইন করে দাঁড়াবে। সাহেব সদলবলে চলে যাবেন তাদের সামনে দিয়ে, শুনবেন, কার কি বলবার আছে, জানাবার আছে কোন নালিশ, অভিযোগ, আবেদন বা নিবেদন।

প্রথম নালিশ এল সেই ছত্রধর পেশোয়ারীর কাছ থেকে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানালো, মেডিক্যাল অফিসার তার দৈনিক ভাতা বন্ধ করে দিয়েছেন।

দৈনিক ভাতা! চোখ কপালে তুললেন বামাপদ। কয়েদী আবার ভাতা পায় নাকি? জেলরের মুখের দিকে তাকাতে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন—আর কেউ পায় না। ও-ই শুধু পায়। ছাতা ধরার ভাতা। অতবড় একটা ছাতা বয়ে নিয়ে বেড়াবার জন্য যতখানি গায়ে জোর দরকার, জেলের সাধারণ খাদ্য সেটা যোগাতে পারে না। তাই মেডিক্যাল অফিসারের সুপারিশ অনুসারে এক্স্ট্রা

বা বাড়তি খাদ্য হিসাবে রোজ আধসের করে মাংস ওর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ছাতা ধরা বন্ধ হবার পর সে অ্যালাউন্সটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

জটিল সমস্যা। বামাপদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ওকে অন্য কোন খাটুনির কাজ দেওয়া যায় না ?

—এরকম ভারী অথচ সম্মানের কাজ আর কিছু নেই। তাছাড়া ও তো সাধারণ কয়েদী নয়, মেট। 'হার্ড লেবর' (Hard labour) বলে যে সব কাজ নির্দিষ্ট আছে জেল কোডে, সেগুলো ওর করবার কথা নয়। আইনে নিষেধ আছে।

—তা হলে আর কি করা যাবে ? ওকে বুঝিয়ে দিন, ছাতা যখন আর ধরতে হচ্ছে না, সাধারণ খাবারের ওপর আর কোনো বাড়তি অ্যালাউন্স ওব প্রাপ্য নয়।

বুঝিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝালেই কি সকলে সব জিনিস বোঝে ? একবার যা পাওয়া যায় তাকে বরাবরের পাওনা বলে ধরে নেওয়াই মানুষের স্বভাব। পেশোয়ারী মুখে কিছু না বললেও, হাবভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সে বোঝেনি, অর্থাৎ বুঝতে চায় না।

এরপরেই মেডিক্যাল অফিসার সুপারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, লোকটা মাংস না পেয়ে যেরকম ক্ষেপে রয়েছে, কোন দিন আমাকেই হয় তো মাংস বানিয়ে ফেলবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন না ? ছাতা ধরুক আর না ধরুক, ওর টিকিটে ঐ 'আমব্রেলা-হোল্ডার' (umbrella-holder) কথাটা আবাব লিখে দিতে বলুন। আমিও তাহলে নষ্ট ভাতাটা উদ্ধার করতে পারি।

বামাপদ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। মেডিক্যাল অফিসার বুঝলেন, এসব কারচুপি এখানে চলবে না।

পরদিন ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। সকালেই খবর নিয়ে এল চীফ্ হেড-ওয়ার্ডার। পেশোয়ারী হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছে! মাংস মঞ্জুর না হলে আমরণ অনশন। অর্থাৎ লোকটার জন্যে কিছু করবার ইচ্ছা থাকলেও, আর তার সম্ভাবনা রইল না। জেলের আইন এ বিষয়ে অত্যন্ত সরল। যে কোনো কারণেই হোক, একবার যদি কেউ হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু করে, সেটা বন্ধ না করলে, অর্থাৎ বিনা সর্তে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার কোনো কথাই শোনা হবে না।

কারাধ্যক্ষ বিশেষ বিচলিত না হলেও, কারাপাল অর্থাৎ জেলর বড় ভাবনায় পড়লেন। হাঙ্গাব-স্ট্রাইক চেপে রাখা যায় না; সরাসরি সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া অবশ্যকরণীয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপদ বাধিয়েছে ঐ ছাতা। হাঙ্গার-স্ট্রাইকের কারণ দেখাতে গিয়ে ঐ বস্তুটির উল্লেখ না করে উপায় নেই। অথচ করতে গেলেই প্রশ্ন উঠবে—কিসের ছাতা, কবে তৈরী হল, ব্যয় পড়েছিল কত, তার স্যাংশন বা মঞ্জুরি কোথায় ইত্যাদি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। আসলে সবটাই আন্‌অফিসিয়াল। জেলের 'স্টক্‌বুক্'-এ ঐ আপদটার কোনো রেকর্ড নেই। তৈরী করতে খরচ যা হয়েছে (নেহাত কম নয়)

তাও 'ডান হাত বাঁ হাতের' ব্যাপার। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। অর্থাৎ বানানো হয়েছে ছাতা, জমার ঘরে লেখা হয়েছে রান্নার ডেক কিংবা বাগানের কোদাল। কোন্ লেফটেন্যান্ট্ কর্ণেল জাঁদরেল বস্‌কে খুশী করতে গিয়ে কে কি ভাবে এই কাণ্ডটি করে গেছেন, কেউ জানে না। কিন্তু সে কথা বলে বর্তমান স্টাফ্-এর পার পাবার উপায় নেই। হেড-অফিস বেঁকে বসলে জেলর স্বয়ং ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

গত্যন্তর না দেখে ভদ্রলোক অনেক ভেবে চিন্তে অতঃপর সাহেবের 'কুঠীতে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। কদিনেই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, বামাপদর প্রতিটি পদক্ষেপ যিনি পরিচালনা করেন, তিনি একজন বামা। তাঁরই শরণ নিলেন জেলরবাবু। পুকুর, বাগান এবং অন্যান্য 'হোম্ অ্যাফেয়ারস্' (**Home affairs**) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এবং কার্য্যকরী সাহায্যের ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি দেবার পর আসল বক্তব্যটা পেশ করলেন। মিসেস হালদার সব কিছু শুনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, কাল সকালে সিপাইরা যখন ওঁকে বাংলো থেকে 'এস্কর্ট' করে নিতে আসবে সেই সঙ্গে ছাতাটাও পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নীচে এসেই চমকে উঠলেন বামাপদ 'একি! এটাকে এখানে কে নিয়ে এল?'

—'আমি আনিয়েছি!' পেছন থেকে বললেন মেমসাহেব।

—'তুমি! কিন্তু—'

—'কিন্তু আবার কি? তুমি কি এখনো সেই ডাক্তার সাহেব আছ যে, একটা সোলার টুপি মাথায় দিয়ে ট্যাং ট্যাং করতে করতে অফিস যাবে? তুমি এখন 'সেণ্ট্রাল' জেলের বড় সাহেব। ঐ রকম একটা আচ্ছাদন না হলে মানাবে কেন? এই, খোলো।'

হুকুম পাওয়া মাত্র ছাতা খুলে তুলে ধরল পেশোয়ারী। বামাপদ আর কী করেন? নিঃশব্দে গিয়ে তার তলায় দাঁড়ালেন। এগিয়ে চললো প্রসেশন।

শাস্তি

মফঃস্বল কলেজের চাকরি। রোজ গুটি চারেক করে ক্লাস প্রায় সকলের ঘাড়েই চাপানো আছে। এক নাগাড়ে কয়েকঘণ্টা গলাবাজির পর আড্ডা জমাবার মত উৎসাহ আর কারো থাকে না। অধ্যাপকেরা ছাড়া পাওয়া মাত্র বাড়ির পথ ধরেন। শুধু একটি দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। মাসের পয়লা তারিখ। সেদিন ছুটির পরেও কিছুক্ষণ বসতে হয়। প্রফেসরদের বসবার ঘরে একখানা চেয়ারও খালি থাকে না। গল্প-গুজব, চা সিগারেট চলে। তার ফাঁকে প্রত্যেকের একটা চোখ ও একখানা কান পড়ে থাকে গেটের দিকে—ছরছর করতে করতে কখন এসে পৌঁছবে গফুর কোচোয়ানের সেই পেটেণ্ট ছক্কড়, আর তার ভিতর থেকে খাকী কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে পড়বে ক্ষীণকায় শশধর পিওন, সঙ্গে ভোজপুরী

দারোয়ান মহীন্দর সিং। মহকুমা শহরের সাব-ট্রেজারীর ভিড় ঠেলে ফিরতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। অন্য কোন কারণে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে অধ্যাপকদের অবশ্যই ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। কিন্তু ঐ বিশেষ দিনটিতে, প্রতীক্ষিত বস্তুটির কল্যাণে সকলেই খোসমেজাজ।

এই মাসপয়লার জমায়েতগুলো বেশীর ভাগ দিন যাকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে, তার নাম বিজয়েশ মিত্র। বাংলার অধ্যাপক, বয়সে তরুণ, তার উপরে মাসিক-পত্রে রোমান্টিক কবিতা লিখে থাকে। জীবনেও একদা রোমান্স ঘটেছিল, তার রঙ এখনো অম্লান। পূর্বরাগ-লব্ধা সুন্দরী স্ত্রী, তার কোলে একটি বছর দুয়েকের ফুটফুটে ছেলে—এই নিয়ে সংসার। আরেক জন আছে। অনেকদিনের পুরনো লোক, হরিচরণ। একাধারে বামুন, ভৃত্য, বয়, বেয়ারা এবং সব মিলিয়ে 'লোক্যাল গার্জেন'।

বিজয়েশ কনিষ্ঠ অধ্যাপক, সুতরাং তার মাসিক মাইনেটাও লঘিষ্ঠ। তবু ঐটুকুর মধ্যেই বেশ গুছিয়ে চালিয়ে নেয়। সঞ্চয় যেমন নেই, তেমনি ধার-দেনারও ধার ধারে না। প্রাচুর্য না থাক, অনটনের বোঝা টানতে হয় না। দুখানা ঘরের ছোট্ট বাসাটিতে পা দিলেই চারদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী চোখে পড়ে। ঘরের কোণে টিপয়ের উপর জয়পুরী-কাজ-করা ফুলদানী, তার মধ্যে কয়েকটি সদ্য-ফোটা তাজা ফুল, জানালায় সুদৃশ্য পরদা, দেয়ালে টাঙানো দুচারখানা ছবি—কোথাও কোন ছন্দপতন নেই।

এই সব প্রসঙ্গেই কথা চলে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক, প্রফেসর লাহিড়ী বলেন, 'আমাদের দিনগুলো হচ্ছে পঞ্জিকার পাতা, শুধু শুকনো তারিখের তালিকা আর বিজয়েশের প্রতিটি দিন একটি সরস ছোট্টগল্প কিংবা সুরেলা গীতিকবিতা, এ লিরিক পোয়েম।'

অর্থনীতির অধ্যাপক মজুমদাব বলেন, কবিতা লিখলে কি হয়, বিজয়েশ আসলে একজন পাক্কা ইকনমিস্ট। আমাদের যেখানে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের লাঠালাঠি, ওর সেখানে আশ্চর্য ব্যালান্স। ডেফিসিট বাজেট এড়িয়ে চলবার আর্ট ওর জানা আছে।

—সে কৃতিত্ব ওর নয়—এক টিপ নস্য সহযোগে মন্তব্য করেন সংস্কৃত পণ্ডিত মশাই, আমাদের বৌমাটি যে মূর্তিমতী লক্ষ্মী।

—হরির মত একটি চাকর পাওয়াও কি কম ভাগ্যের কথা?—ওদিক থেকে কে একজন যোগ করেন, 'বলতে গেলে, তার হাতেই সংসার।'

সহকর্মীদের এই সব সস্নেহ প্রশস্তি বিজয়েশ সহাস্যে উপভোগ করে, কখনো বিনীত কণ্ঠে দু একটি মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

সেদিন মাইনের প্যাকেটটি পকেটে করে সাইকেল চালিয়ে বিজয়েশ যখন বাসায় ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাইরের ঘরে পা দিয়ে ডাকল, রমা··। সাড়া পাওয়া গেল না। ভিতরের বারান্দায় পড়ে চোখে পড়ল শোবার ঘরে তালা ঝুলছে। হরি রান্নাঘরের ওদিকে কী করছিল। এগিয়ে এসে বলল, মা দাদুভাইকে নিয়ে গৌরী-মাসিমাদের বাড়ি গেছেন।

—কখন গেল ?

—এই তো গেলেন। আমি কেরোসিন নিয়ে ফিরছি, ঐ হোথায় দেখা। বললেন, তুমি বাড়ি যাও হরি, আমি একটু ঘুরে আসি। বাবুর তো আজ দেরি হবে আসতে। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি চা-এর জল চাড়িয়ে দিই।

বিজয়েশ জামাটা খুলে সোফার পিঠে ঝুলিয়ে দিয়ে কলতলার দিকে চলে গেল। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে দেখল, ঘরের মধ্যে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। আবছায়া অন্ধকারে চিনতে পারল না। বলল, কে ?

—আজ্ঞে, আমি নিধিরাম।

—ও, নিধিরাম ? কী খবর ?

—মেজোবাবু আজকের কাগজটা চাইলেন।

—ওখানে আছে, নিয়ে যাও।

নিধিরাম পাশের বাড়ির চাকর। টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপরে ভিতর থেকে হরির ডাক শোনা গেল, চা দিয়েছি, বাবু। 'যাই' বলে বিজয়েশ চায়ের টেবিলে গিয়ে বসল। ভিতরের বারান্দার একটা অংশকে পরদায় ঘিরে ডাইনিং রুমের রূপ দেওয়া হয়েছে।

চা শেষ হবার আগেই বাইরের ঘরে নতুন আগন্তুকের সাড়া পাওয়া গেল। বিজয়েশ বলল, 'দ্যাখ্ তো কে ?'

হরিচরণ ওদিকটায় একবার উঁকি দিয়ে এসে অপ্রসন্ন মুখে বলল, এবার এক-ঘণ্টার দায়ে নিশ্চিন্দি।

বিজয়েশ মৃদু হেসে বলল, অতুল ডাক্তার বুঝি ?

—তাছাড়া আর কে ? ভর সন্ধ্যেবেলা লোকের বাড়ি গিয়ে উৎপাত করা আর কার কম্ম ?

—আহা, উৎপাত আবার করল কোথায় ?

—না ; পাঁচ মিনিট অন্তর চা লেয়াও, সিগ্রেট লেয়াও, পান লেয়াও। লাট-সায়েব আর কি !

'লাটসাহেবের' হুকুমগুলো এমন সুরে ও ভঙ্গিতে পরিবেশন করল হরিচরণ যে, বিজয়েশ না হেসে থাকতে পারল না।

অতুল ডাক্তারকে ডাক্তারি করতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। বয়স্ক লোকেরা বলে এককালে তিনি যথারীতি রবারের নল গলায় ঝুলিয়ে রোগী দেখতে বেরোতেন। অনেকদিন হল সে সব ছেড়ে দিয়েছেন। তার জায়গায় অন্য কিছু যে ধরেছেন তাও নয়। দুটি ছেলে সামান্য রোজগার করে। কী করে যে চলে, পাড়ার লোকের কাছে সে এক রহস্য। ওঁর নিজের কাজ হল, সকালে উঠে আগের দিন বিকেলে বিলি করা ইংরেজি খবরের কাগজখানা প্রথম থেকে শেষ পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া, এবং বেলা পড়তেই সেটি বগলে করে কারো বাড়িতে গিয়ে ওরই ভিতর থেকে একটা কিছু নিয়ে আড্ডা জমানো। বিষয়ের বাছবিচার নেই। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, পণ্ডিতজীর বক্তৃতা থেকে পুলিশ কোর্টের

রিপোর্ট—সর্বত্র তাঁর সমান কৌতূহল। যা হোক কিছু নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। 'আলোচনা' ঠিক নয়, তাতে দু তরফের সহযোগিতা প্রয়োজন। ওঁর ব্যাপারটা নিছক একতরফা। অর্থাৎ অতুল ডাক্তার বলেন, শোনেন না, এবং যা বলছেন কেউ শুনল কিনা তা নিয়েও মাথা ঘামান না। বিজয়েশের বৈঠকখানায় তাঁর পদার্পণ প্রায়শঃ ঘটে থাকে। তার কারণ, শ্রোতা হিসাবে সে যেমন নীরব ও ধৈর্যশীল, চা-সিগারেট যোগাতেও তেমনি তৎপর ও উদার।

আজকের আসরটা শুরু হতে না হতেই বাধা পড়ল। কলেজের একটি ছাত্রের মুখে এল দারুণ দুঃসংবাদ। প্রফেসর লাহিড়ী প্রফেসরস্ রুমেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এতক্ষণ আছেন কিনা সন্দেহ। বিজয়েশ চমকে উঠল—সে কি! এইমাত্র দেখে এলাম দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

ছেলেটি বলল, মাইনে নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু প্যাকেটটা কিছুতেই পকেটে পুরতে পারছেন না। পণ্ডিত মশায় দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ধরতে না ধরতেই পড়ে গেলেন। তারপরেই পাল্‌স নেই। আপনাকে যত শীগগির হয় যেতে বলেছেন প্রিন্সিপ্যাল।

—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

ছেলেটি সাইকেল ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরো কয়েকজনকে খবর দিতে হবে। 'খুবই ভাবনার কথা' বলতে বলতে অতুল ডাক্তারও উঠে পড়লেন।

সোফার উপর থেকে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে গিয়ে বিজয়েশের হাতে ঠেকল মাইনের প্যাকেট। এক সেকেণ্ড কী ভাবল, একবার এদিক-ওদিক তাকাল। ঘরের একধারে তার লিখবার টেবিল, তার ডান দিকে একটা দেরাজ। কাগজপত্র থাকে, চাবি দেবার ব্যবস্থা নেই। তাড়াতাড়ি তারই ভিতরে খামখানা রেখে, টানাটা ঠেলে দিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখল, হরি এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। বলল, দরজাটা বন্ধ করে দে। রমাকে বলিস, কলেজে যাচ্ছি। একজন মাস্টার-মশায়ের খুব অসুখ। ফিরতে হয়তো রাত হবে।

বিজয়েশ চলে যাবার পর হরিও বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, আরে, বংশী কবে এলি?

—আজ সকালে।

—তারপর, দেশের খবর কি? আমাদের ওদিক গিয়েছিলি?

—না হরিদা, একেবারে সময় পাইনি। তোমার একখানা চিঠি আছে।

—চিঠি! কৈ দেখি?

—তোমাদের গাঁয়ের জগবন্ধু দিয়ে গেল। খুব নাকি জরুরী চিঠি। তাইতো ছুটতে ছুটতে এলাম।

একখানা ভাঁজকরা কাগজ হরির হাতে দিয়ে বলল, 'আমি যাই হরিদা দোকানে কিছু কেনা-কাটা আছে। জলদি ফিরতে বলে দিয়েছে গিন্নীমা!'

বলতে বলতে বংশী চলে গেল। মাইলখানেক দূরে ও-পাড়ায় কোন এক বাসায় চাকরি করে। ক'দিনের ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। হরিদের গ্রাম থেকে ক্রোশ দুয়েক দূরে ওর বাড়ি।

হরি সামান্য লেখাপড়া জানে। বংশীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল এবং আলোর কাছে গিয়ে খুলে ধরল।

বিজয়েশ পৌঁছবার আগেই প্রফেসর লাহিড়ী মারা গেছেন! হার্টের ব্যাপার। নোটিশ দেওয়া ছিল। এটা দ্বিতীয় এবং মোক্ষম আক্রমণ। যেমন অতর্কিতে শুরু তেমনি অবিলম্বে শেষ। কিন্তু সহকর্মীদের ঘাড়ে যে কাজটা চাপিয়ে গেলেন সেটা অত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়। দেহটা প্রথমে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, তারপর শ্মশানে। সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে বিজয়েশকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হল। সুতরাং পরদিন সকালে সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে পারল না।

রমা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। স্বামীকে ভিজে কাপড়ে ফিরতে দেখে একটা শুকনো ধুতি আর গেঞ্জি স্নানের ঘরে রেখে এসে বলল, তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসো। আমার চা তৈরী। আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই।

চা খেতে খেতে বিজয়েশের নজরে পড়ল, হরি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, হাতে বাজারের ঝুড়ি। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রমা বলল, 'কী হল'! 'আসছি' বলে ছুটে গেল বসবার ঘরে, টানাটা একটানে খুলে ফেলল, তারপর মাইনের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ফিরে এসে রমার হাতে দিয়ে আবার চায়ের কাপটা টেনে নিল।

—কোথায় ছিল? জিজ্ঞাসা করল রমা।

—ও ঘরের ড্রয়ারে।

—ড্রয়ারে! খোলা?

বিজয়েশ মৃদু হেসে চায় চুমুক দিল।

—ওমা! ঐ ভাঙা দেরাজে কেউ টাকা রাখে? বিস্ময় ও উদ্বেগের সুরে বলল রমা। 'যত বয়স হচ্ছে ততই কি ভীমরতি ধরছে দিন দিন?'

—তা-ই তো প্রাকৃতিক নিয়ম।

—থাক, আর রসিকতা করতে হবে না। (টাকার প্যাকেটটা মাথায় ঠেকিয়ে) আমাকে একবার ডেকে পাঠাতে কী হয়েছিল? ঘর সংসার ছেড়ে বনে তো আর চলে যাইনি।

—তা কেমন করে জানবো? ঘরের পাশেই তো—

—ঘরের পাশে কী, শুনি?

—বন। যে-সে বন নয়, একেবারে—

—'আবার?' আয়ত কালো চোখের তারায় এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়িয়ে রমা ধমকে উঠল। কিন্তু ছদ্মরোষের আড়ালে মৃদু হাসিটি চাপা রইল না।

বিজয়েশ যে শব্দটি বলতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে ধমক খেল, সেটি 'কুঞ্জবন'। ওদের দুজনের মধ্যে তার একটি বিশেষ অর্থ আছে। রমার সখী গৌরীদের বাড়ি যাবার পথে একটি ফুলবাগানওয়ালা দোতলা বাড়ি পেরোতে হয়। তার মালিকের নাম কুঞ্জবাবু। ভদ্রলোক প্রৌঢ় এবং বিপত্নীক। বিকেলের দিকে প্রায়ই তাকে বাগানে পায়চারি করতে কিংবা একটা বাঁধানো বেদির উপর বসে থাকতে

দেখা যায়। রমা যখনই ঐ পথ দিয়ে যায়, তার এই সুন্দরী প্রতিবেশিনীর দিকে তিনি একটু বিশেষ উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। তার বাগানটা সত্যিই দেখবার মত এবং রমার মুখে তার অজস্র প্রশংসা যখন-তখন শোনা যায়। দু তরফের এই দুটি দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছে বিজয়েশ। স্ত্রীর কাছে ঐ বাগানটির উল্লেখ করতে হলেই বলে 'কুঞ্জবন' এবং ঐ কথাটির ভিতরে যে গূঢ় ইঙ্গিত আছে সেটাও অস্পষ্ট রাখে না। রমা সেটুকু বুঝতে পেরে স-কলরবে তেড়ে আসে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

ঐদিন আর পুরোপুরি অবকাশ ঘটবার আগেই দৃশ্যপটে হঠাৎ খোকাবাবুর আবির্ভাব। মায়ের ভ্রূভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করে বুঝল, কলহ জাতীয় একট কিছু ঘটেছে। পিতৃপক্ষকেই বোধহয় অন্যায়কারী বলে মনে হল। মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, বাবা দুত্তু।

রমা হেসে উঠল, বেশ হয়েছে। দেখলে তো? অতটুকু বাচ্চা কী রকম মানুষ চেনে।

বিজয়েশ ছদ্মগাম্ভীর্যের সুরে বলল, বাচ্চাটি যে পুরুষ জাতীয়। নারীর প্রতি তার চিরন্তন পক্ষপাত।

—হেরে গেলে ওরকম সবাই বলে থাকে। না বাপী?

'বাপী' এমন বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সায় দিল যে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। রমা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় কচি মুখখানা ভরে ফেলল।

এই সব মধুর পারিবারিক দৃশ্যে হরিও প্রায় সময়ে যোগ দিয়ে থাকে। নানা রকম মন্তব্য করে, কখনো এর পক্ষে, কখনো ওর দিকে। আজ সে বিরস মুখে দূরে দাঁড়িয়ে রইল এবং সেটা স্বামী-স্ত্রী কারোরই নজর এড়াল না। দুজনের চোখেই একটা মৌনী প্রশ্ন ফুটে উঠল, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলল না।

পরদিন কলেজে যাবার আগে বিজয়েশ স্নান করতে যাচ্ছিল। রমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলল, শোনো।···

—কি?

—প্রিমিয়ামের টাকাটা কি তুমি নিয়ে গিয়েছ?

—না তো।

—সেদিন ডাক্তারের ফী, শ্মশানের খরচ কিংবা অন্য কোন বাবদে তোমাকে কিছু দিতে হয়নি?

—না, না, ও সব দরকার হয়নি। কেন বল দিকিন?

—থাক, তুমি চান করে এসো।

—ব্যাপার কী, বল না? টাকা কি কম মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ; পঞ্চাশ টাকা কম।

—বল কি!

—যাক, ওসব পরে ভাবা যাবে। এখন আর দেরি কোরো না। আমার রান্না হয়ে গেছে।

খেতে বসে কিংবা কলেজে যাওয়ার আগে আর কোনো কথা হল না। কিন্তু দুজনের মনেই একটা ভার চেপে রইল। এটা ইনসিওরেন্স-প্রিমিয়াম দেবার মাস। ঐ কখানা গোনাগুনতি নোট থেকে বাহান্ন টাকা বারো আনা বেরিয়ে গেলে এমনিতেই ওদের খুব হিসাব করে চালাতে হয়। বেশ খানিকটা টানাটানির মধ্যেই চলে মাসটা। তার উপরে আবার এই পঞ্চাশ টাকার ঘাটতি। রমা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু টাকাটা নিল কে?

বিজয়েশ ফিরে এলে আবার ঐ প্রসঙ্গই উঠল! ওঘরে কে কে এসেছিল সেদিন, কখন, কতক্ষণের জন্যে ঘর ছেড়েছিল বিজয়েশ, টাকাটা তখন কোথায় ছিল—ইত্যাদি তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবার পর রমার আর সন্দেহ রইল না, যে এটা নির্ঘাৎ ঐ অতুল ডাক্তারের কাজ। ও লোকটার চালচলন তার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। বিজয়েশ এ রায় মেনে নিতে পারল না। সন্দিগ্ধ সুরে বলল, অতুল ডাক্তার নেবে? অতগুলো টাকা!

—তা ছাড়া আর কে নেবে? পাশের বাড়ির চাকরটা? তার এতটা সাহস হবে বলে মনে কর?

বিজয়েশ মাথা নাড়ল। রমা গলা খাটো করে বলল, তাহলে বাকি থাকে এক হরি! তার পক্ষে এটা অসম্ভব। আজ ছবছর ধরে দেখছি তো। দুআনা পয়সা কোনোদিন এদিক-ওদিক করেনি। হরি তোমার পকেট থেকে কিংবা দেরাজ থেকে টাকা চুরি করেছে—এটা আমি দেখলেও বিশ্বাস করব না।

বিজয়েশ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ঠিক মত বন্ধ করেছিল কিনা, এইটুকু ছাড়া, মনিব বা মনিব-পত্নী হরিকে আর কোনো প্রশ্ন করল না, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা এবং চাঞ্চল্য তার নজর এড়াল না। কিছু কিছু আলোচনাও কানে গেল। ওরা দুজনেই লক্ষ্য করল, সে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

হরিচরণ কোনোকালেই চুপচাপ থাকবার পাত্র নয়। হাত-পায়ের সঙ্গে তার বাকযন্ত্রটাও পাল্লা দিয়ে চলে। কিন্তু ঐদিন থেকে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সে একটি কথাও বলে না। নির্দিষ্ট কাজগুলো নিঃশব্দে করে যায়। রমা মনে মনে আহত হল। বিজয়েশকে আড়ালে ডেকে বলল, হরিটা কি রকম মুষড়ে পড়েছে দেখেছ?

—দেখেছি।

—আহা বেচারা! নিশ্চয়ই ভাবছে, আমরা মনে মনে ওকেই চোর ঠাউরেছি।

—হুঁ, বলে বিজয়েশ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল।

—হুঁ কী? তুমি কি সত্যিই ওকে সন্দেহ কর?

—না, তা বলছি না। সে যাক গে। এখন, এত বড় ডেফিসিট সামাল দেবে কেমন করে?

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

—তা জানি। রিট্রেঞ্চমেন্টের কুড়ুল সবটা নিজের ঘাড়েই ফেলবার মতলব।

তা কেন হবে ? একটা কোপ্ এদিকেও ফেল। মোটা না হোক গোটা কয়েক ছোট-খাটো আইটেম ছেঁটে দিলে আমার বিশেষ কিছু লাগবে না।

—তোমার দিকে আছে কি যে ছাঁটবো ? খরচের সিংহ-ভাগ তো মেয়েদের।

—তবু পুরুষদের একটা মুষিক-ভাগও তো আছে। তার থেকে কিছু যাক।

—মুষিক-ভাগটা কী শুনি ? মুখ টিপে হাসল রমা।

—কেন ? চা, সিগারেট, ওভালটিন, দাড়ি কামাবার ব্লেড—

—আহা-হা, ওতে আমার কত সাশ্রয়ই না হবে !

—হবে না মানে ? দাম কষে দ্যাখ না একবার ? দৈনিক চার কাপ হিসেবে একশ কুড়ি কাপ চা, তিরিশ দিনে তিরিশ পেয়ালা ওভালটিন, পাঁচ টিন সিগারেট, দশখানা সেভেন ও-ক্লক্—

—খুব হয়েছে, এবার থামো।

কিন্তু তখনকার মত থামতে বাধ্য হলেও বিজয়েশ শেষ পর্যন্ত তার 'পয়েন্ট' ছাড়ল না। তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দৈনন্দিন তালিকা থেকে কয়েকটা দফা আপাতত ছেঁটে দিতে রমাকে রাজী হতে হল।

সকালে ঘণ্টা তিনেক বিজয়েশকে লেখাপড়া করতে হয়। ঐ সময়ে এক পেয়ালা ওভালটিন তার দৈনিক বরাদ্দ। রমা সেটা নিজে হাতে তৈরী করে এবং নটা বাজতেই হরি এসে কাপটা নিয়ে গিয়ে বাবুকে দিয়ে আসে। তার একটু আগেই তাগিদ দিয়ে যায়, রমার হাতে অন্য কাজ থাকলে তাড়া দিয়ে তৈরী করিয়ে নেয়। সেদিন ঠিক সময়ে ট্রে হাতে এসে দাঁড়াতেই রমা বলল, 'ওভালটিন দিতে হবে না।' আশঙ্কা ছিল, হরি তাকে এইটুকুতেই ছেড়ে দেবে না। কেন দিতে হবে না, কী হয়েছে বাবুর, বরাবরের অভ্যাস ছেড়ে দেবার কী কারণ ঘটল, ঐটুকু পোষ্টাই খাবার পেটে না গেলে এত খাটুনিতে শরীর টিঁকবে কেমন করে —ইত্যাদি একগাদা প্রশ্নের জবাব চাইবে। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে—তা সে বাবু, মা, খোকাদাদু—যারই হোক, হরিচরণ এতটুকু টানাটানি বরদাস্ত করে না। 'খাবো না' বললে বকে চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলে। কোন মাসে একবার মাছের পরিমাণটা কমাবার প্রস্তাব হয়েছিল। হরি বলে বসল, সে বাজারে যেতে পারবে না। সেই সঙ্গে যোগ করেছিল, আমাকে ছাড়িয়ে দাও। তারপর কর তোমাদের যা খুশি। উপোস করে থাকলেও আমি দেখতে আসবো না।

কিন্তু আজ সে একটি কথাও বলল না। রমার মুখের দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সরে গেল। কী কারণে বিজয়েশকে ঐ সময়ে একবার ভিতরে আসতে হয়েছিল। হরির মুখের দিকে চেয়ে এবং তার চলে যাবার ধরনটা দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহকুমার পুলিশ প্রধান অর্থাৎ এস. ডি. পি. ও-র সঙ্গে বিজয়েশের বন্ধুত্ব ছিল। কথায় কথায় চুরির ব্যাপারটা তাকে বলতেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন,

অতুল ডাক্তার, নিধিরাম এবং হরিচরণ তিনজনকেই পর পর থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসা-বাদ করলে হয়তো কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু কাউকেই যখন বিশেষ-ভাবে সন্দেহ করা যাচ্ছে না, তখন লোকগুলোকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা বিজয়েশের মনঃপূত হয়নি। অতুল ডাক্তার সম্বন্ধে রমার মনোভাব যাই থাক, ভদ্রলোককে পুলিসে দেওয়াটা সেও পছন্দ করেনি। দিলেও টাকা উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যখন নানা উপায়ে ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা চলছে, তখন এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে একটা নতুন বোঝা এসে ঘাড়ে চেপে বসল। বিজয়েশের এক মাসিমা ছিলেন, এই পর্যন্ত তার জানা ছিল, কোনোদিন যোগা-যোগ ছিল না। হঠাৎ অনেক কাল পরে তাঁর এক চিঠি এসে হাজির। কুশল প্রশ্নাদির পর জানাচ্ছেন, শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তাঁর একটি ছেলে জটিল ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে, অবিলম্বে কিছু টাকার ব্যবস্থা না করলে জেল অনিবার্য। বিজয়েশের মত আপনজন যদি এই দুঃসময়ে মুখ তুলে না চায়— ইত্যাদি ইত্যাদি। চিঠিখানা রমার হাতে দিয়ে বিজয়েশ বলল, তার মানে অন্ততঃ পঁচিশ, কি বল?

রমা লাইনগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তার কমে আর পাঠোনো যায় কেমন করে?

—তারপর? এবারে কোন্ আইটেম্ ধরবে? খোকার দুধ?

রমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, কী যে বল তার ঠিক নেই। আর কিছু না থাক, কয়েক কুচো সোনা তো রয়েছে গায়ে।

—তা আছে। তবু, আমার মনে হয় খোকাকেও আমাদের দলে টানা উচিত।

—তার মানে?

—ও যখন বড় হবে, মানুষ হবে, যদি শোনে মায়ের গয়না বেচে ওর দুধ যোগাতে হয়েছিল, খুব খুশী হবে না। তার চেয়ে যদি জানতে পারে, অভাবের দিনে বাপ-মায়ের কষ্টের ভাগ সেও মাথা পেতে নিয়েছিল, শিশু বলে ওকে আমরা অবহেলা করিনি, নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করবে।

রমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বিজয়েশ হেসে ফেলল, কী সব বাজে বকচি! চল, বেড়িয়ে আসি।

রমার সিক্ত চোখে হাসির ঝলক খেলে গেল। বলল, দ্যাখ দিকিন কাণ্ড! আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সন্ধ্যার পর আবার উঠল কথাটা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বিজয়েশ বলল, খোকার দুধটা সত্যিই কদিন বন্ধ রাখতে হবে, রমা।

'—কেন?' রমা চমকে উঠল। স্বামীর স্বরে হাসি-ঠাট্টার লেশমাত্র আভাস নেই।

—কারণ আছে।

—কী কারণ?

—সেটা এখন জানতে চেও না। পরে সব বলবো। কিন্তু তুমি আর আপত্তি করো না।

এর পরে আর কথা চলে না। তবু মুখ থেকে যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, দুধের বাচ্চা, দুধ না পেলে কী খেয়ে বাঁচবে ?

—ক'টা দিন তো। এ কষ্ট আমাদের সইতেই হবে।

বেলা পড়লে খোকাকে ঘাড়ে চড়িয়ে স্টেশনের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হরির নিত্যকার রুটিন। ফিরবার পরেই তার বরাদ্দ পুরো এক গ্লাস গরম দুধ। বলা বাহুল্য, খোকার সেদিকে কোনো স্বাভাবিক স্পৃহা নেই। এমন অনেক রকম কসরৎ করে ঐ তরল বস্তুটি তাকে গলাধঃকরণ করাতে হয়, যা রমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই কঠিন কাজটি হরিচরণ বরাবর নিজের হাতে রেখেছে। কখনো কোলে বসিয়ে শেয়ালের গল্পের অনুপান দিয়ে, কখনো পলাতকের পিছনে সারা বাড়ি ছুটাছুটি করে গেলাসটি নিঃশেষ না করিয়ে সে ছাড়ে না। সেদিনও মনিব-পুত্রকে যথারীতি বেড়িয়ে আনবার পর রান্নাঘরে গিয়ে বলল, মা, দাদু-ভাইয়ের দুধ দাও।

—দুধ বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে আমার কাছে দিয়ে যাও।

হরি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রমার মুখের পানে। তারপর যন্ত্রচালিতের মত বিড়-বিড় করে বলল, দুধ বন্ধ হয়ে গেছে! দাদুভাই তাহলে খাবে কী ?

—দুখানা বিস্কুট রেখেছি। এখনকার মত ওতেই হবে। কোথায় সে ? নিয়ে এস।

খোকা অন্যদিন দুধ দেখলে পালায়। আজ তার কী সুমতি হল ! হরি-চরণকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে বলে উঠল, অলি, দুধ কই ?

হরিচরণের দু-কানে দুটি সুতীক্ষ্ন তীর এসে বিঁধল। যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভাবে ছুটে পালিয়ে গেল আরেক দিকে।

পরদিন সকালে হরিকে দেখা গেল না। বরাবর সে-ই সকলের আগে ওঠে, ধোয়া-মোছা, ঝাড়-পোঁছ সারে, রান্নাঘরের কাজও খানিকটা এগিয়ে রেখে দেয়। রমা যখন ওঠে, তখন উনুনে চায়ের জল ফুটছে। কদিন থেকে চায়ের পাট বন্ধ। তাই অত সকালে আঁচ দিতে নিষেধ করে দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য কাজগুলোও তো পড়ে আছে। রমা প্রথমে মনে করল, হয়তো ধারে-কাছে কোথাও গেছে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও যখন এল না, তখন বিজয়েশকে ডেকে তুলল। সেও খানিকক্ষণ নিষ্ফল ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজি করে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখল, টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজে চাপা দেওয়া আছে। বড় বড় আঁকা-বাঁকা কাঁচা অক্ষরে পেনসিলে লেখা। খানিকটা চেষ্টার পর পাঠোদ্ধার করা গেল। দাঁড়ি-কমা যোগ করলে এই রকমটা দাঁড়ায়ঃ

বাবু টাকা আমি চুরি করিয়াছি। আপনি বাইরে জাইবার পর দেশের চিটি পাইলাম। পনচাশ টাকা পাঠাও। না হইলে সব্বনাস হইবে। মাথাটা গোলমাল হইয়া গেল !

বাবু, আপনি জখন সনদে করিলেন, আমি চোর, আমাকে পুলিসে না দিয়া এত বড় সাচাতি দিলেন কেন? দাদুভায়ের দুধটুকু বন্ধ করলেন। তারপর এ মুখ দেখাই কেমনে? টাকাটা আমি পাঠাই নাই। আমার বাকসের মধ্যে আছে। —হরিচরণ।

সিঁড়ির পাশে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে হরিচরণ থাকত। সামান্য জিনিসপত্র, যেমন ছিল, তেমনি পড়ে আছে। এককোণে ফেলে রাখা ভাঙা টিনের বাক্সের ডালা খুলতেই পাওয়া গেল কাগজে জড়ানো পাঁচখানা নোট। সাদা কাগজ নয়, একখানা চিঠি। পড়ে দেখা গেল কোন এক মনসাতলা থেকে কে একজন পতিত-পাবন রায় জানাচ্ছেন—

শুভাশীর্বাদপূর্বক সমাচার এই, তোমার মনিবের নিকট হইতে আগাম বেতন লইয়া যে টাকা পাঠাইয়াছ তাহা তোমার স্ত্রীর হাতে দিয়াছি। এদিকে এক নূতন বিপদ উপস্থিত। যে মহাজনের নিকট তোমার বসত-বাটী বন্ধক ছিল, সে আদালতে নালিশ করিয়া তোমার বিরুদ্ধে ডিক্রি পাইয়াছে। অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা পাইলে আপাততঃ দখল লওয়া বন্ধ রাখিতে পারে। টাকাটা পত্রপাঠ পাঠাইবে। নতুবা পুত্র-কন্যা সহ তোমার স্ত্রীকে গাছতলায় আশ্রয় লইতে হইবে। তোমার মেয়েটির অবস্থাও ভাল নহে। জ্ঞাতার্থে লিখিলাম।

মনসাতলা ছাড়া চিঠিতে আর কোনো ঠিকানা নেই। হরির পুরো ঠিকানা রমা ও বিজয়েশের জানা ছিল না। মেদিনীপুরের কোথায় যেন তার বাড়ি, এইটুকুই শুনেছিল।

দুদিন পরে ওদের ডাক-বাক্সে আর একখানা চিঠি পাওয়া গেল। পোস্টকার্ড। ডাকঘরের সীলটা পড়া যায় না। মনসাতলা থেকে একই লেখকের লেখা। তার থেকে জানা গেল, মহাজনের লোক এসে বাড়িটার পুরো দখল নিয়ে নিয়েছে এবং হরির স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আপাততঃ আশ্রয় পেয়েছে গ্রামের মোড়ল বিধু হালদারের ঢেঁকিশালায়। আর একটা খবর ছিল শেষের দিকে—রুগ্না মেয়েটি মারা গেছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিল্লী থেকে ফিরছিলাম। গোটা দুই চালের আড়ৎ রয়েছে কোলকাতায়। তখন কন্ট্রোলের যুগ। তারই সুযোগে ওগুলোকে একটু বাড়িয়ে তোলা যায় কি না, সেই চেষ্টায় ছিলাম। তার জন্যেই মাঝে মাঝে রাজধানীতে ধরনা দেবার প্রয়োজন হত। যাবার সময় যেমন ভারী পকেটে গিয়েছিলাম, তেমনি হাত ভরে নিয়ে ফিরছি। উদ্দেশ্য সফল, সুতরাং মনও প্রফুল্ল।

মার কাছে শুনেছি, যখন শিশু ছিলাম আমাকে ঘুম পাড়াতে হলে একজন কাউকে দোলার পাশে দাঁড়িয়ে "হেঁইও" "হেঁইও" করে ক্রমাগত দোল দিতে হত। দোল থামলে ঘুমও উধাও। সেই অভ্যাসটা বোধ হয় বুড়ো বয়সেও রয়ে গেছে। ট্রেন যত জোরে চলে আমার ঘুমও তত গাঢ় হয়, স্টেশনে এলেই নাক

ডাকা থেমে যায়। তখন গভীর রাত। একটা কোন স্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, নড়বার নাম নেই। ঘুমের অপেক্ষায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম। ছোট স্টেশন। টিম টিম করছে কেরোসিনের আলো। দরজার সামনে দিয়ে একটি বাবু যাচ্ছিলেন। হাতে একচক্ষু-লণ্ঠন ঝুলতে দেখে বুঝলাম, রেলের লোক। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, সামনে কোথায় অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পড়ে গেছে লাইন থেকে। তাকে টেনে তুলে আমাদের গাড়ির পথ করে দিতে সময় লাগবে। কত সময়, জিজ্ঞাসা করতে, হাতে একটা হতাশার ভঙ্গি করে জানালেন, কি জানি মশাই? দু'ঘণ্টায় হয়ে যেতে পারে, আবার চব্বিশ ঘণ্টাও লাগতে পারে।

—গাড়িটা পড়ল কেমন করে?

উত্তর দিলেন আমার মাথার উপরে অর্থাৎ আপার বার্থের সহযাত্রী, 'যেমন করে পড়ে। ফিস্-প্লেটের ফিসী ব্যাপার।'

উঁকি মেরে দেখলাম, যা সন্দেহ করেছিলাম, তা নয়। ভদ্রলোক শিবরাম চক্রবর্তী নন। তাঁর কোনো চেলা হবেন হয়তো।

ডিরেলমেণ্টের খবরটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। আজকাল হলে করত না। ওটা তো প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন-যাত্রীর কলরবে গোটা প্ল্যাটফরম জেগে উঠল। সকলের মুখেই 'অ্যাকসিডেণ্ট-এর উত্তেজনা। তখন আমরা সবে স্বাধীনতা পেয়েছি। তার উত্তাপে জনতার রক্তস্রোত আজকের মত তেতে ওঠেনি। তাই পঞ্চাশ মাইল দূরে কোথাকার কোন এঞ্জিনের ড্রাইভার কি করেছে না করেছে, তার জন্যে আমাদের এঞ্জিন ড্রাইভারকে প্রাণ দিতে হল না। স্টেশনমাস্টার এবং তাঁর স্টাফও অক্ষত দেহে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। স্টেশন-ঘরের কাচের জানালা অটুট রইল। ভোরবেলা পুরির দোকানে একটা ছোটখাট হামলা ছাড়া জনচাঞ্চল্যের আর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

গাড়ি ছাড়ল পরদিন বিকালের দিকে। রাত্রে ভাল ঘুম হল না। সকালে একটু বেলায় উঠে দেখি ব্যাণ্ডেলে পেঁছে গেছি। গরম চা আনিয়ে নিলাম এবং সেই সঙ্গে একখানা টাটকা বাংলা কাগজ। মিনিট কয়েক উলটে পালটে এক জায়গায় আসতেই যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে মাথাটা ঝিম ধরে গেল। মনে হল, দেহের রক্তস্রোত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। একটি 'শোক সংবাদ"। তিনটি মাত্র লাইন—"১৩ নম্বর বংশী হালদার লেন, হাটখোলা নিবাসী প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী শ্রীগোলকচন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে এলাহাবাদ স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিতে গিয়া অকস্মাৎ পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন! আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।"

আমারই নাম গোলকচন্দ্র সান্যাল। ঠিকানা নির্ভুল। চাউলের ব্যবসা করি, সেটাও সত্যি। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে পথ ধরে হয়েছি সেটা ঠিক সাদা পথ নয়, বরং কিঞ্চিৎ মসীলিপ্ত। হয়তো ঐ সদ্গতি কামনার মধ্যে সেই ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

আমাদের পাড়ার রিটায়ার্ড জজ সদাশিববাবুর সেদিনকার কথাটা মনে পড়ল। কাগজ পড়তে পড়তে বলছিলেন, আজকাল obituaryর কি রকম ছড়াছড়ি পড়ে গেছে, দেখেছেন। জানাশুনো, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তো গেলেন দেখছি। ভয়ে ভয়ে কোনদিন সকালের কাগজ খুলেই দেখব আমার খবরটাও বেরিয়ে গেছে।

শুনে খুব হেসেছিলাম আমরা। আজ আর হাসি এল না, কেমন যেন গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো ? বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের যুগ। অত্যাশ্চর্য ঘটন বা অঘটন রোজই কিছু না কিছু ঘটছে। হয়তো এও তেমন কিছু। আর কিছু না হোক, কোনো বিদীর্ণ এ্যাটম কিংবা হাইড্রোজেন বোমার উড়ন্ত তেজস্ক্রিয় ভস্মের কারসাজি। তারই প্রভাবে অজ্ঞাতে অদৃশ্যভাবে আমার দেহযন্ত্রে কোনো আভ্যন্তরীণ **metamorphism** ঘটে গিয়ে থাকবে, অন্ততঃ কোনো মারাত্মক **metabolism**, যার নাম মৃত্যু। কাল সারারাত ধরে ঐ রেলওয়ে অ্যাকসিডেণ্টের কথাই ভাবছিলাম। কত লোক মরেছে, কি ভাবে মরেছে, সেই দুশ্চিন্তা অনেকক্ষণ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি। হয়তো সেই সময়ে দেহান্তর হয়ে গেছে, আমি জানতে পারিনি।

এই যে আমি শ্রীগোপালচন্দ্র সান্যাল দিল্লী-হাওড়া এক্স্প্রেসের একখানা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এ হয়তো ঠিক কালকের "আমি" নই। নাড়ী দেখলাম ; ঠিক আছে। নিঃশ্বাস ; তাও বইছে ! হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ; লাগছে। গাড়ির ওধারটায় রোদ এসে পড়েছিল। উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ ; ছায়াও পড়েছে। তবে ?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার, বলুন তো ? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে।

বসে পড়ে বললাম, না, না, ও কিছু না। অন্য লোককে কেমন করে বলি আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই খবর ?

ছেলেবেলায় একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটার নাম মনে নেই। তাজ্জব ঘটনা। কে এক যাদব চক্রবর্তী, লোকটা বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল, তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বলে, আরে, এই তো আমি বেঁচে আছি, কেউ তা মানতে চায় না। আমারও কি সেই দশা হবে ? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। এই সেদিন পাড়ার ছোঁড়াগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে একশ' টাকা নিয়ে গেল। গৃহিণীর গা ভরা গয়না, ছেলেদের পরনে দামী শার্ট, ট্রাউজারস্, মোটা হাতখরচ, মেয়েদের নিত্য নতুন শাড়ি, রং বেরংএর হ্যাণ্ডব্যাগ। ধর্ম কর্মও যথারীতি করে থাকি। মাসে মাসে কালীঘাটে পুজো পাঠাতে ভুল হয় না। ওপাড়ার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকি, সেদিন খোলের দাম বাবদ থোক পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। না, আমি যাদব চক্রবর্তী হতে রাজী নই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো

চক্রান্ত আছে। কাগজওয়ালাদের চেপে ধরলে বেরিয়ে যাবে। কোত্থেকে কোন সূত্রে কেমন করে এ খবরটা ছাপা হল, কোন মতলব আছে এর পেছনে, সব আমাকে বের করতে হবে। যারা এর মধ্যে আছে, সেই লোকগুলোকে সহজে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দরকার হলে একটা ড্যামেজ সুট—।

তার আগে একবার খোঁজ খবর নেওয়া যাক।

হাওড়ায় পৌঁছে বাড়ি না গিয়ে, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সেই খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে উঠলাম।

একটা প্রকাণ্ড টেবিল! পুরনো বনাতে মোড়া; জায়গায় জায়গায় কালির দাগ, মাঝে মাঝে ছেঁড়া। তার উপরে একরাশ কাগজ-পত্র এলোমেলো ছড়ানো। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, পিন কুশান, গঁদের শিশি, কাগজ-চাপা, তলানি-সমেত চায়ের পেয়ালা, তার মধ্যে পোড়া সিগারেটের টুকরো? একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক মাথা নীচু করে এক মনে ঝড়ের মত কলম চালিয়ে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উসকো খুসকো, চোখে পুরু কাচের চশমা। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতে দুটো রাতজাগা লালচে চোখ এক পলক উপরের দিকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, আপনিই কি সম্পাদক?

—সহকারী সম্পাদক, লিখতে লিখতেই উত্তর এল।

এসব গাঁজাখুরি খবর কোত্থেকে আমদানি করেছেন, জানতে পারি?·· বলে হাতের কাগজখানা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

এবার তিনি মাথা তুলে তাকালেন। কিন্তু মুখ খুললেন না। কপালের উপর কয়েকটা প্রশ্নসূচক রেখা ফুটে উঠল। ভূমিকা না বাড়িয়ে সোজাসুজি ব্যাপারটা খুলে বললাম। কিন্তু শুনে এবং কাগজের রিপোর্টটা পড়ে সহকারী সম্পাদক কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। আবার সেই লেখার উপরে ঝুঁকে পড়ে বললেন, একটা প্রতিবাদ পত্র রেখে যেতে পারেন। যথারীতি **verification**-এর পর—

মাঝপথেই বাধা দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, রেখে দিন আপনার প্রতিবাদ পত্র আর **verification**-এ খবর মিথ্যে। আমি আপনার মুখের উপর দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলছি। আপনারা যার মৃত্যু সংবাদ ছাপিয়ে বসে আছেন, আমি সেই গোলক সান্যাল। জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ—অতিশয় শান্তভাবে মিহি গলায় বললেন ভদ্রলোক।

—মানে?

—মানে, প্রথমতঃ আপনার এই **statement** আমাদের ওখানকার **correspondent**-কে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ লোকাল **source**-এ অর্থাৎ এখানে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানেও খবর নিতে হবে। তৃতীয়তঃ—

থাক আর তৃতীয়তে দরকার নেই। আপনাদের সেই **correspondent**, মানে এই 'নিজস্ব সংবাদদাতা'র নাম-ঠিকানা দিন। বোঝাপড়া ওখানেই করে নেবো।

সহকারী মহাশয় স্বরটা আরো মিহি করে জানালেন, আজ্ঞে, সংবাদদাতার নাম-ঠিকানা আমরা প্রকাশ করি না।

—কেন ?

—সেটা সাংবাদিক রীতি নয়।

—বুঝেছি। ওসব সংবাদদাতা-ফাতা সব ভুয়ো। এই আজগুবি খবরগুলো নিশ্চয়ই এই 'নিজস্ব' বনাত-ছেঁড়া টেবিলে বসে তৈরী হয়। কিন্তু আপনি ভুল করছেন। আমার নাম গোলক সান্যাল ; তিন পুরুষ ধরে চাল বেচে খাই। ক'টা ধানে ক'টা চাল শিগ্গিরই টের পাবেন। একটা কাগজ হাতে আছে বলে যখন যাকে খুশি সাবাড় করে দেবেন, মানুষের জীবন নিয়ে চোরা কারবার-এ ব্যবসা বেশিদিন চলবে না। আপনার ঐ সংবাদদাতা থেকে সম্পাদক সবগুলোকে আমি গেঁথে তুলবো!…

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, যাকে উদ্দেশ্য করে এই অবিরাম বর্ষণ করে চলেছি, সে লোকটার মাথা, মুখ, চোখ, কান, মায় হৃদপিণ্ডটাও বোধ হয় পাথরের তৈরী। দম নেবার জন্যে এক সেকেণ্ড থামতেই আবার সেই চিঁচিঁ আওয়াজ কানে এল, **Have you finished** ? মানে, আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে ? তাহলে এবার আসতে পারেন। নমস্কার।

—আচ্ছা। বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ির মুখে হঠাৎ নজরে পড়ল একজন পিয়নগোছের লোক পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে। ফিরে তাকাতেই হাত বাড়িয়ে বসল, আপনার কাগজ।

চলন্ত ট্রেনের হাওয়া লেগে মাথাটা কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হবার পর মনে হল, একটু বোধ হয় বাড়াবাড়ি করে ফেললাম। কিন্তু তীর বেগে গাড়ি ছুটেছে। সামনে বর্ধমান। ফিরে যাওয়াটা যেন নিজের হাতে নিজেরই অপমান। অল্প বয়সে প্রচুর সম্পত্তি রেখে বাপ মারা গেছেন। মা এবং ঠাকুরমার অতিরিক্ত আদরে মানুষ। তাই রাগটাও একটু অতিরিক্ত।

এলাহাবাদে গিয়ে বুঝলাম, তখন ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, আসলে তা মোটেই নয়। অতবড় শহরে একটা সামান্য বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দা পুলিসের পক্ষেও রীতিমত কঠিন। কিন্তু এসে যখন পড়েছি কিছু একটা না করে ফিরি কোন মুখে ? একদিন এপাড়া আর একদিন ওপাড়া ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। কাগজটার নামই কেউ জানে না। এমনি করে কেটে গেল ছ'-সাত দিন। এদিকে শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে আসছে। ফিরে যাব মনে করে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি একজন চশমাপরা খদ্দরধারী সাইকেলওয়ালা ছোকরা হকারের কাছ থেকে কোলকাতার কাগজগুলো বুঝে নিচ্ছে। চেপে ধরলাম তাকে —আপনিই কি অমুক কাগজের রিপোর্টার, **I mean** নিজস্ব সংবাদদাতা ?

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, কেন বলুন তো ?

বুঝলাম, মেজাজ দেখালে হবে না, নরম পথ ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, বিদেশী লোক। বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই। আপনিই তাহলে—

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার correspondent, বলুন কি করতে হবে।

—ওঃ, বাঁচালেন মশাই। এই খবরটা দেখুন। গোলক সান্যাল আমার বড় ভাই। উনি কি করে মারা গেলেন, মৃতদেহের কি ব্যবস্থা হল, কোনো হদিসই যোগাড় করতে পারছি না। এদিকে আমার বৌদিদি একেবারে অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছেন।

—সব খবর তো আমি আপনাকে দিতে পারবো না। রেল পুলিসে খোঁজ করুন। ওরাই bodyর ভার নেয়। ময়না তদন্তও হয়েছিল জানি। নাম ধাম আমি ওদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। শুধু কাগজ নয়, পুলিসও আছে এর মধ্যে। রিপোর্টার ছেড়ে এবার রেল পুলিসের অফিসে হানা দিলাম। আমার দিকে চেয়েই দারোগাবাবুর চোখ দুটো কেন জানি না সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা গোটা সিগারেট শেষ করে বললেন, আপ্ কোন্ হ্যায় ?

বললাম, আজ্ঞে, সেটা তো আগেই বলেছি। আমি ওঁর ছোট ভাই।

—এক বাড়িতে থাকেন ?'

—হ্যাঁ ; এক বাড়িতে বৈ কি ? নিজের ভাই।

—তার পাননি ?

—কিসের তার ?

—ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সব খবর আমি জানিয়ে দিয়েছি।

চমকে উঠলাম—কোথায় জানিয়ে দিয়েছেন !

—কেন আপনাদের কোলকাতার ঠিকানায়।

স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, করেছেন কি !

—অন্যায় কি হল ! এ তো আমার ডিউটি।

—ডিউটি না ছাই। আপনি জানেন না সেখানে কী কাণ্ড হচ্ছে ! যা এড়াতে চাইলাম—উঃ ! এখন কী করি বলুন তো ?

পুলিসী সন্দেহ গাঢ়তর হল। হবারই কথা। দারোগা আরো কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি ?

—কী হবে আপনার নাম জেনে ?

—বলুন না, নতুন আলাপ হল।

—নাম শুনবেন ? আমিই সেই গোলক সান্যাল, যাকে আপনারা মরা বানিয়ে শান্ত হননি, মরার খবরটা আবার ঘটা করে আমার বাড়িতে জানিয়ে বসে আছেন।

উঠে পড়েছিলাম। দারোগাবাবু হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান ; এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায় ? উঁহুঃ, এটা তাহলে সাধারণ অ্যাকসিডেণ্ট নয়। রীতিমত mysterious !

এই, কৌন হ্যায় ?

হাঁক শুনে একজন সিপাই ছুটে এল। দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, ইসকো লক্ আপ মে লে যাও।

আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, কিছু মনে করবেন না। নমস্তে।

এ কি ফ্যাসাদে পড়লাম ! সব রাগ গিয়ে পড়ল নিজের উপর। না হয় ছেপে ছিল একটা মৃত্যু-সংবাদ। সত্যি সত্যি তো আর মরিনি। শুধু কাগজে কলমে মরা। কী ক্ষতি ছিল তাতে ? আর এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দু'রাত ধরে মশা আর ছারপোকায় ভাগাভাগি করে যে রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত ঘর থেকে জ্যান্ত ফিরে যাব সে ভরসা আর নেই। দুটো দিন পেটেও কিছু পড়েনি। দারোগাবাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেননি। তাঁর দোষ নেই, দোষ আমারই ; সেটা মুখে তুলতে পারিনি। ছেঁড়া কম্বলের উপর অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। একটি পুলিস এসে বলল, আমাকে এবার জেলে যেতে হবে। যেখানে হোক, যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। বললাম, বেশ, চল। জেলেই চল।

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত কড়া, কোমরে মোটা দড়ি। তারই একটা দিকে পুলিসের হাতে। মাথার উপর কড়া রোদ। দু'ধার দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত বার করে হাসছে ! কানে আসছে তাদের প্রকাশ্য মন্তব্য—"চোট্টা হ্যায়" "নেহি ; পাক্কা পকেটমার।" "ডাকাতি কিয়া হোগা" ঃ "দেখো না, বুড্ঢা হো গিয়া, তব্ ভি কেৎনা বড়ি ছাতি।"

পাশ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি চলে যাচ্ছিল। পেছনের সীটে যে ভদ্রলোক বসে, মনে হল যেন চেনা মুখ। তিনিও ঝুঁকে পড়ে তাকালেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তাঁর চোখ এড়ানো গেল না। চেনা গলা—"এই, রোখো, রোখো।"

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন—বেপার কি সানিয়েল বাবু !

আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু বংশীপ্রসাদ। ইষ্টার্ন রেলের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি করেন। কথা বলবার মত অবস্থা আমার নয়। ছেলে-মানুষের মত শুধু চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

জেলে আর যেতে হল না। বংশীপ্রসাদের অনুরোধে পুলিসের সিপাই রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি মোটর নিয়ে ছুটলেন থানায়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দারোগাটিকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর সকলে মিলে থানায় ফিরে এলাম এবং একটু সামলে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা খুলে বললাম।

বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সিটা গলির মধ্যে মোড় নিতেই কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই, মনটা বিষিয়ে উঠল। তারপর ভাবলাম, ভুল শুনেছি ; অন্য কোনো বাড়ি হবে।

সে ভুল ভাঙল গেটের সামনে এসে। এ কি ! এত লোকজন কিসের !

দু'ধারে কলাগাছ ; আগাগোড়া সমস্ত গেটটা সাদা ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম, একেবারে রাজসূয় কাণ্ড ! সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি চাঁদোয়া। তার তলায় কীর্তনের আসর। ওদিকে আর একটা শেডের নীচে মেহগিনির খাট, তার উপরে দামী বিছানা, পাশে একরাশ আসবাবপত্র, চৌকি আসন, বাসনের স্তূপ, ছাতা, জুতো, কার্পেট আরো কত কি ! হঠাৎ চোখে পড়ল তারই মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান। মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে আমাদের কুল-পুরোহিত বিধু ভট্চাজ।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ভট্চাজ মশাই তার হাতে এক কুশী জল ধরিয়ে দিয়ে বলছেন, ভয় নেই; নিশ্চয়ই কোনোখানে কোনো গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার আত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল নাও, বল···

পুরোহিত কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। আমি সেই সুযোগে অন্দরে ঢুকলাম। সেখানকার অবস্থা গুরুতর। হলঘরের মেঝের উপর গৃহিণী পড়ে আছেন। পুরোপুরি বিধবার বেশ। পাড়ার কয়েকজন মেয়ে তাঁর মাথায় জল ঢালছে।

এমন সময়ে কে এসে খবর দিল পুলিসের কোন সাহেব এসেছেন দেখা করতে। বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

—কি চাই বলুন ?

—আপনি মিস্টার স্যানাল ?

—তাই তো জানতাম। কিন্তু চারদিকে যা দেখছি—

—আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর ছাপা হয়েছিল, তাব জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কাগজে কাগজে Contradiction পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।

—তা তো করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

পুলিসসাহেব একখানা নাম-ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, এটা আপনার কার্ড ?

—হ্যাঁ। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন ?

—বাইশ তারিখে ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস থেকে একজন লোক এলাহাবাদে নামতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মাণিব্যাগে কার্ডখানা ছিল। আপনি কি কাউকে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আরও আপ্এ কোন একটা স্টেশনে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার গাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। ঠিকানা চাইতে আমি তাঁকে আমার একটা কার্ড দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে। আহা ! লোকটা মারা গেছে !

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন ?

পুলিসসাহেব মাথা নীচু করে রইলেন, জবাব দিলেন না। বললাম, ভুলটা ধরা পড়ল কি করে?

—ময়না তদন্তে। রিপোর্ট পড়ে মনে হল, চেহারার যে বর্ণনা রয়েছে, **wheat-eating belt**-এর বাইরে, মানে, মাপ করবেন, বিশেষ করে ভাত খেকো বাঙালীর ওরকমটা অসম্ভব। **Further enquiry** চালাতে বললাম। তাতে আপনিই অনেকটা সাহায্য করেছেন। ঐ সময় **G. R. P.**-তে গিয়ে না পড়লে—

—এখনো পৈতৃক প্রাণটা ফিরে পেতাম কি না বলা যায় না। ত্রুটি আমারই। আর ক'টা দিন আগে যদি যেতাম, নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না, অনেকগুলো টাকার শ্রাদ্ধও এড়ানো যেত।

দৃষ্টি

রজত ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা, এবার পড় তো, কি লিখলে।

সীমা হাতের খাতাটা থেকে পড়ে যেতে লাগল—"· ·কিন্তু আমাদের একটা মস্ত সুবিধে আছে, অনুপম, যা তোমাদের, অর্থাৎ যারা চক্ষুষ্মান, তাদের নেই। তোমরা যা দেখ, তাই দেখ। সৃষ্টি করতে পার না। করতে গেলে ঐ চোখ দুটো বাধা দেয়। আমরা সে বাধা থেকে মুক্ত। মনের আনন্দে খোদার উপর খোদকারি করে যাই। যা আছে, তাকে নস্যাৎ করে দিই, যা নেই, তা গড়ে তুলি। চক্ষু হারাবার ফলে আমরা দিব্যচক্ষুর অধিকারী। আমরা কবি এবং স্রষ্টা।"

বলে, হেসে উঠল রত্নেশ্বর। অনুপম সে হাসিতে যোগ দিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অনেক বকবক করেছ। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন।"

পড়া শেষ করে সীমা রজতের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সহসা যেন ধ্যান থেকে জেগে উঠে বলল, "আজ এই পর্যন্ত থাক, কী বল?"

সীমা খাতাটা বন্ধ করে বলল, "আমি তাই বলবো, ভাবছিলাম। তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

—ও কিছু না। এখন ক'টা বাজে?

—ন'টা বেজে কুড়ি।

—তার মানে, পুরো তিন ঘণ্টা কাজ করেছি আমরা। গুড্। এই ভাবে চললে মাসখানেকের মধ্যেই বইটা শেষ করতে পারবো, মনে হচ্ছে।

—যাই, তোমার খাবার নিয়ে আসি।

—সেই সঙ্গে তোমারও। এসো না? আজ একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক।

সীমা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড কি ভেবে নিয়ে বলল, 'আজ থাক। আরেক দিন হবে।'

—আরেকদিন ? বেশ···। রজতের মুখের উপর ম্লান ছায়া গাঢ় হয়ে এল। সীমা এগিয়ে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বড় বড় চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, অমনিই রাগ হল তো ? আচ্ছা, তুমি কি জান না, এখনো আমার কত কাজ বাকী রয়ে গেছে। তোমাকে খাইয়ে, ওদিকের সব পাট চুকিয়ে—

—জানি, আমি সবই জানি, সীমা। তবু অবুঝের মত ইচ্ছে করে তুমি সব সময় আমার কাছটিতে বসে থাক।

—হাত বাড়িয়ে সীমার গণ্ড স্পর্শ করেই চমকে উঠল, এ কি, তুমি কাঁদছ !

—না, না, কাঁদবো কেন ?···হাসির সুরে বলল সীমা।

—এই যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখে জল।

—'ও তোমার চোখের ভুল।'···বলেই, সীমার মুখখানা ছাই-এর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আকস্মিক অসাবধানতায় এ কী কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে। রজত হাসল, "চোখ দুটো থাকলে তারা ভুল করত কিনা জানি না। কিন্তু আমার এই হাতখানা কখনো ভুল করে না। এই স্পর্শ দিয়েই তোমাকে আমি সর্বক্ষণ দেখতে পাই। তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা আমার চোখের উপর ভাসে।"

বলতে বলতে, স্ত্রীকে আরো কাছে টেনে নিয়ে তার ওষ্ঠে, গণ্ডে, কপালে, চিবুকে পাঁচটি আঙুলের প্রগাঢ় দৃষ্টি বুলিয়ে দিতে লাগল। সীমার বুকের ভিতরটা ভয়ে, বেদনায়, অনুশোচনায় বারবার মুচড়ে উঠল।

বিধাতা তাকে রূপ দেননি। 'অনিন্দ্যসুন্দর' দূরের কথা, লোকের চোখে সে রীতিমত অসুন্দর। কিন্তু সে কথা অন্ধ মানুষটিকে মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। বিয়ের আগে শ্বশুরের কাছে সেই প্রতিশ্রুতিই তাকে দিতে হয়েছে। স্বামী জানেন, সে অসামান্য রূপসী। তাঁর মুখ থেকে সেই কঠোর মিথ্যা তাকে অহরহ মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। প্রতিদিন কান পেতে শুনতে হয় তার কল্পিত রূপের এই দুঃসহ স্তুতিবাদ। একটি অসহায় অন্ধকে ঘিরে এই যে প্রতারণাচক্র, একদিন জেনে শুনেই তার মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে দিয়েছিল। তারপর থেকে এই অবিরাম ঘূর্ণনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু সেই কুম্ভীপাক থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নেই।

দুঃস্থ পরিবারের বড় মেয়ে। স্কুলের গন্ডী পার হয়ে কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই বাবা মারা গেলেন। ছোট ভাইটি এক ক্লাস উপরে পড়ত। দুজনের টিঁকে থাকা চলে না। সীমা বেরিয়ে এল। শুধু ভাই-এর পড়া নয় মা এবং ছোট বোনের ভরণ পোষণের ভারও হাতে তুলে নিতে হল। কোনো রকমে মাথা গুঁজবার মত একটি আস্তানা ছাড়া বাবা আর কিছু রেখে যেতে পারেননি। শুরু হল চাকরির চেষ্টা, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত দিয়ে যাওয়া। একদিন একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—'একজন অন্ধ লেখকের শ্রুতিলিখন লিখিবার জন্য পুরুষ বা নারী কর্মী আবশ্যক। বাংলা এবং ইংরেজীতে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলেই চলিবে। কিন্তু হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই।'

মাইনের অঙ্কটি মন্দ নয়। সীমা প্রলুব্ধ হল। সেই সঙ্গে খানিকটা দ্বিধাও দেখা দিল। অফিস বা স্কুল নয়, একটি অপরিচিত সংসারের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। কী ধরনের পরিবেশ, কে জানে? লেখকটিই বা কী রকম? কিন্তু তার অন্ধত্ব এবং কাজটির বৈচিত্র্য—দুয়ে মিলে বেশ খানিকটা কৌতূহলও জাগিয়ে তুলল তার মনে। তার সঙ্গে হয়তো কিঞ্চিৎ আকর্ষণ। যা কিছু নতুন, রহস্যময় এবং গতানুগতিক থেকে আলাদা, তরুণ-মনের কাছে তার একটা নিজস্ব আবেদন আছে। মনের গড়ন কিংবা স্ত্রী পুরুষ ভেদে তার তারতম্য ঘটে এই পর্যন্ত। কিন্তু সে আছে। সীমার মধ্যেও ছিল। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হল। মার অজানতেই চলে গেল দরখাস্ত, এবং কদিন পরে ইনটারভিউ বা সাক্ষাতের ডাক এসে হাজির।

মোট তিনজনকে ডাকা হয়েছিল। সব কটিই মেয়ে। রজতের বাপ বিপিন সেন প্রথমে তাদের হাতের লেখার পরীক্ষা নিলেন। অন্য দুজনের লেখায় একটা লীলায়িত ভঙ্গি থাকলেও স্পষ্টতা কম। সীমার অক্ষরগুলো ঋজু, সরল এবং মুক্তার মত সাজানো। বিপিনবাবুর খুব পছন্দ হল। ছেলেকে গিয়ে বলল, 'এ রকম গোটা গোটা, পরিষ্কার লেখা আজকাল আর চোখে পড়ে না। এখন ছেলে মেয়ে সকলেই এক একটি খুদে রবিঠাকুর। কলম ধরতে শিখেই তাঁর মত বাঁকা ছাঁদের জড়ানো অক্ষর মক্শ করতে শুরু করে। এই মেয়েটিকে দেখছি, সে রোগে পায়নি।'

একটু থেমে বললেন, 'আমাদের বেলায় এই রকম লেখাই দরকার। কম্পোজিটাররা বাপান্ত করবে না, আর প্রুফ্ রীডারের প্রাণান্ত ঘটবার সম্ভাবনা কম।

রজত জানে, বাবা শুধু সেকেলে নন, সব রকম আধুনিকতার বিরোধী। হেসে বলল, 'বেশ তো, ওকেই রেখে দিন।'

—না, তার আগে আমি তিনটেকেই তোমার কাছে নিয়ে আসি। শুধু হাতের লেখা দেখলেই তো চলবে না। কি রকম ডিক্‌টেশন নিতে পারে, তাও দেখা দরকার।

তিনটি তরুণী ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। তার সঙ্গে এল শাড়ির মৃদু খসখসু, চপ্পলের চাপা শব্দ এবং প্রসাধনের স্নিগ্ধ সৌরভ। রজত উঠে দাঁড়িয়ে, যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বলল, আমার উচিত ছিল অন্ততঃ দরজা পর্যন্ত গিয়ে আপনাদের অভ্যর্থনা করা। বিধাতা বাধ সেধেছেন। তাই এখান থেকেই নমস্কার জানাচ্ছি। আপনারা কিছু মনে করবেন না।'

পরীক্ষার্থিণীরা বোধ হয় এই ধরনের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। উত্তরে কি বলা যায় সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে উঠতে পারল না। বিপিনবাবু তাদের বাঁচিয়ে দিলেন—আহা, ওরা আবার মনে করবে কী? সব কটিই ছেলেমানুষ। তুই বস। আমি ওদের দেখছি।

সতরঞ্চির উপর তিনজনকে বসিয়ে প্রত্যেকের হাতে কাগজ, পেন্সিল দিয়ে বললেন, 'ওরা রেডি। কি লিখতে দিবি, দে। হয়ে গেলে আমি আসবো।'

রজত মিনিট কয়েক ভেবে নিয়ে, যে নতুন লেখাটা মনে মনে তৈরী হচ্ছিল, তারই কয়েকটা লাইন ডিকটেট্ করে গেল। তারপর বলল, এবার আপনারা একে একে পড়ে যান। আমার বাঁদিক থেকে শুরু করুন।

বাঁদিকে যে বসেছিল, বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে। পড়তে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল। ঠেকেও গেল কয়েকবার। মাঝখানের মেয়েটি একটু অতিরিক্ত চটপটে। সম্ভবতঃ দেখাতে চাইল, সে মোটেই ঘাবড়ায়নি। অনেকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে গড় গড় করে পড়ে গেল। তৃতীয়জন সীমা। সহজ মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে অনুচ্ছেদটি এমন ভাবে পড়ে শোনাল, যার থেকে মনে হবে, সে শুধু শ্রুতি-লিখন-লেখিকা নয়, লিখিত বস্তুর ভিতরে যে সাহিত্য-রস, তাও খানিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাছাড়া, তার গলাটিও বেশ মিষ্টি লাগল রজতের কানে!

সীমার চাকরি হয়ে গেল।

রজতের মা এই লেখিকা-নির্বাচন ব্যাপারটাকে মনে মনে পছন্দ করেননি। বিশেষ করে তাঁর সংসারের মধ্যে একটি অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের অনুপ্রবেশ তাঁর একেবারেই মনঃপূত ছিল না। কিন্তু কর্তাটি খেয়ালী প্রকৃতির লোক, তার উপরে একটু একগুঁয়ে, একবার যা ধরবেন, তার থেকে নিরস্ত করা শক্ত। ছেলেরও ঝোঁক এই দিকে। তাই প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেননি।

বছর পাঁচেক আগে দুরন্ত বসন্তরোগ যখন তাঁর জোয়ান ছেলের প্রাণটা নিতে নিতে শেষ মুহূর্তে কি ভেবে চোখ দুটো নিয়েই ক্ষান্ত হল, তারপর থেকে ওর কোনো ইচ্ছাকেই তিনি বাধা দেন না। সাহিত্যের নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। তার জন্যে রজতকে পিতার কাছে উঠতে বসতে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা কম সইতে হয়নি। মা-ও সেটাকে উৎসাহ দেননি বরং গরীবের ঘোড়া-রোগের মত একটা উৎপাত বলেই মনে করতেন। ও-সব ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়াটাকে এঁটে পিটে ধরবার জন্যে দুজনেই পীড়াপীড়ি করেছেন, যাতে করে ভবিষ্যতে একটি ভালো চাকরির পথ সুগম হয়।

চোখ যাবার পর আর সে কথা ওঠে না। তাই ছেলেকে তার খেয়াল খুশি মত চলতে দিয়েছেন। বরং ঐ নিয়েই যাতে ভুলে থাকতে পারে সেই দিকটাতেই নজর দিয়েছেন। রজতও তার মনটাকে গুটিয়ে এনে লেখার মধ্যে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছে। বাইরের পৃথিবীতে পথ না পেয়ে তার সমস্ত দৃষ্টি ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রথম যৌবনে তার রচনার মধ্যে যে চাপল্য ছিল, তার জায়গায় এসেছে গভীরতা। পাঠকের আগ্রহ বেড়েছে, এবং তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ খ্যাতি ও অর্থাগমের পথও খুলে গেছে। ফলে, বিপিনবাবুও উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

এতদিন অনুলেখনের ভার ছিল রজতের ছোট বোন মালতীর উপর। কিছু-দিন আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারে আর কেউ নেই, যাকে দিয়ে এ কাজটি নিয়মিতভাবে করানো যায়। তাই বাইরে থেকে একজন কাউকে সংগ্রহ

করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সে ব্যক্তিটি পুরুষ হবে, কি স্ত্রীলোক হবে সে সম্বন্ধে রজত কিছু বলেনি। বিপিনবাবু তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন, এমন একজন চাই, যে শুধু লেখকের মুখের কথা নকল করবে না, ঐ সঙ্গে তার মনের পালেও হাওয়া লাগাতে পারবে, যার সান্নিধ্য ও সাহচর্য দৃষ্টিহীনের অন্তরে একটি তৃতীয় নয়নের আবির্ভাব ঘটাতে সহায়তা করবে। হয়তো, সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেই তরুণের চেয়ে একটি তরুণীর দিকেই তিনি বেশী ঝোঁক দিয়ে থাকবেন। তাই অনেক প্রার্থীর ভিতর থেকে বেছে বেছে তিনটি মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এবং সীমাকে পেয়ে খুশী হয়েছিলেন। মেয়েটির রং কালো, মুখশ্রীও ভাল নয়—দুটি প্রশ্নই এখানে অবান্তর—তাছাড়া, অন্য সব দিকে সে রজতের মনোমত হবে, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

সীমার মা এই জাতীয় চাকরির ব্যাপারে প্রথমটা ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু অভাবের সংসারে সেটা বেশীক্ষণ টেঁকেনি। প্রথম ক'দিন তাকেও যখন রজতের ঘরে ঢুকে তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে ছোট্ট কাশির আওয়াজ তুলতে হত, বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠত। একটি বলিষ্ঠ সুদর্শন ভাবপ্রবণ যুবকের নির্জন সংগ! কিন্তু এ ভাব কাটিয়ে উঠতে তার বেশী দিন লাগেনি। রজতের ব্যবহার মেয়েদের সম্বন্ধে একটি সহজ সম্ভ্রমবোধ সর্বদা ফুটে উঠত। তাছাড়া, সে ভদ্র, সংযত, মার্জিত-রুচি। আশ্চর্য তার বাকশৈলী, কিন্তু তার মধ্যে শালীনতার অভাব নেই। সকলের উপরে সে অন্ধ! সব মিলিয়ে সীমার তরুণ মনে কখন যে একটি অলক্ষ্য আকর্ষণ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, সে, নিজেও বুঝতে পারেনি।

একটা বিষয়ে তার বড় লজ্জা করত, এবং অনেক দিন পর্যন্ত নিজেকে অনেক চোখ রাঙিয়েও জড়তার বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রজতের উপন্যাসে মাঝে মাঝে প্রেমের দৃশ্য থাকত। সেগুলোর বর্ণনায়, বিশেষ করে নায়ক নায়িকার সংলাপে লেখকের কণ্ঠস্বর কখনো বেদনাবিধুর, কখনো সোহাগ-গুঞ্জনে মধুময় হয়ে উঠত।

লিখতে লিখতে সীমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। কখনো কখনো সুগভীর ভাব-ভারে সে স্বর এত নীচুতে নেমে আসত, সে সীমার কান পর্যন্ত পৌঁছত না। মুখ ফুটে যে জিজ্ঞাসা করবে 'কী বললেন?' তাও কিছুতে পেরে উঠত না। অথচ না করেও উপায় ছিল না। লিখতে তো হবে। সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা ছিল—সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি। রজত মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে বলে উঠত, 'এবারে একবার পড়ুন তো, কেমন হল।' সীমার গলা উঠতে চাইত না, জিভ জড়িয়ে আসত। সেটা যে আরো লজ্জাকর, বুঝেও ঠিক সহজ হতে পারত না। এই দুর্বলতা এত সুস্পষ্ট যে, রজতের কাছে গোপন থাকবার কথা নয়। সে হয়তো মনে মনে হাসত, কিন্তু মুখে কিছুই বলত না।

সীমার কাজ ছিল সাধারণতঃ দুপুর বেলা। লিখতে লিখতে চায়ের সময় হয়ে যেত। রজতের মা দুজনের মত চা এবং খাবার নিয়ে ঘরে আসতেন। সীমা কয়েকদিন আপত্তি করেছিল, তিনি শোনেননি। কিছুদিন যেতে, ছেলেকে

খাওয়াবার অর্থাৎ চা ঢেলে দিয়ে, পেয়ালা ও খাবারটা সামনে এগিয়ে দেবার কাজটাও তিনি সীমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সীমা সেটা খুশী মনেই গ্রহণ করেছিল। রজতও যে খুশী হয়েছে, তা তার মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, যদিও মুখে বলেছিল, 'মার কাণ্ড দেখলেন তো? আপনার ঘাড়ে আবার একটা নতুন বোঝা চাপল। আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এ রকম কথা তো ছিল না।'

—'সে ভাবনা আপনার কেন?' হালকা সুরে বলেছিল সীমা। 'বোঝাটা তো আপনি চাপাননি। ওটা আমি ওঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করে নেবো।'

রজত বোধহয় "না, না বিরক্ত হব কেন?"—এই জাতীয় একটা সাধারণ সৌজন্য-সূচক উত্তর ছাড়া আর কিছু আশা করেনি। তাই নির্বাক বিস্ময়ে দৃষ্টিহীন চোখদুটি তুলে ধরে থাকবে। সীমা তাড়া দিয়ে বলেছিল, কই, নিন: চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—ও, আচ্ছা, বলে তাড়াতাড়ি খাবারে হাত দিয়েছিল! তার মুখের সেই আনন্দময় ঔজ্জ্বল্যটুকু সীমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

একদিন ঐ বৈকালিক খাবার-টেবিলে রজতের হাতের ধাক্কা লেগে চায়ের কাপটা হঠাৎ উলটে গেল। খানিকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল তার নিজের জামার উপর। লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, এই দেখুন, কি বিভ্রাট বাধিয়ে বসলাম।

সীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, কিচ্ছু বিভ্রাট বাধাননি। আপনি একটু উঠুন তো, আমি জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

—উঠবো? বলে, দাঁড়াতেই সীমা তার বাহু ধরে ধীরে ধীরে টেবিলের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল এবং পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে বলল, হাত দুটো একটু তুলুন। কোথাও জ্বালা করছে না তো?

—না।

—এক মিনিট দাঁড়ান। আমি মাসীমাকে বলে আর একটা জামা নিয়ে আসছি।

—জামা থাক। এই গেঞ্জিতেই চলবে। আপনি বরং আমাকে একটু বারান্দায় নিয়ে চলুন। জানেন, একদিন ঐখানে বসে আমি সূর্যাস্ত দেখতাম। সেই বদভ্যাসের নেশাটা এখনো যায়নি।

বলে, একটু হাসল। সীমার মনে হল, সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। ধীরে ধীরে হাত ধরে নিয়ে বারান্দার কোণে একটা মোড়ার উপর বসিয়ে দিল। রজত বলল, ব্যস, এইবার আপনার ছুটি। বোধহয় অনেক দেরি করিয়ে দিলাম।

সীমা একথার কোন জবাব দিল না। সঙ্গে সঙ্গে চলেও গেল না। আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়ে রইল। রজত আর কোনো কথা বলল না। আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেল। পার্শ্ববর্তিনীর এই নীরব সান্নিধ্যটুকু হয়তো তার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

আরেকদিন সন্ধ্যার মুখে সীমা খাতাটা রেখে উঠতে যাবে, রজত বলে উঠল,

বাড়িতে কি আপনার খুব কাজ আছে ?

—না, এখন আর কী কাজ ?

—তাহলে, আর একটু বসুন। আপনি খুব ভাল পড়তে পারেন। একটু রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনাবেন ? ঐ আলমারিতে চয়নিকা আছে।

সীমা উঠে গিয়ে বইখানা বের করে এনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল, কোনটা পড়বো ?

—'দুঃসময়।' 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা।' এক কাজ করুন ; চেয়ারটা টেনে আমার কাছে এসে বসুন। আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে পড়বেন, কবির ভাষায় 'মন্দ মন্থর'। সন্ধ্যাকাল কি না ?

কবি তাঁর 'সন্ধ্যা' কবিতায় বলেছেন,—'ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন, নত কর শির। দিবা হল সমাপন'।

দু'তিনটি কবিতা পড়ে শোনানো হলে রজত বলল, থাক, আর আপনাকে আটকে রাখবো না। কী আনন্দ যে দিলেন! আপনার গলাটি ভারী সুন্দর।

সীমার হাত ধরে বিছানায় যেতে যেতে বলল, আমি জানি আপনি দেখতেও খুব সুন্দর।

সীমা শিউরে উঠল, 'কে বললে আপনাকে !'

—বলবে আবার কে ? আমি আপনার এই হাতখানা ধরেই বুঝতে পারি ! ছেলেবেলায় সংস্কৃত বইতে পড়েননি ? রাজা কর্ণেন পশ্যাতি। তেমনি যার দৃষ্টি নেই, সে স্পর্শেন পশ্যাতি। এই যে আমি আপনার আঙুল ক'টি ছুঁয়ে আছি, তার থেকেই আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—'না, না, আপনি ভুল করেছেন। আমি একেবারেই সুন্দর নই।'··· ভীত, ত্রস্ত কণ্ঠে এই কথা ক'টি বলতে বলতে সীমা যেন পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিপিনবাবু কি একটা কাজে ছেলের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। সীমার কথাগুলো তাঁর কানে গেল। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সরে গেলেন। ভাবতে ভাবতে গেলেন, এ মেয়েটিকে যখন নির্বাচন করেন, এদিকটা তো তার মনে হয়নি। উল্টোটাই ভেবেছিলেন—চেহারাটা এখানে বিবেচনার বিষয় নয়, অন্ধের কাছে রূপের মূল্য কী ? থাকা না থাকা সমার্থ। এই মুহূর্তে বুঝলেন, তিনি ভুল করেছেন। সুন্দর কে না চায় ? রূপ-তৃষ্ণা যে মানুষের রক্তজ ধর্ম। দৃষ্টির অভাব তাকে কেড়ে নেবে কেমন করে ? চোখের আলো নিভে গেছে বলে আকাঙ্ক্ষার আগুন তো নেভেনি। অনুভূতির ধারগুলো বরং তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তার কাছে পাওয়ার আনন্দ যেমন প্রবল, না পাওয়ার নৈরাশ্য তেমনি গভীর।

পরদিন সীমা যখন বাড়ি ফিরছিল, বিপিনবাবু তাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। দু-একটা কুশল প্রশ্নের পরে বললেন, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, মা।

সীমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মাথা নত করে বলল, অনুরোধ কী বলছেন,

মেসোমশাই ! যখন যা দরকার, আপনি আমাকে হুকুম করবেন।

—না, মা ! এটা ঠিক সে ধরনের কথা নয়। শুনলেই বুঝতে পারবে।

সীমা অপেক্ষা করে রইল। বিপিনবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আমার এই ছেলেটা জ্ঞান হবার পর থেকেই ভয়ানক সুন্দরের ভক্ত। ঘর দোর একটু অগোছালো হলে চটে যেত। জামা কাপড় ফিট্-ফাট্ হওয়া চাই। ফুল না হলে একদিনও চলে না। এখনো, দেখছ না, রোজ এক গোছা করে রজনীগন্ধা ওর টেবিলে সাজানো থাকে। চারদিকে যে সব মানুষ থাকবে, তাদেরও সুশ্রী না হয়ে উপায় নেই। এমন কি, চাকর বাকর যদি দেখতে তেমন ভালো না হত, রাখতে চাইত না। তাই বলছিলাম—

একটু থেমে, সীমার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, তুমি তো মা অসুন্দর নও। ওর কাছে সেটুকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি ? দেখছ তো, ও তোমাকে কত ভালো চোখে দেখেছে। সে ধারণাটা নাই বা ভাঙলে।

সীমার মাথাটা আরো নুয়ে পড়ল। ক্ষীণ, সলজ্জ কণ্ঠে বলল, কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা—

—না, মা, মিথ্যা নয়। আর যদি হয়ও, সেই মিথ্যা দিয়ে ওকে তোমার ভুলিয়ে রাখতে হবে। বিধাতা যাকে বঞ্চিত করেছেন, আমরা যদি তাকে ঐটুকু সান্ত্বনা দিতে না পারি, সে বেঁচে থাকবে কিসের জোরে ?

সীমার চোখের পাতা ভিজে উঠল। বলল, আপনি আমাকে বড় কঠিন আদেশ দিলেন মেসোমশাই !

—তা হলেও সেটা তোমাকে মানতে হবে, মা।

—কিন্তু অন্য কারো মুখ থেকে যখন আমার সত্যি পরিচয়টা বেরিয়ে যাবে, তখন আমি ওর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে ?

—কেউ কিছু বলবে না। ওকে তো সকলেই চেনে। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, তোমাকে আমরা সবাই ভালবেসে ফেলেছি।

সেদিন সীমা যাকে বলেছিল 'কঠিন আদেশ' তার চেয়েও কঠিনতর 'আদেশ' তার জন্যে অপেক্ষা করছিল এবং বছর খানেক পরে সেটিকেও মেনে নিতে হল।

এবাড়িতে যেবার বসন্ত ঢোকে, তার প্রথম নজর পড়েছিল রজতের মায়ের উপর। ছেলেকে কাছে ঘেঁষতে বারবার বারণ করেছিলেন। সে শোনেনি। তিনি যখন উঠবার মুখে, রজত পড়ল, এবং শেষ পর্যন্ত চোখ দুটি বলি দিয়ে কোনো রকমে পরিত্রাণ পেল। এই নিদারুণ আঘাত সুভাষিণী কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ছেলেকে দেখতেন আর ভাবতেন এ যেন তাঁরই অপরাধের ফল। এই চিন্তা থেকেই ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ক্রমশঃ সেটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। এ সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব তখন সীমার হাতে চলে এসেছে। আপনা হতেই এসেছে। কেউ বলে বা গছিয়ে দেয়নি। এমন অনেকদিন গেছে, দুপুর বেলা এসে দেখল, রান্নার লোকটি কাজে আসেনি, গৃহিণী মাথা তুলতে পারছেন না। কর্তা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তখন অনুলেখিকাকে খাতা ফেলে হাতা ধরতে হত, ভাতের থালা সাজিয়ে ছুটতে হত লেখক-মালিকের ঘরে।

তারপর একদিন সেই ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেল। এমন অকস্মাৎ যে, অন্যকে কি করে বোঝাবে, নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। সেই দিনটি তার কোনোদিন ভুলবার নয়।

কদিন আগে থেকেই সুভাষিণীর একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল। সীমা এ বাড়ি আসতেই শুনল, তিনি বারবার তার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তখনই ছুটে গিয়ে বিছানার পাশে বসল। সুভাষিণী চোখ মেলে বললেন, এসেছ মা ? আমি সেই কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে আছি। ভাবছিলাম, কি জানি যদি দেখা না হয়।

সীমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, থাক, আপনি আর কথা বলবেন না।

—একটা কথা যে আমাকে বলতেই হবে মা। এখন না বললে হয়তো আর সময় পাবো না।

কম্পিত শীর্ণ হাতখানা সীমার হাতের উপর রেখে বললেন, আমার অন্ধ ছেলেটাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।

সীমা চমকে উঠেছিল, কিন্তু হ্যাঁ না কোনো কথাই বলতে পারেনি। হয়তো বলবার সুযোগ পায়নি। কিংবা তার অন্তরের কোনোখানে এই কঠিন বন্ধনকে স্বীকার করে নেবার জন্যে একটা আয়োজন পর্ব চলেছিল, সে জানতে পারেনি।

সীমা গুপ্তের সীমান্তে সিন্দুর উঠল। বৃদ্ধ শ্বশুর, অন্ধ স্বামী এবং দুটি কলেজগামী দেওরের ভার এসে পড়ল কাঁধের উপর ! কিন্তু যে চাকরি সূত্রে এ গৃহে তার প্রথম পদার্পণ সেটি সে ছাড়ল না। এখনো সে সাহিত্যিক রজত সেনের অনুলিপিকার। ইতোমধ্যে তার লেখক-খ্যাতি আরো বেড়েছে, সংসারেও মোটামুটি স্বচ্ছলতার অভাব নেই। শ্বশুর এতদিন যে কাজগুলো করতেন, সে সব এখন সীমাকেই করতে হয়। প্রুফ দেখা, প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া, আরো অনেক কিছু। কাজের পর কাজ দিয়ে দিন ও রাত্রির সবটুকু সময় এমন করে বেঁধে দিয়েছিল যে, নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত অবসর হয়নি। দিন কাটছিল দ্রুতবেগে। হয়তো জীবনের বাকী দিনগুলোও তেমনি করেই কেটে যেত। কিন্তু ছন্দ বদল হল। এখানেও আকস্মিকতার আবির্ভাব।

হঠাৎ একদিন এক সাংবাদিক বন্ধু এসে খবর দিল, ভিয়েনা থেকে একজন বিশ্ব-বিশ্রুত চক্ষু চিকিৎসক এসেছেন, যিনি অন্ধদের দৃষ্টিদান করতে পারেন। দূষিত বিকল চোখ ফেলে দিয়ে, সদ্যোমৃতের দেহ থেকে সংগৃহীত নিরোগ চোখ বসিয়ে দেন। সীমা উৎসাহিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই কোত্থেকে একটা কোন গোপন ভয়ের কালো ছায়া অলক্ষ্যে এগিয়ে এসে তার মুখের সমস্ত দীপ্তি ঢেকে ফেলে দিল। সে শুধু ক্ষণেকের তরে। মুহূর্তমধ্যে আবার স্বাভাবিক সত্তায় ফিরে এল। মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে—ছিঃ, ছিঃ, এসব কি ভাবছিল সে ! স্বামী চোখ ফিরে পাবেন—এর চেয়ে বড় কাম্য আর কী আছে জীবনে !

তারপর তাকে কী চোখে দেখবেন, এই ক্ষুদ্র ঘৃণ্য, স্বার্থান্ধ সংকীর্ণতা তার মনে এল কেমন করে!

বন্ধুটিকে বলল, আপনি আর দেরি করবেন না, ঠাকুরপো। যত শিগগির পারেন, ব্যবস্থা করে ফেলুন। টাকার জন্যে ভাববেন না।

—টাকা, মানে ফী তিনি নেন না। হাসপাতালে একটা কেবিন, চোখের দাম, নার্স ওষুধপত্তর—এইরকম আনুষঙ্গিক খরচা কিছু আছে। সেটা তেমন বেশী নয়। আসল কথা হল, ওকে পাওয়া। শুনেছি, উনি বেশী কেস্ নেবেন না।

—যে ক'টা নেবেন, তার মধ্যে যাতে আমরা পড়তে পারি, সেটুকু আপনাকে করে দিতেই হবে।

সাংবাদিকের তদ্বিরের জোর ছিল। অপারেশনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিপিনবাবুর এ ব্যাপারে বিশেষ আস্থা ছিল না। পুত্রবধূর আগ্রহেই এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু ব্যয়ের দিকে কোনো টানাটানি করেননি।

রজত তার এই দীর্ঘ দিনের অন্ধতাকে অন্ধ নিয়তি বলেই গ্রহণ করেছিল, এবং মনকেও সেইভাবে তৈরী করে ফেলেছিল। বিশেষ করে, সীমা যেদিন তার পাশে এসে দাঁড়াল তারপরে যেন সে ভুলতেই বসেছিল, সে অন্ধ। একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, জান সীমা, তোমাকে পেয়ে কিন্তু আমি একটা দিকে হেরেছি।

সীমা প্রথমটা চমকে উঠেছিল, কিন্তু জবাব দিয়েছিল হাসিমুখে—'কোন্ দিকে, শুনি।'

—সংখ্যার দিক। একে বলা যেতে পারে mathematical loss অর্থাৎ গাণিতিক লোকসান।

—তার মানে?

—মানে, দুটো চোখের বদলে একটা বৌ।

বলে হেসে উঠেছিল। সীমা সে হাসিতে যোগ দিতে পারেনি। বলেছিল, আমি কিন্তু জানি, তুমি সব দিকেই হেরেছ।

—কে বললে? দু বাহু বাড়িয়ে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, তোমার মধ্যে আমি সব পেয়েছি। কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা নেই।

অপারেশনের ব্যাপারটাকে রজত বিশেষ আমল দিতে চায়নি। ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলেছিল, তুমি তো আচ্ছা বোকা মেয়ে দেখছি। নিজের স্বার্থ বোঝ না?

নিজের স্বার্থ! কী একটা করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল সীমা। ভয়ে হাত পা সরতে চায়নি। রজত হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার চোখ ফিরে এলে তোমার চাকরিটি যে চলে যাবে।

সীমার বুকের কাঁপুনি তখনো থামেনি। পরক্ষণেই অবশ্য সামলে নিয়ে স্বামীর একান্ত কাছটিতে সরে এসে মৃদুস্বরে বলেছিল, চাকরি কি আমার একটা নাকি যে ভয় দেখাচ্ছ? ওসব বাজে কথা রেখে লক্ষ্মী ছেলের মত যা বলছি তাই কর দিকিন?

রজত আর কোনো আপত্তি করেনি। স্ত্রীর উদ্যম ঔৎসুক্য ও আশা তাকেও ক্রমশঃ উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

অপারেশনের পর ক'দিন কেটে গেছে। কেবিনেই রয়েছে রজত। সীমাও আছে তার সঙ্গে। বিপিনবাবু দুবেলা যাতায়াত করেন। রজতের বোন এবং ভাই দুটিও আসে যায়।

ব্যাণ্ডেজ খুলবার দিন এসে গেল। সকলের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষার দোলা। রজতও অধীর, নিয়তির শেষ রায় শুনবার জন্যে উৎকণ্ঠিত।

চোখের উপর থেকে আবরণ সমেত ডাক্তারের হাতটা সরে যেতেই চীৎকার করে উঠল, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি...সীমা...সীমা...।

ভিড় ঠেলে সীমা এসে দাঁড়াল খাটের পাশে। রজতের নবলব্ধ চোখ জুড়ে বিরক্তির ভ্রূকুটি—'আঃ! তোমাকে কে আসতে বলছে? যাও, দিদিমণিকে, মানে আমার স্ত্রীকে ডেকে দাও!'

সীমা পড়ে যাচ্ছিল। খাটের রেলিং ধরে কোনোরকমে সামলে নিল। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। একঘর লোক নির্বাক নিস্পন্দ; যেন বজ্রাঘাতে অচল হয়ে গেছে।

রজত আবার চেঁচিয়ে উঠল, কী হল! সীমা আসছে না কেন?

—সীমা এসেছিল, বাবা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন বিপিনবাবু।

—কই, কোথায়!

—এইমাত্র যে এখানে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই সীমা।

—কী বললেন! ও-ই সীমা!...না, না; এ হতে পারে না, এ কখনো হতে পারে না।...

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বেদনা-বিক্ষুব্ধ, শোকার্ত দীর্ণ কণ্ঠে এই ক'টি কথাই বারংবার আবৃত্তি করে গেল—এ হতে পারে না।

বিপিনবাবু নিঃশব্দে, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। রজতের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। ধীরে ধীরে স্তিমিত কণ্ঠে বলল, কী দরকার ছিল এ প্রতারণার?

অকস্মাৎ যেন তড়িতাঘাতে চমকে উঠলেন বিপিনবাবু। দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, ও কথা বলো না। প্রতারণা করেছি আমি, সে নয়। আমিই তাকে নিজের সম্বন্ধে নীরব থাকতে বাধ্য করেছিলাম।

—বাধ্য করেছিলেন! কেন?

—সে কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না রজত?...বলতে বলতে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

রজত আর কথা বলল না। শূন্য দৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে অচেনা পৃথিবীর দিকে চেয়ে রইল। সহসা যেন একটা নতুন আলো ঠিকরে এসে পড়ল তার চোখের উপর। চীৎকার করে ডাকল, বাবা! বিপিনবাবু ছুটে এলেন।

'সীমাকে একবার ডাকুন। এখুখনি।'

—সে চলে গেছে।

—চলে গেছে! কেন? কোথায়?

—বোধ হয় তার মায়ের কাছে।

—আমি যাবো। আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

উঠতে যাচ্ছিল। নার্স বাহু চেপে ধরল, 'কি করছেন! নড়াচড়া করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

সর্বনাশ? যে সর্বনাশ এই মাত্র হয়ে গেল, তার চেয়ে বেশী আর কি হবে? আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।

বিপিনবাবু বললেন, তার দিকে চেয়েই এদের কথা তোমাকে শুনতে হবে, রজত। যে দৃষ্টি তুমি ফিরে পেয়েছ, সে শুধু তারই জন্যে। আবার যদি হারাও সে আঘাত সে সইতে পারবে না।

—কিন্তু, এ তো আমি চাইনি, বাবা। এই ধার করা চোখ দিয়ে আমি কী করবো! এরা আমাকে যা দেখাচ্ছে সেটা মিথ্যা। আমার অন্তরের মধ্যে যে দুটি চোখ বসে আছে, তারাই আমার কাছে পরম সত্য। এই কথাটাই আমি তাকে গিয়ে বলতে চাই। আমাকে যেতেই হবে।...

বিপিনবাবু কাছে সরে এসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন সে ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও বাবা। আমি তাকে বলবো। তারপরে নিশ্চয়ই সে আর দূরে থাকতে পারবে না।

সাংবাদিক

বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। লড়াই বেধেছে দূর পশ্চিমে শাদা মানুষের দেশে। তার আগুন এসে লাগল পূর্ব-দেশের কালো মানুষের গায়। রাতারাতি উধাও হল গৃহস্থের যেটা নিত্য প্রয়োজন, চাল-চিনি-কাপড়-কেরোসিন। ঠিক উধাও নয়, খোলা বাজার থেকে জড়ো হল গিয়ে কালো বাজারে। সাধারণ কালো মানুষ তার চাবির সন্ধান জানে না।

বনগাঁ স্কুলের কনিষ্ঠ মাস্টার গণেশ পাল। বয়সে নয়, বেতনে। মাস গেলে তিরিশটি টঙ্কা। মা, বৌ আর গুটিতিনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে ওতেই কোন রকমে চলে যেত। এবার আর চলে না। আশে পাশে সকলেরই প্রায় সেই অবস্থা। সবাই ভাবছে, কী করা যায়। হঠাৎ শোনা গেল মিলিটারী আসছে। সর্বনাশ! এতদিন প্রাণ গেলেও মানটা ছিল। এবারে তাও বুঝি যায়।

দেখতে দেখতে ময়দানবের মন্ত্রবলে সারা মাঠ জুড়ে গড়ে উঠল পল্টনের পাকা ছাউনি। তৈরী হল পীচ্‌ঢালা রাস্তা। বড় বড় ট্রাকে করে দরকারী আর অদরকারী নানা পণ্যের সম্ভার এসে জড়ো হল ছোট্ট শহরের পথে ঘাটে। শুধু ভয় নয় কিঞ্চিৎ ভরসাও এল সেই সঙ্গে। যত ছিল বেকারের দল, তাস পিটে আর তামাক টেনে দিন কাটাত, আমেরিকান-কাট্ ট্রাউজারের উপর হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে ভিড় করল আফিসে, দোকানে ক্যাণ্টিনে। প্রত্যেকের পকেটে

সদ্যছাপা চকচকে নোট। গণেশের দুজন ছোকরা সহকর্মীও মাস্টারি ছেড়ে জুটে গেল সেই দলে।

স্থানীয় ইউনিটের বড়বাবু ছিলেন গণেশের কোন দূর সম্পর্কের দূরতর আত্মীয়। সেই সূত্র ধরে একদিন সে ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতজোড় করে বলল—যাহোক একটা চাকরি-টাকরি দিন, দাদা। ছেলেপিলে নিয়ে আর কতদিন উপোস করে থাকব।

—চাকরি কোথায়? ঠিকাদারি চান তো চেষ্টা করতে পারি।

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

—মাল যোগাতে পারলে টাকার জন্যে আটকাবে না। দেখুন, এর মধ্যে কোন্‌টা কোন্‌টা দিতে পারেন আপনি।···বলে একখানা টেণ্ডার ফর্ম এগিয়ে দিলেন গণেশের হাতে। গণেশ বুঝল, সুবিধা হল না। নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই ফর্মখানা নিয়ে পকেটে রাখল। তারপর কী মনে করে দু'চারটা জিনিসের পাশে যাহোক একটা দর ফেলে দু'দিন পরে দিয়ে এল বড়বাবুর সেরেস্তায়। সাতদিন না যেতেই তার নামে এক সরকারী চিঠি এসে হাজির। পড়েই মনটা বিগড়ে গেল। বড়বাবুর কাছে গিয়ে সোজা বলে দিল, এ কাজ তার দ্বারা হবে না।

দুনিয়ায় এত জিনিস থাকতে তার ঘাড়ে চাপল কিনা Ten thousand brooms of one seer each!

বড়বাবু বললেন, কি করবো, আপনার কপালে ঐ ঝ্যাঁটা ছাড়া আর কিছুই যে উঠল না। না দিতে চান তো লিখে দিন, পারবো না। কম্যাণ্ডাণ্ট্‌ সাহেবকে অ্যাড্রেস করবেন।

একখানা কাগজ দিলেন ওর হাতে। গণেশ ঐখানে বসেই লিখল—

শ্রীল শ্রীযুক্ত কম্যাণ্ডাণ্ট্‌ সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু—বহুসম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন, হুজুর বাহাদুরকে, দশ হাজার ঝাঁটা দিবার জন্য অধীনের উপর যে আদেশ হইয়াছে, তাহা পালন করিতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম বিধায়, উক্ত গুরুভার হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—।

কাগজখানা রেখে চলে যাচ্ছিল। বড়বাবু ডেকে ফেরালেন, আপনার আপত্তিটা কিসে বলুন তো? লাভের অঙ্কটা একবার ভেবে দেখেছেন?

—না, মশাই, ওরকম লাভ চাই না। লোকে বলবে ঝ্যাঁটাওয়ালা।

—বললই বা। ভট্‌চায্যি বামুন, পেশা পুরুতগিরি, পাইখানার মগ যুগিয়ে লাল হয়ে গেল, খবর রাখেন?

কথাটা শুনে একটু যেন নরম হল গণেশ পাল। বলল, তাছাড়া কোথায় পাব অত নারকেলের শলা?

—সবটা তো নারকেলের নয়, আধাআধি কাগজের।

—কাগজের মানে?

—মানে, (গলা খাটো করলেন বড়বাবু) দিতে হবে না, শুধু কাগজে উল্লেখ থাকবে। অর্থাৎ আপনার 'বিল' এ এবং আমাদের খাতায়।

গণেশ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। বড়বাবু বললেন মাস্টারি করছেন কদ্দিন ?

—বছর দশেক।

—আজ্ঞে না ; হিসেব করে দেখুন বারো বছর পেরিয়ে গেছে। তা না হলে এই সোজা কথাটা মাথায় ঢোকে না ?

বলে, একটা কি নাম ধরে ডাকলেন। একজন কেরানী এসে দাঁড়াতেই গণেশকে বললেন, যান ওর সঙ্গে ; সব বুঝিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা বুঝবার পর গণেশ প্রথমটায় বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাজার হলেও মাস্টার মানুষ। কিন্তু গরজের কাছে বিবেক আর কতক্ষণ! অনশনের কাছে হার হল আদর্শের। ঐখানে বসেই একসেরি ওজনের দশ হাজার ঝ্যাঁটার কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে ব্যবস্থা হল, অর্ধেকের বেশী দিতে হবে না। পেমেণ্ট্ হবে পুরো মালের—অবিশ্যি ভুয়ো বিল্-এর মোটা বখরা বড়বাবুর। আর একটা সুবিধা পাওয়া গেল। ওজনের ব্যাপারে যথাসম্ভব মা গঙ্গার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

নৌকা, গরুর গাড়ি আর লোকের মাথায় চড়ে যত রাজ্যের ঝ্যাঁটা এসে জড় হল গণেশের বৈঠকখানায়। ছেলেরা নাক সিটকায়, গিন্নী তো রেগেই আগুন— 'পেট চালাতে না পার ভিক্ষে কর না বাপু! এসব অলক্ষুণে কাণ্ড তো বাপের বয়সেও শুনিনি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

পাড়া পড়শীরা কেউ বলে ঝাড়ুদার, কেউ বলে ঝ্যাঁটামাস্টার। কিন্তু গণেশ পালের ওসব কথা গায়ে মাখলে চলে না। নেমে যখন গেছে, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

যে যাই বলুক, ঐ ঝ্যাঁটা থেকেই কপাল ফিরল। ঝ্যাঁটার পরে পেল ঝুড়ি, তার সঙ্গে এল ঝুড়িঝুড়ি করকরে নোটের তাড়া।

যুদ্ধ চিরস্থায়ী নয়। যেমন সহসা আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায়। তার আগে মানুষের জীবনটাকে সাড়ে বত্রিশভাজার মত দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে ওলট-পালট করে রেখে যায়। কিন্তু একটানা ধ্বংসই মহাযুদ্ধের দান নয়, তার সঙ্গে এখানে ওখানে রেখে যায় বিপুল ঐশ্বর্য। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। যার তুঙ্গে ছিলেন শনিঠাকুর, তার গলায় ঝুলিয়ে দেয় লক্ষ্মীর বরমাল্য। লক্ষ্মীর বরপুত্রের ভাগ্যস্থানে রেখে যায় শনির দৃষ্টি। কারো প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেয়, কাউকে আবার বসায় ধূলির আসন থেকে রাতারাতি প্রাসাদের চূড়ায়। গণেশ পাল সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যমন্তদের একজন। যুদ্ধ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই যখন ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল তারও কয়েক লাইন পেছনে অজ্ঞাত অন্ধকারে, গণেশ তখন সামনের লাইনে এগিয়ে গিয়ে সদর রাস্তায় বাড়ি তুলেছে তিনতলা। তার উপর একটি পাঁচ অঙ্কের বৃহৎ সংখ্যা বসে আছে ব্যাঙ্কের খাতায়, এবং নানা কারবারে যে অঙ্কটি খাটছে তার আকার আরো বড়।

বাইরে থেকে দেখতে অবশ্য গণেশ বিশেষ বদলায়নি। আধ্-ময়লা ফতুয়ার

ঝ্লটা একটু বেড়েছে। প্রো নয়, হাফ-পাঞ্জাবি ; ধুতির বহরটাও ছাঁটু ছাড়িয়ে খানিকটা নীচে নেমেছে ! বৈঠকখানায় সাবেকী আমলের জোড়া তক্তপোষ, তার উপর শীতলপাটি ; একদিকে খানকয়েক চেয়ার ; তেমন তেমন কেউ এলে সেগুলো অধিকার করেন। সবচেয়ে জমকালো ঘরের কোণে একটি কাঁচের আলমারি, তার মধ্যে দাঁড় করানো একখানি রূপো বাঁধানো ঝ্যাঁটা। রোজ সন্ধ্যায় গণেশ নিজের হাতে সেখানে ধূপ-ধুনো দেয়। আলমারির মধ্যে ঐ বস্তুটির সযত্ন অবস্থান এবং এতটা খাতির সমাদর সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলে, কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দেয়—'আজ্ঞে ঐরূপেই মালক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন।'

ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে। বাপের কাণ্ড দেখে লজ্জা পায়। বড় ছেলে তো কথাই কয় না। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে, 'বাবা, ঝ্যাঁটাটা সরিয়ে ফেল ; সবাই হাসাহাসি করে।' গণেশ জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ ! বলিস কি তোরা ! যার দৌলতে দুটো খাচ্ছিস পরছিস, তাকে হেলাফেলা করলে ধর্মে সইবে না।

মেয়ে রাগ করে চলে যায়।

টাকা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বাড়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাড়ে উমেদার আর দাবিদার। প্রথম দল নিয়ে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। হাত জোড় করে থাকে, নরম সুরে কথা বলে, আড়ালে যাই বলুক, সামান্য কিছু পেলেই কৃতার্থ হবার ভাব দেখায়। দাবিদারের সুর সব সময়েই চড়া। লম্বা চওড়া ফিরিস্তি নিয়ে যখন তখন বাড়ি চড়াও করবে।

সে সব মেটাতে গেলে দুদিনেই ফতুর ; আর না মেটালে কিংবা হাতটা একটু টান করলে শুধু মান নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

শহরে বারোয়ারী পূজার আয়োজন চলছে। রাস্তার মোড়ে বড় বড় বিজ্ঞাপন —মধ্যমপাড়া সার্বজনীন শারদোৎসব। সভা ডেকে সাড়ম্বরে গঠিত হয়েছে কমিটি। সভাপতি, উপসভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্য—ছাপানো বই-এর তিনপাতা জোড়া শুধু তাদেরই নাম। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম নামটি—শ্রীগণেশচন্দ্র পাল, পৃষ্ঠপোষক। মনে মনে খুশী হল গণেশ। সভাপতি একজন নামকরা উকিল। সদলবলে স্বয়ং এসেছেন চাঁদার খাতা নিয়ে। অনেক আদর, আপ্যায়ন খাতির যত্নের পর গণেশ হাফ-পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে সবিনয়ে এগিয়ে ধরল একখানা দশ টাকার নোট। সভাপতির চোখ উঠল কপালে। গর্জে উঠলেন, ভিক্ষে দিচ্ছেন নাকি পাল মশাই ?

—আজ্ঞে, তাহলে কত দিতে হবে ?

—এই দেখুন—খাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন সভাপতি। প্রস্তাবিত চাঁদার অংক দ'শ টাকা। পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠদেশে যেন একখণ্ড থান ইট এসে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আমি সামান্য ব্যবসাদার।' বলে, বাঁ পকেট থেকে বের করল আর একখানা পাঁচটাকার নোট। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে

বেরিয়ে গেলেন সভাপতি, এবং 'দেখে নেবো' গোছের ভঙ্গি করে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের দল।

এমনি করে আর একদিন ফিরে গেল কাত্যায়নী থিয়েট্রিকাল পার্টির ম্যানেজার মাধব কয়াল। গণেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিল পাঁচসিকে। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের মধ্যম পাণ্ডব কয়াল তার ভয়াল দন্ত প্রদর্শন করে যে ক'টি কথা বলেছিল, সেটা যে ঠিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয় নয়, বুঝতে পেরে গণেশ আরো চার আনা যোগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা আর দাঁড়ায়নি।

মেয়েদের মাইনর স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ মোহিনী দেবী একদিন দুটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ওর বৈঠকখানায় এসে হাজির। গণেশ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। কী করবে, কোথায় বসাবে ভেবে পায় না। বিশেষ চিন্তা হল, এতবড় মান্য অতিথি, না জানি কী দাবী নিয়ে এসেছেন তার বাড়িতে। একথা সেকথার পর তিনি নিজেই সেটা ব্যক্ত করলেন। স্কুলটাকে কয়েকটা ক্লাস বাড়িয়ে হাইস্কুলে দাঁড় করাতে হবে। পাল মহাশয়ের মত মহদ্ব্যক্তির আনুকূল্য না পেলে—ইত্যাদি। গণেশ ওঁদের বসতে বলে অপ্রসন্নমুখে ভিতরে চলে গেল। লোহার সিন্দুক খুলে একখানা একশ টাকার নোট পকেটে নিয়ে ফিরে এল। দুহাতে করে মোহিনী দেবীর দিকে এগিয়ে ধরতেই তিনিও দুহাত পিছিয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, একি করছেন গণেশবাবু। আমাদের এষ্টিমেট্‌ দশ হাজার টাকা। তার অর্ধেকটা অন্ততঃ আপনার কাছ থেকে নেবো বলে এসেছিলাম। এখ্‌খুনি হাতে হাতে দিতে না পারেন, লিখে দিন—বলে খাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন। গণেশ লজ্জা ও বিনয়ে গলে গিয়ে আভূমি নত হয়ে হাত জোড় করে বলল, আজ্ঞে আমি নগণ্য মানুষ, আপনার মত সম্মানীয় ব্যক্তির পরিহাসের যোগ্য নই।

এর পর থেকে পাড়ার ছেলেরা গণেশ পালের নামের আগে-পেছনে যে সব বিশেষণ যোগ করে প্রকাশ্যে প্রচার করতে লাগল, সেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে মানহানির দায়ে পড়তে হয়। সুতরাং অনুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই।

বাইরের দাবি যত, ঘরের দাবি তার চেয়ে কম নয়। গৃহিণীর হাল-চাল বিশেষ না বাড়লেও ছেলেমেয়েরা এক একটি ছোটখাট রাজপুত্তুর ও রাজকন্যা। তবু কেউ খুশী নয়, বাপের উপর সকলেই অপ্রসন্ন। যত পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পাওনা, এই তাদের মনোভাব, এবং সেটা না পাওয়াতে ক্ষোভের অন্ত নেই।

এই নির্বান্ধব সংসারে একটিমাত্র সুহৃৎ ছিল গণেশ পালের। তার পিসতুতো শ্যালক ভুজঙ্গভূষণ। এখানকার বাসিন্দা নয়, স্থায়ী আস্তানা জেলাশহরে। মাঝে মাঝে আসে। কোলকাতার এক নামজাদা কাগজের রিপোর্টার। সেই সূত্রে আসতে হয়। দুজনে খুব জমে। বয়সের অমিল অনেকখানি—ছাপান্ন এবং ছাব্বিশ। কিন্তু হৃদয়ের মিল আছে। একবার এলে গণেশ এক সপ্তাহের আগে ছাড়তে চায় না।

এবার অনেকদিন পরে এসেছে ভুজঙ্গভূষণ। বৈঠকখানায় বসে গল্পসল্প

হচ্ছিল। গণেশের হাতে একখানা দুদিন আগেকার খবরের কাগজ। তাতে বেরিয়েছে, ফিলাডেলফিয়া, না কোন্ দেশে একটি স্ত্রীলোক একসঙ্গে পাঁচটি সন্তান প্রসব করেছে; কোনটিই বেঁচে নেই। তার নিচেই আছে "এই মহকুমার কোন্ এক গ্রামে শিলাবৃষ্টির সহিত প্রচুর মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছে। বহুলোক স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ধরিতে গেলেই কিন্তু মৎস্যগুলি অন্তর্ধান করিয়াছে।"

গণেশ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দিনকাল কী রকম বদলে গেছে, দেখছ? আগে স্বর্গ থেকে হত পুষ্পবৃষ্টি, এখন পড়ে মাছ। তাও ধরতে গেলে পালায়।

ভুজঙ্গ কথা বলল না, মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। গণেশ সেদিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, কাগজে যা বেরোয় সবই কি সত্যি ঘটনা?

—কেমন করে বলি? সবই কি আমাদের সুবিধে মত ঘটে দাদা? কোনো কোনোটা ঘটাতে হয়।

—তার মানে, তোমরা বানাও। বলে, রহস্যভেদ করার ভঙ্গিতে হাসল গণেশ পাল। ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বলল, সাহিত্য মাত্রেই সৃষ্টি, অর্থাৎ খানিকটা বানানো।

—তোমরা তো আর সাহিত্যিক নও, রিপোর্টার। যা ঘটে তার হুবহু রিপোর্ট দেওয়াই তোমাদের কাজ।

নিজের সম্বন্ধে 'রিপোর্টার' কথাটা ভুজঙ্গর বড়ই অপছন্দ। বলল, আমরা রিপোর্টার নই, বলতে পারেন সাংবাদিক। আমরা যা লিখি সেও সাহিত্য। সংবাদ সাহিত্য।

আর একটু পরিষ্কার করে বলল, অনেকে মনে করে নিছক ফ্যাক্‌ট্ নিয়ে আমাদের কারবার। ভুল ধারণা। আমাদের লক্ষ্য ফ্যাক্‌ট্ নয়, ট্রুথ; তথ্য নয়, সত্য। ঘটনা তো কতই ঘটে। তার সবটাই সত্য নয়। সত্য হচ্ছে তার সরস ও সুন্দর রূপ। Truth is beauty—বলেছেন Keats, পড়েননি? এক সময়ে তো মাস্টারি করতেন।

জীবনের ঐ মাস্টারি অধ্যায়ের উল্লেখটা গণেশের বিশেষ পছন্দ নয়। তাই অন্য কথা পাড়ল, এবার কিছুদিন আছ তো?

—থাকতেই হবে। ভোটের ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত যেতে পারছি কৈ? রোজ এক কলাম করে খবর পাঠাতে হচ্ছে।

কিছুদিন আগে থেকেই শহরে ভোটযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় একটা না একটা মাঠ এ-পক্ষের কিংবা ও-পক্ষের গরম গরম বক্তৃতায় সরগরম। এদের মুখে ওদের কুৎসা, ওদের মুখে এদের শ্রাদ্ধ। শুধু ভোট যুদ্ধ নয়, ভোটরঙ্গ। সাধারণ মানুষের দুদিকেই লাভ। বিনা পয়সায় আমোদ। গণেশ এ সব ব্যাপারে উৎসাহী নয়। রাস্তার বড় বড় প্লাকার্ডগুলো নজরে না পড়ে পারে না। শোভাযাত্রীর ধাক্কাও এড়াবার উপায় নেই। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সভা-সমিতির গণ্ডগোলে গিয়ে দাঁড়ানো, কিংবা কার নামে কে কি বলছে, কান পাতা

—ও-সব তার ধাতে নেই।

ভুজঙ্গ বলল, আজ মস্ত বড় মিটিং আছে কালিবাড়ির মাঠে। যাবেন নাকি?

—না বাপু, আমার দোকান আছে।

—আহা, দোকান তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। চলুন না, শুনে আসি কী বলে জগৎনারায়ণ।

আইনসভার নির্বাচনে একদিকে দাঁড়িয়েছেন জেলফেরত দেশসেবক জগৎ-নারায়ণ রায়। আর একদিকে জবরদস্ত জমিদার রায়বাহাদুর শিবেশ চৌধুরী। দুজনেরই প্রায় সমান প্রভাব। কেউ বুঝতে পারছে না কে জিতবে, কে হারবে। তবে জগৎনারায়ণের সমর্থক দলটাই বোধহয় কিছু বড়। হাজার হলেও দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার। তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে। ভুজঙ্গ একরকম জোর করেই ভগ্নীপতিকে ধরে নিয়ে গেল।

বিরাট সভামণ্ডপ। একদিকের ধার ঘেঁষে মঞ্চ। তার মাঝখানে আপাদমস্তক খদ্দরশোভিত জগৎনারায়ণ বসে আছেন। দু'পাশে ঘিরে আছেন গণ্যমান্য ভক্তের দল। মঞ্চের সামনে কয়েক লাইন চেয়ার, বিশিষ্ট শ্রোতাদের জন্যে। আশেপাশে ও পিছনে সতরঞ্চি। ঠাসাঠাসি লোক; কোথাও এক তিল জায়গা নেই। গণেশ বসেছে সামনের লাইনে, ঠিক পাশেই ভুজঙ্গ।

মঞ্চের দিকে চেয়ে প্রথম থেকেই গণেশের কী একটা সন্দেহ হচ্ছিল। এবারে আরো একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, ওহে ভুজঙ্গ, এ যে দেখছি আমাদের সেই জগা। ঐ নাকি তোমাদের জগৎনারায়ণ?

অনেকেই কটমট করে তাকাল। ভুজঙ্গ ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলল, চুপ। গণেশ চাপা গলায় অনেকটা নিজের মনেই গজরাতে লাগল, আরে রেখে দাও তোমার ইয়ে। ওর কীর্তিকলাপ আমার তো আর অজানা নেই। থার্ডক্লাসে দু'দুবার ফেল করার পর স্কুলই ছেড়ে দিল। এদিকে বাড়িতে রোজ ঝগড়া। তারপর একদিন পিঠে পড়ল বাপের হাতের খড়ম। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। শেষটার নন্‌-কো-অপারেশনের হিড়িকে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে চলে গেল জেলে। পরের খবর আর জানতাম না। সেই হল তোমাদের নেতা!

ওদিক থেকে একটি ছোকরা বলে উঠল, 'গোলমাল করতে হলে উঠে যান এখান থেকে।' অগত্যা চুপ করল গণেশ।

পরপর ভক্তদের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি-বন্দনার পর এক বোঝা ফুলের মালা গলা থেকে নামিয়ে জগৎনারায়ণ হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। হাততালিতে ফেটে পড়ল চারিদিক। আধঘণ্টা জ্বালাময়ী বক্তৃতার আগুন ছড়িয়ে উপসংহারে এসে বললেন—

বন্ধুগণ, আমি একজন সামান্য দেশসেবক। শিবেশবাবুর মত না আছে অর্থ, না আছে খেতাব, না আছে সরকারী সার্টিফিকেটের জোর। আমার সম্বল শুধু একখানা ছোট্ট সার্টিফিকেট, যা আমি সর্বদা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই। সেইটুকু আজ আপনাদের সামনে খুলে ধরছি। আপনারা দেখুন। দেখে যদি মনে করেন আমার যোগ্যতা আছে, অধিকার আছে দেশকে সেবা করবার, তাহলে

ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন সে যোগ্যতা নেই, ভোট চাই না।

এই বলে জগৎনারায়ণ জনতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভক্ত এগিয়ে এসে জামা তুলে ধরল, অপর একজন টর্চ ফেলল পিঠের উপর। স্পষ্ট দেখা গেল একটা কাটা চিহ্ন। ভক্ত গম্ভীরস্বরে বলল, পুলিসের বুট, দেশসেবার পুরস্কার। গণেশ আঁৎকে উঠল।—অ্যাঁ, বলে কি? পুলিসের বুট! একেবারে রাতকে দিন! ও তো সেই লিচু গাছ থেকে—আমারই ধরাধরি করে—

তুমুল হাততালিতে গণেশের বাকী কথাগুলো ডুবে গেল।

ভুজঙ্গ তার সাংবাদিক কর্তব্য শেষ করে যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত ন'টা। গণেশ বাইরের ঘরে বাতিটা কমিয়ে দিয়ে চুপচাপ তামাক টানছিল।

—'একি। অন্ধকারে বসে কি করছেন দাদা? তারপর মিটিং কেমন লাগল, বলুন।

হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে ভুজঙ্গ বসল। গণেশ কোনো জবাব দিল না। আরো কিছুক্ষণ গড়গড়ার একটানা শব্দ। তারপর নলটা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, কি ভাবছিলাম জানো? ভাবছিলাম, কী হল এইসব ব্যবসা বাণিজ্যের পেছনে ছুটে! কোন্ কাজে লাগল টাকা! শুধু ঘরে বাইরে শাপ-মন্যি আর গালাগাল কুড়নোই সার। তার চেয়ে জগার রাস্তা ধরলেই বোধহয় ভাল হত। কত নাম! কত মান! দেখলে একবার মালা আর হাততালির বহরটা?

ভুজঙ্গ চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে বলল, লোভ হচ্ছে নাকি আপনার? আহা! আগে বলেননি কেন? আপনাকেও নামিয়ে দেওয়া যেত ভোটযুদ্ধে।

—কী যে বল! আমি কী করতাম? কে চেনে আমাকে? কেই বা পুঁছতো? শুধু টাকা থাকলেই তো হয় না। আসল হল এই কপাল। তা না হলে সেই জগাটা—! বলতে বলতে নৈরাশ্য ভারে ডুবে গেল বোধহয় সেই পুরনো দিনের স্মৃতির মধ্যে। ভুজঙ্গ আড়চোখে দেখল দু' একবার। তারপর একটু চিন্তিত-মুখে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেল।

দিন চার পাঁচ পরে সকাল বেলা যথারীতি ঝাঁটারূপীন লক্ষ্মীর আলমারির সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করে গণেশ কাজে বেরোবার উদ্যোগ করছে। বড় মেয়ে সবিতা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হাতে একখানা খবরের কাগজ।

—বাবা! বাবা!

—কি রে!

—এ কী কাণ্ড করেছ তুমি!

গণেশ চমকে উঠল, কী কাণ্ড করলাম আবার!

—এত টাকা দিয়েছ, আর আমরা কিছু জানি না!

—কোথায়! কিসের টাকা?

—আবার লুকোনো হচ্ছে? এদিকে যে কাগজে বেরিয়ে গেছে! এই দ্যাখো না—বলে গড়গড় করে পড়ে গেল ঃ—

"আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীগণেশ চন্দ্র পাল নিজ শহরে একটি মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

পড়া শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল একদল যুবক। সবিতা ভিতরে চলে গেল। যুবকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, গণেশ পা-ল কি—! বাকী সকলে গলা ফাটিয়ে যোগ করল—'জয়!' তারপর সবাই মিলে তাকে ঠেলে তুলল কাঁধের উপর। গণেশ চেঁচিয়ে উঠল—'আরে, কর কি! কর কি! পড়ে মরবো যে।' সে কথা কানে তুলবার মত অবস্থা তাদের নয়।

আমেরিকান সৈন্যদের চলে যাবার সময় সস্তাদামে দু' একখানা জীপ কেউ কেউ কিনে রেখেছিল। বর্তমানে কোনোটাই চলে না। তারই একটা সংগ্রহ করে এনেছিল ছেলের দল। গণেশকে কাঁধে করে তার উপর নিয়ে তোলা হল। পাশে ও পিছনে রইলেন পাড়ার আরো কজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারপর শুরু হল প্রসেশন। বাম্পারে দড়ি বেঁধে সামনে থেকে একদল টানছে আর পিছন থেকে একদল ঠেলছে। লোকসংখ্যা বিজয়ার বিসর্জন শোভাযাত্রাকেও হার মানিয়েছে। মিছিল পরিচালনা করছে স্বয়ং মাধব কয়াল। সামনে থেকে দু'মিনিট অন্তর ভীম গর্জনে হাঁক দিচ্ছে—গণেশ পা···ল···কি···। পেছনের বিশাল জনতা তুমুল কণ্ঠে যোগ করছে—জয়!

গোটা শহরটা ঘুরিয়ে গণেশকে যখন তারা বাড়ির সামনে এনে পেঁৗছে দিল, তখন বেলা প্রায় চারটা। সমস্ত দিন স্নান নেই, পেটেও কিছু পড়েনি। মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। তার উপরে ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির। স্বয়ং এস. ডি. ও. বসে আছেন। সঙ্গে কজন বিশিষ্ট উকিল মোক্তার এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারী। গণেশ ভাবল, নিশ্চয়ই কোনো ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছে। আগন্তুকদের কথায় ও ব্যবহারে অবশ্য তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মহকুমার মালিক উঠে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন গণেশের দিকে। গণেশ কি করবে বুঝতে না পেরে শশব্যস্ত হয়ে প্রায় মাটির উপর নুয়ে পড়ে যুক্তকর কপালে ঠেকাল। এস. ডি. ও. আপনাকে বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এখন আর আটকাবো না। ভেতরে যান। চানটান সেরে কিছু মুখে দিয়ে নিন। তারপর আবার একটু বেরোতে হবে।

—কোথায় যেতে হবে? কোনো রকমে বলে ফেলল গণেশ।

—এই তো কালীবাড়ির মাঠে। আমরা সবাই মিলে একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি।

—'তুমি আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছ।' যোগ করলেন প্রবীণ উকিল গুণধরবাবু, 'নাগরিকদের তরফ থেকে একখানা মানপত্র দিতে চাই।'

গণেশ মাথা চুলকে বলল, কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই মিস্টার পাল, বাধা দিলেন এস. ডি. ও.। এইটুকু কষ্টস্বীকার আপনাকে করতেই হবে। আচ্ছা, আপনি রেডি হয়ে নিন। আমরা বরং ঘণ্টাখানেক পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আর কোনো কথাবার্তার সুযোগ না দিয়েই ওঁরা উঠে পড়লেন।

ভিতরে যেতেই ভুজঙ্গের সঙ্গে দেখা। যেন মহা-সংকটের দরিয়ায় একটা কূলের রেখা চোখে পড়েছে এমনি ভাবে বলল, তুমি কখন এলে?

—বাঃ, আমি তো আগাগোড়া আপনার মিছিলেই ছিলাম। দেখতে পাননি?

—আমার কি আর মাথার ঠিক ছিল যে দেখব? কিন্তু কী ব্যাপার বল তো?

—সব পরে হবে। আপনি চট করে খেয়ে নিন।

শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন গৃহিণী। মেয়ে এনে দিল গরদের পাঞ্জাবি ও চাদর। ভুজঙ্গ এক শীট কাগজ হাতে দিয়ে বলল, এই নিন, আপনার ভাষণ। পকেটে রেখে দিন। সকলের বলা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে উঠে পড়বেন। আমি ঠিক সামনেই থাকবো। কোনো ভয় নেই।

গণেশ আবার একটা কী বলতে যাচ্ছিল। ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—এস. ডি. ও. এসে গেছেন।

কালীবাড়ির অতবড় মাঠ। তিলধারণের জায়গা নেই। সুসজ্জিত মঞ্চের মাঝখানে শোভা পাচ্ছে গণেশ পাল! মালার ভারে ঘাড়ে গর্দানে একাকার। কোনো দিকে ফিরবার উপায় নেই। গলাটা যতদূর সম্ভব সোজা করে তুলে কোনো রকমে নাকটা বাঁচিয়ে রেখেছে। জগার উপর আর হিংসা নেই। তার চেয়েও বেশী মালা, বেশী হাততালি জুটেছে তার ভাগ্যে। কিন্তু আর ভাববার অবসর নেই। শুরু হল বক্তৃতা। এস. ডি. বললেন দানবীর, গুণধরবাবু বললেন দাতাকর্ণ, শিবেশবাবু বললেন, সবচেয়ে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যাঁর ডান হাত দান করে কিন্তু বাঁ হাত জানতে পারে না। আমাদের গণেশ ভায়া আজ সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন।

সকলের শেষে ভুজঙ্গের ইঙ্গিতে গণেশ জবাব দিতে উঠল, অর্থাৎ সেই কাগজের লেখাটা কোন রকমে পড়ে গেল। তার পর কান ফাটানো হাততালি। সভার শেষে সেই এক বোঝা ফুলের মালা ছেলেরাই পৌঁছে দিল তার বাড়িতে।

দিন তিনেক পরে হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ মোহিনী দেবী আরেকবার গণেশ পালের বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সঙ্গে স্কুল কমিটির সেক্রেটারী। কুশল প্রশ্নাদির পর সবিনয়ে জানালেন, এখন থেকে কাজ শুরু না করলে বর্ষার আগে শেষ করা যাবে না। সুতরাং চেক্‌টা পেলে সুবিধা হত।

ভুজঙ্গ বসে ছিল। গণেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে একটু কেশে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, মাপ করবেন। কোন্‌ চেকের কথা বলছেন আপনারা, জানতে পারি কি?

—'কেন?' কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন সেক্রেটারী, 'যে টাকাটা উনি স্কুলের জন্য দান করেছেন।'

—দান করেছেন! চিঠিপত্র আছে কিছু?

মোহিনী দেবী বললেন, চিঠিপত্রের কী দরকার? কে না জানে স্কুলকে উনি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন? খবরের কাগজে বেরিয়েছে। মস্তবড় সভা

করে ওঁকে আমরা মানপত্র দিয়েছি।

সবই ঠিক। সে সম্বন্ধে উনি কি বলেছেন, সেটা আপনারা শুনেছেন কি?

—শুনেছি বৈকি! ভাষণটি সুন্দর হয়েছিল।

—আচ্ছা, এক মিনিট। বলে, উঠে গিয়ে তার সাংবাদিক মার্কা ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে ভুজঙ্গ ফিরে এল তার আগের জায়গায়, এবং কাগজটা হেড্‌মিস্ট্রেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই আপনাদের সেই সভার রিপোর্ট। দেখুন, বক্তৃতাটা ঠিক আছে কিনা।

মোহিনী দেবী চিহ্নিত জায়গায় চোখ বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ; এই কথাই তো বলেছিলেন, মনে হচ্ছে।

—আচ্ছা, তাহলে আর একবার শুনুন, আমি পড়ছি।

ভুজঙ্গ কাগজখানা নিয়ে বক্তৃতার রিপোর্টটা পড়ে গেল ঃ—

"বন্ধুগণ, আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেখালেন, আমি তার একেবারেই যোগ্য নই। এমন কিছুই আমি করিনি, যার জন্যে আপনাদের এই সাধুবাদের ক্ষুদ্রতম অংশও আমি দাবি করতে পারি। আপনারা আমাকে দাতা বলে অভিনন্দিত করেছেন। শুনে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আপনারা প্রচার করেছেন, স্কুলের জন্য কতবড় দান, কতবড় ত্যাগস্বীকার করেছি আমি। আমি নগণ্য মানুষ। দান করি, সে সাধ্য কোথায়? সে সঙ্গতিও আমার নেই। আমার মত ক্ষুদ্রলোকের কি দানের স্পর্ধা সাজে? তবু নিতান্ত বিনা কারণে আপনারা আমাকে এই সভামঞ্চে ডেকে এনে যে বিপুল গৌরব দান করলেন, তার জন্য শতকোটী ধন্যবাদ।"

পড়া শেষ করে সেক্রেটারীর দিকে ফিরে ভুজঙ্গ বলল, আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা যা-ই বলে থাকুন, দানের কথা উনি বারবার অস্বীকার করে গেছেন।

'অস্বীকার করে গেছেন!' বিহ্বল কণ্ঠে ভুজঙ্গের শেষের কথাগুলোই কেবল আউড়ে গেলেন সেক্রেটারী। হেড্‌মিস্ট্রেস্ বললেন, সে কী কথা! আমরা ভেবেছি, ওগুলো ওঁর বিনয়।

—আজ্ঞে না; কথাগুলো উনি 'লিটারেল সেন্‌স্'-এই বলেছেন। ব্যবসায়ী মানুষ; যা বলেন স্পষ্টাপষ্টি।

ভুজঙ্গ যখন তার ভাষণের রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছিল, সেই ফাঁকে গণেশ উঠে পড়েছিল। সেক্রেটারী বললেন, পাল মশাই কোথায় গেলেন? এসেছি যখন, ওঁর মুখ থেকেও শুনে যাই উনি কি বলেন।

—বেশ তো। তবে আমি যা বলছি, সব ওঁরই কথা। আমাকে জানাতে বলেছেন বলেই জানাচ্ছি।

হেড্‌মিস্ট্রেস্, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে বললেন, কিন্তু খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছিল, সেটাও কি মিথ্যা?

—'মিথ্যা বৈ কি?' হেসে বলল ভুজঙ্গ। 'কাগজে অমন কত কি বেরোয়। আজকের কাগজে ওর একটা প্রতিবাদ বেরিয়েছে, দেখেননি বুঝি?'

সেদিনকার কাগজটা খুলে দেখিয়ে দিল আগেকার খবরের কনট্রাডিকশন।

সেক্রেটারী এবং হেডমিস্ট্রেস্ চলে যেতেই গণেশ ঘরে ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, মামলা-টামলা করবে না তো হে ?

—'মামলা !' হো হো করে হেসে উঠল ভুজঙ্গ। সে ফাঁক রাখলে তো ? ...এ আপনার বিজনেস নয়, দাদা, এর নাম জার্নালিজম্।

সার

এক

উকিলবাবু এতক্ষণ অন্য মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এবার কালীনাথের দিকে ফিরলেন। কলমে টুপি পরাতে পরাতে বললেন, "বলুন, স্যার। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আপনার ব্যাপারটা কী? দেওয়ানী না ফৌজদারী ?"

কালীনাথ যখন ভাবছেন, বক্তব্যটা আরেকটু পরিষ্কার করলেন উকিলবাবু, —"মানে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কিছু, না চুরি বাটপাড়ি খুনখারাপি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা..."

—"আজ্ঞে না, ওসব কিছু না"—তালিকাটি আর বাড়াতে দিলেন না কালীনাথ। "বাড়িভাড়ার বিষয়ে"—

—বাড়িভাড়া ! আপনি কি ল্যান্ডলর্ড ?

কালীনাথ মনে মনে হাসলেন—লর্ডই বটে ! বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—তাহলে বিশেষ কিছু করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

"কেন ?"—কালীনাথের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

—বাড়িভাড়া সংক্রান্ত যে-সব নতুন নতুন আইন হচ্ছে, সবই টেনান্টের পক্ষ টেনে। তাদেরই সুবিধে সুযোগ বাড়ছে। বাড়িওয়ালাদের বড় দুর্দিন।

—আজ্ঞে, তা কি করে হয় ? আইন তো একপেশে হতে পারে না। দু-পক্ষের যেটা ন্যায্য অধিকার—

—আপনি কী করেন ?

—এখন আর কিছু করি না। সরকারি স্কুলে মাস্টারি করতাম, বছর দুয়েক হল রিটায়ার করেছি।

—বুঝেছি। পুরনো পাঠ এখনো ভুলতে পারেননি। তবে ভুলতে হবে। ভয় নেই, তার জন্যে বেশীদিন লাগবে না। আচ্ছা, আইনের ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি। এই কলকাতা সহরে যাদের বাড়ি আছে, অর্থাৎ বাড়ির মালিক, তারা হল শতকরা আট জন, এইট পার্সেণ্ট। বাকী বিরানব্বই জন ভাড়া দিয়ে থাকে। অনেকে অবিশ্যি না দিয়েই থাকে। ডেমোক্র্যাটিক স্টেট, সরকার চলে ভোটের জোরে। সেটা কোনদিকে বেশী, বলুন। সরকার যারা চালায় তারা কি এতই বোকা যে আপনার মত আটজনের ওপর সুবিচার করতে গিয়ে বিরানব্বইটা ভোট নষ্ট করবে ? সে তো স্রেফ নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। তাই যাদের দিকে ভোট বেশী, তাদের মুখ চেয়েই আইন বানাতে হয়।

"তাই বলে"—উত্তেজিত হয়ে একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন কালীনাথ দত্ত, উকিলবাবু থামিয়ে দিলেন—"থাক্ ওসব কথা। আপনার কেসটা কী বলুন। দেখি যদি কিছু করা যায়।"

কেস অতি সরল এবং সাধারণ। বোঝাতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে কালীনাথের বাবা এই বাড়িখানা একজনকে ভাড়া দিয়েছিলেন। ভবানীপুরে বেশ ভাল জায়গায় দোতলা বাড়ি। উপরে নীচে মিলিয়ে ছোট বড় আটখানা ঘর, তাছাড়া রান্না ভাঁড়ার কলতলা আলাদা। ভিতরে একটা উঠোনও আছে। নিজেই করেছিলেন বাড়িখানা। তারপর এমন একটা অবস্থা বিপর্যয় ঘটল যে মাসে মাসে মাত্র তিরিশটি টাকার বিনিময়ে ভদ্রাসনখানি এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের হাতে ফেলে দিয়ে তাঁকে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হল। কালীনাথের বদলির চাকরি। নানা জিলায় ঘুরে শেষের দিকে যখন কলকাতা অঞ্চলে ফিরে এলেন, তখন বাবা-মা কেউ নেই, দেশের বাড়িও ভেঙে পড়েছে। ভাড়া বাড়িতে উঠতে হল। যতদিন চাকরি ছিল, কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছেন, তারপর আর পারছেন না।

ভবানীপুরের বাড়ি যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন, তিনি কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তার ছেলে সওদাগরি অফিসে বড় চাকরি করেন। তিনিই বর্তমান দখলিকার। কালীনাথ অনেকবার গেছেন তার কাছে, নিজের অবস্থা জানিয়ে বাড়িটা ছেড়ে দেবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করেছেন। ভদ্রলোক স্রেফ 'না' বলে দিয়েছেন। অগত্যা এক তলায় মাত্র দুখানা ঘর ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন কালীনাথ। তাও সরাসরি না-মঞ্জুর হয়ে গেছে। শেষ উপায় হিসাবে ভাড়াটা কিছু বাড়িয়ে দেবার কথা যখন বলতে গেছেন, বড়লোক টেনাণ্ট্ ল্যাণ্ড্‌লর্ডকে সোজা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন কোর্টে যান।

উকিলবাবু ধীর ভাবে গোটা কাহিনীটা শুনে গেলেন। তারপর বললেন. আপনি কোন্‌টা চান?

আমি তো চাই উনি উঠে যান।

—যাবেন না, এবং যাওয়াবার মত কোনো অস্ত্র ও আইন আপনাকে দেয়নি।

—বাড়িটা যে আমার নিজের জন্যে দরকার, একথাও কি আইন শুনবে না?

—না; কিছুদিন আগে শুনত। এখন সে ধারাটা উঠে গেছে। ওঠা না-ওঠা ভাড়াটের মর্জি। তবে যদি ভাড়া না দেয়, অর্থাৎ পর পর চার মাস বাকী ফেলে—

—না; ভাড়া ও ঠিক দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তো সেই মান্ধাতার আমলে ঠিক হয়েছিল। ওটা কি বাড়ানো যেতে পারে না?

—পারে। আপনাকে রেণ্ট্ কোর্টে মামলা দায়ের করতে হবে, সেটা অন্ততঃ বছর খানেক তো চলবেই, তার বেশীও চলতে পারে, তারপর ডিক্রি পাবেন— টেন পার্সেণ্ট ইনক্রিজ। অর্থাৎ তিরিশ টাকা পাচ্ছেন তো? ওটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে তেত্রিশ টাকা।

—বল্লেন কি ? অতবড় বাড়ি, আর ঐ জায়গায় ! আশে-পাশে খবর নিয়ে জেনেছি ঐ রকম একখানা বাড়ির ভাড়া আড়াইশ তিনশ টাকা।

—আপনি ঠিক খবর পাননি। আরো বেশী। কিন্তু তাতে আপনার কোন সুবিধে হবে না। কোর্ট আপনাকে ঐ তেত্রিশের ওপর এক পয়সাও দেবেন না। তার দেবার ক্ষমতা নেই।

কালীনাথ একেবারে বসে পড়লেন। এর পরে আর কী বলা যায় খুঁজে পেলেন না। উকিলবাবুর আরো মক্কেল বসে আছে, একজনের দিকে বেশীক্ষণ নজর দিতে পারেন না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বললেন, বাড়ি গিয়ে ভালো করে ভেবে দেখুন। যদি মামলা করাই সাব্যস্ত হয়, মানে ভাড়া বাড়াবার জন্য, আরেকদিন আসবেন, ব্যবস্থা করে দেবো।

লিগ্যাল অ্যাডভাইস অর্থাৎ আইন-ঘটিত পরামর্শ এবং তার সঙ্গে এতটা সময় দিলেন উকিলবাবু—তার জন্য একটা ফী তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কালীনাথ দিতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, "না এখন আপনাকে কিছু দিতে হবে না। যদি মামলা করা স্থির করেন, তখন দেখা যাবে।

কালীনাথ মনে মনে খুশী হলেন। উকিলবাবু লোকটি সত্যিই উদার। এই ফী-টা তিনি অনায়াসেই নিতে পারতেন। তাঁকে তো এই করেই খেতে হয়। এইটুকু ত্যাগ স্বীকারই-বা কজনে করে আজকাল ?

কিন্তু ঐ জগতে যারা আনাগোনা করে তারা বলবে এটা উদারতাও নয়, ত্যাগও নয়, স্রেফ ইন্‌ভেস্টমেণ্ট্। এই 'না নেওয়া' দিয়ে তিনি ভবিষ্যতে বেশী নেবার পথটা খোলসা করে রাখলেন। ফী ছেড়ে দেওয়াটা হল তাঁর মূলধন, তার একটা রিটার্ন বা মুনাফার সম্ভাবনা রইল।

উকিলবাবু দেখলেন, লোকটি সেকেলে মানুষ, ভালো মানুষ, তার উপরে মাস্টার। সামান্য একটু উপকার দেখালে একে, সাধুভাষায় যাকে বলে, "কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ" করা যাবে। অর্থাৎ গেঁথে ফেলা যাবে। মামলা তো একে করতেই হবে। না করলে ঐ তিন টাকাই বা দেয় কে ? তখন এই খানেই তাকে আসতে হবে।

উকিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে বড় রাস্তায় ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কালীনাথ। একটি লোক এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। প্রথমে হঠাৎ চিনতে পারলেন না, তার পরেই মনে হল, এই মাত্র একে উকিলের বৈঠকখানায় দেখেছেন। পিছন দিকে একটা বেঞ্চিতে বসে বিড়ি টানছিল।

লোকটিই আগে কথা বলল, "মামলা-টামলার মধ্যে যাবেন না, স্যার। এঁটো মুখই সার হবে, পেট ভরবে না। ক'টা টাকাই বা পাবেন ? তার চেয়ে ব্যাটাকে উঠিয়ে দিন। নিজের বাড়িতে এসে গ্যাঁট হয়ে বসুন। আর যদি ভাড়া দিতে চান, অনেক ভালো ভাড়াটে পাবেন। বলেন তো আমি যোগাড় করে দেবো।"

—কিন্তু উঠিয়ে দেবো বললেই তো আর ওঠানো যায় না। আজকালকার আইনে নাকি—

—রেখে দিন আপনার আইন। উকিলরা ও ছাড়া আর কী বলবে? অনেক রাস্তা আছে উঠিয়ে দেবার। আপনি আমাকে বাড়ির ঠিকানাটা দিন, আর লোকটাকে চিনিয়ে দিন। এক মাসের মধ্যে যদি বাড়ি আপনার খালি করে না দিতে পারি, আমার নামে তিনটে কুকুর পুষবেন।

কালীনাথ ভয়ে ভয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না না, আমি ওসব হ্যাঙ্গামা হুজ্জুতে যেতে চাই না।

—হ্যাঙ্গামা হুজ্জুতে কে যেতে বলছে আপনাকে?

—আপনি মার-ধোরের কথা বলছেন তো?

—আরে না মশাই। সে সব কিছু নয়। শুধু একটু কৌশল। কারো গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না, অথচ কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

—কী করতে চান আপনি?

—সেটা স্যর আমি এখন বলবো না। আমকে আপনার কিছু দিতেও হবে না। ভালোয় ভালোয় শুভকাজটি চুকে যাক তারপর খুশি হয়ে যা দেবেন, তাই নেবো।...বলুন আপনার বাড়ির নম্বর!

কালীনাথ তখনো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাচ্ছেন, ভাবছেন, ঠিকানাটা একে জানিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কিনা। এদিকে সে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বের করে পেন্সিল হাতে অপেক্ষা করছে। মিনিটখানেক পরে বলল, আপনি স্যর এখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমি তো বলছি, আপনার কোন ঝক্কি নেই। বেশ, আপনাকে চেনাতে-টেনাতেও হবে না। শুধু নামটা বলুন, আর ঠিকানা দিন। আমি ঠিক চিনে নেবো।

—কোনো মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়বো না তো?

—কি মুশকিল! মামলা-মোকদ্দমা হলে তো জড়াবেন। আপনার ঠিকানাটাও দেবেন স্যর। কদ্দুর কী করতে পারলাম, জানাবো কেমন করে?

কালীনাথ নিজের এবং ভাড়াটের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলেন। লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। নিজে থেকে তার নাম বলল, বলরাম দাস, সেই সঙ্গে নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে কালীনাথের হাতে দিয়ে বলল, বাসার নম্বরটাও রইল। আপনাকে কিছু খোঁজখবর করতে হবে না, আমিই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

দুই

বলরাম বলেছিল একমাস। ততদিনও লাগল না। কুড়ি-বাইশ দিন পরেই ভাড়াটের কাছ থেকে একখানা তিন লাইনের চিঠি পেলেন কালীনাথ—আগামী মাসের পয়লা তারিখ থেকে আপনার বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। দখল নেবার ব্যবস্থা করবেন। নোটীশ দেওয়া সম্ভব হল না। তার বদলে এক মাসের ভাড়া—তিরিশ টাকার চেক পাঠালাম।

ঠিক দুদিন পরে এল বলরাম। ঘরে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন—চিঠি পেয়েছেন?

"পেয়েছি"—কালীনাথের স্বরে যেমন খুশি তেমনি প্রচণ্ড কৌতূহল—"এত

বড় একটা অসম্ভব কাণ্ড কী করে সম্ভব হল বলুন তো ?"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান ; এখনি অত ভরসা করবেন না। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। ব্যাটা কি কম ত্যাঁদড় ? পর পর তিনটে ডোজ লাগাবার পরে তবে না পথে এসেছে।"

"ডোজ। কিসের ডোজ ?" বিস্মিত হলেন কালীনাথ।

"সে সব পরে বলব স্যার। আগে উঠুক তো।"

বলরাম তখনি চলে যাচ্ছিল। কালীনাথ এরকম একজন নিতান্ত অপরিচিত, বলতে গেলে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া, পরম হিতৈষীর জন্যে বেশ ভাল রকম চা-জলখাবারের আয়োজন না করে ছাড়লেন না।

পয়লা তারিখেই ছেলেকে পাঠিয়ে যথারীতি বাড়িটার দখল নিলেন। ভাড়া আদায়ের জন্যে এর আগে আরো অনেকবার সে ভাড়াটেবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে, দু-একটা কথাবার্তাও হয়েছে। এবারে তিনি আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন। শুধু গাড়িতে উঠবার সময় একটু বিষাক্ত হাসি হেসে বললেন, "এবার তোমাদের আক্রোশ মিটল তো ? তার জন্যে এরকম একটা নোংরা কাণ্ড না করলেই পারতেন তোমার বাবা !"

"কাণ্ড" সম্বন্ধে ছেলেটি কিছুই জানত না। সুতরাং হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার বলবার বা করবার কিছুই ছিল না।

বলা বাহুল্য এরপর বলরামের সাক্ষাৎ পেতে একদিনও দেরি হল না। এসেই একটি 'বিল' দাখিল করল কালীনাথের সামনে। ছোট্ট একখানা চিরকুট, তার উপরে এক দুই তিন করে তিন দফা হিসাব—মাল তিন আনা, ছোকরাদের ফী তিন টাকা, আমার বকশিশ—! তিন নম্বরের শেষে কোনো অঙ্কপাত নেই, শুধু একটা ড্যাশ। চুক্তি অনুসারে ওটা সে কালীনাথের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

বিলের তলায় যথারীতি স্বাক্ষর—শ্রীবলরাম দাস।

কালীনাথ যখন চিরকুটখানা পড়ছেন, বলরাম বলল, টাকাটা আপনার সুবিধে মত দেবেন, স্যার। তার আগে বাড়িটা রং টং করিয়ে উঠে যাবার আয়োজন করুন। আর যদি ভাড়া দিতে চান, আমি চেষ্টা করতে পারি। বেশ ভালো পার্টি আছে আমার হাতে। যে-রকম বাড়ি আপনার, তিনশ-সাড়ে তিনশ অনায়াসে পেয়ে যাবেন।

—সে সব কথা পরে আসছে। তার আগে আপনার 'কৌশলটা' একটু জানতে পারলে খুশী হতাম। ও-লোকটা আমার ছেলেকে বলে গেছে, এরকম একটা নোংরা কাণ্ড না করলেই পারতে।

"বলেছে বুঝি ?" হেসে ফেলল বলরাম, "তা ওরা সাহেব-সুবো মানুষ, ওদের চোখে জিনিসটা একটু নোংরাই বটে। দিশী সার তো।"

—সার !

—হ্যাঁ, স্যর। জমির ফলন বাড়াতে হলে যেমন সার দরকার, তেমনি এসব ব্যাপারে ভাল আর তাড়াতাড়ি ফল পেতে হলেও সার দিতে হয়। দেবার ধরণটা অবিশ্যি আলাদা। সে দিক দিয়ে ঐ ছোকরাগুলো বেজায় ওস্তাদ। ব্যাপারটা

তাহলে খুলেই বলি।

'ছোকরাগুলোর' প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করল বলরাম।

সব পাড়াতেই দু'দল ছোকরা আছে—এক, যারা রকে বসে আড্ডা দেয়। পেটেন্ট চেহারা ড্রেনপাইপ প্যান্ট, গেঞ্জির মত হাওয়াই সার্ট আর ছুঁচলো জুতো। ইস্কুলের মেয়েগুলোর পেছনে লাগে, প্রসেশনে ভাড়া খাটে, ঠাকুর বিসর্জনের সময় লরীতে উঠে কোমর দুলিয়ে নাচে। কাজ-কর্ম কিছুই করে না, করবার ইচ্ছাও নেই। বসে বসে বাবার অন্ন ধ্বংস করে, আর সেদিকে কোনো ত্রুটি হলেই চোখ রাঙায়।

দু নম্বর হল বস্তির ছেলে, বয়সে ওদের চেয়ে ছোট—১০ থেকে ১৫।১৬। ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, ময়লা জামা, বেশির ভাগই খালি গা। রোগা, না খেতে পাওয়া চেহারা। বাসায় বাসায় ছোঁড়া চাকরের কাজ করে, বেশিদিন টেঁকে না, টুকটাক চুরি-চামারি করে পালায়। ধরা পড়লে মুখ বুজে মার খায়। ওদের দেখা যায়—শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে একটা করে গাছের ডাল হাতে করে দল বেঁধে হৈ-হল্লা করে রাস্তায় রাস্তায় কাটা-ঘুঁড়ি ধরে বেড়ায়। সরস্বতী পূজার সময় একখানা করে ছোট্ট রসিদের বই নিয়ে ওরাও কখনো কখনো চাঁদার খোঁজে বেরোয়। তবে দাবি অতি সামান্য—'একটা দশ নয়া দিন স্যার।' দিলে খুশি হয়ে একটা রসিদ কেটে দেয়, না দিলে রকাশ্রয়ী ব্রাদারদের মত শাসায় না, বা তেড়ে আসে না।

এই দলটির সাহায্য নিয়েছিল বলরাম। মজুরির বেট সামান্য। তাতে ওদের উৎসাহের অভাব হয়নি। প্রস্তাবটি অভিনব, তার ভিতরে বেশ মজার স্বাদ আছে, এই দুটোতেই ওরা আকৃষ্ট হয়েছিল।

তিন

ভাড়াটে ভদ্রলোক নামকরা সওদাগরি ফার্মে মোটামুটি উঁচু দরের চাকুরে 'বাবু' নন, 'সাহেব' স্তরের লোক। দামী পোশাকে অফিসে যান। ঠিক আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্রাম ধরেন। সেইদিনও তাই যাচ্ছিলেন। ভিতরে ভিতরে বোধহয় একটু ব্যস্ত, এবং অন্যমনস্ক। একটা গলির মোড়ে পৌঁছতেই, হঠাৎ সামনে থেকে সাঁ করে একটা ভারী জিনিস সোজা মুখের উপর এসে পড়ল।

"ইট নাকি ?" চমকে উঠলেন কালীনাথ।

—"না, স্যর। ইট হলে কি উনি খাড়া থাকতেন ? রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। তারপর হাসপাতাল, থানা-পুলিশ। ওসব ব্যাপারে ঝক্কি অনেক। এ এমন জিনিস যাতে করে লোকজন জড়ো হল ঠিকই। মুখে খানিকটা আহা-উহু ঈস্-টিস্ও করল কেউ কেউ, কিন্তু ভদ্দর লোক যদি তাকাতে পারতেন তো দেখতে পেতেন, মুখে মুখে চাপা হাসি খেলে যাচ্ছে।

—"নামটি কিন্তু বেড়ে দিয়েছেন। সার।" বলে কাশীনাথও হেসে ফেললেন।

বলরাম বলল, গাছের গোড়ায় দিতে হলে অবিশ্যি পচাতে হত। মানুষের বেলায় অত মেহনতের দরকার হল না। একেবারে টাটকা তাজা মাল। তাছাড়া আমাদের মানে হিন্দুদের কাছে পবিত্র জিনিস। পুজো-আচ্চায় লাগে।

ভদ্রলোকের অবস্থা অন্যের চোখে যতই হাস্যকর হোক, ব্যাপারটাকে নিজে মোটেই হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আক্রমণটা চোখ-মুখ নাকের উপর হলেও, টাই, কোট, সার্ট, প্যাণ্ট, কোনোটা অক্ষত অবস্থায় ছিল না। তখনই বাড়ি ফিরে ওগুলো ছেড়ে ফেলে কলতলায় ঢোকাই ছিল একমাত্র পথ। পথচারীরাও সেই পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এতবড় অত্যাচার নিঃশব্দে হজম করার মত লোক তিনি নন। চোখ দুটো একটু সাফ করে নিয়ে ঐ অবস্থাতেই গেলেন থানায়।

ও সির ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিলেন, তিনি একেবারে রা-রা করে উঠলেন—দাঁড়ান, দাঁড়ান ওখান থেকেই বলুন কী চাই আপনার?

অর্থাৎ, ওঁর ঐ রকম দামী জামাকাপড়ের চেয়ে একটা পুরানো, পচা পালিশ উঠে-যাওয়া চেয়ার হল বড়! এরপরে মেজাজ ঠিক রাখা একজন মার্চেন্ট অফিসের ছোট সাহেবর পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক একেবারে ফেটে পড়লেন। ও পক্ষও পুলিস। কড়া কথা শোনা তাদের ধাতে নেই। বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটির পর ও-সি সাফ জবাব দিয়ে দিলেন "এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে পুলিস কেস হয় না। ইচ্ছে হলে আপনি কোর্টে গিয়ে মামলা করতে পারেন।"

ভাড়াটে বাবুর এক বন্ধু ছিলেন পুলিশ কোর্টের উকিল। তিনি সব শুনে নিয়ে বললেন, ছেলেটাকে চিনতে পারবে?

—ঠিক কোন্‌টা ছুঁড়েছে, তা বলতে পারবো না। যে কোন একটাকে দেখিয়ে দিলেই তো হল। সবগুলোই সমান বদমাস।

তাহলেও সাক্ষী-সাবুদ চাই। তার চেয়ে চেপে চলে যাও ভাই। দেখছ তো দিনকাল।

—চেপে যাবো! তুমি বলছ কী? কতগুলো বাঁদর ছোঁড়াকে শায়েস্তা করা যাবে না?

—বাঁদর বলেই যাবে না।

অগত্যা পরদিন থেকে ট্যাক্‌সি করে অফিস করতে শুরু করলেন ভদ্রলোক।

দিন কয়েক পরে বলরাম গিয়ে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। বলল, আমি এই পাড়াতেই থাকি। শুনলাম কতগুলো ছোঁড়া আপনার পেছনে লেগেছে। কী করবেন স্যর? পাড়াটা তো ভাল নয়। পাশেই একটা মস্ত বড় বস্তি। আপনার এটা কি নিজের বাড়ি?

—না।

—ও, ভাড়া বাড়ি। কতদিন আছেন?

—অনেক দিন।

—মাপ করবেন, স্যর। আপনাকে এ বাড়িতে মোটেই মানায় না। আপনার মত একজন বড় অফিসার একটা ছোট লোকের পাড়ায় পড়ে আছেন কেন বুঝতে

পারছি না। আপনাদের জন্য বালিগঞ্জ রয়েছে, সাদার্ন এ্যাভিনিউ, গোলপার্ক রয়েছে। তার চেয়ে আরো এক ধাপ উঠতে পারেন—। নিউ আলিপুর। চমৎকার ফ্ল্যাট পাবেন। বলেন তো আমিও দেখতে পারি।

—আপনি বুঝি দালাল ?

—আজ্ঞে, হাউস-এজেণ্ট।

—আচ্ছা ; এবার আসতে পারেন। ধন্যবাদ।

বলরাম বলছিল কালীনাথবাবুকে, "বোঝা গেল, ব্যাটা এখনো ঠাণ্ডা হয়নি। আরেকটা ডোজ দরকার। কিন্তু তারপর থেকে হেঁটে চলা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। যখনি চলে, ট্যাকসিতে। কাজেই অন্য ব্যবস্থা করতে হল।"

রাস্তাটায় আলোর বন্দোবস্ত তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে ঐ বাড়িটার খুব কাছে কোনো লাইট-পোস্ট নেই। আশে-পাশে দোকান-পাট থাকলে তার থেকে খানিকটা আলো পাওয়া যায়। তাও ছিল না। একচাপে সবগুলো বসত বাড়ি।

একদিন দেখা গেল ঐ বাড়ির দুপাশে যে দুটো পোস্ট, তার কোনোটাতেই আলো জ্বলছে না, বালবগুলো ভাঙ্গা। অফিস থেকে ফিরতে ওঁর সন্ধ্যা হয়ে যেত। ঐ দিন কি কারণে, আরেকটু দেরী করে ফিরেছিলেন। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে যখন নামলেন, চারিদিক রীতিমত অন্ধকার। তারপর মানিব্যাগ থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে ট্যাকসিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। সে বলল, চেঞ্জ নেহি হ্যায়।

—নেহি হ্যায় তো হ্যাম কেয়া করেগা।

এই নিয়ে শুরু হল বচসা। শিখনন্দনও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। ইনি তেড়ে ওঠেন তো সে ওঠে রুখে। চেচাঁমেচি শুনে সামনের বাড়ির ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে দুইজনকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলেন এবং যা নিয়ে মূল বিরোধ অর্থাৎ নোটের ভাঙানির ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালীনাথের ভাড়াটে বাবু খুচরো টাকা-পয়সাগুলো পকেটে ফেলে গজগজ করতে করতে বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির রোয়াকের দিকে যেমন এগোতে গেছেন, তখনি ঘটল প্রমাদ !

নরম নরম একটা কিসে জুতোটা হঠাৎ হড়কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে পতন। মাথাটা বাঁচাতে গিয়ে যেখানে হাত রাখলেন, সেখানেও এক তাল।

ট্যাকসিওয়ালা গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল। শব্দ শুনে এঞ্জিন থামিয়ে ছুটে এল এবং দুহাতে বাবুকে তুলল। জানতে চাইল চোট লেগেছে কিনা। তার-পরেই তাঁর সারা অঙ্গে লেপটে যাওয়া বস্তুটির দিকে নজর পড়তেই, দাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল অট্টহাসি।

দেখতে দেখতে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেল।

লোকের কাছে চেপে গেলেও চোট নেহাৎ কম লাগেনি। মাথার পিছনে খানিকটা জায়গা কেটে গিয়েছিল। ডান কনুইটাতেও ইঞ্চিদুয়েক ছড়ে যাওয়ার দাগ। তার উপরে ঝাঁকানি খেয়ে সারা দেহে ভীষণ ব্যথা। অফিস থেকে পুরো

সাতদিনের ছুটি নিতে হল।

ঐ সময়টা পার করে দিয়ে বলরামের পুনরাবির্ভাব। ছোকরাগুলো শাসনের অভাবে মাথায় উঠে গেছে, এই জাতীয় একটা ভূমিকা দিয়ে নতুন ফ্ল্যাটের প্রস্তাবটা সবে তুলতে যাবে, তার আগেই লাফিয়ে উঠলেন প্যাটারসন্ কোম্পানীর ছোট সাহেব, "আপনি কি আমাকে বুঝাতে চান এসব ছোঁড়াগুলো করছে ?"

—তবে ?

—এ সব সেই মিনমিনে মাস্টারটার শয়তানি। তা না হলে ওরা কেন আমার পেছনে লাগতে যাবে ?

তা তো বটেই। একেবারে বাচ্চা, দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই হয়। এর পেছনে তাহলে লোক আছে ? কোন্ মাস্টার ? কার কথা বলছেন ?

—সে আপনি চিনবেন না। আপনাকেও বলি, আমার পেছনে খালি খালি সময় নষ্ট করছেন। এ বাড়ি আমি ছাড়বো না। দেখি সে ব্যাটা কদ্দুর যেতে পারে।

অতএব তৃতীয় ডোজের জন্যে তৈরী হওয়া ছাড়া বলরামের আর গত্যন্তর রইল না।

ছুটির পরে ছোট সাহেব আবার ট্রামেই অফিস যাতায়াত শুরু করলেন। আগে খালি হাতে যেতেন, এবার থেকে হাতে রইল একটা হাণ্টার। তাছাড়া গলিপথটুকু যখন পার হন, বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চারদিকে নজর রেখে চলেন।

ভবানীপুরের এ অংশটা বেশ পুরনো। গলির মধ্যেও মাঝে মাঝে দু' একটা বড় গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বাড়ি ফিরছিলেন। একটা ঘন ঝোপওয়ালা গাছের নিচে আসতেই মাথার উপর ঝপ্ করে বালতি—

"এটা বুঝি তরল সার ?" প্রশ্ন করলেন কালীনাথবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর বেশ কদিনের পুরনো। অনেক আগেই ভিজিয়ে রাখতে হয়েছিল তো। কে জানে কদ্দিনে চান্স পাওয়া যায়।

এবারে বলরাম আর দেখা করতে যায়নি। শুধু সকাল-সন্ধ্যায় গলি পথটা একবার ঘুরে যেত। দেখতে পেয়ে ছোট সাহেবই একদিন ইশারায় ডাকলেন। কাছে গিয়ে ভক্তিভরে নমস্কার করতেই বললেন, আপনার হাতে ভালো ফ্ল্যাট আছে ?

—আছে বৈকি স্যর ? কোন্ অঞ্চলে চান ?

—ড্যাম ইওর অঞ্চল। অ্যানি চুলো উইল ডু।

—দু তিনখানা ঘর ?

—তাতেই হবে। কী রকম লাগবে মনে করেন ?

—আড়াইশ-তিনশ।

—ঠিক করে ফেলুন।

হরীশ দত্ত বরাবরই একটু বেলায় উঠে থাকেন। সকাল বেলাকার দু-চারটে টাটকা রুচিকর খবরের সঙ্গে চা-পান শেষ করবার আগেই মেয়ের ইস্কুলের বাস এসে পড়ে। তার চেহারাখানা উনি কখনো চোখে দেখেন নি, শুধু বাঁশি শুনেছেন। মাঝে মাঝে যখন সে সুর কর্ণ-পটহ ভেদ করবার উপক্রম করে, তখন মেয়েকে ডেকে দেন। সেদিনও ঠিক সেই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কয়েকবার চেঁচিয়েও মেয়ের কোন সাড়া পেলেন না। তার বদলে দেখা দিলেন স্ত্রী।

হরীশ বললেন, খুকু কোথায় গেল? বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি যাবেন না, গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন মানদা।

কেন, কী হল আবার?

কী হল তা আমি কেমন করে জানবো? রাজরানীর মেজাজ দাসী-বাঁদীরা কবে বুঝে থাকে?

অর্থাৎ, অবস্থা কিঞ্চিৎ জটিল। হাতে একটা অসহায় ভঙ্গী করে চটিটা পায়ে গলিয়ে মেয়ের ঘরের দিকে চললেন হরীশবাবু। দরজায় দাঁড়িয়ে আর একবার ডাকলেন, জবাব পেলেন না।

মেয়ে ক্লাশ ট্রেন-এর ছাত্রী, বয়েস ষোলো-সতেরো, শাড়িও ধরেছে কিছুদিন থেকে, কিন্তু চলা-ফেরায় কথার সুরে মাথার দোলায় 'খুকু' ভাবটা এখনো কাটে নি। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ধার ঘেঁষে। হরীশ এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, ইস্কুলে গেলি নে, অসুখ-টসুখ করেনি তো?

না।

দিদিমণিরা বকেছে?

না।

তবে কী? পড়া তৈরি হয় নি?

ও ইস্কুলে আর পড়বো না আমি।—কণ্ঠে কিঞ্চিৎ রুদ্ধ অশ্রুর আভাস।

হরীশ আর প্রশ্ন করলেন না। কাছে গিয়ে হাতখানা পিঠের উপর রাখতেই অশ্রুধারা আর বাধা মানল না।

দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে খুকু যা জানাল তার মর্ম এই—ইস্কুলে একটি নতুন ঝি এসেছে, তার নাম ক্ষেমী। যখন-তখন মেয়েগুলো বিনা কাজে তাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, আর সে-ও সাড়া না দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। 'আমাকে দেখলেই'—কথা শেষ না করেই বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হরীশ আর কথা বললেন না। এর পেছনে যে একটি করুণ ইতিহাস আছে, সেটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু প্রতিকারের পথ তাঁর হাতের বাইরে।

অন্য দশজন মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের মত হরীশ দত্ত সেকেলেও নন, একেলেও নন। বলা যেতে পারে, সেই দলে—যারা মেয়েদের নামকরণে তরুবালা, বিধুমুখী, নন্দরাণীর স্তর পার হয়ে, শোভা, মায়া, সুলেখা, কমলার

কোঠায় বিচরণ করছে। তাঁর এই একমাত্র কন্যাটির জন্যে ঐরকম একটা নামই তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর উপর কারো কথা চলে না। গৃহিণীর পূজ্যপাদ গুরুদেব। মেয়ের জন্মের পর কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মানদা গুরুকে স্মরণ করেছিলেন। তিনি এসে শিশুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই আশ্বাস দিলেন, আর কোনো ভয় নেই মা, স্বয়ং ক্ষেমঙ্করী তোমার ঘরে এসেছেন। গুরুর ইচ্ছায় ঐ পবিত্র নামটিই যখন বহাল রইল, হরীশের মুখ গম্ভীর হলেও, যার নাম তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল দন্তহীন নির্মল হাসি। বড় হয়ে একদিন সে হাসি যে অশ্রু হয়ে দাঁড়াবে, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি।

কন্যার নীরব মর্মপীড়ার উৎস ঐ নামটি হরীশ কোনোদিন উচ্চারণ করেন নি। তাঁর কাছে ও চিরদিন 'খুকু'ই রয়ে গেছে। অন্য সকলের মুখে ক্ষেমঙ্করী ক্রমশ 'ক্ষেমীতে' রূপান্তর লাভ করল এবং স্কুলে ও পাড়ার বন্ধুমহলে ঠাট্টা-কৌতুকের খোরাক যোগাতে লাগল। চরম সংকট এল সেইদিন, যেদিন কোথা থেকে ঠিক ঐ নামে একটি ঝি আমদানি করলেন ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ, এবং মেয়েরা কারণে-অকারণে সময়ে অসময়ে যখন-তখন তাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

ফিরে এসে আবার সেই খবরের কাগজে বৃথা মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন হরীশ, এমন সময়ে গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ। বিনা ভূমিকায় বললেন, তা মান ভাঙাতে পারলে ?

ওর যখন ইচ্ছা নেই, নাই বা গেল একদিন।

কিন্তু না যাবার কারণটা শুনলে তো ?

হরীশ জবাব দিলেন না, হঠাৎ কোন একটা বিশেষ খবরে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তারপরেই এল সেই মোক্ষম অস্ত্র, বয়স্থা মেয়ের মাতারা সুযোগ পেলেই নিরীহ এবং নিষ্ক্রীয় স্বামীদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে থাকেন— মেয়ে তো ধিঙ্গি হয়ে উঠলেন, গলা থেকে নামাতে হবে না ? না, খালি আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুললেই চলবে ?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। হরীশ যে এই দিকটায় একেবারে নজর দেন নি তা নয়। এবার আর একটু সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কয়েকটা সম্বন্ধ উপস্থিত ছিল। তারই একটাকে পাকাপাকি করবার জন্যে লেখালেখি শুরু করলেন। ছেলেটি ডিগ্রিধারী, কোনো একটা শাঁসালো সরকারী চাকরিতে ঢুকব-ঢুকব করছে। বাপও উঁচুমহলের চাকরে ছিলেন ; পেনশন নিয়ে মস্ত বড় বাড়ি ফেঁদে বসেছেন নিউ-আলিপুরে। সচরাচর এসব মহলে আর একটু বেশী বয়সের, পাশ-করা, নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরই চাহিদা। কিন্তু এক্ষেত্রে পাত্রের মা একটু অন্য ধরনের। তার ফলে অতি-আধুনিক বাথরুম, ড্রইংরুম, প্যান্ট্রি, ল্যান্ডিং ইত্যাদির সঙ্গে বাড়িতে একখানা একেবারে সেকেলে ঠাকুরঘরও স্থান পেয়েছিল, এবং গৃহিণী এমন একটি বধূ খুঁজছিলেন যাকে সেখানেও বেমানান দেখাবে না, অন্তত শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে নেওয়া চলবে। হরীশের ঐটুকুই ভরসা। তা ছাড়া মেয়ে

দেখতে সুশ্রী, এবং নাচ না হলেও গানবাজনায় মোটামুটি দখল আছে।

কনে দেখতে এলেন স্বয়ং কর্তা। অতি-মিহি শান্তিপুরী ধুতির উপর গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। কিন্তু এসব ঝঞ্ঝাটে ঠিক অভ্যস্ত নন, কখন ছেড়ে ফেলে শার্ট-ট্রাউজার আশ্রয় করে বাঁচবেন—এমনি একটা ভাব নিয়ে অতি সন্তর্পণে হরীশের ফরাশে এসে বসলেন। কনের ডাক পড়ল। তাকে পাশে বসিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, রবীন্দ্রনাথের কোন্ গানটা তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে, বল তো?

ক্ষেমঙ্করী একটুখানি ভেবে বলল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে'…

'চমৎকার!' বলে উঠলেন ভাবী শ্বশুর, আমারও ভারী প্রিয় ঐ গানটি। মাঝে মাঝে শোনাতে পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।

ব্যাডমিণ্টন খেলতে পার নিশ্চয়ই?

একটু একটু পারি।

'ব্যস্ তা হলেই হল।' হরীশের দিকে ফিরে বললেন, একটা টেনিস-লন করেছি বাড়িটায়। টেনিসের ঝামেলা অনেক, দু-একটা গেম ব্যাডমিণ্টন অন্তত না খেলতে পারলে ভাত হজম হয় না। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আরো দু-একটা নিতান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ কথাবার্তার পর কর্তা বললেন, তোমার নামটা তো শোনা হল না মা-মণি? কী বলে ডাকবো?

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ক্ষেমঙ্করীর। বাবার মুখের দিকে তাকাল, তিনি চেয়ে আছেন অন্য দিকে। তারপর কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে ফেলল, ক্ষেমঙ্করী।

নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। চোখে ফুটে উঠল কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া। শুষ্ককণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা এবার তুমি যেতে পার।

ভদ্রলোক লোক ভাল। 'চিঠিতে খবর দেবো'—বলে অপ্রিয় উত্তরটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর একটি সন্দেশের এক দশমাংশ কোনরকমে মুখে তুলে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, সবই তো ছিল ভাল, কিন্তু ঐ নামটা—বাকীটুকু শেষ না করেই থেমে গেলেন। হরিশ বোঝাতে চেষ্টা করলেন বিয়ের পরে মেয়ের নামের শেষ-অংশটা তো বদলে যাবেই, সেই সঙ্গে প্রথমাংশও বদলে নেওয়া যেতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু কী জানেন, নাম তো শুধু নাম নয়, ওটা পরিচয়; বলতে পারেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠি।—বলে, একটু থেমে মৃদু হাসির সঙ্গে যোগ করলেন, বিবাহটা যন্দুর সম্ভব সমান স্তরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রাত্রে খাবার সময় আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন হরীশ দত্ত। মানদা বললেন, পছন্দ করে নি ভালোই হয়েছে। মিন্সের রকমসকম যেন কেমন-কেমন। কনে দেখতে এসেছিল, তা এত গল্প কিসের? আদিখ্যেতা। মরুক গে,

এবার তুমি সেই বনগাঁর সম্বন্ধটা দেখ। চিঠি লিখে দাও, মেয়ে দেখে যাক। ওদের আগ্রহ আছে।

এ সম্বন্ধটাও ভাল। শিক্ষিত পরিবার। ছেলে এবং বাপ দু'জনেই প্রফেসর। একজন দর্শন, আরেকজন সংস্কৃত। এ ক্ষেত্রেও বাপ এলেন কনে দেখতে। তার দু'দিন আগে থেকে হরীশ আর 'খুকু'তে মিলে কী সব পরামর্শ হল, মানদা কিছু জানতে পারলেন না।

অধ্যাপক বরকর্তা দীর্ঘ সময় ধরে পাত্রীর কররেখা পরীক্ষা করলেন। তারপর খুঁটিয়ে দেখলেন চোখ, মুখ, নাক, কান, চুলের গোছা এবং পায়ের পাতা। বসিয়ে, হাঁটিয়ে, দাঁড় করিয়ে, নানাভাবে পরখ করবার পর প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটা কী বল তো মা।

ক্ষেমঙ্করী মৃদুকণ্ঠে বলল, সবিতা দত্ত।

অধ্যাপকের কপাল কুঞ্চিত হল। হরীশের দিকে ফিরে বললেন, স্ত্রীলোকের নাম সবিতা! নামটা কে রেখেছে জানতে পারি?

—'আজ্ঞে,' বলে থেমে গেলেন হরীশ! ভয়ে ভয়ে তাকালেন পেছন ভেজানো দরজার দিকে, কল্পনায় দেখলেন দুটি রোষকষায়িত চক্ষু। যে-রকম বাজখাঁই আওয়াজ ভদ্রলোকের, এতক্ষণ নিশ্চয়ই পেঁাছে গেছে যথাস্থানে। একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। স্ত্রীর অজ্ঞাতে, গোপনে গুরুদত্ত নামটাকে একটু আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও যে আবার নতুন সমস্যা দেখা দেবে, কে ভেবেছিল?

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন অধ্যাপক, আপনার দোষ নেই। পুত্রকন্যার নামকরণে লিঙ্গ প্রকরণ অগ্রাহ্য করাই এ যুগের ফ্যাশান। তাই আমরা ছেলের নাম রাখি শান্তি, আর মেয়ের নাম দিই সবিতা।

হরীশ মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললেন, কিন্তু 'সবিতা' কথাটি আকারান্ত। তা ছাড়া—

বাধা দিয়ে শ্লেষ মিশিয়ে বললেন অধ্যাপক, আকারান্ত শব্দ হলেই যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহলে পিতাও স্ত্রীলিঙ্গ। স্বয়ং 'বিধাতা'ও ঐ দলে পড়বেন। আপনার বোধহয় জানা নেই, মূল শব্দটি হচ্ছে সবিতৃ, যার অর্থ সূর্য। সহস্র-লোচন মহাতেজোময় ভাস্কর—তাকেও আজ স্ত্রীলোকের আসনে নেমে আসতে হল। হায় কলিকাল!

বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জলযোগের অকৃপণ আয়োজন। ব্যাকরণ-নিষ্ঠার অভাবহেতু বিরাগ যতই হোক, ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি অনুরাগের অভাব দেখা গেল না। পাত্রী অপছন্দ করলেও, তার পিতাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, আধুনিক নামকরণ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করবেন।

এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই বর-সন্ধান কিছুদিন বন্ধ রইল। কিন্তু সে ঐ কিছুদিন মাত্র। উঠতে বসতে গৃহিণীর বাক্যবাণ হরীশকে আবার

প্রজাপতি অফিসে নিয়ে ফেলল। ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত পাত্রও জুটে গেল আর একটি। সিভিল-ইনজিনিয়ারিং পাশ করে ট্রেনিং-এ আছে কোন ফার্মে। বাপ ডাক্তার, মা লেখিকা। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে কনে দেখতে এলেন। একথা-সেকথার পর আবার সেই নাম জিজ্ঞাসা। পূর্ব-বন্দোবস্ত মতো উত্তরটা এবার কানে দিল না, দিলেন তার বাবা। বললেন, ডাকনাম একটা আছে, পোশাকী নাম ইচ্ছা করেই রাখি নি।

কেন বলুন তো? জানতে চাইলেন লেখিকা।

হরীশ বললেন, ভেবে দেখলাম, মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা শুধু গোত্রান্তর নয়, জন্মান্তর। নতুন ঘরে গিয়ে মানুষটাই যখন নতুন হয়ে যাবে, তখন সঙ্গে করে একটা পুরনো নাম টেনে নিয়ে গিয়ে কী লাভ? মেয়ে যদি আপনার মনে লাগে, মনোমত নামও একটা আপনারাই দিয়ে নেবেন।

লেখিকা মিষ্টি-সুরে হেসে উঠলেন। গলাটা যদ্দূর সম্ভব মিহি করে বললেন, সুন্দর বলেছেন কিন্তু। বিয়েটা গোত্রান্তর নয়, জন্মান্তর। চমৎকার একটা literary flavour, মানে সাহিত্যের গন্ধ আছে আপনার কথায়। বেশ. তাই হবে; নাম আমরাই রাখবো।

'আমরা' আর বলছ কেন? বললেন ডাক্তার স্বামী, ওটা তোমারই এলাকা, তুমিই রেখো। একটা দেখে-শুনে।

স্ত্রী খুশী হলেন। কথাবার্তা হয়ে গেল।

ক্ষেমঙ্করীর বিয়ে হয়ে গেছে। নাম-সমস্যা এখনো মেটে নি; কনে-পক্ষের কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে ভর করেছে বর-পক্ষের ঘাড়ে। নিজের সৃজনী-শক্তির উপর নির্ভর না করে লেখিকা শ্বশ্রূ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘাঁটতে শুরু করেছেন কালিদাস থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক লেখকদের গাদা গাদা উপন্যাস। কত নতুন নতুন নাম—লিপিকা, রুচিরা, প্রহেলিকা, কুহেলিকা, দুন্দুভি, সুস্মিতা, শর্মিষ্ঠা, অরুন্ধতী, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বল্লরী, বাসবী, নির্বিন্ধা, বেতসী, সংঘমিত্রা…মনে লাগছে না কোনোটাই। ধরনা দিয়েছেন মেয়ে-ইস্কুল এবং মহিলা-কলেজের দরজায়, তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন রাজশেখরের চলন্তিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার। পছন্দমতো নাম পাওয়া যায় নি।

ডাক্তারের ফিরতে রাত হয়। সেদিন এগারোটায় খাবার টেবিলে এসে দেখলেন স্ত্রী অনুপস্থিত, পরিবেশন বরছে পুত্রবধূ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কোথায়?

—পড়বার ঘরে।

—এত রাত্রে আবার কী পড়ছেন?

বধূর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বলল, পড়ছেন না।

—তবে?

উত্তর না পেয়ে হেসে উঠলেন শ্বশুর, ও. নাম খুঁজছেন বুঝি?

ঠিক সেই সময়ে দেখা দিলেন গৃহিণী, কী হল? এত হাসি কিসের?

—হ্যাঁ, শোনো, আজকে একটি রুগী দেখে এলাম। নামটি ভারি চমৎকার

—কানন-কুন্তলা। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

—তা আর হবে না! তোমার পছন্দ তো! তার চেয়ে 'কপালকুণ্ডলা' রাখলে তো আরো ভালো হয়।

—তা যাই বল, বঙ্কিম চাটুজ্যের নামগুলো কিন্তু বেশ। কুন্দনন্দিনী, তিলোত্তমা, সূর্যমুখী, শৈবলিনী, ললিত-লবঙ্গলতা। শুধু ঝঙ্কার নয়, বেশ খানিকটা ওজন আছে শব্দগুলোর। আজকাল যারা লিখছেন, তাদের এই ওজন কোথায়? সব হালকা। শুধু রঙ আর ঢঙ। বস্তু বলে কিছু নেই।

—হয়তো তাই, একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন গৃহিণী, তবে একথাও ঠিক, যা-কিছু একালের তাকে সস্তা আর হালকা বলে উড়িয়ে দেওয়াও একরকমের সেকেলে ঢঙ। বৌমা তুমি শুতে যাও। সেই জন্যেই আমার লেখা দেখলেই তোমার নাক কুঁচকে ওঠে।

—আহা! এর মধ্যে তোমার আম্মার কথা আবার এল কোত্থেকে?

উত্তাপ বাড়তে লাগল। ক্ষেমঙ্করী ততক্ষণে বিছানায় গিয়ে ঝুপ্ করে শুয়ে পড়েছে! পাশের ব্যক্তিটি তখন কপট নিদ্রায় নিশ্চল। সুতরাং সে-ও যথারীতি পেছন ফিরে নিদ্রাব ভান করে পড়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পরে সমীরই হার মানল। স্ত্রীর কাঁধের পাশটা ধরে এদিক ফেরাবার চেষ্টা করে বলল, এই, কোথায় ছিলে এতক্ষণ!

—ছাড়ো, ঘুম পেয়েছে।

—বেশ, আমারো তা হলে ঘুম পেয়েছে, বলে সেও পেছন ফিরে পাশবালিশ আশ্রয় করল! মিনিট কয়েক কেটে গেল নিঃশব্দে। আবার হার হল সমীরের, এদিকে ফিরে বলল—এই, শুনছ? আরে শোনোই না…।

পাশ ফিরল ক্ষেমঙ্করী। স্বামীর বুকের মধ্যে সরে এসে নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে বলল, কী দস্যিরে বাবা। বলো, কী বলছিলে।

নাম তার আছে কি নেই, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই পাশের মানুষটির। শুধু একটা 'এই' কিংবা 'শুনছ'।

বধূর নাম-সমস্যা উপলক্ষ করে শ্বশুর-শাশুড়ীর উত্তেজিত স্বর তখনো জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল। ক্ষেমঙ্করীর হঠাৎ মনে হল বিশ্বসংসারে সকলের কাছেই বোধকরি নামের প্রয়োজন, নামের মধ্য দিয়েই তার পরিচয়। একটিমাত্র স্থান, যেখানে সে শুয়ে আছে সেখানে সে নামাতীত। এই একটি মাত্র মানুষের কাছে সে 'অনাম', 'অনির্বচনীয়'।"

দাগী

গভীর রাত। কী একটা শব্দ কানে যেতেই আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম: বালিশের পাশে টর্চ থাকে, হাতড়ে পাওয়া গেল না। সকাল সকাল উঠতে হয় বলে হাত ঘড়িটা শিয়রে নিয়ে শুয়েছিলাম। তা-ও দেখলাম, নেই। বারান্দার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। এ কি! দরজা

খুলল কে ? পাশের ঘরে স্ত্রী ঘুমুচ্ছেন ছেলেদের নিয়ে । তার ওদিকের ঘরটায় আছেন মা । ওঁদের ডাকতে যাবো, এমনি সময়ে হঠাৎ মার ঘর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে এল একটা রোগা মতন লোক, এবং কী করবো ভেবে দেখবার আগেই আমার খোলা দরজা দিয়ে ছুটে চলে গেল । 'চোর' 'চোর' বলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম ।

পাশের বাড়িতে থাকে আমার বিশ্বস্ত এবং অনুগত সিপাই, রাজারাম সিং আর তার কুস্তিগীর শ্যালক বির্জাপ্রসাদ । চিৎকার শুনে তারা বেরিয়ে এল । অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চোর তখন মাঠ পাড়ি দিচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে নি । বির্জাপ্রসাদ বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল । পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেল-কলোনি ভেঙে পড়ল আমার বারান্দায় । বাবুদের হাঁকডাক, মহিলাদের কলরব এবং সিপাইদের আস্ফালনে আসর যখন রীতিমত সরগরম, ঠিক তেমনি সময় কুস্তিগীরের ঘাড়ে চড়ে চোরের ক্ষীণ দেহ ঝুলতে ঝুলতে এসে উপস্থিত । একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা টর্চ আর হ্যারিকেনের আলো পড়ল তার রক্তাক্ত মুখের ওপর । এ কি ! এ যে আমাদের মহানন্দ !

চোরের জ্ঞান ছিল না । সুতরাং বারান্দা দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল । স্ত্রী ছুটে এলেন জলের বালতি আর পাখা নিয়ে, মা হায় হায় করতে লাগলেন । আমি পঁচিশ হাত দূরে আমাদের ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়া আর গলার জোরের সাহায্যে তাঁদের জাগ্রত নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করে চললাম ।

মহানন্দ গোস্বামী মাসখানেক আগে আমার জেল থেকে খালাস পেয়েছে । চুরি-অপরাধে ছ'মাস সাজা, আর তার সঙ্গে ছিল এক বছরের "পুলিশ পি আর"। অর্থাৎ খালাসের পরেও একবছর তাকে পুলিশ-থানায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে সে কী করে, কোথায় থাকে, কোন্ দিকে তার গতিবিধি । জেলে সে ছিল স্বনামধন্য 'বি-কেলাস' । অর্থাৎ এর আগে আরো বার দুই সে এই লম্বা ব্যারাকগুলো পবিত্র করে গেছে । গোঁসাইবংশের ছেলে । পৈতৃক পেশা ছিল পৌরোহিত্য । যজমানের পারত্রিক মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তার পূর্বপুরুষ । মহানন্দ নিল তাদের ঐহিক ভার-মুক্তির কাজ । কিন্তু এ যুগের যজমানদের রসবোধ নেই । পুরোহিতের চালকলা-ফলমূলপূর্ণ পোঁটলার মধ্যে তাদের দুএকখানা বস্ত্র-অলঙ্কার যখন আবিষ্কৃত হল, একে তারা যাজকবৃত্তির অঙ্গ বলে স্বীকার করল না । শরণ নিল পুলিশের । পরের ঘটনা যথারীতি ।

জেলের মধ্যে মহানন্দের কাজ ছিল 'ডালখাটনি' । একমণ ছোলা, মটর, বা মশুরি জাঁতায় পিশে ডাল তৈরি করা ছিল তার দৈনন্দিন বরাদ্দ । কাজে তার অবহেলা ছিল না । এ নিয়ে কোনো নালিশও সে করেনি কোনদিন কর্তৃপক্ষের দরবারে । মনে আছে এক সোমবারের 'ফাইলে' কয়েদীদের 'নালিশ-নিবেদনে'র সময় তারও একটা ছোট্ট 'নিবেদন' একদিন শুনতে হয়েছিল—

—আমাকে ডিগ্রিতে থাকবার হুকুম দিন হুজুর।

—কেন ?

মহানন্দ জবাব না দিয়ে তাকাল 'মেটের' দিকে। মেট জানাল, সকাল-সন্ধ্যায় ঠাকুর একটু আহ্নিক-টাহ্নিক করে, স্যর। বি-কেলাসগুলো ঐ নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে।

মহানন্দ বলল, ঠাট্টা করে করুক। তাতে আমার কোন অসুবিধে নেই। 'সন্ধ্যা' করতে বসলেই বাসি কাপড়ে এসে ছুঁয়ে দেয়। হাতে পায়ে ধরে অনেক করে বললাম। তা—।

হঠাৎ একদিন মহানন্দের নামে গুরুতর রিপোর্ট—সে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হলেন। শেষটায় স্বদেশী বাবুদের খপ্পরে পড়ল—বি-কেলাস মহানন্দ! কড়া পানিশমেন্ট দরকার।

হেঁকে বললাম, খাওয়া ছেড়েছিস কেন ?

কোনো উত্তর নেই। হাত দিয়ে শুধু গলাটা দেখিয়ে দিল।

কী ব্যাপার ? গলায় অসুখ নাকি ? ডাক্তার জানালেন লোকটাকে যথারীতি পরীক্ষা করা হয়েছে, গলায় বুকে বা অন্য কোথাও কোনো দোষ পাওয়া যায় নি।

হাঙ্গার-স্ট্রাইক যে কী মারাত্মক অপরাধ এবং তার পরিণাম কত কঠোর—এ সম্বন্ধে আসামীকে যথারীতি হুঁশিয়ার করে আপাতত তাকে cell এ পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরদিন যখন নাকের ভিতর নল চালিয়ে জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে, 'ডালখাটনি' দফার একজন কয়েদি এসে ডাক্তারকে জানাল, ও হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে নি, বাবু। রাত্তিরে যখন ঘুমুচ্ছিল, কে ওর পৈতে খুলে নিয়েছে। সেই থেকে কথাও বলছে না, খাচ্ছেও না।

ব্যাপারটা তাই কিনা জিজ্ঞেস করতে মহানন্দ জোরে জোরে হাঁ-সূচক মাথা নাড়তে লাগল।

অতঃপর একটা পৈতে দিয়েই সে যাত্রা হাঙ্গার-স্ট্রাইক দমন করা গেল।

মাস-দুয়েক জাঁতা ঘোরাবার পর মহানন্দকে বাইরে 'পাশ' করা হল। লোহার কড়া পায়ে পরে কিছুদিন কোদাল চালাল জেলের বাগানে, শেষটা প্রমোশন পেল বাবুদের 'বাসাখাটনির' তিন নম্বর দফায়। জেলের কেতাবে তার নাম 'জলভরি' বা Water carrying gang, সেখানে যেতে হলে প্রাথমিক পাসপোর্ট—কর্তৃপক্ষের প্রসন্ন দৃষ্টি।

Water-carrying অর্থাৎ বাসায় বাসায় জল যোগানো হল এদের সরকার-নির্দিষ্ট কর্ম। কিন্তু বেসরকারি কার্য-তালিকা পরিধি অনেকখানি। সেখানে মহানন্দ এবং তার বন্ধুরা মহানন্দে বাটনা বাটে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড় কাচে, বিছানা ঝাড়ে এবং বিনিময়ে পায় নারী এবং শিশু-কণ্ঠ-মুখরিত সহৃদয় গৃহস্থ-জীবনের আস্বাদ।

আমার বাড়িতে জল সরবরাহের ভার পড়েছিল মহানন্দের ভাগে। একদিন

সকালবেলা কোনো কাজে অফিস থেকে ফিরে দেখি, বারান্দায় অপূর্ব দৃশ্য। মহানন্দের মুখে দড়ির লাগাম, পিঠে কম্বলের জিন। তার উপর বসে আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান মহা উৎসাহে অশ্বচালনা করছেন,—'হেৎ, গোলা, হেৎ'। গৃহিণীকে ডেকে বললাম, ও আমাদের ঘরের চাকর নয়, সেটা ভুলে যাও কেন?

তিনি একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন, আমি ভুলি নি। ও-ই সেটা ভুলে যায়, বার বার মনে করিয়ে দিলেও শোনে না।

সুতরাং ব্যাপারটায় আমাকেই হাত দিতে হল। মহানন্দকে বুঝিয়ে দিলাম, সে সরকারের কয়েদি মাত্র; এ ছাড়া তার সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।

যে-আজ্ঞে, বলে সে চলে গেল। আড়াল থেকে মনে হল তার চোখদুটো ছলছল করছে।

কয়েকদিন পরে দেখলাম, সকালবেলা মহানন্দ বাড়ি ঢুকছে, তার পরনের কাপড় ভিজে, হাতে ফুলের সাজি। মা ভিতরের বারান্দায় বসে ছিলেন। সাজিটা পাশে রেখে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কাজে গিয়ে লাগল। এতদিন মায়ের এই পূজার ফুল-সংগ্রহের কাজটি ছিল একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দুস্থানী সিপাই-এর হাতে। এ বিষয়ে মা অত্যন্ত বাছবিচার করে চলেন।

* * *

কিছুক্ষণ জলঢালা এবং পাখা চালাবার পর মহানন্দ উঠে বসল। রাত আর নেই। বাইরেটা ফর্সা হয়ে আসছিল। ওর পাশেই পড়ে রয়েছে সদ্যসংগৃহীত চোরাই মালের পুটলি। দু'খানা পুরানো শাড়ি আর সের দুয়েক চাল। সেদিকে একবার তাকিয়ে সে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল।

আমি বললাম, ঘড়িটা কী করেছিস?

মাথা তুলে বলল, ঘড়ি আমি নিই নি হুজুর। ওটা নিয়েছে বিপিন।

বিপিন! ও, তা হলে দল বেঁধে আসা হয়েছিল। আর কে কে ছিলেন?

মহানন্দ সে কথার উত্তর দিল না। বিড়বিড় করে অনেকটা যেন আপন মনে বলল, দু'দিন একেবারে উপোস। কিছু জোটাতে পারি নি। বয়স্থা মেয়েটা ঘরের বার হ'তে পারে না। সিঁদকাঠি নিয়ে গাঁয়ের দিকে বেরিয়েছিলাম। পথে বিপিনের সঙ্গে দেখা। বললে, জেলখানায় চল। কী দুর্মতি হল…

প্রশ্ন করলাম, মার ঘরে গিয়েছিলি কী জন্যে? আরো কিছু নেবার মতলব ছিল বুঝি?

মহানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ঠাকুরমাকে অনেক দিন দেখি নি। ভাবলাম, একটু পায়ের ধুলো—

কথাটা শেষ হল না। মনে হল, গলাটা ধরে গেল। মা আস্তে আস্তে উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সিপাইরা আবার সদলবলে ফিরে এল। বাবুরাও কেউ কেউ এলেন। ডাক্তারবাবু এতক্ষণে তাঁর রবারের নলটা গলায় ঝুলিয়ে এসে

পৌঁছলেন। ঐ জিনিসটা চোরের বুকে একবার ঠেকিয়ে, ডান হাতের কব্জিটা একটুখানি ধরে বললেন, কিচ্ছু হয়নি ব্যাটার। Quite all right, আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, মলয়বাবু আমাদের একটুতেই ঘাবড়ে যান। আরে মশাই, যাকে বলে বি কেলাস ঘুঘু। ও কি অত সহজে টসকায়। ছেড়ে দিন, এখুনি দেখবেন, তিন বাড়ি চুরি করে বাড়ি গিয়ে ভাত খাচ্ছে।

সিপাইরা বিপুল উৎসাহে শক্ত দড়ি দিয়ে চোরকে বাঁধল। তারপর মাল সুদ্ধ নিয়ে গেল থানায়। লোকটা যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল, আমার স্ত্রী হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। কী একটা বলতে গেলেন, বললেন না। বিশ্বস্ত জেলকর্মচারীর সহধর্মিণী। বোধহয় বুঝলেন, বলবার কিছু নেই।

গড়ের মাঠ

রোমন্থন ক্রিয়াটি বৃদ্ধ বয়সের সাধারণ ধর্ম। কারো কারো বেলায় এটা আবার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। সারা জীবনে যিনি দরকারী চিঠি এবং সরকারী রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু লেখেননি, শেষ বয়সে স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে তাঁরও হঠাৎ লেখক হবার সাধ জাগে।

ভূতপূর্ব পুলিশ-ইনসপেকটর কুঞ্জলাল সাহা একজন কড়া ও কর্মঠ অফিসার বলে উপরমহলে কিঞ্চিৎ সুনাম এবং নীচের মহলে প্রচুর দুর্নাম লাভ করেছিলেন। সম্প্রতি পেনসন লাভ করবার পর এই দুটি মূলধন কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ একখণ্ড বৃহৎ স্মৃতিকথা ফেঁদে বসেছেন। মাথার মধ্যে মালমশলার অভাব নেই। সেগুলির অবয়ব দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়েছেন। জিনিসটা যদি ইংরেজীতে লেখা চলত তাহলে বিশেষ ভাবনা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা না থাকলেও দীর্ঘজীবন অনেক সাহেব-সুবো নিয়ে ঘর করতে হয়েছে, ইংরেজিটা সহজেই আসে, তার মধ্যে না-ই বা রইল ব্যাকরণের বন্ধন, কিংবা ইডিয়মের বালাই। কিন্তু বাংলা ভাষাকে বাগ মানানো রীতিমত কসরতের ব্যাপার। অথচ পাঠক পেতে হলে তাছাড়া আর উপায়ও নেই। ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজির মান চলে গেছে। এখন পুলিশ-সাহেবের জায়গায় এসেছে আরক্ষাধ্যক্ষ। কটমটের জয়জয়কার।

অগত্যা এ. টি. দেবের শরণ নিয়েছেন কুঞ্জবাবু। সেই বৃহদাকার ইংলিস-টু-বেঙ্গলি ডিকশনারী সামনে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন।

রোজকার মত সকালে চায়ের পাট মিটিয়েই লেখা নিয়ে বসেছিলেন। ভগ্নদূতের মতো গৃহিণীর আবির্ভাব। কুঞ্জবাবু চোখ তুলতেই বললেন, বসেই তো আছ; বাজারটা একবার ঘুরে এসো না?

কেন, বংশী কোথায় গেল?

বংশীর কি আর অন্য কাজ নেই? ছিষ্টি সংসারের ঊনকোটি ঝামেলা, আর ঐ একটা তো চাকর। তাছাড়া, (গলা খাটো করলেন গৃহিণী) একেবারে

দুহাতে গলা কাটছে আজকাল। ষোল আনার চার আনাই পাপ, কাঁহাতক পারা যায়, বল ?

একটু কাজ করব ভাবছিলাম, অপ্রসন্ন মুখে আমতা-আমতা করে বললেন কুঞ্জলাল। গৃহিণীর চোখমুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললেন, কাজ মানে তো ঐ ডিকশনারী দেখে দেখে কথার মানে লেখা ? ওটা বরং খোকাকে দিও। তোমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।

সামনেই খোলা রয়েছে এ. টি. দেব। বলবার কিছু নেই। স্ত্রীর খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করে কুঞ্জবাবু উঠে পড়লেন।

পরদিনও ঐ একই সময়ে বাজারের থলে এবং তার সঙ্গে লম্বা ফর্দে-জড়ানো একখানা দশটাকার নোট টেবিলের উপর রেখে গৃহিণী বিনা বাক্যব্যয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। কুঞ্জলাল বিরক্ত হলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার সুযোগ পেলেন না, তাতে কোনো লাভও হত না। এ বিপদ থেকে কৌশলে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় বাজারের পথে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চললেন। পাকা পুলিশী মাথা। বেশীক্ষণ ঘামাতে হল না। দেখতে দেখতে একটি চমৎকার ফন্দি জুটে গেল।

প্রথমেই পাঁচপো আলু কিনে ওখান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে নিলেন। একখানা পাঁচটাকার নোট, বাকীটা এক টাকা আর খুচরো। বড় নোটখানা সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললেন এবং চারটাকা ক-আনায় যা হয়, তাই কিনে নিয়ে মুখ শুকনো করে বাড়ি ফিরে এলেন।

থলে উজাড় করে গৃহিণী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, এ কী করেছ ! মাছ কৈ ? পটল কৈ ? তখন থেকে কড়া চড়িয়ে বসে আছি। খোকার ইস্কুল, মায়ার কলেজ। ওদের ভাত দেবো কী দিয়ে ?

কুঞ্জবাবু মুখখানা আরো কাঁচুমাচু করে বললেন, পাঁচটাকার নোটখানা হারিয়ে এলাম।

ওমা ! সে কি কথা ? চোখ কপালে তুললেন গৃহিণী।

আলুর দোকান থেকে চেঞ্জ বুঝে নিয়ে পকেটেই রেখেছিলাম, বেশ মনে আছে। মাছ কিনতে গিয়ে দেখি, নেই। কে কখন তুলে নিয়েছে ! বা ভিড় !

গৃহিণী একেবারে থ' মেরে গেলেন। এই বাজারে পাঁচ-পাঁচটা টাকা !

কুঞ্জবাবু ঘরে গিয়ে নোটখানা টানায় বন্ধ করতে করতে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলেন এর পরে আর বাজারের দুর্ভোগ নিশ্চয়ই তাঁকে ভুগতে হবে না। সকালবেলাটা এমন করে নষ্ট করলে চলে না। তখনই লেখাটা আসে। মাথা সাফ থাকে। ইনস-পিরেশন পাওয়া যায়। কথাগুলো চটপট জুটে যায়। বাধা পড়লে সারাদিনটাই মাটি।

পরের সকালটা নির্বিঘ্নে কাটল। বেশ কয়েক পাতা এগিয়ে গেল স্মৃতি-

কথা। পরদিন যথাসময়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গৃহিণীর প্রবেশ। তার পিছনে দরজায় ওপাশে থলে হাতে বংশী। রান্না চাপিয়ে এসেছেন। দাঁড়াবার সময় নেই। তাড়া দিয়ে বললেন, চট করে ওঠো। অনেক জিনিস বাড়ন্ত। এই নাও ফর্দ। দেখো যেন এটা আবার হারিয়ে না যায়। টাকা বংশীর কাছে রইল। যাকে যা দিতে হবে, বলে দিও। ও-ই দেবে।

বলেই চলে যাচ্ছিলেন। কুঞ্জবাবু মাথার পেছনটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, বংশী যখন যাচ্ছে, তখন আবার আমার যাবার কী দরকার?

আহা, ওকি আর বাজার করতে যাচ্ছে? কী বললাম সেদিন? ওকে সঙ্গে দিলাম টাকা-পয়সাগুলো সাবধান করে রাখবার জন্যে। রোজ রোজ তো আর একখানা পাঁচ টাকার নোট গচ্চা দেওয়া যায় না।

সেদিন নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন কুঞ্জলাল। আজ দেখলেন অর্ধাঙ্গিনীর অর্ধেক বুদ্ধিও তাঁর ধড়ে নেই।

কুঞ্জবাবু তার রোজকার রুটিন খানিকটা রদবদল করতে বাধ্য হলেন। সকালে উঠে চা-পর্ব শেষ করে নিজেই গরজ করে বাজারে বেরোন। ফিরে এসে চাকরি জীবনে যা করতেন, দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলেন। একটু বিশ্রাম করেই লেখা নিয়ে বসেন। এর মধ্যেই দিবানিদ্রার অভ্যাস খানিকটা পেয়ে বসেছিল। তার উপরে ঘা পড়ল। উপায় কি? সংসারে সব দিক বাঁচিয়ে চলা যায় না। একটা ধরতে গেলে আরেকটা ছাড়তে হয়। অ্যাডজাস্টমেণ্ট অ্যাণ্ড রি-অ্যাডজাস্টমেণ্ট। এই তো জীবন।

কিন্তু বেকার লোকের কাজের অন্ত নেই। কথাটা শুনতে প্যারাডাকস—অর্থাৎ স্ববিরোধী উক্তি বলে মনে হলেও আসলে খাঁটি সত্য। কুঞ্জলাল এই ক'দিনেই সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন। সপ্তাহে বিনা বাধায় কাটে না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রার্থী-প্রত্যাশী—সব মিলিয়ে পরিচিত মহলা তো ছোট নয়। কত হরেক রকম দাবি নিয়ে আসে তারা। কারো বন্দুকের লাইসেন্স, কারো পাকিস্তানের পাসপোর্ট, কারো বা বাড়ি তৈরির লোন কিংবা ইনকামট্যাকসের মামলা। কে ইনক্রিমেণ্ট পায়নি, কার ট্রানসফার চাই, কে প্রমোশন-প্রার্থী; এ অফিস থেকে সে-অফিসে তদ্বির করে বেড়াও। না গিয়ে পারা যায় না। সবার মুখেই এক কথা—'আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায়', 'তোমার তো ওখানে বেজায় খাতির হে', 'আপনি না দেখলে কে দেখবে দাদা'—ইত্যাদি।

চাকরি থেকে অবসর নিয়েও অবসর নেই কুঞ্জবাবুর। কাজ না করলেও নানাজনের কাজের ধাঁধায় ঘুরে বেড়ান অফিস পাড়ায়।

গৃহিণী মনে মনে খুশী। যে পুরুষ দুপুরবেলা ঘরে বসে থাকে, প্রতি-বেশিনী সমাজে তার স্ত্রীর কোনো মান নেই। 'বাবু কী করেন?' এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। এ তো শুধু প্রশ্ন নয়, বেকার স্বামীর স্ত্রী বেচারাকে বেকায়দায় ফেলবার ফন্দি। 'উনি লেখেন'—একথা বলে পার

পাবার উপায় নেই। তার পরেই দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাতো বুঝলাম, কিন্তু করেন কী? চাকরিজীবী পরিবারে দশটা থেকে পাঁচটা একচ্ছত্র গৃহিণীরাজ। সে রাজ্যে কর্তাদের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত, নারী সেখানে সাত ঘণ্টার স্বরাজ।

কুঞ্জবাবু যে দুপুরবেলাটা বাইরে বাইরে কাটিয়ে দেন, এও তার একটা কারণ। স্ত্রীর মুখরক্ষা। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। যেখানে নিজের কোনো লাভ নেই, অর্থ-প্রাপ্তির যোগ নেই, কেবল মাত্র পরার্থে পরিশ্রম—কত দিন আর সহ্য হয়? তাছাড়া লেখাটাও এগুচ্ছে না। সুতরাং বেগার খাটার ঘোরানি কিছুদিন পরেই বন্ধ করতে হল। কোনো কোনো আত্মীয় অসন্তোষ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু কুঞ্জবাবু নিরুপায়।

এই সময়ে একদিন পিসশাশুড়ী এলেন এক নতুন অনুরোধ নিয়ে। তাঁর বড় মেয়েটি ক্লাইভ স্ট্রীটের কোন এক সওদাগরী অফিসে চাকরির দরখাস্ত করেছিল। কর্তৃপক্ষ ইন্টারভিউ মঞ্জুর করেছেন। সময় দিয়েছেন সোমবার বেলা দুটো। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখাটা করিয়ে আনতে হবে। জামাতাকে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধা অনুনয়ের সুরে যোগ করলেন, আর কাকে বলি বাবা? সবাই কাজের মানুষ। তুমি যদি এই উপকারটুকু না করো—ইত্যাদি।

কুঞ্জবাবু বললেন, কিন্তু সুমিতা তো বেশ চটপটে মেয়ে। তার ওপরে আই-এ পাশ করেছে। একা যেতে পারবে না?

এবার উত্তর দিলেন স্ত্রী—কী যে বল, তার ঠিক নেই। অফিস-পাড়ায় ভিড়। ছেলেমানুষ; কোথায় যেতে কোথায় চলে যাবে। তাছাড়া সঙ্গে কেউ না থাকলে ঘাবড়ে যাবে না?

এর পরে আর কথা চলে না। কুঞ্জলালকে যেতেই হল।

চাকরি একটি। তার জন্যে পনর-ষোলটি মেয়েকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এক-এক জনকে মিনিট দশেকের আগে ছাড়ছে না। সুমিতার পালা যখন এল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ততক্ষণ একটা তিনদিক-বন্ধ ছোট্ট ঘরে বিদ্যুতের কড়া আলোর নীচে এক গাদা মানুষের ভিড়ে একনাগাড়ে বসে থেকে থেকে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। ম্যানেজারের ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে লিফটের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। ওখানেই একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন কুঞ্জবাবু। কাছে গিয়ে মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, উঃ বাঁচলাম। চলুন, জামাইবাবু।

হল? উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন কুঞ্জবাবু।

হ্যাঁ; এতক্ষণে দয়া করে ছাড়লেন কর্তারা।

কী রকম বুঝলে?

কী করে বলবো? কাজের কথা একটাও না। কেবল কতগুলো আজে-বাজে প্রশ্ন।

ওকেই বলে পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

টেস্ট না ছাই। লোকগুলো যেন কী রকম! মরুকগে। বাঃ, কি সুন্দর

হাওয়া দিচ্ছে। চলুন না জামাইবাবু। ঐ মাঠে একটু বেড়াই।

'বেড়াবে?' বলে চারদিকে একবার তাকালেন কুঞ্জবাবু। ক্লান্ত-বর্ষণ শরতের ছায়া-ঢাকা বিকালটা সত্যিই বেশ মনোরম। অদূরে মাঠের বুকে সবুজ-ছাওয়া মুক্তি। পিঞ্জরাবদ্ধ সহরবাসীর কাছে তার ডাক অলঙ্ঘনীয়। তারই স্বীকৃতি বেরিয়ে এল সুমিতার মুখ থেকে—'বাড়ি ফেরা মানেই তো সেই দেড়খানা ঘরের খাঁচা।'

'চল।' বলে এগিয়ে চললেন কুঞ্জলাল। কার্জন পার্কের কাছে এসে বললেন, শুধু হাওয়া খেলে তো আর পেট ভরবে না। একটু চা'এর জন্যে প্রাণটা টা টা করছে। আগে চল; একটা রেস্তোরাঁয় ঢোকা যাক।

সে বিষয়ে সুমিতার নিজের গরজও কম ছিল না। তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপাদেয় চর্ব্য বস্তুর প্রয়োজনও বোধ করছিল। ভগ্নীপতির প্রস্তাবে মনে মনে খুশী হল। কিন্তু বাইরে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বলল, আপনি ঘুরে আসুন, আমি এখানে বসি।

কেন?

ওসব রেস্তোরাঁ-ফেস্তোরা আমার ভালো লাগে না।

লক্ষণ তো ভালো নয়। মন্তর-টন্তর নিয়েছ নাকি?

সুমিতা হেসে উঠল, হ্যাঁ; ঐটাই বাকী আছে।

তাহলে আর আপত্তি কী? তোমার বয়সে তোমার দিদিকে ঐ পর্দা ঢাকা খোপের মধ্যে একবার ঢোকালে আর বের করে আনা যেত না।

তার কারণ ছিল।

কী কারণ?

আপনারা জানেন। আমি কেমন করে বলবো ঃ আমি কখনো ঢুকেছি নাকি ওখানে?

সেদিন তো আসছে। তার আগে রিহার্সালটা হয়ে থাক না।

সুমিতার সুগৌর মুখের উপর একটি লজ্জার আভা খেলে গেল। কুঞ্জবাবু শ্যালিকার পিঠের উপব হাত রাখলেন। সেই ভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন মোড়ের দিকে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাঠে যখন পড়লেন, তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পশ্চিম আকাশের দিকে নজর পড়ল কুঞ্জলালের। বললেন, বেশ মেঘ করেছে। ঘুরবে, না বাড়ি যাবে?

কোথায় মেঘ? আপনি ভারী ভীতু।

ভীতু কি আর সাধে? তোমার মত রক্তের তেজ তো নেই। বৃষ্টিতে ভিজে নিমুনিয়ায় ধরলে বুকে পুলটিস লাগাবে কে?

কেন, দিদি? মুখ টিপে হাসল সুমিতা।

হ্যাঁ, দিদিকে কে দেখে তার ঠিক নেই। কোমরে বাত, হাঁটুতে খচখচ, দাঁতে কনকনানি।

বেশ ; পুলটিসটা না হয় আমি গিয়ে লাগিয়ে দেবো।

বাঃ, তাহলে আর ভাবনা কি ? এরকম নরম নরম মিষ্টি হাতের সেবা পেলে রোজ নিমুনিয়া বাধাতে রাজী আছি।

শ্যালিকার বাঁ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে যেন নতুন উৎসাহে পা চালালেন কুঞ্জবাবু।

ময়দানের ভিতরে যে রাস্তাগুলো, তাতেও গাড়ি ঘোড়া লোকজনের ভিড়। সে সব এড়িয়ে ওঁরা খোলা মাঠে পড়লেন। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন দক্ষিণ দিকে। খানিকক্ষণ হাঁটবার পর কুঞ্জবাবু কিছুটা ক্লান্তি বোধ করে বললেন, এসো, একটু বসি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। এরই মধ্যে চারিদিকটা কখন অন্ধকার হয়ে গেছে গল্পে গল্পে দুজনের কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ মেঘের ডাক কানে যেতেই নজর পড়ল। আকাশের দিকে চেয়ে কুঞ্জবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ আশে পাশে দু'চারটি লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বোধহয় মেঘের তোড়জোড় দেখে সরে পড়েছে। নির্জন ফাঁকা মাঠ। তার উপরে আকাশ ভেঙে আসছে। সুমিতার বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। কুঞ্জবাবু তাড়া দিলেন, 'চল, চল, জল আসছে।' কয়েক পা এগোতে না এগোতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃষ্টি।

বাঁ-দিকে শ'খানেক গজ দূরে গোটা কয়েক বড় গাছ চোখে পড়ল। ধারে কাছে আর কোনো আশ্রয় না দেখে দুজনে সেই দিকেই ছুটলেন। সে পর্যন্ত পেঁছিবার আগেই একেবারে নেয়ে উঠতে হল। মুষলধারে বর্ষণ। গাছ আর কতটুকু ঠেকাতে পারে। একধারে একটা মোটা ডাল খানিকটা নুয়ে পড়েছিল। তারই নীচে ঢুকে গিয়ে গুঁড়ির সঙ্গে মিশে কুঁজো হয়ে যতটা সম্ভব মাথাটা বাঁচাতে চেষ্টা করলেন কুঞ্জবাবু। ওরই মধ্যে একটুখানি সংকীর্ণ আচ্ছাদন। সুমিতা পাশে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বৃষ্টির বেগ তুমুল হয়ে উঠল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। জামাইবাবুর গা ঘেঁষে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে সিক্ত এবং ভিতরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল সুমিতা। উনি তো গোড়াতেই আপত্তি করেছিলেন। সে জোর করল বলেই অগত্যা রাজী হলেন। এ দুর্ভোগের জন্যে সে-ই সবটুকু দায়ী। বুড়ো মানুষ, যদি কোনো শক্ত অসুখ করে ? দিদির কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে।

কুঞ্জবাবু তখন ঠকঠক করে কাঁপতে সুরু করেছেন। এদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই। সুমিতা কি করবে ভেবে পেল না। ভিজে আঁচলখানা নিংড়ে ওর পিঠের উপর তুলে দিয়ে নিজের দেহের আড়াল দিয়ে যতখানি সম্ভব ওঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে লাগল।

গাছের তলায় গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ তার মধ্যে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল। দুজনেই চমকে উঠলেন এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই একটুখানি

সরে দাঁড়াল সুমিতা। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটা লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। মাথা থেকে হাঁটুর নীচেটা পর্যন্ত বর্ষাতি জড়ানো। পায়ে ভারী বুট। ওদের উপর টর্চ ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েকবার দেখে নিয়ে একটু হাসল। অর্থপূর্ণ বাঁকা হাসি। তারপর গম্ভীর কর্তৃত্বের সুরে কুঞ্জবাবুকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি আপনার কে হন ?

কুঞ্জলাল ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন, তা দিয়ে তোমার কী দরকার।

খুব তেজ দেখাচ্ছেন, দেখছি। তার মানে, ব্যাপারটা গোলমেলে। আপনাদের থানায় যেতে হবে।

কেন ? তেমনি ঝাঁজালো সুরে বললেন কুঞ্জবাবু।

কেন, তা এখনো বুঝতে পারছেন না ? বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল লোকটা। 'এর নাম গড়ের মাঠ, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবার জায়গা নয়।'

'চোপরাও', গর্জে উঠলেন ভূতপূর্ব পুলিশ ইনসপেকটর কুঞ্জলাল সাহা। স্থান কাল পাত্র জ্ঞান রইল না।

তোম চুপরও—সমান তালে ধমক দিল পুলিশের সিপাই। 'চলো।' বলে এগিয়ে এসে কুঞ্জবাবুর হাতটা ধরবার চেষ্টা করতেই সুমিতা বলে উঠল, গায়ে হাত দেবেন না। চলুন, কোথায় যেতে হবে।

মাঠের অন্ধকারে একজন পুলিশের মুখের উপর যা-ই বলুক, ঐ অবস্থায় থানায় পৌঁছবার পর কড়া আলোয় অতগুলো কৌতূহলী লোকের সামনে সুমিতা কিছুতেই মাথা তুলতে পারছিল না। নির্দেশমত একটা বেঞ্চির কোণে নতমুখে বসে রইল। কনস্টেবলটি চুপি চুপি কী বলল তার বন্ধুদের কাছে। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ঘরময় একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সুমিতা মাটির দিকে চেয়েই বুঝতে পারল, চারপাশে একঘর পুরুষের সবগুলো চোখ তীরের ফলার মত তার দিকে উদ্যত হয়ে আছে এবং তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে কুৎসিত ইঙ্গিতভরা কৌতুক।

ও-সি বা অন্য কোনো অফিসার তখন উপস্থিত ছিলেন না। ওঁদের অপেক্ষা করতে বলা হল। কুঞ্জবাবু একবার তাকিয়ে দেখলেন, সিপাহীদের মধ্যে তার পূর্বতন অনুচর কেউ আছে কি না। দেখতে পেলেন না। একদিকে নিরাশ যেমন হলেন, আরেকদিকে তেমন স্বস্তিও পেলেন অনেকখানি। পরে যা-ই হোক ; আপাততঃ যেন একটা গভীর লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

'কুঞ্জদা না ?'

একটু বোধহয় ঝিম ধরেছিল কুঞ্জবাবুর। চমকে উঠে চোখ তুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে সাব ইনসপেকটর বিনোদ চ্যাটার্জি। কয়েকমাস আগে এক সঙ্গে কাজ

করেছেন বড়বাজার থানায়। উনি জবাব দেবার আগেই চ্যাটার্জি বিস্ময়ের সুরে বলল, কী আশ্চর্য ! আপনি এখানে ! উনি কে ?—পাশে বসা সুমিতার দিকে ইঙ্গিত করল।

আর বোলো না, ভাই। কপালের দুর্ভোগ।

'এ ঘরে আসুন।' বলে ও-সি পাশের কামরায় ঢুকল। সুমিতাকে ডেকে নিয়ে কুঞ্জবাবু তার অনুসরণ করলেন।

ওঁদের বসিয়ে চ্যাটার্জি বেরোতে বেরোতে বলল, একটু বসুন দাদা। আমি দুমিনিটের মধ্যে আসছি।

খানিক পরে একজন সিপাই এসে তিন কাপ চা রেখে গেল। কুঞ্জবাবু একটা পেয়ালা সমেত ডিস সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপটা টেনে নিয়ে বললেন, এসো, একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক।

সুমিতা হাত বাড়াল না। শুধু একবার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে যেমন ছিল তেমনি বসে রইল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এল চ্যাটার্জি। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে সুমিতার দিকে নজর পড়তেই বলল, কই, আপনি চা খেলেন না ?

সুমিতা কিছু বলবার আগেই উত্তর দিলেন কুঞ্জবাবু, ও চা খায় না। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। সুমিতা, আমার শালী। আশুতোষ কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

ও, আচ্ছা। কী ব্যাপার বলুন তো ? ওঁকে নিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ থানায় যে ?

সন্ধ্যার আগে থেকে যা কিছু ঘটেছে কুঞ্জলাল তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। চ্যাটার্জি হো হো করে হেসে উঠল—শেষকালে আপনিও পুলিশের হাতে পড়লেন, দাদা ! তাও এই রকম কেস-এ।

বলে, আড়চোখে একবার তাকাল সুমিতার দিকে। তার মাথাটা যেন আরো নুইয়ে পড়ল। চ্যাটার্জি বলল, তা যাই বলুন, আমার সিপাইটি কিন্তু বেশ ডিউটিফুল।

'হ্যাঁ ; তবে একটু অতিরিক্ত', মন্তব্য করলেন কুঞ্জলাল। 'বুড়োমানুষ দেখেও—'

বুড়োমানুষ কী বলছেন ? আপনার চেয়ে অনেক বুড়ো অনেক কিছু করে বেড়ান ঐ গড়ের মাঠে। তিন দিন আগেই তো এক জনকে ধরে নিয়ে এল। বেশ নামী লোক। মেয়েটা একেবারে কচি। যাক, ওঁর সামনে এসব আলোচনা—। আপনারা এবার আসুন। যে রকম ভিজেছেন দুজনে, অসুখে না পড়েন।

কুঞ্জবাবু উঠতে উঠতে বললেন, কেলেঙ্কারিটা যেন আর বেশীদূর না গড়ায়, তাই দেখো, ভাই।

গড়ালেই বা মন্দ কি। শালী তো।

বলে, একটু মুখ টিপে হাসল চ্যাটার্জি। তারপর বলল, দাঁড়ান, একটা

ট্যাকসি ডাকতে বলি।

সিঁড়ির ঠিক মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহিণী। সেখান থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলে তোমরা ? একটা খবরও তো দেয় মানুষ। সেই পাঁচটা থেকে ঘরবার করছি।

খবর দেবো কী! যা বিষ্টি, এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেছে আফিসের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললেন কুঞ্জলাল।

সেইখানেই ছিলে এতক্ষণ !

আর কোথায় যাবো ? চারঘণ্টা ঠায় বসে সেই দারোয়ানের বেঞ্চির ওপর।

সুমিতা ছিল ঠিক পিছনে। তার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপলেন কুঞ্জবাবু। আর একটু উঠতেই গৃহিণী বললেন—ঈস, এ রকম ভিজলে কি করে। বিষ্টি তো সেই কখন ছেড়ে গেছে।

শরৎ কালের বিষ্টির ঐ তো মজা। এদিকে খটখটে, ওদিকে বন্যা।

নাও, আর দাঁড়িও না। ওগুলো সব ছেড়ে ফেল। আমি কাপড় নিয়ে আসছি। সুমি, তুই ওদিকের কলতলায় চলে যা। আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউজ সব আছে। নিয়ে নিস।

স্ত্রী আড়ালে যেতেই এই সত্য-গোপনের কৈফিয়ত-স্বরূপ শালীকে একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন কুঞ্জবাবু। চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, দরকার নেই। সেখানে এর পূর্ণ সমর্থন।

মঙলী

ক্যাপটেন ব্যানার্জি সেণ্ট্রাল জেলের ‘বড় সাহেব’। সোমবার সকালে তাঁর প্রথম কাজ ‘ফাইল’ দেখা। লাল ফিতে বাঁধা কার্ড-বোর্ডের ফাইল নয়, কোমরে গামছা বাঁধা কয়েদীর ফাইল।

জেলে ঢুকতেই বড় বড় ব্যারাক। হরেক-রকম কয়েদী থাকে তার মধ্যে—চোর, ডাকাত, পকেটমার, তারই সঙ্গে খুনী গুণ্ডা, জোচ্চোর-জালিয়াতের দল। ব্যারাকের কোলে লম্বা লম্বা বারান্দা। সোমবার সকালে সেখানে এসে সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হয়। তারই নাম ‘ফাইল’। বড় সাহেব সামনে দিয়ে চলে যান। আগে পিছে চারজন বেটনধারী সিপাই, তার পেছনে জেল-আফিসের বাবুরা। যার যা নালিশ থাকে লোকগুলো একে একে বলে যায়। কত রকমের নালিশ ! কারো গম পেশা ভালো লাগছে না, গুদামে যেতে চায়। সেখানে সুবিধা আছে। হাত সাফাই জানা থাকলে কাজ করতে করতে কখনো কখনো দুটো একটা পেঁয়াজ লঙ্কা কিংবা একটু গুড় ফস্ করে মুখে পুরে দেওয়া চলে। কেউ ‘মেট’ হতে চায়, সাধারণ কয়েদী থেকে কয়েদী-সরদার ; অনেকদিন তো খাটল, এবার একটু খাটাবার ইচ্ছা।

যারা জেলে যায়, তাদেরও বাড়িঘর ছেলেমেয়ে আছে। তা নিয়েও নালিশের

অন্ত নেই। কেউ ছ'মাস বাড়ির চিঠি পায়নি, জানতে চায় কে কেমন আছে। কারো জমিজমা নিলাম হতে চলেছে, কেমন করে বাঁচানো যায়; কারো ক্ষেত থেকে ধান, ঝাড় থেকে বাঁশ জোর করে কেটে নিচ্ছে পাড়ার লোকেরা, পুলিশের সাহায্য চাই। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারেনি বলে কাল ছেলের নাম কাটা গেছে, বড় সাহেব যদি হেডমাস্টারমশাইকে একটা চিঠি লিখে দেন। এমনি সব ফিরিস্তি।

কোণের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল একজন মাতব্বর গোছের কয়েদী। সবাই না শুনতে পায়, এমনিভাবে গলা খাটো করে বলল, 'ঘরে আমার কিছু টাকা আছে, হুজুর। চুরি হয়ে যেতে পারে। এখানে এনে রাখা যায়?'

বড় সাহেব বললেন, 'যায়, কেউ যদি পৌঁছে দেয়। অফিসে জমা থাকবে, যাবার সময় পেয়ে যাবে।'

পাশের লোকটি জোরে জোরে ঘাড় নাড়ছিল।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করলেন সাহেব। সে খুশী হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, না। বুঝে গেছি।'

আশেপাশে চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল। দু'একজনকে বলতে শোনা গেল, ও পাগল আছে, হুজুর।

সাহেব চলে যেতেই একদল কয়েদী এসে ঘিরে ধরল পাগলাকে, 'এই জগা, মাথা নাড়ছিলি কেন অমন করে?'

জগার আনন্দ আর ধরে না। এক গাল হেসে বলল, 'যাক, আর ভাবনা নেই।'

নিজের ভাবনা ঘোচাতে গিয়ে জগা যে অতবড় জেলের গোটা অফিসটাকেই ভাবিয়ে তুলবে, সেকথা কেউ ভাবতেই পারেনি।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক দশ দিন পরে। বেলা তখন প্রায় এগারটা। পুরোদমে কাজ চলছে। 'সুপার' থেকে ছোট কেরাণী কারো নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। এমন সময় একজন গাঁয়ের লোক বেশ বড়সড় একটা বকন বাছুর নিয়ে জেলের সামনে এসে দাঁড়াল। বন্দুকধারী সান্ত্রী গেটের বাইরে টহল দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

এজ্ঞে, এটা জমা দেবো।

কী জমা দেবে? এই গোরু!

এজ্ঞে।

সান্ত্রী তো অবাক। গোরু জমা দেবে! জেলখানায়! এটা কি খোঁয়াড় না পিঞ্জরাপোল? লোকটাকে হাঁকিয়ে দিতে যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, এজ্ঞে, চিঠি আছে।

কই দেখি?

ট্যাঁক থেকে বেরোল একটা চার ভাঁজ করা ময়লা পোস্টকার্ড। পিঠের উপর জেলখানার ছাপ। লোকটাকে দাঁড়াতে বলে সান্ত্রী চিঠিখানা পাঠিয়ে দিল

আফিসে। তারপর সেটা ঘুরতে লাগল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে। যে দেখে তারই মুখ চুন।

আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা কয়েকটি মাত্র লাইন। লিখেছে সাত'শ বারো নম্বর কয়েদী, জগন্নাথ সরকার। আফিস হয়েই গেছে। জেলের গোলমোহর তো আছেই, তার মধ্যে বড় সাহেবের সই, নিচে কানাইবাবুর ফুটকি।

প্রতিটি কয়েদী একমাস অন্তর একখানা করে চিঠি লিখতে পায়। যে লিখতে জানে না, তার জন্যে ওদের মধ্য থেকেই লেখাপড়া জানা লোক ঠিক করা আছে। তাদের নাম 'রাইটার'। সব চিঠি এসে জড়ো হয় আফিসে। একটি একটি করে পড়ে দেখা হয়—জেলের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখছে কিনা, কিংবা অন্য কোনো কথা যা বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এ কাজটি হল কানাইবাবুর। চিঠি পড়ে পিঠে একটি করে রবারস্ট্যাম্প মেরে তার নিচে ছোট্ট করে বসিয়ে দেন নিজের নামের প্রথম অক্ষর। তারপর সেই চিঠিগুলো বাণ্ডিল বেঁধে নিয়ে যান বড় সাহেবের কাছে। প্রতিটি চিঠিতে তাঁর সই চাই, কিন্তু কানাইবাবুর হাতের ঐ চিহ্নটুকু না দেখে তিনি সই করেন না।

জগন্নাথের পোস্টকার্ড হাতে পড়তেই কানাইবাবু একেবারে বসে পড়লেন। একটানা একই ধরনের আজেবাজে কথা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তার ঢুলুনি আসে। সেই ফাঁকেই হয়তো বেরিয়ে গেছে এই হতভাগা পোস্টকার্ড। কিন্তু এখন উপায়? চিঠিখানা আরেকবার পড়লেন কানাইবাবু। জগন্নাথ লিখছে তার কোন ভাইকে—

এই চিঠি পাওয়ামাত্র আমার মঙলীকে জেল গেটে আনিয়া জমা করিয়া দিবে। অন্যথা না হয়। বড় সাহেবের হুকুম আছে। চিঠিখানা সঙ্গে আনিও।

ইতি—

তোমার জগাদা।

চিঠির মাথায় রাইটারের হাতে লেখা—৭১২এ জগন্নাথ সরকার। পোস্টকার্ড বিলি করার আগেই ওটা লিখে দেওয়া হয়।

আফিসেও কিছু কয়েদী কাজ করে। কানাইবাবু যখন ভাবছেন কি করা যায়, তাদের কেউ গিয়ে খবরটা তখন তুলে দিয়েছে জগন্নাথের কানে। শুনেই সে কাজকর্ম ফেলে গেটের দিকে ছুটল। মঙলীটাকে কতদিন দেখেনি। কেমন আছে কে জানে।

চেঁচামেচি শুনে জেলারবাবু জগাকে ডেকে পাঠালেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'এসব কী লিখেছ? বড় সাহেব বলেছেন গোরু জমা দিতে?'

জগা জোড় হাত করে বলল, 'আজ্ঞে, আমার সামনেই তো একজনকে টাকা জমা দেবার হুকুম দিলেন।'

টাকা আর গোরু এক হল!

আজ্ঞে হুজুর, আমার তো আর টাকাকড়ি নেই। থাকবার মধ্যে আছে ঐ

বকনাটা। ঐ আমার সব।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওটা থাকবে কোথায়! খেতে দেবে কে?

সে কথা আমি কেমন করে জানব, হুজুর?

জেলারবাবু রেগে উঠলেন—ওসব হবে না। গোরু নিতে পারবো না আমরা।

তা হলে ও কোথায় যাবে, হুজুর? আমার যে আর কেউ নেই। একটু ঘাস জল না পেয়ে মরে যাবে বকনাটা।

আফিস থেকে কিছুতেই নড়ে না দেখে শেষ পর্যন্ত ওকে বড় সাহেবের কাছে হাজির করা হল। তিনি যখন চিঠিটা পড়ছেন, জগা হঠাৎ সিপাইদের পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর টেবিলের নিচে ঢুকে পা দুটো জড়িয়ে ধরল, 'দোহাই, সাহেব। বাচ্চাটাকে রাখবার হুকুম দিন। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।'

ক্যাপটেন ব্যানার্জি মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। কানাইবাবুর উপর বেশ খানিকটা ঝাল ঝাড়লেন। বরখাস্ত করবেন বলে শাসালেন। কিন্তু সেটা তো গেল পরের কথা। এখন একে ঠেকানো যায় কেমন করে? চিঠিটা সই করে তিনিও যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। অনুমতি একরকম দিয়েই ফেলেছেন, বলা চলে, যদিও না জেনে। তাই বলে কয়েদীর সম্পত্তি হিসেবে জলজ্যান্ত গরু তো আর সত্যি সত্যি জমা রাখা যায় না জেলখানায়। এর পেছনে খরচ আছে। সেটা কে দেবে? দেখাশুনার ঝঞ্ঝাটও কম নয়।

বড় জমাদার রামোদর সিংহ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এর আগেই বকনাটাকে এক নজর দেখে এসেছে। খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু জাত ভাল। যত্ন আত্তি করলে বছর খানেকের মধ্যেই বাচ্চা দেবে। চার পাঁচ সের দুধ একটানেই পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দু'কদম এগিয়ে গিয়ে বুটে বুট ঠুকে সাহেবকে একটা টানা সেলাম দিয়ে রামোদর জানাল, সরকার থেকে যখন গরুটার ভার নেওয়া সম্ভব নয়, হুজুরের হুকুম পেলে সে কাজটা অগত্যা সে-ই করতে পারে। বকনা বাছুর; মা ভগবতীর অংশ। এসে যখন পড়েছে, ফিরিয়ে দিলে অধর্ম হবে।

জেল পাঁচিলের বাইরেই বড় জমাদারের সরকারী বাসা। সেখানে গরু রাখবার হুকুম নেই। কেউ কেউ লুকিয়ে রাখে, সুপার একেবারে জানেন না, তা নয়। নিজে থেকে সরাসরি অনুমতিটা দেন কেমন করে? তাই জিজ্ঞেস করলেন, রাখবে কোথায়?

জমাদার যা বলল, শুনেই বোঝা গেল, তখখুনি বানিয়েছে কথাগুলো। সহরতলীর কোনখানে তার কে এক ভাই নাকি দুধের ব্যবসা করে। একটা ছোটখাটো খাটাল আছে। সেইখানেই রেখে দেবে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবে।

সুপার রাজী হলেন। কথা রইল, বছর দুই পরে জগন্নাথ যখন জেল থেকে ছাড়া পাবে, তার গরু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। জমাদার কোন খরচপত্তর

দাবি করতে পারবে না।

সবাই খুশি। জগা তো এক রকম নাচতে নাচতে চলে গেল। রামোদর ভাবল, রাম জেতা জিতেছে সে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কানাইবাবুর। আর একটু হলেই চাকরিটা গিয়েছিল আর কি!

যা আন্দাজ করা গিয়েছিল। সহরতলীর খাটালে নয়, রামোদরের বাসাতেই 'মানুষ' হতে লাগল মঙলী। ডিউটি থেকে ফিরে উর্দিটা ছেড়েই সে লেগে যায় গরুর সেবায়। কোত্থেকে জুটিয়ে আনে কচি ঘাস, নিজে হাতে খড় খাটে, বেশী করে খৈল আর ভুষি দিয়ে জাবনা মেখে নিজের হাতে খাওয়ায়।

একমাসের মধ্যেই বকনাটার চেহারা ফিরে গেল। তিন-চার মাস পরে তাকে আর চেনা যায় না।

জগা প্রায়ই খবর নেয়, আমার মঙলী ভাল আছে জমাদার সাহেব?

ভালো আছে মানে! দেখলে তুই চিনতে পারবি না।

বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে তো?

ভাল ভাল খাচ্ছে, আর সে সব খাবার তুই কোনদিন চোখেও দেখিস নি।

আপনার খুব খরচ হচ্ছে তা হলে?

কী করবো বল? গাই গরু হল মা দুগগা। হলই বা পরের জিনিস, ঠিক-মত আদর যত্ন না করলে, ওখানে গিয়ে কী জবাব দেবো?

আঙুল দিয়ে আকাশের দিকটা দেখিয়ে দেয় রামোদর। জগা আর একটু কাছে সরে আসে। ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমাকে একটু দেখাতে পারেন, জমাদার সায়েব? কতদিন দেখিনি বাচ্চাটাকে।'

তোর জিনিস তুই দেখবি, তাতে আর আপত্তি কী? কিন্তু সে কি এখানে? পাক্কা দু-মাইল পথ।

একদিন যদি নিয়ে আসেন গেটের সামনে।

জমাদার বড় বড় চোখ করে বলে, 'যা, যা, মন লাগিয়ে কাজ কম্ম কর। বড় সাহেব জানতে পারলে রক্ষে আছে? তোর মেয়াদ তো ফুরিয়ে এল। কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

বছর ঘুরতেই মঙলীর একটি চমৎকার বাচ্চা হল। দুধের মত শাদা, কপালে সোনালি চাঁদ। রামোদর তার নাম রাখল, ধবলী।

লোকে বলে গরুর দুধ মুখে। জমাদার সেটা ভাল করেই জানে। মঙলীর খাবার দিকটায় সে বরাবর নজর দিয়ে এসেছে, এখন তো আরো দেবার কথা। দুধ বেড়ে চলল দিন দিন। মাস দুই যেতেই দুবেলা মিলিয়ে ছ-সাত সের দুধ দেয় মঙলী। খেয়ে বিলিয়ে খানিকটা বিক্রীও করে রামোদর। সেটা অবিশ্যি খুব গোপনে। দুধের অঙ্কটাও গোপন রাখে। কেউ জানতে চাইলে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, 'কত আর! দু-বেলায় টেনেটুনে দু'সের। যা খায় তার তুলনায় কিছু না। ডাহা লোকসান, বুঝলে না?'

জগা আজকাল তার বকনার কথা বড় একটা জানতে চায় না। সারাদিন খাটে। ভাল কাজ করলে কয়েদীরা পুরো মেয়াদ থেকে কিছুটা করে মাপ পায়। তিন বছর সাজা নিয়ে যে এল, আড়াই বছর বাদেই যেতে পাবে। ঐ দিকেই মন দিয়েছে জগন্নাথ। মঙলীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে।

মঙলী যে আগের মত ছোট্টটি নেই, বড় হয়েছে, বাচ্চা দিয়েছে, এ দিকটা সে ভাবে নি, এ সব খবরও তাকে কেউ দেয় নি।

জগন্নাথের খালাসের দিন এসে গেল। ব্যানার্জি সাহেব তাকে ভোলেন নি। কুড়ি বাইশ জন কয়েদী সেদিন মেয়াদ শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সব লাইন করে বসে আছে তাঁর সামনে। 'খালাসী' সেরেস্তার ডেপুটিবাবু হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ নিয়ে এক এক করে নাম ডাকছেন, যার নাম সে উঠে এলে, হাতে দিচ্ছেন কয়েক আনা খোরাকী পয়সা আর একখানা করে রেলের পাশ। লোকটি সেলাম করে চলে যাচ্ছে।

"জগন্নাথ সরকার!" নামটা কানে যেতেই সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। ডেপুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর গরুটা আছে তো?'

আছে, স্যার; গেট থেকে বেরোলেই একটা রসিদ নিয়ে দিয়ে দেবো।

কিছুক্ষণ পরেই গেটের দিক থেকে একটা গোলমাল শোনা গেল। সুপার ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। সে বলল, 'জগা পাগলা গরু নিতে চাইছে না।'

কেন?

বলছে, 'এটা আমার মঙলী নয়।'

মিনিট কয়েক পরেই জগাকে আনা হল সাহেবের সামনে। সে হাতজোড় করে বলল, 'ও গরু আমি নেবো না। আমার মঙলীকে দিতে বলুন, হুজুর।'

সাহেবকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হল। তিনি হেসে বললেন, 'তোমারই তো লাভ। বকনার বদলে দুধলো গাই পেয়ে যাচ্ছ। দুধ খাবে। গরিব মানুষ, খানিকটা বিক্রীও করতে পারবে।'

'চাই না, হুজুর। অধম্মো করতে পারবো না। আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন। পরের জিনিস নিতে বলবেন না।'

সবাই মিলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'এই সেই বকনা। ছোট ছিল, বড় হয়েছে, গাই হয়েছে।'

জগা রুখে উঠল, 'আমার বকনা আমি চিনি না! আমাকে দেখলে ছুটে চলে আসত, আর ঐ ধেড়ে গরুটা একবার চোখ তুলে দেখল না!'

বলতে বলতে তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

পাগলের সঙ্গে বকবক করতে গেলে জেল-সুপারের চলে না। সে সময় কই? জগাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইসারা করলেন। সে যেতে চায় না। দুজন সিপাই মিলে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিল।

গেটের বাইরে নিয়ে আরো এক দফা বোঝানো হল। জগার ঐ এক কথা।

শেষটায় জেলারবাবু এসে কড়া ধমক দিতেই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। খোরাকীর পয়সাগুলো টান মেরে ছড়িয়ে ফেলল। 'চাই না তোমাদের পয়সা।'

মাসচারেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা কালো রং-এর কয়েদীগাড়ি এসে গেটের সামনে থামতেই তার ভিতর থেকে বেরোল জগন্নাথ সরকার। সিপাইদের কেউ কেউ চিনতে পেরে বলল, 'কিরে জগা? আবার এলি যে? কী মামলা?'

জগা গুম হয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না।

ঐ গাড়িতেই আর একজন লোক ছিল। অন্য মামলার আসামী, কিন্তু জগার বাড়ির কাছেই তার বাড়ি। তার মুখ থেকে শোনা গেল ব্যাপারটা।

জেল থেকে বাড়ি ফিরবার পর জগা প্রায়ই ঘুরে ঘুরে বেড়াত। একদিন মাঠ থেকে ফিরছে। দেখল, একটা বকনা চরে বেড়াচ্ছে, ঠিক তার মঙলীর মত দেখতে। হাতে দড়ি নেই, কোঁচার দিকটা খুলে বাছুরটার গলায় জড়িয়ে, সোজা নিয়ে চলল বাড়ি। যার গরু সে ছুটে এল, 'এ কি! আমার বকনা নিয়ে চললে কোথায়?' জগা তেড়ে উঠল—'তোমার বকনা মানে? এ তো আমার মঙলী।'

লোকটা তা শুনবে কেন? প্রথমে চেষ্টা করল ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু জগার সঙ্গে জোরে পেরে উঠল না। তখন "চোর! চোর!" বলে চেঁচাতে শুরু করল। লোকজন ছুটে এল এবং বাছুর সুদ্ধ জগাকে নিয়ে গেল থানায়।

আজ সারাদিন জেলে যত লোক আমদানি হল, কাল সকালেই তাদের হাজির করতে হয় জেল-সুপারের দরবারে। জগাকে যখন নিয়ে আসা হল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি তার ওয়ারেন্ট দেখে বললেন, 'চুরি কেস! কী চুরি করেছিলে?'

জগা একেবারে তুবড়ির মত ফেটে পড়ল, 'চুরি করেছি আমি না ওরা! আচ্ছা, বেরোই একবার। তারপর দেখে নেবো আমার বকনা কেমন করে আটকে রাখে।'

কৈফিয়ত

পদস্থ কর্মচারীর শিক্ষিতা স্ত্রী হয়েও মঞ্জরি দেবী বাংলা বই পড়ে থাকেন। শাড়ি, জুয়েলারি, টয়লেটের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁকে বই কিনতেও দেখা যায়—বিয়ে বা জন্মদিনে উপহার দেবার জন্যে নয়, পড়বার জন্যে। লেখক নামক জীবদের উপর তাঁর কেমন একটা করুণা আছে। পথেঘাটে ছোট্ট একটা নমস্কার এবং আলাপের ছলে কিঞ্চিৎ উপদেশ আমিও কখনো কখনো লাভ করে থাকি। সেদিন দেখা হয়ে গেল এক পুরস্কার-বিতরণী সভায়।

এই যে আপনার কথা হচ্ছিল আজ।

মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম। আলোচিত হবার সৌভাগ্য কোন লেখক না কামনা করে? বিশেষ করে মহিলামহলে।

কুশল প্রশ্নাদির পর বললেন মঞ্জরি দেবী, আপনার লেখা তো আগেও পড়েছি। সেকালে যেসব লিখেছেন, সে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু হালে যা আমদানী করছেন, তার সবটাই দেখি চোর ডাকাত খুনী আর পকেটমার দিয়ে ঠাসা। ভদ্র-সমাজের পাতে দেবার মত জিনিস তো পাচ্ছিনে।

কী উত্তর দেব আমি? হাসবার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে শুরু করলাম।

মঞ্জরি দেবী আর একটু এগিয়ে এসে বললেন, এই দেখুন না, উনি বলছিলেন, ওদের ক্লাব-লাইব্রেরীতে আপনার বই নেওয়া হয়নি। জুনিয়র মেম্বরদের মধ্যে কে নাকি কিনতে চেয়েছিল এক এক কপি। মুরুব্বিরা ধমক দিয়েছেন। এ তো ছেলেছোকরাদের পাড়ার লাইব্রেরী নয়। বড় বড় পদস্থ এবং শিক্ষিত লোক সব। আপনার ঐ জেলখানার কেচ্ছা ওখানে পাত্তা পাবে কেন?

সুর শুনে মনে হল, এই ব্যাপারটায় কিঞ্চিৎ আহত হয়েছেন ভদ্রমহিলা। হয়তো এই অক্ষম লেখককে টেনে হিঁচড়ে জাতে তুলবার একটা বৃথা চেষ্টা করেছিলেন; পারেন নি। সেই নৈরাশ্যের দুঃখটা আর চাপা দিতে পারছেন না। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত, মঞ্জরি দেবী। দয়া করে ওঁরা যদি একখানা বই আমার কিনতেন ভাগের ভাগ কয়েক আনা পয়সা আমার পকেটে আসত। তার থেকে বঞ্চিত হলাম। দুঃখের বিষয় বৈকি! কিন্তু সেজন্য ওঁদের দোষ দিই কেমন করে? জেলের লোক; সাহিত্য করি। আমার বন্ধুরা ভাল চোখে দেখেন না। তার ওপর আবার ঐ চোর-ডাকাতের কেচ্ছা। ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতাম যদি গোটা কয়েক বালীগঞ্জ-মার্কা প্রেমের গল্প, কিম্বা তাক-লাগানো কথা সাজিয়ে ঝেড়ে দিতাম কিছু ধর্মের বাণী, হয়তো ঐ কয়েক আনা পয়সা এমন করে মারা যেত না। কিন্তু সে ক্ষমতা তো ভগবান আমাকে দেননি।

মঞ্জরি দেবীকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সাহিত্য হচ্ছে কল্পনার রং দিয়ে আঁকা জীবনের চিত্র। আমার মনে সে রং কোথায়? কল্পনার পদ্ম-বনে তো আমি কোনদিন বিচরণ করিনি। ঘুরেছি এক জেল থেকে আর এক জেলে। দেখেছি সেই সব মানুষ—সংসারের চোখে যারা অমানুষ, সমাজের চোখে অপাংক্তেয়। সে এক বিচিত্র মিছিল—নরহন্তা, নারীলোলুপ, দস্যু-জালিয়াৎ-পকেটকর্তকের দল। তারা মুখ খুললেও বুক খোলে না। তবু যদি কোন অসতর্ক অবসরে আমার কাছে ধরা দিয়ে থাকে কেউ, নামিয়ে দিয়ে থাকে তার হৃদয়ভার—সে জানত, তার সব কথা রইল শুধু আমারই কাছে। কিন্তু কী দুর্মতি হল! পাঁচিলের আড়ালে যা ছিল একান্ত গোপন, তারই দু'চারটি ছবি আমি একদিন তুলে ধরলাম সংসারের রূঢ় চক্ষুর সামনে। কী পেলাম! ভদ্রসমাজের ভ্রুকুটি, মঞ্জরি দেবীর "উনি" এবং তাঁর বন্ধুমহলের নাসিকাকুঞ্চন। কেন এ খেয়াল হল, সে কথা কি ছাই আমিই জানি! বলতে পারি শুধু অনেক দিন আগেকার ছোট্ট দু'একটা ঘটনা। কে জানে তারই মধ্যে আছে কিনা

আমার এ অপরাধের কৈফিয়ত।

অনেক দিনের কথা।

চাকরী-জীবনের তিন-চার বছর কেটে গেছে। জেলের অক্টোপাস সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু শ্বাস রোধ করতে পারেনি। ফাঁক পেলেই চলে যাই বাইরে—যেখান থেকে ঐ পাথরের পাঁচিলে চোখে পড়ে না। লুকোবার চেষ্টা করি, আমি জেলের লোক। যদি কেউ চিনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবে—'আপনার ওখানে তেল পাওয়া যায়?···বার ইঞ্চি মোড়ার দাম কত?'—সর্ষে আর বেতের বাইরেও যে আমাদের একটা জগৎ আছে, এ কথা স্বীকার করে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই কম। তাদেরই দু'একজনের বাড়ীতে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত হয়। মা ভাত আগলে বসে থাকেন।

একদিন একটু সকাল সকাল এসে পড়েছি। গুণগুণ করে একটু গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ী ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালাম। ভিতরের বারান্দায় মার সামনে বসে একটি তরুণী বধূ। আমার সাড়া পেয়ে মাথার কাপড়টা একটুখানি টেনে দিল কপালের উপর। মুখের ডৌলটি সুন্দর। সব জুড়ে কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়া। কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু।

পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে যাচ্ছিলাম। মা ডেকে ফেরালেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, চোর-ডাকাতের খাওয়া-পরা খেলাধুলা নিয়ে তোরা আর তোদের কর্তারা শুনি বেজায় ব্যস্ত। এদের কথা কোনদিন ভেবে দেখেছিস?

"এরা" যে কারা অনুমান করতে কষ্ট হল না। মা-ও সেটা স্পষ্ট করেই বললেনঃ ওর স্বামী খুন করেছিল, বুঝলাম। তোমাদের হাকিমরা তাকে যাবজ্জীবন জেলে পুরে দিলেন। কিন্তু সেই যাবজ্জীবন ওর চলবে কি করে? কী খাবে ও? কী করে বাঁচাবে ঐ বাচ্চাটাকে? একজনের দোষে আর পাঁচজন শাস্তি পাবে কেন, এই মোটা কথাটার কী জবাব দেবেন তোমাদেব সরকার বাহাদুর?

মাকে এতখানি উত্তেজিত হতে কোনদিন দেখিনি। আমি পলিটিক্যাল ফিলসফির ছাত্র। এসব প্রশ্নর উত্তর আমার নখদর্পণে। ক্রাইম সম্পর্কে স্টেটের কী বর্তব্য, Law এবং Justice-এর সংগে তার যোগ কোথায়—ইত্যাদি বিষয়ে সুযোগ মত মাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করব স্থির করলাম। আপাতত কয়েদির পরিবার সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্ব অস্বীকার করে একটা মামুলি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখ পড়ল বৌটির চোখে। তীব্র আগ্রহাকুল দৃষ্টি মেলে সে চেয়েছিল আমার মুখের দিকে। আমি কি বলব, সেই কথাটাই যেন সে সর্বাঙ্গ দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারি উপরে যেন দাঁড়িয়ে আছে তার, আর তার শিশুসন্তানের সমস্ত জীবনের অবলম্বন।

সরকারী জবাব আমার গলায় এসে আটকে গেল।

আর একদিনের কথা। রাত প্রায় ন'টা। ক্লাব বা আড্ডায় যেতে পারিনি।

বাইরের ঘরে একটা অসমাপ্ত লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। জানালার বাইরে নজর পড়তে দেখলাম, খিড়কির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। মার হাত থেকে কাপড় চাল এবং বোধ হয় কিছু টাকাকড়ি লাভ করে তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে এমন অজস্র আশীর্বচন উচ্চারণ করছে, যার সামান্য কিছুটাও যদি এতদিনে ফলে যেত, আজ আমার রাজতক্তে বসে থাকবার কথা। এই জাতীয় 'মক্কেল' যে মার বেশ ক'জন আছে, সেটা আমার জানা ছিল। এতদিন কারো দর্শনলাভ ঘটেনি। অন্যদিনের মত এ কাজটা আজও রাত্রির অন্ধকারে গোপনেই সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। ছেলের কাছে ধরা পড়ে বোধহয় লজ্জিত হলেন, এবং আমার ঘরে এসে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, জানিস খোকা, খাওয়া-পরার কষ্টটাই এদের সবখানি নয়। ছেলে বা স্বামী জেল খাটছে, শুধু এই কারণেই পাড়ার লোকের কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মেয়েগুলোর লাঞ্ছনার অন্ত নেই। ঘরে যদি বয়স্থা মেয়ে বৌ থাকে, সে আবার আরেক বিপদ। জমির ফসল, বাগানের আমটা কলাটা পুকুরের মাছ—কিছুই ঘরে তুলবার উপায় নেই। যে যেভাবে পারে, ঠকাবে। এ ছাড়া পুলিশের উৎপাত আছে। তোদের ঐ জেলের সিপাইগুলোও কম যায় না। 'তোমার ছেলে না খেয়ে আছে, তোমার স্বামী বিড়ি খেতে চেয়েছে'—এই সব ভাঁওতা দিয়ে প্রায়ই কিছু হাতিয়ে নিয়ে আসে।

আমার গল্প-লেখা শিকেয় উঠল। কলম গুটিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সামনের চেয়ারটা দখল করে মা আবার বলে চললেন, ছেলে জেল খেটে ঘরে ফিরলেই যে মায়ের সব সমস্যা মিটে গেল, তা নয়। সমস্যা বরং বাড়ল। পাড়ার লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে। চুরি ডাকাতি একটা-কিছু হলে তো কথাই নেই। সবার আগে ওরই হাতে পড়বে হাতকড়া। যদ্দিন ঘরে থাকবে, রাত দুপুরে পুলিশ এসে হাঁকডাক করবে। সাড়া দিতে দেরি হলেই মা-বোন তুলে গালাগালি। কাজকর্ম যে জোটাবে একটা, তারও উপায় নেই। কে দেবে কাজ?

মৃদু কণ্ঠ থেমে গেল। সেইখানেই নিঃশব্দে বসে রইলেন মা।

জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন বাইরের পানে। তারপর আমার দিকে ফিরে যেন ভিক্ষা চাইছেন, এমনি ভাবে বললেন, হ্যাঁরে, তুই তো শুনি, কী সব লিখিস-টিখিস। এই হতভাগীদের কথা কিছু লিখতে পারিস না?

সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মায়ের এই অজ্ঞতা দেখে সেদিন মনে মনে কৌতুক বোধ করেছিলাম। তিনি তো জানতেন না, তাঁর এই "সাহিত্যিক" পুত্র তখন হাসির গল্প কিংবা রোমান্স রচনায় নিমজ্জমান...

আজ এই লিখবার টেবিলে বসে আমার মায়ের সেই করুণ মুখখানা বারংবার মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, বারান্দায় আবছায়া অন্ধকারে বসে আছে একটি অনাহারক্লিষ্ট নতমুখী বধূ, কোলে তার শীর্ণকায় শিশু। কানে আসছে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের আশীর্বাদ।

তারা আজ কোথায় কে জানে !·

নাম

'বৈশাখী'র সম্পাদক বেণীমাধববাবু বড়ই মুষড়ে পড়েছেন। পুজো একেবারে আসন্ন। আর 'মাস' নয়, একেবারে 'দিনের' পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছে। বিশেষ সংখ্যাটা মহালয়ার দিনই বাজারে ছাড়া দরকার। তার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। প্রেস বারবার তাগিদ দিচ্ছে, কিন্তু 'ম্যাটার' নেই। লেখা সব জোগাড় করে উঠতে পারেননি।

প্রথম সারির লেখক যারা, যেমন সুধাকান্ত বটব্যাল, গঙ্গাধর তালুকদার ইত্যাদি, তাদের কাউকে তিনি পটাতে পারেননি। পুজোর মরসুমে সে সব অঞ্চলের ধারে-কাছে ঘেঁষে কার সাধ্যি? চড়া দর হেঁকে বাগিয়ে নিয়ে গেছে যত সব হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা নতুন পয়সাওয়ালা পুজো-বার্ষিকীর পাণ্ডারা! 'বৈশাখী'র সে সঙ্গতি নেই। তবু অনেক দিনের কাগজ। এক সময়ে যখন 'লেখক' নামক পণ্যের চাহিদা এতটা বাড়েনি, পাঠক-সংখ্যা কম ছিল, অর্থের এমন ছড়াছড়ি ছিল না, তখন এই সব কেষ্ট-বিষ্টুর দল বিনীত মুখে মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে তুলে তাঁরই দরজায় ভিড় করতেন। মাসিক 'বৈশাখী'তে কালে-ভদ্রে দু-একটা গল্প, কিংবা কখনো কদাচিৎ একখানা উপন্যাস ধরাতে পারলেই তাঁরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করতেন। মাঝে মাঝে দু-চারখানা দশ টাকার নোট পকেটে ফেলে দিলেই খুশী। আজ আর সেদিন নেই। ধুতি, জুতো, মাছ, পটলের মতো প্রতি জিনিষটাই ঊর্ধ্বমুখী। সব চেয়ে চড়া বোধ হয় 'লেখা'র বাজার, বিশেষ করে এই পুজোর সময়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারিতে যাঁরা পড়েন, এ রকম দু-চারজন লেখক কথা দিয়েছিলেন, যা হোক কিছু পাঠাবেন। তা-ও সব এসে পোঁছায়নি। অমল ধরের কাছ থেকে একখানা ছোট উপন্যাস পাবার কথা। কিন্তু লোকটা কী ধাড়িবাজ। শেষ মুহূর্তে নতুন করে দর কষাকষি সুরু করেছে। অথচ লেখা যে তার কী দরের, মা-গঙ্গাই জানেন। আগেকার দিন হলে ঐ ছেঁড়া কাগজের টুকরিটাই হত তার যোগ্য স্থান। আর আজ সমাদর করে প্রথম পাতায় ছাপতে হয়। কী করবেন? এখন আর ধারে কিছুই কাটে না, সব কাটে ভারে।

প্রেস-ম্যানেজার তারিণীবাবু ঘরে ঢুকলেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে হল না। কী বলতে চান, তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন বেণীবাবু। এক সদ্য গোঁফ-ওঠা উঠতি লেখক ছোটগল্প রেখে গেছে কাল সন্ধ্যাবেলা। কোন কথা না বলে সেইটাই ড্রয়ার খুলে বের করে দিলেন। নামে ছোটগল্প। আসলে ছোট নয়, গল্প তো নয়ই। তবু খানিকটা জায়গা জুড়বে।

তারিণী চলে যেতেই পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন বেণীমাধব। রাজেন সিকদারের বাড়ীটা কাছেই। বড় না হলেও মেজো সাহিত্যিকদের

একজন। একল্লার অবশ্য 'না' বলে দিয়েছেন। তবু যদি বলে কয়ে কিছু আদায় করা যায়।

কড়া নাড়তে চাকর এসে দরজা খুলল, এবং বেণীবাবু মুখ খুলবার আগেই বলে উঠল, বাবু লেখাপড়া করছেন। দেখা হবেনি।

মাথার ভিতরটা চড়াৎ করে উঠল। কিন্তু সম্পাদকগিরি করতে গেলে এসব অপমান গায়ে মাখা চলে না। বিশেষত, গরজ যখন তাঁরই। ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন, বল, বেণীবাবু এসেছেন!

চাকর বিরক্ত হল এবং সেটা প্রকাশ করতেও কোন দ্বিধা করল না। তবু কি মনে করে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। দরজার সামনে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলেন সম্পাদক মশাই।

মিনিট পনের পরে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া ভারী পায়ের চটিজুতো নেমে এসে থেমে গেল দোর গোড়ায়।

বেণীবাবু যে, কী খবর? ভিতরে আসুন।—মুখ ফুটে এই কথাগুলোই বললেন রাজেন সিকদার, কিন্তু মুখের রেখায় যে কথা ফুটে উঠল, তার বয়ান ঠিক উলটো—আগেই তো বলে দিয়েছি 'না', তবে আবার জ্বালাতে এসেছ কেন?

রাজেন বাবুর দোষ নেই। পুজোর বাজারে খ্যাতিমান লেখক মাত্রেরই ঐ অবস্থা। ঘুম নেই, হজম চলে গেছে, মেজাজ তিরিক্ষি, শির ঘূর্ণ্যমান! ব্রহ্ম-তালুর উপর খানিকটা জবাকুসুম চাপড়ে ভোর না হতেই বসে পড়েন কলম নিয়ে, রাত দুটোতেও বিরাম নেই। তবু সবাইকে খুশী করা যায় না।

বেণীবাবু বললেন, লিখছিলেন নিশ্চয়ই। কাজের সময় বিরক্ত করলাম। বেশীক্ষণ জ্বালাব না, একটা কিছু দিন। না হলে চলে কি করে?

আপনাকে তো গোড়াতেই বলেছি দাদা, এবার আর পারব না। যেখানে যেখানে কথা দেওয়া ছিল, সেইগুলোই বোধ হয় হয়ে উঠবে না।

বড়-কিছু চাইছি না। ছোটখাট দু-চার পাতা—গল্প, নকসা, রম্যরচনা, যা আপনার খুশি।

দু-চার লাইনও আসছে না। মাথা একেবারে ফাঁকা।

পুরনো কোন লেখা?

কিচ্ছু নেই।

বেণীমাধব শুষ্ক মুখে উঠে পড়লেন। দরজা পর্যন্ত যেতেই ডেকে ফেরালেন সিকদার মশাই—শুনুন। একখানা ছোট উপন্যাস আছে। কিন্তু বড্ড পুরনো জিনিস, চলবে কি?

বেণীবাবু মনে মনে বললেন, পুরনো জিনিস চালাবার এই তো সময়। ছোট শ্যালকের কাপড়ের দোকান আছে। তার কাছে অনেকবার শুনেছেন, যত বস্তাপচা ছাতাপড়া খুঁতে দাগী অচল মাল, পুজোর হিড়িকে সব সাফ। কিছুই পড়ে থাকে না। চাহিদা মতো যোগান কোথায় যে লোকে বাছাবাছি করবে? লেখার বেলাতেও তাই। লেখকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ওদিকে ফুটপাত ভর্তি

'পূজা-সংখ্যা'র পাহাড়। কোত্থেকে আসবে অত টাটকা সাপ্লাই? তাই পুরনো মালও চালাতে হয়।

বেশ তো দিন না? আপ্যায়নের সুরে বললেন সম্পাদক—হলই বা পুরনো। রাজেন সিকদারের লেখা তো!

লেখক খুশী হয়ে ভক্ত প্রার্থীকে কৃতার্থ করবার ভঙ্গীতে বললেন, আপনি একজন প্রবীণ সম্পাদক, অত করে বললেন। তা না হলে মনে করেছিলাম, পুজোর চাপটা চলে গেলেই ওটাকে একটু ঘষে মেজে একেবারে প্রেসে পাঠাব। কিন্তু আপনার যখন এখনি দরকার—

পাণ্ডুলিপিখানা খুলেই ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন বেণীবাবু। নামটা যেন চেনা-চেনা। হুঁ-উ, মাথার উপর ঐ 'অ'টা তো তাঁরই হাতের। তারিখও দেওয়া আছে। প্রায় সাত বছর হল। তবু পকেটে পুরলেন। সাত বছর আগে 'অমনোনীত' বলে যাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন, লেখাটি সেই বস্তুই বটে, কিন্তু লেখক আর সে ব্যক্তি নন। বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা ঠিকই আছে, চেহারাও বিশেষ বদলায়নি। তবু সেদিনকার রাজেন সিকদারের সঙ্গে আজকের রাজেন সিকদারের অনেক তফাৎ। সেই নামের সঙ্গে আরেকটা 'নাম' যুক্ত হয়েছে, যার দাম আছে, এবং সেই হারেই তার পুরনো লেখার দাম আজ নতুন করে কষতে হবে। কলকাতা শহরে যেমন জমি। সাত বছর আগে যে কাঠা ছিল পাঁচশ, আজ হয়েছে পাঁচ হাজার। অথচ জমি সেই একই; মাটিও তাই আছে। তবু বসে বসে সে সোনা হয়ে গেছে। এই লেখাটাও তেমনি একদিন ছিল 'অ'। সাত বছর ধরে ঘরে বসে থেকে আজ হয়ে গেল 'ম'; শুধু 'ম' নয়, একখানি মোটা টাকার চেক জড়ানো 'ম'।

সম্পাদকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় একটা জিনিষ শিখেছেন বেণীমাধব—লেখার কোনো নিজস্ব মূল্য নেই, লেখকের নামের মূলেই তার মূল্য।

বেণীমাধবের সহকারী মুরারি হালদার বিশেষ খুশী হল না। কী এমন নাম লোকটার যে সেই সাত বছর আগেকার 'অ' মার্কা পচা উপন্যাস পয়সা দিয়ে নিতে হবে, আর ছাপতে হবে পূজা-সংখ্যায়? 'বৈশাখী'র কি এতই দুর্দিন?

দুর্দিন বৈকি! দেখছ না সুধাকান্ত বটব্যাল তোমাকে সোজা দরজা দেখিয়ে দিল, আর ঐ সিনেমাওয়ালা কাগজটা এক কথায় বাগিয়ে নিয়ে এল একখানা গোটা উপন্যাস? রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার পড়ে গেছে। কী কাগজ, কতদিনের কাগজ, কী তার **standard**. কারা তার পাঠক—কিছু দেখবার দরকার নেই। চাই শুধু—বলে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর তর্জনী নাচিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গি করলেন বেণীমাধব।

মুরারি খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলল, একখানা ছোট উপন্যাসে আজকাল কত নিচ্ছেন সুধাকান্ত?

সে অনেক। এখন ওর চাহিদাই সব চেয়ে বেশী।

তবু?

বেণীবাবু একটা মোটা অঙ্কের উল্লেখ করলেন। মুরারি আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

পুজোর ঠিক দশদিন আগে সবগুলো নাম করা দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল—বৈশাখীর পূজা-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

সুধাকান্তের একখানা সম্পূর্ণ উপন্যাস। তাহা ছাড়া আরও অনেক খ্যাত-নামা সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া পূজার পূর্বেই বাহির হইবে।

ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ তালিকাভুক্তির জন্য সত্বর আবেদন করুন।

মূল্য ৪॥০ টাকা।

সকালের কাগজ হাতে পড়তেই লাফিয়ে উঠলেন বেণীমাধব। বাহাদুর ছেলে বটে মুরারি হালদার। একেবারে অসাধ্য-সাধন করে ফেলেছে। তার পরেই মুখে দেখা দিল দুশ্চিন্তার রেখা—দক্ষিণার পরিমাণটা কোথায় গিয়ে উঠেছে, কে জানে? আর বসে থাকা সম্ভব হল না। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন আফিসে। মুরারি একমনে কাজ করছিল। পিঠে গোটাকয়েক চাপড় দিয়ে বললেন, সাবাস ছেলে! কিন্তু আসল খবরটা কি বল তো ভাই? প্রেসট্রেস বিকিয়ে যাবে না তো?

যা ভাবছেন, তা নয়। অতিশয় ঠাণ্ডা সুরে বলল মুরারি, সুধাকান্ত অত সোজা পাত্তর নয়। লেখা পাওয়া যায়নি।

অ্যাঁ! বলে ধপ করে বসে পড়লেন বেণীবাবু। তাহলে এই বিজ্ঞাপনগুলো—

আমিই দিয়েছি। আপনি কটা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন দাদা। আফিসে-টাফিসে আসবেন না।

এসব বলছ কী তুমি! বুড়ো বয়সে জেল খাটাতে চাও?

এখনি অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? দেখুন না কদ্দুর কি করতে পারি।

পরদিন থেকেই সুরু হল অজস্র চিঠির আমদানি—গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হবার অনুরোধ। অগ্রিম টাকাও এসে গেল অনেক। সুধাকান্ত বটব্যালের সম্পূর্ণ উপন্যাস! ছাপা হলে কম করেও তার দাম হবে সাত টাকা। সাড়ে চার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে একগাদা ফাউ। এমন সুযোগ কে ছাড়ে।

দিন চারেক পরেই পাওয়া গেল সুধাকান্তের কড়া চিঠি। মিথ্যা বিজ্ঞাপনের জন্যে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে শাসিয়েছেন, অবিলম্বে সমস্ত কাগজে সংশোধন-পত্র না পাঠালে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন।

মুরারির মুখে একটি রহস্যময় মৃদু হাসি ফুটে উঠল। উল্টে-পাল্টে দেখল, খামখানা এসেছে সাধারণ ডাকে; রেজেস্ট্রি নয়, এক্সপ্রেসও নয়। অতি ধীর ভাবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে। তার-পর যথারীতি লেগে গেল কাজে। তিনটি দিন মাত্র বাকি। এক সেকেণ্ডও বসে থাকবার সময় নেই।

যথাসময়ে পূজা-সংখ্যা বেরিয়ে গেল। উদার রকম হিসেব করে বেশ একটা মোটা সংখ্যাই ছেপেছিল মুরারি। তা-ও কয়েক দিনের মধ্যেই নিঃশেষ। তখনো স্টকওয়ালাদের পুরো দাবি মেটানো হয়নি, মফঃস্বলের কিছু অর্ডার পড়ে আছে। দিনরাত প্রেস চালিয়ে আরেকটা মুদ্রণ বের করলেন তারিণীবাবু, তা-ও

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এল। রাতারাতি কপাল ফিরে গেল 'বৈশাখী'র।

বেণীমাধব এ ক'দিন আফিসে আসেননি। প্রথম সংখ্যাটা মুরারিই নিয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। উপন্যাসের কয়েক লাইন পড়েই শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন সহকারীর মুখের দিকে। মুরারির মরবার ফুরসৎ ছিল না। বইখানা পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছিল। ও নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি। কথা হল আরও কয়েকদিন পরে, প্রথম যেদিন আফিসে এলেন বেণীমাধব।

সবই তো হল—সিগারেটে টান দিয়ে বললেন সম্পাদক। ঘরে মুরারি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু তারপর? সুধাকান্ত অত সহজে ছেড়ে দেবে, মনে কর? তাকে ঠেকাবে কেমন করে?

মুরারীর সেই এক কথা—দেখাই যাক না কদ্দুর কি করতে পারি।

বেশী দিন আর দেখতে হল না। দিন পনের যেতে না যেতেই বটব্যালের নতুন কেনা 'ল্যাণ্ডমাস্টার' প্রায় নিঃশব্দে এসে লাগল বৈশাখী আফিসের দরজায়। নেমেই গর্জে উঠলেন, এ সব কিসের ব্যবসা ধরেছেন বেণীবাবু?

সম্পাদক আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

মতলবটা কী? কার এক ওঁচা গল্প বেমালুম চালিয়ে দিলেন আমার নামে। তার ফলটা কি হয়েছে খবর রাখেন? এই দেখুন—বলে একগাদা চিঠি টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেললেন সুধাকান্ত।

বেশীর ভাগই খাম, কয়েকখানা পোস্টকার্ড। পাঠক-পাঠিকাদের গালাগালি, এ বড় আশ্চর্য জগৎ। আজ ভাল লেগেছে—আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে, বিনিয়ে বিনিয়ে লিখে পাঠাবে বোঝা বোঝা প্রশস্তি-পত্র। কাল, পছন্দ না হলেই খিস্তি। সে ভাষা শুনলে কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হবে আপনাকে। সুধাকান্তের প্রায় সেই অবস্থা। জিন্দাবাদ দিয়ে যারা একদিন তাঁকে আকাশে তুলেছিল, নিন্দাবাদ হেঁকে তারাই আজ তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

বেণীমাধবকে চুপ করে থাকতে দেখে আরো ক্ষেপে গেলেন বটব্যাল। বললেন, আপনার নামে আমি ড্যামেজ-সুট আনবো! রীতিমত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আপনাকে।

হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল মুরারি হালদার।—ও, আপনি এসেছেন! কী সৌভাগ্য! বলে সব চেয়ে ভাল চেয়ারখানা এগিয়ে দিল সম্মানিত সাহিত্যিকের দিকে। একরকম জোর করেই বসিয়ে বাড়িয়ে ধরল দামী সিগারেটের টিন। তারপর ড্রয়ার খুলে চেক-বই বের করে খস খস করে একটা মোটা অঙ্ক বসিয়ে কলমটা ধরিয়ে দিল বেণীবাবুর হাতে। কলের পুতুলের মত তিনি নিঃশব্দে সই করে দিলেন। নিচু হয়ে দু'হাতে কাগজখানা ধরে সবিনয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সুধাকান্ত চোখ পাকিয়ে বললেন, কী ওটা?

আজ্ঞে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা।

দক্ষিণা মানে? আমি তো আপনাদের কাগজে কোনো লেখা দিইনি।

আজ্ঞে, আপনি না দিলেও আমরা তো ছেপে ফেলেছি!

ছোকরার স্পর্ধা দেখে থ' হয়ে গেলেন বটব্যাল। মুরারি বশংবদ ভঙ্গিতে

মাথার পিছনে হাত রেখে বিগলিত কণ্ঠে বলল, অপরাধ নেবেন না স্যার। ভেবে দেখুন, ড্যামেজ বলুন, ক্ষতিপূরণ বলুন, সে-ও এই টাকা। তার জন্যে কোর্টে যেতে হবে। তার মানে অন্তত বছর খানেকের ধাক্কা। আর ঝামেলা যে কত, আপনি জ্ঞানী লোক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তারপরে ডিক্রি। এ-ও সেই একই হল। শুধু কোর্টে না দিয়ে সরাসরি আপনার হাতে দিলাম। আপনারও সুবিধে, আমাদেরও সুবিধে।

এই পর্যন্ত এসে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে একটা লাফ দিয়ে আবার টান মেরে খুলে ফেলল টেবিলের টানাটা। একখণ্ড কাগজ বের করে চেক-খানার পাশে রেখে বলল, এই নিন প্রতিবাদ।

সুধাকান্ত তাচ্ছিল্য ভরে তাকালেন। বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা খসড়া—

"পূজা সংখ্যার বৈশাখীতে 'মরুপ্রান্তর' নামে যে উপন্যাসখানা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুধাকান্ত বটব্যাল নহেন। মুদ্রণ-প্রমাদ বশত তাঁহার নামটি ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তাঁহার নিকট এবং আমাদের প্রিয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

খসড়াটা পড়া শেষ হলে আড়চোখে চেকখানার দিকে তাকিয়ে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পকেটস্থ করলেন সুধাকান্ত। তারপর উঠে পড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে গম্ভীরভাবে বললেন, এটা আজই পাঠিয়ে দিন সব কাগজে। ভাল করে পার্বালিসিটি হয় যেন।

মুরারি বিনয়ে ভেঙে পড়ে বলল, আজ্ঞে সে কথা বলতে হবে না।

ক'দিন পরেই রাজেন সিকদারের আবির্ভাব। বেণীমাধব ছিলেন না। মুরারি যথারীতি কাজ করছিল। ভদ্রলোককে ভাল করেই চেনে। তবু যেন কখনো দেখিনি এমন ভাবে বলল, কী চাই আপনার?

আমি রাজেন সিকদার। উত্তর এল অতি গম্ভীর সুরে!

রাজেন সিকদার! বলে কপাল কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইল, যেন নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

একটা লেখা দিয়েছিলাম আপনাদের পুজো-সংখ্যায়।

কই, আপনার কোনো লেখা তো বেরোয়নি।

সে কি? আপনাদের সম্পাদক নিজে আমার বাড়ি গিয়ে নিয়ে এলেন।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নিন আপনার লেখা। ওটা ছাপা হয়নি। আমাদের পছন্দ হল না।

ড্রয়ার থেকে বের করে পাণ্ডুলিপিটা রেখে দিল সিকদারের সামনে। তিনি গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর লেখাটই বটে। যেমন ছিল ঠিক তেমনি। শুধু আগেকার সেই ছোট্ট 'অ'-এর নিচে জ্বলজ্বল করছে লাল কালি দিয়ে লেখা আরেকটি বৃহদাকার 'অ'। রাজেন সিকদারের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। শুধু না ছেপে ফেরৎ দেওয়া নয়,. ছাপব বলে সেধে এনে ফিরিয়ে

দেওয়া। এ অপমানের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বলবার কিছু নেই। মনের আগুন মনেই চেপে রেখে লেখাটা তুলে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

বেণীবাবু ফিরবার পর সব কথা শুনে বললেন, তার মানে 'বৈশাখী' এখনো ওর চোখে পড়েনি। নামী লেখকরা নিজের লেখা ছাড়া আর কিছুই বড় একটা পড়ে না। কিন্তু ব্যাপারটা বরাবর চাপা থাকবে না। নিজের লেখা ছাপা হয়ে গেছে অন্যের নামে—এত বড় একটা কাণ্ড দেখেও চুপ করে যাবে, মনে কর।

তখন যদি আসে, ফেলে দেব খানকয়েক নোট।

সে ঝামেলা এখনি মিটিয়ে ফেললে পারতে।

পারলাম না দাদা। পয়সার গরমে আপনার মত লোককে চাকর দিয়ে অপমান করেছিল, সে কথাটা এখনো ভুলতে পারিনি।

আলাদা জাত

'পুলিন কর কার নাম, পুলিনবিহারী কর?'

হাঁক শুনেই সচকিত হয়ে উঠল তিন নম্বরের কয়েদীরা। গণেশ দাসের গলা! কয়েদী হলেও মাতব্বর কয়েদী। 'আমদানী' দপ্তরের 'লালবিল্লা' অর্থাৎ মেসেঞ্জার। ডোরাকাটা কুর্তার বাঁ হাতের উপর বাঁধা আছে এক টুকরো লাল ফিতা। তারই জোরে তামাম জেলখানায় তার অবাধ গতিবিধি। কাউকে কোর্টে যেতে হবে, জামিনে খালাস পাবার হুকুম এসেছে কারো জজ-সাহেবের এজলাস থেকে, কারো বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দেখা করবার দরখাস্ত। গণেশ ছুটল ডেপুটিবাবুর স্লিপ নিয়ে। খুঁজেপেতে ঠিক-লোকটিকে বের করে প্রথমটা নিয়ে যেতে হবে বড় জমাদারের কাছে। তার সই, অর্থাৎ লিখিত অনুমতি নিয়ে তারপর তাকে পৌঁছে দেবে জেলগেটে। এই তার কাজ। গম পিষতে, তাঁত চালাতে, কোদাল কোপাতে হয় না। বাঁ-হাতে নামের লিস্টি, আর ডান-হাতে পেন্সিল নিয়ে সারাদিন শুধু ঘোরাঘুরি। সর্বদাই শশব্যস্ত এবং কারণে অকারণে অতি-গম্ভীর। সাধারণ কয়েদীদের কাছে বেশ খানিকটা মান আছে গণেশ দাসের, এবং সে বিষয়ে সে অতি-সজাগ।

গণেশের ডাক শুনে হুড়মুড় করে একদল কয়েদী বেরিয়ে এল ওয়ার্ডের ভিতর থেকে। লালবিল্লার লিস্টিতে আরো নামও থাকতে পারে।

'পুলিন কর আছে এখানে?'

ভিতর থেকে সাড়া এল—'আছে।'

সামনের একজনের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল গণেশ, 'বাবার নাম কি?'

'আমার?' বুকের উপর আঙুল রেখে জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

'না, তোমার হবে কেন!' ব্যঙ্গ-মেশানো বিরক্তির সুরে ঝাঁজিয়ে উঠল গণেশ, 'আমার বাবার নামটা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

একটা হাসির রোল উঠল। তার মাঝ থেকে পুলিনের গলা শোনা গেল, 'স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর কর।'

'স্বর্গীয়! তার মানে লেট'—বলে গণেশ নামটা মিলিয়ে নিল হাতের লিস্টির সঙ্গে। তারপর তাড়া দিয়ে বলল, 'টুপি পরে গামছা বেঁধে নাও।'

'কেন?'

'কেন আবার! মোলাকাত এসেছে তোমার। এইখানে থাকো। চার নম্বর থেকে ফিরবার পথে নিয়ে যাবো। আবার যেন ডাকতে না হয়।'—বলেই হনহন করে চলে গেল গণেশ।

মোলাকাত অর্থাৎ দেখা করতে এসেছে কেউ। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না পুলিন, কে সে। ছ'মাস হয়ে গেল জেল খাটছে। এতদিন কেউ আসেনি। আসবার মত আপনার জন কেউ থাকলে তো আসবে? একবার ভাবল, কাজ নেই গিয়ে। এখান থেকেই জানিয়ে দেবে, দেখা করতে চাই না। কিন্তু কার এমন গরজ পড়ল দেখা করবার! শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই জয়ী হল।

মাঝখানে দু' লাইন ঘন জালের বেড়া। এপাশে গায়ে গায়ে দাঁড়ান চার-পাঁচ জন কয়েদী। ওপাশে তাদের আত্মীয়স্বজনের দল, প্রায় বারো-চৌদ্দ জন নানাবয়সী মেয়ে-পুরুষের ঘেঁষাঘেঁষি জটলা। ডবল জালের ফাঁক দিয়ে কোন রকমে মুখ চেনা যদি বা যায়, এতগুলো গলার সমবেত সম্ভাষণ ভেদ করে কথা শোনে কার সাধ্য? পুলিন প্রথমটা চিনতে পারল না, তারপর গলা শুনে বুঝল বিনোদ—তার ছেলেবেলাকার বন্ধু। অনেক দিন পরে দেখা। একথা-সেকথার পর সব চেয়ে দরকারী কথাটা জানা গেল, সুধা এসেছে কলকাতায়। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে দেশপ্রাণ কলোনি—সেখানে আছে তার বাবার কাছে। এখনো বিয়ে হয়নি।

সব শেষের ছোট্ট খবরটায় হঠাৎ কেন যেন তোলপাড় করে উঠল বুকের ভিতরটা। সেই মুহূর্তে ঐ ভিড়ের ভিতর থেকে ভেসে এল একটি মিষ্টি কণ্ঠ। কণ্ঠ নয় সুর—'আমি সেই পুলের ধারটায় দাঁড়িয়ে থাকব, বুঝলে?' চমকে উঠল পুলিন। মনে হল যেন সুধা বলছে তাকে উদ্দেশ্য করে—'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব আমি।' স্বপ্ন ভেঙে গেল। ঠিক তার পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল তারই মত কয়েদী একজন, বোধহয় ঐ মেয়েটির স্বামী—'তুমি আবার কষ্ট করতে যাবে কেন? কখন ছাড়বে ঠিক বলতে পারছি না, দেরিও হতে পারে।'

'বা-রে! কষ্ট আবার কিসের?' অভিমান হল মেয়েটির, 'বেশ তুমি যদি না চাও, আসব না।'

'না, না, এসো, এসো। কাউকে সঙ্গে করে এসো। সোমবার নটা।'

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারই মধ্যে বোধহয় ছড়িয়ে পড়ল এক-ঝলক লজ্জার আভা। সেইদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুলিন। ভুলে গেল, ও সুধা নয়, যার জন্যে ও পুলের ধারে অপেক্ষা করে থাকবে, সে-ও

অন্য লোক। সুধাও কি এতদিনে অতবড় হল ? তা হবে বৈকি ! কম দিন তো নয়। শুধু বড় হয়নি, সুন্দরও হয়েছে নিশ্চয়ই ঐ বৌটির মত।

হঠাৎ কাঁধের উপর এক বিরাট থাবা—'কি হে, গিলে খাবে নাকি ?' চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হল পুলিন। সত্যিই তো! অমন হাঁ করে অচেনা মেয়েছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকা—ছিঃ ছিঃ, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে ফিরে গেল নিজের 'নম্বরে'। সমস্ত পথ, এবং তারপরেও অনেক রাত, যতক্ষণ না ঘুম এল, ঐ অচেনা মেয়ের রূপ নিয়ে সুধার সলজ্জ সুন্দর মুখখানা তার অন্তরের নিভৃতে সুধা সঞ্চার করতে লাগল। বারংবার বলতে লাগল মধু-স্নিগ্ধ কণ্ঠে, দাঁড়িয়ে থাকবো আমি। শুধু থাকবো নয়, আছি—অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্যে।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ কোন কালেই পুলিনের স্বভাব নয়। দিনের বেলাটা কাটত কাজকর্মের ভিতর দিয়ে। রাতগুলো কাটানোই ছিল কঠিন! একদল লোক গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসে। তাদের কথাবার্তায় প্রায় সবটুকু জুড়ে থাকে নারী। যোগ দেওয়া অসম্ভব, না দিয়েও রেহাই নেই ? এই অবস্থা থেকে একজন লোক তাকে রক্ষা করল। তার নাম গফুর। কয়েকবার জেলখাটা দাগী। স্বভাবটাও অনেকখানি বেপরোয়া এবং বদরাগী! সবাই এড়িয়ে চলে, ভয়ও করে খানিকটা। পুলিনকে সে কী চোখে দেখেছিল সেই জানে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা সরাসরি বলে ফেলল—'এই, তোর কম্বল নিয়ে এখানে চলে আয়।' অনেকে গা টেপাটেপি করল, মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করল না। পুলিন একটু ভয়ে ভয়েই উঠে গেল। কিন্তু তার পরেই বুঝল, এই কঠিন মানুষটার বুকের কোনোখানে একটি কোমল স্থান আছে, যার সন্ধান সকলে পায় না। সে অনায়াসেই পেল এবং সেদিন থেকে বেঁচে গেল।

পুলিনের ভাবান্তর গফুরের নজর এড়ায়নি। দিনকয়েক নিঃশব্দে লক্ষ্য করে একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে মোলাকাত করে এলি ?'

হঠাৎ এমনধারা খাপছাড়া প্রশ্নে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল পুলিন, 'ও কেউ না।'

'কেউ না-টা কে ?'

'দেশ থেকে এসেছিল, ছেলেবেলার চেনা।'

'সেয়ানা বোন-টোন ছিল নাকি সঙ্গে ?'

'কী যে বল। বোন আবার এল কোত্থেকে ?'

'তবে ?'

'কী তবে ?'

'সেইটাই তো জানতে চাই।'

পুলিন জবাব দিল না! গফুর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'খুলে বলবি, না হাপরের মত ফোঁস-ফোঁস করবি সারারাত ?'

এর পরে আর খুলে না বলে উপায় কি ? তাছাড়া বলতে না পেরে মনটাও ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠেছিল। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করতে হল, গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে সুধার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা। নবগঙ্গার ধারে আম-কাঁঠাল সুপারি-নারিকেল-ঘেরা ছোট একখানা গ্রাম। তারই মধ্যে বিঘা কয়েক জমি নিয়ে সুধার বাবা বসন্ত ঘোষের বাড়ি। তার সঙ্গে মাঠান জমি। এমন-কিছু বড় অবস্থা নয়। সাধারণ কিন্তু মোটামুটি সচ্ছল ও সুখী পরিবার। তিন ভাই-এর একমাত্র বোন সুধা। তের পেরিয়ে সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছে। শ্যাম চিক্কণ দেহে প্রথম জোয়ারের আভাস। স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যে ভরপুর, দেখাশুনো হয়েছিল দু'একবার। কিন্তু সেটা গোপনে নয়, নিভৃতেও নয়। সেখানে না ছিল চাঁদের আলো, না অন্য কোন কাব্যময় পরিবেশ। মুখোমুখি বসে মন দেয়া-নেয়ার সুযোগও হয়নি। হঠাৎ যেতে যেতে ফেলে-যাওয়া একটুখানি সলজ্জ চাহনি, একটি মধুর মোহন অপ্রতিভ হাসি ! তার থেকেই সব-কিছু বুঝে নিয়েছিল পুলিন। উনিশ বছরের প্রথম যৌবন। ইস্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি। পল্লী অঞ্চলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফুটবল খেলায় প্রচুর নামডাক। রূপ থাক না থাক স্বাস্থ্যের অভাব ছিল না। ঘরে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা ! দুটিতে কিন্তু বেশ মানায়—কথাটা প্রথম তুলেছিলেন ওর দিদিমা। ও-পক্ষের মেয়েমহলে কিছুটা সমর্থনও পেয়েছিল। কিন্তু সমস্ত প্রসঙ্গ এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলেন বসন্ত ঘোষ। অতবড় কুলীন, মৌলিকের ঘরে মেয়ে দিতে যাবেন কোন দুঃখে। তাছাড়া আরো একটা বাধা। সুধার বড়দা স্টিমার স্টেশনের কেরানী। যদিও নেহাৎ গ্রাম্য স্টেশন তবু সেখান থেকেই গ্রামের বাইরে যে জগৎ, তার খানিকটা ছবি সে ঘরে নিয়ে আসত। সে ছবির সঙ্গে চোদ্দ বছরের মেয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে নৌকা চড়ে কাঁদতে কাঁদতে পাশের কোন গ্রামে শ্বশুরঘর করতে চলেছে, এ দৃশ্যটা ঠিক খাপ খায় না। সুধা তখন চারুপাঠ শেষ করে দাদার কাছে ফার্স্টবুকের ঘোড়ার গল্প পড়ছে। সেটা শেষ হলে ধরবে ঈসপস-ফেবল। বয়সও খানিকটা বাড়বে, তারপর চাকরে ছেলের হাত ধরে স্টিমারে করে নতুন দেশে গিয়ে ঘর বাঁধবে। তাদের ছোট বোনটি সম্বন্ধে এই ছিল দাদার স্বপ্ন। পুলিন সেখানে জায়গা পেল না।

কিছুদিন পরেই দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে গেল রক্তগঙ্গা। নবগঙ্গার দু-তীরেও তার ঢেউ গিয়ে লাগল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কে তলিয়ে গেল, আর কে-ই বা ভাসতে ভাসতে উঠল কোন কূলে—এসব খোঁজ নেবার মত অবস্থা কারো রইল না। পুলিন কোনরকমে পৌঁছল গিয়ে কলকাতায়। তার পরের ইতিহাস সময়ের দিক দিয়ে দীর্ঘ না হলেও ঘটনার দিক দিয়ে বৃহৎ। সে অধ্যায়টা সংক্ষেপে সেরে ফেলল পুলিন। প্রথমেই পড়া বন্ধ হল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা-ও ভুগে ভুগে কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অনুসরণ করলেন। একটা বোন—তাকে কোনরকমে পার করে বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যের পথে। সুধার খবর নেবার সময় আর পেল কোথায় ? তবে এইটুকু কোন সূত্রে কানে এসেছিল, তারা সবাই এপারে এসে গেছে। কোথায় আছে, কেমন আছে, জানবার

সুযোগ হয়নি।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত বৈকি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত বড়দার মুখের সেই মর্মান্তিক কথা—'চাকরে ছেলে।' কেমন এক ধরনের উচ্চাঙ্গের টান দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করত ভদ্রলোক। এবার যখন সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেল, সংসারে আর বিশেষ কোন বন্ধন রইল না, তখন সেই 'টান'টা তাকে ঐ বিশেষ পথেই টানতে লাগল। একটা চাকরি চাই। কেবলমাত্র নিজের জন্যে হলে হয়তো এমন বেপরোয়া চাকরির চেষ্টা সে করত না। কিন্তু মনে মনে তখন সে আর একা নয়। চাকরি তো চাইলেই পাওয়া যায় না। ক্রমাগত ব্যর্থতার বোঝা টেনে টেনে মনটা যখনই ঝিমিয়ে পড়ত, তখনই কানের কাছে বেজে উঠত গর্বের ভঙ্গীতে উচ্চারিত সেই 'চাকরের ছেলে'। ওটা তখন তার জীবনের মান-মর্যাদার একমাত্র প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশেষে চাকরি একটা জুটল। হঠাৎ জুটে গেল, বলা চলে। কোন নামজাদা সাইকেল-কোম্পানির পাওনা টাকা আদায় করে বেড়ানো। কাজ যাই হোক, গালভরা ইংরেজী নামটা গর্ব করবার মত—বিল-কালেকসন এজেন্ট। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। সেই সঙ্গে আদায়ের উপর কমিশন এবং ঘোরাঘুরির জন্য ভাতা। প্রথম মাস কয়েক মাইনেপত্তর সময় মতই পাওয়া গেল। পুলিনের বিশ্রাম নেই। যে-সব পাওনা অনেকদিন থেকে পড়ে আছে এবং মারা যাবে বলেই ধরে রেখে-ছিল কোম্পানি, তার মোটা অংশটা ঘরে চলে এল। কমিশনের অংকটাও বাড়তে লাগল। সেটা যেন কর্তাদের তেমন মনঃপুত হল না। ক্রমশঃ দেখা গেল মাইনেটা ঠিকমত পাওয়া যায়, কমিশন বাকী পড়ে। তাগাদা দিলে ম্যানেজার বিরক্ত হন। তারপর শুরু হল হিসাব নিয়ে গণ্ডগোল। যেটা জলের মত স্বচ্ছ, তাকে তেলের মত ঘোলাটে করবার অপচেষ্টা। সেখানে যখন সুবিধা হল না, এদিকে অনেক টাকা পাওনা হয়ে গেছে পুলিনের, তখন প্রস্তাব এল কমিশনের হার কম করতে হবে। পুলিন বলে বসল, চাই না আপনাদের চাকরি, আমার টাকা মিটিয়ে দিন। এ প্রস্তাবের প্রথম অংশটা কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন, কিন্তু পরের অংশ পূরণ করতে গড়িমসি চলতে লাগল। ক'দিন অপেক্ষা করে পুলিন কাজ ছেড়ে দিয়ে বলে গেল, 'আমার কাছে বিল আদায় বাবদ আপনাদের পাওনা রইল পাঁচশ সাতষট্টি টাকা বারো আনা। টাকাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রাপ্য এর চেয়ে অনেক বেশি। সেটা মিটিয়ে দিলেই এ-টাকা ফেরত দিয়ে যাব। এই রইল আমার ঠিকানা।'

অন্য চাকরি খোঁজা দরকার। দু'এক জায়গায় দেখা করবার তাগিদও ছিল। কিন্তু যদি ম্যানেজার কিংবা তার লোক এসে ফিরে যায়, তাই সারাদিন বাসায় বসে থাকতে হয়। এমনি করে দিন তিনেক গেল। চারদিনের দিনে ম্যানেজারের বদলে এল পুলিস। সঙ্গে ওয়ারেণ্ট। অপরাধটা কী? একটা নয়, অনেকগুলো ধারা—চুরি, তহবিল-তছরুপ এবং বিশ্বাসভঙ্গ, যাকে বলে **criminal breach of trust**। ফৌজদারী মামলা রুজু হয়ে গেল পুলিনের নামে। কিন্তু পুলিস পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেও ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকতে চাইল না। তার

জানা ছিল, 'চুরি' কথাটার অর্থ—'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ'। এখানে যা সে নিয়েছে, কোম্পানিকে বলেই নিয়েছে। আর এটা ঠিক নেওয়াও নয়। যতক্ষণ আমার পাওনা মিটিয়ে না দিচ্ছ, তোমাদের পাওনা জমা রইল আমার কাছে—এ কেমন ধারা তহবিল-তছরূপ? তারপর বিশ্বাসভঙ্গ—সে অপরাধ তো করেছে কোম্পানি। যা দেবে বলে চুক্তি করেছিল, তা দেয়নি।

এসব গেল সাধারণ বুদ্ধির যুক্তি। এর মধ্যে যে নীতি আছে, বিদ্যাসাগরের যুগে হয়তো চলত। এ যুগে চলে না। 'চুরি' ইত্যাদির সংজ্ঞা আজ বদলে গেছে। প্রথম ভাগ হাতে করে হাকিম তাঁর উচ্চ মঞ্চে বসেননি। তাঁর বাইবেল হল ইণ্ডিয়ান পিনালকোড। সেই মহাগ্রন্থের উপর নির্ভর করে আসামীকে তিনি এক বছরের জন্যে জেলে পাঠালেন। তার সঙ্গে এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছ'মাস।

গফুর নিঃশব্দে শুনে গেল সবটুকু, এবং শোনাবার পরেও কোন উচ্চবাচ্য করল না। দিন দুই পরে পুলিনকে অফিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে দেখা করল জেলারবাবুর সঙ্গে।

'কি রে গফুর, কি চাই?'—বেশ খানিকটা খাতির দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জেলারবাবু। গফুরের মত 'বি ক্লাস', যারা বারবার জেলে আসে, সমাজের সৎ-মানুষেরা নাক সিঁটকে বলেন 'জেলঘুঘু', জেলকর্তৃপক্ষের কাছে তাদের প্রচুর সমাদর। এরাই হল জেলখানার লক্ষ্মী। এদের চেষ্টায় এবং একাধিক মেয়াদে অর্জিত যে দক্ষতা, তারই ফলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিল্প, যার নাম **Jail Industries**। এরা একদিকে যেমন সুনিপুণ কারিগর, আরেক দিকে তেমনি ধৈর্যশীল শিক্ষক! নিত্য-আমদানি অনিচ্ছুক এবং আনাড়ী কয়েদীকে গড়েপিটে কাজের লোক তৈরি করবার গুরুদায়িত্ব যারা বহন করে, তারা মাইনে-করা বাইরের লোক নয়, এইসব বিনি-মাইনের 'বি-ক্লাস'। সবাই জানে, এরা ফিরে এসে জেলের অন্ন ধ্বংস করে। তার বদলে যা দেয়, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। জেল-বাজেটের বাঁ দিকের যে অঙ্ক, সেটা অনেকাংশে এই জেল-ঘুঘুদের দান।

জেলারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর তাঁতশালার ওস্তাগর গফুর শেখ সবিনয়ে সেলাম করে জানাল, 'আমার কিছু চাই না হুজুর। এই ছোঁড়াটাকে—কই রে, কোথায় গেলি?'

পুলিন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সেলাম করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। জেলারবাবু তার দিকে একবার চেয়ে হেসে বললেন, 'তোর ওখানে পাশ করে দিতে হবে, এই তো?'

'জী, না, হুজুর। আমার ওখানে ও কী করবে? মোটে এক বছর মেয়াদ। শেখাতে না শেখাতেই বেরিয়ে যাবে। মেহেরবানি করে ওকে ভেতরবাগানে ফেলে রেখে দিন। একটু আগে আগে যাওয়া দরকার। যাবার আগে দু'চারটা দিন 'ইস্পিশাল' যদি আপনার কলম থেকে পেয়ে যায়, বড্ড উপকার হয় বেচারার।'

'ইস্পিশাল, মানে স্পেশাল রেমিশন' অর্থাৎ বিশেষ ধরনের জেল-মকুফ।

'কোথায় আছে ও ?' জিজ্ঞাসা করলেন জেলর।

'গম-চাকিতে আছে।'

'টিকিটখানা পাঠিয়ে দিস। আর কিছু বলবি ?'

'জী, না হুজুর।'

পরদিন সকালবেলা বড়-জমাদার যখন নতুন কয়েদীদের টিকিট পেশ করে এবং জেলরবাবু তার উপরে লিখে দেন কে কোথায় কী কাজ করবে, সেই সঙ্গে পুলিনকেও চালান করা হল গম-পেশা থেকে সবজি-বাগানে। এখানে রবিবারেও কাজ হয়, এবং অন্যত্র যেখানে মাসে চারদিন করে মাপ বা **remission** দেওয়া হয়, এখানে দেওয়া হয় পাঁচদিন। এর উপরে ইস্পিশাল বা **special remission**ও আছে। সেটা প্রধানত জেলরবাবুর অনুগ্রহ। গফুরের সুপারিশে পুলিনের ভাগ্যে সেটা পুরো মাত্রায় জুটে গেল।

২

কলোনির আর সব বাসিন্দাদের মত বসন্ত ঘোষও একটা সরকারী গৃহ নির্মাণ ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই যেমন সেটা গৃহ বাদ দিয়ে অন্য সব ব্যাপারে নিঃশেষ হয়ে যায়, বসন্ত তা হতে দেননি। ঐ দিয়েই পাকা ভিত এবং দেয়ালের উপর খান তিনেক টিনের চালা তুলতে পেরেছিলেন। ছেলেরাও আন্দোলনের পথে না গিয়ে ছোটখাট যা হোক কিছু অবলম্বন করে বাপের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দুটোকে সমানভাবে কাজে লাগিয়ে বসন্ত ঘোষ অল্পদিনেই কলোনির কেউ-কেটাদের দলে গিয়ে পড়েছিলেন।

মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি। তার জন্যে কোন উদ্বেগ ছিল না। এখানকার পরিবেশ সেই নবগঙ্গার তীরে ফেলে-আসা আবহাওয়া থেকে আলাদা। মেয়ে বড় হওয়াটা এখানে অপরাধ নয়, এবং এখনো বিয়ে হয়নি দেখে 'ও মা!' বলে কোন প্রতিবেশিনী চোখ কপালে তোলে না। মানুষ যে অবস্থায় পড়ে, তারই সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। বসন্তকেও হয়েছিল। চৌদ্দয় পা দিয়েছে বলে যে মেয়ের ঘরের বাইরে পা-দেওয়া কড়া শাসনের আওতায় এসে পড়েছিল, আঠারর প্রান্তে এসে সে-ই বই বুকে করে প্রকাশ্য রাস্তায় বহু লোকের দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে একা একা ইস্কুলে যায়। সে জড়সড় ভাবে কোথায় চলে গেছে। স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন।

ঘটনাচক্রে এই অবস্থাতেই দেখা হয়ে গেল পুলিনের সঙ্গে। সেই সুধা। সেদিন যা ছিল আভাস মাত্র, আজ তার পরিপূর্ণ বিকাশ। জোয়ার আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল পুলিনের। ও তরফেও কি কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি ? মনে হল যেন একটুখানি মন্থর হল চলার ছন্দ। মুখের রেখায় উঠল ক্ষণিকের ত্রস্ত বিস্ময়। পুলিনের ইচ্ছা হল আর একটু কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ সুধা ? সাহস হল না।

অনুকূল মুহূর্তটি চলে গেল। চোখের কোণ দিয়ে একটিবার মাত্র তাকিয়েই এগিয়ে চলল সুধা। বোঝা গেল না কী ছিল সেই চাউনিতে। পুলিনের মনে হল এ দৃষ্টি নয়, দৃষ্টি-প্রসাদ।

বসন্ত ঘোষের বাড়ি সবাই চেনে। দু-এক জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদ করেই সন্ধান পাওয়া গেল। কড়ানাড়া বা ডাকাডাকির দরকার হল না। সামনেই বসেছিলেন বাইরের ঘরের রোয়াকে। পুলিন কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কপাল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

পুলিন মনে মনে একটু আহত হল। তারপর নিজেকে প্রবোধ দিল এই বলে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তেমন জোরালো আলো নেই কাছাকাছি, হয়তো চিনতে প্যারেননি। বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে, আমি পুলিন।'

'ও-ও। তা কী মনে করে?'

নিরুৎসাহ নিরুত্তাপ স্বর। সেদিনের সে সাদরসম্ভাষণ বা সস্নেহ অভ্যর্থনার লেশমাত্র নেই! পুলিন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না। হঠাৎ চমকে উঠল পরের প্রশ্নটা শুনে, 'জেলে গিয়েছিলে শুনলাম?'

খবরটা তাহলে আগেই পৌঁছে গেছে।

'কি করেছিলে, চুরি?'

'আজ্ঞে না, যেখানে চাকরি করতাম, তারাই মিথ্যে করে—'

'ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেল হবার পর সবাই শুনেছি ঐ কথা বলে থাকে। এখন কি করা হচ্ছে?'

'কদিন হল একটা চাকরি পেয়েছি।'

'ও-ও। তা বেশ।'

পুলিন আশা করছিল, জানতে চাইবেন কী চাকরি, কত মাইনে, উপরি কত। চাকরির উপর এদের সেই দারুণ মোহ সে তো ভাল করেই জানে। কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না ভদ্দরলোক। কোনরকম কৌতূহল না দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল এদিকে?'

'আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছিলাম।'

'আমার কাছে! কেন?'

পুলিন বারকয়েক ইতস্তত করে দু'চারবার ঢোক গিলে সলজ্জ কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে, শুনলাম সুধারাণীর এখনো বিয়ে হয়নি—'

বলে মাথা চুলকাতে লাগল।

'না হয়নি। পাত্তর-টাত্তর আছে নাকি তোমার হাতে?'

'আমার সব কথাই তো আপনি জানেন। যদি অনুগ্রহ করে—'

'তুমি!'

'আজ্ঞে, চাকরিটা মোটামুটি ভালই। একটা বাসাও—'

'চুলোয় যাকগে তোমার চাকরি আর বাসা!' গর্জে উঠলেন বসন্ত ঘোষ, 'একটা মেয়াদ-খাটা চোর, তোর হাতে মেয়ে দেবো! এতবড় আস্পর্ধা তোমার?'

'কে, বাবা ?' বলতে বলতে বেরিয়ে এল বসন্ত ঘোষের বড় ছেলে যোগেশ। স্টিমারের কেরানী, এপারে এসে হয়েছে রেলের কেরানী। এগিয়ে এসে রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'পুলিন না ? কি খবর ?'

বসন্ত তখনো সামলে উঠতে পারেননি। ছেলের প্রশ্নে কোন সাড়া দিলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা যাকে উদ্দেশ্য করে, সে-ও তেমনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। যোগেশ কাছে এসে বলল, 'বাবার কথাবার্তাই অমনি। তুমি কিছু মনে করো না। যা বলবার ভালো ভাবে বললেই হয়। চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।'

পুলিন নিঃশব্দে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল। যোগেশ বকবক করতে করতে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। পথের দু'ধারে দু'একখানা পাকাবাড়ি, বেশির ভাগই চালা। তারই একখানার সামনে দাঁড়িয়ে একটি রোগা মতন লোক বিড়ি টানছিল। যোগেশকে দেখতে পেয়ে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে বলল, 'বেরোচ্ছেন নাকি, বড়দা ?'

'না হে। এখন আর যাবো কোথায় ? এই একে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'এঁকে তো চিনলাম না।'

'আমাদের পুলিন। তুমি বোধহয় শুনেছ ওর কথা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি ! বিনোদবাবু বলছিলেন সেদিন।'

বলে, কেমন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পুলিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। যোগেশ এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলে ফেলল, 'সুধার সঙ্গে কি রকম মানাবে বল দেখি ?'

চমকে উঠল পুলিন। আপনার অজ্ঞাতসারে একবার ফিরে তাকাল পিছনের দিকে। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বড়দা তখন আপন মনে বলে চলেছে, 'চাকরি করে ছেলেটা। তেমন বড় কিছু নয়, আমার মতই কেরানী। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আসছে মাসে দু'হাত এক করতে পারলেই নিশ্চিন্দি হতে পারি আমরা। এবার তাহলে আসি, কি বল ? এই তো, আর একটু হাঁটলেই বাস পাবে।'

৩

রোজকার মত সন্ধ্যার দিকে একদল আসামী নিয়ে গণেশ যখন সাত নম্বরের দিকে যাচ্ছিল, গুমটির কাছে গফুরের সঙ্গে দেখা। হঠাৎ যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়াল গফুর। এগিয়ে এসে বলল, 'ফিরে এলি !' গণেশের কানে কানে কি একটা বলতেই সে প্রতিবাদ করে উঠল, 'তা হয় না। হাজতী আসামী তিন নম্বরে থাকতে পারে না।'

'তুমি মন করলেই পারে, গণেশবাবু।'

'বাবু' সম্বোধনে খানিকটা নরম হলেও আপত্তি করল গণেশ, 'জমাদার যদি—'

'আহা ! সে ভার আমার উপর রইল।'

প্রসারিত হাতের উপর গোটাচারেক বিড়ি রাখতেই গণেশ একগাল হেসে হনহন করে এগিয়ে চলল। গফুর ফিরে গেল তিন নম্বরে।

সেই চেনা কোণটিতে তেমনি পাশাপাশি শুয়ে সেই রাতে পুলিন খুলে ধরল তার ক্ষণস্থায়ী মুক্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যোগেশের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত সবটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে শেষটায় যোগ করল—

'একটা ক্যালভার্টের ওপর বসেছিলাম। কী সব ভাবছিলাম আবোল-তাবোল—সব কি আর মনে আছে? হঠাৎ দেখি রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। লোকজন নেই, বাসও বন্ধ হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে তখনও আগুন জ্বলছে। আর বসে থাকা গেল না। আস্তে আস্তে ফিরে গেলাম সেই বাড়িটার সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল লোকটা। রাস্তার ধারেই ঘর, জানলা খোলা। কে যেন ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। পকেটে নোটবুক ছিল, পেন্সিলও ছিল একটা। একখানা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলাম—সুধা খারাপ মেয়ে। চরিত্র ভাল নয়। ওকে বিয়ে করলে ঠকবেন।' কাগজটা ভাঁজ করতে করতে একবার মনে হল, না থাক। সুখী হোক সুধা। ওর তো কোন দোষ নেই। তক্ষুনি মনে পড়ল ওর বাবার সেই কথাগুলো। আবার আগুন জ্বলে উঠল মাথার ভেতর। জেল খেটেছি বলে মানুষ নই আমি? জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম কাগজখানা। লোকটার পাশে গিয়ে পড়ল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই হাতে পড়বে। ফেঁসে যাবে বিয়ে।

'ছুটে চলে এলাম আবার সেই পুলের ওপর। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। ছিঃ ছিঃ, এ কী করলাম! এ যে কত বড় মিথ্যা! সুধাকে না আমি ভালবাসি? তারপর আর স্থির থাকতে পারলাম না। আবার ছুটে গেলাম সেই জানালার ধারে। বেলে-বেলে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, কাগজটা তেমনি পড়ে আছে। এখনো কারো চোখে পড়েনি। ঘুরে গেলাম দরজার দিকে। ভেতর থেকে বন্ধ। জানালার শিকগুলো পাতলা; খানিকটা আলগা মতন। চৌকাঠও অপলকা। পকেটে ছুরি ছিল। আস্তে আস্তে গোড়ার দিকটা একটুখানিক কেটে, টান দিতেই গোটা দুই শিক উঠে এল। ঢুকে পড়লাম। কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে বেরোতে যাবো হঠাৎ জেগে উঠল লোকটা। না, সে নয়; ষন্ডা মতন অন্য কে একজন। 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। দু'হাতে এমন জাপটে ধরল, ছাড়ায় কার সাধ্য?'

গফুর আর একটা বিড়ি ধরাল। খানিকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সেই কাগজের টুকরোটা?'

'জাপটে ধরতেই সেটা ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম।'

গফুর আর কোন প্রশ্ন করল না। খানিকক্ষণ দম দিয়ে পুলিন আবার শুরু করল—'দেখতে দেখতে ভেঙে পড়ল কলোনির লোক। ওরাও ছিল তার মধ্যে। ভোর হয়ে গিয়েছিল। হাত বেঁধে কয়েকটা ছোকরা যখন নিয়ে যাচ্ছিল থানায়, পাশের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখলাম একদল মেয়ের মধ্যে সে-ও দাঁড়িয়ে আছে।'

পর্নিলনের কাহিনী শেষ হল। অনেকক্ষণ বক্তা বা শ্রোতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অন্য সব কয়েদীরা ঘ্নমিয়ে পড়েছে। পাহারাদারও বোধহয় শ্নয়ে পড়েছে কোনখানে। হঠাৎ গফ্ফ্নর বলে উঠল তার ভাঙা ভাঙা গলায়—'ভালোই হল। দিব্যি আরামসে থাকা যাবে। ওসব আমাদের পোষায় না, ব্নঝলি? আমরা হলাম আলাদা জাত। নে, একটা বিড়ি খা।'

প্রধান-অতিথি

প্নরো নামটা ছিল রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী। সাহিত্য-জগতে তার প্রথমাংশ প্রায় ল্নপ্ত হয়ে গেছে, দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয়াংশ। আশ্চর্য নয়। বাংলা-সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন ব্রহ্মচারী। তার নাম হাসপাতাল। আর্ত মান্নষের বেদনার্ত হৃদয়ের ছবি। এদেরই নিয়ে তাঁর প্রথম রচনা, 'ব্যাধি-মন্দির' এক গভীর আবেদন নিয়ে এসেছে বাংলার ঘরে ঘরে।

খ্যাতির নেশায় পাগল হয়ে অবিরাম লিখে চলেছেন ব্রহ্মচারী, ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর বিকৃত রক্তে রঞ্জিত করেছেন সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণ। সম্প্রতি যে বইখানা তাঁর রীতিমত আলোড়ন এনেছে পাঠক-মহলে, তার নায়িকা ভি-ডি ওয়ার্ডের একটি তর্নণী পেসেণ্ট। কী করে, কার আকর্ষণে, কোন দ্নরন্ত যৌবনের জোয়ারের দিনে তার পদস্খলন হয়েছিল, তারপর কোন পথ ধরে গোপন ব্যাধির অভিশাপ দেহে নিয়ে সে ভাসতে ভাসতে ঠেকল এসে হাসপাতালের দরজায়, জড়িয়ে গেল এক হৃদয়বান তর্নণ ডাক্তারের জীবনের সঙ্গে, তারই চমকপ্রদ কাহিনী।

ব্রহ্মচারীর লেখায় স্থান পেয়েছে যে সব নরনারী, তারা কল্পনা-রাজ্যের জীব নয়, লেখকের বাস্তব-জীবনের জীবন্ত মান্নষ। তাই বোধহয় তারা প্রথম দ্নষ্টিতেই পাঠক-পাঠিকার মন কেড়ে নেয়।

এ জগতে একদিন আকস্মিকভাবেই এসে পড়েছিলেন রাধাকান্ত। কোন কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁরও পরিচয় অতি সামান্য। সবে ইস্কুলের গণ্ডী পার হয়েছিলেন মাত্র। তারপর যে পথ ধরে তাঁকে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চলতে হয়েছে, সেটা আগাগোড়া কঙ্করময়। সে কাহিনী এখানে অবান্তর। কোনো এক আত্মীয় ছিলেন হাসপাতালের কন্ট্রাক্টর। তাঁরই কল্যাণে ডিম-মাছ-তরি-তরকারীর ঠেলাগাড়ির সঙ্গে হাসপাতালে প্রথম প্রবেশ, এবং কিঞ্চিৎ ডান-হাত-বাঁ-হাতের কসরৎ দেখিয়ে, আত্মীয়টিকে পেছনে ফেলে সরা-সরি তাঁর স্থান গ্রহণ। র্নগীদের খাদ্য সরবরাহ করতেন রাধাকান্ত, এবং তাদের জীবন থেকে সংগ্রহ করতেন নিজের খাদ্য। তারই খানিকটা একদিন পরিবেশন করলেন সাহিত্যের পাতে। ট্যাঁড়স, ভেটকির বাজার থেকে ঢ্নকলেন এসে সাহিত্যের বাজারে। খ্যাতি এল, অর্থ এল। আজ হাসপাতাল ছাড়লেও খাদ্য-যোগান বন্ধ হয়নি ব্রহ্মচারীর। হয়েছে শ্নধ্ন রোগী-বদল। দৈহিক ব্যাধির ক্ষ্নদ্র পরিসর থেকে চলে এসেছেন মানসিক ব্যাধির বিস্তৃত এলাকায়।

খ্যাতির সঙ্গে ভক্ত-বৃদ্ধি অনিবার্য। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। মাঝে মাঝে তাই সভা-সমিতি ক্লাব-আড্ডার উচ্চ-মঞ্চে গিয়ে বসতে হয়। সেই উদ্দেশ্যেই বেরোচ্ছিলেন সেদিন। নীচে নামতেই মামার সঙ্গে দেখা। মামা হলেও প্রায় সমবয়সী। ব্যবসা-সূত্রে বাইরে বাইরেই ঘুরতে হয়। প্রায় পনর বছর পরে ক'দিন হল দেশে ফিরেছেন। বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে সেজে-গুজে ?

বিরক্তির ভান করে উত্তর দিলেন ব্রহ্মচারী, 'আর বলো না ! সভা-সমিতির জ্বালায় অস্থির। রোজই প্রায় লেগে আছে একটা না একটা।'

'বেশ তো। সভাপতি বুঝি ?'

'না। প্রধান-অতিথি।'

'সে আবার কী পদার্থ ?'

'প্রধান-অতিথি বুঝলে না ! চীফ গেস্ট্।'

'তা মন্দ বলনি। তোমাদের হাতে পড়ে বাংলা-ভাষার যে রকম উন্নতি হয়েছে, তার মানে বোঝাতে হয় ইংরেজি শব্দ দিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের কালে তো সভাপতিই ছিলেন সভার একমাত্র প্রধান ব্যক্তি। আর সব বক্তা। তা, এই প্রধান-অতিথি না কি বললে, তার কম্মো মানে function-টা কি।'

'কম্মো আর কী ? বক্তৃতা। এ ছাড়া আর একজন আছেন, তাঁর কাজ হল সভার উদ্বোধন। এই তিন প্রধান না হলে আজকাল সভা হয় না।'

'অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। নমস্ত্রিমূর্তয়ে। এবার বুঝলাম ! একনায়কত্বের দিন চলে গেছে। ডেমোক্রাসির যুগ ; তার মূল নীতি হল decentralisation. তোমাদের কটমট বাংলায় বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ ক্ষমতা একজায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই, শুধু সভাপতি হলে চলবে না, আরো দুটি চাই তার ডাইনে বাঁয়ে—একজন প্রধান-অতিথি, আর একজন কি বললে ?'

'উদ্বোধক।'

'উদ্বোধক। আগে কিন্তু উদ্বোধন থেকে উপসংহার সব কাজ করতেন ঐ সভাপতি একা। উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার লোক একজন জোটাতে হত। সেটাও কখনো কখনো সভাপতি নিজেই চালিয়ে নিতেন। একটা ঘটনা তো আমিই জানি। বরিশালে অশ্বিনী দত্ত হল-এ সভা হচ্ছে। কার মৃত্যু-বার্ষিকী না জন্মোৎসব, ঠিক মনে নেই। সভাপতি হয়েছেন সহরের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি। অন্য দশটা কাজ ফেলে এসেছেন। এদিকে উদ্যোক্তারা তৈরি হতে পারছেন না। ব্যাপার কি ? দেরি কিসের ? জিজ্ঞেস করলেন পাণ্ডাদের কাউকে। আজ্ঞে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবেন যিনি, তিনি এসে পৌঁছননি। হারমোনিয়াম আছে তো ? আছে। নিয়ে এসো—বলে খাম্বাজ কি ভীমপলশ্রী রাগিনীতে সভা কাঁপিয়ে গান ধরলেন সভাপতি। সভা সুরু হয়ে গেল।'

ব্রহ্মচারী হেসে উঠলেন, 'তাই নাকি ? আজকাল সভাপতির কাজটাই সব চেয়ে কম। চুপ করে বসে থাক, পুরো প্রোগ্রামটা যতক্ষণ না শেষ হয়। তার

চেয়ে উদ্বোধক বা প্রধান-অতিথি হওয়াই সুবিধে। গোড়ার দিকেই দু-চার কথা বলে সরে পড়া চলে। অসুবিধাও আছে। ঝড় ঝাপটা যা কিছু ওদের ওপর দিয়েই যায়। সকলের শেষে, সব কিছু হয়ে যাবার পর সভাপতি যখন ওঠেন, ততক্ষণে সভাও প্রায় ফাঁকা। তারে-নারে—করে বসে পড়লেই হল।'

ট্যাক্সি নিয়ে দু-জন ভক্ত এসে পড়লেন। ব্রহ্মচারীকে উঠতে হল। সভাপতি-তত্ত্বের গবেষণা আর অগ্রসর হল না।

সহরের উপকণ্ঠে অনেকখানি খোলা জায়গা জুড়ে একটা ব্যায়ামাগার। সভাপতি পাড়ার এক কাঠগুদামের মালিক। মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন ব্যায়ামাগারের ভাণ্ডারে। প্যাণ্ডেল, মাইক, বিজলিবাতির বিশাল আয়োজন। দেড়-হাত লম্বা ঠাসবুনানী প্রোগ্রাম। নাচ, গান, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতাপাঠ, ম্যাজিক, ক্যারিকেচার; তার উপর প্রবন্ধ, কার্যবিবরণী-পাঠ এ সব তো আছেই। দর্শক-শ্রোতার বিপুল সমাবেশ। ব্রহ্মচারী যখন পৌঁছলেন, তখন হ্যালো হ্যালো করে মাইক-পরীক্ষা সুরু হয়েছে। মঞ্চের ঠিক সামনে ময়লা সতরঞ্চির উপর শখানেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে যথারীতি গণ্ডগোল করে চলেছে। ব্রহ্মচারী জানেন, সে গোলমাল বরাবর চলতে থাকবে, এবং তারই মধ্যে তাঁকে তারস্বরে চেঁচাতে অর্থাৎ ভাষণ দিতে হবে।

সভাপতির টেবিলের উপর কার্যসূচীর দিকে নজর পড়ল। প্রধান-অতিথির নম্বর পড়েছে সাত। অর্থাৎ ছ-দফা আইটেম শেষ হলে তাঁর ডাক পড়বে। কতক্ষণ লাগবে মনে মনে হিসাব করছেন, আর ভাবছেন ব্যায়াম-কসরতের সঙ্গে সাহিত্যের যোগটা কোথায়, এ দু'এর মধ্যে সমন্বয় দেখানো যাবে কেমন করে? এ ছাড়া তাঁর বলবার আর কী থাকতে পারে? ইতিমধ্যে একটার পর একটা দফা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তাঁর পালা তো আসছে না। আর একবার সূচী-তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর দফা প্রায় রফা। সাত থেকে কখন সতেরয় নেমে এসেছেন প্রধান-অতিথি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ একজন পাণ্ডা এসে কানে কানে জানিয়ে গেলেন, 'ক-জন আর্টিস্ট বড্ড তাড়াতাড়ি করছেন, অন্যত্র প্রোগ্রাম আছে; তাঁদের একটু ওপরে তুলে দিলাম। আপনার একটু কষ্ট হবে স্যার।'

ব্রহ্মচারী আর কী বলবেন? ভিতরের অবস্থা যাই হোক একখানা হাসির মুখোস পরে বসে বসে পা নাচাতে লাগলেন।

অবশেষে সতের নম্বর এসে গেল। মাইকের কাছে গিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে সবে হুঙ্কার দিয়েছেন, 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়…' পেছন থেকে কানে গেল, কাকে যেন বলছেন একটি মহিলা, 'আপনাকে এত করে বললাম, অর্চনার নাচটা এবার দিয়ে দিন—কে একটা লোক আবার বলতে উঠল। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।'

'আস্তে, আস্তে, শুনতে পাবেন ভদ্রলোক', চাপা গলায় বললেন সেক্রেটারী, 'উনি আমাদের প্রধান অতিথি।'

মহিলাটি কিছুমাত্র দমে না গিয়ে তেমনি সুর চড়িয়েই বললেন, 'তা কী জানি, প্রধান-অতিথি না কী! এবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্দ তো?'

শ্রোতাদের শেষের কয়েক সারিতে সমান গোলমাল চলতে লাগল। স্টেজের পেছনেও পাণ্ডাদের হাঁকডাক, অর্থাৎ পরবর্তী দফার আয়োজনপর্ব। তারই মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চলেছেন প্রধান-অতিথি। বোঝাতে চেষ্টা করছেন—'শক্তি-সদনের ব্রত হল শক্তি-সাধনা। কিন্তু শক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে দেহচর্চার সঙ্গে চাই মনন-চর্চা, অর্থাৎ কাব্য-সংগীত, নাট্যকলা, যাকে বলে সংস্কৃতি। তা যদি না হয়, শুধু দানবই তৈরী হবে, তার মধ্যে মানবের আবির্ভাব ঘটবে না। সেকথা আপনারা উপলব্ধি করেছেন, তাই দেখতে পাচ্ছি।'

হঠাৎ ভীষণ জোরে হাততালি। ব্রহ্মচারী উৎসাহিত হয়ে আর একটু গলা চড়িয়ে বললেন, 'লোহার কল যেমন চাই, তেমনি চাই এই সেলুলয়েডের কলম।'

আরেকবার হাততালি, এবং তার আর থামবার নাম নেই। কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী। সেক্রেটারী এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'এবার শেষ করুন স্যার। দু-নম্বর হাততালি পড়ে গেছে। এর পরেই ম্যাজিক শো আছে কিনা!'

'দু-নম্বর হাততালি মানে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান-অতিথি।

'তা জানেন না? এক নম্বর মানে—সাবাস, আর দু-নম্বর মানে, বসে পড়। এবার না থামলে ইটপাটকেল সুরু হবে।'

ততদূর আর যাবার ইচ্ছা ছিল না। ক্ষুব্ধ মনে বসে পড়লেন ব্রহ্মচারী। মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার কথা। কন্ট্রাকটারী করে তখন। একদিন পাঁচ-শ ডিমের যোগান দিয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পচা বলে রিজেক্ট করেছিলেন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট। এমনি ক্ষোভ হয়েছিল সেদিন। নালিশ করেছিলেন উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষের দরবারে। আজ তেমন কোনো পথ নেই। তাঁর এমন সুন্দর বক্তৃতা না-মঞ্জুর হয়ে গেল যাঁর দরবারে, তিনি স্বয়ং জনসম্রাট। তাঁর বিরুদ্ধে আর আপীল চলে না।

কিছুক্ষণ পরেই সভাপতির অনুমতি নিয়ে সভা ত্যাগ করলেন প্রধান-অতিথি। একটি যুবক এসে কিঞ্চিৎ জলযোগের অনুরোধ জানাল, বসাল নিয়ে পিছনের দিকে একখানা ছোট্ট ঘরে। চারদিকে একদল লোক হৈ-চৈ করছে। তারই মধ্যে এল একখানা চায়ের প্লেটে একটি শুকনো সিঙ্গাড়া, একখানা নিমকি আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ—সম্ভবত চা। স্পর্শ করতে প্রবৃত্তি হল না। ভিড়ের মধ্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন।

গাড়ি করে পৌঁছে দেবার কথা ছিল। সেজন্যে যখন অপেক্ষা করছেন, হঠাৎ কানে গেল, বলাবলি করছেন কর্তৃপক্ষের কয়েকজন, 'পাঁচ মিনিট তো বলেছেন, তার জন্যে দু-বার গাড়িভাড়া দেওয়া যায় না।'

আর একজন মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করলেন, 'আহা, তাহলে যাবে কি করে লোকটা?'

সে-সমস্যার সমাধান প্রধান-অতিথি নিজেই করে নিলেন। তেমনি নিঃশব্দে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

রাত এগারটায় বাড়ি ফিরে দেখলেন, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। জামা-কাপড়

ছাড়ছেন, এমন সময় পান মুখে দিয়ে ঢুকলেন গৃহিণী। একগাল হেসে বললেন, 'তোমার দেরি দেখে বুঝলাম, ওরা না খাইয়ে ছাড়বে না। বসে থেকে আর কী হবে, হেঁসেলের পাট তুলে দিলাম।'

আর একটু কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন 'হ্যাঁগা, কি কি খেলে বল না? পোলাও-টোলাও করেছিল নিশ্চয়ই।'

কর্মযোগী

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই চওড়া বারান্দা। সামনে প্রশস্ত এবং সুসজ্জিত ড্রইংরুম। বাঁ দিকে মোড় ফিরে একটুখানি এগিয়ে গেলে আরেকখানা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। ঘোষ সাহেবের অফিসরুম। সেক্রেটারিয়েট-টেবিল, গদিআঁটা হাতলহীন চেয়ার, স্টিলের আলমারী ইত্যাদি আসবাব দিয়ে সাজানো। বাড়িতে যখন থাকেন ঐখানে বসেই কাজ করেন, এবং কার্যসূত্রে যারা আসে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। পরদা-ঢাকা দরজার বাইরে চাপরাশীর টুল। পল্টনফেরৎ নেপালনন্দন খড়্গ বাহাদুর পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত কেতা-দুরস্ত ফিটফাট পরিপাটি। বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ অনড় কিন্তু চলাফেরায় চটপটে।

অফিস-ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে বিচিত্র শব্দ করে আটটার ঘণ্টা বেজে উঠতেই নেপালী ছিন্নগুণ ধনুকের মত বিদ্যুৎবেগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শেষ ঘণ্টার রেশটুকু মিলিয়ে না যেতেই ঘোষ সাহেব ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে খটাস শব্দ। বুট ঠুকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকল তকমা-আঁটা ফৌজী চাপরাশী।

ঘোষ সাহেবের পুরো নাম—বি আর ঘোষ। যখন বিলাতে ছিলেন কন্টি-নেন্টাল বন্ধুরা বলত ঘষ। দেশে আসবার পর কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবসায়ী মহলে ঐ আন্তর্জাতিক নামটাই চালু হয়ে গেছে। ভাগ্যবান কৃতী পুরুষ। মস্ত বড় ইনজিনিয়ারিং-ফার্মের মালিক। তাছাড়াও অনেকগুলো কোম্পানীর ডিরেক্টর। সেগুলো শুধু আকারে বৃহৎ নয় প্রকারেও বিচিত্র। চাটগাঁয়ে সুঁটকির কারখানা, বাঙ্গালোরে কফিক্ষেত, নওগাঁয় গাঁজার চাষ, কানপুরে চামড়া ট্যানিং—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। শুধু কাজ আর কাজ। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই—কথাটা অন্যের বেলায় যতই অত্যুক্তি হোক, ওঁর বেলায় আক্ষরিক সত্য।

ঘোষ সাহেব অবিবাহিত। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন মাঝে মাঝে একটু ফুরসত পেলেই একটি বৌ-এর জন্যে বায়না ধরতেন। ছেলে হয়তো তখন খাচ্ছেন, কিংবা বেরোবার আগে টাই আঁটছেন। কখনো উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে, কখনো বা বিরক্তির সুরে বলতেন, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। বিয়ে করবো কখন? সময় কোথায়?'

কোনো কোনো দিন মা জিদ ধরতেন, 'ওসব কথা শুনতে চাই না। ঘর সংসারই যদি না হল, কী হবে খেটে? কার জন্যে এত কাজ?'

'কার জন্যে মানে ?' ভীষণ বিস্ময় প্রকাশ করতেন মিস্টার ঘোষ, 'কাজ কাজের জন্যে ! **Work for the sake of work.'**

কিন্তু মা চিরদিনই মা। এর পরেও অনেকবার পীড়াপীড়ি করতে ছাড়েননি। তাঁরও ঐ একটি ছেলে এবং শেষ বয়সের সন্তান। বাধ্য হয়ে ঘোষ একদিন মিনিট দশেক সময় করে মাকে নিয়ে পড়লেন। ড্রইং এবং অঙ্কের সাহায্যে বৃদ্ধা মহিলাকে জলের মত বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর দিন-রাতের প্রতিটি ঘণ্টামিনিট একটার পর একটা জরুরি কর্মসূচী দিয়ে এমনভাবে বাঁধা যে বিয়ে নামক অনাবশ্যক কাজটাকে তার কোনো ফাঁকেই ঢোকানো যায় না।

দিন কয়েক পরেই মা কাশী চলে গেলেন। এবং বছর খানেক না যেতেই সেইখানে দেহরক্ষা করলেন। ঘোষ সাহেবও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বিয়ে নিয়ে আর কোনোদিন কেউ তাঁকে বিরক্ত করেনি।

তারপর বয়স বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে কাজের নেশা। চুলে পাক ধরলেও দেহে ও মনে যৌবনের উদ্যম আজও অম্লান।

ক্রিং-ক্রিং। ভীষণ জোরে ইলেকট্রিক-বেল বেজে উঠল বেয়ারার কানের কাছে। ছুটে গিয়ে সে সেলাম করে দাঁড়াল ! সাহেব সকালের 'ডাক' দেখছেন। টেবিলের উপর স্তূপাকার চিঠিপত্র। একজন বাবু খাম খুলে চিঠিগুলো এগিয়ে ধরছে, উনি আগাগোড়া একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা মোটা লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে নামের আদ্যক্ষর বসিয়ে দিচ্ছেন তার উপর।

চাপরাশীর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'মজুমদার।'

পল্টনীয়া খড়্গ বাহাদুরের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। কোন রকমে নিঃশ্বাস চেপে বলে ফেলল, 'আভি তক আয়া নেই হুজুর।'

ঘোষ সাহেব রূঢ় চক্ষু মেলে নেপালীর মুখের দিকে তাকালেন। এই না-আসার জন্যে সে-ই যেন অপরাধী। চাপরাশী অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আনেসে তুরন্ৎ ভেজ দেনা।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর'—বলে অ্যাবাউট-টার্ন করে খড়্গ বাহাদুর বেরিয়ে গেল।

'ডাক' দেখা শেষ করে একখানা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটা দূরাগত ছায়া পড়ল চোখের উপর। চিঠিখানা তাঁর দিদির। হাতের লেখাটা চিনতে না পারলেও লেখিকার ঠিকানা ও স্বাক্ষরের বদলে 'তোমার দিদি' এই দুটো কথা থেকেই সব বুঝতে পেরেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর এই দিদি ছাড়া সংসারে আপনার বলতে ঘোষ সাহেবের আর কেউ নেই। এঁদের কাছে তিনি অশেষভাবে ঋণী। এই দিদি এবং জামাইবাবুই তাঁকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তখনও ওঁদের ছেলেপিলে হয়নি। পুরুলিয়া অঞ্চলে একটা ছোট জমিদারি ছিল। তারই উপস্বত্ব থেকে ভদ্রলোক শ্যালকের সব খরচ বহন করেছিলেন। কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বিনয়রঞ্জন শুধু দিদি নয় ভগ্নীপতিরও বিশেষ প্রিয়পাত্র। ভবিষ্যতে ওকেই সব দিয়ে যাবেন এই ছিল তাঁদের সংকল্প। ঘোষ সাহেবও সেই আশায় বিদেশে থাকতে খাওয়া-পরা চাল-চলনে একটু

বেহিসাবী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে একটি ক্ষুদ্র শিশু এসে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ উলট-পালট করে দিল। চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে গিয়ে দিদি হঠাৎ মাতৃত্বের গৌরব লাভ করলেন। সেই মারাত্মক শুভ সংবাদটি যখন ওদেশে গিয়ে পেঁছিল, বিনয় তখন ওখানকার কাজ শেষ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে কণ্টিনেণ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফিরবার নির্দেশ দেওয়া হল। তাছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঘোষ ফিরে এলেন, কিন্তু খুশীমনে ফিরলেন না, এবং কলকাতায় এসে দিদি ও ভগ্নীপতির সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। দেশ থেকে মাকে আনিয়ে শ্যামবাজারে বাসা করলেন এবং একটি দেশী ফার্মে সামান্য চাকরি সম্বল করে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপর শুরু হল একটানা কঠোর সংগ্রাম। অনমনীয় জিদ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অজেয় অধ্যাবসায়ের জোরে সব বাধা জয় করে ধাপে ধাপে উঠতে লাগলেন বিনয় ঘোষ। পর পর কয়েকটি চাকরি ধরে এবং ছেড়ে নিজস্ব ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। সাফল্য এল, অর্থ এল, তার সঙ্গে এল খ্যাতি। ধাপে ধাপে ক্রমশ শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার বি. আর. ঘোষ।

শ্যালকের অকৃতজ্ঞ আচরণে জমিদার ভগ্নীপতি রুষ্ট হয়েছিলেন। দিদিরও ক্ষোভের কারণ ছিল। সুতরাং ওতরফ থেকেও যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মা মাঝখান থেকে জোড়া দেবার জন্যে যতই টানাটানি করুন, দুদিক থেকে প্রতিকূল হাওয়ায় তাঁর সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে গেছে।

ছেলের জন্মের কিছু দিন পর থেকেই বাপের শরীর ভেঙে পড়েছিল। জমিদারিও তখন দেনার জালে জড়িয়ে গেছে। ছাড়াবার আশা নিষ্ফল জেনেও শেষ বয়সে চেষ্টার ত্রুটি করেননি ভদ্রলোক। তার ফলে শেষ দিনগুলো আর একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এল। হাইকোর্টে কি একটা মামলা করতে গিয়ে পাটনাতেই রয়ে গেলেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে শেষ দেখাটাও করে যেতে পারেননি।

নিদারুণ অভিমানে দিদি এতবড় খবরটাও ভাইকে জানাননি। অনেক দিন পরে অন্য কী একটা সূত্রে বিনয় জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অসংখ্য কাজের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন। ঝঞ্ঝাটের ঢেউগুলো একটার পর একটা এমন ভাবে এসে পড়েছে যে মাথা তুলে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, সে ফুরসৎ ছিল না। মা-ও তখন কাশীবাসিনী। এদিককার দায়িত্ব-বোধকে জাগিয়ে দেবে এমন কেউ ছিল না।

তারপর দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার বলে যা কিছু ছিল তারও শেষ বন্ধন ঘুচে গেছে। তার জায়গায় বাইরের জগৎ থেকে নতুন নতুন দায়িত্ব এসে চেপে বসেছে কাঁধের উপর। 'দিদি' বলে কেউ যে কোথাও ছিল দিনে রাতে কোনো সময় একবারও মনে পড়েনি।

দিদিও তো ওঁরই দিদি। স্বামীর মৃত্যুর পর দেনার ফাঁক দিয়ে গোটা সম্পত্তি কিছুদিনের মধ্যে তলিয়ে গেল। তখন সামান্য নগদ পুঁজি এবং গয়না ক'খানার উপর ভরসা করে একলা হাতে ছেলেটিকে মানুষ করে তুলেছেন। তবু বড়লোক

ভাইয়ের শরণাপন্ন হননি। আজ তাঁর যাবার বয়স ঘনিয়ে এল। সে তেজ নেই। সঙ্গতিও নিঃশেষ। তাই অনেক ভেবে, অনেক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এই পোস্টকার্ডখানা পাঠিয়েছেন। ছেলেটি এবার বি. এ. পাশ করেছে। অতবড় মামা; যদি কোথাও একটু সুবিধা করে দেয়। তা না হলে দুজনের সামনে আসন্ন অনাহার। ভাই-এর উত্তরের অপেক্ষা না করে ছেলেকেও সঙ্গে সঙ্গে রওনা করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

চিঠিখানা হাতে করে বহুদূর পিছনে চলে গেলেন ঘোষ সাহেব। ছেলেবেলাকার সেই বিস্মৃত দিনগুলো একে একে চোখের উপর ভেসে উঠল। সংসারে কিছুই হারায় না। শুধু কোথাও না কোথাও চাপা পড়ে থাকে। তার উপরে জমে ওঠে ধুলোর পাহাড়। হঠাৎ একদিন কোন অদৃশ্য কোণ থেকে ছুটে আসে দমকা হাওয়া। জঞ্জাল উড়ে গিয়ে আবার জেগে ওঠে, যেমন ছিল ঠিক তেমনি।

গগন মজুমদার ঘোষ সাহেবের পুরনো সরকার। কিছুক্ষণ আগেই সে এসে গেছে এবং জোড়হাত করে বশংবদ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের কোণের দিকে। একখানা পোস্টকার্ড অতক্ষণ ধরে পড়তে তার মনিবকে সে কখনো দেখেনি। জটিল কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে। তাই মনিবের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিতে সাহস করছে না। আবার বেশীক্ষণ অপেক্ষা করার ফলে তার অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে নিজের চিন্তাও কম নয়। কী করে সাহেবের নজরে পড়া যায় ভাবছে। এমন সময় মিস্টার ঘোষ চোখ তুলে বললেন, 'কী হয়েছিল তোমার?'

'আজ্ঞে, কিছু নয়। ঘড়িটা একটু স্লো যাচ্ছে কদিন ধরে। তাই—'

'দেখ, আমি তোমাকে আরো একদিন বলেছি, তোমার ঐ ঘড়ি বদলাও। নয়তো আমাকেই বাধ্য হয়ে আমার সরকার বদল করতে হবে।'

মজুমদার মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে ঘড়ির বাজার বড্ড চড়া। কয়েকটা দোকান ঘুরে এসেছি। ওরা বললে আর কিছুদিন বাদে নতুন চালান এলেই দামটা একটু—'

ঘোষ সাহেব বাধা দিলেন, 'ঘড়ি সম্বন্ধে লেকচার শোনবার আমার সময় নেই। ওটা বন্ধ রেখে দরকারী কাজের কথাটা শুনবে কি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু হুজুর ব্যস্ত ছিলেন বলে কোনো রকম ডিসটার্ব করাটা—'

'ব্যস। পুরুলিয়া-প্যাসেঞ্জার হাওড়ায় আসছে ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিটে। এখন আটটা কুড়ি। ঠিক দশ মিনিট পরে অর্থাৎ সাড়ে-আটটার সময় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ঐ ট্রেনে আমার ভাগ্নে আসছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?'

'যে আজ্ঞে।'

ঘোষ একটা ফাইল খুলে পড়তে শুরু করলেন। মিনিট খানেক পরে মুখ তুলে দেখলেন মজুমদার যায়নি. মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে কেমন উসখুস করছে।

'কী হল ?'

'আজ্ঞে বাবুর নামটা—'

'ও, নাম ?'

পোস্টকার্ডের চিঠিখানা আর একবার পড়লেন। নাম কোথাও নেই। ছেলেকে শুধু শ্রীমান বলে উল্লেখ করেছেন দিদি। বিরক্ত হলেন এই সব সেকেলে বুদ্ধাদের বুদ্ধিহীনতায়। বললেন, 'নামটা তো জানি না। ওর বাবার নাম ছিল বিধুভূষণ বোস।'

'ব্যস, তাতেই হবে। ও আমি ঠিক বের করে নেবো।'

সরকার চলে যেতেই স্টেনোগ্রাফারের ডাক পড়ল! সাহেব ক্রমাগত ডিকটেশন দিয়ে চললেন। ব্রেকফাস্টের সময় পেরিয়ে গেল। বাবুর্চি এসে দু-বার সেলাম জানিয়ে গেছে। অর্থাৎ কোন কথা না বলে জানিয়ে গেছে, খানা তৈরী। ছেলেটা এলে একসঙ্গে বসে খেয়ে নেবেন, এই রকম ইচ্ছা ছিল। এদিকে মজুমদারের দেখা নেই। ঠিক সময়ে গাড়ি এলে এতক্ষণ পেঁাছে যাবার কথা। স্টেনোকে বললেন, 'হাওড়া-এনকোয়ারিতে একটা ফোন কর তো, পুরুলিয়া-প্যাসেঞ্জার এসে গেছে কিনা। যদি এসে থাকে, কখন এসেছে।'

জবাব পাওয়া গেল, ঠিক সময়েই এসেছে।

মজুমদারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন ঘোষ সাহেব। লোকটাকে সত্যিই এবার বদলানো দরকার। কেবল কথার বুদবুদ। অত বকবক করলে কাজ করবে কখন ?

উঠতে যাবেন এমন সময় নিচে পরিচিত হর্ন শোনা গেল, এবং তার পরেই একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল মজুমদার।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?' রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন ঘোষ।

'আজ্ঞে, অনেক কাণ্ড করতে হল কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

'অনেক কাণ্ড মানে ? ছেলেটাকে এনেছ ?'

'তিনজন এনেছি।'

'তিনজন !'

'আজ্ঞে। হুজুর যদি দয়া করে একবার বাইরে এসে দেখেন।'

'কী বলছ মাথা-মুণ্ডু !'

'আজ্ঞে কী করবো বলুন। নাম জানা নেই ; বাবুকে কখনও দেখিওনি যে চেহারা দেখে চিনবো। তারপর জামাইবাবুর নামটাও তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলাম। পদবীটা অবিশ্যি মনে ছিল। স্টেশনে গিয়ে একটা উপায় বের করতে হল। গোটা চারেক কুলীকে এক টাকা করে বখসিস কবুল করে লাগিয়ে দিলাম, সব কামরাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচা—'বোস বাবু কে আছেন ? জরুরি খবর আছে !' ঐ রকম কিছু না বললে কেউ গা করবে না। অনেক হাঁকাহাঁকি করে বারোজন বোস পাওয়া গেল। তার মধ্যে পুরুলিয়া থেকে পাঁচজন। বাকী সাতটাকে ছেড়ে দিয়ে এই পাঁচ জনকেই নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলাম। দুটো কিছুতেই এল না, আর তাদের বয়সও দেখলাম অনেক বেশী। তিনটিকে বলে

কয়ে, তা একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছি…'

পরিশ্রমের বহরটা দেখাবার ছলে, পুরোদমে চালানো বৈদ্যুতিক পাখার নিচে দাঁড়িয়েও মজুমদার চাদর দিয়ে গলার ঘাম মুছল। ঘোষ সাহেব তাঁর অভিজ্ঞ সরকারের বুদ্ধিমত্তা দেখে যতটা মুগ্ধ হবেন আশা করা গিয়েছিল, ততটা যেন হলেন না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তা বেশ করেছ। বিশল্যকরণীর বদলে গোটা গন্ধমাদনটাকেই উপড়ে এনেছ। আচ্ছা, এবার একটি একটি করে নিয়ে এসো দেখি।'

প্রথমে যাকে আনা হল, কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেই ধপাস করে বসে পড়ল মেঝের উপর। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঢুলু ঢুলু দুটি চোখ। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে ঘোষ সাহেবের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, একটু আফিম দিতে পার বাবা। চারদিন জোটেনি। ঠ্যাং-এ আর জোর পাচ্ছি না। ঐ সঙ্গে আধ সেরটাক দুধ।

সাহেব মজুমদারের মুখের দিকে একবার কটমট করে চেয়ে বললেন, 'next'.

এবার ঢুকল দু'নম্বর। কুড়িবাইশ বছরের ছোকরা, শুকনো দড়ি পাকানো চেহারা। মালকোঁচা এঁটে কাপড় পরা। গায়ে সবুজ রং-এর হাফসার্ট! হাতে একটা টিনের সুটকেস। এসেই ডালাটা চটপট খুলে ফেলে গোটা কয়েক কাগজের প্যাকেট বের করে বলল, ক প্যাকেট চাই, স্যার? বিখ্যাত তানসেন গুলী। গলা-জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর, মাথা ঘোরা, মুখ দিয়ে জল ওঠা, বুক ধড়ফড় করা—

ঘোষ সাহেব গর্জে উঠলেন, **'Take him away.'**

লোকটা হঠাৎ একটু ঘাবড়ে গেল। তারপরেই সামলে নিয়ে বলল, চাই না? আচ্ছা বেশ, অন্য ওষুধও আছে, স্যার। দাঁতের মাজন, দাদের মলম, গেঁটে বাতের মালিশ, টাকের তেল—

ঘোষ বেল টিপলেন এবং চাপরাশী আসতেই হুকুম দিলেন, 'উসকো নিকাল দেও।'

লোকটা তখনো তার প্রসিদ্ধ ওষুধের লম্বা ফিরিস্তি আউড়ে চলেছে। নেপালী আর সে সুযোগ দিল না। হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে ফেলল।

মজুমদারের তৃতীয় লোকটির জন্যে অপেক্ষা না করেই মিস্টার ঘোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঘরের বাইরে পা দিতেই এগিয়ে এল আধময়লা কোটপ্যান্ট পরা একজন আধবয়সী দেশী সাহেব। তেলের ছোপলাগা হ্যাট খুলে 'গুডমর্নিং' জানিয়ে ইংরেজীতে বলল, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

'কে আপনি?'

আমার নাম আর. এন. বোস, পামিস্ট এ্যাণ্ড এ্যাস্ট্রোলজার। হাত দেখে আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নির্ভুল বলে দিতে পারি।

'ধন্যবাদ। আপনি এবার আসতে পারেন।'

কিন্তু আপনার লোক যে আমাকে ডেকে নিয়ে এল।

ঘোষ সাহেব মজুমদারকে বললেন, 'গোটা দুই টাকা দিয়ে এখখুনি বিদেয়

করে দাও।'

এগারটা প্রায় বাজে। অন্যদিন অনেক আগেই মিস্টার ঘোষ অফিসে বেরিয়ে পড়েন। আজ আর হয়ে ওঠেনি। তৈরি হয়ে নিচে নামতে যাবেন, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল, একঠো বাবু ভেট করনে মাংতা হ্যায়।

বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কার্ড লেয়াও।'

বেয়ারা ছুটে গিয়ে নিয়ে এল এক টুকরো কাগজ! পেন্সিলে লেখা অহিভূষণ বসু, বি. এ.।

'অহিভূষণ! **Good God**! জলদি ওপরে লেয়াও।'—বলতে বলতে হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল এক সুশ্রী যুবক। পরণে ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবি। ঘোষ সাহেব সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন, এসো এসো। তোমার জন্যে সকাল থেকে যা হয়রাণি। আমার এই সরকারটি এক আজব চীজ। নিশ্চয়ই ভুল প্লাটফরমে ঢুকে পড়েছিল। তা তোমার বাড়ি চিনে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

ছেলেটি যেন একটু হকচকিয়ে গেছে বলে মনে হল। কোন রকমে মাথা নেড়ে বলে ফেলল, 'আজ্ঞে না।'

'নিশ্চয়ই খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। **It's all due to that Majumdar.** যাক, সে সব কথা পরে হবে। এখন চট করে চানটা সেরে, খেয়ে নাও। আমি অপেক্ষা করছি।' বলে হাঁক দিলেন, 'বেয়ারা···'

বেয়ারা ছুটে এল।

'বাবুকো অন্দর লে যাও। গোছলখানা দেখলা দেও।'

অহিভূষণ একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, 'চান তো আমি···'

'গাড়িতেই সেরে নিয়েছ বুঝি? **Good** অনেকটা সময় বাঁচল। তাহলে একেবারে খেতে বসে যাও।···'

তখনো ইতস্তত করছে দেখে বললেন, 'অবিশ্যি আজকের দিনটা তোমাকে বিশ্রাম দিলেই ভাল হত। কিন্তু কাল থেকে পরপর চারদিন আমার একটা সেকেণ্ড সময় হবে না। আজকেই একটু যা ফাঁক আছে। তোমাকে নিয়ে বেরোতে পারবো। তোমার বিশেষ কষ্ট হবে কি? হলই বা একটু। **Young man**···'

'না, না, কষ্ট হবে কেন? সেকথা নয়।'

'কিন্তু···' বলে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গীতে অপেক্ষমান বেয়ারার দিকে তাকাল।

ঘোষ সাহেব বিরক্তি বোধ করলেন এবং সেভাব কিছুমাত্র গোপন না করে বললেন, 'দ্যাখ, গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের ঐ 'কিন্তু' 'তবে' 'বরঞ্চ' আর 'পরন্তু' ওসব আমার দু চক্ষের বিষ। যা বলবে সোজা সরল ভাষায় অসঙ্কোচে বলবে। যেটুক দরকার তার বেশী বলবে না। **Life is time.** জীবনে সময়ের বড় অভাব। বাজে কথা দিয়ে একটা সেকেণ্ড-ও **waste**

করা চলে না।···বয়, বাবুকো খানা দে দেও।'

অহি আর আপত্তি করল না। 'বয়' নামক চাপকান ও চাপদাড়িওয়ালা লোকটির পিছনে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল।

অহিকে সঙ্গে করে মিস্টার ঘোষ প্রথমেই গিয়ে উঠলেন ক্লাইভ স্ট্রীটে এক মস্ত বড় নামকরা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে। ম্যানেজিং ডিরেকটর পদমলাল বাণ্ডিলওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে দামী সিগারেট এগিয়ে ধরলেন। উভয় তরফে কুশল প্রশ্নাদির পর ঘোষ সাহেব বললেন, 'আপনার এলাহাবাদ ব্রাঞ্চের জন্যে একটি ক্যাশিয়ার ঠিক করবার ভার দিয়েছিলেন আমাকে।'

'হাঁ, হাঁ, রোজ তাগিদ আসছে হামার কাছে। কাজ একদম চলছে না।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এতদিন ঠিকমত লোক পাইনি। জানেন তো বিশ্বাসী এবং কাজের লোক জোটানো কত শক্ত আজকাল। এবার একটি ছেলে পেয়ে গেছি। আমাব নিজের লোক। ভাল লেখাপড়া জানে। অবিশ্যি গোড়াতে একটু Train up করে নিতে হবে। দু চার দিন পরে দাঁড়িয়ে গেলে স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারবেন।'

'আপনার নিজের লোক? তোবে তো বিলকুল ঠিক আছে। Training? উ তো আলবৎ দরকার। সে সব বন্দবস্ত ওখানেই হোবে। এজেণ্ট হামার পাককা আদমি আছে। তাহলে মিস্টার ঘোষ, আর দেরি না করে, ওকে কাল কি পরশু তক ভেজিয়ে দিন।'

'কাল পরশু নয়, আমি একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি? বাঃ, তব তো একদম আচ্ছা হ্যায়।'

'আহা! আপনি কেন কোষ্ট কোরছেন। হামি ডেকে লিচ্ছি।'

ঘোষ বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? আমিই ডাকছি। আপনার লোক তো ওকে চেনে না।'

অহিভূষণকে দেখে বাণ্ডিলওয়ালার পছন্দ হল। নামটা লিখে নিয়ে বললেন, 'আপনার appointment letter এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে তা হলে কালই এলাহাবাদ যেতে হোবে। কোনো অসুবিস্তা হোবে না তো?'

অহি জবাব দেবার আগেই মিস্টার ঘোষ বলে উঠলেন, 'না, না, অসুবিধে কিসের? কালই যাবে। আর, এই নিন ওর সিকিউরিটি। মাইনেটা ভালো দেবেন। তা না হলে ছেলেদের কাজে মন বসে না।···' বলে একটা মোটা টাকাব চেক ডিরেকটরের হাতে দিলেন।

বাণ্ডিলওয়ালা খুশী হয়ে বললেন, 'আপনি যা হুকুম কোরবেন তাই হোবে।'

ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে সোজা চৌরঙ্গীর মোড়ে গিয়ে গাড়ি থামল। অহিকে নিয়ে ঘোষ সাহেব এবার হোয়াইটওয়ে লেডল-র চারতলায় গিয়ে উঠলেন। পুরনো এবং শাঁসালো খদ্দের হিসাবে মেমসাহেবরা সবাই ওঁকে ভাল করে চেনে। অর্ডারের

সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কোট সার্ট ট্রাউজার টাই এনে হাজির করল। ঘোষ বললেন, 'দ্যাখ তো কোনগুলো তোমার পছন্দ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি বেছে দিচ্ছি। একেবারে পাঁচ সেট করে নিয়ে যাও। গরম জায়গা, কাপড়-চোপড় একটু বেশী লাগে।'

অহির মুখ দেখে মনে হল সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে। এতক্ষণ যাবৎ একটা কি কথা সে বারবার বোঝাবার চেষ্ট করে বাধা পেয়েছে। সসঙ্কোচে তারই পুনরুক্তি করল, 'আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। আমি ঠিক—'

ঘোষ সাহেব একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'এইবার হাসালে দেখছি। আমি ভুল করছি, না? আর তুমি সেটা শুধরে দেবে। শোনো। কাজের লোক যদি হতে চাও, সকলের আগে চাই suitable পোশাক। চেহারাটা ভগবানের হাত ঠিক, কিন্তু তার উপর যদি উপযুক্ত দর্জির হাত পড়ে তবেই তাকে কাজে লাগানো যায়। চৌদ্দ হাত লম্বা একটা ধুতি আর ধানের গোলার মত পাঞ্জাবি জড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানা চলে, আর কিছু হয় না। পশ্চিমে দেখে এলাম, ওরা যে এত এগিয়ে চলেছে সব দিক দিয়ে, তার মূলে রয়েছে ওদের পোশাক। 'বসন' জিনিসটার আদি প্রয়োজন হয়তো কেবল লজ্জা নিবারণ। কিন্তু তারপর আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। আজকের যুগে ওর প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মঠ করে তোলা।'

দুটো সুটকেস ভর্তি জামা-কাপড় জুতো মোজা স্টেশনারী ও টয়লেটে গাড়ি বোঝাই করে সন্ধ্যার মুখে অহিকে নিয়ে ঘোষ সাহেব বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে অন্য লোক ছিল। আর কোনো কথাবার্তা হল না। এসেই আবার অফিস ঘরে ঢুকলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত প্রথমে লোকজন, পরে ফাইলপত্র নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। অহি কয়েকবার দেখা করবার চেষ্টা করল, কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। মনিবের নির্দেশ মত বয়, বাবুর্চি, সরকার, বেয়ারা সবাই মিলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাগনেবাবুর পরিচর্যার ব্যবস্থা করল।

পরদিন সকালেও সেই অবস্থা। ব্রেকফাস্টের টেবিলে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা হল দুজনের। ঘোষ সাহেব বললেন, 'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তোমার গাড়ি। মজুমদার গেছে বার্থ রিজার্ভ করতে। আমি ঠিক সাড়ে ছটায় ফিরবো। তুমি তার আগেই রেডি হয়ে নিও। বাঁধাছাঁদা গোছগাছ যা দরকার, চাকর-বাকর রয়েছে, সব করে দেবে।'

এইটুকু বলেই উঠে পড়লেন। অহি আর কোন কথা পাড়বার সুযোগ পেল না।

ছটা বেজে পঁচিশ। জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা হচ্ছে। মিস্টার ঘোষ হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরলেন। সব কিছু নিজের চোখে তদারক করে অহিকে এসে বললেন, 'ওদের টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে। স্টেশনে লোক থাকবে। সাবধানে কাজ করো। অনেক দায়িত্ব তার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার।'

অহি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ঘোষ সাহেব ওর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'থাক. থাক, ওতেই হবে।' হঠাৎ ওর চোখের দিকে নজর পড়তেই

বলে উঠলেন, 'Oh ! No, Don't be sentimental, my boy. এই তো সবে শুরু হল, যাকে বলে life. আজকের দিনে মন খারাপ করলে চলবে কেন ? পুরুষ মানুষ কাজ করতে জন্মেছ, কাজ করে যাবে। ব্যস ! আচ্ছা, তাহলে আর দেরি করো না। মজুমদার কই ?'

'আমি ready. হুজুর।'

'জিনিসপত্তর সব হুঁসিয়ার হয়ে তুলবে। কোনোটা যেন আবার পড়ে না থাকে।'

'যে আজ্ঞে।'

'একগাদা লোক বসে আছে। আমি আর স্টেশন অবধি যেতে পারলাম না। সাবধানে যেও। তোমার মাকে কালই খবর দিয়ে দেবো।'

অহি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। যেন এতখানি সে একেবারেই আশা করেনি। বলল, 'আপনি খবর দেবেন ! আমিই না হয় ওখান থেকে একটা চিঠি লিখে দিতাম।'

'না না, আমিই লিখবো।'

'তা হলে ওঁর ঠিকানাটা—'

'ভুলে গেছি মনে করেছ ? হুঁ, এ অভিমান করবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমি কিছুই ভুলিনি। অনেকগুলো বছর একেবারে ডুবে ছিলাম। তোমাদের কোন খবরই নিতে পারিনি। তার জন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত।'

এসব কী বলছেন মিস্টার ঘোষ ! অহিভূষণের চোখে গাঢ় বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল রয়ে গেছে। তা না হলে আমার একটা পরিচয় পর্যন্ত না নিয়ে—'

'আ, হা হা ! তুমি বড্ড বকতে পার অহিভূষণ। একেবারে দ্বিতীয় মজুমদার। জানো অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক মানুষ দেখেছি। মানুষের পরিচয় পেতে হলে আর ঠিকুজি কুণ্ঠী ঘাঁটতে হয় না। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। যাক, তোমার গাড়ির সময় হল। আর দেরি নয়। এই টাকা কটা রেখে দাও। রাস্তায় লাগবে, ওখানে গিয়েও খরচ পত্তর আছে। পৌঁছে চিঠি দিও। গুড বাই…।'

দিন তিনেক পর সকাল বেলা যথারীতি 'ডাক' দেখছেন ঘোষ সাহেব। একখানা পোস্টকার্ডে একবার চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলেন, 'অ্যাঁ' !

যে-কেরানীটি খাম খুলে খুলে চিঠিগুলো সই করাচ্ছিল ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কী হল, স্যার ?'

'মজুমদার !'

মজুমদার ছুটে আসতেই এগিয়ে দিলেন কার্ডখানা। সে এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল—

"গত ২৩শে তারিখে শ্রীমান কলকাতা রওনা হইতে পারে নাই। তাহার পর কয়েক দিন পাঁজিতে দিন ভাল ছিল না। আগামীকল্য সন্ধ্যার গাড়ীতে পাঠাইব,

মনস্থ করিয়াছি। শ্রীমান দুই একবার মাত্র কলিকাতা গিয়াছে। রাস্তাঘাট ভালরূপ জানা নাই—হাওড়া স্টেশনে লোক রাখিও।

তোমাকে বলা বাহুল্য, তুমি ভিন্ন হতভাগিনীর সহায় সম্বল বলিতে আর কেহ নাই। ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিও। উহার একটা কোন সংস্থান হইয়াছে, দেখিয়া যাইতে পারিলে আমি নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী তোমার দিদি।"

চিঠিখানা শেষ করে মনিবের দিকে তাকিয়েই মজুমদার নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ চমকে উঠল। চেয়ারের পিঠের উপর সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে নুইয়ে পড়া মাথাটা হাতের উপর রেখে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস্টার ঘোষ। ক্লান্ত চোখ দুটির নীচে গভীর বলিরেখা। সব ছন্দেরই যতি আছে। সব কর্মীরই বোধহয় বিশ্রামের প্রয়োজন।

পরক্ষণেই আবার সোজা হয়ে বসলেন ঘোষ সাহেব। স্তূপীকৃত কাগজের উপর দ্রুতবেগে চালিয়ে গেলেন লাল পেন্সিলের লাঙ্গল।

ঐদিনকার ডাকেই আর একখানা চিঠি ছিল শেষের দিকে। পড়ে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরলেন সরকারের উদ্দেশ্যে। সেখানাও পড়ল মজুমদার—

শ্রীচরণ কমলেষু

পৌঁছেই তার করেছি। আশা করি পেয়েছেন। কালই জয়েন করেছি। আজ থেকে ট্রেনিং শুরু হল। মনে হচ্ছে এই চার দিনে যা ঘটে গেল সবটাই যেন স্বপ্ন। বি. এ. পাশ করে এই এক বছর সামান্য একটা চাকরির জন্যে প্রতিদিন অফিসে অফিসে ঘুরেছি। কেউ কোন ভরসা পর্যন্ত দেননি। তার পর এক জনের মুখে শুনলাম আপনার কথা। তিরিশ টাকা মাইনের একটা কেরানীগিরি যদি পাই আপনার কোনো অফিসে, এই আশা নিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন কথা বলবার আগেই পেয়ে গেলাম চারশ টাকার ক্যাশিয়ারি। এরই নাম অদৃষ্ট।

কোন শুভলগ্নে কী দেখেছিলেন আমার মধ্যে, আমি জানি না। জানবার প্রয়োজন নেই। আশীর্বাদ করুন, আপনার এই অশেষ দয়া ও বিশ্বাসের মর্যাদা যেন রাখতে পারি। ইতি

স্নেহধন্য অহিভূষণ।

মালা ও চন্দন

সব মানুষেরই একটা কোনো নেশা থাকে। গানবাজনা, তাস-পাশা, মাছধরা, দেশে-বিদেশে ঘুরে-বেড়ানো কিংবা আর কিছু না হলেও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা। নীতীশ পালের কোনো নেশা নেই। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে প্রথম

বয়সে একবার সিগারেট ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। কয়েক টানের বেশী এগোতে পারেননি। বন্ধু বলেছিলেন, কি হে, রস পেলে না?

রস! ধোঁয়ার আবার রস থাকে নাকি?

থাকে বৈকি। ওটাও একটা পানীয়। তাই ওর নাম ধূমপান।

তোমরাই কর সেটা।

বন্ধু হেসে বলেছিলেন, তুমি বুঝি আরেক ধাপ উঠতে চাও?

আরেক ধাপ মানে?

মানে, ধোঁয়ার পরের stage, অর্থাৎ জল, যাকে বলে লাল প্যানি।

সে পরীক্ষাও একদিন হয়ে গেল আর এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেও ফেল করলেন নীতীশ। একটা চুমুক দিয়েই বিকৃত মুখে পাত্রটা নামিয়ে দিলেন। ধোঁয়ায় তবু গলাটা শুধু খুস খুস করেছিল, জলে একেবারে জ্বলে গেল।

পাশে যে ভদ্রলোক ছিলেন, পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা জার্মান সিলভারের কৌটো বের করে ডালাটা খুলে ধরলেন ওঁর সামনে।

কী ওটা, পান?

হ্যাঁ; ধূমপান, মদ্যপান, কোনটাই যখন রুচল না, তখন শুধু পানই চলুক।

'পাত্রের বদলে পত্র,' ফোড়ন কাটলেন ওপাশ থেকে কে একজন।

তবক দেওয়া মিঠে পানের খিলি। চেহারাটা লোভনীয়, গন্ধও চমৎকার। তুলে নিলেন একটা। না; ওতেও রস পেলেন না।

তারপর আর নতুন কিছু ধরবার চেষ্টা করেননি। নেশা ওঁর ধাতে নেই, এইটাই মেনে নিয়েছিলেন।

নীতীশবাবুর দিনরাতগুলো একেবারে বাঁধাধরা রুটিন দিয়ে গাঁথা। কাজগুলো সব পর পর সাজানো। মাঝখানে এমন কোনো ফাঁক নেই যে আর-একটা কিছু এসে ঢুকে পড়বে। একটু বেলায় ওঠার অভ্যাস। মুখ ধোবার পর চা। তাতেও ঠিক আসক্তি নেই। খেতে হয় তাই খান, না হলেও বিশেষ অভাব বোধ করেন না। তারপর খবরের কাগজে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে অফিসের জামা-কাপড়গুলো ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে রেখে জুতোয় কালি দিতে বসেন। এই পার্টটি শেষ করতে বেশ খানিক সময় যায়। টেবিলের উপরে টাইমপিস ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ন'এর কাছে পৌঁছতেই উঠে পড়েন। স্নানাহার সেরে ধীরে সুস্থে আফিস।

কাজকর্ম কিছুটা শ্লথগতি কিন্তু নিশ্ছিদ্র। ছুটির পরেও খানিকক্ষণ বসতে হয়। ছটার কাছাকাছি বেরিয়ে পাশেই একটা পার্কে বাঁধা কয়েক পাক চক্কর দিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণের পাট চুকিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর তদারক করতে হয়। তার মধ্যেই খাবার ডাক পড়ে। আহারান্তে যতক্ষণ ঘুম না আসে সকাল বেলাকার অসমাপ্ত কাগজখানা উলটে-পালটে দেখেন। কোনোখানটা ভাল লাগলে একটু পড়েনও।

রবিবারগুলো শুয়ে বসে গড়িয়ে ঘুমিয়ে কেটে যায়।

বারংবার-পড়া পোস্টকার্ডের চিঠির মত স্বামীর এই জীবনযাত্রা নলিনীর একেবারে মুখস্থ। কোথাও যে এর কোনো নড়চড় হবার সম্ভাবনা নেই তাও তার জানা। তবু মাঝে মাঝে একটু-আধটু অনুযোগের সুর চেপে রাখতে পারেন না। হঠাৎ হয়তো বলে বসেন, বিধাতা তোমাকে কী দিয়ে গড়েছিলেন বলতে পার ?

নীতীশ বেশ আমোদ পান গৃহিণীর কথায়। কৌতূহল সুরেই বলেন, কি করে জানবো ? আমার সঙ্গে তো পরামর্শ করেননি। তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

তাঁকে আর পাচ্ছি কোথায়। পেলে একবার দেখে নিতাম। কোনোদিন আবার বলেন, ধন্যি মানুষ তুমি। মেশিনকেও হার মানিয়েছ। কলও মাঝে মাঝে বিকল হয়, তুমি একেবারে অব্যয়।

নীতীশ জুতো পালিশ করতে করতে একবার চোখ তুলে তাকান। জবাব দেন না। এ জাতীয় কথা শুধু শুনে যেতে হয়, এইটুকুই তিনি জানেন। গৃহিণী বলতে থাকেন, শখ টখ বলে কোনো বালাই না-হয় নেই। একটু একঘেয়েও লাগে না ? সারা বছরে না একটা সিনেমা, না কোনো সভাসমিতি, না কোথাও একটু বেরোনো। সেই বাড়ি আর আফিস, আফিস আর বাড়ি। বেঁচে আছ কেমন করে ?

শুধু আছি নয় আরো অনেক দিন থাকবো বলেই তো মনে হয়।

ওকে থাকা বলে না।

কিন্তু আমার তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

অসুবিধে বোধ করবে কে ? বুকের উপর আঙুল রেখে যোগ করেন, মন বলে কোনো জিনিস থাকলে তো ?

নীতীশ আর জবাব দেন না। মৃদুমৃদু হাসেন। এই রকম একটু সাহিত্য-ঘেঁষা কথা বলাই গৃহিণীর অভ্যাস। এটা শুধু ঐ গাদাগাদা গল্প-উপন্যাস পড়ার ফল। ঐগুলোর মধ্যে ডুবে আছেন ভদ্রমহিলা। ঐ ওঁর নেশা। উনি বলেন 'হবি'। অল্পসল্প ইংরেজিও জানেন এবং স্থানে অস্থানে দু-একটা শব্দ বসিয়ে দিয়ে বিদ্যেটুকু জাহির করতে পারলে আর ছাড়েন না। প্রায়ই বলেন, একটা 'হবি' চাই মানুষের ; যাকে বলা যেতে পারে জীবনের **sauce.** ঐটুকু না থাকলে গোটা জীবনটাই বিস্বাদ ; বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা থাকে না।

নলিনীর একটা আলাদা জগৎ আছে। ছোট্ট সংসার, নিজেরা দুজন, দুটি ছেলে-মেয়ে। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। অভাব অনটনের টানাটানি নেই। চাকা আপনা হতেই চলে, ঠেলাঠেলির দরকার হয় না। সামান্য কাজ। সহজে এবং অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। তারপর প্রচুর অবসর। তার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে বই। ঐ সঙ্গে মনটাকেও বোধ হয় ভরে রেখেছে। তাই কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই, অপূর্ণতার অভাববোধ নেই। স্ত্রীর চোখ দুটির দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেন নীতীশবাবু। বুঝতে পারেন, কিছু একটা নিয়ে তারই মধ্যে ওরা নিবিষ্ট হয়ে আছে। ওঁর নিজের তেমন কিছু নেই।

নদীস্রোতের মত জীবনের স্রোতও চিরদিন একখাতে বয় না। তার গতি বদলায়। নীতীশ পালের পরিবারে বাইরের দিক থেকে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ি কোলকাতাতেই। রোজ না হলেও প্রায়ই এসে দেখা করে যায়। ছেলে লেখাপড়া শেষ করে ওঁরই মত ঢুকে পড়েছে এক মার্চেণ্ট অফিসে। রোজকার রুটিন তেমনি আছে। অভ্যাসগুলোও বদলায়নি। তবু যেন সব ঠিক আগের মত নেই। কিছুদিন থেকে মনটা মাঝে মাঝে ছটফট করে। কিসের যেন অভাব। কোথায় হয়তো খানিকটা ফাঁক রয়ে গেছে। একটা কিছু চাই সেই শূন্য জায়গাটা পূরণ করতে, অথচ হাতের কাছে তেমন কিছু পান না। কী পেলে যে সে ফাঁক ভরে তাও জানেন না। মনে হয় তাঁর এই চিরদিনের বাঁধাধরা অভ্যাসের নিরেট গাঁথনির কোনোখানে একটু ফাটল ধরেছে, যা চোখে না পড়লেও অনুভব করা যায়। তাই চলা-ফেরায় স্বস্তি নেই. স্বাচ্ছন্দ্য নেই। থেকে থেকে কেবল একটা কথা মনে হয়—আর ভাল লাগছে না।

কয়েকটা নির্দিষ্ট প্রয়োজনে বাইরের সঙ্গে তাঁর যেটুকু সম্পর্ক সেটা বাদ দিলে নিজের ঘরখানির মধ্যেই এতদিন নীতীশবাবুর দিন কেটেছে। এখন মাঝে মাঝে অকারণে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান, অনুদ্দেশ্যে খানিকটা এঘর-ওঘর ঘুরে আসেন। এমনি ভাবে কোনো এক ছুটির দিন দুপুরবেলা হঠাৎ স্ত্রীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। নলিনী খাটে শুয়ে যথারীতি পড়ছিলেন। এ রকম অসময়ে স্বামীকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ব্যস্তভাবে বললেন, কী ?

না, কিছু না।

কিছু খুঁজছ ?

না।

ঘুমোওনি ?

নীতীশবাবু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, ওটা কী বই ?

ও একখানা নভেল, মানে গল্পের বই।

লাইব্রেরী থেকে আনিয়েছ বুঝি ?

হ্যাঁ।

ঐ একটা করেই আন নাকি একসঙ্গে, না আরো আছে দু-একখানা ?

কেন, তুমি পড়বে ?

দেখতাম একবার।

সেকি ! তুমি তো এ সব কখনো পড় না !

ছুটির দিনটা, তাই ভাবছিলাম—

বেশ তো। তাহলে এইটাই নাও না ?

না না, ওটা তুমি পড়ছিলে, পড়।

আমার পড়া হয়ে গেছে। আরেকবার একটু উলটেপালটে দেখছিলাম। নাও।

হাল-আমলের একখানা মাঝারি সাইজের উপন্যাস। বড় গল্পই বলা চলে। তাদেরই মত একটি কেরানী-পরিবারের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় ভরা। সুখের

চেয়ে দুঃখ এবং হাসির চেয়ে কান্নার ভাগই বেশী। অর্থাৎ করুণ রসের আধিক্য। তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ রোমান্স আছে। নারী-প্রগতির জয়গান আছে। আত্মত্যাগের চমক আছে, ধনী-মহলের বিরুদ্ধে চোখা চোখা ব্যঙ্গোক্তি আছে, নেই শুধু আসল কেরানীরা যা ভাবে, যা করে এবং যেভাবে চলে সেই কথা। তবু মন্দ লাগল না। সময় কাটাবার পক্ষে বেশ, দিবানিদ্রার টনিক হিসেবেও ব্যবহার করা চলে।

সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল ?

ভালো।

তাহলে এটাও পড়ে দ্যাখ। আরো ভালো লাগবে।

এও সেই একই ধরনের। একদল আধা-কেরানীর, আজকাল যাদের বলা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত, তাদেরই জীবনচিত্র। যা সত্যি সত্যি ঘটছে, তার চেয়ে যা ঘটলে এরা সুখী হত, তারই রং-ফলানো ছবি।

স্ত্রীর কল্যাণে কিছুদিনের মধ্যেই নীতীশ নিয়মিত নভেল-পাঠকের দলে ভিড়ে পড়লেন। চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ল এবং গৃহিণীর হাত দিয়ে পাড়ার ছোট লাইব্রেরী সবটা যুগিয়ে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত অফিস-লাইব্রেরীর গ্রাহকের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেললেন। নামজাদা মার্চেণ্ট অফিস। বাবুদের সংখ্যা অনেক। মোটা চাঁদা ওঠে। ইদানিং বিদেশী কোম্পানীও তার সঙ্গে কিছু যোগ করতে শুরু করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের পলিসির পরিবর্তন ঘটেছে। আগে মনে করতেন, কতগুলো দেশী বই-এর পিছনে অর্থ যোগানো কোম্পানীর গুড-মানির অপব্যয়। তারপরে বুঝেছেন **Investment** হিসেবে এর মূল্য আছে। এতগুলো মাথা গল্প-উপন্যাসের অসার জঞ্জাল দিয়ে ভরে রাখতে পারলে কর্তৃপক্ষের লাভ। তা না হলে তারা 'ইউনিয়ন' ইত্যাদি মারাত্মক পথে জোট বাঁধতে পারে। উদ্দেশ্য যাই হোক, কোম্পানী সাহেবেরা লাইব্রেরী এবং যাকে বলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অর্থাৎ নাচগান-জলসা-নাটকের রীতিমত উৎসাহ দিয়ে থাকেন। ফলে, বই-এর সংগ্রহটি সংখ্যার দিক দিয়ে বেশ মানানসই। তার মোটা অংশই সাম্প্রতিক কালের গল্প-উপন্যাস। নীতীশবাবু বছরখানেক ধরে তার সদ্ব্যবহার করলেন।

বাংলাদেশের স্যাঁতসেঁতে জলহাওয়ায় কাব্যের বীজ ঘুরে বেড়ায়। পরবর্তী জীবনে যারা পাটের দালাল কিংবা লোহার কারখানার লেজারকীপার, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ছাত্রজীবনে তাদের অনেকেই একদিন চৌদ্দ অক্ষর গুণে গুণে দু-চার লাইন কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। ইস্কুলের পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা খুঁজলে তাদের হাতের দু-চারটা ছোট গল্পও বেরিয়ে পড়বে। নীতীশ পাল নামক কিশোর ছাত্রটিও একসময়ে গোটাকয়েক গল্প লিখে বন্ধুমহলে 'সাহিত্যিক' আখ্যা লাভ করেছিল। একটা গল্পের কথা এখনো ওঁর একটু একটু মনে আছে। নায়িকার নাম দিয়েছিলেন সুষমা। 'উতলা যৌবনের প্রথম প্রভাতে' অর্থাৎ চৌদ্দ বছরে পা দিয়ে পাড়ার ষোল বছরের যুবক পরিতোষের প্রতি তার অনুরাগ

দেখা দিল। কিন্তু 'বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে।' তাই নিষ্ঠুর অভিভাবকেরা জোর করে তাকে এক ধনী প্রৌঢ়ের হাতে সঁপে দিলেন। 'অশ্রুর আল্পনায় বিদায়ের পথ সিক্ত করে' সে চলে গেল স্বামীর ঘরে এবং বছর পাঁচেক পরে ফিরে এল বিধবার বেশে। সঙ্গে তিন বছরের শিশুপুত্র সুমন। পরিতোষ তখনো তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, এবং প্রতিজ্ঞা করেছে চিরদিন থাকবে। 'এক নির্জন বসন্ত সন্ধ্যায়, আম্র-মুকুল-সুরভিত' বাগানের ধারে ওদের যখন আবার দেখা হল, নায়িকা বলে বসল, 'সে হয় না, পরিতোষদা। এই উচ্ছিষ্ট দেহমন কি তোমার পুজোয় দেওয়া যায়?'

পরের পরিচ্ছেদে পরিতোষের গৃহত্যাগ। বৎসরান্তে ফিরে আসবার পর সুষমার এক সখী গোপনে দেখা করে এগিয়ে ধরল 'রক্তের অক্ষরে লেখা' একখানা চিঠি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানাল 'করলার জলে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে হতভাগীর। এই নাও তার শেষ চিহ্ন। তিনটি লাইনঃ 'এ জীবনে হল না। কিন্তু এর পরেও তো জীবন আছে। তারই দুয়ারে তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার সুমনকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।'

নীতীশদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় থাকতেন একই পাড়ায়। তার মেয়ের নাম সুলেখা। গল্পের নায়িকা সুষমার সঙ্গে তার খুবই মিল। বয়স, চেহারা, রং এমন কি বাঁ-গালের উপর কালো তিলটি পর্যন্ত এক। তার সম্বন্ধে যে লেখকের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, তা-ও খানিকটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ফলে, গল্পটি বন্ধুমহলে প্রচুর বাহবা পেলেও, বেরসিক বৃদ্ধের দল ঘোঁট পাকাতে শুরু করলেন। সুলেখার বাবা বাড়ি চড়াও হয়ে লেখকের উদ্দেশ্যে এমন সব উক্তি করে গেলেন, যেটা রীতিমত মান-হানিকর। ওর নিজের জ্যাঠামশাই আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। খড়মের সাহায্যে এমন পুরস্কারের ব্যবস্থা করলেন, কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই যা গৌরবের নয়।

এর পরের অধ্যায়ে স্বাভাবিক কারণেই সাহিত্য-জগৎ থেকে নীতীশ পালের বিদায়-গ্রহণ।

ছেলেবেলায় যাকে একবার ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল, এমন কোন ব্যক্তি প্রৌঢ় বয়সে যদি হঠাৎ উলো কিংবা বনগাঁয়ের পানাপুকুরে ডুব দিয়ে বসে, সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার জ্বর ফুটে বেরোয়, রবার্টসন জুট কোম্পানীর বাজেট সেকশনের ইনচার্জ উত্তর-চল্লিশ নীতীশ পালের অন্তরের মধ্যেও তেমনি সাহিত্যের শুকনো বীজে কিঞ্চিৎ অঙ্কুর দেখা দিল। এক একখানা বই খানিকটা করে পড়েন আর ভাবেন, এর পর কী? তিনি হলে কী করতেন? লেখকের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা কখনো মেলে, কখনো মেলে না। মাঝে মাঝে ভাবেন, লিখলে কেমন হয়। এমনি করে সত্যিই একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। শুরু হল লেখা। বিষয়বস্তুর জন্যে ভাবতে হল না। তিনি নিজে যা, দীর্ঘজীবন যাদের মধ্যে বিচরণ করেছেন, যাদের নাড়ীনক্ষত্র তার নখদর্পণে, সেই কেরানীকুল আশ্রয় করেই গড়ে উঠল তার প্লট।

কেরানী জগৎ নিয়ে কত লোকেই তো লিখে গেছেন। এই ক'বছরে নীতীশও তার কিছু কিছু পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। পড়ে মনে হয়েছে তাদের কেউ কেরানী নন কিংবা কেরানীর জীবনধারার আসল পরিচয় পাননি। তাই বাইরে থেকে যা দেখা যায়—এর শুকনো বর্ণহীন একঘেয়ে চেহারাটাই তাদের চোখে পড়েছে। দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-সংকট নিয়েই চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু নীতীশ তো জানেন ওদের জীবনে করুণরস যতখানি, তার চেয়ে কৌতুকরস কম নয়। সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের দল এদের নিয়ে যতটা আহা-উহু করেন, তার সিকি ভাগও এরা নিজেদের জন্যে করে না। দারিদ্র্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, ছেলের অসুখ, স্ত্রীর মুখঝামটা, মুদী গয়লা ও বাড়িওয়ালার লাঞ্ছনা সমানভাবে অগ্রাহ্য করে, এই হাজার হাজার বেপরোয়া মানুষ তাদের সেই চিরন্তন চায়ের দোকান, খবরের কাগজ, ডেলি-প্যাসেঞ্জারের চলন্ত তাসের আড্ডা, গল্পের বই, টিফিনের কৌটা, মোহনবাগান, আর বড়বাবু-ঘেরা ছোট্ট পরিধির ভিতরে দিব্যি হেসে খেলেই দিন কাটায়। রোমান্সের ছিটেফোঁটাও আছে তার মধ্যে। তার সুযোগ দিন দিন বেড়ে চলেছে। আগেকার মত আফিসগুলো এখন আর বর্ণহীন ধুতি-পাঞ্জাবী বা সার্ট-কোটের রুক্ষ জঙ্গল নয়। এখানে ওখানে দু'একখানা রঙীন শাড়ি আর লম্বিত বেণী খানিকটা উদ্যানের আভাস নিয়ে এসেছে। বেসুরো আলাপ আর বল্গাহীন কর্কশ অট্টহাসির মধ্যে একটু সুরেলা কণ্ঠ এবং সংযত মিষ্টহাসির মধুর মিশ্রণ। নীরস মরুভূমির মাঝে মাঝে এক ফোঁটা স্নিগ্ধশ্রী ওয়েসিস।

কেরানী জীবনের এই দিকটার উপরেই পরিমিত রঙ মিশিয়ে নীতীশ গোটা কয়েক ছোট গল্প দাঁড় করিয়ে ফেললেন। একে তো কোনকালে লেখার অভ্যাস নেই, তায় এই প্রৌঢ় বয়স, যখন সব মানুষের মধ্যেই স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যায় বিচারক, 'ভালোলাগা'র চেয়ে বড় হয়ে ওঠে খুঁত ধরার প্রবৃত্তি। তাই প্রথমবার যা দাঁড়িয়েছিল, তার উপরে বেশ কিছু কাটাকুটি ঘষামাজা এবং অদলবদলের রোলার চালাতে হল।

সেই ক্ষতবিক্ষত খাতাটি হাতে করে আবার এক ছুটির দুপুরে গুটি গুটি গিয়ে হাজির হলেন গৃহিণীর ঘরে। নলিনীর মুখে সেই একই প্রশ্ন—কী ?

একটা লেখা—খাতার দিকে ভীরু দৃষ্টি ফেলে মৃদুস্বরে বললেন নীতীশ।

লেখা ! হাতের বইখানার পড়বার জায়গায় আঙুল রেখে নলিনী মুখ তুলে চাইলেন। মুখে ও কণ্ঠে বিস্ময়ের আভাষ।

হ্যাঁ। মানে, গোটা দুই গল্প লিখেছিলাম। কী রকম দাঁড়াল—

কথাটা শেষ হল না। স্ত্রী এক লাফে উঠে বসলেন এবং কিশোরীর মত চঞ্চল কলকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, গল্প লিখেছ ! তুমি ? দেখি।

অনেক কাটাকুটি আছে। তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে। আমিই বরং পড়ে শোনাই।

শীগগির পড়—ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নলিনী গুছিয়ে বসলেন।

একটা গল্প পড়া শেষ হতেই উঠে এসে খাতাটা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন স্বামীর হাত থেকে। ওলটাতে ওলটাতে বললেন, কাগজ আছে তোমার কাছে? দাও, এক্ষুনি কপি করে বৈশাখী'তে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পাগল! এসব কখনো ছাপে ওরা?

ছাপবে না মানে? এ রকম গল্প পাবে কোথায়? কী আশ্চর্য! এত ভালো লিখতে পার তুমি, আর এতদিন বসে বসে খালি জুতোয় কালি লাগাচ্ছ!

স্ত্রীর প্রশংসায় নীতীশ মনে মনে খুশী হলেন, যদিও নিজের লেখার উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতটা আশান্বিত হতে পারলেন না। তা ছাড়া তিনি শুনেছিলেন, নাম-করা মাসিক পত্রিকাগুলোর প্রত্যেকের চারদিকে একটা করে ব্যূহ আছে। সেটা ভেদ করবার বিদ্যা না জানলে কেবলমাত্র লেখার জোরে লেখকের আসরে ঢোকা যায় না। কিন্তু সে সব কথা তুলে স্ত্রীকে নিরাশ করতে চাইলেন না। হাত বাড়িয়ে বললেন, যা হাতের লেখা আর যে রকম কাটা-ছেঁড়া রয়েছে তুমি পেরে উঠবে না। কপিটা বরং আমিই তৈরী করে দিই। তার পর যেখানে পাঠাতে চাও, পাঠিও।

নলিনীর আর দেরী সয় না। পরদিন থেকেই তাগিদ দিতে শুরু করলেন। তারপর একদিন স্বামী যখন আফিসে, দেরাজ থেকে খাতাটা বের করে বহুকষ্টে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলেন; যেখানে যেখানে বুঝতে পারলেন না, বাদ দিয়ে বাকীটা গোটা গোটা অক্ষরে নকল করে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। আফিস থেকে ফিরে নীতীশ একেবারে অবাক। দেখলেন প্রায় ঠিকই আছে সব। শূন্যস্থান পূরণ এবং যেটুকু সংশোধন দরকার, করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে প্যাক করে নলিনী সেটা পাঠিয়ে দিলেন 'বৈশাখী' সম্পাদকের আফিসে। তাঁর মতামত আসবার আগেই বাকী গল্পগুলোও ছেড়ে দিলেন অন্যান্য কাগজের ঠিকানায়।

পাঁচটা গল্পের মধ্যে চারটাই যথাসময়ে ফেরত এল। একটার সম্বন্ধে সম্পাদক জানালেন, 'লেখাটি মনোনীত হয়েছে, তিন মাস পরে প্রকাশ করা হবে।' চিঠিখানা প্রথমে নলিনীর হাতে পড়ল। তখনই ছুটতে ছুটতে গিয়ে স্বামীকে সুখবরটা দিয়ে এলেন। তারপর গল্প যেদিন ছাপা হল, একটা ছোটখাট পারিবারিক উৎসবের আয়োজন করলেন নলিনী। উপলক্ষটা প্রথমে কাউকে জানতে দিলেন না। সমস্ত দুপুর ধরে সকলের অলক্ষ্যে বসবার ঘরটা সুন্দর করে সাজালেন। সন্ধ্যার পরে সবাই যখন এসে পড়েছে, আঁচলের তলা থেকে হঠাৎ বের করলেন একটি মাসিকপত্র, এবং ছাপার অক্ষরে স্বামীর নামটা সগর্বে তুলে ধরলেন নিমন্ত্রিতদের চোখের সামনে। ছেলেমেয়ে জামাতাকে ডেকে বললেন, ওঁকে প্রণাম কর।

এসব একেবারে গোড়ার দিকের ইতিহাস। তারপর নীতীশ পালের আরো লেখা বেরিয়েছে। সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে মাসিকপত্রের তরফ থেকে তাঁর চাহিদা। শুধু গল্প নয়, দুখানা মাঝারি আকারের উপন্যাসও ছাপা

হয়েছে পূজা সংখ্যায়।

প্রথম গল্প-সংগ্রহ নলিনীই অগ্রণী হয়ে নিজের খরচে প্রকাশ করেছেন। নীতীশ নিষেধ করেছিলেন, অনেকগুলো টাকার ব্যাপার।

তা হোক, এ টাকা আমি দেবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

সত্যিই ভাবতে হয়নি। টাকাটা কোথেকে কেমন করে এল, নীতীশ কোনোদিন জানতে পারেননি। তাই বলে সংসার খরচের উপর কোনো টান পড়েনি। নিজের সামান্য পুঁজি এবং হাত খরচের কটা টাকা বাঁচিয়ে নলিনীই অনেক দিন ধরে দেনাটা শোধ করেছিলেন।

বই যেদিন বেরোল, আফিস ফেরত প্রেস থেকে খাঁকী কাগজে মোড়া প্যাকেটটা হাতে করে নীতীশ প্রথমেই গেলেন স্ত্রীর ঘরে। নলিনী একটানে মোড়ক ছিঁড়ে ফেললেন। মলাট খুলতেই সমস্ত মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বুজে এল চোখের পাতা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক অভিভূতের মত। তারপব নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে বেরিয়ে এল দুটি জলধারা। বই ক'খানা কপালে ঠেকিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর পায়ের কাছটিতে মাথা নুইয়ে পায়ের ধুলো তুলে নিলেন।

প্রথম বইখানা স্ত্রীকেই উৎসর্গ করেছিলেন নীতীশবাবু।

পরের বইগুলো আর নিজের খরচে ছাপতে হয়নি। তার আগেই প্রকাশক আসতে শুরু করেছে।

গল্প বা উপন্যাস রচনায় নীতীশ পাল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। 'দিগন্ত বিস্তারের' মোহ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তিনি বলতেন, 'যাদের আমি চিনি না, যাদের কথা জানি না, তাদের নিয়ে লিখতে গেলে যে কল্পনা দরকার তা আমার নেই। দীর্ঘজীবন ধরে যে মানুষগুলোকে দেখে আসছি, তাদের কথাই শুধু বলতে পারি।'

সেই গতানুগতিক কেরানী-জীবন থেকেই নীতীশ তাঁর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঐটাই ছিল সাধারণ পটভূমি। রূঢ় বাস্তবের বর্ণহীন দিকটা নগ্নভাবে প্রকাশ না করে, তার উপরে কিছু কল্পনার রঙ ঢেলে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। যাদের কথা লিখেছেন, সেই কেরানীকুলই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে সব চেয়ে বেশী। তার কারণ, যাদের জীবনে রঙের অভাব, তারাই রঙীন স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়। বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় খোঁজে। এ-ও এক ধরণের জীবন-সম্ভোগ। যে ঐশ্বর্য আমার অনায়ত্ত, মনে মনে তারই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমার সুখ। যে শিখরে আমি উঠতে পারব না, কল্পনায় উড়িয়ে নিয়ে সেইখানটিতে নিজেকে বসিয়ে দিয়েই আমার আনন্দ। সেই কল্পনার পালে হাওয়া যুগিয়েছেন নীতীশ পাল। যাদের জীবনে প্রেম নেই, কোনোদিন আসেনি এবং আসবে না, তাদের সামনে তুলে ধরেছেন ভোগরঞ্জিত প্রণয়ের ছবি। জীবনযাত্রার অবসর-বহুল স্বাচ্ছন্দ্য থেকে যারা চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে রইল, তাদের চোখের উপর খুলে দিয়েছেন প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের

লোভনীয় ভাণ্ডার। তারা একাত্মা হয়ে মিশে গেছে তারই মধ্যে, উপভোগ করেছে তার মাদকরস। ক্ষণেকের তরে ভুলে গেছে, এ সবই মায়া, **illusion**, এর মধ্যে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই।

এই কথা তুলেই নীতীশ পালের রচনাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছেন কোনো সাময়িকপত্রের বাস্তবধর্মী সমালোচক। বলেছেন, এসব **froth**, শুধু ফেনা ; মাটি নয়, খালি ধোঁয়া। উপদেশ দিয়েছেন, **Lotus-eater**-এর দিন চলে গেছে, রোমাণ্টিক স্বপ্নবিলাস দিয়ে মানুষকে আর ভোলানো যায় না। এমন কিছু লিখুন, যা তার মনকে নাড়া দেয়। দিন কিছু সেই জীবনজ্বালার তিক্ত আস্বাদ। আপনার ঐ কেরানীর মধ্যেই তো তার অজস্র ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে। শুধু চিনে কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা।

নীতীশ বিচলিত হয়নি। মনে মনে হেসেছেন ওদের বক্তৃতা শুনে। তিনি যে নিজের চোখে দেখেছেন, ওঁদের ঐ 'জীবনবোধ' আর 'জীবন-যন্ত্রণা' নিয়ে যাদের কারবার, অভাব, দৈন্য, অত্যাচার আর হাজার রকম ব্যর্থতার নগ্ন চিত্র এঁকে যাঁরা পাঠককে সমাজ-সচেতন করতে চান, এই দৈন্যপীড়িত মানুষগুলো দূরে থেকেই তাঁদের নমস্কার জানায়। প্রশংসা করে, কিন্তু ভালবাসে না। অফিস-লাইব্রেরীগুলোয় ঐ জাতীয় বই-এর চাহিদা তেমন বেশী নয়। উলটে-পালটে দেখে, রচনা-শক্তির তারিফ করে, কিন্তু বাড়ি নেবার বেলা বেছে নেয় বাস্তব-বাদীদের ভাষায় যাকে বলে 'জ'লো রোমাণ্টিক সাহিত্য'। এক শ্রেণীর তরুণ পাঠক আছে যারা ঐ 'বাস্তব' ইস্কুলের ছাত্র। কিন্তু নীতীশ খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, তাদের আসল আকর্ষণ 'জীবনবোধ'-এর মননশীলতা নয়, বস্তু-তন্ত্রের নামে নরনারীর দেহ-সম্পর্কটা যে রকম অনাবৃত করে দেখান এই সব লেখকেরা, তার ভিতরকার আদিরস।

এখানকার বেশীর ভাগ পাঠকের কথা হল—গল্পের বই পড়ি কিসের জন্যে ? ঘরে-বাইরে যে জ্বালায় জ্বলছি, তারই খানিকটা কী করে ভুলে থাকা যায়। সেখানেও যদি 'জীবন-জ্বালা', তাহলে যাই কোথায় ? বই খুলেও যদি শুনতে হয় ঐ ফুটো-ছাদ, শূন্য-হাঁড়ি আর রোগশোকের পুরানো পাঁচালি, দেখতে হয় সেই ছোট সাহেবের চোখরাঙানি, বাড়িওয়ালার ভ্রূকুটি আর ছেলে-মেয়ের ছেঁড়া কাঁথা তা হলে দরকার নেই আমার লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে। ঐ দুটো টাকা দিয়ে বরং তিনদিন সিনেমা দেখা যাবে।

এদের দোষ দেওয়া যায় না। সংসারে যে যা নয়, সেই দিকেই তার টান। তাই বাস্তবের চেয়ে কল্পনার ছবিই মানুষকে চিরদিন প্রলুব্ধ করেছে, হয়তো চিরদিন করবে।

কারণ যাই হোক, শিল্পমূল্য থাক বা না থাক, নীতীশ পালের লেখা এক-দিন স্ত্রী, পরিবার এবং পরিচিত মহলের পরিধি ছাড়িয়ে সাধারণ পাঠকের বৃহত্তম আসরে ছড়িয়ে পড়ল। চলতি ভাষায় তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিক বলে গণ্য হলেন। পঞ্চাশের পরপারে পৌঁছে বেশ খানিকটা খ্যাতিরও অধিকারী হলেন।

তার স্বীকৃতি এল ভক্তদলের চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে। তাদের মধ্যে পাঠকের চেয়ে পাঠিকার সংখ্যা বেশী, এবং সাহিত্য-মূল্যায়নের চেয়ে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। তবু তার ভিতরেও কেমন একটা মোহ আছে। নীতীশ পড়ে খুশী হতেন, এবং প্রথম প্রথম স্ত্রীকেও পড়াতেন। তারপর কেমন যেন সঙ্কোচ হত এসব তার হাতে দিতে। বিশেষ করে সেই চিঠিগুলো, যার পাতা জুড়ে শুধু বাঁকা ছাঁদের অক্ষরে জড়ানো আবেগময় অন্তরঙ্গ সুর। ক্রমশ এ বিষয়ে নলিনীরও উৎসাহের অভাব দেখা দিল। পড়তে দিলে নিতান্ত নিস্পৃহভাবে কোনো রকমে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে চলে যেতেন। মুখখানা কেমন ভার-ভার মনে হত।

শুধু এই চিঠি সম্পর্কে নয়, স্বামীর লেখা সম্বন্ধেও বাইরে যখন ঔৎসুক্যের জোয়ার জেগে উঠেছে, স্ত্রীর আগ্রহে তখন ভাটা পড়ে আসছে। সেটা এত স্পষ্ট যে নীতীশের দৃষ্টি এড়ায়নি। একটুখানি ক্ষোভ যে মনের কোণে দেখা দেয়নি, তা নয়। দিলেও তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। বাইরে থেকে যা আসছে, তাতেই তার অন্তর তখন ভরপুর। স্ত্রীর কাছ থেকে কি পেলেন, না পেলেন তার সম্বন্ধে আগের সে আগ্রহ আর ছিল না।

এই সময়ে আরেক ধাপ উঠে তিনি বড়বাবুর গদিটা ধরব ধরব করছেন। কাজে কর্মে যেমন দক্ষ, ব্যবহারেও তেমনি অমায়িক। ছোট-বড় সকলের প্রিয়। তার উপরে এই সাহিত্যগৌরব। সকল স্তরের সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একদিন স্থির করলেন, আফিসের তরফ থেকে নীতীশকে তার সাহিত্য-কর্মের জন্য সুষ্ঠুভাবে সম্বর্ধনা জানানো হবে। মহিলাকর্মীদের উৎসাহই বেশী। বড় সাহেবের স্টেনো সুপ্রভা সরকারকে সম্পাদিকা করে একটা কমিটি গঠন করা হল। উৎসবের দিন ধার্য হল নীতীশের আগামী জন্মদিন। ঐ উপলক্ষে যথোচিত গানবাজনা এবং আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও রইল।

নির্দিষ্ট দিনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে সম্পাদিকা তাঁর দুটি অফিস-সঙ্গিনীকে সঙ্গে করে সন্ধ্যাবেলা নীতীশের ভবানীপুরের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একদল মেয়ে এসেছে, বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—চাকরের মুখে খবরটা শুনেই গৃহিণীর ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা ওরা? কি চায়?

চাকর সসম্ভ্রমে জানাল, ওনারা সব বাবুর আফিসে চাকরি করেন। সেখান থেকে আসছেন। বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমাকে! আমি গিয়ে কী করবো?

বাঃ, তুমি না গেলে ওরা শুনবে কেন?

এর পরেও নলিনীর উঠবার লক্ষণ না দেখে নীতীশ একটু অপ্রসন্ন সুরে যোগ করলেন, যেতে ইচ্ছে না হয় যেও না। কিন্তু ডাকছে এত করে, একবার দেখা করতে দোষটা কী?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই এবার নলিনীকে যেতে হল। ঘরে ঢুকতেই সুপ্রভা উঠে দাঁড়িয়ে কলরব করে বলল, এই যে আসুন বৌদি। ভর সন্ধ্যায় দল বেঁধে উৎপাত করতে এলাম।

উৎপাত আর কী ? বসুন। শুষ্ক স্তিমিত সুরে বললেন নলিনী।

দরকারী কথাটা আগে সেরে ফেলি। বুধবার সন্ধ্যাবেলা আমাদের অফিসে একটা ফাংশান আছে। নীতীশ-দাকে আমরা ঘরোয়া ভাবে একটু অভিনন্দন জানাবো। অবিশ্যি, সমস্ত দেশই তো আজ ওঁকে সম্মান দিচ্ছে। তার তুলনায় এটা কিছু নয়। তবু উনি তো আমাদেরই একজন। ওঁকে নিয়ে আমাদের বিশেষ গর্ব। তাই একটু ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেছি। আপনাকেও ঐ সঙ্গে যেতে হবে।

আমাকে আর এর ভেতরে কেন ? একটুখানি উদাস সুর লাগল নলিনীর উত্তরে। ওসব আমি কিছু বুঝিও না। তা-ছাড়া রান্নাবান্না ফেলে আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই।

সে কথা বললে শুনবো না, মাথা নেড়ে আবদারের সুরে বলল সুপ্রভা। পাশের মেয়েটি যোগ করল, রান্নাঘর থেকে না হয় ছুটিই নিলেন একবেলা।

আমাদের রান্নাঘরই সব, ভাই। একবেলা কেন এক মুহূর্তও ছুটি নিলে চলে না।

'আমাদের কথাটার উপর এমন একটু বিশেষ জোর দিলেন যে মেয়েরা আর বেশী পীড়াপীড়ি করবার মত জোর পেল না। নলিনীই আবার কথা পাড়লেন, ঐদিন আমাদেরও ছেলেপিলে নিয়ে একটুখানি আমোদ উৎসব করবার ইচ্ছা আছে।

নীতীশ বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বললেন, তাই নাকি ? এ মতলব আবাব কবে করলে, টের পাইনি তো।

গৃহিণী উত্তর দিলেন না। যেন শুনতেই পাননি কি বললেন স্বামী। সুপ্রভা বলল, বেশ তো। ছুটির দিন যখন, আপনার অনুষ্ঠান আপনি দিনের বেলাতেই সেরে ফেলুন। আমাদের যা-কিছু সন্ধ্যার পর। তখন একবার সময় করে যাবেন।

নলিনীকে আর কোনো আপত্তি জানাবার সুযোগ না দিয়েই নীতীশ বলে উঠলেন, তাই হবে। তোমরা যখন এতদূর এগিয়েছ, তখন আর 'না' বলার কোনো মানে হয় না। যাবো বৈকি। দুজনেই যাবো।

রবিবার এল। নলিনী রোজ যা করেন, সেই ভাবেই দিন শুরু করলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের কোনে উদ্যোগ আয়োজন কোথাও দেখা গেল না। জন্মদিন-উদ্‌যাপন এ বাড়ির রীতি নয়। এবারেও যে তার ব্যতিক্রম হবে, তেমন কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। নীতীশের মনে হল, ওটা শুধু পাল্টা প্রস্তাব হিসেবেই উত্থাপন করেছিলেন নলিনী। কিংবা গোড়াতে ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।

বাইরে ওজরআপত্তি যা-ই দেখান, মনে মনে এই 'জয়ন্তী' সম্বন্ধে নলিনী একেবারে উদাসীন ছিলেন না। নারীজাতির সনাতন কৌতূহল তার সঙ্গে জড়ানো হয়তো আরো-কিছু।

ছ-টার আগেই ওদের গাড়ি এসে গেল। সুপ্রভার সঙ্গে সেদিন যারা এসেছিল, সেই মেয়ে দুটির একজন ছুটতে ছুটতে উপরে উঠেই তাড়া দিল, কৈ, আপনি এখনো তৈরি হননি, বৌদি ? নিন, নিন, তাড়াতাড়ি করুন।

নলিনী তখনো একবার একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত কাপড়-চোপড় পরতে চলে গেলেন। নীতীশের তৈরি হবার ব্যাপার বিশেষ ছিল না। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বৈঠকখানায় এসে বসলেন।

নাম-করা সওদাগরী অফিস। অনেক কেরানী কাজ করে। তাদের বসবার ঘরটা ছোট নয়। চেয়ার, টেবিল, র‍্যাক, আলমারী, কাঠের পার্টিশন সব সরিয়ে নেবার পর রীতিমত একটা 'হল' বলে মনে হচ্ছে। একপাশে দেয়াল ঘেঁষে সুদৃশ্য সতরঞ্চি-মোড়া তক্তপোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে মঞ্চ। তার সামনে সারি সারি চেয়ার। একেবারে প্রথম সারিতে একটি বিশিষ্ট আসনে নলিনীকে নিয়ে বসানো হল। সেই মেয়েটি মঞ্চের দিকে আঙুল দেখিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গে বলল, সাজানোটা কেমন হয়েছে বলুন।

বেশ হয়েছে।

সব আমরা, মানে মেয়েরা মিলে করেছি। ডিজাইনও আমাদের সম্পাদিকা সুপ্রভাদির। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন কি না।

ও, তাই নাকি ?

এখন নীতীশদার পছন্দ হলে হয়। সাহিত্যিকের চোখ। উনি খুশী হলেই সব সার্থক।

নলিনীর বুকের ভিতরটা কেন যেন একটু মুচড়ে উঠল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন সব। পরদার বদলে কয়েকখানা নতুন রঙিন শাড়ি দিয়ে দেয়াল মোড়া। নিশ্চয়ই ওদের নিজেদের শাড়ি। তার উপরে ফুল-লতাপাতার সাদৃশ্য কাজ। কত যত্নে, কত নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্দর করে জড়ানো। বাজার থেকে আনা সাধারণ রিং নয়। ডেকরেটরের স্থূল হাতের চিহ্ন নেই কোনোখানে। মেঝের ঠিক মাঝখানে একখানি নানাবর্ণের কার্পেটের আসন হয়তো ওদেরই কারো হাতে বোনা। দুধারে ফুলদানিতে দুটি বড় বড় তোড়া। দোকানের জিনিস নয়, ওরাই কেউ নিজে হাতে সাজিয়েছে একটির পর একটি ফুল গুঁজে গুঁজে, আজকের এই বিশেষ উৎসবের নায়ক একটি বিশেষ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে। ধূপাধার দুটি কি সুন্দর! একটি সুসজ্জিতা তরুণী ধূপকাঠিগুলো জেলে দিয়ে গেল। আসনের দুপাশে দুটি সূক্ষ্ম সুগন্ধি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে সুন্দর একটি সুরুচি ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত পরিবেশ।

সুবেশা সম্পাদিকা আগে আগে পথ দেখিয়ে নীতীশকে নিয়ে বসাল সেই আসনের উপর। অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বক্ষণে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে একটি সুদৃশ্য আধার থেকে ধীরে ধীরে কপালে পরিয়ে দিল চন্দন—তিলক। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তাদের কীর্তিমান প্রিয় সহকর্মীর পায়ের

কাছটিতে। নীতীশ ডান হাতখানা তুলে সস্নেহে ওর কাঁধের উপর রাখলেন। একটি তৃপ্তিময় উজ্জ্বল হাসিতে তাঁর মুখখানা ভরে উঠল। নলিনীর মনে হল তাদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্বামীর মুখে এমন একটি হাসি তিনি কোনোদিন ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। বুকের ভিতরটা আবার একবার নড়ে উঠল।

ঠিক পাশটিতে একটা বহুবর্ণ বৃহৎ মালা হাতে নিয়ে যে তরুণীটি দাঁড়িয়ে, সেই বোধহয় আফিসের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। সুপ্রভা উঠে দাঁড়াতেই সে সহাস্যে এগিয়ে এসে মালাটা ওঁর গলায় পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হল কাঁপিয়ে ফেটে পড়ল হাততালি। নীতীশ ধীরে ধীরে মালাটা নামিয়ে রেখে পরিতৃপ্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ঐ মেয়েটির মুখের দিকে।

নলিনীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল বহুদিন-পিছনে-ফেলে আসা আর একটা উৎসব-মুখর রাত্রি। একটি লাজনত ভীরু কিশোরী দুরু দুরু বুকে কম্পিত হাত দুটি বাড়িয়ে ঐ মানুষটিরই গলায় পরিয়ে দিয়েছিল বেলফুলের গোড়ে। সেদিন ঐ মুখে ছিল কেমন একটা লাজুক লাজুক অপ্রতিভ হাসি। সেই তরুণ মুখখানা স্মরণ করবার চেণ্টা করলেন। কিন্তু স্পণ্ট রূপটা কিছুতেই ওঁর স্মৃতির পাল্লায় ধরা দিল না।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন নলিনী। হঠাৎ কানে গেল আবেগময় নারীকণ্ঠ। মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে সম্পাদিকা অভিনন্দন পাঠ করছেন। সুমধুর রচনা, সুললিত বাচন-ভঙ্গী। স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি ফেললেন। অভিভূত তন্ময় দুটি চোখ। সহসা মনে হল ঐ আকৈশোর-পরিচিত মুখখানা তিনি চেনেন না। একটা কোন অচেনা জগতে চলে গেছেন তাঁর স্বামী, যেখানে স্ত্রী পুত্র ঘর সংসার সব অলীক, অবাস্তব।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্চের উপর থেকে স্ত্রীর আসনের দিকে নজর পড়তেই নীতীশ চমকে উঠলেন। সেখানে বসে আর একটি কে মহিলা। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। অনুষ্ঠান-সূচী শেষ হবার পর যখন নেমে এলেন, উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন জানাল, দরকারী কাজ আছে বলে তিনি আগেই চলে গেছেন। ওরা থেকে যেতে অনেক অনুরোধ করেছিল, একটু মিষ্টিমুখ করতে পীড়াপীড়ি করেছিল, কিছুতেই রাজী হলেন না। অগত্যা একজন গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

শেষ দিকে ব্যাপক জলযোগের আয়োজন ছিল। সে সব সেরে নীতীশ যখন বাড়ি ফিরলেন, দশটা বেজে গেছে। সিঁড়ির মুখেই ছেলের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করতেই জানাল, নলিনী ওখান থেকে ফিরে শ্যামবাজারে তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, রাত্রে আর ফিরবেন না। নীতীশ চিন্তিতভাবে বললেন, ওঁরা কোনো খবর-টবর দিয়েছিলেন নাকি? কারো অসুখ-বিসুখ নয়তো?

না; এমনিই গেছেন।

এমনিই!—নিজের মনে কথাটা আবৃত্তি করেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন নীতীশ। মুখের উপরে কিসের একটা গভীর ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

যে তরুণ সহকর্মীটি ওঁকে পৌঁছে দিতে এসেছিল, বিদায় নেবার আগে বলল,

আমি তাহলে এখন আসি, দাদা ?

নীতীশ কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙল। বললেন, ও, আচ্ছা এসো।

সেই মালাটা সঙ্গে এনেছিল ছেলেটি। ওঁর হাতে দিল। ধরতে গিয়ে অস্ফুট স্বরে উঃ করে উঠলেন। একটা কোন অদৃশ্য কাঁটা খচ করে বিঁধল।

জামা ছেড়ে কলতলায় গেলেন হাত মুখ ধুতে। কপালে হাত দিতেই শক্ত মত একটা কি ঠেকল। আবার চমকে উঠলেন। পরক্ষণেই বুঝলেন ওটা চন্দন। শুকিয়ে রুক্ষ, কঠিন হয়ে গেছে। লাগে।

সমাধান

প্রফেসরদের বসবার ঘরের সামনে কয়েকটি থার্ড-ইয়ারের ছেলে জটলা করছিল। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল গুপ্ত সাহেব ক্লাস করে ফিরছিলেন; হাতে হাজিরি খাতা। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, তোমাদের কি খবর ? একটি ছেলে বলে উঠল, আজ্ঞে, স্যার, টি. পি. এম.—থমকে গিয়ে, দাঁতে জিব কেটে সংশোধন করল, প্রফেসর মহলানবিশ আসেননি।

আসেননি ? তাই তো ! তাঁর আবার কি হল ?

ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা তরুণ অধ্যাপক, শুধু খ্যাতনামা নন, দীর্ঘ-নামা—তপোধীরপ্রসাদ মহলানবিশ। ছাত্রছাত্রীদের মুখে তিন অক্ষরের টি. পি. এম.।

ছেলেরা তখনো অপেক্ষা করছে। কারণ অনুমান করতে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের অসুবিধা হল না। তবু প্রশ্ন করলেন, আর ক্লাস নেই তোমাদের ?

সমবেত উত্তর—আজ্ঞে না, স্যার।

বাড়ি যেতে চাও ?

এবার আর উত্তর এল না। প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তার বদলে সবগুলো মুখে ছড়িয়ে গেল একটি হাসির ঝলক।

আচ্ছা, যাও—বলে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ঢুকলেন।

অফিসে গিয়ে সেদিনকার ডাকের ফাইলটা খুলতেই পাওয়া গেল ছুটির দরখাস্ত। জরুরি পারিবারিক কারণে একমাসের ছুটি চেয়েছেন প্রফেসর মহলানবিশ। গুপ্ত সাহেবের ভ্রূদেশে কুঞ্চন দেখা দিল। পারিবারিক কারণ ! পরিবার বলতে তো একটি বছর-দুয়েকের ছেলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মা হারিয়ে বসে আছে। তারই কোনো অসুখ-বিসুখ করল না তো ? একবার খবর নেওয়া দরকার।

কলেজের পর অনেকদিন বাদে বাগবাজারের পুরনো বাসায় যখন পৌঁছলেন গুপ্ত সাহেব, তপোধীর নিবিষ্ট মনে একটা বই দেখছিল। ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, খোকা কেমন আছে ?

আরে, দাদা যে ! আসুন আসুন । কি বলছিলেন ? খোকা ? ভাল আছে ।

ছুটি নিচ্ছ যে ? কি ব্যাপার ?

একটু বসুন । এটা সেরে নিয়ে বলছি ।

কি বই ওটা ?

রেডি-রেকনার ।

রেডি-রেকনার ! ও দিয়ে কি হবে ?

হিসেব-টিসেব করতে সুবিধে হয় । তাই একটা কিনে নিয়ে এলাম । প্রায়ই লাগে তো । এই যেমন ধরুন, এখনি আমার দরকার—মাসে আঠার টাকা হিসেবে সাড়ে বারো দিনের মাইনে কত । অঙ্ক কষে বার করতে হলে অন্ততঃ আধঘণ্টা লাগবে । তাও হয়তো ভুল করব । আর এখানে আধ মিনিটে নির্ভুল উত্তর পেয়ে যাচ্ছি । কত সুবিধে ।

একমাস পরেও কি তোমার ঐ রেডি-রেকনার-মাহাত্ম্য শুনতে এলাম ?

দাঁড়ান না । অত ব্যস্ত কেন ?—বলে, একটা কি নাম ধরে ডাকতেই একজন ঝি-গোছের স্ত্রীলোক জড়সড় হয়ে মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে দোর-গোড়ার এসে দাঁড়াল । তপোধীর নোট এবং রেজগিতে মিলিয়ে কিছু টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, এই নাও তোমার বারদিন একবেলার মাইনে—সাত টাকা সাত আনা তিন পয়সা । ভাল করে গুনে দ্যাখ ।

আমি আর কি গুনব, বাবা ? আপনিই তো দেখে দিয়েছ । বলে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই তপোধীর বলল, একে নিয়ে বাইশটি হল, বুঝলেন দাদা ? রেডি-রেকনার ছাড়া কী করে চলে, বলুন ।

বাইশটি মানে ?

মানে, গড়পড়তা মাসে প্রায় একজন । অর্থাৎ ছেলের বয়স হল তেইশ মাস । তার জন্যে ঝি-চাকরে মিলে মোট এই বাইশ জন গেল । আমি কাউকে তাড়াইনি । সব রেজিগনেশন ।

গুপ্ত সাহেব হেসে উঠলেন—এই ব্যাপার ! তারপর সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, তা হোক ; ছেলেপিলে একটু দুরন্ত হওয়া ভাল । কিন্তু তুমিই বা কি করে সামলাবে ? তার চেয়ে বরং তোমার শ্বশুরবাড়িতে—

না, দাদা । ওঁরা অবিশ্যি বরাবরই তাই বলছেন । কিন্তু আপনি তো সবই জানেন । ঐটুকু তার শেষ চিহ্ন ! কাছছাড়া করতে ইচ্ছা করে না ।

বুঝি সবই । কিন্তু কি করবে বল ?

মিনিট কয়েক বিরতির পরে বললেন, তা হলে এক কাজ কর । তোমার কোন আত্মীয়া-টাত্মীয়া কেউ যদি থাকেন—

সে চেষ্টাও করেছি । আমার এক পিসীমা আছেন । বাবার খুড়তুতো বোন । নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা । আমাকে খুব স্নেহ করেন । সব শুনে-টুনে আগ্রহ করেই এলেন । আমিও নিশ্চিন্ত হলাম । কত বাঘা ছেলে মানুষ হয়েছে তাঁর হাতে । ...তাঁকে দিয়েও হল না ।

তিনি চলে গেছেন ?

অনেক দিন। মাসখানেক থাকবার পর বললেন, 'আমার সাধ্যি নয় বাবা।' আমাকে তুমি বাড়ি রেখে এসো।' কাজেই এবার—

নিজেকেই পিসীমার জায়গায় বহাল করতে চাও?

তা ছাড়া আর কি করি?

ও সব তোমাকে দিয়েও হবে না। সেই জন্যেই, আগেও বলেছি, এখনো বলি বাপ-ছেলে দু'জনকেই দেখতে পারেন, এমন একটি বিশেষ ব্যক্তির দরকার। বল তো খোঁজ করি।

রক্ষে করুন, স্যার। এখন শুধু মাইনে আর ক্ষতিপূরণের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আপনার কথা শুনে শেষকালে ডিভোর্সের দায়ে পড়ি আর কি?

গুপ্ত সাহেবের আরেক দফা উচ্চ-হাসির উচ্ছ্বাস উঠেই হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। তপোধীরের উৎকলবাসী ঠাকুরটি ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল বাবুর পায়ের কাছে। দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কী হল! ঠাকুর একটা বিকট আওয়াজ বের করে কেঁদে উঠল, খোকা বাবু মারি দিলা।

মারি দিলা! কোথায়?

ঠাকুর হাত দিয়ে মাথার পিছনে ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে দিল। বড় রকমের জখম না হলেও খানিকটা জায়গা কেটে গেছে, কিছু রক্তপাতও হয়েছে তার সঙ্গে। যথারীতি ব্যাণ্ডেজাদির ব্যবস্থা করা হল। ও সব সরঞ্জাম বাড়িতেই মজুত থাকে।

পাচক মহারাজের সালঙ্কার বর্ণনার ভিতর থেকে আসল ঘটনা যেটুকু সংগ্রহ করা গেল, সেটা হচ্ছে এই: উনুনে কি একটা চাপিয়ে সে গিয়েছিল ভাঁড়ারঘরে তেল আনতে। হঠাৎ খোকাবাবু কোত্থেকে এসে মহা উৎসাহে খুন্তি নাড়তে শুরু করেছিলেন। অগ্নিকাণ্ড আশঙ্কা করে ঠাকুর ছুটে এসে হাতটা ধরে একটু সরিয়ে দিতেই প্রলয় শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কিছুক্ষণ সেই নোংরা মেঝের উপর সটান শুয়ে পড়ে বিপুলবেগে হাত-পা ছোঁড়া এবং ঠাকুরের পিঠের উপর জুতো-সমেত পদাঘাত। তাতেও ক্রোধশান্তি হয়নি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সেই খুন্তি দিয়েই মাথার উপর বসিয়ে দিয়েছেন এক ঘা।

তপোধীর ভাবতে লাগল, এই ঘাটা খোকার হাত থেকে না এসে যদি তার বাবার হাত থেকে পড়ত, অনায়াসে ৩২৩ ধারার মামলা চলতে পারত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা চলবে না, যেহেতু আততায়ী শিশু এবং ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড অনুসারে অপরাধ করবার যে ন্যূনতম বয়স, তা এখনো হয়নি। কিন্তু যার মাথায় খুন্তি পড়ল তাকে তো আর পিনাল কোড দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না। অথচ প্রতিকারও একটা চাই। ঠাকুর তখনই 'মাহিনা' দাবী করে বসল! প্রাণের দায়ে চাকরী করতে এসেছে বলে, প্রাণটা তো আর দিতে আসেনি? ন্যায্য কথা। তপোধীর আবার রেডি-রেকনার খুলতে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত আর দরকার হলো না। গুপ্ত সাহেব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু বকশিস (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) কবুল করে তখনকার মত মহারাজকে নিরস্ত করলেন।

এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে অধ্যাপকের মনে একটা জটিল প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। অনেকেই একে লঘু করে দেখবেন, বলবেন এর আর প্রতিকার

কি ? যা করছে তার গুরুত্ব বা ফলাফল উপলব্ধি করবার বয়স যতদিন না হচ্ছে ততদিন শিশুকে শুধু পাহারা দিয়ে রাখা ছাড়া আর কি উপায় আছে ? শুধু দেখে থাকা, সে নিজের বা অন্যের কোনো গুরুতর অনিষ্ট না করে বসে। এ ছাড়া সত্যিই কি আর কিছু করবার নেই ? তপোধীর মনে মনে বলল, আছে। একথা সবাই জানে, শিশু মাত্রেই নিষ্ঠুর ? অন্যের কষ্ট দেখে আনন্দ পাওয়াই তার প্রকৃতি। চলতে চলতে কেউ যদি আছাড় খেয়ে পড়ে, আমি-আপনি তাকে ধরে তুলবার চেষ্টা করব, অন্ততঃ দৃশ্যটা উপভোগ করব না, কিন্তু একটি বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে, হাততালি দিয়ে হেসে উঠবে। আপনার কষ্ট তার কাছে মজা। ব্যাঙ, টিকটিকি, পাখির ছানা শুধু নয়, নিরীহ দুর্বল মানুষের উপরেও অযথা অত্যাচার করে ওদের উল্লাস। সুতরাং, ওদের ঐ প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতার পথ ধরেই প্রতিকারের সূত্র খুঁজতে হবে। আঘাত দিয়ে দেখাতে হবে, আঘাত বস্তুটি কী! বুঝিয়ে বা উপদেশ দিয়ে ফল হবে না। যাকে শাস্তি দেওয়া বলে, মার-ধোর, না-খেতে দেওয়া, আটকে রাখা, তাতেও ঠিক কাজ দেবে না। বরং উল্টো ফল ফলতে পারে। তাতে করে কোনো কোনো ছেলে হয়তো আরো নির্মম, আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। আসল দরকার **realisation** বা উপলব্ধি ; মারলে যে ব্যথা লাগে, সেই সত্যটা ওর উপর দিয়ে, অর্থাৎ ওকে দৃষ্টান্ত করে বুঝিয়ে দেওয়া।

মনে মনে এই রকম একটা সংকল্প নিয়ে তপোধীর উঠে পড়ল। কিন্তু কোথায় সে আততায়ী। উপরে সবগুলো ঘর, বারান্দা, কলতলা ঘুরে শোবার ঘরের সামনে আসতেই এমটা কড়া মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। দরজা বন্ধ ছিল, খুলতেই চক্ষুস্থির। দাড়ি কামাবার পর ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে তপোধীর রোজ একটু করে স্নো মেখে থাকে। শিশিটা থাকে একটা উঁচু তাকের উপর। কালই একটি বড় সাইজের দামী শিশি কেনা হয়েছে। তার ভিতরকার প্রায় সবখানি বস্তু খোকার কপালে গালে চিবুকে গলায় বেশ পুরু করে মাখানো। লেপন-ক্রিয়া তখনো পুরো দমে চলছে। বসবার ধরনটা ঠিক বাপের মত। বাইরে ঝি-চাকর থাকে বলে, এই সময় তপোধীর দরজাটা অনেকদিন বন্ধ করে দিয়ে থাকে। সে বিষয়েও ত্রুটি হয়নি।

বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সাদা সাদা দাঁত ক'টি বের করে খোকা মহানন্দে হেসে উঠল। টুল থেকে নেমে এল ছুটতে-ছুটতে এবং একরাশ স্নো-জড়ানো ছোট্ট হাতখানা বাবার মুখের দিকে বাড়িয়ে পাখির সুরে বলে উঠল, 'বাপি-মাখি।' অর্থাৎ এসো তোমাকেও খানিকটা মাখিয়ে দিই। তপোধীরের প্রথমেই বিস্ময় লাগল, শিশিটা পাড়ল কেমন করে ? তবে কি ভুল করে ওটা ড্রেসিং-টেবিলেই ফেলে গিয়েছিল ? না, তা নয়। তাকের ঠিক নীচেই একটা টুল। সেটা থাকে ওধারে খাটের পাশে, এবং সেখান থেকে এতখানি পথ তাকে বেশ কষ্ট করেই টেনে আনতে হয়েছে।

খোকাকে নিজেই ধুইয়ে-মুছিয়ে পড়বার ঘরে নিয়ে গেল তপোধীর। টেবিলের উপর যে পিন-কুশনটা থাকে তার থেকে একটা পিন তুলে নিয়ে ছোট্ট

আঙ্গুলের ডগায় আস্তে করে ফুটিয়ে দিল। উঃ বলে হাত টেনে নিল খোকা। তপোধীর বলল, মেরো না, লাগে। বুঝলে খোকা? লাগে। কাছেই একটা রুল ছিল। তাই দিয়ে ঠুক করে লাগিয়ে দিল মাথায়। খোকা সেখানটায় হাত বুলোতে লাগল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে আবার বোঝাল তপোধীর, মারতে নেই, ব্যথা। খোকা কি বুঝল, সে-ই জানে। বড় বড় শঙ্কিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের পানে।

পরদিন বাজার থেকে ফিরতেই কানে গেল তিনটা বিড়ালছানার একটানা চিৎকার। দিন-চারেক হল হয়েছে ছানাগুলো। কয়লার ঘরে একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছে চাকরটা। বাজারের থলে নামিয়ে দিয়েই সে ঐ দিকে ছুটে গেল! গিয়েই এক হাঁক—বাবু, শীগগির আসুন। তপোধীর তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে, খোকা গম্ভীর হয়ে বসে আছে কয়লার গাদায়। বাঁ হাতে সেই পিন-কুশন, ডান হাতে একটি খোলা পিন। চাকর বলল ঐ দেখুন, খোকাবাবু ছানাগুলোর গায়ে পিন ফোটাচ্ছে। বাবাকে দেখেই মহা উৎসাহে বলে উঠল—উঃ উঃ। অর্থাৎ পিতা যে পরীক্ষাটা মানব-শিশুর উপর চালিয়েছিলেন, অনুগত পুত্র সেইটাই প্রয়োগ করছে মার্জার-শিশুর উপর। এত বড় একটা সুচিন্তিত এক্সপেরিমেন্ট, এক দিনের মধ্যেই এমন ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে, অধ্যাপক স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল তপোধীর। খোকার সবচেয়ে বড় ব্যাধি হল—বড়দের অনুকরণ। খোকা তো নয়, বুড়ো-খোকা। কোন খেলনার দিকে তার খেয়াল নেই। সে ঠাকুরের মত রান্না করবে, ঝি-এর মত বাটনা বাটবে, বাবার মত ইজি-চেয়ারে শুয়ে মোটা মোটা বই পড়বে, চাকর যে বিড়ি খেয়ে টুকরোটা ফেলে দেয়, তাই কুড়িয়ে এনে ঠিক তারই মত পা ছড়িয়ে বসে টানতে থাকবে। সাবান-তোয়ালে নিয়ে কলতলায় বসে নিজেই স্নান করবে। ঝি করিয়ে দিতে এলে শুধু যে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে তাই নয়, তার চুল টেনে, কাপড় ছিঁড়ে, খামচি কেটে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে।

কিছুদিন আগে কোনো বেলজিয়ান জার্নালে তপোধীর একটা লেখা পড়েছিল। তার আলোচ্য বিষয় ছিল শিশুর অনুকরণ-প্রিয়তা। লেখক এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, শিশু-মনকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করবার মত ভাল খেলনা পৃথিবীর কোনো দেশই আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। নিজেদের রাজ্যে মনের খোরাক পায় না বলেই তারা বড়দের এলাকায় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। বড়দের কাজে নাক গলায়। কথাটা তপোধীরের মনে লেগেছিল। তার নিজের খোকার বেলাতেও এটা আংশিক সত্য। ঠিক খেলনা বলতে যা বোঝায় তা ওর নেই। ঐদিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। ব্যাপারটা ব্যয়বহুল। কিন্তু উপায় কি? একটি মাত্র ছেলেকে মানুষ করতে হলে অর্থের দিকটায় কড়াকড়ি করা চলে না।

সেইদিনই বিকালবেলা বেরিয়ে হগ-মার্কেটে ঘুরে ঘুরে কতগুলো দামী খেলনা কেনা হয়ে গেল। নির্বাচনে তিনটা দিকেই জোর দেওয়া হল—রূপ, গতি

ও শব্দ। সুন্দর রঙচঙে ডলপুতুল, স্প্রিংএ চলা মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, মিষ্টি-সুরের পিয়ানো, জলতরঙ্গ এবং বাঁশি। একটা মাদুরের উপর খোকাকে বসিয়ে তার চারিদিকে খেলনাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তপোধীরও বসল তার পাশে। একবার দু'বার করে প্রতিটি জিনিস বাজিয়ে, চালিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দিল। খোকা খুব খুশী, সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠল অতগুলো খেলনা নিয়ে। তপোধীরও খুশী হয়ে নীচে নেমে গেল, এবং এই ভেবে আশ্চর্য হল, ছেলে ভোলাবার এই সহজ এবং সনাতন রাস্তাটা এতদিন নজরে পড়েনি।

শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানা নামকরা বইও ঐ সঙ্গে কিনে এনেছিল মহলানবিশ। ব্যাধি যে স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে সেখানে বা এখন তখন একটু আধটু আংশিক উপশম দিলে চলবে না, রীতিমত ধারাবাহিক চিকিৎসার প্রয়োজন। এই এক মাস ধরে সেটাই হবে তার প্রধান কাজ। এবারে যে নতুন ঝিটি বহাল করা হয়েছিল, তার সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে ; খোকার সম্পর্কে সব কিছুই যেন তাকে জিজ্ঞাসা করে করা হয়।

একখানা বই-এর একটা অধ্যায় তখনো শেষ হয়নি, হঠাৎ উপর থেকে খোকার সেই চিলের মত চিৎকার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখল, খেলনাগুলো যেমন ছিল প্রায় তেমনি পড়ে আছে। খোকা ওপাশের বারান্দায়। বাবার জুতোয় কালি লাগিয়ে বুরুশ করতে সুরু করেছে। চাকর কাছে যেতেই তারস্বরে প্রতিবাদ—অর্থাৎ, দূরে রহ! তপোধীরের মনে হল, একটু-আধটু জোর না করলে চলবে না। ওখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে খেলনা সমেত শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। খোকা কিছুতেই থাকবে না। প্রথমে চিৎকার, তারপর কান্না, তারপর দরজায় দুমদাম লাথি। কিছুক্ষণ এই জাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শন চলার পর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তপোধীর আশান্বিত হয়ে উঠল, এতক্ষণে ওষুধ ধরেছে। অমন সুন্দর সুন্দর খেলনা! তার নিজেরই ইচ্ছা করছে, একটা বেলা ঐগুলো নিয়ে কাটিয়ে দেয়। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চুপি চুপি দরজাটা খুলেই মনে হল, এইমাত্র এখানে একটা খণ্ড-প্রলয় হয়ে গেছে। খাটের উপরে বালিশ, বেড-কভার যা-কিছু ছিল, সব মেঝের উপর গড়াগড়ি ; লিখবার টেবিলের বইখাতা-পেন্সিল-কাগজপত্র চার-দিকে ছত্রাকার। ঘরের এক কোণে একটি হারমোনিয়ম ছিল বেশ যত্ন করে কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাকে টেনে আনা হয়েছে মাঝখানে। রীডগুলোর উপর বলপ্রয়োগের চিহ্ন, বেলো করবার জায়গাটা ছেঁড়া, ধরে তুলতেই ভিতর থেকে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থের নিঃসরণ হল। অর্থাৎ যন্ত্রটিকে নানাভাবে অপদস্থ করবার পর শেষ পর্যন্ত তার উপরে একটি জলীয় অপকর্ম করে রাখা হয়েছে। পাশেই পড়ে আছে অধ্যাপকের অতি আদরের পার্কার কলমটি। তারও আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন। লিখবার টেবিলে রাখলে পাছে খোকাবাবুর সন্ধানী দৃষ্টির কবলে পড়ে যায়, তাই এ মূল্যবান বস্তুটিকে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু খেলনাগুলো গেল কোথায়? বাবাকে শূন্য মাদুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে খোকারই বোধহয় হুঁশ হল। ও পাশের জানালার ধারে ছুটে গিয়ে নীচের

দিকে আঙুল দেখিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—দূঃ দূঃ। তপোধীর গিয়ে দেখল, ঠিকই বলেছে খোকা। সে আপদগুলোকে জানলা গলিয়ে একেবারে রাস্তায় দূর করে দেওয়া হয়েছে, এবং পাড়ার একপাল ছেলেমেয়ে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করেছে। সম্ভবত নিজের এই অসামান্য কৃতিত্বের আনন্দ খোকাবাবুর মনে গভীর আবেগ-সঞ্চার করে থাকবে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মহা উল্লাসে খলখল করে হেসে উঠল। চোখের কোলে, গণ্ডের পাশে কিছুক্ষণ আগেকার কান্নার চিহ্ন তখনো লেগে আছে। তার উপরে এই সরল, সাদা, মাতাল হাসি। শিশিরভেজা স্থলপদ্মের উপর যেন ছড়িয়ে গেল একঝলক অরুণালোক। মুহূর্ত-মধ্যে সব ভুলে গিয়ে তপোধীর ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

কোনো আধুনিক মার্কিন দার্শনিকের একখানা সদ্যপ্রকাশিত বই এইমাত্র শেষ করে তপোধীর হঠাৎ আবিষ্কার করল, এতদিন সে একেবারে উল্টোপথে চলেছিল। গ্রন্থকার লিখেছেন শিশুমনের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির একটা অলক্ষ্য কিন্তু গভীর যোগ আছে। সেই যোগ যতটা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে, ঠিক সেই পরিমাণে সুগম ও সহজ হবে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ। সহরের কৃত্রিম পরিবেশে যে-সব ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে নানা বিকার দেখা দেয়। চারাগাছের মত চারা-মানুষের জন্যেও চাই প্রচুর জল বাতাস আকাশ আলো। অত্যন্ত খাঁটি কথা। কিন্তু এই অভিশপ্ত কলকাতার সহরে সবগুলোরই অভাব। তবু তারই মধ্যে যতটা পাওয়া যায়, তার সুযোগই বা ক'জন নিয়ে থাকে! বাগবাজারের একটা ছোট গলির মধ্যে তপোধীরের বাসা। সেখানে প্রকৃতি নেই; কিন্তু কাছেই গঙ্গা। সে কথাটা যেন সে ভুলেই বসেছিল এতদিন। স্থির করে ফেলল কাল থেকেই রোজ সকাল-সন্ধ্যা খোকাকে নিয়ে সে গঙ্গাতীরে বেড়াতে বেরোবে। পেরাম্বুলেটরটা অনেক দিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। হাঁটতে শেখার পর খোকা আর ওটা চড়তে চায় না, চড়ার চেয়ে চালানোটাই বেশি পছন্দ করে। তাই ব্যবহার করা হয়নি। ওটা এবার কাজে লাগবে। বাসা থেকে গঙ্গা বেশ খানিকটা পথ। সবখানি হেঁটে যাওয়া-আসা সম্ভব নয়।

বাগবাজারের গঙ্গাতীর। একফালি সরু রাস্তা, একদিকে পোর্টকমিশনের রেললাইন, আর একদিকে খাড়া পাড়, ইঁট দিয়ে বাঁধানো। এইমাত্র সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে কল-কারখানার মাথার উপর ধূম্রমলিন আকাশের গায়ে তার বর্ণচ্ছটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। তপোধীর ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং খোকাকে ডেকে ডেকে বলছিল, কী সুন্দর নদী দেখেছ খোকা, আর কত নৌকা। ঐ দ্যাখ আকাশ, রঙ! হঠাৎ এক লাফ দিয়ে গাড়ির উপর উঠে দাঁড়াল খোকা। গাঙ্গেয় প্রকৃতির প্রেরণা কিনা ঠিক ধরা গেল না; তবে এটা বোঝা গেল—সে নামতে চায়। বাবা যতই বলে, বসে থাকো খোকা, নামে না,—ততই চেঁচিয়ে লাফিয়ে তুমুল কাণ্ড। লোক জড়ো হয়ে গেল। এক প্যাণ্ট-পরা ছোকরা একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'দিন না নামিয়ে। এখন থেকে গাড়ি চড়তে না-ই বা শেখালেন!' তা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। কিন্তু

তাতেই সমস্যা মিটল না। নামিয়ে দিতেই খোকা হ্যান্ডেলটা দখল করে বলল, বাপি, বছি। অর্থাৎ এবার সে হবে চালক আর বাবা সওয়ার। যে-কথা সেই কাজ। পা ঠুকে বিকট চিৎকার—বাবা কেন গাড়িতে উঠছে না। তপোধীর কী যে করবে, কিছুই ভেবে পেল না। একদল লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। হঠাৎ কি মনে করে খোকার মত বদলে গেল। বাবাকে ছেড়ে শূন্য গাড়িটাই বেপরোয়া ঠেলতে সুরু করে দিল। আরও বিপদ। খোকা চলার চেয়ে টলেই বেশি। ঐটুকু সরু পথ। কোনো রকমে একবার পা'টা সরে গেলে তিরিশ ফিট নীচে একেবারে জলে গিয়ে পড়বে। অথচ বাধা দেয় কার সাধ্য? ছুঁতে গেলেই চিলের মত চিৎকার। মনে হচ্ছে, এখনই মাথার শিরগুলো ছিঁড়ে যাবে। তাই বলে ছেড়ে দেওয়াও যায় না। জোর করে বাহুটা চেপে ধরতেই সে গাড়িটাকে মারল এক ধাক্কা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢালু পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে গঙ্গাগর্ভে। খোকা খুশি হয়ে বলে উঠল, যাঃ! তারপরেই চলল ওটা ধরে আনতে। তপোধীর এবং আরো দু'একজন লোক তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। বলা বাহুল্য, খোকাবাবুর সেটা মনঃপূত হল না। কোলে তুলে নিতেই প্রথমে বাবার চশমা টেনে ফেলে দিল, তারপর দু'হাতে চুল টেনে, জামা ছিঁড়ে, কেঁদে, খামচে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তাতেও যখন ফল হল না, নীচু হয়ে নাকের উপর বসিয়ে দিল দাঁত।

আধ ঘণ্টা পরে এক হাতে ছেলে আরেক হাতে নাক চেপে ধরে অধ্যাপক মহলানবিশ যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছল, মার্কিন দার্শনিক নিরাপদ দূরত্বে বসে হয়ত তখন শিশুদের অবাধ স্বাধীনতার গুণগান করে আর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত।

পরদিন সকালে উঠে তপোধীর প্রথমেই একটা বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা নিয়ে পড়ল। দু-চার বার কাটা-ছেঁড়ার পর যা দাঁড়াল, সেটা এই রকম ঃ

'একটি বছর-দুয়েকের খুনী-ভাবাপন্ন দুর্দান্ত ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য প্রচুর ধৈর্যশীলা এবং প্রভূত বলশালিনী নার্স আবশ্যক। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। ফোটো এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ সত্বর আবেদন করুন।

'ছেলেটির সর্বপ্রকার ভার লইতে ইচ্ছুক ও সমর্থ কোন আবাসিক প্রতিষ্ঠানের আবেদনও যথারীতি বিবেচিত হইবে।'

বিজ্ঞাপনটা একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক-কাগজে প্রকাশের ব্যবস্থা করে ফিরে আসতেই সেদিনকার ডাকে দুটো জিনিস পাওয়া গেল। একটা বিদেশী পার্সেল, তার মধ্যে "শিশুমন—তার বিকার ও প্রতিকার" সম্বন্ধে দু-খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আর একখানা খামের চিঠি, লিখেছেন শ্বশুরমশায়। পার্সেলটা না-খোলাই পড়ে রইল টেবিলের উপর। চিঠিখানা পর পর দু-বার পড়ল তপোধীর, যদিও বক্তব্য সরল ও সামান্য—দ্বিতীয় বার পড়বার মত কিছুই ছিল না। সেই একই অনুরোধের পুনরুক্তি করেছেন শ্বশুরমশায়। তাঁদের সকলের একান্ত ইচ্ছা, সুলেখাকে ওর হাতে দিয়ে চিরকালের সম্পর্কটা বজায় রাখেন। মা-হারা ছেলেটারও একটা সুরাহা হয়!

সুলেখা ওঁদের দ্বিতীয়া কন্যা, দিদির চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। এই জাতীয় চিঠি আগেও অনেক এসেছে। কিন্তু সুজাতার শূন্য স্থানে আর কেউ এসে বসবে, ভাবতেই পারা যায় না। এই সব কথা বলেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাঁরা নিরস্ত হননি। প্রতি চিঠিতেই কুশল-প্রশ্নের সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গটা জুড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা একরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। আজ যেন মনটা কেমন ভাবাতুর হয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হল, সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ।

তপোধীর আছ নাকি? গুপ্ত সাহেবের গলা।

এই যে আসুন, দাদা।

দেখতে এলাম তোমার নতুন থিওরিগুলো—ও কি, নাকে কি হল?

মনটা নরম হয়ে ছিল। নাসিকা-ঘটিত ব্যাপারের একটি সরস বর্ণনা দিল তপোধীর। গুপ্ত সাহেব তাঁর সেই অট্টহাসির ঝড় তুললেন। তারপর বললেন, ঠিকই হয়েছে। তোমার ঐ কেতাবী বিদ্যার অত্যাচার ও আর কত সইবে বল? ওসব এবার ছাড়ো। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক ছেলেটা।

কিন্তু হাঁপ ছাড়তে দিচ্ছে না!

ও যা চায়, পেলেই দেবে। ঝি, চাকর, বাবা—কারুরই তখন দরকার হবে না।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। অন্যদিন হলে তপোধীর হেসে উড়িয়ে দিত। আজ কোনো কথা বলল না। মনটা আবার উদাস হয়ে উঠল।

বিজ্ঞাপন বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল চাকরি-প্রার্থিনীর ভিড়। ষোল থেকে ছাপ্পান্ন নানা বয়সের কুমারী, সধবা ও বিধবার দল বিচিত্র বেশে এবং ভঙ্গীতে তাঁদের গুণাবলীর লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে অধ্যাপককে অভিভূত করে ফেললেন। কাকে ফেলে কাকে রাখা যায়, কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারল না তপোধীর। একটা প্রশ্ন, যা প্রথম দিকে খেয়াল হয়নি, এখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দেখা দিল। একটি অনাত্মীয়া মহিলাকে ছেলের নার্স হিসাবে এই বাড়িতে স্থান দেওয়া—বাড়তি ঘর অবশ্য আছে, তবু সমীচীন হবে কি? একটু বেশী বয়স দেখে নিলে হয়ত তেমন দোষের হবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতির বয়স-নির্ণয়ের চেয়ে শক্ত কাজ আর কিছু নেই। বয়স্থা এবং বয়স্কা—এ দুয়ের সীমা-রেখা যে কোথায়, চেহারা ও সাজ-পোষাক দেখে ধরে কার সাধ্য? অন্ততঃ তপোধীর সে বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ।

শিশু-সদন জাতীয় কয়েকটি সংস্থাও দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে একটির নাম 'বালাতঙ্ক-নিকেতন'। তাঁদের তরফ থেকে যে নারী-প্রতিনিধি দেখা করতে এলেন, তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই অধ্যাপকের বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। নামটার সার্থকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। প্রথমেই প্রশ্ন করল, দুষ্টুমি করলে বাচ্চাদের আপনারা মারধোর করেন কি?

নারীমূর্তিটি তাঁর সবগুলো ভয়াল দন্ত একসঙ্গে বিকশিত করে হাসলেন

এবং ভগ্ন কাঁসর-নিন্দিত কণ্ঠে বললেন, আজ্ঞে না। চোখ-মুখ-দাঁতের সাহায্যেই আমরা সবরকম ডানপিটে সায়েস্তা করি। হাত তুলতে হয় না।

নিয়মাবলীতেও তাই দেখা গেল। নার্সদের চেহারাই ওঁদের প্রধান মূলধন। খুঁজে খুঁজে নানা দেশ থেকে এই সব হৃৎকম্পদায়িনী হুরীদের সংগ্রহ করতে হয়। সংসারে সবাই চায় রূপ। পুরুষের বেলায় না হলেও চলে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় প্রতি ক্ষেত্রেই এ বস্তুটি অপরিহার্য। একটিমাত্র ব্যতিক্রম এই 'বালাতঙ্ক'—যেখানে রূপসীর চেয়ে কুরূপার কদর বেশী। নারীজাতির মধ্যে একটিমাত্র রসের সন্ধান পেয়েছেন এঁরা—তার নাম বীভৎস রস। প্রতিষ্ঠানটিকে মনে মনে বাহবা জানাল তপোধীর। বিশেষ বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাটিকে বিদায় দিল।

সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ইণ্টারভিউ। তপোধীর স্থির করেছিল আজই ব্যাপারটা শেষ করে ফেলবে। এ পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন এবং দরখাস্ত পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকেই একজন বা একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হবে। কিন্তু হঠাৎ একটি দরকারী কাজে বেরিয়ে যেতে হল। ফিরল প্রায় সাড়ে ন'টার কাছাকাছি। সদর দরজা পার হতেই বসবার ঘরের ভিতর থেকে কানে গেল একটি পরিচিত কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় নারীকণ্ঠ—আপনাদের ত কতবার করে বললাম, নার্স আমাদের দরকার নেই। আপনারা এবার আসতে পারেন।

কে-একজন প্রশ্ন করল, লোক নেওয়া হয়ে গেছে?

কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর উত্তর এল—হ্যাঁ।

উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠল তপোধীর—সুজাতা! কী আশ্চর্য বিভ্রম! সুজাতা নয়, সুলেখা। চোখাচোখি হতেই মেয়েটির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক রক্তরাগ। কোলে ছিল খোকা। তাকেই আবো জোরে চেপে ধরে ত্রস্তা হরিণীর মত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল একটি কিশোর, সুজাতার ছোট ভাই। জামাইবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। তপোধীর তার কাঁধ দুটো নাড়া দিয়ে বলল, কখন এলে তোমরা?

এই ত ঘণ্টাখানেক। বাবাও এসেছেন।

কোথায় তিনি?

বেরিয়েছেন। এখখুনি এসে পড়বেন।

উপরে উঠে শোবার ঘরে ঢুকতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা। এবার আর পালানো সম্ভব হল না, বোধহয় সে ইচ্ছাও ছিল না। পরনে একখানা হালকা সবুজ রঙ-এর তাঁতের শাড়ি, কাঁধ ও বুকের উপর দিয়ে নেমে গেছে তার গাঢ় লাল পাড়। কিছুক্ষণ আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে চুলের বোঝা পিঠের উপর ছড়ানো। মুখে সামান্য প্রসাধনের প্রলেপ। কপালে একটি সযত্ন-রচিত কুমকুমের টিপ। তপোধীর পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। সুলেখা এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আপনার মক্কেলরা সেই কখন থেকে এসে বসে আছে।

আমার মক্কেল !

তা ছাড়া আর কি ?

কই, কাউকে ত দেখলাম না ।

ওমা ! সব চলে গেছে ? ঈস !

তাড়িয়ে দিলে আর থাকে কি করে ?

কে আবার তাড়াল ?

তা জানিনে । তবে একজন কেউ ত সত্যিই দরকার । খোকাটাকে দেখবার—

সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, মশাই । বাধা দিয়ে তেড়ে উঠল সুলেখা । তারপর স্বর নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বলল, বাবা বলেছেন, খোকাকে আমি দেখব ।

শুধু খোকাকে ? হঠাৎ বলে ফেলল তপোধীর ।

তা ছাড়া আবার কাকে ?—তড়িৎগতিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুলেখা । তপোধীর মুখে কিছুই বলল না । উত্তরটা বোধহয় লেখা ছিল তার চোখের তাবায় । সেইদিকে চেয়ে দুখানি সুন্দর ভ্রূর মাঝখানে ফুটে উঠল একটি বিশেষ কুঞ্চন । নীচের ঠোঁটখানা উলটে দিয়ে বলল, আমার বয়ে গেছে ।

একুশ বছর

বিপিন বকসী আমাব দাদামশায়েব আমলেব লোক । ঢুকেছিলেন মুহুরী হয়ে, তাঁব মৃত্যুর পর হয়ে দাঁড়ালেন মুরুব্বী । আমাদের একটি ছোটখাট জমি-দারি ছিল, তাব দেখাশুনো, ক্ষেত-খামারের বিলিব্যবস্থা, চাষ-আবাদ, আদায়-তহশিল—সবই চলে গেল ওঁব হাতে । বাবা-কাকা কিঞ্চিৎ সমীহ করে চললেও, আমাদের সঙ্গে বিপিনদার সম্পর্কটা ছিল সহজ বন্ধুত্বের । আমি যখন কলেজে ঢুকেছি, ওঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে । তিন কূলে কেউ কোথাও নেই, বিয়েথাওয়া করেননি । তাই নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করতাম । এই প্রসঙ্গেই একদিন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম, কি জানো দাদুভাই, বিয়েটা হচ্ছে ঠিক ডাঙা জমির পয়লা চাষ । সময়মত হল তো হল । তা নৈলে আর হয় না । জো চলে যায় ।

মনে আছে, খুব হেসেছিলাম বিপিনদার এই অদ্ভুত থিওরী শুনে । কখনো ভাবিনি অভিজ্ঞ বৃদ্ধের এই সরস পরিহাস (তাই বলেই ধরে নিয়েছিলাম) আমাব জীবনে একদিন কঠোর সত্যের রূপ নেবে । বিয়াল্লিশ পেরিয়েও যখন কৌমার্যের উষরতা ঘুচল না, তখন আমারও ঠিক ঐ কথাটা মনে হয়েছিল—জো চলে গেছে । বিপিনদা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলতেন, কেমন, বলিনি ?

বিপিন বকসীর জীবনে কী ঘটেছিল, যার ফলে পয়লা চাষটা ঠিক সময়ে পড়েনি, সেটা তিনি কোনদিন খুলে বলেননি । হয়তো আমারই মত ঠিক কারণটা তাঁর জানা ছিল না । আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমিই বা কী উত্তর

দেবো ? শুধু বলতে পারি 'জো'টা যে কখন এল আর চলে গেল, বুঝতে পারিনি।

একথা অস্বীকার করতে পারি না, আমার বেলায় এই 'পয়লা চাষ' সম্বন্ধে আর কেউ না হলেও আমার মা রীতিমত সজাগ ছিলেন। তবু যে কেন হল না, কোথা দিয়ে বেলা বয়ে গেল, সে কথা এখন থাক। পরের অংশটাই আগে বলি।

অন্য দশজন ভদ্রসন্তানের মত আমিও যথাসময়ে এম. এ পাশ করলাম। সাধারণ ভাবে পাশ করলে হয়তো ঐখানেই দাঁড়ি টানতে হত, এবং তারপর যথারীতি চোখ বুজে সংসার নামক ঘানি টানতে শুরু করতাম। কিন্তু যেহেতু পরমকারুণিক বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামটাকে টেনে একেবারে সকলের মাথার উপর তুলে দিয়েছিলেন, আমার আর তখন থামবার উপায় রইল না। আরও উপরে চড়বার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লাম। বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ এবং যথাস্থানে মুরুব্বীর অভাব ছিল না। সুতরাং গৌরীসেনের অর্থেই সাগর পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বছর কয়েক পরে ভূতত্ত্ব বিষয়ে বিশাল বিদ্যা এবং ততোধিক বিশাল একটি সরকারী চাকরি সংগ্রহ করে যখন দেশে ফিরলাম, তখন আমার পারিবারিক বন্ধন প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে গেছে। বাবা অনেক আগেই গিয়েছিলেন, মা নেই, দিদিরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, ভাই কোনোদিন ছিল না। আর যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার মত বিলাত-ফেরত বড়-চাকরে সম্বন্ধে 'শত হস্তেন বাজিনঃ' এই সনাতন চাণক্যনীতি অবলম্বন করে চারদিকে উল্টো কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন, 'দীপক কি আর সেই দীপক আছে ? এখন সে মস্তবড় সাহেব, আমাদের মত গরিব কালা আদমির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের ?'

এই রটনার মূলে ষষ্ঠ রিপুর সেই চিরন্তন কারসাজি লক্ষ্য করে আমিও তাঁদের কাছে ঘেঁষবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করলাম।

তারপর বছরের পর বছর মাটির তলায় নুড়ি আর পাথরের ঢেলা দিয়ে ঘেরা যে জগৎ, তার মধ্যেই ডুবে রইলাম। মহাকাল যে অদৃশ্য লিপি লিখে রেখে গেছে ভূগর্ভের স্তরে স্তরে, যেখানে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে তারই পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম। মাটির উপরে যে বিচিত্র জীবজগৎ প্রতিদিন নব নব রূপে অশ্রুহাসির মালা নিয়ে মানুষকে আহ্বান করছে, তার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর হল না। আলো বাতাস আর আকাশে জড়ানো এই প্রাণময় পৃথিবীর দরজা আমার কাছে রুদ্ধই রয়ে গেল।

বিধাতার রাজ্যে 'নারী' নামক যে অপরূপ সৃষ্টি, তার সম্বন্ধে আমি কোনদিন উৎসুক ছিলাম না, একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি, 'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া'—এটাও সত্য নয়। বারম্বার নয় একবার বোধহয় ডেকেছিলাম। 'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে' দ্বারও খুলেছিল। তারপর সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে। সে সব অনেক কাল আগেকার ইতিহাস। পরের অধ্যায়ে পট বদলে গেল। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল বেলা। হঠাৎ একদিন চমকে চেয়ে দেখলাম, আঙিনার কোলে অপরাহ্ণের প্রলম্বিত ছায়া।

বাংলা দেশেরই একটা পাহাড়ী অঞ্চল। নামধামগুলো অনুক্ত রাখতে চাই। তার কারণ আমার এ কাহিনীর পক্ষে সে সব অনাবশ্যক। আরও একটা কারণ আছে। লেখাটা পাঠিকামহলের নজরে পড়তে পারে। তাতে করে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু এ আখ্যায়িকার শেষ দৃশ্যে যাঁর আবির্ভাব ঘটবে, স্ত্রী-জাতির অতিকৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর সম্বন্ধে হয়তো তাঁরা এমন কোন তথ্য আবিষ্কার করে বসবেন, যা আমি বলতে চাইনি। তাই এই সামান্য গোপনতার আশ্রয় নিতে হল।

জিলা-সহর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ের কোলে ভূতত্ত্ব-বিভাগের খনন-কার্য চলেছে। চাঞ্চল্যকর তথ্য-উদ্ধারের সম্ভাবনা। সুতরাং দিল্লী থেকে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। সারাদিন কাদামাটি আর পাথর ঘাঁটাঘাঁটির পর সন্ধ্যাবেলা সহরের সার্কিট-হাউসে ফিরে এসেছি। যে জায়গায় আমাদের কাজ চলছে, সেখানে বা তার আশেপাশে আমদের মত নুড়ি-কারবারী ছাড়া আর কারো কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। সুতরাং রাস্তা বলতে কিছু নেই। কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও উঁচু-নীচু পাথুরে জমি—যাকে অতিক্রম করা জীপের মত বাহন এবং জিওলজি ডক্টরের মত বাহকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু জিওলজিস্টের মনটা পাথর হয়ে গেলেও দেহের কাঠামোটা হাড়ের। যখন ফিরলাম, মনে হল তার কোনোটাই বোধহয় আস্ত নেই। জীপ থেকে নেমে কোনো রকমে সেগুলোকে টেনে নিয়ে বিছানায় ফেলতে পারলে হয়।

আমার আস্তানা ছিল চার নম্বর ঘরে। তালা খোলার জন্যে চৌকিদারকে ডাকতেই সে সবিনয়ে সেলাম করে এগিয়ে ধরল একখানা চিঠি। পড়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠলেও বুঝলাম, করবার কিছু নেই। কালেক্টর জানাচ্ছেন, বিকালের দিকে হঠাৎ ইস্কুলসমূহের ডিভিশনাল-ইনসপেকট্রেস সাহেবা বিনা নোটিসে এসে পড়াতে আমার ঘরেই তাঁকে জায়গা দিতে হয়েছে। বাকী কামরা গুলো আমার আসবার আগে থেকেই **booked.** অতএব ড্রইংরুমের একধারে একখানা ক্যাম্পখাট বসিয়ে দেওয়া ছাড়া তিনি আমার জন্যে আর কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে বিশেষ দুঃখিত।

চিঠির শেষ ক'টি লাইনে রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। লেখা আছে—'অবশ্য আইন অনুসারে সকলের পরে যিনি আসবেন, এ ব্যবস্থা তাঁর বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি মহিলা অতএব কালেক্টর আশা করেন ডক্টর ব্যানার্জি (অর্থাৎ আমি) এই অনিচ্ছাকৃত অসুবিধাটুকু সিভালরি অর্থাৎ মধ্যযুগীয় নাইটসুলভ বীরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।'

ডিনার নামক প্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাট সংক্ষেপে মিটিয়ে ফেলে একটু সকাল সকালই ক্যাম্পখাটের আশ্রয় নিলাম। আমার চোখের সামনেই চার নম্বর-এর দরজা খোলা। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, গতরাত্রে আমি যে আরাম-দায়ক স্প্রীং-এর শয্যায় রাত্রিযাপন করেছি, তার উপর নতুন 'হোল্ডল'-এ জড়ানো অন্য লোকের বিছানার বাণ্ডিল। পাশে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস, গায়ে শাদা অক্ষরে নাম লেখা। এধার থেকে শুধু একটা কথা পড়া যাচ্ছে—মিস্। বাকীটুকু

আড়ালে পড়ে গেছে। একটা চাপরাশী গোছের লোক ঘোরাঘুরি করছে। আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

দুর্গ্রহের মত হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যে ব্যক্তি আমার রাত্রির আশ্রয়টুকু কেড়ে নিল, তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাব ছাড়া আর কী থাকতে পারে ? কিন্তু, কি আশ্চর্য ! ঐ মহিলাটি সম্বন্ধে আমি যেন মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম ! যাকে চিনি না, হয়তো কখনো চোখেও দেখিনি—কোথাকার কোন মেয়ে-ইস্কুলের ভ্রাম্যমান পরিদর্শিকা, তারই একটা কল্পিত রূপ আমার মনের মধ্যে জুড়ে বসল। অজ্ঞাতসারে ভাবতে শুরু করলাম, মহিলাটি কেমন দেখতে, কত বয়স, কী ধরনের বেশভূষা, কেমন স্বভাব। আমি যাদের দেখেছি, আমার মনের উপর ক্ষণেকের তরে যাদের ছায়া পড়েছিল (খুঁজে দেখলে তার একটু অস্পষ্ট আভাস হয়তো এখনো লেগে আছে), তাদের মধ্যে কেউ নয় তো ? তাই যদি হয়, বেশ মজা হয় কিন্তু।

শুনেছি, কবিরা কল্পনার সঙ্গে 'জাল'-এর তুলনা করে থাকেন। কিন্তু জাল বুনতে হয়, কল্পনা নিজেকে নিজেই বুনে চলে। একবার রাস খুলে দিলে আর রক্ষে নেই, চোখের পলকে ছেয়ে ফেলে বিশ্ব-সংসার। সেদিন আমার সেই বিশ্ব-গ্রাসী কল্পনার জালে কত দৃশ্য যে ধরা দিল, যাদের একটিবার দেখে ভুলে গেছি, কিংবা একেবারেই দেখিনি। বিস্মৃতির কুহেলী-ঢাকা অলিগলি পার হয়ে এক-জনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একদিন আমার নবজাগ্রত যৌবন-দুয়ারে যে ছিল বিশেষ জন, অনেকের মধ্যে যে একক, বহুর মধ্যে অনন্যা। তাকে ঘিরে, যা জানি তাই শুধু নয়, যা জানি না, হয়তো কোথাও শুনেছি কিংবা শুনিনি, এমনি কত উদ্ভট অবাস্তব ছবি ছায়া-চিত্রের মত আমার নিমীলিত চোখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগল।

তারপর কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

রাত কত জানি না। ঘুমের মধ্যেই যেন দেখলাম, কে-একজন আমার খাটের পাশে এসে বসল। মশারি খাটানো ছিল ; চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে ?' তরুণ কণ্ঠে জবাব এল, তার মধ্যে একটু যেন কৌতুকের সুর, 'চিনতে পারছ না ?'

'না তো।'

'আমি তোমার, 'একুশ বছর'।'

'একুশ বছর ?'

'হ্যাঁ।'

'তাই যদি হয়, তোমাকে তো অনেক দিন হল পেছনে ফেলে এসেছি। এত-কাল পরে আজ হঠাৎ—'

'ডাকলে বলেই এলাম।'

'তোমাকে ডেকেছি ?'

'ডেকেছ বৈকি ! শুধু আমাকে নয়, আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকেই তো ডাক দিয়েছ। তার মধ্যে বিশেষ করে একজনকে।'

আমি চুপ করে রইলাম। মিনিটখানেক বিরতির পর আবার শুনলাম, সে বলছে, 'আচ্ছা, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে ?'

'কোন দিন ?'

'সেই যেবার এম. এ. পরীক্ষার পর দেশে গিয়েছিলে। একদিন বৈকালিক জলখাবারের নাম করে মা তোমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারনি, ঘরে ঢুকেই চমকে উঠেছিলে। কার্পেটের আসনের সামনে তোমার মিষ্টান্নের থালা। তার ডান পাশে আর একখানা আসনে জড়সড় হয়ে বসে ছিল একজন। তখন গোধূলিবেলা। উল্টোদিকের জানালা পার হয়ে অস্তমান সূর্যের কয়েকটি রক্তাভ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মুখের উপর। তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল লজ্জার লালিমা। এক ঝলক দেখেই তোমার মনে হয়েছিল মুখখানা অপরূপ। সে-ও একবার চকিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেছিল তোমার দিকে। দুটি স্বপ্নময় নীলাভ চোখ! তারপর আর মুখ তোলেনি। তুমিও আর তাকাতে পারনি। ঘেমে নেয়ে উঠেছিলে। কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে মিষ্টিগুলো নাড়াচাড়া করে উঠে পালিয়ে গিয়েছিলে নিজের ঘরে। মা পেছন থেকে বলছিলেন, 'একি, সবই যে পড়ে রইল। যাচ্ছিস কোথায় ? শোন্।' তুমি ফিরে চাওনি। অস্ফুট স্বরে শুধু বলেছিলে, 'খিদে নেই।'··· ···মনে পড়েছে ?'

সাড়া দিলাম, 'বলে যাও।'

'একুশ বছর'এর কাহিনী এগিয়ে চলল ঃ 'সেই রাতেই মা এলেন তোমার ঘরে। তুমি চুপ করে শুয়েছিলে। আলোটা ভাল লাগেনি, অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছিলে। তন্ময় হয়ে ভাবছিলে সেই সন্ধ্যাটির কথা। মা আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েছিলে। মা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'উঠছিস কেন ? শুয়ে থাক।' তারপর আলোটা একটু উসকে দিয়ে তোমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'মেয়েটি বেশ সুন্দর, না রে ?'

'কার কথা বলছ ?' না বোঝার ভান করেছিলে তুমি।

'যাকে দেখলি।'

'তা কি জানি ? আমি ওদিকে তাকাই-টাকাইনি।'

'আচ্ছা, আরেকদিন ডাকবো। ভালো করে দেখিস। যা যা তোর জানবার ইচ্ছে, জিজ্ঞেস করিস। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। এই তো সবে পনেরোয় পা দিয়েছে, এরই মধ্যে কত কী শিখেছে। ওর বাবা যে ওকে নিয়ম করে পড়ান। গলাটা কী মিষ্টি! ঠিক যেন একটি দোয়েলপাখি। গানও শিখছে। তা ছাড়া সংসারের যা কাজ—রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়াই মোটামুটি সবই জানে। মায়ের সঙ্গে হাতে-হাতে সব করতে হয়। লোকজন তো নেই। বাপ সামান্য মাস্টারি করে। কোনো রকমে চলে।'

তুমি কোন সাড়া দিচ্ছ না দেখে মা বলেছিলেন, 'কী হল ? তুই যে কিছুই বলছিস না দীপু—'

'কী বলবো ?'

'আচ্ছা আজ থাক। আরেক দিন ভাল করে দেখে তখন বলিস।'

দেখার ব্যবস্থা তুমিই করে নিয়েছিলে, মা কবে কি করবেন, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকনি।

ঐ মেয়েটির বাপ মাস কয়েক আগে সেকেণ্ডমাস্টারের চাকরি নিয়ে তোমাদের গ্রামে এসেছেন। বাসা ছিল গ্রাম ছাড়িয়ে ইস্কুলের পাশে যে মাঠ, তারই ধারে। কাছেই তোমার ঠাকুরদা'র আমলের বড় পুকুর। চারদিকে আমবাগান। জায়গাটা হঠাৎ তোমার ভালো লেগে গেল। রোজ বিকেলে একা একা বেড়াতে যেতে। সেইখানে সেই ছায়া-ঢাকা পথের ধারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ঠিক হঠাৎ নয়। তুমি জানতে ঐ সময়ে ঐ পথ দিয়ে সে কলসি কাঁখে জল নিয়ে বাড়ি যায়। তুমি যা ভয় করেছিলে, তা হয়নি। পালায়নি, চমকেও যায়নি। মনে মনে সে-ও বোধহয় চেয়েছিল এই গোপন দেখার মাধুর্যটুকু। তোমার ভরসা হল। কাছে গিয়ে বললে, 'একি। আপনি এখানে!' যেন অত বড় একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তুমি একেবারেই আশা করনি। সে বোধহয় ধরে ফেলেছিল তোমার ছদ্মবেশ। বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিয়েছিল, 'কেন, আপনি জানেন না? পাশেই আমাদের বাড়ি, রোজই তো এই পুকুরে জল নিতে আসি।'

'ও, তাই নাকি? কই, আমাদের বাড়ি তো আর গেলেন না?'

সে হেসে উঠেছিল।

'হাসছেন যে?'

'আমাকে বুঝি 'আপনি' বলতে হয়।'

'ও, আচ্ছা বেশ; 'তুমি'ই বলছি। মা তোমার কথা বলেন। একদিন যাওনা কেন?'

কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। সাড়া না পেয়ে অভিমান হল তোমার। ক্ষোভ মেশানো উদাস সুরে বললে, 'যেতে যদি ইচ্ছে না হয়, থাক। আমি তো আর জোর করতে পারি না।'

'আমি তাই বলেছি নাকি?'

'তবে কী?'

'লজ্জা করে না বুঝি?'

'কেন, লজ্জা কিসের?'

'আপনি যেন কিছুই জানেন না!'

'বাঃ, আমি কেমন করে জানবো?'

একটু বোধহয় সংশয়ের ছায়া পড়েছিল তার মনের কোণে। তারপরেই তোমার মুখের পানে এক পলক তাকিয়ে বুঝে ফেলেছিল, ওটা তোমার ছল, না-জানার ভান করে 'লজ্জা'র সেই মধুর কারণটুকু ওর মুখ থেকে শুনতে চাও। তাই তোমার কথার জবাব না দিয়ে অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে সুধা ঢেলে বলেছিল, যান, আপনি ভারী দুষ্টু। মাথাটা আরো নুয়ে পড়েছিল মাটির দিকে। তুমি ওর একান্ত কাছটিতে সরে গিয়েছিলে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠেছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, ঐ সলজ্জ হাসি রঞ্জিত আনত মুখখানা দু'হাতে একটিবার তুলে ধর—। কিন্তু পারনি। বড্ড ভীরু ছিলে তুমি। শিক্ষা সংস্কার এবং চিরাচরিত

সংযমের পাশ তোমার হাত জড়িয়ে ধরেছিল। সে কিন্তু এতটুকু আপত্তি করত না। হয়তো মনে মনে অপেক্ষা করে ছিল।

তারপর আরো কতবার দেখা হয়েছে তোমাদের। তোমার মা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওর বাবাও তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। পাশে বসিয়ে মেয়েকে দিয়ে পরিবেশন করিয়ে খাইয়েছেন তাঁর নিজের হাতের রান্না। তোমার সঙ্গে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মুগ্ধ হয়েছেন সেকেণ্ডমাষ্টার ভূপতিবাবু। তোমাকে ভালবেসেছিলেন। তুমি তো ধীমান নও, শ্রীমান। বিদ্যায়, বিনয়ে, স্বভাবে, আচরণে তোমার জোড়া কোথায়? মারও ওঁদের সবাইকে ভাল লেগেছিল। দরিদ্র, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ পরিবার।

আজ হয়তো তুমি স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি তো জানি, তোমার বুকের মধ্যে বসে দেখেছি, সেদিনকার সেই কাঁচা মনের উপর মাধুরীর মধুর মুখখানা গভীর দাগ কেটে বসে গেছে। তাকে তুমি ভালবেসেছিলে, এবং সেকথা কারো কাছেই অস্পষ্ট ছিল না। সেই জোরেই, মা তাদের কথা দিয়েছিলেন। দরিদ্র ইস্কুলমাস্টার কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে থেকে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার মত ভাগ্যবান কে? কিন্তু আপনার ঐ হীরের টুকরো ছেলে। ওর যোগ্য সম্মান দিতে পারি, সে সঙ্গতি তো আমার নেই।'

মা বলেছিলেন, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না, বেয়াই মশাই। শুধু আপনার মাধুরীর হাতখানা আমার দীপকের হাতে তুলে দিয়ে দু'জনকে আশীর্বাদ করবেন।'

'আপনার অশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু তারও তো একটা অনুষ্ঠান আছে, আয়োজন আছে। সেটুকু যে করে উঠতে পারবো—'

'সে ভারও আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। মনে করুন, মাধুরী আমারই মেয়ে, আমিই তার বিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুদিন পরেই তুমি কলকাতায় ফিরলে। এম. এ পরীক্ষার ফল বেরোল। সকলের উপরে তোমার নাম, কাগজে কাগজে তোমার ছবি, তোমার অসামান্য কৃতিত্বের বিবরণ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সতীর্থ, অধ্যাপক—সবারই মুখে এক কথা—সাবাস! একদল তাতিয়ে তুললেন, 'না, এখানে থেমে গেলে চলবে না; এগিযে চল। দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু চায়, অনেক বেশী তার প্রত্যাশা। তোমাকে তা পূর্ণ করতে হবে।'

পুরুষের জীবনে সবচেয়ে বড় মোহ বোধহয় যশের মোহ, সবচেয়ে প্রবল আকর্ষণ কীর্তি। তারই দূরাগত দীপ্তি তোমার দু-চোখ ঝলসে দিলে। তার পাশে জীবনের আর যত প্রাপ্তি ও পাওনা, ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাস কয়েকের মধ্যেই তুমি পশ্চিমের পথে ভেসে চললে।

মা প্রথমে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলেন। বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর অনুমতির অপেক্ষা তুমি করবে না। শুধু বারংবার পীড়া-

পীড়ি করেছিলেন বিয়েটা হয়ে যাক। তুমি রাজী হওনি! লিখেছিলে, 'আমার সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কবে ফিরব, কি নিয়ে ফিরব, জানি না। এ অবস্থায় আর একজনের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না।' মা জানতে চেয়েছিলেন ওরা কি অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকবে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, 'না. তার দরকার নেই। ইচ্ছা হলে ওঁরা অন্যত্র সম্বন্ধ করতে পারেন।'

এই স্পষ্ট উক্তির পরেও যাবার আগে একটি বার দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন তোমার মা। তুমি সময় করতে পারনি। আমি জানি, সেটা মিথ্যা কথা। মায়ের এবং মাধুরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ তোমার ছিল না, সাহস হয়নি।

ফিরে এসে মাকে আর দেখতে পাওনি। যে আঘাত দিয়ে গিয়েছিলে, তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বাবার পরেই সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, সেই তাঁর শেষশয্যা।

আর মাধুরী? তার মনের খবর কেউ পায়নি, আমিও জানি না। মুখ ফুটে কেউ তাকে কোনদিন কিছু বলতে শোনেনি।

তুমি কি সত্যিই তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিলে? আমি তোমার 'একুশ বছর'। আমাকে তুমি পেছনে ফেলে চলে গেলে। কিন্তু তোমার চোখে আমার এই দৃষ্টি, তোমার মনে আমার এই স্পর্শ তখনো লেগেছিল; অনেক দিন কাটিয়ে উঠতে পারনি। কেউ পারে না। সাগরের ওপারে বসেও নানা কাজের মাঝে তোমার তরুণ মন এক একবার চঞ্চল হয়ে উঠত। সামনে পড়ে থাকত খোলা বই-এর পাতা। তার সেই শুকনো অক্ষরের বন্ধন ছাড়িয়ে তোমার উদাস চোখ দুটি কখন জানালা দিয়ে চলে যেত দূরে কুয়াশা-ঢাকা আকাশের গায়। সেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠত একখানা মুখ, পাতলা ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠত, তারি ভিতর থেকে বাঁশীর সুরে ভেসে আসত দুটি একটি সরমে-জড়ানো কথা। কথা নয়, যেন গান। তারপর সশব্দে জানালা বন্ধ করে সমস্ত মনটাকে তুমি গুটিয়ে এনে ফেলতে সেই পুঁথির পাতায়। মনে মনে আবৃত্তি করতে, না, না, এ চলবে না। আমাকে বড় হতে হবে, আরো বড় হতে হবে। **I must get rid of this idle sentiment.**

তোমার সাধনা সফল হল। যখন ফিরে এলে—কীর্তিমান, কর্মীপুরুষ। মাধুরী নামে যে একটি সামান্য-শিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা কবে কোন দুর্বল মুহূর্তে ভীরু পদক্ষেপে তার অন্তরের খোলা দ্বারপথে দু'দিনের তরে দেখা দিয়েছিল, সেদিনকার দীপক ব্যানার্জির কাছে সে ঘটনাটা নিতান্তই তুচ্ছ ও হাস্যকর। কোথায় সে মাধুরী, কেমন আছে, কিংবা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কৌতূহলও তার মনে আসেনি।

বিদেশে থাকতে মা তোমাকে যে-সব চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে সামান্য কুশল-প্রশ্ন ছাড়া বড় একটা কিছু থাকত না। এ কথা একবারও জানাননি, শেষ ক'টা দিন ঐ মাধুরীই ছিল তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গিনী। ও যা করেছে, তাঁর নিজের মেয়েরা তার সিকি ভাগও করতে পারেনি। দিন যতই ঘনিয়ে আসতে

লাগল, ঐ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর একটা তীব্র অশান্তি বোধ করতেন বুকের ভিতর। তারপর একদিন ওর বাবাকে ডেকে পাঠালেন। নিজে থেকেও মাঝে মাঝে আসতেন ভূপতিবাবু। সেদিন সবাইকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার একটা শেষ অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। বলুন, রাখবেন ?'

তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। জিভ কেটে বললেন, 'অমন করে বললে যে আমার অপরাধ হয়। আপনি জানেন না, আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশ।'

মা একখানা খাম তাঁর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, 'এই ক'টা টাকা আমি মাধুরীর বিয়ের জন্য তুলে রেখেছিলাম। আমার তো আর দেখে যাওয়া হল না। আপনি আমার হয়ে একটি ভালো ছেলে দেখে ওকে পাত্রস্থ করবেন।

ভূপতিবাবু জোড় হাত করে বললেন, 'আপনার কাছে আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি, তার ঋণ এ জীবনে শেষ হবে না। তার ওপরে সে বোঝা আর বাড়াবেন না। ওকে শুধু আশীর্বাদ করে যান। লক্ষ টাকার চেয়ে তার দাম অনেক বেশী।'

মা বললেন, 'কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছিলাম, ওর বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার আমার।'

'তার জন্যে আপনি মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। যাকে উপলক্ষ করে কথা দিয়েছিলেন, তাকেই যখন পেলাম না, শুধু কতকগুলো টাকা দিয়ে আমি কী করবো ?'

মায়ের মনেও ঠিক এই আশঙ্কা ছিল। ভূপতিবাবুকে তিনি চিনতে ভুল করেননি। এই দারিদ্র্য-ব্রতী ইস্কুলমাস্টারটিকে বিধাতা ধনদৌলত থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু একটি বড় সম্পদ অকাতরে দান করেছিলেন, তার নাম চরিত্র-বল। কোনো অবস্থাতেই একে দান বা অনুগ্রহ গ্রহণে সম্মত করা যাবে না, একথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই ও নিয়ে আর বৃথা পীড়াপীড়ি করেননি।

কিন্তু মন যে কিছুতেই স্থির হতে চায় না। ক'দিন পরে ঐ খামখানা মাধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, তুলে রাখ্। বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যাস।'

খোলা মুখ দিয়ে হাজার টাকার পাঁচটা বান্ডিল দেখা যাচ্ছিল। মাধুরী চমকে উঠল, 'সর্বনাশ ! এত টাকা নিয়ে আমি কী করবো ?'

'কি করবি মানে ! একটা মেয়ে পার করতে কত লাগে খবর রাখিস ?'

'দরকার নেই আমার খবর রেখে। আমি তো আর মেয়ে পার করতে যাচ্ছি না।'

'পাগলামি করিস না মাধু। ও টাকা আমি তোর নাম করে রেখেছি। না নিলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

মাধুরী চোখ ছল ছল করে উঠল। বলল, 'এ হুকুম আমাকে করো না মা। দিতে যদি হয়, বাবাকে দিও।'

'তিনি নিলেন না।'

'তবে আমকে নিতে বলছ কেন ?'

'বলছি এই জন্যে যে তুই আমার মেয়ে। আমার কাছ থেকে কোনো কিছুই নিতে তোর বাধা নেই, লজ্জা নেই।'

মাধুরী তখনো মাথা নিচু করে বসে আছে দেখে মা সেই অবস্থাতেও রুক্ষ তীক্ষ্ন কণ্ঠে যেন গর্জন করে উঠলেন, কিছুই যদি না নিবি হতভাগী, তবে কেন এসেছিলি আমার কাছে ? কাল থেকে আর আসিস না। তোর মুখ দেখতে চাই না আমি।'

মাধুরী দু'হাতে মায়ের সেই শীর্ণ দেহখানা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। নেবো নেবো, তুমি যা দেবে, আমি মাথায় করে নেবো।'

বলে, সেই খামখানা পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকাল। দারুণ উত্তেজনার পর মা নির্জীবের মত পড়ে রইলেন। বহুদিন পরে সেই রোগক্লিষ্ট মুখখানার উপর যেন একটা গভীর প্রশান্তির স্নিগ্ধ আভা ফুটে উঠল।

পরদিন মা যখন আবার একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মাধুরী তার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে আব্দারের সুরে বলল, 'তোমার কথা আমি শুনেছি। আমার একটা কথাও কিন্তু শুনতে হবে তোমাকে।'

মা খুশির সুরে বললেন, 'তোর কোন্ কথা আমি শুনতে বাকী রেখেছি মুখপুড়ি ?'

মাধুরীর কণ্ঠে গাম্ভীর্যের সুর বেজে উঠল—'তোমার ঐ টাকা আমার বিয়ের পেছনে খরচ করতে বলো না।'

'ওমা ! তবে কী করতে চাস ও দিয়ে ?'

'আমার যা ভালো বলে মনে হবে, তেমন কাজে যেন লাগাতে পারি, এই অনুমতি দিয়ে যাও।'

মা একটু কী ভাবলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, তাই করিস।'

মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর মাধুরী একদিন বাবাকে গিয়ে ধরল, 'বাবা আমি পড়বো। আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দাও।'

'ইস্কুলে ! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার মা।'

'টাকা আমি দেবো।'

'তুই কোথায় পাবি ?'

মাধুরী সেই খামখানা এনে তুলে দিল বাবার হাতে। তার পিছনে যে ইতিহাস, একটু একটু করে তা-ও সব খুলে বলল। ভূপতিবাবু নিঃশব্দে শুনে গেলেন, কিছুই বললেন না। কয়েকদিন পরেই মেয়েকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে বেথুন-ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পড়াশুনোয় সে বাড়িতেই অনেকখানি এগিয়ে ছিল। হেডমিস্ট্রেস মোটামুটি পরীক্ষা করে খুশি হলেন এবং একেবারে সবচেয়ে উপরের ক্লাসে নিয়ে নিলেন। পাশেই বোর্ডিং। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা হল।

পরের বছর স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল মাধুরী। ঢুকল কলেজে। তারপর এগিয়ে চলল এক ধাপের পর আরেক ধাপ……'

*　　*　　*　　*

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম সেই একটানা গুঞ্জনধ্বনি। সহসা ছেদ পড়তেই বলে উঠলাম, 'তারপর ?'

কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সার্কিট-হাউসের ড্রইংরুমে সেই ক্যাম্পখাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। ভোর হয়ে গেছে। চাকরবাকরদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শরীর ও মন দুই-ই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বেরোবার মত তৈরি হয়ে নিতে বেশ খানিকটা দেরি হল। ব্রেকফাস্ট-টেবিলে গিয়ে যখন বসলাম, অন্য সকলের ঐ পর্বটি তার আগেই শেষ হয়ে গেছে। বোধহয় বেরিয়েও পড়েছে যার যেখানে দরকার। 'বয়' এসে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। কোণের দিকের চেয়ার-খানা দখল করে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছি। একটি নারীকণ্ঠ কানে যেতেই চমকে উঠলাম। লম্বা ডাইনিং-হলের ওদিকের দরজা দিয়ে বলতে বলতে ঢুকলেন এক-জন মহিলা—'আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম। কী কাণ্ড বলুন তো। আমার জন্য সারারাত ঐ ড্রইংরুমের ক্যাম্পখাটে—। ছিঃ ছিঃ, আগে জানলে আমি ডাকবাংলো কিংবা—'

হঠাৎ থেমে গেলেন। আমার মাথার ভিতরকার শিরাগুলো যেন জট পাকিয়ে গেল। যাঁকে দেখছি, তিনি কি সত্যিই কোনো শরীরী প্রাণী, না গত রাত্রির স্বপ্নের ভিতর থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে ?

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। চোখে পড়ল স্থির পলকহীন দুটি নীলাভ তারা। একটু যেন ক্লান্ত।

পসারিনী

বংশীদাদুর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। পাড়ার লোক। যখন যাই, সেকালের গল্প শোনান। তারপরেই আসে আজকের দিনের সর্বগ্রাসী অভাবের কথা। সেদিন 'মুড্'টা একটু অন্যরকম ছিল। বললেন, তোমাদের কালে সব কিছুর আকাল পড়লেও, একটা জিনিস কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

বললাম, কী, বলুন তো ?

—রোমান্স্। ওখানে তোমাদের অঢেল সুযোগ !

—আপনারা বুঝি কোন সুযোগ পাননি ?

—রাম বল ! কোথাও কারো দর্শন পেলে তো ? কায়া দূরে থাক, ছায়া মাড়াবার সুবিধাটুকুও ছিল না। রবিঠাকুর বলেছেন, অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা। আমাদের কাছে গোটাটাই ছিল কল্পনা। একটা ঝুলন্ত বেণী কিংবা

একটি উড়ন্ত আঁচল দেখবার জন্যে হেদোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম—ওপারে কখন বেথুনের গাড়ি এসে থামবে।

আমি হেসে উঠলাম। বংশীদাদু বললেন, হাসছ? তা হাসবে বৈকি? মদনদেব দুহাতে প্রসাদ বিলাচ্ছেন তোমাদের, আমাদের কপালে এক কণাও জোটেনি। আমরা মরেছি উপোস করে, তোমরা করছ সুধাপান।

—সুধাপান!

—তা বৈকি? সঙ্গ-সুধা, বাক্য-সুধা, হাস্য-সুধা। বাকীগুলো না হয় না-ই বললাম।··আমাদের যুগটাই ছিল শুক্‌নো। চারদিকে শুধু অসহযোগ। তোমাদের সবটাই 'সহ'—স্কুল-কলেজে সহপাঠী, রাস্তা-ঘাটে সহযাত্রী, অফিসে ক্লাবে, আসরে, বৈঠকে সহকর্মী।

আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে চোখ নামিয়ে যোগ করলেন, তোমার খবর কী? একটি 'সহ' জোটাতে পারলে না?

—কই আর পারলাম।

—কেন, বাধাটা কোথায়? তোমার তো আবার ষোল আনার ওপর আঠারো আনা সুবিধে। মাথার ওপর বাপ-খুড়ো কেউ নেই, যে একটা কাউকে ধরে এনে গলায় ঝুলিয়ে দেবেন, আমাদের কালে যা হত। কলেজের গেট পেরিয়ে আসবার আগেই একটি নোলক-পরা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলে। তারপর সারাজীবন ধরে জাবনা খাও আর জাবর কাট। তোমার তো আর সে অবস্থা নয়। একেবারে ফাঁকা মাঠ। যেদিকে খুশি যত ইচ্ছে চরে বেড়াও।

গলা নামিয়ে চোখে একটি বিশেষ ইঙ্গিত করলেন, বলি, আটকাচ্ছে কোথায়?

একটু ইতস্ততঃ করে সত্যি কথাটাই বললাম, কি জানেন দাদু, ঠিক সাহস পাই না।

বংশীবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। পিলে চমকানো হাসি। সত্তরেও সাতাশের ঝড়। হাসি থামিয়ে বললেন, কেন, ভয়টা কিসের? ব্যাটাছেলে না?

আমি মাথা নীচু করে কানের পিছনটা চুলকোতে লাগলাম। উনি বললেন, ও তুমি বুঝি আশা করে বসে আছ, ঐ তরফ আগে এগিয়ে আসবে? আরে বোকা ছেলে, তাই কি কখনো হয়? **You have to break the ice,** তারপর দেখবে, সব সমস্যা জল হয়ে গেছে।

বংশীদাদু ঠিকই ধরেছেন। ও তরফ আপনা থেকে এগিয়ে আসবে, এতটা আশা না করলেও, এমন একটা কিছু ঘটবে, যা তাকে এগিয়ে আনবে বা এগোবার সুযোগ করে দেবে, এই ধরনের প্রত্যাশাই আমি মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। বড় রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ি। রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে গাড়িঘোড়ার ভিড় দেখতে দেখতে কতদিন মনে হয়েছে, ঠিক আমার দরজার সামনে এমন একটা অ্যাকসিডেণ্ট্ কি হতে পারে না, যার ফলে গাড়িটা দুমড়ে যাবে, সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ আরোহী সামান্য আঘাত পাবেন, আর তার অনাহত তরুণী কন্যা সাহায্যের আবেদন নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে উপরের দিকে? সেই নীরব আহ্বানে

আমি ছুটে যাব, সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব আমার এই দীনগৃহে স্বল্পক্ষণ বিশ্রাম নেবার। তাব চোখে ফুটবে খুশির ঝলক। বাবার পিছনে ধীরে ধীরে আমার এই ঘরটিতে এসে উঠবে, বিনয়ের ঘরে যেমন এসেছিল সুচরিতা, বৃদ্ধ পরেশবাবুর হাত ধরে, খুলে দিয়েছিল একটা নতুন জীবনের দ্বার।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চোখের উপর কত অ্যাকসিডেণ্ট দেখলাম। কিন্তু আমি যেমন চাই, তেমন একটাও কি ঘটতে নেই? সেকি শুধু উপন্যাসের জীর্ণ পাতায় কালির বন্ধনে বদ্ধ হয়ে থাকবে? একটিবার বাস্তবের আলোয় এসে বাঞ্ছিত রূপ নেবে না?

বটানীতে আমার কোন ঝোঁক নেই। গাছপালার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও নিজের মধ্যে কখনো অনুভব করিনি। তবু বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছি বটানিক্যাল গার্ডেনের জনবিরল রাস্তায়, ঝোপঝাড়ের আনাচে কানাচে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন উদ্যানের খালের ধারে নিঃসঙ্গ বেঞ্চি আশ্রয় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মশার কামড় খেয়েছি। কত লোভনীয় দৃশ্য চোখে পড়েছে, কত ঘননিবদ্ধ যুগল মূর্তির অভিশাপ কুড়িয়েছি। কিন্তু যার আশায় আমার এই অক্লান্ত অভিযান —একটি কোনো গুন্ডা-কবলিত-বিপন্ন-নারীকণ্ঠ—সেটা অপূর্ণই রয়ে গেছে। অথচ কেবল গল্প-উপন্যাস কেন, খবরের কাগজ খুলে দেখুন, এ রকম দুর্ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুধু যে-সব দিনে বা রাতে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেইগুলো বাদ দিয়ে।

"দুর্বৃত্তের হাত থেকে যুবতী উদ্ধার"—সংবাদের দিক থেকে ও অধ্যায়ের ঐখানেই শেষ। কিন্তু উদ্ধার যে করল, তার জীবনে ওটা একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। তাই নিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্য। আমি শুধু তার পাঠক হয়েই রইলাম, নায়কেব আসনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। এই ব্যায়ামপুষ্ট সবল দেহের পেশীগুলো কোন কাজে লাগল না।

কেবল ব্যায়াম নয়, অনেক যত্ন করে সাঁতারও শিখেছিলাম। একসময়ে অহিরীটোলা স্নানের ঘাটে ঘোরাঘুরি কম করিনি, ও-বিদ্যাটা অন্ততঃ যদি সার্থক করা যায়। একদিন সুযোগও জুটে গেল ঠিক জায়গায়। একসঙ্গে অনেকগুলো ভয়ার্ত কলকণ্ঠের টানে ছুটে গিয়ে দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে ঢেউ-এর দোলায় উঠছে-নামছে এক গোছা চুল। মা গঙ্গা বলে দিলাম ঝাঁপ! তীব্র স্রোত। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে কেশের সঙ্গে কেশিনীকে যখন টেনে তুললাম, তিনি দম নিয়েই বললেন, বেঁচে থাক বাবা। তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করবো।

তখনো আশা ছিল, কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া যদি কেউ সঙ্গে এসে থাকে। না, কেউ আসেনি। না আসুক, বাড়িতেও তো থাকতে পারে। বললাম কোথায় থাকেন আপনি?

—বেশী দূর নয় বাবা। ঐ বড় রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকে যে গলিটা, তাব তের নম্বর বাড়ি।

—চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না, বাবা, তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে একাই চলে যেতে পারবো।

—বাড়িতে কে কে আছেন ?

—কেউ নেই, বাবা। এক বুড়ি মা একেবারে অথর্ব্ব। চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না।

"অলকাপুরী রেস্টুরেণ্ট' আমার বাড়ির কাছে। অফিস থেকে ফিরে বিকেল বেলার চা-এর পাটটা পিসীমার ঘাড়ে না চাপিয়ে রোজই প্রায় ঐখানে সেরে নিই। বছর পাঁচেক ধরে আমি ওদের বাধা কাস্টমার। বিশ্বম্ভর দাস একাধারে মালিক ও ম্যানেজার। অতি অমায়িক লোক। টেবিলে টেবিলে ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নেন—"আর কিছু চাই স্যার। এক প্লেট রোস্ট মাটন ? একটা ফাউল কোবরেজি ?"

"কোবরেজি খেয়ে আবার কোবরেজ ডাকতে হবে না তো ?"

"কী যে বলেন স্যার ?" আকর্ণ দন্তবিকাশ করেন বিশ্বম্ভর, "মাল আমি নিজে দেখে কিনি! ঘি-মশলা হাণ্ড্রেড্ পার্সেণ্ট খাঁটি, আপনি নির্ভয়ে খান স্যার। অসুখ করলে আমি দায়ী।"

ঢুকেই বাঁদিকটা আগাগোড়া পুরু পরদা-টানা কাঠের পার্টিশান। ছোট ছোট খোপ। উপরে লেখা—"লেডিস্"; কিন্তু অমিশ্র লেডিস্ নেই কোনোটাতেই। সব মিক্স্ড্। বেশীর ভাগই আধাআধি মিক্শ্চার। কোথাও কিঞ্চিৎ হেরফের। জি ওয়ান, এল টু—জেণ্ট্ এক, লেডিস্ দুই।

আমি কেবিন-কাস্টমার নই, খোলা টেবিলের নিঃসঙ্গ খদ্দের। সেদিন কোনো কারণে (একটু পরেই সেটা জানা গেল) বেশ ভিড় ছিল অলকাপুরী রেস্টুরেণ্টে। একটি আসনও খালি নেই। চলে যাচ্ছিলাম। পড়ে গেলাম খোদ বিশ্বম্ভরবাবুর কড়া নজরে।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

ভর্তি ঘরের দিকে আঙুল তুলে বললাম, "ঘুরে আসি।"

"না না, ঘুরে আসবেন কী ?" বলে আমার বাহু ধরে নিয়ে গেলেন বাঁ তরফের শেষপ্রান্তে। একটা পরদা-খোলা খালি কেবিন দেখিয়ে বললেন, বসুন।

—ট্রেস্পাস্ হবে না তো ? যদি কেউ এসে পড়েন ? উপরের লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করলাম!

—আসে, তখন দেখা যাবে।

আমাকে ঢুকিয়ে বোধহয় অভ্যাসবশে পরদাটা টেনে দিতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, থাক, ওটা আর টানছেন কেন ?

—ও, তাই তো। আপনার তো আবার 'ও-সব' নেই। বলে মুচকি হেসে চলে গেলেন।

'বয়'গুলো সবই আমার চেনা। সেই প্রায় একই রকমের চেহারা, পোশাক তো এক বটেই—সাদা চাপকানের উপর লাল কোমরবন্ধ, মাথায় সাদা পাগড়ি, তার সামনে গোলাকৃতি পিতলের ফলকে লেখা—অলকাপুরী রেস্টুরেণ্ট।

তেমনি এক মূর্তি এসে সেলাম করে ময়লা মেনু-কার্ডখানা এগিয়ে দেবে, সেই অপেক্ষায় ছিলাম। তার বদলে যিনি এসে দাঁড়ালেন, দেখেই উঠে পড়ছিলাম। হাতের দিকে নজর পড়তে থেমে গেলাম। সেই বহু-পরিচিত মেনু কার্ড, কিন্তু সেলামের জায়গায় ছোট্ট একটি নমস্কার, তার সঙ্গে মিষ্টি হাসি। প্রতি-নমস্কার করতে ভুল হয়ে গেল। তা যাক। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার বক্তব্য বা কর্তব্য যে কী, তাও মাথায় এল না। হতভম্বের মত কার্ডধারিণীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

বিশ্বম্ভরবাবু এলেন ছুটতে ছুটতে, যেমন এসে থাকেন। ওর দিকে চেয়ে বললেন, "এখানে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে হবে না। এক প্লেট চিকেন্ স্যাণ্ডউইচ্ আর এক পট চা নিয়ে এসো।" সে চলে যেতেই ফিরলেন আমার দিকে। কাছে সরে এসে ঝুঁকে পড়ে গলা খাটো স্বরে বললেন, "এরকম দুটি রেখেছি। 'বয়' বলে তো ডাকা যাবে না। কি বলবো—এই গার্ল? সেটা বড় বিশ্রী শোনাবে। তার চেয়ে নাম ধরে ডাকাই ভালো। কি বলেন? ওর নাম শিউলি, শিউলি ঘোষ। ভদ্রঘরের মেয়ে। ভালো অবস্থা ছিল এক সময়ে। এখন —বুঝতেই তো পাচ্ছেন। কাস্টমারদের বলে দেবো মিস্ ঘোষ বলে ডাকতে। বেশ সুবিধায় পাওয়া গেছে। আর এদিকেও—দেখছেন তো?"

চোখের ইশারায় হল ভরতি ভিড়টা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বম্ভরবাবু। এতক্ষণে সেটা আরো ফেঁপে উঠেছিল। এরকম জমজমাট অবস্থা অলকাপুরী রেস্টুরেণ্টে কোনোদিন দেখা যায় নি।

"ওখানকার জন্যেই রাখা। কেবিনে ওরা কী করবে?" উপরের লেখাটার দিকে চোখ তুলে বললেন, "এরা আবার নিজের জাতটাকে একেবারেই সইতে পারে না! জানেন তো? ঠিক বেড়ালের মত। দেখা মাত্তর ন্যাজ ফুলে উঠল।" বলে হেসে উঠলেন। যাবার সময় বললেন, 'আপনি এবার থেকে এই কেবিনেই বসবেন। ঐ হট্টগোলে গিয়ে দরকার নেই।...আর ঐটি রইল।"

চোখ টিপে হাসি মুখে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে চলে গেলেন বিশ্বম্ভরবাবু।

আমি যখন যাই, কেবিন-কাস্টমারদের সেটা সময় নয়। তারা আসেন আরেকটু রাত করে। সুতরাং খালি খোপ পেতে অসুবিধা হয় না। বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা হোক আর না হোক, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে শিউলি এসে ঢোকে —হাতে স্যাণ্ডউইচের প্লেট্। রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার আসে চা এবং তার সরঞ্জাম নিয়ে। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। প্রথম ঢুকে নমস্কারটাও বাদ যায় না।

দিন তিনেক পরে আরো একটু সকাল সকাল গিয়ে পড়েছিলাম। 'হল' প্রায় খালি। কেবিন তো বটেই। শিউলি যথারীতি প্লেট রেখে চলে গেল। দ্বিতীয় দফায় যখন এল, ট্রেখানা নামিয়ে দিয়ে বলল, "চা'টা আমি করে দিই?"

এ কদিন শুধু হাসি দেখেছি, আজ প্রথম শুনলাম ওর কণ্ঠস্বর। হাসির মতই মিষ্টি। মুখখানাও বেশ। ভাসা ভাসা চোখ, গালদুটি তেমন ভরাট নয়

দ ...য। এতদিন চোখের ... দিয়ে দেখেছি, আজ চোখ তুলে
...ক্ত আছে ?

গা পাক দিয়ে ওঠে। অত

ঝি চা'এর সঙ্গে স্যান্ড-

চপ, কাটলেট, ফ্রাই,

ক সময় ভেবে ঠিক

...ত এদিক-ওদিক
া আপনি। কী
...টি চিবোচ্ছেন।
গন্ধ শুঁকলেই
বমি উঠে আসে। বিকৃত ক'র
মাথা ও কাঁধে একটু ...ল, আচ্ছা,
এবার থেকে আমি অ

সেদিন বাড়ি ফিরে ... ওলটাতে
ওলটাতে এর তার ... ত আমি
মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে ... নাশ্রিত
দেহের সুষম বিন্যাস ... বার,
চলবার বিশেষ ভঙ্গীটি, অ ... মনে
ভেসে উঠেছে, আমার কা ... শষ
মাধুর্যের সঞ্চার করেছে আম ... র
করতে পারি না। এর আগে ... তার ...
ছিল আলাদা। একটি ভদ্রঘরের যুবতী ...
সম্মানের মধ্যে লালিত হয়েছিল, আজ ... এসে
দাঁড়িয়েছে, দুটি অন্নের জন্যে দশজনকে হা... কুড়িয়ে
নিজেও দশের চোখে উচ্ছিষ্টের স্তরে গিয়ে ... ভেবেছি।
মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠেছে, কিছুটা ক্ষোভ জ... উপরে,

বড় বড় নেতাদের রাজনৈতিক অ্যাড্‌ভেনচারের উপরে, যার হতভাগ্য বলি এই শিউলি এবং তার মত আরো হাজার হাজার মেয়ে। ওর জন্যে দুঃখ বোধ করেছি, তার সঙ্গে খানিকটা সহানুভূতি। তার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু সেদিন আমার মনের গহনে আনন্দ-বেদনার যে দোলা লেগেছিল তার চেহারা আলাদা, সুর অন্যরকম।

আমি ওখানকার নিয়মিত খদ্দের এবং দৈনন্দিন বিলের অঙ্ক সামান্য বলে 'বয়'কে কোনো টিপ্‌স্‌ দিতাম না। পুজো এবং বড়দিনের সময় বকশিশ বলে থোক্‌ কিছু দিয়ে দিতাম। মুশকিল হল শিউলিকে নিয়ে। ওর বেলায় কী করবো? দিতে ইচ্ছা করে অথচ হাত সরে না। ওকে ঐ 'বয়'দের দলে ফেলতে পারি না। মনের কোথায় যেন খচ্‌ করে বেঁধে। প্রথম প্রথম নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—এটা আমার বাজে সেণ্টিমেণ্ট। আসলে তো সে একজন ওয়েট্রেস্‌—ঐ পাগড়ি-ওয়ালাদের চেয়ে আলাদা নয়। তাছাড়া লক্ষ্য করে দেখেছি, অন্যদের কাছ থেকে নেয়। গোড়াতে নাকি নিত না। তারপর বিশ্বম্ভরবাবু বলে দিয়েছেন, ওটা এ লাইনের দস্তুর, ওতে দোষ নেই, বরং না নিলে কাস্টমাররা অসন্তুষ্ট হতে পারে। এরপর থেকে আর আপত্তি করে না। বিশ্বম্ভরবাবুই কথায় কথায় বলেছিলেন আমাকে। সুতরাং আমার তরফ থেকে না দেবার কী কারণ থাকতে পারে? দিলে বরং ওর উপকারই হবে। টাকার ওর নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন। তা না হলে আসবে কেন এই হোটেলের চাকরিতে? আমি তাকে মনে মনে উচ্চাসনে বসালেই তো তার এই বর্তমান অবস্থাটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না। তার উপরে একটা অবাস্তব মর্যাদা আরোপ করে আমি বরং তার ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করছি।

এত করে নিজেকে বুঝিয়েও শিউলি যখন একখানা ডিসে করে কিছুটা মৌরি তার পাশে আমার বিল এবং দশ বা পাঁচ টাকা নোটের ভাঙানিটা ফেরত দিয়ে যেত, সেখানে একটা সিকি আধুলী কিংবা একখানা ছোট নোট ফেলে রাখতে কিছুতেই পেরে উঠিনি। 'সেদিনের' পর এটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অথচ কিছু একটা দেবার জন্যে মন তখন আরো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে যথারীতি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ 'অলকাপুরী'তে গিয়ে বসেছি, একটি সেই পুরনো 'বয়' এসে সেলাম করে দাঁড়াল। আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই বলল, উনি নেই।

"কোথায় গেছেন?" এ প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে যাবার পর খেয়াল হল যে, ওর কাছে এটা না করলেই হত। শুধু প্রশ্ন নয়, তার মধ্যে যে চমক ছিল তাও খুব অস্পষ্ট নয়। 'বয়' সহজভাবেই জানাল, দুদিন আসেন নি; বোধহয় অসুখ করেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কী খাবেন?

—অ্যাঁ! ও, আচ্ছা, স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ই নিয়ে এসো এক প্লেট।

আরো দুদিন পরে শিউলি এল! বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ। চোখের নিচে

কালি। পাতলা গণ্ড দুটি আরো খানিকটা ঝরে গেছে। হাসিতে সে দীপ্তি নেই।
খাবার প্লেটখানা সামনে রাখতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছিল ?
—জ্বরে ভুগলাম একটু।
—'একটু' বলে তো মনে হচ্ছে না।
—ইনফ্লুয়েঞ্জা কিনা। অল্পতেই কাবু করে ফেলে।
—আরো দুটো দিন বিশ্রাম নিলে হত না ?
—তাহলে কি চলে ?
আর কিছু বলবার আগেই সে চলে গেল। মনস্থির করে ফেললাম, আর কোনো দ্বিধা নয়, সামান্য কিছু সাহায্য ওকে করতেই হবে।
সঙ্গে খুচরো ছিল, তবু ইচ্ছা করেই দশটাকাব নোট দিলাম। ফেরত চেঞ্জটা যখন নিয়ে এল, পাঁচটাকার নোটখানা রেখে বাকীটা তুলে নিতেই সে বিস্ময়ে মুখ তুলে বলল, 'এটা যে পড়ে রইল ?'
আমি জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালাম।
'না, না, ছিঃ!' বলে, টাকাটা তুলে ক্ষিপ্রহাতে আমার হাওয়াই সার্টের বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে মাথা নিচু করে যেন ছুটে পালিয়ে গেল।
আমার অভিমানে আঘাত লাগবার কথা। দান যখন প্রত্যাখ্যানের ঘা খেয়ে ফিরে আসে, দাতার পক্ষে সেটা অসম্মান। কিছুমাত্র অন্যায় বা অস্বাভাবিক হত না, আমি যদি ভাবতাম, মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয় : অন্যের কাছ থেকে চার-আনা পয়সা কুড়িয়ে নিতে যাব বাধে না, আমার দেওয়া পাঁচটা টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেল সে কোন্ সাহসে ? কিসের অহঙ্কার তার ? যত মান, সব চাড়া দিয়ে উঠল বুঝি কেবল আমার বেলায় ? কেন ? আর সকলের চেয়ে আমি ছোট হলাম কিসে ?
কিন্তু কি আশ্চর্য। এসব কথা একবারও আমার চিন্তায় এল না। তার বদলে ভারী একটা খুশির সুর সারা মনে গুঞ্জরণ করে বেড়াতে লাগল। ভাবতে ভাবতে গেলাম, অপরের সঙ্গে এইখানেই তো আমার পার্থক্য। তাদের কাছে শিউলি বা 'মিস্ ঘোষ' একজন ওয়েট্রেস্ মাত্র, আমার কাছে ওর আলাদা পরিচয়। অন্য সকলের কাছ থেকে অনায়াসে হাত বাড়িয়ে টিপ্স্ নিতে পারে ; কেননা, তাদের সঙ্গে সেইটুকুই ওর সম্পর্ক। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন স্তরের। তারই স্বীকৃতি রয়ে গেছে ঐ নোটখানা ফিরিয়ে দেবার মধ্যে। ওতে করেই সে নীরবে জানিয়ে দিয়ে গেল, তার চোখে আমি এই হোটেলের একজন কাস্টমার মাত্র নই, বহুজনের মধ্যে এক বিশেষ জন। অনেকের মধ্যে একক ও অনন্য।
সলজ্জ নতমুখে তার সেই পালিয়ে যাবার দৃশ্যটা মনে পড়ল। তার আগে অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে নোটখানা আমার বুকে গুঁজে দেওয়া। প্রথম স্পর্শের সেই শিহরণটুকু বাড়ি পেঁছিবার পরেও আমার রক্তের স্রোতে দোলা দিতে লাগল।

আগে আগে কাজ-কর্মের চাপে আফিস থেকে বেরোতে যেদিন দেরি হয়ে

যেত, চা-এর ব্যাপারটা কাছাকাছি কোন রেস্তোরাঁয় সেরে নিয়ে বেড়িয়ে টেড়িয়ে বাড়ি ফিরতাম। ইদানীং কয়েক মাস ধরে, (শিউলি আসবার পর থেকে) যত বিলম্বেই হোক প্রত্যহ একবার অলকাপুরীর পৃষ্ঠ-পোষণ আমার কাছে একটা 'মাস্ট্' অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কোনো দিন মনে মনে 'আসব না' স্থির করেও কখন অন্যমনস্ক হয়ে এসে পড়েছি, টের পাইনি। অনেকটা যেন নেশার ঘোর।

এমনি একদিন। আফিসের ছুটির পর অন্য দু-একটা কাজ সেরে ওখানে এসে যখন পৌঁছলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে। 'হল' তো ফাঁকাই, কেবিনপার্টিও বড় একটা নেই। লাইনের শেষে যে খোপটাতে আমি সাধারণতঃ বসে থাকি, খালি পড়ে আছে। সেইখানেই ঢুকলাম। তার ঠিক পরেই বিশ্বম্ভরবাবুর 'আফিস', যেখানে বসে তিনি বিল তৈরি করেন, টাকা নেন, লোকজনের নির্দেশ দেন। একটা চাপা ধমকের সুর কানে এল—তাই বলে খদ্দের ডাকলে তুমি যাবে না ?

—যাবো না বলেছি নাকি ? (শিউলির গলা। নরম, কিন্তু ক্ষুব্ধ) কিন্তু উনি তো নতুন অর্ডার দেবার জন্যে ডাকেন না।

—তবে কী জন্যে ডাকেন ?

শিউলি উত্তর দিল না। বিশ্বম্ভরবাবু আর একটা ধমক দিলেন, বল।

—গেলেই অমনি পর্দাটা টেনে দেন। তারপর যত সব বাজে গল্প।

একটি নারী-কণ্ঠ খিল খিল করে হেসে উঠল। দ্বিতীয় ওয়েট্রেস। তার মন্তব্যও শোনা গেল—"কি জানেন স্যার ? পংকজবাবু ছাড়া আর কাউকে ওর পছন্দ নয়।"

নিজের নাম কানে যেতে, এবং ঐ রকম টিপ্পনি সমেত, আমি রীতিমত উৎকর্ণ হলাম। এবার ধমকে উঠল শিউলি—"তুই চুপ কর। তিনি কখ্খনো পর্দা টেনে দেন না, বাজে কথাও বলেন না।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, কিন্তু সবাই তো একরকম নয়। মদনলাল যদি পর্দা টানতে চায়, আমি 'না' বলি কেমন করে ? তাছাড়া, ওরকম শাঁসালো কাস্টমার আমি হাতছাড়া করতে পারি না। ওকে চটানো চলবে না। যাও…।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম ; যাতে করে শিউলি যদি এসে পড়ে, মনে করবে, আমি এইমাত্র এসে ঢুকেছি। কিন্তু সে এদিকে এল না। একদিক দিয়ে ভালই হল। আমি কোন শব্দ না করে পা টিপে টিপে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলাম।

তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফেরা হল না। খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ্য রইল অলকপুরীর গেটের দিকে। শিউলিকে এ জীবন থেকে উদ্ধার করতে হবে, এটুকু সেই মুহূর্তেই মনে মনে স্থির করে ফেললাম। কী করে—সেটা তখনো ভেবে উঠতে পারিনি। তার আগে তার সঙ্গে একান্তে দেখা হওয়া দরকার। তার সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। বালিগঞ্জ স্টেশন ছাড়িয়ে কসবা অঞ্চলে কোথায় যেন থাকে, বাপ কিছুদিন আগে মারা গেছেন, মা আর

দুটি ছোট ছোট ভাই নিয়ে সংসার, তারা স্কুলে পড়ে, ওর উপরেই সব, সেইজন্যে ক্লাস নাইন্ পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে রোজগারের ধান্দায় নামতে হয়েছে, প্রথমটা মনস্থির করতে পারেনি, মায়েরও আপত্তি ছিল, পরে বাধ্য হয়েই—ইত্যাদি ; মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একদিন গিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসব। ওকে অবশ্য বলিনি. কিন্তু আজ কাল করে এতদিন হয়ে ওঠেনি। এবার আর দেরি করা চলে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হল। তারপর দেখলাম, শিউলি বেরোচ্ছে। সঙ্গে আরেকটা মেয়ে, ওর সেই সহকর্মী। দুজনে গল্প করতে করতে আমার দিকেই এগিয়ে এল। আমি একটা বকুল গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিলাম এবং ওদের বেশ খানিকটা সামনে রেখে ধীরে ধীরে অনুসরণ করলাম। দূর থেকেই দেখলাম একটা বাস এসে দাঁড়াতেই দুজনে উঠে পড়ল।

পরদিন বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ রইল না। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে রেস্টুরেণ্টের সেই কেবিনে গিয়ে ঢুকতেই ও এল। পাখাটা খুলে দিয়ে হালকা সুরে বলল, কাল আসেননি যে বড় ?

—তোমার ছুটি কটায় ?

শিউলি একটু চমকে উঠল। প্রশ্নটাই যে শুধু অসংলগ্ন এবং আকস্মিক তাই নয়, আমার হাবভাবটাও ছিল রীতিমত গম্ভীর। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন বলুন তো ?

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা ?

তখনো ওর কন্ঠে বিস্ময়।

বললাম, এখানে হবে না। তার জন্য সময় চাই।

এবার ধীরে ধীরে ওর পুরু পুরু ঠোঁট দুখানায় একটি চাপা হাসি ফুটে উঠল। বলল, বসুন আপনার খাবার নিয়ে আসি।

হাসিটি অর্থপূর্ণ। শুধু যে অস্বস্তি বোধ করলাম, তাই নয়, সম্মানবোধেও আঘাত লাগল। আমার সম্বন্ধে কী ভাবল শিউলি ! তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এর জন্যে সে দায়ী নয়, দায়ী তার এই চাকরি, এই পরিবেশ। তার দৃষ্টি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বদলে দিচ্ছে এই জীবন, যার ফলে আমি আর মদনলাল ওর কাছে সমপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

খাবারের প্লেট নিয়ে যখন এল তখনো ওর অধরসীমায় সেই হাসিটি লেগে আছে। জানতে চাইল—বলুন, কোথায় যেতে হবে। দশটায় আমার ছুটি, বেরোতে ধরুন আরো মিনিট পনর।

বললাম, বেশ ঐ সময়ে আমি ঐ বকুল গাছের তলায় থাকবো।

—বকুলতলায় ? না, ওটা বড্ড কাছে হয়ে গেল। এখান থেকে কে আবার দেখে-টেখে ফেলবে। তার চেয়ে রাস্তার ওপারে যে পার্কটা আছে, সেখানে কেমন হয় ?

হাসিটা এবার মনে হচ্ছিল ফেটে পড়বে। একবার ভাবলাম ওর এই ভুলটা

ভেঙে দিই। কিন্তু তাতে করে হয়তো কোথাও আঘাত দিয়ে বসব, এই ভয়ে নিরস্ত হলাম। বললাম, বেশ ঐ পার্কেই থাকবো।···আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

—কী?

চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল।

বললাম, আর একটু সকাল সকাল বেরোতে পার না? এই ধর নটা, সাড়ে নটা?

—তা বোধ হয় পারি। দাঁড়ান, বলে দেখি।

খালি প্লেট কুড়োতে এসে জানিয়ে গেল, সাড়ে নটাতেই ছুটি পেয়েছি।

ছোট পার্ক। লোকজন হিসেব নেই। গেটের পাশে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে ভাবছিলাম, কী ভাবে শুরু করলে সহজেই ও আমার মনের কথাটা বুঝতে পারবে। আমার মোটামুটি জানা ছিল, যারা সব কিছু হারিয়েও হার মানতে চায় না, তারা বড় স্পর্শকাতর। কথায় কথায় তাদের অভিমান আহত হয়। অনাহূত উপকারকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। সুতরাং—

শিউলি এল প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে, 'ও, আপনি এখানে?' বলে ধপ করে আমার পাশটিতে বসে পড়ে বলল, বাব্‌বা, ম্যানেজারটা কি ঘুঘু! ছাড়তে কি আর চায়? 'কী অসুখ তোমার মার? কদ্দিন হল? কই, আগে তো শুনিনি'—জেরার চোটে অস্থির!

—মায়ের অসুখ বলে ছুটি নিলে বুঝি?

—তাছাড়া আর কি বলবো? আমাকে অমুকবাবু ডেকেছেন? বলে হেসে গড়িয়ে গেল তারপর তেমনি চটুল সুরে বলল, তাহলে কিন্তু বেশ মজা হত। একেই তো ওরা মনে করে—

হঠাৎ থেমে গেল। একটুখানি অপেক্ষা করে বললাম, কী মনে করে ওরা?

—মনে করে, আপনি আমাকে—যান, সে-সব আমি বলতে পারবো না।

আমি গম্ভীর হলাম, শোনো শিউলি, তোমাকে এ চাকরি ছাড়তে হবে।

—কেন!

সে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

—এ নরকে তোমার একটা দিনও থাকা চলবে না।

আমার কণ্ঠের প্রস্ফুট আবেগ আমি নিজের কানেই টের পেলাম, শিউলির কাছেও লুকানো রইল না। কিন্তু তার স্বর শান্ত ও নিরুত্তাপ—তাহলে চলবে কি করে?

—সে ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও!

শিউলি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। তারপর তেমনি ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনি তো জানেন, আমি একা নই। আমার মা আছে, দুটো ছোট ছোট ভাই আছে।

—জানি, সব জেনেই বলছি। তোমার জন্য আমি অন্য কাজ ঠিক করে দেবো।

—কী কাজ ?

—যে কাজে ভদ্রঘরের মেয়েরা সম্মান বাঁচিয়ে চলতে পারে। এই যেমন ধর স্কুল টীচার কিংবা কোনো অফিসের চাকরি।

—এই বিদ্যে নিয়ে !

আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, যেন এমন একটা প্রস্তাবকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো ভাবেই নেওয়া যায় না। ঐ প্রসঙ্গে আরো কি বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম, দরকার হলে সব বিদ্যেই ঝালিয়ে নেওয়া যায়। সে ভাবনা আমার। তোমাকে তো তার জন্যে মাথা ঘামাতে বলছি না। তুমি শুধু চলে এসো।

শিউলির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ঘন হয়ে এল গাম্ভীর্যের ছায়া। আমি আরো কিছুক্ষণ ভাবতে দিলাম। ওর একটা হাত অলসভাবে বেঞ্চির উপর পড়ে ছিল। আরেকটু কাছে সরে এসে তার উপর মৃদু চাপ দিলাম। ও হাত সরিয়ে নিল না। তেমনি বসে রইল। সেই আনত মুখের দিকে চেয়ে ডাকলাম, শিউলি।

—বলুন।

—আমার যা বলবার তা তো বলেছি। এবার তুমি বল।

—আজ থাক।

—বেশ। কিন্তু তোমার মায়ের কাছেও তো আমাকে যেতে হবে। সে কাজটা আজই সেরে ফেললে কেমন হয় ?

এ প্রশ্নেরও ঐ একই উত্তর দিল শিউলি, আজ থাক, আরেকদিন নিয়ে যাবো।

বাড়ি ফিরে দেখলাম দেশ থেকে আমার এক আত্মীয় এসেছেন ! মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তাঁর কিছু কেনাকাটা ছিল। পর পর তিনটি বিকেল সেই কাজে দিতে হল। চতুর্থ দিন 'অলকাপুরী'তে পা দিয়ে প্রথমেই খোদ বিশ্বম্ভরবাবুর কবলে পড়ে গেলাম !

—এই যে আসুন। কদিন দেখতে পাইনি তো।

—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। সময় করে উঠতে পারিনি। আপনার খবর সব ভালো ?

—আর ভালো ! সেই মেয়েটা ভেগেছে।

—কোন মেয়েটা ?

—শিউলি।

একটু সময় গেল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বললাম, কেন ?

—তা কি বলে গেছে যে জানবো ? কোথায় নাকি অন্য কাজ পেয়েছে। নেমকহারাম আর কাকে বলে ? বলতে বলতে আর একজন কাউকে গিয়ে ধরলেন।

একবার ভাবলাম, চলে যাই। কিন্তু দরজার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে

পড়াটা বড় বেশী চোখে পড়বে বলে ধীরে ধীরে সেই কেবিনটায় গিয়ে বসলাম ! হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল। আজ আর সে আসবে না ! কেন গেল ? একবারটি বলে গেলে এমন কি ক্ষতি হত ?

'বয়'দের মধ্যে কাউকে আশা করছিলাম। এল সেই ফাজিল মেয়েটা। দু-চোখে দুষ্টুমি ভরা হাসি। যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে বলল, শিউলি নেই কিনা ? ম্যানেজারবাবু আমাকে পাঠালেন। কী খাবেন বলুন।

—নিয়ে এসো যা হোক কিছু।

'অলকাপুরী'তে সেটাই আমার শেষ সন্ধ্যা। ভেবে দেখলে তার কোন কারণ ছিল না। বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। লোকটি সত্যিই ভালো। আমাকে ভালোবাসতেন। তবু সেখান থেকে চিরদিনের মত স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করে নিলাম।

আঘাত ? হ্যাঁ, তা কিছুটা পেয়েছিলাম বৈ কি ? তার চেয়েও বেশী ছিল লজ্জা, পরাজয়ের গ্লানি। প্রধানতঃ সেই কারণেই বংশীদাদুকে কিছুই বলি নি।

কালক্রমে অর্থাৎ মাস কয়েকের মধ্যে আঘাত ও লজ্জা দুইই কাটিয়ে উঠলাম। একটা প্রশ্ন শুধু রয়ে গেল মনের কোণে—কোথায় কী অমূল্য সম্পদ সে পেয়েছে, যার কাছে, আমি যা দিয়েছিলাম দিতে চেয়েছিলাম, সব তুচ্ছ হয়ে গেল ?

নানা কাজের ফাঁকে, বিশেষ করে মনটা যখনই ফাঁকা লাগত, ঐ প্রশ্নটা কোথা থেকে এসে জুড়ে বসত। এমনি একদিন। চৌরঙ্গীর পশ্চিম ফুটপাত ধরে ধীরে ধীরে চলেছিলাম দক্ষিণ মুখে। ইচ্ছা ছিল, আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ট্রাম ধরবো। হঠাৎ খুব কাছে মোটরের ব্রেক কষবার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠের ডাক—"হ্যালো পঙ্কজ"……। চমকে উঠলাম। বাল্যবন্ধু অমল। এক সঙ্গে কলেজে ঢোকা এবং বেরোনো, তার কিছুদিনের মধ্যেই বড় চাকরি নিয়ে শ্রীমানের রাজধানীতে প্রস্থান। তারপর আর দেখা হয়নি।

নেমে আসতেই বললাম, তুই ?

—বদলি হয়ে এলাম তোদের পুরনো পচা কোলকাতায়।

—**The old hag who at once attracts and repels.**

"চমৎকার বলেছিস।" আমার পিঠে একটা দারুণ চাপড় মারল অমল, "এখান থেকে একশ গুণ ভালো ছিলাম, তবু যখন তখন মনটা কেবল কোলকাতা কোলকাতা করত। এ যেন ডাইনীর টান।"

দুজনেই হেসে উঠলাম—সেই ছেলেবেলাকার উদ্দাম হাসি। তারপর অমল বলল, এদিকে কোথায় চলেছিলি ঘাড় গুঁজে ? মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনটে মেয়ের বিয়ে আসন্ন।

—বাড়ি যাচ্ছিলাম।

—হেঁটে, হেঁটে !

—ট্রাম, বাস-এ ওঠা যায় নাকি ?

ঠিক সামনেই ভীষণ গর্জন করে একটা বাস যাচ্ছিল। তার দুটো গেট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা একরাশ তালপাকানো ঝুলন্ত সার্ট প্যান্ট শাড়ির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ও, তা বটে।···উঠে পড়।

—কোথায় ?

—গাড়িতে, আর কোথায় ?

—তুই তো চলেছিলি উল্টো দিকে।

—আহা, ওঠ তো, তারপর দেখা যাবে, কোনদিকে যাই।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অমল বলল, চল, আগে খানিকটা মার্কেটিং সেরে নিই।

—কি কিনবি ? শাড়ি ?

—না ভাই, সে ভাগ্য আর হল কৈ ?

—তা বুঝেছি। তাহলে একখানা বিশেষ খামের চিঠি অন্ততঃ পাওয়া যেত।

—তোর চিঠিও যখন পাইনি, বোঝা যাচ্ছে, আমরা এখনো এক গোয়ালেই আছি।—আচ্ছা এবার নেমে পড়।

একটা অত্যন্ত জমকালো দোকানের সামনে এসে গাড়ি থামল। বাইরে থেকেই দেখা যায় লম্বা কাউণ্টারের ওধারে থাকে থাকে সাজানো নানা রংএর গরম কাপড়। অমল বলল, একটা স্যুট করাতে হবে।

—তা, আমি গিয়ে কি করবো ?

—কেন, কাপড় পছন্দ করবি। রোমাণ্টিক টেম্‌পারমেণ্টের লোক ; তোদের নজরই আলাদা। কাল একবার এসেছিলাম। পুরো স্টক ছিল না। আজ আনিয়ে রাখবে বলেছে।

—চেনা দোকান বুঝি ?

—না ; তবে প্রোপাইটর লোকটা খুব ভাল। তাছাড়া আর একটা **attraction** আছে।

—কী ?

—গেলেই দেখতে পাবি !

দোকানে ঢুকতে না ঢুকতেই একজন অবাঙালী ভদ্রলোক সাদর ও সরব অভ্যর্থনা জানালেন—আইয়ে সাব্, আপ্‌কা মাল আ গিয়া।

অমল আমার পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বিশেষ বন্ধু পঙ্কজ গুহ।

নমস্কার বিনিময় হল। উনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, কুথায় আপনাকে দেখিছি বলুন তো।

আমি চিনতে পেরেছিলাম। চেপে গিয়ে বললাম, আমি তো ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

হাঁ, হাঁ, জরুর দেখেছি···বলতে বলতে উনি আমাদের নিয়ে কাউণ্টারের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। অনেকে কেনাকাটা করছেন। স্ত্রী পুরুষ দুইই আছে। সকলেই সম্ভ্রান্ত বেশী। ওপার থেকে যারা কাপড়ের ভাঁজ খুলে মেলে ধরছেন ক্রেতাদের সামনে, তাদের মধ্যেও দু একটি মহিলা চোখে পড়ল। সান্ধ্য পোশাকে ফিটফাট। অভিজাত বিপণির আধুনিক **sales girl**, নতুন আমদানি

হয়েছে কোলকাতায়।

একেবারে শেষপ্রান্তে একটি মহিলা পিছন ফিরে র‍্যাকের উপর থানগুলো গুছিয়ে রাখছিলেন।

"Here is our old friend. কাল তুমি ওঁকে খুশী করতে পারনি। আশা করি আজ জরুর পারবে"—বলতে বলতে মালিক ভদ্রলোক ওপাশে আবার কাকে নিয়ে পড়লেন। মহিলাটি হাসিমুখে এদিকে ফিরতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা যেন দপ্ করে নিভে গেল। সেই ত্রস্ত চকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে অমলও আমার দিকে তাকাল। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

কয়েকটিমাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। তার পরেই আবার ফিরে এল সেই মন ভোলানো হাসি, সেই মধুঢালা কণ্ঠস্বর—বলুন, কী দেবো।

বিদ্যুৎচমকের মত আমার স্মৃতির ফলকে জেগে উঠল, আর এক জায়গায় কিন্তু একই সুরে বলা, একই প্রশ্ন—বলুন কী দেবো।

অমলের উত্তরটাও প্রায় সেই একই তারে বাঁধা—আমি কি জানি, কী দেবেন?

—বেশ, তাহলে পছন্দের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি যা দেবো তাই নিতে হবে কিন্তু।...

পিছন ফিরে থান বাছতে লাগল। সেই সুযোগে আরেকবার দেখে নিলাম। সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে স্বাস্থ্য, তার সঙ্গে বেশ-বাসের জলুস।

আমার অবস্থা হল—ন যযৌ ন তস্থৌ। চলে আসতে পারি না, অমল কী ভাববে; দাঁড়িয়ে থাকা আরো কঠিন। একেবারে চুপ করে থাকাটাও বিসদৃশ। বাধ্য হয়ে হাঁ, হুঁ করে অমলের কথায় সায় দিয়ে গেলাম।

খানিকটা বাছাবাছির পর কাপড় কেনা হল।

বেরোবার সময় আবার নমস্কার বিনিময় হল মদনলাল শেঠের সঙ্গে।

গাড়িতে এসে অমল জানতে চাইল, এ দোকানে আসিস নাকি মাঝে মাঝে?

—ক্ষেপেছিস! এখানে আমি কী করতে আসবো?

—চেনা বলে মনে হল যেন। অথচ দু পক্ষেই কি রকম—কথাটা শেষ না করেই আমার দিকে তাকাল। আমি চুপ করে রইলাম।

—বলতে বাধা আছে কিছু?

—আর তর্ সইছে না! তুই দেখছি, মেয়েদেরও হার মানাস!

—থাক, তোর যদি আপত্তি থাকে—

—না রে, না। কী শুনতে চাস, বল।

—তার আগে চল কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। যাই বলিস, খালি পেটে এসব ব্যাপার জমে না!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি রেখে মাঠের মাঝখানটায় গিয়ে মুখোমুখি বসা গেল। শীতের প্রথম। আবহাওয়াটি মনোরম। শুধু অমলের আগ্রহ নয়, নিজের ভিতর থেকেও একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। একজন কাউকে বলতে পারলে অনেকটা যেন হালকা হওয়া যায়। সেদিক দিয়ে অমলের জুড়ি নেই। আমাকে ও যেমন চেনে, যেমন বুঝবে তেমন আর কেউ নেই; যদিও

মনের চেহারায় ইংরেজিতে যাকে বলে **temperamentally**, আমরা দুজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। যতদিন দেখেছি, রোমান্সের বাষ্পও কোনদিন ওর মনের কোণে ছায়া ফেলেনি। নারী-জগৎ সম্বন্ধে মোহ দূরে থাক, সামান্য কৌতূহলও কোনো-কালে ছিল না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীটা নিঃশব্দে শুনে গেল। ঠিক নিঃশব্দে নয়, মাঝে মাঝে দু একটা জিজ্ঞাসা। তারপর দুজনেই চুপ। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বার সামান্য আওয়াজটুকুও যেন শোনা যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমন ভাবে বলল, চল, এবার ওঠা যাক!

দুজনে পাশাপাশি চলেছি। গাড়ির কাছাকাছি এসে অমল বলল, কী ভাবছিস?

—কই, কিছু না তো।

—দ্যাখ, আমি কিন্তু মেয়েটাকে কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না। ও তোর মত নয়, খাঁটি এ যুগের লোক, যাদের কাছে প্রেমের চেয়ে অনেক বড় প্রয়োজন।

তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে না পারলেও পরে মনে হয়েছে, অমল বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছিল।

পা

জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। জ্বলে-যাওয়া ধোঁয়াটে আকাশের কোনো কোণে এক টুকরো মেঘও চোখে পড়ে না। সারা দিন ধরে চলেছে কেবল অগ্নিবৃষ্টি।

অবিনাশ সমাদ্দার মহকুমা শহর বনগাঁ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মোকদ্দমা ছিল। হালদারদের সঙ্গে জমির আইল নিয়ে বিরোধ। পাঁচ-ছ' বছরে একটু একটু করে প্রায় একহাত চওড়া জায়গা—লম্বায় চল্লিশ হাতের কম নয়, তারা নিজেদের জমির শামিল করে নিয়েছে। অনেকবার প্রতিবাদ করেছেন সমাদ্দার। গ্রাহ্য করেনি। বাধ্য হয়েই মামলা দায়ের করতে হয়েছে। এই সবে শুরু: ফয়সালা হতে কতদিন লাগে কে জানে? এখন শুধু তারিখে তারিখে খরচান্ত।

বেরিয়েছিলেন সূর্য উঠবার একটু পরেই। পাকা পাঁচ-ছ' ক্রোশ পথ। সূর্য এখন মাথার উপর। সামনে মস্তবড় মাঠ, পাড়ি দিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। চলতে চলতে ফসলের অবস্থা দেখছিলেন সমাদ্দার। আউশের আশা খুবই কম। গাছ বাড়েনি, ঝাড় বাঁধেনি, পাতাগুলো কুঁকড়ে গেছে। পাটও যাবার মধ্যে। শীর্ণ কাঠির মত গাছগুলো রোদে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। এই দুটি ফসলের উপরেই তাঁকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়।

বাড়ি পৌঁছতেই সোদামিনী রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে বারান্দায় জলচৌকি পেতে দিলেন। আঁচল দিয়ে তার উপরটা মুছতে মুছতে মেয়েকে ডেকে বললেন, সরি, শীগ্‌গির তামাক দিয়ে যা।

—সরি কেন, ছাতাটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বললেন অবিনাশ, নবাব-পুত্তুর কোথায় গেলেন ? না, তাঁর বুঝি মান খোয়া যায় এক ছিলিম তামাক সাজতে।

—সে বাড়ি নেই।

—ও ; তা, কোন্ সফরে বেরিয়েছেন, শুনি ?

উত্তর না পেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুললেন। তিনি আর কিছু না বলে মাথা নীচু করে বাতাস করে চললেন।

জ্বলন্ত কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে সরমা এসে দাঁড়াতেই সৌদামিনী পাখাখানা মাটিতে রেখে দিয়ে বললেন, তামাকটা দিয়ে একটু বাতাস কর তো মা। আমি যাই। তরকারীটা চড়িয়ে এসেছি, বোধহয় পুড়ে গেল।

অবিনাশ মেয়ের হাত থেকে কলকে এবং কোণ থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে বললেন, ব্যাপার কী ? তোর মা তো দেখছি কথাটা কানেই তুলল না।

—দাদা মধুখালী গেছে।

—মধুখালী ! কেন ?

—সবকার বাবুরা 'হায়ার' করে নিয়ে গেছে।

—কী করে ? হুঁকো থেকে মুখ তুলে কপাল কুঞ্চিত করে রুক্ষস্বরে জানতে চাইলেন অবিনাশ। কথাটা ঠিক ধরতে পারলেন না।

সরমা ভয়ে ভয়ে দাদার হয়ে যতটা সম্ভব কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করল, ওঁরা নতুন টীম করেছেন কিনা। দাদা যেতে চায়নি। বিজয় সরকার নিজে এসে এক-রকম জোর করে—

—ধরে নিয়ে গেছে, মেয়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বাকীটুকু পুরিয়ে দিলেন সমাদ্দার, তার সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে যোগ করলেন, আমি তামাক খেতে চাই নি, ওরা এসে জোর করে আমার মুখ দিয়ে খেয়ে গেছে।

বলেই হুঁকো ফেলে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। কল্কের আগুন হঠাৎ মাথায় গিয়ে চড়ল। মেয়ে ততক্ষণে সরে পড়েছে। অবিনাশ তারই উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, তোর মাকে বলে দে সরি, ফের যদি তার আদরের নন্দনকে বাড়ি ঢুকতে দেখি, সোজা ঘাড় ধরে বের করে দেবো। বুড়ো বাপ খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরবে, আর লাটসাহেব ফুটবল খেলে বেড়াবেন ! বেশ তো তিন বেলা খ্যাঁটের ব্যবস্থা ঐ ফুটবলওয়ালারাই করে দিক না ! আমি এখানে বিনি পয়সার হোটেল খুলিনি। ইত্যাদি।

সরিকে কিছুই বলতে হল না ; হলে পারত না। যার শোনবার, তিনি রান্না-ঘরে বসে স্বকর্ণেই সব শুনলেন। শুধু আজ নয়, প্রায়ই শুনতে হয়। উত্তর দেন না। দিলে কর্তা আরো জ্বলে ওঠেন, মুখে আর তখন রাশ থাকে না। আগে আগে বার কতক এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে গেছে। ছেলে দু-একবার রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের ধরে খুঁজে পেতে আনতে হয়েছে। লোকে হাসাহাসি করে। ইদানীং তাই সৌদামিনী চুপ করেই থাকেন। তবে ছেলেকে বোঝাতে কসুর করেন না। একুশ বছর বয়স হল।

গেরস্তের ছেলে, এখন কি আর বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালে চলে ? বুড়ো বাপ। পেছনে দাঁড়াবার আর কেউ নেই। সামান্য কয়েক বিঘা জমি ; খাওয়া-পরাটা কোনোরকমে চলে যায় এই পর্যন্ত। বাড়তি আয় বলে কিছু নেই। এদিকে মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। এখনই না হোক দু-তিন বছরের মধ্যে পার করতে হবে। সে কথাটাও তো একবার ভাবা উচিত। কিন্তু রমেন কোনো কিছুতেই কান দেয় না। মুখে যদি বা ভরসা দেয়—হবে, হবে—বন্ধুদের আড্ডায় ঢোকা মাত্র সব ভুলে যায়।

রমেন সমাদ্দার এ-অঞ্চলের নামকরা সেণ্টার ফরোয়ার্ড। যখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ে, তখন থেকেই। পাছে অন্য স্কুলে চলে যায়, এই ভয়ে হেডমাস্টার ক্লাস-প্রমোশন বন্ধ করেন নি, যদিও কোনো পরীক্ষাতে সে পাশ-নম্বর পায় নি। এমন কি টেস্টে ফেল করা সত্ত্বেও অ্যালাউ করে দিয়েছিলেন ! বিশ্ববিদ্যালয় তার ফুটবল-বিদ্যার খবর রাখত না, রাখলেও তার জন্যে কোন গ্রেস্‌মার্কের ব্যবস্থা করে নি। সুতরাং ম্যাট্রিকে গিয়ে ঘায়েল হল। কিন্তু 'গঙ্গারামের' মত উনিশটি বারে'র সুবিধা তাকে দেওয়া হল না, দু'বারেই থামতে হল। ফুটবল অবশ্য থামল না। ইস্কুল থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেয়ে খেলার মাঠেই তখন প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল।

অবিনাশ আবাব ফুটবলের নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠতেন। ঐ জন্যেই যে ছেলেব লেখাপড়া হল না, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। স্ত্রীকে বলতেন, হতভাগাটা পাশ করবে কী ? ঐ বলের গুঁতোয় মাথার সব ঘিলু জমাট বেঁধে গেছে। সেখানে কিছু ঢুকলে তো ?

তিনি শুনেছিলেন ছেলের দুটো পা-ই শুধু চলে না, মাথাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। হেড করতে তার জুড়ি নেই।

সেদিনই সন্ধ্যার কাছাকাছি রমেন ফিরে এল। হাঁটবার মত অবস্থা ছিল না। সরকারবাবুরা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত আসে না। দুজন বন্ধু সঙ্গে ছিল। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। অবিনাশ বেরিয়েছিলেন। মেয়ের ডাক শুনে সৌদামিনী পুকুরঘাট থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। বাঁদিকের হাঁটু ফুলে ঢোল। ছেলে দুটিব একজন বলল, জানেন মাসীমা, ওদের সাইডে চারটে প্লেয়ার বুট পরে খেলছিল। কলকাতার টীম তো। তবু রমেনদার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে ? পরপর দুটো গোল খেয়ে আর সামলাতে পারল না ঐ রাইট ব্যাকটা—

—রাইট নয়, লেফ্‌ট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সংশোধন করে দিল রমেন।

—হ্যাঁ, ঐ লেফ্‌ট ব্যাক—দেখতে একেবারে গুণ্ডার মত—বদমাইসি করে মেরে দিল হাঁটুর ওপর। রেফারী অবিশ্যি ফাউল দিতে ছাড়েনি।

সৌদামিনী খুব বেশি বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। এসব তাঁর অভ্যাস ছিল। সহজ ভাবেই বললেন, হাড়-টাড় ভেঙেছে কিনা দেখেছ ?

—না, না, হাড় ভাঙবে কি ? একটুখানি মচকে গেছে।

ছেলেটি কোনো উত্তর দেবার আগে রমেন নিজেই ব্যাপারটাকে হালকা

করে দিল।

'ভাঙলে আমার হাড় জুড়োত,' অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন সৌদামিনী। বলেই বেরিয়ে গেলেন চুন-হলুদ গরম করতে। ও-সব সরঞ্জাম তাঁকে হাতের কাছেই রাখতে হয়।

ছেলে দুটিও বিদায় নিয়ে চলে গেল। সরমা তখনো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে রমেন আপসোসের সুরে বলল, জানিস সরি, শেষ পর্যন্ত ড্র হয়ে গেল। সুদ্ধ ঐ বুটের জন্যে! নাঃ, এক-জোড়া বুট যোগাড় না করতে পারলে আর চলে না।

আরো কি বলতে যাচ্ছিল, সরমা ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল, চুপ, বাবা আসছেন। বুট এবার তোমার পিঠে পড়বে দেখো।

—কেন, কী হয়েছে? বাবা কিছু বলেছেন নাকি?

সরমা জবাব দিল না। বাবা তখন বিপজ্জনক সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলেন।

•

রাত্রে সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে যথারীতি পাখা করতে করতে এ-কথা ও-কথার পর সৌদামিনী ছেলের ফিরে আসার খবরটা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন। হাঁটুর ব্যাপারটাও রইল ঐ সঙ্গে। অবিনাশ আর চেঁচামেচি করলেন না, শুধু বললেন, ঐ খেলার মাঠেই একদিন ওর প্রাণটা যাবে, দেখে নিও।

—বালাই ষাট্! অস্ফুট ভীত কণ্ঠে বললেন সৌদামিনী।

—বালাই ষাট্ তো বুঝলাম, কিন্তু ঠেকাবে কেমন করে? কেবল যদি ফুটবল হত, তাহলে না হয় বুঝতাম। তার ওপরে আছে মাছ ধরা; সেই ঝিনাইদর বাঁধে গিয়ে বসে থাকবে সারা রাত। কোন্‌দিন সাপে ছোবল দেবে কে জানে? সাপের হাত থেকে যদি বা রক্ষা পায়, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙা আটকাবে কে?

—গাছ থেকে পড়ে! সৌদামিনীও যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—হ্যাঁ, জানো না বুঝি রায়দের পুকুরপাড়ে সেই বড় জামগাছটার মগডালে ওঠে জাম পাড়তে নিজের চোখে দেখলাম সেদিন। নীচে দাঁড়িয়ে কুড়োচ্ছে সেই মেয়েটা। আমাকে দেখে ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকোল। এদিকে ওপর থেকে ষাঁড় ডেকে যাচ্ছে—'সাবি, সাবি'…

—ওমা, তাই নাকি? হেসে লুটিয়ে পড়লেন সৌদামিনী, আহা, দুটিতে বড় ভাব।

—ও-সব ভাবসাব এখন সিকেয় তুলে রাখ। ছেলে আগে মানুষ হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। যেন গর্জে উঠলেন সমাদ্দার। তারপর স্বর নামিয়ে বললেন, তবে এখানে পড়ে থাকলে তা কস্মিনকালেও হবে না, তাও আমি তোমায় বলে রাখলাম!

—কিন্তু যাবে কোথায়? তেমন কোনো চাকরি-বাকরিও তো জুটছে না।

—কেন, এবারেও তো বাবু বললেন, বড়ছেলে যশোর টাউনে ডাক্তার হয়ে বসল, নতুন বাসা করেছে, একটি ভালো ছেলে চাই। দুজনের মত দুটো চাল

ফুটিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে কম্পাউণ্ডারের কাজটাও শিখে নিতে পারবে। আমি কিছু বলিনি। বললে এখনি হয়ে যায় কাজটা।

—ও-সব কি আর ও করতে চাইবে? এক গেলাস জল নিজের হাতে গড়িয়ে খায়নি কোনদিন—

—তবে থাক। ম্যাট্রিক ফেল করা বিদ্যে নিয়ে কোথাকার লাটসাহেব হন একবার দেখি। কিন্তু নবাব-নন্দনকে আর বেশিদিন বসিয়ে খাওয়ানো আমার দ্বারা হবে না, এও আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

পায়ের ব্যথা পুরোপুরি ভাল হবার আগেই বর্ষা নামল। পল্লীগ্রামের ফুটবল মরসুমও শেষ। সেদিক দিয়ে সৌদামিনী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, যদিও এর পরেই শুরু হবে মাছ ধরার তোড়জোড় এবং তাই নিয়ে নতুন অশান্তি। সে পর্বটা আরম্ভ হবার আগেই কর্তার মেজাজ এবার সপ্তমে গিয়ে চড়ল। কারণ অন্যত্র। আউশ এবং পাট—দুটো ফসলই এমন মার খেয়েছিল যে, ভাতের অভাব না ঘটলেও অন্যান্য দিকে রীতিমত অনটন দেখা দিল! স্বাভাবিকভাবেই তার জের গিয়ে পড়ল রমেনের উপর। টানাটানির সংসারে বয়ঃপ্রাপ্ত বেকার ছেলে চিরদিনই চক্ষুশূল। তবু যদি সে নিজের দায়িত্ব বোঝে, সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়, কিছুটা হয়তো সহানুভূতির আশা করতে পারে। কিন্তু এ-ছেলের যে গুণের অন্ত নেই! চিরটা কাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে এসেছে। আজ ঘর তার শোধ নিচ্ছে। উঠতে বসতে শুরু হয়েছে তাড়না! এতদিন সেটা আসত শুধু বাপের কাছ থেকে। এখন যেন মা-ও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে আসে অসন্তোষ। প্রতি কাজে ফুটে ওঠে অবহেলা। ছোটবোনটাও আর আগের মত আমল দেয় না। তার কাছেও আজ সে অবাঞ্ছিত।

প্রথমটা রাগে অভিমানে মনে মনে জ্বলে উঠেছিল রমেন। এ সংসারে সে একা। বাপ, মা, বোন কেউ তার আপন নয়, সবাই বোঝে শুধু নিজের স্বার্থ, এদের ওপর তার কোনো কর্তব্য নেই। সে চলে যাবে যেদিকে দুচোখ যায়, আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।…তারপর নিজেই নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করল। এ-বাড়িতে কেউ তাকে চায় না, কিন্তু একজন আছে, কয়েকখানা বাড়ির পরেই, যে তাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে চায়, আর সে-ও কি তাকে চিরদিনের তরে ফেলে চলে যেতে পারবে? অসম্ভব। সে কথা তো সেইদিনই হয়ে গেছে।

সাবি বলেছিল, রমেনদা, তুমি একটা চাকরি-টাকরি করবে না?

—পেলে কি আর না করি? কিন্তু চাকরি দেয় কে?

—কেন, জ্যাঠামশাই তো তোমার কোথায় যেন কাজ ঠিক করেছেন।

—কে বললে?

—সাবি বলছিল।

—আরে দূর! ও আবার একটা কাজ নাকি? ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।

—হলই বা! শহরে তো থাকতে পারবে। তারপর দেখে-শুনে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে না?

—তুই বুঝি চাস আমি চলে যাই, আর ফিরে না আসি ?

সাবিত্রী চকিতে একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। পরমুহূর্তেই তার দুচোখ ছাপিয়ে উঠেছিল জলধারা। রমেন এদিক-ওদিক চেয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই দ্যাখ, অমনি মেয়ের কান্না শুরু হল।

সাবিত্রী ওর বুকে লুকিয়ে মধুসিঞ্চিত সলজ্জ কণ্ঠে বলেছিল, বা-রে, অমন করে বললে বুঝি কান্না পায় না !

শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর পরামর্শই মেনে নিল রমেন। মা-র কাছে গিয়ে বলল, সেই কম্পাউণ্ডারের কাজটা কি খালি আছে ? থাকে তো, বাবাকে বল উকিলবাবুর নামে একটা চিঠি লিখে দিতে। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি।

সৌদামিনী খুশী হলেন, এতদিনে ছেলের সুমতি হয়েছে ! বললেন, কাল কি করে যাবি ? একটা ভাল দিন-টিন দেখি, কাপড়-জামাগুলো কেচে দিই···

একটু থেমে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, হ্যাঁরে, রাগ করে যাচ্ছিস না তো ?

—বাঃ রাগ করব কেন ?

—মন লাগিয়ে কাজ করিস, বাবা। একদিন যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস। দেখছিস তো সব।

বলতে বলতে সৌদামিনীর গলাটা ধরে এল। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলে গেলেন।

তিন দিন পরেই ভাল দিন পাওয়া গেল। অবিনাশ নিজে সঙ্গে করে ছেলেকে বনগাঁয় তাঁর উকিলের বাসায় পেঁছে দিলেন। সেখান থেকে তাঁর চিঠি নিয়ে রমেন চলে গেল যশোর।

প্রথম প্রথম নিয়মিত চিঠি আসত—মাসে দুখানা তো বটেই। বেশীর ভাগ মাকেই লিখত রমেন, মাঝে মাঝে বোনের কাছে, সেই সঙ্গে সাবিত্রীর জন্যে কয়েক লাইন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথাই থাকত তার মধ্যে—সে যেন অপেক্ষা করে।

দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল। হঠাৎ রমেনের চিঠি-আসা বন্ধ। আজ আসে, কাল আসে করে বেশ কিছুদিন কাটল। বনগাঁর উকিল মাসকয়েক আগে মারা গেছেন। যশোরে তাঁর ছেলের ঠিকানায় চিঠি দিলেন অবিনাশ। সে চিঠি ফিরে এল, তিনি ওখানে নেই। বাসা তুলে দিয়ে চলে গেছেন। ছটফট করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

হঠাৎ একদিন এক মনি-অর্ডার এসে হাজির। কোত্থেকে কে পাঠালে টাকা ? পিয়ন পুরো ঠিকানা পড়তে পারল না, শেষ শব্দটা পড়ল, ইটালী। প্রেরকের নাম রমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, তার আগে একটা মোটা অঙ্কের নম্বর। একটা ইংরেজি শব্দও আছে, পিয়নের বিদ্যায় তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হল না। কুপনে কিছু লেখা নেই।

কয়েক দিন পরে চিঠিও এল ! যুদ্ধে যোগ দিয়েছে রমেন। প্রথমে পাঠিয়েছিল মিডল ঈস্টে, সেখান থেকে সোজা বর্মাফ্রণ্ট ; তারপর ইটালী। ক'দিনের মধ্যে রেজিমেণ্ট রওনা দিচ্ছে আফ্রিকার দিকে। সে বেশ ভালো আছে, সুযোগ এবং সময় পেলেই চিঠি লিখবে, টাকাও পাঠাবে। ওঁরা যেন কোনরকম চিন্তা না করেন।

জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছে, এ-খবর পল্লীগ্রামেও এসে পৌঁছেছিল। বড় বড় শহরে অফিস বসিয়ে ইংরেজরা সৈন্য-সংগ্রহ করছে, কিছু কিছু বাঙালী ছেলেও সেখানে গিয়ে নাম লেখাচ্ছে, এসব তথ্য অবিনাশ একদিন বনগাঁ থেকে জেনে এসেছিলেন। স্ত্রী-কন্যাকে জানাননি। তাঁর পুত্রটিও হয়তো ঐ দলে গিয়ে জুটেছে, এই রকম একটা আশঙ্কা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল। কারো কাছে প্রকাশ করেননি। নিজেও তেমন আমল দিতে চাননি। আজ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না। মনি-অর্ডার যখন আসে, তিনি মাঠে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে, যাঁদের কাছে তাঁর মনের সন্দেহ এতদিন ধরে গোপন করে গেছেন, তাঁরাই সব সন্দেহের নিরসন করে দিল। স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দোষারোপ রইল তাঁরই উপর। কিন্তু জ্বলে ওঠা দূরে থাক ক্ষীণ প্রতিবাদটুকুও করলেন না। বরং মনে মনে অভিযোগটা মেনে নিলেন। অতটা তাড়াহুড়ো না করলে ছেলেটা, আর যাই করুক, যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত না।

আরো দু-একটা চিঠি এবং মনি-অর্ডার আসবার পর সমাদ্দার-বাড়ির মন থেকে শোকের ছায়াটা ওদের অজ্ঞাতসারেই কখন ধীরে ধীরে সরে গেল। ছেলের জন্যে গৌরব-বোধটাই প্রবল হয়ে দেখা দিল তার জায়গায়। কথায়-বার্তায় চাল-চলনে সেইটাই ফুটে উঠতে লাগল। প্রতিবেশীরাও কেউ পরোক্ষে, কেউ বা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিবর্তনটা মেনে নিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ একদিন কেউ-কেটা হয়ে পড়লেন অবিনাশ সমাদ্দার। যারা আমল দিত না, এড়িয়ে চলত, তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে খাতির জমাতে চেষ্টা করল। যে চোখে ছিল তাচ্ছিল্য, সেখানে দেখা দিল ঈর্ষা। যে-সব মুরুব্বীরা ক'দিন আগে বাড়ি বয়ে শুনিয়ে গেছেন, 'এ ছেলের আশা ছেড়ে দাও অবিনাশ। বল খেলা আর মাছ ধরা ছাড়া ওর দ্বারা আর কোন কাজ হবে না', তাঁরাই আবার তেমনি বাড়ি বয়েই বলে গেলেন, 'আগেই জানতাম, রমেন আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। বেঁচে থাক, আরো উন্নতি করুক', ইত্যাদি।

হালদাররা উপযাচক হয়ে মামলা মিটিয়ে নিল। অবিনাশ রটিয়ে দিয়েছিলেন, আর ভাবনা কি ? ছেলে রয়েছে মিলিটারিতে, যা করবার সে-ই করবে। একখানা দরখাস্ত ঝেড়ে দিলেই হল—'আমার বাবার উপর অত্যাচার করছে অমুক অমুক লোক।' বাস ; সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডাক পড়বে থানায়।

গ্রামের লোকেরা কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি।

বাপ-মা-বোনের চোখে রমেনের রূপটাও দিন দিন বদলে গেল। একদিন যে রীতিমত চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবুরুকের লড়াই-ফ্রণ্টে বসে কখন যে সে চোখের মণি হয়ে উঠল, এঁরা জানতে পারলেন না।

রমেনের যুদ্ধযাত্রার কল্যাণে 'সাবি'ও আর সে সাবি রইল না। 'সমাদ্দার-বাড়ির ঐ বাজে ছেলেটার সঙ্গে' অতটা মাখামাখি রায়বাড়ির কর্তা-গিন্নী কখনো পছন্দ করেননি। ঐ নিয়ে নিজেদের মেয়ের উপর বেশ একহাত নিতে ছাড়তেন না। উঠতে বসতে কড়া শাসন, তার সঙ্গে ছিল সমবয়সীদের ঠোঁট-বাঁকানো, গিন্নী-বান্নীদের ছিঃ ছিঃ। সকলের কাছেই নিতান্ত অপরাধী হয়ে থাকতে হত মেয়েটাকে। হঠাৎ একদিন চাকা ঘুরে গেল। সাবিত্রী এখন যেদিকে তাকায়, খুশী মুখ। আরেকজনের গৌরবের আলো এসে পড়েছে তার উপর! তারই 'গরবে' সে 'গরবিনী'।

রায়গিন্নী কোনোদিন সমাদ্দার-বাড়ির উঠোনে পা দেননি। সে অভাবনীয় ঘটনাও ঘটল। শুধু পদার্পণ নয়, অদূর ভবিষ্যতের দু-বাড়ির মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক-স্থাপনের প্রস্তাবনাও সেই সঙ্গে করে রাখলেন।

সৌদামিনী ভরসা দিলেন, এ তো অতি সুখের কথা দিদি। খোকা ফিরে আসুক। প্রজাপতির নির্বন্ধ থাকলে নিশ্চয়ই হবে।

সরমাই প্রথম দেখতে পেয়েছিল। হাট-বার। বাবা গিয়েছিলেন হাটে, মা পাড়া বেড়াতে। ও পুকুর থেকে গা ধুয়ে এসে একটু সাজ-গোজ করছিল। ও-বাড়ি থেকে কমলার আসবার কথা। বিয়ের পর এই প্রথম ফিরছে শ্বশুর বাড়ি থেকে। বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে। সন্ধ্যা হয় হয়। খুশির আমেজে গুণ গুণ করে একটা গানের কলি ভাঁজছিল সরমা। উঠানে একটা খট্‌খট্ শব্দ শুনে জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কে লোকটা? এ কী রকম পোশাক! তারপর ভাল করে ঠাহর করতেই চেঁচিয়ে উঠল—দাদা।

ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে আর কথা সরল না। কেমন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুচোখ ভরা ভয় ও বিস্ময়।

রমেন কলরব করে উঠল, ওরে বাপ রে। তোকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না! এত বড় হয়ে গেলি কি করে?

সরমা শুকনো মুখে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, ওটা কী দাদা?

—কোন্‌টা? ও একে বলে ক্রাচ্। মা কোথায়?

—ওটা কেন?

—আর বলিসনে। ডান পা-টা যে হিটলারকে প্রেজেন্ট করে এলাম। তাকে তো আর পেলাম না। দিয়ে এলাম তার জেনারেলকে। জেনারেল রোমেল। নাম শুনেছিস? দুর্ধর্ষ ফাইটার। তবু্কে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে খুব ঠ্যাঙানি খেয়েছে ব্যাটা। যাবার আগে আমার পা-টা নিয়ে গেল, এই যা।

—অ্যাঁ! তোমার পা নেই!

—নেই কে বললে? দ্যাখ না, কি রকম নতুন পা লাগিয়েছি। চলতে ফিরতে কোন অসুবিধা নেই। এই দ্যাখ না?

ক্রাচে ভর দিয়ে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে কয়েক পা চলে ওদিকে ঘুরতে গিয়েই

মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি। শেষের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। দু-বগলে কাঠের ডাণ্ডা এবং নকল পায়ের উপর দাঁড়ানো, জমকালো ফৌজী পোশাকে সজ্জিত ছেলের দিকে কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সৌদামিনী। তারপর সেইখানেই বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এ তুই কি করলি খোকা! তোকে এ সাজে দেখবার আগে আমার কেন মরণ হল না।…

বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে গরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। গাড়োয়ান একে একে প্রকাণ্ড একটা ট্রাঙ্ক, একটা ক্যানভাসের থলে এবং বিছানার বাণ্ডিলটা বারান্দায় এনে ফেলল। রমেন পকেট থেকে পার্স নিয়ে ভাড়াটা মিটিয়ে দিতেই নিঃশব্দে সেলাম করে চলে গেল।

বারান্দার এদিকে একটা তক্তপোষ পাতা ছিল। রমেন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে তার উপর বসল। কয়েক হাত দূরে একটা থাম জড়িয়ে ধরে মাথা নুইয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সরমা। চাপা কান্নার মৃদু শব্দ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ওদিকে উঠোনের ধুলোয় পড়ে আছেন মা। গলার আওয়াজ আর কানে আসছে না, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় শরীরটা থেকে থেকে দুলে উঠছে। আরো কিছুক্ষণ দুজনকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রমেন। তারপর বিরক্তির সুরে বলে উঠল বোনকে উদ্দেশ্য করে, কী হল! তোরা কি সারারাত ধরে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করবি, না, খেতে-টেতে দিবি কিছু?

কথাটা কানে যেতেই তড়িৎপৃষ্ঠের মত উঠে পড়লেন সৌদামিনী, এবং তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেলেন। সেখান থেকেই মেয়েকে ডাকলেন। সরমা সাড়া দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল—এক হাতে একটা ঘটি, আরেক হাতে জলের বালতি। সেদিকে চেয়ে রমেন ধমকে উঠল, একি, তোকে আবার জল টানাটানি করতে কে বলল? আমি বুঝি আর কুয়োর পাড়ে যেতে পারতাম না?

সরমা বালতিটা বারান্দার কোণে রেখে ধরা ধরা গলায় বলল, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। মা এখ্‌খুনি খাবার নিয়ে আসছেন।

—নিয়ে আসতে হবে না, আমি রান্নাঘরে গিয়ে খাব।

—বেশ তাই খেও। জামা-কাপড় ছাড়বে না?

—কাপড় একটা দিবি, তবে তো ছাড়ব। ধুতি-ফুতি আমার কাছে নেই। দাঁড়া, থকেতে পারে। খোল দিকিন বাক্সটা।—বলে পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে ধরল।

সরমা হাত না বাড়িয়েই বলল, পরে খুলব। বাবার একটা ধুতি এনে দিচ্ছি। এখন তাই পরে নাও।

—তোদের জন্যে কি আনলাম-টানলাম দেখবি না?

—সে-সব পরে দেখা যাবে, বলতে বলতে সরমা বারান্দা থেকে নেমে বাবার ঘরের দিকে চলে গেল। রমেন চেঁচিয়ে বলল, বাবা কোথায় রে? বাড়ি নেই বুঝি?

—হাটে গেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে যখন কাপড় ছাড়ছিল, আরেকবার মায়ের কান্না কানে যেতে রমেন বুঝল, বাবা ফিরছেন। একবার ভাবল, নিজেই গিয়ে দেখা করবে। দেয়ালে দাঁড়-করানো ক্রাচ্ দুটোর দিকে চেয়ে কি মনে করে থেমে গেল। আরো খানিকক্ষণ যেতে সরমা এল খাবার নিয়ে। বাবার কথা সেও কিছু বলল না, রমেনও জানতে চাইল না।

ঘরের একটা দিক জুড়ে ওর সেই পুরনো তক্তপোষ, তারই উপর বসে ছিল রমেন। সামনে একটা ছোট টুলের উপর কাঁসার রেকাবিতে গরম চিঁড়ে ভাজা, তার পাশে একরাশ নারকেল-কোরা। ওর চিরদিনের অতি প্রিয় জলখাবার। মায়ের মনে আছে। খেতে খেতে সেই কথাই ভাবছিল। বড় একটা গ্রাস মুখে পুরে বলল, জানিস সরি, সেই আফ্রিকার জঙ্গলে বসে অন্ধকারে ভেড়ার ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে মনটা খালি চিঁড়েভাজা চিঁড়েভাজা করত।…কতকাল পরে খেলাম। এর সঙ্গে যদি এককাপ চা হত—

—চা তো নেই, দাদা।

—আছে আছে। একটা বেশ বড় প্যাকেট নিয়ে এসেছি, ঐ হ্যাভারস্যাক্‌টা খোল দেখি।

—কী খুলব ?

—আরে বাঙাল, ঐ থলেটা।

—আমি বাঙাল, আর তুমি কী ?

—আমি সোলজার, যার কোন জাত নেই, গোষ্ঠী নেই, ধর্ম নেই, আছে শুধু দেশ।

বিদ্যুৎ-চমকের মত সরমার চোখের উপর ভেসে উঠল দেয়ালে হেলান-দেওয়া ঐ দুটো কাঠের দণ্ড। সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রমেন তাড়া দিয়ে উঠল, কী ভাবছিস ? খোল।…আচ্ছা, ওটা বরং আমার কাছে সরিয়ে দে। আমি খুলছি। তুই ঐ বাক্সটা খোল।

দাদার হাত থেকে চাবি নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সরমা ট্রাঙ্কের তালাটা খুলে ফেলল। রমেন বলল, বাঁ দিকে হাত ডুবিয়ে দে, একটা পিচ্‌বোর্ডের বাক্স পাবি, নিয়ে আয়।

লালরঙের ঝকঝকে বাক্সটা হাতে করতেই সরমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। কোন রকমে নিয়ে গেল দাদার কাছে। রমেন তার ভিতর থেকে বের করল একটি পাথর-বসানো নেকলেস্। হারিকেনের মৃদু আলোতেও ঝলমল করে উঠল। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বোনের গলার কাছটিতে ধরে বলল, কেমন হয়েছে ? বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে, দ্যাখ। নে, পর।

সরমা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না ! মাথাটায় ঘন ঘন ঝাঁকানি দিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল দাদার কোলের উপর।

অবিনাশ রান্নাঘরের সামনে বাজারের থলে নামিয়ে দিয়ে সেই যে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আর বেরোলেন না। রান্না হলে মেয়ে যখন ডাকতে গেল, বললেন, খিদে নেই মা, আজ আর কিছু খাব না। তোদের খাওয়া হলে আমার এই

কলকেটায় একটু আগুন দিয়ে যাস।

রমেনের ভাতের থালা সরমাই নিয়ে এল তার ঘরে। সে আর রান্নাঘরে যাবার কথা তুলল না। নিঃশব্দে খেয়ে নিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ল। মনটা কেমন অসাড় হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে দেহটাও। দরজা বন্ধ করবার মত জোরও খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই ঘর, সেই পুরনো দিনের পরিচিত শয্যা, যার জন্যে এতকাল ধরে দেহ-মন তৃষিত হয়ে ছিল। তার উপরে পথশ্রমের ক্লান্তি, তৃপ্তিময় আহার, মায়ের, বোনের যত্ন, আদর, স্নেহ। সবই তো সুখনিদ্রার অনুকূল। তবু ঘুম এল না। বারংবার একটি কথাই শুধু ঘুরে-ফিরে উঠতে লাগল মনের কোণে—একদিন এ-বাড়িতে সে ছিল অবাঞ্ছিত। অভাব-অনটন এঁদের স্নেহের উৎসটাকেও বোধহয় শুকিয়ে ফেলেছিল। আজ আবার সেখানে নতুন জোয়ার জেগে উঠেছে। তার মধ্যে বসেও মনে হচ্ছে এখানে সে অপরিচিত। যে পা টাকে সে তব্‌রুকের কোন আর্মি হাসপাতালে ফেলে এসেছে, সে-ই আজ এঁদের চোখে বড় হয়ে দেখা দিল. আর তার আড়ালে সে চাপা পড়ে গেছে।

একটু বোধহয় তন্দ্রামত এসেছিল হঠাৎ ভেঙে গেল। ঘরময় জ্যোৎস্না' সেই আলোতে দেখা গেল, মা দাঁড়িয়ে আছেন। অপলক করুণ চোখদুটি তারই দিকে একাগ্র। যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে। রমেন জানতে দিল না, সে জেগে আছে। চোখের পাতা একটুখানি মেলে নিঃসাড়ে পড়ে রইল। মা আর একটু কাছে সরে এলেন। আরো কিছুক্ষণ যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। রমেন চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। একটা পাতলা চাদরে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া তবু যে পা-টা উরুর নীচে নেমে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, তার সেই ভীষণ শূন্যতা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সেই দিকেই চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর চোখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। লোহার পা টা টুলের উপর পড়ে ছিল। তাতে একবার হাত দিয়েই চমকে উঠে হাতটা সরিয়ে নিলেন। দেয়ালের গায়ে ক্রাচ্‌দুটোকে দেখলেন। তারপর দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

এ বাড়ি থেকে কেউ বলেনি। তবু কি করে খবরটা রটে গেল। রমেনের আড্ডাব কোনো বন্ধুই জানতে পেরেছিল সকলের আগে। সে জানাল আরেক-জনকে। সকাল হতেই সাত-আট জনের একটা দল হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির। বাড়িব বাইরে থেকেই হাঁক ডাক—কই রে রমেন কোথায় গেলি ? লড়াই করতে গিয়ে কনে বৌ হয়ে গেলি নাকি ? সকাল থেকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছিস, ব্যাপার কী ? ও, রমেনদা···

রমেন বসেছিল বারান্দায় সেই তক্তপোশের উপর ! সেখান থেকেই চেঁচিয়ে সাড়া দিল, এই যে, এতক্ষণে বুঝি বাবুদের ঘুম ভাঙল ? হতভাগার দল, এদিকে আয় একবার, দেখাচ্ছি মজা।···

ততক্ষণে ওরা উঠোনে এসে পড়েছে। একজন বলতে বলতে আসছিল, একেই

বলে ফুটবলের নেশা ! লড়াই ফড়াই ফেলে ঠিক সীজ্‌নের মুখটাতে এসে হাজির হয়েছে।

সেই সূত্র ধরে আরেকজন বলে উঠল—এবার কিন্তু বুঝলে রমেনদা—হঠাৎ নজর পড়ে গেল পায়ের দিকে। থমকে থেমে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকী চোখগুলোও ঐ একই জায়গায় গিয়ে আটকে রইল। এতগুলো মানুষ সব যেন এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেছে।

রমেন হেসে উঠল, কী রে ? সব বোবা হয়ে গেলি নাকি ? একটা পা-ই না হয় নেই, মানুষটা তো আছে। আর, পা নেই বা বলি কেন ? এমন দিব্যি লোহার পা-টা তোদের পছন্দ হল না ?

কারো মুখে কোনো সাড়া নেই। সব ছবির মত নিস্পন্দ। রমেনের নিজের মুখের হাসিটা যেন তাকেই ব্যঙ্গ করে উঠল।

সুধীর ওদের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে বড়। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বারান্দার মাটির মেঝেতেই বসে পড়ল।

—আহা, ওখানে কেন, সুধীরদা ? রমেন একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল, এখানে এসে বসো। আর, তোরাই বা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ওপরে এসে বোস না !

আর কেউ সাড়া দিল না। সুধীর বলল, থাক তোকে বাস্ত হতে হবে না। ...এ-সর্বনাশ কবে হল ? কিছুই তো জানাসনি। মেসোমশাই মাসিমার কাছেও বোধহয়—

—না ; তাঁদেরও জানাইনি। হঠাৎ এসে সবাইকে চমকে দেবো মনে করেছিলাম। কি রকম করে হল, জানো ? সে এক মজার ব্যাপার।

আফ্রিকা-ফ্রণ্টে কারেন-অবরোধের সময় অন্ধকার রাত্রে ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন হাতবোমা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল শত্রুর ছাউনির দিকে—ও একা নয়, একটা গোটা লাটুন—তখন হঠাৎ কোথা থেকে কেমন করে একটা রাইফেলের গুলি এসে পায়ে বিঁধল এবং তিনি দয়া করে রয়ে গেলেন, শ্রীচরণ ছাড়লেন না,—তারই একটা বেশ রসাল বর্ণনা দিল রমেন। তার তিনদিন পরে হাসপাতালে গুলির সঙ্গে গোটা পা-টাকে বাদ দিতে গিয়ে ডাক্তার রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন 'হোয়াট এল্‌স্‌ ক্যান ইউ এক্‌স্‌পেক্‌ট্‌ ফ্রম অ্যান এনিমি বুলেট ? তুমি দিলে প্রটেকশন, ও তার বদলে তোমার পা নিয়ে ছাড়ল।' সাহেব ডাক্তারের বলবার ভঙ্গি, ভাষা এবং উচ্চারণ নকল করে রমেন তার শ্রোতাদের কাছে ব্যাপারটাকে যথেষ্ট মজাদার করে তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের শুকনো চোখে-মুখে বেদনা ও ত্রাস ছাড়া আর কোনো কিছুর আভাস পর্যন্ত ফুটে উঠল না। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্দরের দিক থেকে ভেসে এল মায়ের কান্না। বোধহয় পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে সহানুভূতি জানাতে এসেছেন। রমেন চুপ করে গেল। বন্ধুরাও সেই ফাঁকে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বেলা পড়তেই রমেন নকল পা-টা লাগিয়ে ক্রাচে ভর করে বেরিয়ে পড়ল। সেই চিরদিনের চেনা পথ। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কলরব করে খেলা করছিল।

ওকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ চুপ করে গেল। আগেকার দিনে ছুটে এসে ধরত—'রমেনদা, ঐ-বেত-ঝোপের মধ্যে না এতবড় একটা বোলতার চাক হয়েছে ; পেড়ে দেবে ? টুনীদের গাছ থেকে দুটো জামরুল পেড়ে দেবে, রমেনদা ! রমেনকাকা একটা রাক্ষসের গল্প বলো না ?'—এমনিধারা অজস্র আবদারে অস্থির করে তুলত ! আজ যে-যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে রইল। যেন নিতান্ত অচেনা একটা ভয়াবহ লোক চলে যাচ্ছে তাদের সুমুখ দিয়ে।

রমেন দু-একজনের নাম ধরে ডাকল। কেউ কাছে এল না। 'কেমন আছিস ?' এর উত্তরে কেউ কেউ শুধু ঘাড়টা একটু কাত করল কলের পুতুলের মত।

রমেন সোজা গিয়ে পড়ল রায়বাড়ির সামনে। বৈঠকখানার বাইরে থেকেই হাঁক দিল, কাকীমা…।

রায়গিন্নী দুঃসংবাদটি আগেই পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এলেন ছোট একটা জলচৌকি হাতে করে। পেতে দিয়ে শুষ্ক মৃদুস্বরে বললেন, বসো বাবা।

—কাকাবাবু কোথায় ?

—এই তো, কোথায় যেন বেরোলেন।·· তোমাদের ওখানে একবার যাবেন, বলছিলেন। তারপর বললেন, থাক, আর কী দেখতে যাবো।

—না না, উনি কেন যাবেন কষ্ট করে, এতটা পথ ! আমারই উচিত ছিল ও-বেলাই এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা। বন্ধুরা সব এল। তাই আর বেরুতে পারলাম না।

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে, হেসে ফেলে, খাপছাড়া ভাবে যোগ করল, জানেন কাকীমা, এতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। দেখলেন তো, কেমন জোরে জোরে হেঁটে এলাম।

কাকীমা এবার শুধু ওর পায়ের দিকে চোখ বুলিয়ে সমর্থন বা প্রতিবাদ কোনোটাই করলেন না।

রমেন এদিক-ওদিক চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেলল, সাবিকে দেখছি না তো ? সে কোথায় ?

—এইখানেই তো ছিল, তেমনি শুকনো অপ্রসন্ন মুখেই বললেন রায়গিন্নী।

—একবার ডাকুন না ! সলজ্জ খুশির সুর। তার ভিতরে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মিলনাকাঙ্ক্ষাটুকু চাপা রইল না।

—তুমি বসো। দেখি কোথায় গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই যেন রায়গিন্নী ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

রমেনের বুকের মধ্যে রক্তের বেগ দ্রুততর হল। কি জানি, এত দিনে কত বড় হয়ে গেছে সাবি ! দেখতে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর হয়েছে, আরো মধুর হয়েছে মুখখানা চোখ দুটো।

নতুন-কেনা সুদৃশ্য হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল রমেন। কাঁটাগুলো যেন নড়ছে না। আর কত দেরি করবে সাবি ? কাকীমা কি ভুলে গেলেন বলতে ?

মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এলেন রায়গিন্নী। এক হাতে পিতলের রেকাব,

তার উপরে দুটি ঘরে-তৈরি সন্দেশ, আরেক হাতে জলের গেলাস। জলচৌকির একধারে রেখে বললেন, সাবি এল না। তোমাকে পুকুরপাড় দিয়ে আসতে দেখেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বললাম তোকে ডাকছে রমেন। একবার দেখা করে যা।— না, আমার ভয় করছে, আমি যেতে পারবো না।

রমেনের মুখের সমস্ত দীপ্তি যেন কোন্ দমকা হাওয়া এক নিমেষে নিভিয়ে দিয়ে গেল। একবার চোখ তুলে তাকাল সামনেকার ঐ মাঠের দিকে। পরক্ষণেই ক্রাচ্ দুটো টেনে নিয়ে উঠে পড়ল।

—ওকি, উঠলে কেন? একটু মিষ্টিমুখ করে নাও···রায়গিন্নীর কথাগুলো কানে গেল। উত্তর দিল না, ফিরেও তাকাল না। খট্ খট্ করতে করতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

ঘড়িটা বালিশের পাশেই রাখা ছিল। রেডিয়াম ডায়াল। ঘরে আলো না থাকলেও সময়টা দেখা গেল। রাত বারোটা বেজে দশ। রমেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। কালকের মতই দক্ষিণের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ছিল। পোশাকটা চাপিয়ে দু'চারটে জিনিস পকেটে পুরে নেওয়া—সেই আলোতেই করা গেল। নিঃশব্দে দরজা খুলে, ক্রাচেও যতটা সম্ভব শব্দ না করে উঠোনটুকু পার হতে হল। রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরে পা চালিয়ে দিল। পুরো দশ-বারো মাইল পথ পেরিয়ে তবে রেল-স্টেশন। যেমন করে হোক, ভোর ভোর থাকতে পৌঁছে যেতে হবে। তার কিছু পরেই একটা গাড়ি আছে!

রমেনের মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে এই পথ দিয়েই যখন সে বিদেশযাত্রা করেছিল, এমন করে চোরের মত লুকিয়ে যেতে হয়নি। সেদিন সেই যাওয়াটাই সকলে চেয়েছিল, এখানে যারা তার আপনজন, বাবা-মা, বোন, প্রিয়া ও বন্ধুরা! আজ কেউ তা চায় না। তবু তাকে যেতে হচ্ছে। কোথায় সে জানে না।এমন দেশ, এমন জায়গা যেখানে তার এই পায়ের দিকে চেয়ে কেউ কাঁদবে না, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলবে না, ভয় পাবে না।

ওস্তাদজী

গর্ডন সাহেব তখন সবে মেজর হয়েছেন। আই. এম. এস. অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে আট বছরের চাকরি। এতদিন মিলিটারীতেই ছিলেন, এবার ডাক এল সিভিল থেকে। সিভিল হলেও কোনো জেলার সিভিলসার্জন হয়ে গেলেন না। ওঁকে যেতে হলো 'জেল'এ। বাংলা দেশের একটা বড় সেন্ট্রাল 'জেল' এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের চার্জ নেবার আগে কোনো সিনিয়র আই. এম. এস. সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে ছ'মাস শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা হলো।

শোনা যায়, 'ন্যায়' ও 'বিবেক' সম্বন্ধে একটু বেশী খুঁতখুঁতে বলে আর্মির বড় কর্তারা গর্ডনকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। সেইজন্য ওঁকে সরে আসতে হয়েছিল। জেলের গদিতে মোতায়েন হবার পরেও তিনবার না ভেবে এবং পাঁচবার সর্বদিক বিবেচনা না করে কোনো অর্ডার দেন না। ফলে সব কাজ ঢিমে-তেতালায়

চলতে থাকে। বেলা গড়িয়ে যায়। আগেকার 'বড়সাহেব'রা একটার মধ্যে সব কাজ সেরে বাড়ি চলে যেতেন। গর্ডনের তখনো অনেক বাকী। লাঞ্চের তাগিদ দিয়ে বাংলো থেকে রোজই ফোন করেন মেমসাহেব। ওঁর ঐ এক উত্তর—'আমার এখনো কাজ শেষ হয় নি, তুমি খেয়ে নাও।' কিংবা 'জরুরী কাজে জড়িয়ে আছি, এক ঘণ্টার আগে যেতে পারবো না।'

মেমসাহেব হয়তো স্বাস্থ্যের কথা তুলে অনুযোগ দেন, অথবা অন্য কোনো ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গর্ডন মৃদু হেসে সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, 'মাই ডিয়ার, দিস্ ইজ্ ডিউটি।'

ঐ একই যুক্তি দিয়ে অনুবর্তী কর্মীদেরও সান্ত্বনা দেন—'একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু কি করবো, ওয়ার্ক মাস্ট্ বি ডান্।' জেলরকে বলে দিয়েছেন, 'আপনার কাজ হয়ে গেলে চলে যাবেন। আমার জন্যে বসে থাকার প্রয়োজন নেই!' অন্য সকলকেও পালা করে ছুটি দেবার অর্ডার দিয়ে রেখেছেন। যদিচ কার্যতঃ সেটা হয়ে ওঠে না।

রবিবার বাদে বছরে ন'দিন জেল-হলিডে। সবটারই উপলক্ষ্য কোনো পর্ব। এ বিষয়ে ইংরেজ সরকার কোন পক্ষপাত দেখান নি। তিনটি প্রধান ধর্মকে সমান আসন দেওয়া হয়েছে। পর্বগুলোর তিনটি হিন্দু, তিনটি মুসলমান, তিনটি খৃষ্টান। ঐ ন'দিন সব কয়েদীর কাজ বন্ধ। এ ছাড়া তারা আরো দু'একটি বিশেষ সুবিধা বা প্রিভিলেজ ভোগ করে। তার মধ্যে প্রধান হলো—বাইরে থেকে খাবার পাবার অনুমতি। আত্মীয় বন্ধুরা এসে জমা দিয়ে যায়, কিংবা যার টাকা পয়সা রয়ে গেছে জেলের হেফাজতে, তারা কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বাজার থেকেও কিনিয়ে আনতে পারে।

এই সব 'ছুটি'র দিনে অফিসের কাজ মোটামুটি বন্ধ থাকে। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন না। মেজর গর্ডনের নিয়ম আলাদা। তাঁর মতে এইদিনই তো সব চেয়ে বেশী কাজ—জেলগেটে ঠিকমত খাবার গ্রহণ এবং তার সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা। তা ছাড়া, সারা বছরে দুটি বিশেষ পর্ব দিনে—মহাষ্টমী ও ঈদ্—সরকার একটা বাড়তি অর্থ মঞ্জুর করেন, (মাথা প্রতি ছ'আনা) কয়েদীদের ভোজ দেবার উদ্দেশ্যে। সেদিন তারা ডাল-ভাতের বদলে পোলাও কিংবা ভুনি খিচুড়ি খায়, তার সঙ্গে মাংস ও 'মিঠাই'। হাজারের উপর লোক। রীতিমত যজ্ঞীয় ব্যাপার। সুপারকে অবশ্য আসতে হবে! না যদি আসেন, সেটা হবে কর্তব্যহানি!

গর্ডন সাহেবের আমলে প্রথম ছুটি পড়ল—মহাষ্টমী। অন্যদিন সকাল সাতটায় এসে হাজির হন। ওদিন একটু দেরি করে, আটটা নাগাদ এসে পড়লেন। তার আগেই খাবারের প্যাকেট্ আসতে শুরু হয়ে গেছে। বেশীর ভাগই ভীমনাগ, দ্বারিক ইত্যাদি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত সুদৃশ্য কাগজের বাক্স। ভিতরে বিচিত্র বেশী সন্দেশ,—শঙ্খ, পদ্ম, গোলাপ। কেউ শুভ্র, কেউ হরিদ্রাভ। রূপে গন্ধে মনোরম। একজন ডেপুটি জেলর গেটের মুখেই বসে আছেন। তাঁরই সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তিন চারটি কর্মী বাক্সগুলো খুলে নেড়ে চেড়ে দেখছে,

সন্দেশের থাকের মধ্যে কিংবা কার্ড বোর্ডের ভাঁজে লুকিয়ে আছে কিনা একটি ছোট্ট আফিমের গুলি, এক ফোঁটা চরশ কিংবা নিদেন পক্ষে এক টুকরা তামাক পাতা। তারা জানে, যাদের জন্যে এই মিষ্টান্নের আমদানি তাদের কাছে খাদ্যের চেয়ে অনেক বড় আকর্ষণ নেশা।

সন্দেশের বাক্সগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন মেজর গর্ডন। জেল কোডের সেই রুলটি মনে পড়ল, পর্বোপলক্ষে বিশেষ খাদ্য-মঞ্জুরির ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ড্রয়ার থেকে বই নিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই চিহ্নিত পাতাটা বের করলেন। না, তাঁর ভুল হয় নি, হতে পারে না। কালই অধ্যায়টা ভালো করে পড়ে রেখেছেন। এই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে, কোনো কুকুড্ ফুড অর্থাৎ পক্ব খাদ্য দেওয়া চলবে না। কী দেওয়া যেতে পারে তারও স্পেসিফিক উল্লেখ আছে—মিল্ক্ অ্যান্ড ফ্রুট্স্, দুগ্ধ এবং ফল।

ডেপুটি জেলরকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, কোনোরকম মিষ্টান্ন মঞ্জুর করবার 'অথরিটি' কোথায়।

ডেপুটি বোধ হয় এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন, বরাবরই তো দেওয়া হচ্ছে, স্যর।

—ইয়েস্; বাট্ আণ্ডার হোয়াট রুল্স্?

জেল কোডের সেই বিশেষ ধারাটি পড়ে দেখবার জন্যে মোটা বইটা এগিয়ে দিলেন ডেপুটির দিকে। মিনিট দু'য়েক অপেক্ষা করে বললেন, এ ছাড়া আর কোন রুল আছে কি,? কিংবা কোনো সার্কুলার?

ডেপুটি বাবু এদিক দিয়ে গেলেন না। নিজেকে বোঝালেন, খোদ কর্তার যেখানে আপত্তি, তার সেখানে গরজ দেখবার কি দরকার? আসলে তো 'চিনির বলদ'। সাহেব হয়তো অন্য কিছু সন্দেহ করে বসবে। বললেন, প্যাকেটগুলো তাহলে ফেরত দেবো কি?

—তা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি।

উপহার গ্রাহকদের আগেই বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, এবং তারা গেটে অপেক্ষা করছিলেন। বড় সাহেবের হুকুম শুনে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বেশীর ভাগই কুলীন পাড়ার কয়েদী—জাল, তহবিল-তছরূপ, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ (পিনাল কোডের ভাষায়, ক্রিমিন্যাল ব্রীচ্ অব্ ট্রাস্ট্) এবং ঐ জাতীয় সভ্য, মার্জিত অপরাধে যারা আটকে পড়েছেন, বাড়ি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ-সরবরাহের রীতিমত সঙ্গতি যাদের আছে। সকলেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। অনুমতিও পাওয়া গেল; দল বেঁধে নয়, এক একজন করে।

প্রথমে যিনি ঢুকলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী (জেল-পরিভাষায় ডিভিশন টু), তাঁর বক্তব্য সহজ ও সরল—তিন বছর ধরে পেয়ে আসছি স্যর। তারও আগে থেকে এ প্রাক্‌টিস্ চলে আসছে। দিস্ ইজ্ এ টাইম্-অনার্ড্ প্রিভিলেজ্ ফর প্রিজনারস্।

সাহেব ডান হাতে জেল কোড্‌খানা তুলে ধরে বললেন, ওসব আমি জানি না,

জানতেও চাই না। দিস্ ইজ্ মাই বাইবেল। এর বাইরে একচুল নড়বার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়নি। নেক্সট্ ?

পরে যিনি এলেন, তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণী, 'প্রিভিয়াস্ অকোপেশন' অর্থাৎ প্রাক্-জেলা পেশা সম্ভবতঃ ওকালতি, সবিনয়ে নিবেদন করলেন, ইওর অনার, আপনি ঠিকই বলেছেন ; তবে জেল কোডের ঐ 'মিল্ক্' শব্দটাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'মিল্ক্' মানে শুধু মিল্ক্ নয়, মিল্ক্-প্রডাক্ট্স, শুধু দুগ্ধ নয় দুগ্ধজাত দ্রব্য।

—কিন্তু তার তো কোন উল্লেখ নেই। দ্যাট্ ইজ নট্ মেন্শনড হিয়ার।

—বাট, ইট্ ইজ্ ইম্প্লায়েড। কথাটা ওর মধ্যে উহ্য রয়ে গেছে। উল্লেখ না থাকলেও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

—হাউ ?

—আমি এমনি বুঝিয়ে দিচ্ছি, ইওর অনার। প্রথমতঃ, দুধ আপনারা পান করেন, আমরা বাংলা দেশের লোকেরা দুধ 'খাই'। উই ঈট মিলকু। দুধ এখানে 'কঠিন' পদার্থ, এ সলিড ফুড। তরল পদার্থ যে 'ঈট' করা যায় না, সেকথা অবশ্যই মানতে হবে।

ক্ষণেক বিরতির পর অর্থাৎ যুক্তিটা সাহেবকে হৃদয়ঙ্গম করবার সময় দিয়ে পুনরায় শুরু করলেন ভূতপূর্ব উকিলবাবু,—দ্বিতীয়তঃ আপনার ঐ জেল কোডের ভাষায় সরকার বাহাদুর আজ আমাদের বাইরে থেকে 'স্পেশাল ফুড' আনাবার অনুমতি দিয়েছেন। কথাটা লক্ষ্য করবেন। স্পেশাল ফুড—বিশেষ খাদ্য। দুধকে খাদ্য অর্থাৎ খাবার যোগ্য করতে হলে তরল থেকে কঠিন, ইন্ আদার ওয়ার্ডস্, লিকুইড থেকে সলিড অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ, তাকে ছানা কিংবা ক্ষীরের আকার দিতে হবে। ইওর অনার, সন্দেশ হচ্ছে সেই ছানা, দুধেরই একটা রূপ, মিল্ক্ ইন্ অ্যানাদার ফর্ম।

অকাট্য যুক্তি। গ্রহণ না করবার মত কোনো ফাঁক খুঁজে পেলেন না গর্ডন সাহেব। সুতরাং সন্দেশের বাক্স হাতে হাতে ভিতরে চলে গেল তার অনুকরণ করল রসগোল্লা, পান্তুয়া, দানাদার ও চমচমের হাঁড়ি। দুগ্ধজাত দ্রব্যের ছদ্মবেশে কিছু মিহিদানা দরবেশ খাজা গজাও নির্বিবাদে পার হয়ে গেল।

গর্ডন উঠতে যাবেন, এমন সময় একজন কারাকর্মীর কাঁধে চড়ে তাঁর অফিসে এসে ঢুকল একটি বৃহৎ তানপুরা, সঙ্গে ওটি মঞ্জুর করবার আবেদন পত্র হাতে ডেপুটি জেলর। সাহেব চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব বড় করে শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, মাই গড ! ইজ দ্যাট অলসো এ মিলক্ প্রডাক্ট !

ডেপুটি বললেন, নো স্যর, এটা একটা বাদ্যযন্ত্র, এ মিউজিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট !

—আই সী। কিন্তু আইনে তো শুধু স্পেশাল ফুড দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

'এক্সকিউজ মি স্যার', ডেপুটী জেলর কোন উত্তর দেবার আগেই পিছন থেকে এগিয়ে এলেন আর একজন 'দ্বিতীয় শ্রেণী', 'অন্যের বেলায় বাদ্যযন্ত্র হলেও আমার কাছে এটি স্পেশাল ফুড, বলা যেতে পারে স্পিরিচুয়াল ফুড,

আধ্যাত্মিক খাদ্য। আমার বাড়ি থেকে আর কোনো খাদ্য আনাইনি। কোনরকম স্থূল খাদ্যে আমার স্পৃহা নেই। আমি একজন সুরসাধক।'

শেষ কথাটা সাহেবের বোধগম্য হল না। ডেপুটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ডাজ হি সে?

'সুর সাধক' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ অত তাড়াতাড়ি ডেপুটি বাবুর মাথায় এল না। তার প্রয়োজনও হলো না। ডিভিসন টু প্রিজনার সুকেশ দত্ত নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি সঙ্গীত শিল্পী। ভোরে উঠে কিছুক্ষণ সুরালাপ তার নিত্য কর্তব্য। তার জন্যে ঐ তানপুরাটি একান্ত আবশ্যক। খাদ্যের চেয়েও এটি তার বড় প্রয়োজন।

গর্ডন সাহেব সুকেশের হিষ্ট্রি টিকেটখানা চেয়ে নিলেন যার মধ্যে কয়েদীর নাম, ধাম, বিবরণ, কোন ধারায় কতদিনের জেল, কী পেশা ছিল জেল হবার আগে—সব কিছুর তালিকা থাকে। তার থেকে পাওয়া গেল, ফোর্ টোয়েনটী অর্থাৎ প্রতারণা মামলায় তিন বছরের সাজা নিয়ে এসেছে সুকেশ দত্ত। পেশার ঘরে লেখা—'নিল'। কোর্টের ওয়ারেণ্ট থেকে ঐ তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়।

'এখানে আসবার আগে আপনি কী করতেন?' প্রশ্ন করলেন সুপার।

—গান বাজনা।

—ব্যস? আর কিছু না?

—আর কিছু করবার আমার অবসর ছিল না, স্যর। সঙ্গীত আমার ধ্যান জ্ঞান সাধনা। ঐ তানপুরাটি ছিল আমার দিনরাতের সঙ্গী। ওটি না হলে আমার ঘুম হয় না সাহেব!

সুকেশ দত্তের আবেদনে এমন একটি গভীর অকপট সুর শুনতে পেলেন মেজর সাহেব, যা তাঁর অন্তর স্পর্শ করল।

জেল কোড্ উলটে পালটে দেখলেন। তানপুরার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বিধান চোখে পড়ল না। একটা রুল পেলেন—'Complete Silence should be observed at all hours.' জেলখানার জীবনযাত্রায় দিনে রাতে কোনো সময়ে কোলাহল-কলরবের স্থান নেই। সব কিছু চলবে একান্ত নীরবে। তানপুরাটার মাথা থেকে তলা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন সাহেব। জানতে চাইলেন, কোনো রকম লাউড্, মানে উঁচু আওয়াজ বেরোয় কি ওর থেকে?

'না, সাহেব' দাঁতে জিভ কেটে মাথা নাড়লেন সুকেশবাবু, 'মৃদু, অতি মৃদু স্বর এবং অত্যন্ত মধুর।'

ডেপুটিবাবুর কাছ থেকেও যন্ত্রটির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান সংগ্রহ করলেন সাহেব।

তানপুরা মঞ্জুর হয়ে গেল। মেজর গর্ডন তাঁর বন্দীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে চান। সঙ্গীতের চেয়ে মহৎ ও পবিত্র আর কী আছে? এই লোকটা অন্য কারো ক্ষতি বা জেলের আইনভঙ্গ না করে অবসর সময়ে যদি তার কিছুটা চর্চা করতে চায়, আপত্তির কারণ নেই। তার অপরাধ-প্রবণ মনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার জন্যে এ বিষয়ে তাকে বরং উৎসাহিত করা দরকার।

সুকেশ দত্ত প্রতিদিন ভোরবেলা তানপুরার সাহায্যে নিয়মিত সুর ভাঁজেন! তার নিজের ওয়ার্ড তো বটেই, পাশাপাশি ব্যারাক থেকেও শোনা যায়। দুচার-দিনেই ব্যাপারটা দূরের ওয়ার্ডের তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। দু'চারটি উৎসাহী ভক্তও জুটে গেল এখানে সেখানে। সবই প্রায় দেশোয়ালী। বাইরে থাকতে দল বেঁধে পাড়া কাঁপিয়ে ভজন গাইত। জেলে এসে গলা বন্ধ হয়ে গেছে। কানেও এতদিন গীত বা গাওনা বলে কোনো জিনিস ঢোকেনি। এ বাবুটির বাহাদুরি আছে। জেলের মধ্যে সুর আমদানি করেছেন, বড় সাহেবের হুকুম নিয়ে রীতিমত গলা সাধছেন, সঙ্গে তানপুরাও আছে।

সাধারণ কয়েদীদের চোখে সুকেশবাবুর মর্যাদা বেড়ে গেল। ভক্তেরা নাম দিল 'ওস্তাদজী'। ক্রমশঃ সেটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ওয়ার্কশপে যাবার পথে কিংবা কাজ শেষ করে যখন ফেরেন, চারদিকে পড়ে যায় সেলামের সমারোহ। কারো কারো মুখে বিনীত, কুশল প্রশ্ন—'তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় ওস্তাদজী?' 'ভালো আছেন তো ওস্তাদজী?' সুকেশবাবু প্রসন্ন হাসির প্রসাদ দিয়ে ভক্তদের আপ্যায়িত করেন, সগর্বে এদিক ওদিক তাকান স্বজাতি অর্থাৎ অন্যান্য ডিভিশন-টু'দের মুখের পানে, সেলাম পাবার মত কোনো বিদ্যা বা বৈশিষ্ট্য যাদের নেই।

সেখান থেকেই গণ্ডগোল বাধল।

'ডিভিশন-টু' অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা থাকেন 'সেল'-এ। নামে 'সেল' হলেও কোলকাতার কোনো কোনো কলেজ-হস্টেলের সিঙ্গলসীটেড্ কামরার, (বিশেষ করে ইডেন হিন্দু হস্টেলের কাঠের খুপরির) চেয়ে অনেক ভালো, দক্ষিণ খোলা পাশাপাশি ঘর, সামনে প্রশস্ত বারান্দা। কিছু আসবাবও আছে—গদি-আঁটা লোহার খাট, চেয়ার, টেবিল ও দেয়াল-আলনা। সুকেশের পাশের কামরাটি যার, বিজন সোম বরাবর একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। ভোর বেলা একবার উঠতে হয়, 'নম্বর খোলার' সময় সমস্ত ওয়ার্ডের দরজা যখন খোলে, জেলর সাহেব কিংবা তাঁর কোনো ডেপুটি তখন রাউণ্ড দিয়ে যান। সবাইকে একবার গিয়ে দাঁড়াতে হয় তাঁদের সামনে। দেখা দিয়েই বিজন আবার গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। সুকেশের গলা সাধা শুরু হবার পর থেকে এই দ্বিতীয় দফা ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল।

যে সব কারণে মানুষের মেজাজ খিঁচড়ে যায়, তার মধ্যে অতৃপ্ত নিদ্রার স্থান বোধহয় কারো চেয়ে কম নয়। সেটা যখন দিনের পর দিন জমতে থাকে, শান্ত, ধীর, নির্বিরোধ ভালোমানুষের মাথায়ও হঠাৎ খুন চেপে বসে। বিজন সোমের ক্ষেপে যাবার আর একটা কারণ ছিল। ওস্তাদীর সঙ্গীতের উপর তার চিরদিনের বিতৃষ্ণা—বিশেষ করে তার এই অনুশীলন বা কসরত।

সেদিন রাত্রে ঘুমটাও ভালো হয়নি। জেলর সাহেবেরা রাউণ্ড্ মিটে যাবার পর বিজন বেচারা সবে গিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিশে মাথা ঠেকিয়েছে, পাশের সেল থেকে মোটা গলার 'আ-আ-আ-আ' হঠাৎ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। এক লাফে সুকেশের সামনে পড়ে মুখের উপর

তর্জনী তুলল,—'আপনার ঐ চেঁচানি এই মুহূর্তে বন্ধ করবেন কিনা জানতে চাই।'

সুকেশও লাফ দিয়ে উঠে বলল, উইৎ-ড্র ; আই সে—উইৎ-ড্র।

—কী উইৎ-ড্র ! কী বলছেন পাগলের মত ?

—প্রত্যাহার করুন। যা বললেন, এখনি প্রত্যাহার করুন। এটা চেঁচানি নয় আলাপ !

—বন্ধ না করলে আলাপ এখনি বিলাপে গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলে দিচ্ছি, মশাই।

—কেন বন্ধ করবো ? আপনি ফতোয়া দেবার কে ?

এধার ওধার থেকে আরো কয়েকজন বেরিয়ে এসে বিজনের পক্ষ নিল। দেখতে না দেখতে হাঁকাহাঁকি থেকে শুরু হল হাতাহাতি। গণ্ডগোলের মধ্যে কে একজন তানপুরাটা টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিতেই তার পেট ফেটে চৌচির, এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কাগজে মোড়া ছোট বাণ্ডিল। ততক্ষণে ডিউটি সিপাই এসে পড়েছিল, সবাইকে ঠেলে ঠুলে সরিয়ে দিয়ে মোড়কটা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল—গাঁজা হ্যায়।

'গাঁজা ?' সবাই এসে ঘিরে ধরল সিপাইকে, 'কী আশ্চর্য ! তাই তো !'

জেলখানায় গাঁজা অতি মারাত্মক বস্তু। আইনের ভাষায় 'কণ্ট্রাব্যাণ্ড', কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। শুধু সেবন নয়, গ্রহণ এবং রক্ষণও একই ভাবে দণ্ডনীয়। অর্থাৎ কারো কাছে কিংবা আওতার মধ্যে পাওয়া গেলেও তার শাস্তি হবে। সুকেশের বেলায় সেবনেরও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। গাঁজা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সিপাই তার সেল তল্লাসি করে বিছানার ভাঁজের ভিতর থেকে বের করল একটি কলকে কিছু অগ্নিসংযোগের সরঞ্জাম।

বিচারের সময় সুপারের প্রশ্নের উত্তরে সুকেশবাবুর বলার ইচ্ছা ছিল—'গঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব গঞ্জিকা সেবী।' বলল না। জেলার সাহেবের চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। লোকটা একেবারে বেরসিক কাঠখোট্টা। ওর সামনে এসব ধর্মতত্ত্ব নিষ্ফল তো হবেই, এজাতীয় কথাবার্তার ভবিষ্যৎ ফলও তার পক্ষে সুখের হবে না।

সুকেশ দত্তের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হল। মেজর গর্ডন তার সমস্ত রেমিশন (এতদিন জেল খাটবার ফলে দণ্ডকাল থেকে তিনি যে কদিন মাপ বা মকুফ পেয়েছিলেন) কেটে দিলেন, এবং সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন, আগামী ছমাসেও তাকে কোনো রেমিশন দেওয়া হবে না।

সুকেশবাবুর তানপুরা গেল, সুরালাপ বন্ধ হলো, কিন্তু 'ওস্তাদজী', নামটা বেঁচে রইল। তফাৎ শুধু এই, যে সাধারণ কয়েদীর স্তর থেকে প্রায় উঠে গিয়ে খেতাবটা ছড়িয়ে পড়ল তার নিজের স্তরে, অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর কয়েদীদের মুখে মুখে। সিপাই জমাদার এবং কিছু কিছু বাবুদের মহলেও কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে 'ওস্তাদজী' ডাক চালু হয়ে গেল।

পুরনো নামের এই নতুন ব্যাখ্যাটা সুকেশ যে সর্বদা চুপ করে মেনে নিতেন, তা নয়। মাঝে মাঝে মুখ খুলতেন এবং তাই নিয়ে এর ওর সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। জেলর কখনো বুঝিয়ে, কখনো বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেন, ব্যাপারগুলো সুপার পর্যন্ত গড়াত না। তারপর এমন একটা কাণ্ড ঘটল, যার ফলে সুকেশ দত্তকে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হলো মেজর গর্ডনের 'কেস্-টেবিলের' সামনে, জেল কোডের ভাষায় রীতিমত 'মেজর অফেন্স্' অর্থাৎ গুরুতর অপরাধের অভিযোগে।

জেলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কয়েদির জন্য যে 'টিকিট তৈরী হয় যার নাম হিস্ট্রী টিকেট, তার মধ্যে অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে তার তখনকার ওজনটাও বসিয়ে দেওয়া হয়। এইসব বিবরণ প্রথমে লেখা হয় অ্যাডমিশন রেজিস্টার বা 'আমদানী কেতাব' বলে একটি বহুঘরওয়ালা বৃহৎ গ্রন্থে। তার থেকে তোলা হয় টিকিটের মাথায়। তারপর দিনে দিনে অনেক কিছু তথ্য তার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে—কবে কোথায় সে চিঠি লিখল, আপীল করল, কি করল না, করলে তার ফল কী হলো, কী কাজ দেওয়া হলো তাকে, কত রেমিশন পেল, কোন অপরাধে কী শাস্তি হলো ইত্যাদি। প্রতি চৌদ্দ দিন অন্তর কয়েদীর ওজন নেওয়া এবং পর পর লেখা হয়ে যায় টিকিটের পাতায়!

সপ্তাহে একদিন কয়েদীদের 'প্যারেড্'। টিকিট হাতে করে পাশাপাশি লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। সুপার সদলবলে সামনে দিয়ে চলে যান, কারো কোনো নালিশ বা প্রার্থনা থাকলে শোনেন এবং সে সম্পর্কে সময়োচিত আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশ যা দেবার, ব্যক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারী সেটা 'নোট' করে নেন কিংবা তেমন কিছু যদি হয় যা তৎক্ষণাৎ মিটে যেতে পারে, সেইমত 'অ্যাকশান' নেন। এমনি এক সাপ্তাহিক প্যারেডে সুকেশ দত্ত সবিনয়ে নিবেদন করলেন, জেলের সাধারণ খাবার, রোজ যেটা দেওয়া হয়, তিনি অনেকদিন থেকেই খেতে পারছেন না, তার ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন, চলতে গেলে হাঁপ ধরে, উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে ইত্যাদি।

মেজর গর্ডন (একাধারে সুপার ও মেডিক্যাল অফিসার) দত্তের হাত থেকে টিকিটখানা নিয়ে প্রথমেই নজর দিলেন ওজনের 'ঘরে'। আগাগোড়া খালি। শুধু বছর দেড়েক আগে যেদিন প্রথম ভর্তি হলেন জেলখানায়, সেদিনকার ওজনটা লেখা আছে—১৪৭ পাউণ্ড; আর আছে গতকাল যেটা নেওয়া হয়েছে—১১৪ পাউণ্ড। অর্থাৎ সতর মাসে তেত্রিশ পাউণ্ড ঘাটতি। অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।

'খাবার খেতে পারছেন না কেন?' প্রশ্ন করলেন সাহেব, 'কী অসুবিধে হচ্ছে?'

'হোয়াট্ ইজ্ ইওর ট্রাবল?'

'ঐ রকম খাবারে আমি অভ্যস্ত নই।'

সকলের চোখেই বিস্ময় ফুটে উঠল। ডিভিসন টু প্রিজনারের খাদ্য তালিকা পুষ্টি পরিমাণ এবং প্রকার, কোন দিকেই তো মধ্যবিত্তশ্রেণীর অযোগ্য নয়।

বরং তার মান আরো একটু উপর স্তরের।

'আমরা তো ও' রকম খাবার খেতে পাই না'—মন্তব্য করলেন জেলর সাহেব।

গর্ডন দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে, এই দীর্ঘকাল ধরে ওজন নেবার ব্যবস্থা হয় নি কেন?

ডাক্তার দত্তের কাছেই জানতে চাইলেন কারণটা—'ওজন নিতে যাননি বুঝি?'

—গিয়েছি বৈকি? 'ওয়েট'ও নেওয়া হয়েছে। দু' একটা হয়তো বাদ গেছে।

—কিন্তু একটাও তো এখানে নোট করা হয়নি, দেখছি।

—আপনার 'রাইটার বাবুরা' যদি সে ফুরসতটুকু না পান, আমি কি করতে পারি, বলুন। টিকিট তো আর হাতে হাতে পাওয়া যায় না। 'পরে পাঠিয়ে দেবো।' তারপর ঐ যা দেখছেন!

[যে সব লেখা-পড়া জানা কয়েদী বিভিন্ন বিভাগের জেল-কর্মচারীদের নানা কাজে সাহায্য করে, তাদের বলা হয়—'রাইটার' (writer); অন্য সকলের তুলনায় তারা একটু বেশি খাতির পেয়ে থাকে।]

গর্ডন সাহেব তাঁর সদ্যোলব্ধ বাংলা জ্ঞান দিয়ে সুকেশ বাবুর মন্তব্যটা বুঝতে পারলেন। রাইটারদের উপর আর একটু কড়া নজর দেবার উপদেশ দিয়ে ডাক্তারকে বললেন, 'গিভ্ হিম্ সাম্ স্পেশাল ফুড।'

ওজন কমে গেলে জেল কোডে তার ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। সুকেশ দত্তের জন্যেও বাড়তি এবং বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা হলো—আরো ডিম, আরো মাংস, আরো মাখন এবং তার সঙ্গে সেরখানেক দুধ ও দু'রকমের ফল।

এবারেও গৃহশত্রু—অর্থাৎ নিজের ওয়ার্ডের কোনো ঈর্ষাপরায়ণ স্ব-জাতির ষড়যন্ত্রের কবলে পড়লেন সুকেশবাবু। চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছোকরা, মারামারি করে জেলে এসেছে। গোড়া থেকেই সুকেশদা'র সঙ্গে খুব ভাব। যখন তখন গিয়ে বসে ওর ঘরে। সুকেশ তাঁর বাড়তি খাবারের কিছুটা—কখনো একটা ডিম, কখনো একটু মাখন কিংবা মাংসের স্টু—নিখিলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খান। ও নিতে না চাইলেও জোর করে চাপিয়ে দেন। তার থেকেই এই খাদ্য সংগ্রহের ইতিহাস সম্বন্ধে সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, এবং হয়তো সুকেশেরই কোনো অসতর্ক মুহূর্তের উক্তি তার মনে খানিকটা সন্দেহের উদ্রেকও করে থাকবে। সন্দেহটা বাড়িয়ে তুলল একটি অতি তুচ্ছ জিনিস—একখণ্ড রবার যা দিয়ে ঘষে ঘষে পেন্সিল ও কালির দাগ তোলা হয়। জিনিসটা নিজে থেকে সন্দেহজনক নয়—যদিও সুকেশের সেলএ তার উপস্থিতির কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত—কিন্তু নিখিলকে দেখেই যে-রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি ওটা লুকিয়ে ফেললেন, তাতেই সে রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তার এক বন্ধু ছিল 'আমদানী-সেরেস্তার' রাইটার, 'আমদানী কেতাব' থেকে কয়েদীর টিকিট তৈরি করা যার কাজ। তার কাছে গল্পচ্ছলে ব্যাপারটা জানাতেই সে চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ কি ভাবল এবং পরদিনই কোনো এক অজুহাতে সুকেশের টিকিটখানা সংগ্রহ করল। প্রথম পাতার মাথায় ওজনের অঙ্কটা তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করে রাইটারের চোখদুটো

আরো কুণ্ঠিত হলো। তারপর বাকী পাতাগুলোর ওজনের 'ঘরটা'ও ভালো করে দেখল।

বছর দেড়েক আগেকার অ্যাড্‌মিশন্‌ রেজিস্টার রেকর্ডরুমের র‍্যাকে গিয়ে উঠেছিল। অনেক ধুলো ঘেঁটে 'রাইটার' তাকে উদ্ধার করে 'সুকেশ দত্তকে' খুঁজে বের করল। দেখা গেল সেখানে তার ওজন রয়েছে ১০২ পাউন্ড, সাম্প্রতিক ওজনের চেয়ে ১২ পাউন্ড কম। অর্থাৎ জেলে আসবার পর তার দেহের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে—১০২ থেকে ১১৪তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হিণ্ট্রি টিকিটের মাথায় ওজনের কলমে ঐ '১০২' অঙ্কটাই বসানো হয়েছিল। নিপুণ হাতের ঘর্ষণ এবং পুনর্লিখনের ফলে সেটি একদিন '১৪৭' হয়ে সুপারের সামনে আবির্ভূত হলো। পরের ওজনগুলো ওর সঙ্গে খাপ খাবে না বলে বেমালুম উড়ে গেল।

রাইটারটি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী, ডিভিশন থ্রী। লেখাপড়া, আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক পদমর্যাদা—কোনো দিকেই ডিভিশন টু সুকেশ দত্তের নীচে নয়। 'ওস্তাদজীর' উপর সে প্রসন্ন ছিল না। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের নজরে চলে গেল। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে সুকেশের সেল থেকে সেই তুচ্ছ রবার খণ্ড এবং তার ফাউন্টেন পেনটি সংগ্রহ করলেন।

যথারীতি তদন্তাদির পর সুকেশ দত্তের নামে নতুন অভিযোগ দায়ের করা হলো—সরকারী রেকর্ডের অবলোপ ও অদলবদল, প্রতারণার দ্বারা অন্যায় সুবিধা আদায় ইত্যাদি।

সুপারের সামনে সুকেশ সব অপরাধ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। ওজন বাড়িয়ে বা ঘষে তুলে বাড়তি খাদ্য আদায়ের মত হীনকাজ তার পক্ষে অসম্ভব। তাকে বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্যে 'কে বা কাহারা' করে থাকবে।

মেজর গর্ডন এবার তাকে এক মাসের জন্যে 'সেপারেট কন্‌ফাইনমেণ্ট' অর্থাৎ নির্জন সেলএ বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। স্পেশাল ফুড আগেই কেটে দেওয়া হয়েছিল।

কঠোর দণ্ডাদেশ ধীর ভাবে গ্রহণ করলেন সুকেশ দত্ত। কেস টেবিল থেকে চলে যাবার আগে সুপারকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমার একটি সামান্য প্রার্থনা ছিল, সাহেব।

—ইয়েস?

—আমাকে একটি তানপুরা মঞ্জুর করা হোক। বাড়ি থেকে আনাতে যদি আপত্তি থাকে আমার যে টাকা এখানে জমা আছে তা দিয়ে দোকান থেকে আনিয়ে দেবার হুকুম দিন।

সাহেবকে প্রথম দিন বলা হয়েছিল, তানপুরা এমন একটি বাদ্যযন্ত্র, গান শিখতে বা অভ্যাস করতে যার 'সহায়তা' লাগে।

সেই কথাটা বোধ হয় মনে পড়ল। জবাব দিলেন নতুন শেখা বাংলা ভাষায়, (কিছুদিন আগে 'ডিপার্টমেণ্টাল' পাশ করেছেন) 'আপনি অনেক বড় ওস্তাদ আছেন। কারো সহায়তার দরকার নাই।'

মানুষ মাত্রেরই কোনো না কোনো শখ থাকে, ইংরেজিতে যাকে বলে hobby, সুবীর ঘোষের হবি ছিল ছবি, ছবি সংগ্রহ। জীবন কাটিয়েছেন বর্মায়। নৌবিভাগে বড় চাকরি করতেন। অবসর নেবার পর ওখানে আর মন টিকল না। মান সম্মান বজায় রেখে বাস করাও কঠিন হয় উঠল। দেশে ফিরে এলেন। টালিগঞ্জে পৈতৃক বাড়ি। অঞ্চলটা প্রথমে ফাঁকাই ছিল; কোথা থেকে একদল ছিন্নমূল মানুষের প্রবল বন্যায় রাতারাতি ভরে গেল। ঘোষ সাহেব সরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। জলের টান তখনো বোধহয় কাটাতে পারেন নি। গঙ্গার ধারে একটা পুরনো বাগানবাড়ি কিনে ফেললেন এবং পছন্দমত সংস্কার ও অদলবদলও করে নিলেন। চারিদিকে বিস্তৃত বাগান। অনেকদিন অযত্নে ও অবহেলায় আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ওঁর হাতে পড়ে আবার পূর্বশ্রী ফিরে এল।

ছোট পরিবার। দুটি ছেলে; দুজনেই বিদেশে। বড়টি বর্মাতেই রয়ে গেছে, ছোটটি ওয়েস্ট জার্মানীর একরকম স্থায়ী বাসিন্দা। মেয়ে একটি, সকলের ছোট, বি. এ. পড়ে। এতদূরে এসে পড়াটা তার বিশেষ মনঃপূত হয় নি। বাবা বুঝিয়েছিলেন, প্রথম দুচার দিন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে; আস্তে আস্তে মন বসে যাবে, দেখিস; তারপর গাড়িটা তো রইলই। ভালো না লাগলে বন্ধুদের বাড়িগুলো একবার করে চক্কর দিয়ে আসবি।

অমিয়া এতদিন তাই করছিল। সম্প্রতি আর তার তেমন প্রয়োজন নেই। একটি মনোমত তরুণ সঙ্গীর আবির্ভাব ঘটবার পর থেকে সঙ্গিনীদের আকর্ষণ অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। চক্করগুলো নিয়মিত প্রদোষই দেয়, এবং যতক্ষণ থাকে, এই 'জঙ্গলেঘেরা হাঁদামুখো বাড়িটা' (বর্ণনাটি অমিয়ার) কিংবা তার সামনে ঐ খোয়া ওঠা রাস্তা, প্রকাণ্ড ফাটল ধরা ঘাট এবং ঝুঁকে পড়া বটগাছ —কোনটাই আগের মত dull বা প্রাণহীন মনে হয় না, বরং সমস্ত অঞ্চলটাই নতুন নতুন আবিষ্কারের ছোঁয়া লেগে প্রতিদিন মনোরম হয়ে উঠছে।

গৃহিণীর সমস্যাটা কন্যার মত অত সহজ নয়। তবু একমাত্র কপালের উপর নির্ভর করে ঘোষ সাহেব এ ব্যাপারে একটা মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন। প্রথম প্রথম চান্সটা বেশ লেগেও গেল।

মিসেস্ ঘোষের জীবনের অর্ধেক কেটেছে বর্মা মুলুকে, নানা জাত ও নানা ভাষার বর্ণাঢ্য সমাজের উচ্চ মহলে। কত বিচিত্র নর-নারীর সমাবেশ! দিন এবং রাতগুলো ছিল ক্লাব, পার্টি, নাচগান, জলসা পিকনিক দিয়ে ঠাসা। কলকাতার শহরে তেমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে সময় লাগবে। সে সমৃদ্ধিও তাঁদের নেই। সেইজন্যে তিনি আসতে চান নি। অনন্যোপায় হয়েই আসতে হয়েছিল। টালিগঞ্জের বাড়ি তিনি কখনো দেখেন নি। দোরগোড়ায় পা দিয়েই বিধিদত্ত উন্নত নাসিকাকে আরো খানিকটা উপরে তুলে, সেখানে এমন একটি কুঞ্চন ফুটিয়ে

স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন যে, ঘোষ সাহেব তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ না ফিরিয়ে পারেন নি। যে কটা দিন ওখানে ছিলেন, তাঁকে প্রায়ই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত। অবশ্য সাত দিন না যেতেই সস্ত্রীক চৌরঙ্গী পাড়ায় একটি অভিজাত ক্লাবের সভ্য তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি এবং বিশেষ করে তার পরিবেশটাকে তো পালটে ফেলতে পারেন নি।

সেই পরিবেশের পরিবর্তনটাই হয়তো মিসেস্ ঘোষকে টালিগঞ্জের বস্তি ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরের বনভূমিতে আকৃষ্ট করে থাকবে। তাছাড়া ছোটখাট পার্টি জলসার পক্ষেও জায়গাটা মন্দ নয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সব কিছু ছাপিয়ে শহরের দূরত্বটাই যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে সেদিন কি করবেন মিসেস্ ঘোষ। সেইকথা ভেবে ঘোষ সাহেব ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। এমন সময় দৈব তার সহায় হলেন। একটা অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটে গেল। 'অঘটন' না বলে বলা উচিত 'সুঘটন'। ঘোষ সাহেব অন্ততঃ সেই ভাবেই তাকে দেখেছিলেন সেদিন।

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলা যাক।

মিসেস্ ঘোষ গিয়েছিলেন হরিদ্বার। তীর্থযাত্রা নয়, দেশভ্রমণ। ওখানে কদিন থেকে ডেরাডুনে এক বর্মী বান্ধবীর অতিথি হয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আসবেন, এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। ওপারে হৃষিকেশে গীতাভবন দেখে খেয়ায় না উঠে লছমনঝোলার দিকে চলেছিলেন। ছায়াঢাকা নির্জন পথ। হঠাৎ বৃষ্টি এল। রাস্তার ধারে একটা ঘনপল্লব আম গাছ দেখে তার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বৃষ্টি আর থামে না। সঙ্গে ছাতা বা বর্ষাতি কিছুই নেই। ধারে কাছে কোনো বাড়িঘরও চোখে পড়ল না। পাতার ফাঁক দিয়ে যে জল চুইয়ে পড়ছিল, তার ধারও কম নয়। তবু যতটা সম্ভব গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। এদিকে বেলা আর নেই। আসন্ন অন্ধকার রাত। বৃষ্টি থামবার বা কমবার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না। বড়ই ভাবনায় পড়লেন মিসেস্ ঘোষ। ভয়ও হলো। একেবারে একা ; গায়ে বেশ কিছু গয়নাও রয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, রাস্তা একেবারে জনশূন্য।

হঠাৎ মানুষের গলা শুনে চমকে উঠলেন। মাত্র হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে এক সাধু। মনে হলো যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল লোকটা। কয়েক মিনিট আগেও এদিক ওদিক চেয়ে দেখেছেন, জনমানবের চিহ্ন মাত্র দেখতে পান নি। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ দূরে থাক, প্রতিকূল মনোভাবই পোষণ করে এসেছেন বরাবর। সর্বাঙ্গে ছাই-মাখা ভীষণ রোগা একটা নেংটিপরা লোক, একমাথা জটপাকানো চুল এবং এক মুখ গোঁফ দাঁড়ির জঙ্গল নিয়ে তাঁর এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আগে হলে নিশ্চয়ই ছিটকে সরে যেতেন কিংবা ভয়ে এবং বিতৃষ্ণায় চেঁচিয়ে উঠতেন। সেই মুহূর্তে তার কোনোটাই করলেন না। বরং মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নুইয়ে পড়ল। সাধু আগে কী বলেছিলেন, মিসেস্ ঘোষ বুঝতে পারেন নি, এবার পারলেন। সুস্পষ্ট সরল হিন্দী ; সুরটি স্নিগ্ধ এবং আশ্বাসময়—ভয় কি মা ? চল, আমি তোমাকে

পৌঁছে দিচ্ছি।

মিসেস্ ঘোষ কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ মুখে কোনো কথা যোগাল না।

হরিদ্বারের একটি অভিজাত হোটেলের নাম করে সাধু বললেন, তুমি ওখানেই উঠেছ তো?

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ' সবিস্ময়ে চোখ তুললেন মিসেস্ ঘোষ, 'আপনি কি করে জানলেন?'

উত্তরে সাধু শুধু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, একটু দাঁড়াও, বৃষ্টিটা থামুক। বেশী দেরি হবে না; মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ধরে যাবে।

আশ্চর্য! ঠিক পাঁচ মিনিট না হলেও সাত আট মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেল। মিসেস্ ঘোষ নিঃশব্দে সাধুর অনুসরণ করলেন। পথে যেতে যেতে অনেক প্রশ্ন তাঁর মনে এল। কোনটাই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। সাধুও আর কোনো কথা বললেন না।

লছমনঝোলার ধার পর্যন্ত এসে সাধু বললেন, এবার একা যেতে পারবে তো? ওপারে গাড়ি পাবে।

মিসেস্ ঘোষের মুখে এসে গিয়েছিল 'ধন্যবাদ', এসব ক্ষেত্রে তাঁদের সমাজে যেটা রীতি। কিন্তু কথাটা ওষ্ঠ প্রান্তে এসে আটকে গেল। এখানে ওটা মানায় না। তার বদলে নত হয়ে সেই প্রায় উলঙ্গ অপরিচ্ছন্ন মানুষটার কাদা মাখা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। স্পর্শ মাত্র সমস্ত শরীরে কেমন একটা শিহরণ জেগে উঠল। কয়েক মুহূর্ত বাক্‌স্ফূর্তি হল না! তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন সাধুজী?

—আমাদের তো কোনো স্থায়ী আস্তানা নেই মা, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। এখন কিছুদিন এই অঞ্চলে আছি। আবার যেদিন তাঁর ডাক আসবে, অন্য কোথাও চলে যাবো।

—এখানে আপনার আশ্রম কোথায়?

—আশ্রম টাশ্রম নয়, একটা ছোট্ট ডেরা বলতে পার। এখান থেকে বেশী দূর হবে না। ঐ পাহাড়ের ওপর।

ডান দিকে বনাকীর্ণ হিমালয়ের একটা চূড়ার দিকে আঙুল তুললেন যার পায়ের তলায় বড় বড় পাথরখণ্ডের বাধা ঠেলে তীব্র বেগে এবং অশ্রান্ত কলস্বরে ছুটে আসছিল নৃত্যপরা গঙ্গা।

দিন পনের গৃহিণীর খবর না পেয়ে ঘোষ সাহেব যখন রীতিমত ভাবতে সুরু করেছেন, মেয়েও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এমন সময় এল চিঠি। পড়েই প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো আরো খানিকটা দুর্ভাবনা, পরে যখন সমস্ত ব্যাপারটাকে ধীর-ভাবে বিবেচনা করে দেখলেন মনে হলো তাঁর দিক থেকেও এটা একরকম দৈবানুগ্রহ। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

গৃহিণী লিখেছেন, তাঁর শীঘ্র কলকাতা ফিরবার ইচ্ছা নেই। দৈবানুকূল্যে এবং জন্মার্জিত পুণ্যের ফলে তিনি একটি সাধু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আপাততঃ হরিদ্বারের সেই হোটেলেই আছেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুরুদেবের আশ্রমে আশ্রয় পাবার ভরসা পেয়েছেন। ওখান থেকে প্রায় পাঁচশ ফুট উপরে গঙ্গাতীরে তাঁর আশ্রম। স্থানটি একেবারে নির্জন। নিভৃতে বসে সাধন ভজনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তিন চারটি গুরুভাই ভগিনী হয়েছেন! তাঁরা সকলেই তাঁকে স্নেহ করেন। আশ্রমটি এখনো পুরোপুরী তৈরী হয় নি। হলেই তিনি জানাবেন। অমিয়াকে নিয়ে ঘোষ সাহেব একবার দেখেও আসতে পারবেন। ইত্যাদি।

দীর্ঘ চিঠির শেষ দিকের কথাগুলোই সব চেয়ে দরকারী। আশ্রমের দুখানা ঘরের (একখানা গুরুদেবের এবং অন্য খানা তাঁর) ব্যয় ভার তিনি বহন করবেন বলে কথা দিয়েছেন। হাজার পাঁচেক টাকার মধ্যেই হবে। টাকাটা যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই শেষ কটা লাইন ঘোষ সাহেবের মনে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। তারপর নিজেকে বোঝালেন প্রাপ্তির তুলনায় এ দণ্ডটা খুব বেশী নয়। প্রথমতঃ অমলা এই দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়িতে বেশী দিন থাকতে চাইত না, যতক্ষণ থাকত তাঁর জীবনটা দুর্বহ করে তুলত। দ্বিতীয়তঃ এখানে বসে তার পুরনো জীবন-যাত্রা চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ মাসে মাসে ককটেল পার্টি পিকনিক, জলবিহার ইত্যাদির গুরুভার আরো ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠত। সুতরাং এ ভালই হলো। এই গুরুদেবটি এসে বরং খানিকটা ভার লাঘব এবং অনেকটা অশান্তি মোচনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অমিয়া প্রথমটা মনমরা হয়ে রইল। কিন্তু সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হলো না। তারও নিজস্ব যুক্তি ছিল। প্রদোষ ইদানীং খুব ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল এবং সন্ধ্যা যাপনের সময়টা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে চলেছিল। মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে যেদিকে খুশি বেরিয়ে পড়া তো ছিলই। মা থাকলে নিশ্চয়ই এতটা অবাধ স্বাধীনতা সম্ভব হতো না। বাবার ওসব দিকে খেয়াল নেই। ছবি নিয়ে আছেন, কখনো কখনো বরং এসব ব্যাপারে উৎসাহই দিয়ে থাকেন, প্রদোষকে ডেকে বলেন, মেয়েটা বড় একা, তুমি একটু দেখো বাবা।

কোনোদিন হয়তো প্রস্তাব করলেন, এক কাজ করলে হয় না? কাল রবিবার আছে। অমিকে নিয়ে একবার ডায়মণ্ডহারবার বেড়িয়ে এসো না? সকালেই চলে এসো। এখান থেকে খেয়ে দেয়ে বেরোবে। কি বলিস অমি?

'অমি'র অন্তরের বার্তা অন্তর্যামীই জানেন।

বাবাও যে ভিতরে ভিতরে জানেন তা নয়। তবু চোখে মুখে বেশ খানিকটা নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, আমি ভাবছিলাম, কাল কালীঘাটে গিয়ে মাসীমাকে দেখে আসবো।

—কেন, মাসীমার আবার কী হলো?

—না, হয় নি কিছু। এমনিই; অনেকদিন যাই নি।

—আচ্ছা, সে আরেকদিন গেলেই হবে।

—তাহলে তুমিও চল না বাবা আমাদের সঙ্গে?

বলেই, চকিতে একবার প্রদোষের মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে। এতক্ষণ সেখানে যে প্রদীপ্ত উৎসাহের আলোকচ্ছটা ফুটে উঠেছিল, কে যেন হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। নিজের অজানতেই সে ঘোষ সাহেবের দিকে তাকায়। তিনি হয়তো সেটা লক্ষ্য করেন, কিংবা না করেই বলেন, আমি! আমার সময় কোথায়? কাল আবার দুজন আর্টিস্টকে আসতে বলেছি। তোমরা ঘুরে এসো। আমি না হয় পরে একদিন যাবো।

সময় সত্যিই ছিল না। ছবির ব্যাপারে ঘোষ সাহেব ইদানীং রীতিমত মেতে উঠেছিলেন। পুরনো ধরনের জমিদার বাড়ি। প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই প্রথমে বারান্দা, তারপর মস্ত বড় হল ঘর। আগেকার মালিকের আমলেও তার চার দেওয়াল জুড়ে টাঙানো ছিল বিশাল বিশাল অয়েল পেণ্টিং, মোটা মোটা হুক্‌গুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সম্ভবত তার বেশির ভাগ ছিল পোট্রেট্‌—তখনকার দিনের যা দস্তুর। ঘোষ সাহেবের বিশেষ ঝোঁক ল্যান্ড-স্কেপের দিকে। প্রকৃতি তাঁর মনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয়। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রায় কোনোটাই বাদ পড়ে নি।

সুরঞ্জিত হল-ঘরের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—কাঞ্চনজঙ্ঘা, এবং চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের আরো কয়েকটি শৃঙ্গ, বহু যত্নে এবং বহু জায়গা থেকে সংগৃহীত আলোক চিত্র থেকে সুদক্ষ চিত্রকর দিয়ে আঁকানো। তা ছাড়া রয়েছে নায়েগ্রার জলপ্রপাত, উত্তর বর্মার গভীর অরণ্যানী, নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালা, সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি লেক, কোথাকার যেন তৃণগুল্ম-হীন রুক্ষ কালো পাহাড়, মধ্য জাপানের কাজি নদীর ধারে ফুলে-ভরা চেরীগাছের অন্তহীন সারি, এবং আরো অনেক অনুপম দৃশ্য।

আধুনিক আর্ট বলতে যা বোঝায়, তার উপরে সুবীর ঘোষের আস্থা নেই। প্রকৃতি যাকে যে-রূপ দিয়েছেন, সেই রূপেই তাকে দেখতে চান। কোনো রকম বিকৃতি তার পছন্দ নয়। পরিবর্তন যদি করতে হয় তার একমাত্র মাপ-কাঠি হবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি—সেটা দেখতে আরো সুন্দর হল কিনা।

মানুষ আঁকতে গিয়ে তার মুখটাকে টেনে ঘোড়ার মত লম্বা করা, নাকটাকে চেপে বসিয়ে দেওয়া, হাতপাগুলো কাঠির মত করে দেখানো—এসব বিকার তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। এ নিয়ে কোনো আর্টিস্ট্‌ বন্ধুর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছে। বন্ধু বোঝাতে চেয়েছেন, ওটা বিকার নয়, ওর মধ্যেই তো সৃষ্টির ইঙ্গিত। শিল্পী ফটোগ্রাফার নন, তিনি স্রষ্টা। চিত্র আর আলোক চিত্র এক জিনিস নয়।

মিস্টার ঘোষ বলেছেন, ও-সব আমি বুঝি না। ছবির ব্যাপারে একমাত্র বিচারক আমার চোখ, আমার মন। ঐ চারহাত-লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা মানুষটাকে আমি মানুষ বলে নিতে পাচ্ছি না। ও আমার চোখে অসুন্দর, বিকৃত। ব্যস;

এর বেশী আমার আর কিছু দেখবার নেই!

আর একজন বন্ধু, দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের এঞ্জিনিয়র, ওঁকে কয়েকটি অত্যল্প-বসনা, উদ্ধত-যৌবনা আদিবাসী মুণ্ডা রমণীর ছবি এনে দিয়েছিলেন। উনি নেননি। বন্ধু বলেছিলেন, কেন, এর মধ্যে তো কোনো কৃত্রিমতা নেই। Here you find Nature in her real form. এই ওদের সত্যিকারের রূপ।

—হতে পারে; কিন্তু আমার মধ্যে যে একটি সভ্য শিক্ষিত মন আছে, তার কাছে এটা একটা repulsive দৃশ্য। একটা জন্তুকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখলে আমার মনে কোনো বিকার জাগে না, মানুষকে দেখলে জাগে। প্রথমটা আমার চোখকে পীড়া দেয় না, দ্বিতীয়টা দেয়। জন্তুর পক্ষে বস্ত্রহীন হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, অশালীন।

—'সব মানুষের পক্ষে নয়'—তর্ক তুলেছিলেন বন্ধু যেমন শিশু, যেমন এরা।

—এদের আমি শিশুর দলে ফেলতে পারছি না।

বন্ধু ফিরিয়ে দেওয়া ছবিটা তাঁর ব্যাগে পুরতে পুরতে বলেছিলেন, তুমি একটি কট্টর puritan.

ঘোষ সাহেব জবাব দেন নি, মৃদু হেসে বন্ধুর অভিযোগ মেনে নিয়েছিলেন।

প্রায় এক বছর ধরে মিস্টার ঘোষ হল ঘরের দেয়ালগুলো একটু একটু করে সাজিয়ে তুললেন। বড় বড় ছবি, দামী ফ্রেমে বাঁধানো। বেশ ফাঁক ফাঁক করে টাঙালেন, যাতে করে প্রতিটি চিত্র তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নিয়ে দর্শকের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরতে পারে। হল'এর যেটি প্রধান প্রবেশ-দ্বার, তার ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালে, ডাইনে বাঁয়ে দুখানা করে একই সাইজের ছবি রইল, মাঝখানে অনেকটা জায়গা খালি রেখে দিলেন, একটা আরো বড় ছবির জন্যে। সেটি তখনো আর্টিস্টের স্টুডিওতে। ধীরে ধীরে কাজ চলছে। ঘোষ সাহেব প্রায়ই দেখতে যান, দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন, কোথায় কোন রংটা মানাবে, কতটা আলো, কতটা ছায়া থাকবে, কোন রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটবে আর কোনটা মিলিয়ে যাবে ধূসর কিংবা কালো আবছায়ায়।

এই ছবিখানাকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সংগ্রহের সম্মান দিতে চান। দৃশ্যটা তাঁরই কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতির মণিকোঠায় এতদিন বন্দী হয়ে ছিল, এবার তার মুক্তি আসন্ন। ঠিক মুক্তি নয়, বাইরে এনে রেখার বন্ধনে বেঁধে রাখা। তিনি চিত্রকর নন। তাহলে তো নিজের হাতেই তাকে রূপ দিতে পারতেন। এখানে তাঁর কাজ আরো কঠিন। যে রঙ ও রেখা তাঁর মানসলোকে আত্মগোপন করে আছে, অন্যের হাতের তুলির মুখে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আর্টিস্টের কাজও কম কঠিন নয়, প্রতি টানটির জন্যে তিনি অন্যের কল্পনার মুখাপেক্ষী।

ছবির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। একখানি সাধারণ ল্যাণ্ডস্কেপ। পূর্ব বাংলার মাঠ; দূরে গাঢ় নীল অস্পষ্ট দিকচক্ররেখা; মাঝখানে সবুজের

সমারোহ। বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, আকণ্ঠ জলমগ্ন, মাথার দিকটা শুধু জেগে আছে। সেই ভাসমান শ্যামলিমার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নব বর্ষার ঘোলা জল (ও-অঞ্চলে বলে 'বগা')। মাঠের বুকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট কালো ডিঙ্গি। প্রতি ডিঙ্গিতে দুজন করে মানুষ, তারাও কালো, পেশী-বহুল সুঠাম দেহ, একজন পিছনে, হাতে বৈঠা, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে 'আগা গলুই' এর ধার ঘেঁষে, তার হাতে উদ্যত ট্যাটা কিংবা কোঁচ, চোখে মৎস্য শিকারীর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি!

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীতে যখন বর্ষার ঢল নামে, সেই বিপুল জলরাশিকে তারা আর ধরে রাখতে পারে না, দু কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেয় দূরে দূরান্তরে। খাল, বিল, নালা বেয়ে সেই ঘোলা জলের উদ্দাম ধারা ঢুকে পরে ধান ক্ষেতে। তার সঙ্গে আসে বড় বড় মাছ—রুই, কাতলা, মৃগেল, কিছু কিছু মহাশোল। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়—বগা এসেছে। মাঠ ছেয়ে যায় শিকারীর ডিঙ্গি নৌকোয়, এরা মৎস্যজীবী নয়, সাধারণ চাষী, কিন্তু শিকারে সুনিপুণ। ধান গাছের গোড়ায় যে শ্যাওলা জমে, মৎস্যরাজের সেটা বড় প্রিয় খাদ্য। সেই ভোজন-পর্ব যখন চলতে থাকে, উপর থেকে তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অব্যর্থ ট্যাটা কিংবা কোঁচ।

এই শিকারপর্বের মেয়াদ বড় অল্প—দু চার দিন। তার পরেই মৎস্যবাহিনী গভীরতর আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সে দুটো দিন গ্রামে গ্রামে কি গভীর উত্তেজনা! ঘোষ সাহেবের প্রথম জীবনে দেখা, কিন্তু তার জীবন্ত স্মৃতি বার্ধক্যের শীতল রক্তেও দোলা দেয়। ছবির ভিতর দিয়ে তাকে তিনি ধরে রাখতে চান।

ছবি শেষ হল। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন, কোথাও কোনো খুঁত নেই। ছবির সঙ্গে সুবীর ঘোষ যেন তার যৌবনও ফিরে পেয়েছেন, এমনি ভাবে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এলেন, উচ্ছল কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকলেন, 'অমি।' মেয়েকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার। অন্যদিন অমিয়াও সাড়া দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। আজ এল নীরবে, ধীরে ধীরে, নির্জীব পদক্ষেপে। ঘোষ সাহেবের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বললেন, কী হলো?

মেয়ে জবাব দিল না, একখানা চিঠি শুধু বাড়িয়ে ধরল বাবার দিকে, পোস্টকার্ড। কয়েকটি মাত্র লাইন। অমলা লিখেছেন, তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব অকস্মাৎ সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেছেন। ওদিকের একটা বিলিব্যবস্থা করে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসছেন। সঙ্গে গুটি তিনেক গুরুভাই থাকবেন। একতলার দুটো ঘর যেন তাঁদের জন্যে ঠিকঠাক করে রাখা হয়। 'অন্যান্য বিষয় সাক্ষাৎ মত বলিব ও শুনিব।'

চিঠি শেষ করে মিষ্টার ঘোষ মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। মায়ের গুরুদেবের 'দেহরক্ষা'র খবরে তার এতটা মুষড়ে পড়বার কারণ খুঁজে পেলেন না। কী বলবেন, ভেবে ঠিক করবার আগেই সে ভিতরে চলে গেল। তিনিও

নিজের ঘরের দিকে চললেন। যেতে যেতে হঠাৎ কানে এল, ওদিকের একটা অদৃশ্য ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা হচ্ছে। প্রদোষের গলা—এবার চলি।

অমিয়া—এত শিগগির?

প্রদোষ—এখন থেকেই অভ্যেস না করলে চলবে কেন? তোমার মা এসে পড়লে তো এটুকুও জুটবে না। একেবারে যাকে বলে পত্রপাঠ বিদায়, তাও হয়তো ঐ সিঁড়ির মুখ থেকে।

অমিয়া—কে বললে?

প্রদোষ—তিনি আবার একা নন, সঙ্গে কোয়ার্টার ডজন গুরুভাই!

ঘোষ সাহেব এগিয়ে গেলেন। ওষ্ঠ প্রান্তে একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। গুরুদেবের শোকটা যে ওদের কাছে এত তীব্র হয়ে দেখা দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

দুদিন পরেই ছবিটা অত্যন্ত দামী এবং সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে এসে গেল। ঘোষ সাহেব মেয়েকে ডেকে দেখালেন। সেও স্বীকার করল, সত্যি, বাবা, এটা তোমার সব ছবির সেরা। আর, ঐ ফাঁকটাতে মানাবেও খুব ভালো।

—মানাবে বলে মানাবে! এর জন্যেই তো জায়গাটা খালি রেখে দিয়েছি। টাঙাই আগে, তারপর দেখিস।

চাকরবাকরদের ডেকে বলে দিলেন, পরদিন সকালে সকলের আগে এইটাই হবে তাদের প্রথম কাজ। ভারী ছবি; আরো দু তিন জন লোক দরকার হবে! আজই যেন বলে রেখে দেয়। দড়ি, দড়া, হুক, সিঁড়ি ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন, সব কিছুর ব্যবস্থা করে সবে বাইরে বেরিয়েছেন, লাল সাইকেল নিয়ে ঢুকল টেলিগ্রাফ পিয়ন। কানপুরে কাকার অবস্থা গুরুতর, তাঁকে একবার দেখতে চান।

ছেলেবেলায় বাবা মারা যাবার পর এই কাকার হাতেই তিনি মানুষ। অনেক বয়স হয়েছে। এখন বেরিয়ে না পড়লে, হয়তো শেষ দেখাটাও হবে না। ঘণ্টা দুয়েক পরে একটা গাড়ি আছে, তাতেই যাওয়া স্থির করলেন। অমিয়াকে পাঠিয়ে দিলেন কালীঘাটে তার মাসিমার কাছে। প্রদোষের উপর ভার পড়ল পেঁছে দেবার।

কাকা সে-যাত্রার মত টিঁকে গেলেন। তাহলেও সাত আট দিনের আগে ঘোষ সাহেবের ফেরা হলো না। এ কদিন এদিকের কথা ভাববার ফুরসত পান নি। খালি বাড়ি ফেলে গেছেন, মেয়েটা রয়েছে অন্য জায়গায়, একটা খবরও নিতে পারেন নি। গৃহিণীরও আর কোন চিঠি পত্র পান নি। বেশ উদ্বেগ নিয়ে ফিরছিলেন। বিশেষ করে ছবিটার কথাই ভাবছিলেন। প্যাকিং খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। চাকরগুলো অসাবধান। ঘর ধোয়া পোঁছা করতে গিয়ে ধুলো কাদা লাগিয়েছে কিনা কে জানে।

বাড়ি পেঁছিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে দেখলেন, নিচের বারান্দায় দড়ির উপর গেরুয়া কাপড় শুকোচ্ছে। ও'রা তাহলে এসে গেছেন।

মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। এ কদিনের অনিয়ম, অনিদ্রা, পথশ্রম ইত্যাদি নানা কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

চাকরদের কারো নজরে পড়ে থাকবে। খবর পেয়ে অমলা এলেন। অমিয়াও এল। মা ফিরেছেন শুনে সে তার পরদিনই এসে পড়েছিল। দু তরফের কুশল প্রশ্নাদির আদান প্রদান হলো। তারপর গৃহিণী গেলেন চা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঘোষ সাহেব ছবিখানার খবর নিতে যাবেন, এমন সময় অমলা ঘরে ঢুকে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, একটা জিনিস তোমাকে দেখানো হয় নি।

'কী জিনিস ?' ঘোষ সাহেব উৎসুক হলেন।

—এখানে বলবো না ; দেখবে এসো।

প্রৌঢ়া স্ত্রী চলন-ছন্দে যৌবন-চাঞ্চল্যের উচ্ছলতা লক্ষ্য করলেন সুবীর ঘোষ। খুশী মনে তাকে অনুসরণ করলেন। •

হল ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। নিজের হাতে খুলে দিলেন অমলা। সমস্ত আলো নেভানো। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চললেন। এবার কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো কোন এক অজানা আশঙ্কায় ঘোষ সাহেবের বুকের ভেতরটা দোলা দিয়ে উঠলো। উল্টো দিকের দেয়ালের কাছাকাছি এসে অমলা হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিলেন।

হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা পাঁচশ পাওয়ারের তীব্র আলোয় ঘোষ সাহেব প্রথমটা কিছু ঠাওর করতে পারলেন না। পরক্ষণেই তাঁর গলার ভিতর থেকে কেমন একটা আঁৎকে ওঠার অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল।

সামনে, কয়েক গজ মাত্র দূরে তাঁর সযত্ন-রক্ষিত ফাঁকটুকু জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে চওড়া সোনালী ফ্রেমে বাঁধা এক বিশালকায় তৈলচিত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটুকরো কৌপীন ছাড়া দেহের কোথাও আর কোন বস্ত্র নেই। এক মাথা জট পাকানো চুল, এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি, এক বুক ঘন লোম। কোটরে ঢোকানো চোখ দুটোয় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক। কণ্ঠার হাড় দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। শুকনো শিরাবহুল হাত-পা। তার উপরে একটা কালো, কুঁচকে যাওয়া খরখরে চামড়ার আবরণ।

শুধু কুশ্রী বললে কিছুই বলা হলো না। ঘোষ সাহেবের মনে হল, মানুষের যে সহজ সৌন্দর্য-বোধ, ঐ ছবি এবং তার শিল্পী তাকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে।

অমলা দু হাত কপালে ঠেকিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, আমার গুরুদেব।

ঘোষ সাহেব এদিক ওদিক চেয়ে বোধহয় বসে পড়বার মত কোন একটা আশ্রয় খুঁজছিলেন। স্ত্রী বললেন, কী হলো ? কি খুঁজছ ?

ঘোষ সাহেব জবাব দিলেন না। দেবার চেষ্টা হয়তো করেছিলেন, কণ্ঠে স্বর ফোটে নি।

বৃথা হবে জেনেও সুবীর ঘোষ স্ত্রীর কাছে কথাটা একবার পেড়েছিলেন. আমতা আমতা করে বলেছিলেন, ও জায়গাটা আমি অন্য একখানা ছবির জন্যে রেখে ছিলাম।

—জানি; সে ছবি আমি দেখেছি, ঝাঁজিয়ে উঠেছিলেন মিসেস্ ঘোষ, 'ঐ ধান ক্ষেত আর তার মধ্যে কতকগুলো ডিঙ্গি নৌকা, ঐটা তো? কিসে, আর কিসে!'

বলে, প্রস্তাবটা একেবারে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন। ঘোষ সাহেব তখনো আশা ছাড়েন নি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন, না, মানে, আমি বলছিলাম, গুরুদেবের ছবিখানা যদি ঠাকুরঘরে কিংবা তোমার ঘরে—

—'কী যে বল, তার ঠিক নেই। এ কি পাথরের মূর্তি, না কালীঘাটের পট, যে ঠাকুরঘরে বসিয়ে রেখে দেবো? আর, আমার ঘরেই বা মানাবে কেন। উনি তো আমার একার গুরু নন। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, দেশ বিদেশে কত ভক্ত, কত শিষ্য সামন্ত ওঁর! সবাই আসবে, দেখবে।'

আর কোনো প্রস্তাবের সুযোগ না দিয়েই অমলা নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন।

আপাতত হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ঘোষ সাহেব অন্য কোনো পথ দেখতে পেলেন না। একবার অবশ্য ভেবেছিলেন, উপরের হলটা 'গুরুদেবকে' একা ছেড়ে দিয়ে তাঁর ছবিগুলো তিনি নিচের কোনো ঘরে সরিয়ে নেবেন। সেখানে যদিও তেমন কোন উপযুক্ত জায়গা নেই, তবু অগত্যা যেমন তেমন করে সেই ব্যবস্থাই হয়তো করতেন, এমন সময় আবার একটা অঘটন ঘটল, এবং আগের বারের মত একেও তিনি 'সুঘটন' বলেই লুফে নিলেন। কিংবা বলা যেতে পারে ডুবন্ত মানুষের তৃণ-খণ্ড আঁকড়ে ধরা।

কদিন ধরে অকাল দুর্যোগ চলছিল। একে কৃষ্ণপক্ষ তায় আকাশ জোড়া মেঘ। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাড়িটাও এমন জায়গায়, লোকজনের মুখ কদাচিৎ দেখা যায়। মিস্টার ঘোষের শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। সংক্ষিপ্ত ডিনার সকাল সকাল সেরে নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে রাত তিনটে না বাজতেই ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের অপেক্ষায় চোখ বুজে ছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চোখ খুললেন। মনে হলো, কে যেন ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। বালিশের নিচে টর্চ এবং পিস্তল থাকে। নিঃসাড়ে হাত ঢুকিয়ে দুটি বস্তুই বের করে নিলেন, এবং হঠাৎ উঠে বসে দুহাতে একসঙ্গে বাগিয়ে ধরলেন ছায়ামূর্তির দিকে।

জ্বলন্ত টর্চের তীব্র আলো চোখে পড়তেই লোকটা থমকে দাঁড়াল। ঘোষ সাহেব কোন রকম চেঁচামেচি করলেন না। পাশের ঘরে স্ত্রী বা কন্যার ঘুম না ভাঙে, এমনি ভাবে মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, খবরদার, নড়েছ কি গুলি করবো।

পিস্তলের নলটা চোরের একেবারে বুকের কাছে রেখে ঘোষ সাহেব তাকে চোখের ইশারায় দরজার কাছে হটিয়ে নিয়ে গেলেন এবং আস্তে আস্তে খিল

খুলে বারান্দায় গিয়ে পড়লেন। সেই ভাবেই ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে। আলোটা জেবলে দিয়ে বললেন, বের কর কি নিয়েছিস।

—কিছু নিই নি বাবু, বলে লোকটা বসে পড়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল।

—'আস্তে!' ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখলেন ঘোষ সাহেব, 'কদ্দিনের ব্যবসা? কবার জেল খেটেছিস?'

লোকটা মাথা নিচু করে রইল, জবাব দিল না।

—'বল', চাপা গলায় ধমক দিলেন মিস্টার ঘোষ।

—এজ্ঞে, তিনবার।

—কোথায় থাকিস?

—ওপার।

—এপার এলি কী করে?

—এজ্ঞে, ডিঙ্গি নৌকোয়। ছেড়ে দ্যান বাবু, এই নাকে খত দিচ্ছি আর কোনদিন আসবো না।

হাত তিনেক পিছিয়ে গিয়ে নাকটা মেঝের ওপর ঘষতে ঘষতে হামা দিয়ে এগিয়ে এল ওঁর পায়ের তলায়।

ঘোষ সাহেব লোকটার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলেন। বেশ লম্বা চওড়া মজবুত দেহ। চোখ দুটো ছোট, চেহারার সঙ্গে নিতান্ত বেমানান। তার মধ্যে কেমন একটা অসহায় ভালমানুষি ভাব। কী ভাবলেন, তিনিই জানেন। নরম সুরে বললেন, এই, একটা কাজ করতে পারবি? পারিস তো, ছেড়ে দেবো।

চোর করুণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো ওঁর মুখের পানে।

—'আয় আমার সঙ্গে' বলে ওকে হল ঘরে নিয়ে গেলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটা মাত্র আলো জেবলে ফিস্‌ফিস্‌ করে বুঝিয়ে দিলেন, কী করতে হবে।

লোকটা খুশির সুরে বলল, এ আর বেশী কথা কী বাবু, বলেন তো আজই—

বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছিল। সেদিকে চেয়ে ঘোষ সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, আজ নয়। পরশু সন্ধ্যের পর এসে খবর নিয়ে যাস, কবে। কাজ হাঁসিল হলে মোটা বকশিশ দেবো বুঝলি? আচ্ছা দাঁড়া।

ভিতরের দিকে দ্রুত প্রস্থান করলেন ঘোষ সাহেব। শোবার ঘরের আলমারী খুলে একখানা দশ টাকার নোট এনে বললেন, নে, আপাততঃ এটা রেখে দে।

লোকটি কথার খেলাপ করে নি। নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্ধারিত সময়ে গঙ্গার ঘাটে গোপনে দেখা করল। ঘোষ সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। অন্ধকারে চাপা গলায় কি বললেন। সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল এবং সেলাম করে চলে গেল।

অমল্য যতদিন বাইরে ছিলেন এঁদের নিয়মিত পার্টিও বন্ধ ছিল। অনেক

দিন পরে তিনি তীর্থ ধর্ম করে ফিরে এসেছেন। সেই উপলক্ষে আর কালবিলম্ব না করে সামনের রবিবারেই ঘোষ সাহেব একটা বেশ ব্যাপক এবং জমকালো পার্টি দেবার বন্দোবস্ত করলেন। শরৎকাল। কদিন আগেই বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি বাদল হয়ে গেছে। আপাততঃ আর সে আশঙ্কা নেই। আকাশ নির্মেঘ। সুতরাং বাগানেই ব্যবস্থা হল। মিসেস প্রথমটা মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আগের দিনের সে ঝোঁক আর তাঁর নেই, মন এখন অন্য দিকে চলে গেছে। কিন্তু স্বামী কন্যার প্রবল নির্বন্ধে শেষ পর্যন্ত মত না দিয়ে পারেন নি। তাছাড়া এই সুযোগ পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁর এই নতুন জীবনের মহিমা ব্যক্ত করবার এবং যাঁর প্রসাদে সে জীবন তিনি লাভ করেছেন, সেই গুরুদেবের সাক্ষাৎ না হলেও সচিত্র সান্নিধ্য উপলব্ধি করাবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে ছিল।

নামে 'টী পার্টি' হলেও আয়োজনটা 'হাই-টী' ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল। শহর থেকে অনেকখানি বাইরে বলে শুরুটা একটু পিছিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপরে অতিথিরা এলেন দেরি করে। সুতরাং শেষ হতে হতে রাত প্রায় বারোটার কাছে গিয়ে ঠেকল। সকলেই তখন ক্লান্ত, মায় চাকর-বাকর পর্যন্ত। স-কন্যা মিসেস নিজের নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। মিস্টারও তাঁর ঘরে চলে গেলেন! কিন্তু বিছানার বদলে আশ্রয় করলেন ইজি-চেয়ার। আধঘণ্টা পরে যখন অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, সমস্ত বাড়িটায় তখন গাঢ় নিদ্রায় বিচিত্র নাসিকাধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ধীরে ধীরে নিচে নেমে গিয়ে সদর দরজার খিলটা খুলে দিলেন, এবং তেমনি নিঃশব্দে উঠে ঘরে এসে ঢুকলেন।

রাত বেড়ে চলল। ঘোষ সাহেব ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

বসবার ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে পিয়ানোর সুর তুলে দুটো বেজে গেল। ঘোষ সাহেবের একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল, চমকে উঠে চোখ রগড়ে নড়ে চড়ে বসলেন, এবং কান দুটোকে যতটা সম্ভব খাড়া করে রাখলেন।

মিনিট কয়েক পরে ওপাশের একটা ঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল সেই শব্দ। তারপর সব চুপ। আরো খানিকটা অপেক্ষা করে ঘোষ সাহেব আবার বেরিয়ে এলেন। নিচে নেমে ভেজানো দরজায় খিল তুলে দিয়ে উপরে গিয়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লেন।

ভোরের ঘুম, বিশেষ করে প্রায় সমস্ত রাত জেগে থাকবার পর, বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই। হঠাৎ একটা ক্ষুরধার নারী কণ্ঠ সূক্ষ্মাগ্র ছুরির মত কানে গিয়ে ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন ঘোষ সাহেব। চারদিক আলোয় ভরে গেছে। পূবের জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে মেঝের উপর। শব্দ লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন হল ঘরে। ভৃত্য-বাহিনী সমেত গোটা পরিবার সেখানে উপস্থিত। কিন্তু কারো মুখে কোন সাড়া নেই; দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর মত সব স্তব্ধ নিশ্চল। তারই উপর আছড়ে পড়ছে গৃহিণীর আর্তবিলাপ। এবার তিনি অসংবৃত বসনে ছুটে এসে ভেঙে পড়লেন

স্বামীর বুকের উপর—এ সর্বনাশ কে করলে গো ! আমার একুশ ভরি সোনা !

—সোনা ! চমকে উঠলেন ঘোষ সাহেব।

—'হ্যাঁ গো ; গোটা ফ্রেমটাই যে সোনার। তার ওপরে পাঁচশ টাকা মজুরি'—

কান্নাটা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ঘোষ সাহেবের দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। বিশ্বস্ত চোর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, তবে পুরোটা নয়। সাধু-সঙ্গে তার প্রয়োজন নেই বলেই তাঁকে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু তাঁর প্রতি কোন অসম্মান বা অবহেলা দেখায় নি।

ফ্রেমহীন কাঁচের অন্তরালে অক্ষতদেহে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন গুরুদেব। চোখের সেই প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনেকটা যেন স্পষ্ট।

মর্যাদা

কালো-বর্ডার-দেওয়া খামখানা টেবিলের উপর চাপা দেওয়া ছিল। ঘরে ঢুকে চোখ পড়তেই মথুরবাবুর বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কে জানে, কার 'খবর' এল। খুলতে গিয়ে হাতটাও কেঁপে গেল। এক নজর দেখবার পর আর কোনো চাঞ্চল্য অনুভব করলেন না। এর জন্যে বোধহয় ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিলেন। অজ্ঞাতসারে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। খোলা চিঠিখানা হাতে করে জানলার বাইরে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন।

সুপ্রভা কী কাজে ঘরে এসেছিলেন। স্বামীকে ঐ অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বললেন, কার চিঠি ?

বলতে গিয়ে অজানা আশঙ্কায় গলাটা কেঁপে উঠলো।

মথুরবাবু তেমনি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখেই বললেন, ব্যানার্জি সাহেব গেলেন।

সুপ্রভার মুখের উপর ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। আর কোনো কথা বললেন না। মথুরবাবু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, সেদিন দেখে কিন্তু মনে হয় নি, এত শিগগির যাবেন। এটা বোধহয় আমার জন্যেই হলো।

—"ওমা, সে কী কথা !" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন সুপ্রভা, "তোমার হবে কেন ? এর কি আর সময়-অসময় আছে ? সবই নিয়তি।"

—আমার সেই হঠাৎ গিয়ে পড়াটা বাড়ির কেউ তো ভালো চোখে দেখেন নি।

—তা তুমি আগে থেকে কেমন করে জানবে ? নিজের ইচ্ছাতেও যাও নি। উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেই গিয়েছিলে।

—হ্যাঁ ; হয়তো সেই ডেকে পাঠাবার জের আর টানতে পারলেন না। একটা মাসের মধ্যেই ওরা অত বড় লোকটাকে—

কথাটা শেষ করলেন না মথুরবাবু। সুপ্রভা সেদিন স্বামীর মুখে যতটা

শুনেছিলেন, তার থেকেই বাকীটুকু বুঝে নিলেন। কিন্তু অসুস্থ পুরানো মনিবকে দেখতে গিয়ে উনি যে কোনো অপরাধ করে ফেলেছেন একথা মেনে নিতে পারলেন না। তাছাড়া, তার সঙ্গে এই মৃত্যুর হয়তো সত্যিই কোনো যোগ নেই। ওটা মথুরবাবুর মিথ্যা অনুমান। সেটা আশ্রয় করে স্বামীর মনে যে অকারণ মেঘ জমে উঠেছে, তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বললেন, থাকগে; ও নিয়ে মিছেমিছি মন খারাপ করো না। "কাজ" কবে।

মথুরবাবু হাতের চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এগারই, মানে পরশু।

—লোকজন খাওয়াচ্ছে নিশ্চয়ই?

—কি জানি? দাঁড়াও, দেখছি।

চিঠির উল্টোপিঠে "স্মারকলিপি" দেওয়া ছিল। পড়ে গেলেন—সকাল আটটায় সভারোহণ; নটায় নামকীর্তন; সন্ধ্যা সাতটা থেকে দশটা—জ্ঞাতি বান্ধবাদির যথাসাধ্য আপ্যায়ন।

—সে আবার কী?

—ঐটাই বোধহয় খাওয়াদাওয়া। অমনি করে লেখে আজকাল।

মরুকগে। তুমি সকাল বেলাটা একবার ঘুরে এসো।

—মথুরবাবুর মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল। মাথা তুলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, কী হবে গিয়ে? যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক, তিনি চলে গেলেন। ওরা আমার কে? একখানা চিঠি যে মনে করে পাঠিয়েছে, তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

—একি আর ওরা পাঠিয়েছে? যাঁর "কাজ", তাঁর ইচ্ছেতেই এসেছে। তাঁর কথা ভেবেই তোমার একবার যাওয়া দরকার। স্বর্গ থেকে সবই দেখতে পাচ্ছেন তো।

সুপ্রভার কথাটা মথুরানাথের মনে লাগল। স্বর্গত মনিবের ইচ্ছা বা আদেশ বলেই একে গ্রহণ করলেন। তাঁর জীবিতকালে যেমন কোনদিন সেটা অমান্য করেন নি, আজও করবেন না। আপ্যায়নে তাঁর প্রয়োজন নেই, শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয়ে পরলোকগত আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন। সেটুকু তাঁর অবশ্যকরণীয়।

টেবিলের দেরাজ খুলে খামটা রাখতে গিয়ে সেদিন চিঠিখানা চোখে পড়ল। ব্যানার্জি সাহেবের শেষ হস্তাক্ষর। চাকরীজীবনে অনেকগুলো বছর প্রায় প্রতি-দিন ঐ লেখার সঙ্গে না হলেও সইটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। "পরিচয়" বললে কিছুই বলা হলো না। ওর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বাঁক ও বিন্দু তাঁর চোখের উপর ভাসত। মোটা কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সই করতেন—জে. কে. ব্যানার্জি। প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট ও পুরন্ত। যে জানে না, কোনোদিন দেখে নি, সেও এক নজরে পড়ে ফেলতে পারত।

বেশির ভাগ অফিসারের সই পড়া যায় না। কোনো অক্ষরটাই পুরো নয়, এর আধখানার সঙ্গে ওর তিন চতুর্থ জড়িয়ে আছে। অনেকটা ইচ্ছাকৃত। নিজের

নামটাকে রহস্য ও অস্পষ্টতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখাই বোধহয় স্বাক্ষরকারীর মনোগত অভিপ্রায়। 'নাম' জেনে কী করবে লোকে? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো 'পদের'। সেই পদটা জানুক। 'সই' এর নীচে টাইপিস্ট সেটা বসিয়ে দেবে। নামটা যেন too sacred, সকলের কাছে প্রকাশ্য নয়। ওটা জানবে শুধু তারা, যাদের সঙ্গে সম্পর্কটা অফিসিয়াল নয়, ব্যক্তিগত।

কিন্তু ব্যানার্জি সাহেবের কোথাও কোনো লুকোচুরি বা অস্পষ্টতা ছিল না —না স্বভাবে, না স্বাক্ষরে। লোকটা ভিতরে বাইরে এক। কাজ নিয়ে কথা। ঐটিই ছিল তাঁর সম্পর্কনির্ণয়ের মান। ঐ মানদণ্ড দিয়ে কখনো আপনজনকে দূরে ঠেলে দিতেন, কখনো পরকে টেনে এনে বসাতেন আপনজনের আসনে।

মথুরানাথ যখন স্কুলে উপরের দিকে পড়েন তাদের ইংরেজির মাস্টার ছিলেন প্রমথ সেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "Character" কথাটার একটা মানে হল চরিত্র, আরেকটা letter বা অক্ষর। এ দু'এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কে কিরকম চরিত্রের লোক, তার হস্তাক্ষর থেকেই তা বোঝা যায়। যার ভিতরে boldness আছে, তার হাতের লেখাও bold ;—আমরা বলি, He writes a bold hand, যে স্পষ্টবাদী, মনে মুখে এক, তার লেখার ভিতরে সেই স্পষ্টতা ফুটে উঠবে ; আর যার মনের মধ্যে প্যাঁচ তার অক্ষরগুলোও প্যাঁচালো।

প্রমথবাবু হয়তো এটা কোনো মতবাদ হিসাবে বলতেন না। অনেকটা ঠাট্টাচ্ছলে, যে-সব ছেলের হাতের লেখা খারাপ তাদের একটু খোঁচা দেওয়া বা ঐ নিয়ে একটু মজা'করা—এইটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। ছেলেরা হাসত। তাদের মত মথুরবাবুও সেদিন একে হাল্কাভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি করতে এসে বিভিন্ন উপরওয়ালার সই দেখে তার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, মাস্টার মশাই ঠিকই বলতেন। অন্ততঃ ব্যানার্জি সাহেবের বেলায় তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

মাসখানেক আগে এই চিঠিখানা যখন এল মথুরবাবু শিরোনামার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ধরতে পারেন নি কার লেখা। অনেকদিন দেখেন নি সেটা কোনো কারণ নয়। এ লেখার সঙ্গে আগের দিনের লেখার মিল খুঁজে পান নি। সেই দৃঢ় ঋজু ভঙ্গি সেই সুঠাম বলিষ্ঠতা কোথাও নেই। অক্ষরগুলো যেন ভেঙে দুমড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সেই দিকে চেয়েই মথুরবাবুর বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠেছিল। বুঝেছিলেন, এ লেখা যার, সে মানুষটার জীবনেও এমনি কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। ইংরেজিতে লেখা কয়েকটিমাত্র লাইন—"আশা করি ভাল আছেন। আমি অনেকদিন যাবৎ শয্যাগত। আপনার সুবিধামত একবার আসিয়া দেখা করিলে খুশী হইব।"

তার নিচে সেই সই—জে. কে. ব্যানার্জি। কিন্তু তার মধ্যে না আছে মেদ, না আছে মজ্জা।

মথুরবাবু দেরি করেন নি। পরদিন অসুস্থ ভূতপূর্ব মনিবকে দেখতে গিয়েছিলেন। ব্যানার্জী সাহেব অবসর নেবার পর ইম্প্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের নতুন

তৈরী সি-আই-টি রোডে বাড়ি করেছেন, ঐ খবর আগেই পেয়েছিলেন। কখনো যান নি। নম্বরটা চিঠি থেকেই পাওয়া গেল।

দুই

মথুরানাথ দত্তের বয়স তখন তিরিশের কোঠায় চাকরির বয়স বছর দশেক। পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে একটা বড় নামকরা থানার ও-সি, অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সেকেণ্ড অফিসার গিয়েছিলেন, জেলা সদরে কোন কাজে। ফিরে এসে বললেন, খবর শুনেছেন, বড়বাবু?

মথুরবাবু চোখ তুললেন।

—গ্রীন সাহেবের বদলির অর্ডার এসে গেছে।

—তাই নাকি, এত শিগগির?

—ঐ রকম হাবাগোবা এস-পি দিয়ে কি এত বড় ডিষ্ট্রিক্টের কাজ চলে? বিশেষ করে এই সময়?

—কে আসছেন, শুনলেন?

—শুনেছি বৈকি? আসবার সময় কাইঠা কালীবাড়িতে জোড়া পাঁঠা মানৎ করে এসেছি। হে মা কালী, অর্ডারটা যেন ফসকে যায়।

মথুরবাবু এনকোয়ারী রিপোর্ট লিখছিলেন। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, কে বলুন তো?

—'ব্যানার্জী সাহেব', বড় বড় চোখ করে বললেন ছোটবাবু।

—কোন্ ব্যানার্জী?

—এখনো বুঝতে পারছেন না? জে. কে.। পি. সি. হলে তো এসেই হরির লুঠ দিতাম।

মথুরবাবুকে মোটেই চিন্তিত বলে মনে হলো না। অসমাপ্ত রিপোর্টে হাত দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কী আছে। জোরালো মনিব একদিক দিয়ে ভালো। যা করবার নিজেই করে, অন্যের কথায় ওঠে বসে না।

—"জোরালো বলে জোরালো!" উচ্চকণ্ঠে সেকেণ্ড করলেন সেকেণ্ড অফিসার। কারো কাছে মাথা নোয়াবার ধার ধারে না। সাহেব কালেক্টরের সঙ্গে রীতিমত টক্কর দিয়ে চলে, শুনে এলাম পুলিস ক্লাবে। গ্রীন সাহেবের মত নয়। গ্রীন সিগন্যাল ফেলা আছে, যার খুশি চলে যাও।

সিগন্যাল ফেলার ভঙ্গি করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন ছোটবাবু।

মাস ছয়েক পরে নতুন এস-পি এলেন ইন্সপেকশনে। তখন বর্ষাকাল। নদীর পারে থানা। স্টীমলঞ্চ একেবারে ঘাটের কাছে এসে ভিড়ল। থানার পাশে পোস্ট অফিস, তার পরেই স্কুল। ইস্টিমারের মোটা গলার হুঙ্কার শুনে ছেলের দল হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, যদিও তখন বেলা তিনটা, পুরো স্কুলের

সময়। দু-একজন মাস্টার মশাইকেও দেখা গেল ছেলেদের ভিড়ে।

'স্টীম'-এর যুগ হলেও এই দূর অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকের কাছে রেল-স্টীমার তখনো অ-দৃষ্ট বস্তু। তার অভাব মেটায় এই স্টীমলঞ্চ, তাও বছরের মধ্যে বর্ষার দুটি মাস, কালেক্টর বা পুলিশ সাহেব কালেভদ্রে যখন থানা তদারক করতে আসেন। নদীর দুধারে কাতারে কাতারে লোক এসে দাঁড়ায়। নানাবয়সী মেয়ে পুরুষ। পর্দানশীন মোস্লেম বধূও দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটাটা একটু ফাঁক করে বিস্ময়ভরা কালো চোখ তুলে তাকায়। মাইনর স্কুলের ছেলেরা তখনো বেঞ্চি আগলে বসে থাকবে, অতিবড় কড়া হেডমাস্টারও তা আশা করেন না।

"ইস্টিমার"-এর সঙ্গে একটি ডিঙ্গি নৌকো থাকে। তারই বা বাহার কত। ঘাটে আসতে হলে তাতে করে আসতে হয়। ব্যানার্জি সাহেব যখন সেই 'বোট্'-এ উঠবার উদ্যোগ করছেন, ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার ছুটে পালাবার পালা। কিন্তু সাহেবের দিকে নজর পড়তেই চাঞ্চল্যটা দমে গেল। বিলাতী নয়, দেশী সাহেব, বাঙালী। সুতরাং অতটা ভীত হব্যর কারণ নেই। তবু ওরই মধ্যে যারা একটু কম সাহসী, তারা পিছনে হটে এল, কেউ কেউ চলেও গেল। দুঃসাহসীরা ঘাটটা ছেড়ে দিলেও আশে পাশে ছড়িয়ে রইল। ভাবখানা হলো— সাহেবের ভাবগতিক দেখে যথাকর্তব্য স্থির করবে।

ব্যানার্জি সাহেব তীরে উঠেই কাছে যে ছেলেটিকে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের হেডমাস্টার মশাই আছেন?

ছেলেটা একেবারে থ। পুলিশ সাহেব বাংলা বলছে! তাও জড়িয়ে পেঁচিয়ে সাহেবী কায়দায় নয়, একেবারে তাদের মত সোজা বাংলা। পাশ থেকে আর একজন বলে উঠল, আছেন স্যর।

ঘাটের ঠিক উপরে থানার কর্মীরা যথারীতি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন এস-পি। ওখানকার যা পর্ব সেরে নিয়ে, ও-সিকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, স্কুলটা কোন্ দিকে?

মথুরবাবু হাত তুলে দেখিয়ে দিতেই সে দিকে পা বাড়ালেন। ও-সি পিছন পিছন যাচ্ছিলেন। থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইউ নিড নট কাম।' হাতের বেঁটে ছড়িটা দিয়ে ছেলেদের এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন। তারা ছুটতে ছুটতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল।

ব্যানার্জি সাহেবের রং তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু দীর্ঘ উন্নত দেহের স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। পরনে নিখুঁত ফিট-করা ইউনিফর্ম। তার মধ্যে কৃতী দর্জির হাত যতখানি সুষ্ঠু দেহ-গঠনের কৃতিত্ব তার চেয়ে কম নয়। সরু ছড়িটা বগলে চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে মিনিট তিনেকের মধ্যেই স্কুলের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। হেডমাস্টার টুইল সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

এস-ই বা মিডল ইংলিশ স্কুল। ষষ্ঠ শ্রেণীতেই শেষ। গত বছর থেকে হাইস্কুলে পরিণত করবার প্রথম ধাপ হিসাবে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয়েছে। উপরের

দু-ক্লাশ মিলিয়ে গুটি বাইশেক ছেলে। তাদের মধ্যে অনেকেরই গোঁফের রেখা স্পষ্ট, কারো কারো সেটি আবার এরই মধ্যে বেশ কালো এবং পুরু হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বয়সটা পুলিশের নজরে পড়বার পক্ষে যথেষ্ট। তখনো 'নন কো-অপারেশন' আন্দোলনের ঢেউ মিলিয়ে যায় নি। সেই সূত্র ধরে কিছু কিছু ধর-পাকড় চলছে। তা ছাড়া এখানে সেখানে দু-চারটা 'স্বদেশী' ধরণের ডাকাতি বা লুট-পাট উপলক্ষ করে কারো কারো গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজ খবর জিজ্ঞাসাবাদ লেগেই আছে। সেজন্য হেডমাস্টারকেই থানায় ডেকে নেওয়া হয়। পুলিশের ছোট-বড় কোনো কর্তা স্কুলে কখনো পদার্পণ করেন নি। এবারে স্বয়ং এস-পিকে এখানকার মাটিতে পা দিয়েই হন হন করে সোজা তাঁর স্কুলের দিকে আসতে দেখে প্রৌঢ় নিরীহ মাইনর স্কুলের এফ-এ পাস হেডমাস্টার রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কী বলে কেমনভাবে কোন ভাষায় অভ্যর্থনা জানাবেন, ভেবে পেলেন না। ব্যানার্জি তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। কাটা তাল গাছের তৈরী সিঁড়ি বেয়ে মাটির দাওয়ায় উঠতে উঠতে দুহাত তুলে সরবে নমস্কার জানালেন এবং এদিক ওদিক দেখে নিয়ে কোণের দিকে হোগলাপাতার বেড়া ঘেরা যে কামরাটা চোখে পড়ল, একাধারে লাইব্রেরী, অফিস, মাস্টার মশাইদের হুঁকালয় ও বিশ্রাম কক্ষ, তারই পানে এগিয়ে চললেন।

ঢুকতেই বাধা পড়ল। ঠিক সামনেই একখানা আধময়লা মোটা ধুতি আড়াআড়ি ভাবে টাঙানো। হেডমাস্টার তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটানে সেটা খুলে ফেললেন। ব্যানার্জি সাহেব লক্ষ্য করলেন, বেড়ার গায়ে ঐ রকম আরো দু-তিনখানা ধুতি সার্ট শুকোতে দেওয়া আছে। হেডমাস্টার এস-পির দৃষ্টি অনুসরণ করে সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বললেন, মাস্টার মশাইরা বেশির ভাগই আশেপাশের গ্রাম থেকে ডিঙ্গি নৌকো বা তালের ডোঙগায় করে আসেন। বৃষ্টি পড়লে জামা কাপড় বাঁচানো মুশকিল। ছেলেদের আবার এই টাঙিয়ে দেবার সুবিধেটুকুও নেই। ভিজে কাপড়েই থাকতে হয়।

ব্যানার্জি সাহেব জানালার ধারে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক সামনেই দূর-প্রসারিত জলমগ্ন মাঠ এবং তার ওপারে গাছপালা ঘেরা গ্রামের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। সাদা চামড়ার সাহেব হলে হয়তো এই জলে ভেজা নিয়ে কিঞ্চিৎ সকৌতুক কৌতূহল কিংবা ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিনি এ দেশের লোক যদিও এ-অঞ্চলের নন। ছেলেবেলায়, স্কুলে যেতে আসতে খাল বিল নদী নালা না পেরোলেও বর্ষার পাঁক নামক প্রগাৎ কোমল বস্তুটির কঠোর স্বাদ তাঁকে পেতে হয়েছে। সেই কথাই বোধহয় মনে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই টেবিলের সামনে ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং হেডমাস্টারকেও বসতে অনুরোধ করলেন। পকেট থেকে কয়েকখানা কাগজ বের করতে করতে হাসিমুখে বললেন, দুটো কাজ নিয়ে এলাম। এক নম্বর—আপনার ছেলেরা যে রকম সদলবলে আমাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল—যদিও জানি সেটা আমাকে নয়, আমার বাহনটাকে—তার বদলে আমার একবার ঘুরে যাওয়া উচিত বলে মনে হলো।

হেডমাস্টার অত্যন্ত লজ্জিত হলেন—কিছুতেই আটকানো যায় না স্যার। বকাবকি করে দেখেছি, শাস্তিও কম দিই নি। কিন্তু ঐ হুইসিলটা একবার কানে গেলে—

'আর স্থির থাকতে পারে না' যোগ করলেন এস-পি। যাক, ও বিষয়ে পরে আসছি। এবার দ্বিতীয় কাজটা সেরে নিই।

হেডমাস্টার বুঝলেন, এবার তাকে অনেক বেশী কঠোরতর কৈফিয়তের দায়ে পড়তে হবে, জবাবদিহি করতে হবে হয়তো কোনো অর্বাচীন ছাত্রের সত্য বা কল্পিত রাজনৈতিক অপরাধের কিংবা তার পুলিশ-বর্ণিত গোপন গতিবিধির। 'বলব না' 'বলবার উপায় নেই' 'জানি না' বলেও এড়ানো যাবে না। তিনি স্কুলের হেডমাস্টার এবং স্থানীয় লোক। তাঁর প্রতিটি ছাত্রের নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে রেখে দেবেন, তাদের কর্ম ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হবেন, এইটাই আশা করেন সরকারী কর্তৃপক্ষ।

ব্যানার্জি সাহেব মাস্টার মশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর বিব্রত ভাবটা বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে বললেন, আপনার ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু নয়। ব্যাপারটা আমার; অর্থাৎ আমি যাদের চরাই তাদের নিয়ে। তাহলে আপনার একটু সাহায্য দরকার।

কাগজখানা ওঁর সামনে খুলে ধরে যোগ করলেন, 'দেখুন তো, হাতের লেখাটা চেনা মনে হচ্ছে কি-না।' বলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকালেন।

হেডমাস্টার এক নজর দেখেই চিনলেন। তাঁরই কোনো শ্রীমানের লেখা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। এস-পির অভিজ্ঞ পুলিশী চক্ষু তার প্রয়োজন বোধ করল না। বাচনিক উত্তরের অপেক্ষা না করেই আরেকখানা চিঠি তেমনি মেলে ধরে বললেন, 'আর এটা?'

সেখানাও চিনতে অসুবিধা হল না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের চিঠি? কী লিখেছে এরা?

—কী লিখেছে, তা নিয়ে আমার বা আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। জানা দরকার, কে বা কারা লিখিয়েছে।

হেডমাস্টার তখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এস-পি—"এগুলো হচ্ছে এখানকার ও-সির নামে বে-নামা দরখাস্ত। অনেক অ্যালিগেশন আছে।"

"ও-সির নামে!" অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন হেডমাস্টার, "তাঁর বিরুদ্ধে এই বাঁদরগুলোর কি বলবার আছে? তাছাড়া বড়বাবু লোকটি এত ভালো—"

—পুলিশের আবার বেশী ভাল হওয়াও বিপদ। সে যাক। এর মধ্যে যা আছে তার সঙ্গে এই ছেলে দুটোর কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সখ করে বা ইচ্ছে করে লেখেও নি। তাদের দিয়ে লেখানো হয়েছে। আমার ইন্টারেস্ট সেইখানে। আপনি এই ছেলেদুটিকে বুঝিয়ে দেবেন, এদের কোনো ভয় নেই। ওরা যে নাম করবে, কারো কাছে প্রকাশ পাবে না। শুধু আপনি জানাবেন, আর আপনার কাছ থেকে আমি জানবো। আশা করি আপনার কোন আপত্তি নেই।

—"না, না, আপত্তি কিসের ? খবরটা আমি আজই এদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু স্যার—" একটু ইতস্ততঃ করে বললেন হেডমাস্টার, "এগুলো যে আমার ছেলেদের লেখা, আপনি জানলেন কেমন করে ?"

—সব আমরা জানি। এই জাতীয় কাজ যারা করে, তাদের রীতি-নীতি ধরণ-ধারণ আমাদের চেনা হয়ে গেছে। এই রকমের ছোট ছোট ছেলেই ওদের বাহন, যাদের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ, লোকের নজরও বিশেষ পড়বে না।…আচ্ছা, এবারে চলুন আপনার ছাত্রদের একবার দেখে যাই। রিটার্ণ ভিজিটটা তো ওদেরই প্রাপ্য।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, এক কাজ করুন। ছুটির সময় হয়ে গেছে। ওদের বরং এই বারান্দায় আসতে বলুন ; এইখানেই দেখাটা হয়ে যাক।

সাতটা ক্লাস মিলিয়ে শ'খানেক ছেলে। জ্বরজারির সময় বলে ২০।২৫ জন অনুপস্থিত। হেডমাস্টারের নির্দেশে ড্রিল মাস্টার (তিনি আবার নিচের দিকে ভূগোলও পড়ান) এক এক ক্লাস করে সবাইকে বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ছেলেগুলো, বিশেষ করে যারা ছোট, ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল। বড়দের মধ্যে কয়েকজন এল মনে মনে বেশ খানিকটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে। 'ইস্টিমার,' দেখতে গিয়েছে তো কী হয়েছে ? দেখা যাক, কী বলেন পুলিশ সাহেব। বেশী কিছু করলে তারাও দু-কথা শুনিয়ে দেবে। তার জন্যে তৈরী হয়ে রইল।

এস্-পি একবার সকলের সামনে দিয়ে ঘুরে গেলেন। দু-একটি ছোট ছেলেকে আদর করলেন, একজন স্বাস্থ্যবান বড় ছেলের বুকের উপর মৃদু ঘুষি মারলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ; তোমরা কে কে স্টীমারে করে বেড়াতে যাবে, হাত তোল।

কোন সাড়া নেই। প্রস্তাবটা এমন অভাবনীয়, কেউ যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না। কিংবা সাহেব হয়তো ঠাট্টা করছে তাদের সঙ্গে ! প্রায় সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হেডমাস্টারের মুখের উপর। তিনি কি একটা ইঙ্গিত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো হাত সোজা উপরে উঠে গেল। এস-পি বললেন, বেশ। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। এর পরে যেদিন আবার 'স্টীমার' আসবে তোমাদের ঐ থানার ঘাটে,—আমিই আসি কিংবা আর কেউ—কেউ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না। ছুটির পরে যাবে, কিন্তু স্কুলের সময়ে নয়। তোমরা ছাত্র, তোমাদের একটা মান আছে না ? অমন আদেখলের মত ছুটে যাবে কেন ?…ঠিক তো ?

প্রায় সব মাথাগুলো একদিকে হেলে পড়ল। অনেকে মুখেও বলল, হ্যাঁ স্যার। ব্যানার্জি সাহেব হেডমাস্টারকে বললেন, ওদের তাহলে থানার ঘাটে পাঠিয়ে দিন। আমি সারেংকে বলে দিচ্ছি, খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসুক।

এস. পি. ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। মথুরানাথ দত্তের বহু দুষ্কর্মের দীর্ঘ তালিকার আসল রচয়িতা তার সেকেণ্ড অফিসার। অনেক দিন আছেন এই থানায়, এমন কতগুলো স্থানীয় সুবিধা ভোগ করছেন, যা আইনবিরুদ্ধ।

কাজকর্মেও যথেষ্ট শিথিল। মথুরবাবু এসে এই দুদিকেই কড়া নজর দিয়েছিলেন। 'বেনামা' দুখানা তারই প্রত্যাঘাত। ছোটবাবুর আর একটি দোসর ছিল—একটি কনস্টেবল। পাশের গ্রামে বাড়ি। ছেলেদুটিকে সেই জুটিয়েছিল, এবং যথারীতি কোনো 'স্বদেশী' মামলায় জড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে কাবু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

ব্যানার্জী সাহেবের প্রথম ইন্সপেকশন। সেটা যে ব্যাপক হবে, থানা-প্রশাসন এবং তার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাজকর্মের কোনো দিক, কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়বে না, এটা সকলেরই জানা। তারই ভিতর দিয়ে কৌশলে এবং সকলের অজানতে দরখাস্ত-বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যতটা জানা যায়, জেনে নিলেন। তার কোনো আভাস দিলেন না, ও সি-র কাছেও ভাঙলেন না। সদরে ফিরে গিয়ে কনস্টেবলটিকে বহু দূরে কোনো দুর্গম জায়গায় বদলি করলেন, এবং সেকেণ্ড অফিসারকে টেনে নিলেন কোতোয়ালী থানায়, যেখানে তার গতিবিধির উপরে নিজেই খানিকটা নজর রাখতে পারেন।

অনেক বছর পরে, মথুর দত্ত তখন সার্কেল ইন্সপেক্টর, ব্যানার্জি সাহেব এই সব নামহীন বা ছদ্মনামা অভিযোগ সম্পর্কে কী "অ্যাকশন" নেওয়া উচিত, সেই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে এই দরখাস্তের কথা বলেছিলেন। তার আগে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি।

চাকরির বোঝা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন কতদিন! এখনো মাঝে মাঝে এই দৃঢ়চেতা, এবং সদাশয় মনিবটির কথা মথুরনাথের মনে হয়। আর সবাইকে প্রায় ভুলেই গেছেন।

এই "বেনামা'র ব্যাপারে অন্যান্য কর্তাদের কাছে তাঁকে কত না লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তারা বুঝতেন না, (অথবা বুঝেও হয়তো খানিকটা মজা করবার লোভে চেপে যেতেন) যে নিচের স্তরের কর্মীদের হাতে এটি একটি অমোঘ অন্তর্ঘাতী বাণ, যা দিয়ে ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে বসে অবাঞ্ছিত উপরওয়ালাকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়, অথচ নিজেদের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগে না।

মথুর দত্ত কাজের লোক। তাঁর নিচে যারা থাকত, তাদের কাছ থেকেও কাজ চাইতেন এবং আদায় করে ছাড়তেন। ফাঁকি, কুড়েমি কিংবা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিয়ে অনুকর্মীদের কাছে "জনপ্রিয়" হবার তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ফল হতো শত্রুবৃদ্ধি। 'বড্ড খিট্‌খিট্ করছে লোকটা, দাও একখানা বেনামা ঝেড়ে'। তার মধ্যে একগাদা 'অ্যালিগেশন'। এস. পি-র হাতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সীল করা খামে ফিরে এল ওঁরই হাতে—'ডিটেলড্ রিপোর্ট' চাই। নামে 'রিপোর্ট', আসলে কৈফিয়ত, কল্পিত অপরাধের জবাবদিহি। যারা 'ঝেড়েছিল', মোটা খাম এবং তার আষ্টেপৃষ্ঠে গালার বহর দেখেই উল্লসিত—এসে গেছে বাঁশ! তখন অন্য কোনো ঠিকানা থেকে অন্য হাতের লেখায় ছাড়ল আরেকখানা। এমনি করে চলল। কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হলেন, ডেকে নিয়ে ধমকালেন, বারে বারে এত অভিযোগ আসছে কেন তোমার নামে? কোনো কোনো এস. পি. আবার 'গোপন'

তদন্ত চালাতেন, ঐসব দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু 'এনকোয়ার' অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া 'এনকোয়ারী' হবে কেমন করে? সুতরাং গোপন কিছুই থাকত না। বাণ যারা ছুঁড়েছিল, তারা জানত, এবং সফল লক্ষ্যভেদের আনন্দটা চেপে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করত না।

ব্যানার্জি সাহেব থাকতে থাকতেই মথুরবাবু সদর থানার অফিসার-ইন-চার্জ হয়ে গেলেন। খুশী হয়েছিলেন বৈকি? যদিও কাজ বেশী, দায়িত্ব অনেক, কিন্তু মাইনে একই। চার্জ নিলেন ফজল করিমের কাছ থেকে। অনেকটা সিনিয়র। যাবার সময় বলেছিলেন, নতুন সদরে এলে, ভালোই। এখন অন্দরমহলের ঠেলা সামলাতে পারলে হয়।

—অন্দরমহল!

করিম সাহেব আর কিছু বলেন নি, চোখ টিপে একটু রহস্যময় হাসি হেসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

দিন পনের পরে সকালের দিকে নিজের ঘরে বসে কাজ করছিলেন। এস. পি-র আরদালী সুজন সিং যথারীতি সেলাম করে এক টুকরো কাগজ আর পাঁচ টাকার একখানা নোট তাঁর সামনে রেখে বলল, মেমসাহেব বলেছেন, জিনিসগুলো যেন আজ সন্ধ্যার পরেই কুঠীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—'কী এটা?' কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন মথুরবাবু।

—মাসের বাজার।

লম্বা ফর্দ। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, ময়দা, মসলাপাতি। তখনকার দিনেও শ-খানেক টাকার মাল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নোটখানা এগিয়ে ধরে বললেন, এটা বরং তুমি নিয়ে যাও। জিনিসের সঙ্গেই পুরো টাকার বিল যাবে। এক সঙ্গে দিয়ে দিলেই হবে।

আরদালী হাত না বাড়িয়েই বলল, টাকা ফেরৎ নিয়ে গেলে মেমসাহেব গোসা হবেন।

—কেন?

আরদালী আর কোনো জবাব দিল না। নোটখানা পকেটে পুরে মথুরবাবু বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

থানার একজন সিপাইকে ডেকে মালপত্রগুলো একটা কোনো ভালো দোকান থেকে নিজে দেখেশুনে কিনে বড় সাহেবের বাংলোতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন। তারপর যোগ করলেন, দোকানদারকে এই টাকাটা দিয়ে বাকী টাকার বিলটা ঐ সঙ্গে দিয়ে এসো।

সিপাইটি তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, কী হলো?

লোকটি প্রথমটা ইতস্ততঃ করল। তারপর দু'চারবার ঢোক গিলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা জানাল, তার সারাংশ হলো এই—'হুজুর', হয়তো এখনো জানেন না, এটা এখানকার রীতি নয়। মেমসাহেব ভারী রাগী লোক বিল-টিল দেখলে ক্ষেপে উঠবেন। এরকম ফর্দ ফি মাসেই আসে। মাল তারাই পৌঁছে দেয়। বি-।

নিয়ে আসে বড়বাবুর কাছে।

একটু ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বলল, আগের বড়বাবু সবাইকে ধমকে শাসিয়ে রেখেছেন, এসব কথা যেন বাইরে না বেরোয়। সাহেবের কানে গেলে কারো 'নকরি' থাকবে না।

সন্ধ্যার পর মথুরানাথ নিজেই গিয়ে উঠলেন "লক্ষ্মী ভাণ্ডারে", ওখানকার যেটা সবচেয়ে বড় মুদী দোকান। জিনিসগুলো তাদেরই লোক দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করলেন, এবং বিল নিজের কাছে রেখে দিলেন।

কর্মসূত্রে এস. পি-র সঙ্গে প্রায়শই সাক্ষাতের প্রয়োজন থাকে। পরে যেদিন গেলেন, (অফিসে সাহেব একাই ছিলেন) কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার সময় বিলটা পকেট থেকে বের করে তাঁর সামনে রেখে বললেন, টাকাটা কি এখন সঙ্গে আছে, সাব ? না হলে থাক, পরে অন্য সময়ে—

—কিসেব টাকা ?

—সেদিন চাল কিনতে বেরিয়েছিলাম। 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' বলে যে দোকানটা আছে বাজারের মধ্যে, ওখানে বসে নমুনা দেখছি, সুজন সিং একটা ফর্দ নিয়ে এল। ওর আবার অন্য কোথায় কাজ ছিল। বললাম, তোমাকে আর আসতে হবে না। জিনিসগুলো আমিই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এখানকার লোকগুলো যা ধড়িবাজ, নিজেরা দেখেশুনে না নিলে যা তা চালিয়ে দেয়, ওজনেও ঠকায়।

ব্যানার্জি সাহেব পকেট থেকে পার্সটা বের করে মাথা নাড়লেন, সবটা বোধ হয় হবে না।

মথুরবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, থাক, অন্য এক সময়ে দিলেই হবে, তার আগেই সাহেব বলে উঠলেন, ও আচ্ছা, দাঁড়ান।

ড্রয়ার খুলে চেক বইখানা বের করে টাকাটার একটা চেক কেটে দিলেন।

নেপথ্যে কী ঘটেছিল, কিংবা কিছুই ঘটেছিল কিনা, মথুরবাবু জানেন না। তবে ওখানে থাকাকালে ঐ জাতীয় আর কোন ফর্দ তিনি পান নি, থানায় অন্য কারো কাছেও আসে নি। আসল ব্যাপারটা শুনবার পর, (যদি শুনে থাকেন) সাহেব সেটা কী ভাবে নেবেন, তাই নিয়ে প্রথম কিছুদিন খানিকটা দুর্ভাবনা যে হয় নি, তা নয়। সেটুকু মুছে যেতেও দেরি হয় নি। ব্যানার্জি সাহেবের কথায়, সুরে, আচরণে, বা ও-সির উপর তাঁর মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় নি।

তিন

সকাল আটটা নাগাদ মথুরবাবু সি. আই. টি. রোডের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলেন, তার আগে সমস্ত পথটা সেই দীর্ঘদিন পিছনে-ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। জে. কে. ব্যানার্জির সেই ঋজু, উন্নত দেহ, সেই শান্ত গম্ভীর মুখ, সেই দীর্ঘ পদক্ষেপ, সেদিনকার নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে চোখের উপর ভেসে উঠছিল।

আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। সুদৃশ্য গ্রীল দেওয়া ফটক। ঢুকেই বাঁদিকে

এক ফালি বাগান, ডান দিকের প্রশস্ত বাঁধানো পথটা সোজা গ্যারাজে গিয়ে ঠেকেছে। সামনে বসবার ঘর। বারান্দায় উঠে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সুইচ টিপতেই একটি ছোকরা চাকর এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই ?

—ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

—তিনি তো এখানে নেই, দিল্লী গেছেন। আজ ফিরবার কথা আছে।

—দিল্লী গেছেন ! কিন্তু—

—আপনি বুড়োবাবুর কথা বলছেন ? তার তো খুব অসুখ।

—আমি তাঁকে দেখতেই এসেছি।

—আচ্ছা দাঁড়ান।

চাকরটি ভিতরে চলে গেল। মথুরবাবুকে বাস-এ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। পা-দুটো টনটন করছিল। ভিতরে ঢুকে একটা সোফায় বসলেন। পাশের কামরায় স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠের হাসি কলরব কানে এল, তার সঙ্গে চিনামাটির বাসনের ঠুং ঠাং কাঁটা চামচের আওয়াজ। ভাঙা ভাঙা কথাবার্তার সুর যেটুকু ভেসে আসছিল, তার থেকে বোঝা গেল, বাক্যালাপ ও আহার একসঙ্গে চলেছে। সম্ভবতঃ ওটা ডাইনিং রুম। এখন ব্রেকফাস্টের সময়। হঠাৎ একটা ঝাঁজালো তীক্ষ্ণ ভরাট গলা শুনতে পেলেন। স্ত্রীকণ্ঠ "কার সঙ্গে দেখা করবে ?"

—"বুড়ো বাবুর সঙ্গে"—এ গলাটি ছোকরা চাকরের, এইমাত্র যার সঙ্গে কথা হয়েছে।

—অসুখ বলিস নি ?

—বলেছিলাম। বললে, তাই শুনেই দেখতে এসেছি।

মুহূর্তের বিরতি। তারপর আবার কানে গেল, "নাম কি জিজ্ঞেস কর।"

চাকরটি ফিরে এল। মুখ দেখে মনে হলো, যাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে গেছে, তার এই অনধিকার প্রবেশ এবং অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কার্যটি সে মোটেই প্রীতির চোখে দেখছে না। সেটা কথায় প্রকাশ না পেলেও কণ্ঠস্বরে চাপা রইল না। বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করল—আপনার নাম কী ?

—"আমার নাম মথুরানাথ দত্ত। অনেকদিন সাহেবের কাছে কাজ করেছি।" কথাগুলো এমন সুরে বললেন, যাতে করে পাশের কামরাতেও পৌঁছায়।

চাকরটি ফিরে যাবার আগেই একটি বর্ষীয়সী মহিলা পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। মেমসাহেব। পুলিশ ক্লাবে কোন পার্টি বা ঐ জাতীয় উপলক্ষে কয়েকবার দেখেছেন মথুরবাবু। মোটরে করে এখানে-ওখানে যেতে আসতেও কখনো কখনো চোখে পড়েছেন। অনেকটা ভারী হয়ে পড়েছেন সেদিনের তুলনায়। খুব রূপসী ছিলেন। আজ সে রূপ নেই থাকবার কথাও নয়, কিন্তু সাজগোজ এবং প্রসাধনের বাহুল্য দিয়ে তাকে ধরে রাখবার প্রয়াস অতিশয় স্পষ্ট। বৃদ্ধ মথুরবাবুর ক্ষীণ দৃষ্টিতেও সেটা ধরা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আমি মথুর দত্ত, একদিন সাহেবের অধীনে চাকরি করতাম। ওঁর অসুখ শুনে— .

—হ্যাঁ, উনি কবছর থেকেই খুব ভুগছেন। নিচে নামতে পারবেন না।

—যদি অনুমতি করেন, আমি ওঁর ঘরে গিয়েই দেখা করতে পারি। একটা চিঠিও লিখেছেন আমাকে।

—চিঠি লিখেছেন! কই, দেখি।

চিঠিখানা সঙ্গে ছিল। মথুরবাবু 'মেমসাহেবের' হাতে দিলেন। একটি বাইশ, তেইশ বছরের ছেলেও এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যানার্জি সাহেবের মেজো ছেলে। মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে সেও পড়ল চিঠিখানা, তারপর মা ও ছেলের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। দু'জনের চোখেই বিস্ময় ও বিরক্তির ভ্রূকুটি।

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে মিসেস ব্যানার্জি বললেন, আচ্ছা, আপনি একটু বসুন।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করবার পর সেই চাকরটি এসে বলল, আসুন আপনি।

আগাগোড়া মোজেইক। বারান্দা, সিঁড়ি ঝকঝক করছে। দোতলায় উঠে প্রশস্ত করিডোর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একখানা ঘরের সামনে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল। ঢুকতে গিয়েই কেমন একটা চামসে গন্ধ নাকে এল। মথুরবাবু অজ্ঞাতসারে রুমালটা বের করলেন কিন্তু পাছে রুগীর চোখে পড়ে তাই নাকে চেপে ধরলেন না। ঘরটা বেশ অন্ধকার। ওদিকের জানালাগুলো সব বন্ধ। তারই মধ্যে যতটা ঠাহর হলো, দেখলেন, একজনের মত একটা খাট, তার উপর একটি দীর্ঘ শীর্ণ দেহ পড়ে আছে। একটা ভাঙা ভাঙা ক্ষীণ কণ্ঠ কানে এল—কে?

—আমি, স্যার! মথুর দত্ত।

—"ও আপনি এসেছেন?". (ওরই মধ্যে একটু যেন আনন্দের সুর) বসুন। জানালাগুলো খুলে দেয় নি বুঝি? কখন যে আসবে ছোঁড়াটা।

—আচ্ছা, আমি খুলে দিচ্ছি, স্যর।

জানালা কটা খুলে দেবার পর মনিবের দিকে যখন তাকালেন, মথুরবাবুর মনে হল, ওগুলো না খুললেই ভালো ছিল। সেই জে. কে. ব্যানার্জির এই রূপ নিজের চোখে এমন স্পষ্ট করে দেখতে হত না। অবছায়া একটা আভাস নিয়েই ফিরে যেতে পারতেন।

পাশে একখানা চেয়ার ছিল। তারই উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এতদিন পরে দেখা; কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। সমস্ত বুকখানা যেন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বারবার মুচড়ে উঠতে লাগল।

ব্যানার্জি সাহেবই আবার কথা পাড়লেন—আমার চিঠিটা পেয়েছিলেন তাহলে?

—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েই আসছি! আপনার কী অসুখ, স্যর?

—হার্টের ট্রাবল। তার সঙ্গে উইকনেস।

—হজম হয়?

—তা হয়। হজমে বিশেষ গোলমাল নেই।

—সকালে কী খেয়েছেন?

—এখনো খাই নি। এবার খাবো।

শিয়রের ধার ঘেঁষে একটা টিপয় বসানো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে মথুরবাবুরও নজর পড়ল তার উপর। দেখলেন, একটা ছোট্ট ডিসের উপর দু-টুকরো টোস্ট, তার পাশে একটা পেয়ালা প্লেট দিয়ে ঢাকা। কি মনে করে পেয়ালাটার গায়ে হাত দিলেন মথুরবাবু। বললেন, এতে বুঝি চা ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—তা হোক, সামান্য গরম থাকলেই চলবে।

শীর্ণ শিথিল হাতপাগুলোকে অনেকটা যেন টেনে গুটিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন এবং একখানা টোস্ট তুলে নিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। চিবোবার ধরণ দেখেই বোঝা গেল, রুটির টুকরো শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে। মথুরবাবু আর থাকতে পারলেন না। বলে ফেললেন, আমি বরং চাকরটিকে ডাকি, খাবারটা বদলে দিয়ে যাক।

—না, থাক। ও হয়তো বাজারে-টাজারে গেছে।

মথুরবাবু কয়েক মিনিট মালিকের সেই দুঃসহ ভোজন-দৃশ্য বসে বসে দেখলেন। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, ওষুধ-টষুধ কিছু খাচ্ছেন না স্যর ?

—মাঝে মাঝে খাই, ডাক্তার যখন বলে। আজই তার আসবার কথা। এখনি আসবে।

—তাহলে একটু বসে যাই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসবেন বৈ কি ? যে জন্যে আপনাকে আসতে লিখেছি, তাই তো বলা হয় নি।

মথুরবাবু অপেক্ষা করে রইলেন। ব্যানার্জি সাহেব এক চুমুকে চা-টা শেষ করে বললেন, আপনাদের ওদিকটা বেশ ফাঁকা শুনেছি, গাড়ি-ঘোড়ার হিড়িক নেই, একটা লেকও রয়েছে কাছাকাছি।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। সেই লেকের ধারেই আমার বাড়ি।

—আপনার ধারেকাছে আমার জন্যে একটা ছোট বাসা দেখে দিতে পারেন ?

কয়েক সেকেণ্ড থামলেন। মথুরবাবুও নীরব। তারপর আবার ব্যানার্জি সাহেবের কথা শোনা গেল—আমি একাই থাকবো। সামান্য রান্না আর দেখা-শুনো করবার জন্যে একটা লোকও আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে।

অনুকূল উত্তর প্রত্যাশায় সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন তাঁর ভূতপূর্ব বিশ্বস্ত, কর্মঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর দিকে।

মথুর দত্তও বোধ হয় সেই পুরানো দিনের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। ক্ষণকাল ভেবে নিয়ে, হাত দুটো জোড় করে, স্নিগ্ধ বিনীতকণ্ঠে বললেন, যদি অনুমতি করেন, আমার একটা কথা বলবার আছে, স্যর।

—বলুন না।

—অন্য বাসা দেখতে হবে না। আপনি আমার কাছে চলুন।

ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। মথুরবাবু বলে চলেছেন, একতলা বাড়ি, সামনেই লেক, থাকবার মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী আর একটি মেয়ে। দুটো ছেলে, দুটোই বাইরে থাকে—একজন পুণা, আরেকজন আমেদাবাদ। যথেষ্ট জায়গা আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই মিলে আপনার সেবা করবো।

—আপনার ঘাড়ে গিয়ে চাপবো ?···চিন্তান্বিত ভাবে ধীরে ধীরে বললেন ব্যানার্জি সাহেব।

মথুরবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন ; বাইরে জুতোর শব্দ পেয়ে থেমে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। প্রথমেই তাকালেন ওঁর মুখের দিকে। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ?

"ও, তাই তো। আমারই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল", খুশির সুরে বললেন ব্যানার্জি সাহেব, "আপনি থাকতে থাকতেই তো উনি সার্কেল ইন্সপেক্টর হয়ে এলেন।"

—'অনেকবার গিয়েছি আপনার কাছে'—যোগ করলেন মথুরানাথ।

—গিয়েছেন, মানে যেতে হয়েছে। ডাক্তার বিশেষ করে সদর হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছাড়া পুলিশের কোন্ কাজটি চলে ? বলে, হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার দাশ। হঠাৎ হাসি থামিয়ে রুগীর দিকে ফিরে বললেন, তারপর ? কেমন আছেন স্যর ? শুয়ে পড়ুন।

মিনিট দশেক ধরে নানাভাবে রোগী পরীক্ষা চলল। তার মধ্যে দু চারটি প্রশ্ন। উত্তরে ব্যানার্জী সাহেব জানালেন, ঘুমটা ভালো হচ্ছে না, আর খাওয়াতেও তেমন রুচি নেই।

ডাক্তার বললেন, ঘুমের জন্য একটু হাঁটা চলা দরকার। দিনরাত শুয়ে বসে থাকলে একটা পঁচিশ বছরের ছোকরারও ঘুম চলে যায়।

—আপনি বলবার পর থেকে রোজ বিকেলের দিকে ঐ বারান্দায় গিয়ে মিনিট কয়েক পায়চারি করছি। বেশীক্ষণ চলতে পারি না। বড্ড উইক মনে হয়।

—তার মানে, যা খাওয়া দরকার, খাচ্ছেন না। কী খেতে ইচ্ছে করে, বলুন।

—সে-সব উদ্ভট জিনিস। শুনলে আপনি হাসবেন।

—বলুন না ?

—একটু শুক্তো, ওলের ডগার ডালনা, পোস্ত চচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট ছেলেবেলায় মা করে দিতেন।

—উদ্ভট কে বলল ? সবটাই উপাদেয়, লোভনীয়ও বটে। তবে, এখানে—

বলে, হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার। তার পর বললেন, এবার উঠি। অনেক জায়গায় যেতে হবে। আপনি বসুন, মিস্টার দত্ত। পুরনো বসু, অনেকদিন পরে দেখা !

ডাক্তার দাশ উঠে দাঁড়াতেই মথুরবাবুও উঠলেন। মনিবের দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখনি আসছি, স্যর।

করিডোরে চলতে চলতে কথা হলো। ডাক্তার বললেন অসুখ, বিশেষ কিছু নয়, ওষুধ-টষুধেরও আজকাল তেমন দরকার নেই। দরকার একটু যত্ন আত্তি, যেটা এখানে—থাক, সেসব আমার না বলাই ভালো।

—বলতে হবে না ডাক্তারবাবু, আমি এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। আমার একান্ত ইচ্ছা ওঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। একটা চেঞ্জও হবে। তা ছাড়া, আপনার ডিরেকশন মত দেখাশুনোও আমরা করতে পারবো। খাবার-দাবারও উনি যা চান কিংবা আপনি যা বলবেন—

—কোথায় থাকেন আপনি?

—সন্তোষপুর, লেকের একেবারে ধারে।

—খুব ভালো। তাতে আমারও সুবিধে। আমি থাকি যাদবপুর। যখন-তখন গিয়ে দেখতে পারি। উনি রাজী হয়েছেন তো?

—আপনি যদি একটু বলেন—

—এখখুনি বলছি।

দ্রুতগতিতে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই বললেন, মথুরবাবু যে প্রস্তাব করেছেন, সব দিক দিয়ে চমৎকার। আপনি আর দোমনা করবেন না, স্যর। সম্ভব হলে আজই চলে যান।

—আমি ভাবছিলাম—

মথুরবাবুর প্রস্তাবে উনি মনে মনে খুশী হয়েছেন, এটা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তবু যে দ্বিধা করছেন, তার কারণটাও অনুমান করে নিলেন। ডাক্তার দাশ বলেন, ভয় নেই; ওঁর ওপরে আপনাকে আর্থিক বা কোনো ব্যাপারে কিছুমাত্র নির্ভর করতে হবে না। সেটা উনি নিশ্চয়ই চাইছেন না। কি বলেন মথুরবাবু?

মথুরবাবু দাঁতে জিভ কেটে বললেন, সর্বনাশ, আমি কি ওঁকে চিনি না? শুধু সেবা করবার অধিকারটুকু চাইছি।

ব্যানার্জি সাহেবের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, আপনি বরং নিচে একবার—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি এখনি বলছি গিয়ে।

ড্রইং রুমে গোটা পরিবারটিকেই একসঙ্গে পাওয়া গেল। বড় ছেলে দীপক কিছুক্ষণ আগেই দিল্লী থেকে ফিরেছেন। সওদাগরী অফিসের বড় চাকরে। তদ্বির সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রিমহলে কদিন ঘোরাঘুরি করে এলেন। সেই প্রসঙ্গে নানারকম মজাদার কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। শ্রোতারা বিপুল কলরোলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ডাক্তার ঢুকতেই বাধা পড়ল।

প্রস্তাব শুনে সব চোখগুলো কপালে উঠল। মিসেস ব্যানার্জি কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থেকে বললেন, এসব আপনি কী বলছেন, ডাক্তারবাবু? চেঞ্জে যেতে

হয়, পুরী, ওয়ালটেয়ার আছে, দার্জিলিং নৈনিতাল আছে। সে সব ফেলে কিনা সন্তোষপুর! সে তো একটা অজ পাড়াগাঁ শুনেছি।

ডাক্তার দাশ বললেন, জায়গাটাই এখানে বড় কথা নয়। দেখতে হবে, পেশেণ্টের মন কী চায়, কোথায় তিনি ভালো থাকবেন।

"I take serious exception to your remark, Doctor" বেশ খানিকটা উত্তেজনার সুরে বললেন দীপক, "নিজের বাড়িঘর, পরিবার পরিজন ছেড়ে পরের বাড়িতে গিয়ে তিনি ভালো থাকবেন, এটা আপনার কেমন ধারা কথা হলো? তা ছাড়া আমরাই বা যেতে দেবো কেন?"

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, ওঁর না হয় ভীমরতি ধরেছে, যা খুশি বলতে পাবেন, আমরা তো আর সেই তালে তাল দিতে পারি না।

—এখানকার হালচাল দেখেশুনে আমার যা ভালো মনে হয়েছিল তাই বললাম। গেলে ওঁর সব দিক দিয়েই উপকার হত, কটা দিন বেঁচে যেতেন।

বলে, আর কোনো বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ডক্টর দাশ উঠে পড়লেন এবং জোরে জোরে পা ফেলে গাড়িতে ঢুকেই স্টার্ট দিলেন।

এঞ্জিনের সেই গর্জনটা যেন প্রবল বেগে ছুটে এসে কিছুক্ষণের জন্যে এদের মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর দীপক হঠাৎ বলে উঠলেন, সে লোকটা কোথায়?

—"কার কথা বলছিস?" জানতে চাইলেন মা।

—সেই দারোগাটা।

—আহা, তার কী দোষ? উনি যদি চিঠি দিয়ে ডেকে আনিয়ে কাঁদতে বসেন, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন, সে কি 'না' করবে? বড় ঘরের কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে আরো বরং মুখিয়ে আসবে।

বিবাহিতা বড় মেয়েও দাদার ফেরার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল। গম্ভীরভাবে বলল, সত্যি বাবাকে বেশ স্পষ্ট করে বলা দরকার, যার তার কাছে এমনি করে কাঁদুনি গাওয়া চলে না। সমাজে আমাদের একটা পজিশন আছে, মান-মর্যাদা আছে।

দীপক লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন, আমি এখনি যাচ্ছি।

ছোট ছেলে কলেজে পড়ে। এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। এবার বলল, ছেড়ে দাও না, এ নিয়ে একটা হুজ্জুত্ করে কী লাভ?

—'তুই থাম।' বলে দীপক ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। সকন্যা মিসেস ব্যানার্জীও তার অনুসরণ করলেন।

অতঃপর একদা-প্রবল-প্রতাপ বলিষ্ঠচেতা পুলিশ-প্রধান এবং বর্তমানে রুগ্ণ দুর্বল, অসহায় ও বৃদ্ধ জে. কে. ব্যানার্জীর রোগশয্যার পাশে যে পারিবারিক দৃশ্যের অবতারণা হলো, মথুর দত্ত একতলায় বসেই তার তাপ ও ঝাপটা সুস্পষ্ট অনুভব করলেন। তাকে নিচেই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল।

মিনিট পনের পরে সেই চাকরটি এসে আবার উপরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখলেন, ঘরে আর কেউ নেই। তাঁর ভূতপূর্ব মনিব একা চোখ বুজে

পড়ে আছেন, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গলায় একটু শব্দ করতে ওঁর দিকে তাকালেন। আগের চেয়েও আরো ক্ষীণ নির্জীব কণ্ঠে বললেন, "আপনাকে মিছেমিছি কষ্ট দিলাম, মথুরবাবু ভেবে দেখলাম, এ অবস্থায় আপনার ওখানে গিয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, আপনি এবার আসুন।"

ঘাড়টা একধারে একটু নুইয়ে মথুর দত্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন।

প্রস্তর-যুগ

শ্রাবণের কিস্তিটা একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল। কালও দুবার জোর তাগিদ এসে গেছে। মহাজনের গদি থেকে নয়, বৈশাখী পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর থেকে। তিনি আমার উত্তমর্ণ নন, কিন্তু আমার অবস্থা অধমর্ণের চেয়েও অধম! একখানা ক্রমশঃ প্রকাশ্য বৃহৎ উপন্যাসের বায়না স্বরূপ কিছু অর্থ কয়েক মাস আগে গছিয়ে গিয়েছিলেন! তখন তাঁর কণ্ঠ ছিল গদগদ; এখন সেখান থেকে বাজখাঁই আওয়াজ নির্গত হচ্ছে। দিন দুয়েকের মধ্যে অন্ততঃ গোটা পনেরো পাতা (ওঁদের পরিভাষায় স্লিপ্) পাঠাতে না পারলে রীতিমত বেইজ্জত হতে হবে। সকালে উঠে তাই নিয়েই বসেছিলাম মূর্তিমান বিঘ্নের মত পরিতোষবাবুর আবির্ভাব।

পরিতোষ মিত্র রেল দপ্তরের উঁচু মহলে অর্থাৎ 'সাহেবী' পদে দীর্ঘকাল চাকরি করে বছর চারেক হল অবসর নিয়েছিলেন। এখনো 'বাবু' সম্বোধনটা বরদাস্ত করতে পারেন না। ওটা আমরা আড়ালে ব্যবহার করে থাকি। সামনে বলি মিস্টার মিটার কিংবা মিত্তির সাহেব। হাতের মোটা লাঠিটা সিঁড়ির উপর ঠুকতে ঠুকতে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলেন। এবং দরাজ গলায় বলে উঠলেন, কি মশাই সকালেই বুঝি সাহিত্য নিয়ে বসেছেন? না, তাহলে আর বিরক্ত করবো না।

আমি নীরব রইলাম। সেটা আর যা-ই হোক অভ্যর্থনাজ্ঞাপক নয়। মিত্তির সাহেব সে সব যথারীতি উপেক্ষা করে এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারখানা দখল করলেন। লাঠিখানা মাটিতে শুইয়ে রাখতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, কোমরটা দেখছি বড়ই গোলমাল বাধালে। তা, ওরই বা দোষ কি? এত বড় দেহটাকে, শুধু দেহটাই বা বলি কেন, তার সঙ্গে একটা বৃহৎ সংসার এতকাল ধরে টেনে নিয়ে এসেছে। আজ আর পারছে না। তার মানে একটু সেবা যত্ন চায়। কিন্তু এমনি কপাল করে এসেছিলাম—

এই পর্যন্ত এসে মুখে একটা আপসোস-সূচক আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনাকে বলতে বাধা নেই। লেখক মানুষ, মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝেন। কাল সন্ধ্যাবেলা মুখ ফুটে বললাম, ওগো কোমরটা বড্ড টনটন করছে। একটু আইওডেক্স্ লাগালে আরাম পেতাম। কি বললে জানেন? 'ওতে কিচ্ছু হয় না। এই দ্যাখ না, আমিও কদিন পা-টান করতে পারছি না। ঝিটাকে দিয়ে

পুরো আধ কৌটো আইওডেক্‌স্‌ ঘষালাম। যে-কে সেই! ঘোরাঘুরি না করে চুপ করে শুয়ে থাক। তাতেই সেরে যাবে।'

মিনিট পনেরো পরে দেখলাম, একেবারে আঠারো বছরের নব-যুবতীর মত সাজগোজ করে আমার ঐ বাউণ্ডুলে ভাগনেটার সঙ্গে দিব্যি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল রে?

—কোথায় আবার? পাঁচ দিন আগে মোহনদাকে দিয়ে 'কাশ্মীর-কি-কলি'র টিকিট আনিয়ে রাখা হয়েছে। আমি যেন আর দেখি নি? আর বেরোবার সময় বলা হল, তোমার বড় মাসীমার বড্ড অসুখ যাচ্ছে। একটু দেখে আসি। ফিরতে দেরি হলে তোমরা খেয়ে নিও।

জিজ্ঞেস করলাম, কী অসুখ তোর বড় মাসীমার?

—তুমিও যেমন, বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি বাবা।

—এখন আবার কোথায় যাবি?

—মীনার কাছ থেকে লজিকের পড়াটা জেনে আসি।

ভাবছিলাম, মেয়েকেই বলব আইওডেক্‌সের কৌটোটা নিয়ে আসতে। সে ফুরসত আর হল না।···এই হল সংসার। বুঝলেন?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিত্তির সাহেব তার দীর্ঘ দেহটাকে চেয়ারের গায়ে এলিয়ে দিলেন। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, অথচ এই কোমরে যখন জোর ছিল, কী খাতির! মুখ থেকে কোনো কথা খসতে তর সইত না, চারদিক থেকে সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত। আর আজ? চাকর-বাকরগুলোকেও সমীহ করে চলতে হয়। কখন বলে বসবে, নেহি করেঙ্গে। সেই যে বি. এ. ক্লাসের প্রথম দিকে পড়েছিলাম—Value of a commodity is determined by its marginal utility, মানুষের বেলাতেও তাই। utility-ই হল সব। আজ বোধহয় তার margin-এর তলায় নেমে গেছি।

—কিসের margin-এর তলায় নামলেন? বলতে বলতে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন প্রশান্ত সমাদ্দার! ইনিও প্রায় একগোত্র, অর্থাৎ রিটায়ার্ড্‌। ঢুকেছিলেন মুন্সেফ হয়ে; ধীরে ধীরে সবজজ-গিরির সিঁড়ি বেয়ে জজিয়তির মসনদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। বছর কয়েক হলো নেমে এসেছেন।

মিত্তির সাহেব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, সে সব আপনি বুঝবেন না! মোটা পেনসন পান। সংসারের কাছে এখনো আপনার যথেষ্ট value আছে।

—আপনার valueই বা কম কিসে? প্রভিডেণ্ট্‌ ফাণ্ডের অঙ্কটি যা বাগিয়ে এনেছেন, আমরা একশ বছর বেঁচে থাকলেও তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো না।

—সে সব কি আর আছে মশাই? বাড়ি করতেই বেরিয়ে গেল। তার ওপরে মাসিক যোগান তো আর দিতে পারছি না আপনার মত।

—তা না পারুন, এতবড় বাড়িটা যে করে দিয়েছেন, তার বুঝি দাম নেই?

—সেটা কে বোঝে ? ওটা তো একরকম মুফৎ, হিসাবের মধ্যে পড়ে না বলতে পারেন taken for granted.

—Exactly so, পরিবারের কাছে, আমরা যারা রিটায়ার করেছি, সকলেই taken for granted. দামের কোনো প্রশ্ন নেই ।

—আছে কি নেই সেইটাই একবার দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ।

—কেমন করে দেখাবেন ?

—সব দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পড়লেই হল ।

—পারবেন না । বেরোতে গিয়ে দেখবেন, নানা জায়গায় টান পড়ছে ।

—টান । গর্জে উঠলেন পরিতোষ মিত্তির । কার ওপরে কিসের টান ? ওটা কি শুধু এক দিকের ? না মশাই, আমি আর কারো জন্যে কিছু feel করি না ।

—তাহলেও পার নেই, মৃদু হেসে বললেন ভূতপূর্ব জজ সাহেব, আপনার কর্তব্যবোধ আছে । তার চেয়েও বড় কথা দশজনের কাছে সুনাম রক্ষার দুর্বলতা আছে, দুর্নামের ভয় আছে ।

—ঠিক বলেছেন, হঠাৎ যেন মিইয়ে গেলেন মিত্তির সাহেব, ঐ ভয় আর দুর্বলতার ওপর ব্যাঙ্ক্ করেই তো এত হেলা-ফেলা । কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, মিস্টার সমাদ্দার । এবার সত্যিই ভাবছি, চলে যাবো । কাশী-টাশী কোথাও গিয়ে থাকবো । সংসারের যেটা আসল বন্ধন—একটুখানি দরদ. তাই যদি না থাকে—

পরিতোষবাবুর কথায় বাধা পড়ল । দরজার ওপার থেকে মুখ বাড়াল তাঁরই অনেক দিনের ভৃত্য, রামদাস । যেন সমন জারি করছে এমনি সুরে ও ভঙ্গিতে বলল, মা ডাকছেন ।

—কেন ? কপাল কুঞ্চিত করে বিরক্তির স্বরে বললেন পরিতোষবাবু । রামদাস সে কথার কোন উত্তর দিল না । সমনের দ্বিতীয় অংশটা ব্যক্ত করল, তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন ।

বলে আর দাঁড়াল না । মিস্টার মিটার দুহাতের আঙুলগুলো উল্‌টে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন । তারপর লাঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন । আমাদের কাছে বিদায় নেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না ।

তাঁর গমন-পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে চেয়ে থেকে প্রশান্তবাবু একটু হাসলেন । তারপর যেন রায় দিচ্ছেন এমনভাবে বললেন, adjustment-এর অভাব । অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই ঐ এক সমস্যা । জীবনটা যেমন যেমন বদলাবে, মনকে যদি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নেন, তাহলেই মুস্কিল । এখানে বিঁধবে ওখানে লাগবে । স্বাচ্ছন্দ্য যাকে বলে, কখনো পাবেন না । মিত্তিরের সব চেয়ে বড় দোষ হলো, সংসারের কাছে ওঁর expectations বড্ড বেশী । উনি বোঝেন না, খাপ-খাওয়ানো মানেই কিছুটা ছেঁটে কেটে ফেলা । আশা যদি কমাতে না পারেন, নিরাশ হবার দুঃখ এড়াবেন কি করে ?

'এদিক দিয়ে আপনি একেবারে বেঁচে গেছেন', এবার আমার দিকে নজর

দিলেন প্রশান্তবাবু, 'গোড়াতেই শূন্য। যা নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া বা খাপ-খাওয়াবার প্রশ্ন ওঠে না।'

পেছন দিকের ভেজানো দরজা খুলে আমার চৌদ্দ বছরের মাসতুতো ভাই সমীর বাজারের থলে নিয়ে আমার ডান পাশে এসে দাঁড়াল। আমি কোনো কথা না বলে দেরাজ খুলে কয়েকখানা ছোট নোট হাতে দিতেই সে বেরিয়ে গেল। প্রশান্তবাবু সেটা লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, অবিশ্যি আমাদের দেশের কথা একটু আলাদা। এখানে ব্যাচেলর হলেও সংসারিক দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয়। তবে সে সংসার একেবারে অন্য জিনিস। সেখানে মনের দিক থেকে, ইংরেজীতে যাকে বলে, অনেকখানি detached থাকা চলে! বাংলায় কী বলবো? নির্লিপ্ত? ওটা আপনিই ভাল জানেন।

এতক্ষণ আমার কাজ ছিল শুধু শুনে যাওয়া। এই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলাম। বললাম, বাংলায় যাই বলুক, আমার মনে হয়, অবসর জীবনে ঐ detachment-ই হল একমাত্র পথ। শুধু আমার বেলায় কেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে যে সংসার, সেখানেও যদি বেশ কিছুটা নিরাসক্ত থাকবার অভ্যাস করা যায়, মিত্তির সাহেবেরা, শান্তি না হোক অনেকটা স্বস্তি পেতে পারেন।

—কিন্তু সে অভ্যাস তো সহজ নয়। আপনি হয়তো পারতেন। ভগবান আপনার হাতে ঐ যে একটি পরমবস্তু তুলে দিয়েছেন (টেবিলের উপর রাখা আমার কলমটার দিকে ইঙ্গিত করলেন) ওরই কল্যাণে সব কিছু থেকে মনটাকে সরিয়ে রাখা যায়। 'আমাদের তো সে সুবিধে নেই। সত্যি; আপনাকে দেখলে হিংসে হয়। এর চেয়ে nobler occupation আর কী আছে? আর আমরা কী করছি? জন্তু-জানোয়ারের জীবন বললেই হয়। শুধু আহার আর নিদ্রা আর মাঝে মাঝে জাবরকাটা।

আমার সঙ্গে যেমন এঁদের সকলেরই মূলগত অমিল,—এঁদের দুঃখটা মন দিয়ে বুঝতে পারি, জীবন দিয়ে নয়,—তেমনি প্রশান্ত সমাদ্দার ও পরিতোষ মিত্রকে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। একজন বিপত্নীক! একজনের বিমুখ-পত্নীক। একজনের বেলায় 'স্ত্রী' নামক ব্যক্তিটি সংসারে কোথাও নেই, কিন্তু জীবন জুড়ে আছেন; আরেকজনের বেলায় তিনি সংসার জুড়ে থাকলেও জীবন থেকে মুছে গেছেন। দুজনের দুঃখ দুরকম। তবু যদি তুলনা করা যায়, ভাগ্যের কাছে মিত্তিরই বোধ হয় বেশী বিড়ম্বিত। 'নেই'-এর যে শূন্যতা তাকে মেনে নেওয়া যায়, মনকে বোঝানো চলে, কিন্তু 'থেকেও নেই'-এর যে ক্ষোভ তার সান্ত্বনা কোথায়?

একদিন অন্য এক প্রসঙ্গে এরই ব্যবহারিক দিকটা মিত্তির মহাশয়ের নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আরে মশাই প্রশান্ত সমাদ্দার যে কথায় কথায় adjustment-এর বুলি ঝাড়ে, আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতাম তার দৌড় কত। সে বেশ ভালো করে জানে where he stands, সংসারের মধ্যে তার আসল জায়গাটা কোথায়। ওর ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ তারাও

জানে ওর সম্বন্ধে তাদের করণীয় কী। আমি যে না ঘরকা না ঘাটকা। আমার অবস্থাটা হচ্ছে বেওয়ারিশ পার্শেলের মত। গায়ে যার লেবেল আঁটা আছে, সে ছাড়া কাউকে ছুঁতে দেওয়া হবে না। এদিকে তারও কোনো পাত্তা নেই। কাজেই গুদামে বসে বসে পচো।

প্রশান্তবাবু থাকতে থাকতেই ডাক পিয়ন এসে কয়েকখানা চিঠি দিয়ে গেল। তার মধ্যে একখানা 'পার-অ্যাভিয়ন' মার্কা সুদৃশ্য খাম। উনি বললেন, বিদেশী ডাক মনে হচ্ছে?

আমি তার ধারটা কাঁচি দিয়ে কাটতে কাটতে বললাম, হ্যাঁ, আদিত্যবাবুর চিঠি।

—কে আদিত্যবাবু?

—আদিত্যবাবুকে চেনেন না? অতবড় সাহিত্যিক।

—ও, আদিত্য সেন? নাম শোনা আছে। বই-টই বড় একটা পড়া হয় নি। চিরটা-কাল তো আইন ঘেঁটেই কাটল। সাহিত্যের স্বাদ আর পেলাম কই? সে যাক। উনি এখন আছেন কোথায়?

—কেনিয়ায় গেছেন একটা কালচারাল মিশনের চার্জ নিয়ে।

—মস্ত বড় চিঠি দেখছি। আচ্ছা, আপনি পড়ুন, আমি উঠি।

চিঠিখানা সত্যিই বৃহৎ। প্রধানমন্ত্রী কেনিয়াট্টা এবং তাঁর বিদুষী কন্যা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 'মিশন' যে জমকালো অভ্যর্থনা পেয়েছে, প্রথম চার-পাঁচ পাতা ব্যাপী তারই বিস্তারিত বর্ণনা। বাকী পাতাগুলো একান্তভাবে ওঁর নিজের কথা, যা আমি ছাড়া বোধ হয় আর কাউকে লিখতেন না। আমরা সমবৃত্তি এবং অসমবয়সী। সাধারণতঃ এরকম দুজন ব্যক্তির মধ্যে হৃদয়গত সম্পর্ক অতি বিরল, বিশেষ করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে। কিন্তু এদিক দিয়ে আমরা ব্যতিক্রম। লেখক হিসেবেও আদিত্য সেন ও মলয় চৌধুরীর মধ্যে প্রচুর ব্যবধান। তবু আমরা পরস্পরের নিকটতম বন্ধু।

চিঠির শেষ পরিচ্ছেদটা আর একবার পড়লাম।

আফ্রিকার অরণ্যে পর্বতে ঘুরছি, আর রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনগুলো মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করছে—

"ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিল অপরিচিত তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।"

তারপর—

"রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যুবেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার বক্ষের পরে চালায়েছে রথ
যেখানে বেদনাভরা মানবহৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।"

সেই রথদলন ক্ষতচিহ্ন আজও মিলিয়ে যায় নি। তবু আফ্রিকা আজ আর সে আফ্রিকা নেই। আজ সে ইউরোপের মন্ত্রশিষ্যা। পশ্চিমের জীবন-ধারার অনুকরণে তৎপর। এদিক দিয়ে সে এশিয়াকে দ্রুত বেগে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক-দিকে তার সেই নব নব রূপায়ণ, আরেক দিকে শহর ও সভ্যতা থেকে দূরে 'লতাগুল্ম-অবরুদ্ধ বনঘনিমায়' এখনো বেঁচে আছে সেই প্রাচীন আফ্রিকা।

"সেথায় অরণ্য অন্তরালে
নিভৃত গোপন অবকাশে"

ঘুরছি, আর কী ভাবছি জানো? 'ওরে কবি, এইখানে তোর কুটিরখানি তোল।'

তুমি মনে মনে হাসছ। হয়তো জিজ্ঞেস করছ, 'এবার নিয়ে কবার হল, দাদা?' স্বীকার করছি, অনেকবার। শুধু বহিঃপ্রকৃতিই যে আমাকে টানে তা নয়, দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে আছে মানুষের যে মধুর প্রকৃতি সেও আমাকে চিরদিন আকর্ষণ করেছে। যখন যেখানে তার স্পর্শ পেয়েছি, কে যেন বুকের ভিতর থেকে মাথা তুলে বলছে, এখানে যেমন তেমন একটা বাসা বেঁধে থেকে গেলে কেমন হয়? গৃহী হয়েও যে গৃহের স্বাদ পেল না, এ বোধ হয় তারই বুভুক্ষু মনের কামনা। অনুভব যখন করেছি, তীব্র ভাবেই করেছি। তার পর কালক্রমে ধীরে ধীরে সে তীব্রতার ধার মরে গেছে, পুরনো স্মৃতির ওপর ধুলো জমেছে।

আজ যেখানে এসে পড়লাম, তার ভৌগোলিক দূরত্বটা যেমন দুস্তর, তেমনি তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষগুলোর আকৃতি, ভাষা, আচার, আচরণ, খাদ্য পরিচ্ছদ, কোনো কিছুর মধ্যেই মন কিছুমাত্র নৈকট্য খুঁজে পাচ্ছে না। তবু ভাবছি, কী হবে আর ফিরে গিয়ে? যে কটা দিনের মেয়াদ বাকী আছে, এই-খানেই কাটিয়ে দিই। জীবন ধারণের উপযোগী যে কোনো একটা কাজ এরা ইঙ্গিত করলেই জুটিয়ে দেবে। সেই কর্মসূত্রই হবে এদের সঙ্গে আমার একমাত্র সম্পর্ক। তার বেশী আর যদি কিছু পাই, খুশী হবো, না পেলে ক্ষুব্ধ হবো না। এদের কাছে আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। কী পেলাম, গ্রহণ না বর্জন, আদর না অবহেলা, সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু ওখানে তো মনকে ঠিক এই স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় না। আপনজনের কাছে যে তার অশেষ প্রত্যাশা, না পাবার দুঃখও অনেক।

আমার এই 'কাঙালপনার' জন্য একদিন তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে, মনে আছে। বলেছিলে সারা দেশের কাছে কম তো কিছু পান নি দাদা। একটা বিশেষ বাড়ির কজন মানুষ যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাতে আপনার কী এসে যায়? শুনে আমি হেসেছিলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর ঐ 'বিশেষ' কথাটার মধ্যেই রয়ে গেছে! সে কথা তোমার খেয়াল হয় নি। কিংবা সব কিছু জেনে এবং বুঝেও তুমি আমাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছ।

খ্যাতি, বিশেষ করে সাহিত্য-খ্যাতির উপর বিধাতার অভিশাপ আছে; তার লক্ষ্যস্থল সাহিত্য-সেবীর দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবন, তোমার এই উক্তি আমি অস্বীকার করি না। ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে, তাও আমি

জানি। কোথায় যেন পড়েছিলাম—কোনো এক প্রসিদ্ধ লেখকের স্ত্রী বলছেন তার বান্ধবীকে, 'অহরহ সতীন নিয়ে ঘর করবার কী জ্বালা, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।' বান্ধবী তো অবাক—'সতীন কোথায়!' 'কোথায় তা যদি দেখতে পেতাম, তাহলে কি আর ছেড়ে দিই? কিন্তু তাকে দেখা যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না। ডাইনী যে যাদু জানে। ওকে দুহাত দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আমি কাছেও ঘেঁসতে পারি না।' বান্ধবী তখনো বুঝতে পারছে না—কে বল তো? স্ত্রী বললেন, 'সে রাক্ষসীর নাম খ্যাতি'।

পুত্রকন্যাদের কাছেও সে এক দুর্ভেদ্য দেওয়াল। তাদের বরং তাদের 'পিতা' নামক মানুষটির মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু মলয়, একথা কেন তারা বোঝে না, একে তো আমি সেধে যেচে আনি নি। তা ছাড়া, এর এক দিকে যদি অভিশাপ থাকে, আরেক দিকে আছে গৌরব। তার অংশ তো তারা নিতে পারত। দেবার চেষ্টাও আমি কম করি নি। তার সবটাই বৃথা হলো। সেই চরম ব্যর্থতার শেষ কাহিনীটুকু বলেই আজকের মত বিদায় নেবো।

কেনিয়া যাত্রার আগে মিশনের সভ্যেরা রাজধানীতে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে একটা আলাপ-আলোচনা করে নেবেন এই ছিল ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে আমি একা। দমদম থেকে প্লেন ছাড়বে সকাল সাড়ে ছটায়। সুতরাং একটু রাত থাকতে উঠে তোড়জোড় করতে হবে। আকাশযাত্রায় আমার কিঞ্চিৎ বমির উদ্রেক হয়ে থাকে একথা আমার বাড়ির সকলেই জানেন। বেরোবার আগে এক পেয়ালা চা এবং তার সঙ্গে কিছু খাদ্য পেটে পড়া দরকার, তাও তাদের জানা আছে। টেলিফোনের 'এলার্ম' যথাসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল! তার প্রধান সংযোগটা দোতলায়, যেখানে আমাব স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা থাকেন। তেতলার একমাত্র বাসিন্দা আমি। আমার টেবিলে শাখা লাইনের সঙ্গে যে যন্ত্রটি আছে নিচে থেকে যোগ না ঘটালে সে বাজে না। অর্থাৎ আমার ঘুম ভাঙাবার আগে নিচের মহলে কেউ না কেউ জেগে উঠেছেন। আমার পুরাতন ভৃত্য বংশী কিছুদিন আগে দেশে গেছে। আশা করেছিলাম, সে যখন নেই, আমার স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো পরিজন নিশ্চয়ই আসবেন। কারো দর্শন পেলাম না। এদিকে সময় হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি কটা জামা কাপড় সুটকেসটায় ভরে নিলাম. স্টোভ এবং চায়ের আয়োজন আমার ঘরেই থাকে, তুমি দেখেছ। কেটলিটা বসিয়ে নিজেই এক কাপ করে নিলাম! সঙ্গে আর কিছু হয়ে উঠল না। ট্যাক্সির ব্যবস্থা আগের দিনই করা ছিল। হর্ণ শুনে সুটকেসটা হাতে করে নেমে এলাম।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে সমস্ত বাড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই তো বছর কয়েক আগে আমিই তৈরী করেছি। সব এই লেখনীর দান। যাদের জন্যে করেছি, তারা ওরই ঘরে ঘরে নিজ নিজ সুখশয্যায় সুপ্ত। জাগ্রতও হতে পারে। কিন্তু কোথাও কোনো জীবনের লক্ষণ নেই। আমার এই সুদূর এবং গৌরবময় (!) বিদেশযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে একটা দরজাও খুলল না, একখানা পরিচিত মুখও দেখা গেল না· কোনো জানালা ব্যালকনি কিংবা

বারান্দার কোণে।

গাড়িটা যখন ছেড়ে দিল, একটা কথাই শুধু মনে হল—কার জন্য কী করলাম ?

আজও বসে বসে ভাবছি, আমরা কি প্রস্তর-যুগে ফিরে যাচ্ছি—যেখানে মানুষ ছিল কিন্তু তাদের কোনো বন্ধন ছিল না ? তারপর বহু শতাব্দী ধরে কত ত্যাগ, কত সাধনা, একের প্রতি অন্যের কত বিশ্বাস ও আনুগত্য দিয়ে 'গৃহ' নামক যে স্বর্গ আমরা গড়ে তুলেছিলাম, তার ভিত কি ধ্বসে পড়ছে ? গার্হস্থ্য জীবনের যে অবলম্বন—শ্রদ্ধা, প্রীতি, মমতা, কৃতজ্ঞতা—সব কি নিঃশেষ হতে চলেছে ?

এই দুর্গম ভয়াল, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি না, কোলকাতা শহরের এক অতি-অভিজাত পল্লীর প্রশস্ত রাজপথের উপর, সভ্যতার বহু উপকরণে সজ্জিত আমার সেই প্রাসাদোপম গৃহের যে আরণ্য রূপ সেদিন দেখে এলাম, এর সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়।'

টেলিফোন বেজে উঠল। না ধরেই বুঝলাম, "বৈশাখী"-সম্পাদক মন্মথ ভট্চাজ। যন্ত্রটা তোলামাত্র তার বেয়ে যে বচনসুধা আমার কর্ণকুহরে এসে ঢুকবে তার প্রতিটি কণা আমার পরিচিত। অতএব ওটা বাজতে থাক, আমি লিখতে শুরু করি।

কিন্তু গত কিস্তিটা কোথায় শেষ করেছি মনে করতে পারলাম না। একটা নতুন মেয়ে আমদানী করে ছিলাম তার নামটাও ভুলে গেছি। বইখানাও বাড়িতে নেই। গলির মোড়ে এক ডাক্তার বন্ধু বসেন। তিনি পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন, ফেরত দেন নি। অতএব উঠতে হলো।

তাঁর ডিস্পেনসারিতে যখন পৌঁছলাম, ডাক্তার একটা লোককে ইন্জেকশন দিচ্ছিলেন। হাঁপানির রুগী। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মানুষ নয়, যেন একটা কঙ্কাল পড়ে আছে বেঞ্চির উপর, একটি প্রৌঢ় স্ত্রীলোক তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পায়ের কাছে বসা এক যুবক। বুড়োর স্ত্রী এবং ছেলে।

হাঁপানির টানটা একটু কমলে দুজনে মিলে রুগীকে তুলে তার দুটো হাত নিজেদের কাঁধের উপর নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। টাকা পয়সা কিছু দিতে দেখলাম না। ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললাম, সবটাই বুঝি খয়রাত ?

ডাক্তার মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। বললাম, হাসপাতালে যায় না কেন ?

—বলে দেখুন না একবার ? মায়ে ছেলে, একসঙ্গে তেড়ে আসবে। কি বলে জানেন ? হালের বুড়ো গরুটা যখন অচল হয়ে পড়ে, তখনো তো লোকে তার যত্ন আত্তি করে। আর এই মানুষটা যে সারাজীবন ভর-গোষ্ঠীকে খাওয়াল পরাল, আজ পড়ে গেছে বলে তাকে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসবো ? বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, ফেলে দেবে কেন ? সেখানেও যত্ন নেবার লোক আছে। বুড়ি বলল, হাজার থাক। তবু তো তারা পর। ছেলেরও তাই মত। বাড়ি দক্ষিণে কোন্ গাঁয়ে। বাপের চিকিৎসার জন্যে বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আছে। চটকলে কাজ

নিয়েছে—নাইট শিফ্‌ট যাতে করে দিনের বেলাটা বাপকে দেখতে পায়ে। রাতের জন্যে তো মা-ই আছে।

এটা যে বদ্ধ কুসংস্কার এবং যত তাড়াতাড়ি এ মনোভাব আমাদের দেশ থেকে দূর হয়, ততই আমরা সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবো—এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে, কেন জানি না, এসব যুক্তির কথা আমার মনে এল না। বুড়োকে নিয়ে যতক্ষণ না ওরা গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেইদিকে চেয়ে রইলাম। আদিত্যদার চিঠির শেষের লাইনগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, এদের কথা তাঁকে লিখে দিলে কেমন হয়। হয়তো তাঁর মনে হবে, প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে এখনো আমাদের কিছু দেরি আছে।

বর্মার দাদামশাই

রবিবার। ইস্কুল ছিল না।

'হাফ-এ-ডজন' মামার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম বাজার করতে। 'হাফ-এ ডজন' মানে ছ'জন মামা নয়। মামা একটিই। ওটা তাঁর একটা বিশেষণ।

মধ্যপ্রদেশের কোনো এক রাজ-এস্টেটে মামা বড়দরের চাকুরে। সেখানে শালবনের মধ্যে কোনো জিনিসই পাওয়া যায় না। সেইজন্য ফি বছর শীতকালে মামা কলকাতায় এসে বছরের মতো বাজার করেন। তার নিয়ম হচ্ছে, যা কিছু কিনবেন—জুতো, জামা, ছাতা, ঘড়ি,—সব অন্তত হাফ-এ-ডজন। কোনো ক্ষেত্রেই এ নিয়মের নড়চড় চলবে না।

মামীমার একদিন চাল-কুমড়ো খাবার সাধ হয়েছিল। মামাকে জানাতেই হাফ-এ-ডজন বড়-বড় চাল-কুমড়ো চলে এল।

আর একবার সংসারের জন্য শিল-নোড়া আর বঁটি কেনার দরকার হয়েছিল। পরদিনই বাজার থেকে হাফ-এ-ডজন শিল-নোড়া আর হাফ-এ-ডজন বঁটি এসে হাজির।

এবার 'হল অ্যান্ড এ্যাণ্ডারসন'-এর দোকানে মামার জুতোর অর্ডার ছিল। ছ'জোড়া জুতো পছন্দ করে প্যাকিং-এর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময়ে দেখি, ওদিকের একটা চেয়ারে আমাদের সুধীর, বেশ একটা দামী জুতো পায়ে ঢোকাচ্ছে।

সঙ্গে তার বাবাও আছেন। প্রথমেই মনে হল ভুল দেখছি। সুধীরের বাবাকে আমরা চিনি তো?

সেবার সরস্বতী পুজোর জন্য চার আনা চাঁদা আদায় করতে চারদিন হাঁটা-হাঁটির পর পাওয়া গেল পাঁচ পয়সা, এবং সেই সঙ্গে দু-চারটে কথা, যা শোনবার পরে বাকি এগারো পয়সার দুরাশা আর রাখি-নি।

সেই ভদ্রলোক জুতো কিনতে ঠন্‌ঠনে কিংবা চীনা-বাড়ি না গিয়ে এসেছেন সাহেব-বাড়ি। কাছে গিয়ে দেখবো ভাবছি, এমন সময় সুধীর নিজেই এগিয়ে এল। হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। ভিতরে বললে সুট—র‍্যাঙ্কিনের বাড়িতে তৈরী।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী রে ?'

সুধীরের মুখ উজ্জ্বল। বললে, 'শুনিস নি বুঝি ? বর্মার দাদামশাই এসেছেন যে ! দেখা করতে যেতে হবে।'

এক কথাতেই সব বোঝা গেল। এই বর্মার দাদামশায়টির নাম অন্তত পঁচিশবার শোনে নি এমন লোক সুধীরের পরিচিত মহলে নেই।

এঁকে আমরা দেখি নি, কিন্তু তৈমুরলঙ বা ভাসকো-ডি-গামার মতো এঁর ইতিহাস আমাদের কণ্ঠস্থ। বর্মার কোনো এক শহরে কিসের ব্যবসা করে কত লাখ টাকা তিনি জমিয়েছেন, সব এক নিঃশ্বাসে বলে দিতে পারি। এই লাখপতি দাদামশায়েব সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সুধীর—কেননা তাঁর আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই। সুধীর একথা অনেক দিন আমাদের শুনিয়েছে। সেজন্য পরীক্ষায় বার-বার ফেল করেও দমে যায় নি। পণ্ডিতমশায়কে আশ্বাস দিয়েছে যে সম্পত্তিটা পেলেই তাঁকে নিজে বাড়িতে একটা টোল করে দেবে। এরপব থেকে পণ্ডিতমশায়ও আর কোনো গোলমাল করেন না।

বললাম, 'তোর দাদামশায় কোথায় উঠলেন ? তোদের বাড়িতে ?'

সুধীর চোখ কপালে তুলে বললে, 'বলিস কী ? আমাদের বাড়ি। অতবড সাহেব মানুষ ! উঠেছেন বালিগঞ্জে। বাবা বললেন, প্রথম দিন একটা দামী সুট পরে যাওয়াই ভালো। তা না হলে হয়তো চটেই যাবেন। সাহেব-সুবোর মেজাজ তো, বলা যায় না।'

পরদিন ইস্কুলে সুধীরের দেখা পাওয়া গেল না। ছুটির পর বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ছি, নিধে চাকর এসে বললে, 'একটি সাহেববাবু এসেছেন দেখা করতে !'

তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, সুধীর। পায়ের নখ থেকে মাথার ডগা পর্যন্ত নিখুঁত সাহেবী পোষাকে মোড়া।

বললাম, 'হ্যালো ! মিস্টার রয়, আই অ্যাম সো গ্ল্যাড...'

'থাম, থাম। চল বেরিয়ে পড়ি।'

'বেরোব ! কোথায় ?'

'কেন, দাদামশায়ের বাড়ি !'

'সর্বনাশ ! সেখানে আমি কী করব ?'

সুধীর অনুনয় করে বললে, 'না ভাই, চল। আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না। যদি ইংরিজীতে কথাবার্তা বলেন, একটু সাহায্য করবি। আমার ইংরেজি-জ্ঞান তো জানিস ?'

'কিন্তু আমার যে সুট নেই।'

'সুট নেই! তা আর কী হবে? তুই পেছনে থাকিস'খন।'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। যেতে হল। বাড়ির নম্বর ছিল। খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। একটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, 'মিস্টার রসরাজ রয়ের বাড়িটা জানেন? এ পাড়ায় নতুন এসেছেন বর্মা থেকে।'

ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ঐ সাদা পাঁচিল। একটু সাবধানে ঢুকবেন।'

সুধীর রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছে কোট-হ্যাট সব ঠিকঠাক করে নিলে। বাড়ির ভিতর থেকে খোল-করতালের আওয়াজ কানে এল।

সাহেবের বাড়িতে খোল। সুধীর বললে, 'লোকটা গাঁজা খায়। এ বাড়ি হতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'তবু যখন এতদূরে এসেছি, একবার ঢুঁ মেরেই দেখা যাক।'

ভিতরে ঢুকতেই উঠোন। সেখানে কীর্তনের আসর বসেছে। আমাদের দেখে একটি বাবাজী গোছের লোক এগিয়ে এল, 'কী চাই?'

'মিস্টার রসরাজ রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনারা কারা?'

'আপনি চিনবেন না। উনি এ বাড়িতে থাকেন কী?'

'থাকেন, কিন্তু এখন দেখা হবে না।'

'আচ্ছা, সে আমি বুঝব।' বলে, সুধীর গট গট করে এগিয়ে গেল।

আমিও সঙ্গ নিলাম। তিন-চারজন বাবাজী 'রা-রা' করে ছুটে এল। তার আগেই আমরা সামনের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়েছি।

ভীষণ অন্ধকার। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না। অনেকক্ষণ তাকাবার পর দেখলাম, ওদিকের কোণে একটা লোক বসে আছে। খালি গা, মাথা ন্যাড়া, বুকভরা বড় বড় লোম, গলায় একবোঝা তুলসীর মালা, পরনে আট-হাত ধুতি। লোকটা এমনি রোগা যে চামড়ার ভিতর থেকে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে আসছে। ভাঙা গলায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে···কে···কে তোরা? কী চাই এখানে?'

আমরা কিছুটা হটে এলাম। কে একজন লোক এসে আমাদের গায়ে-মাথায় কিসের খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল।

হায়রে র‍্যাঙ্কিনের সুট! তাদের হুকুমে জুতোও খুলতে হল। তার উপরেও খানিকটা তুলসী-জল ঢেলে দিল।

রোগা লোকটা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। সুধীর বললে, 'আমরা মিস্টার রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই···মিস্টার রসরাজ রয়।'

লোকটা মুখ ভেংচে বললে, 'আজ্ঞে আমিই সেই অধম। মিস্টার-ফিস্টার নই, রয়-টয়ও নই! সোজাসুজি রসরাজ রায়। আপনাদের শুভাগমনের হেতুটা কী? ফুটবলের চাঁদা তো আমি দিই না।'

সুধীর বললে, 'আজ্ঞে, সে জন্য আসি নি। আমি আপনার নাতি। বৃন্দাবন

রায় মহাশয় আমার পিতা।'

'কোন্ বৃন্দাবন ?'

'আপনার ভাইপো। উত্তরপাড়ায় তেরো নম্বর বসাক লেনের···'

'ওঃ, বেন্দা! তার ছেলে এমন বাঁদর হয়েছে ? সাজটা তো দেখছি চমৎকার। একটা ল্যাজ লাগাও নি কেন ? সুন্দর মানাতো। তা, এখানে কী মনে করে ? সঙ্গে এটি কে ?'

সুধীর একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম। শীতের রাতে সেই ভিজে জামা-জুতো পরে কাঁপতে-কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম!

'দমে যাওয়া' কথাটা সুধীরের অভিধানে ছিল না। দিন সাতেক পরে একদিন রাস্তায় দেখা। চিনতেই পারি না। মাথাটা কামানো, পরনে গেরুয়া, গলায় হাতে তুলসীর মালা, খালি পা। বললাম, 'ব্যাপার কী রে ?'

সুধীর করুণভাবে বললে, 'এর মধ্যে আর-একবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু ফল সেদিনের মতোই গলাধাক্কা। তবু হাল ছাড়তে পারছি না। চোখের ওপর আমার গ্রাস ঐসব ন্যাড়ামাথাগুলোর উদরস্থ হবে, কেমন করে সহ্য করি বল তো ? তাই এই রাস্তা ধরলাম। তবে এইবারই শেষ। চল না···'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। তাছাড়া একটু কৌতূহলও ছিল। চললাম।

আজও কীর্তন হচ্ছিল। ভক্তবর রসরাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমি দরজার পাশে দাঁড়ালাম। সুধীর সোজা সেই দলের মধ্যে গিয়ে বসল।

গানটা জমে উঠেছে। যে খোল বাজায় সে এত জোরে মাথা নাড়ছে, মনে হচ্ছে, মাথাটা যে-কোনো সময়ে গলা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে।

হঠাৎ এক প্রলয় কাণ্ড।

সুধীর লাফ দিয়ে উঠে ধপাস করে সটান মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে হাউ-হাউ করে আকাশ ফাটিয়ে কান্না। সে কী আর্তনাদ। যেন তার একটা হাত বা পা কেউ কেটে নিয়ে গেছে। কীর্তন গেল থেমে। সবাই মিলে তাকে টেনে তুলল।

রসরাজ বললেন, 'কী হয়েছে তোর ? চেঁচাচ্ছিস কেন ?'

সুধীর বুক চাপড়ে বললে, 'বুক ফেটে গেল প্রভু, বুক ফেটে গেল। শ্রীরাধার দুঃখ আর সইতে পারছি না। আমায় কৃপাকণা দিন।'

ভক্তের দল ছবির মতো দাঁড়িয়ে, রসরাজ গম্ভীরভাবে বসে। আর সুধীর শ্রীরাধার শোকে পাগল···

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলাম।

মাস তিনেক পরে আবার দেখা। সুধীর বেচারা একেবারে আধখানা হয়ে গেছে। বললাম, 'করছিস কী! মরে যাবি যে।'

সুধীর বললে, 'আর কোনো রকমে দিন পনেরো। বুড়োর হয়ে এসেছে। উইলটা না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতেই হবে।'

'এখনও তেমনি হাউ-হাউ করছিস পড়ে-পড়ে ?'

'না, ঐ একদিনের কান্নার চোটেই একেবারে প্রধান চেলা হয়ে গেছি। এখন

সমস্ত কাজের ভার আমার ওপর। তামাক সাজা থেকে ওষুধ খাওয়ানো। যে রকম সেবা করছি ঐ সিন্দুক-বোঝাই কোম্পানির কাগজগুলো আর কারুর ভাগে একখানা পড়বে বলে মনে হয় না।'

তারপর একদিন শুনলাম, রসরাজ মারা গেছেন, অর্থাৎ দেহরক্ষা করেছেন। উইল তার আগেই হয়ে গিয়েছিল। উকিল ছাড়া আর কেউ তখনও জানে না। তবে সকলেই বুঝে নিয়েছিল প্রায় সমস্ত টাকাই সুধীরকেই দেওয়া হয়েছে।

সেদিন উইল পড়া হবে। সুধীর এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ তার পায়ে পাম্পসু, পরনে জরিপাড় শান্তিপুরী, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি।

চেলার দল সবাই উপস্থিত। উকিল উইল পড়ে চলেছেন, 'যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বিগ্রহ মদনগোপালের সেবায় ব্যয়িত হইবে। শ্রীমান যাদব সেন তাহার সেবায়েত নিযুক্ত হইল...নগদ টাকা আর কোম্পানির কাগজ—নগেন, বিনোদ, ভজুয়া এবং রামাচলম্ সমান ভাগ পাইবে।'

সুধীর অধীর হয়ে উঠেছিল। আর থাকতে না পেরে মাঝখানেই বলে উঠল, 'আর আমি?'

উকিল বললেন, 'আপনার কথাও আছে, শুনুন।'

'...আমার প্রিয়তম শিষ্য সুধীরকুমার মহাপুরুষ। তাহাকে তুচ্ছ সম্পদের মায়ায় আবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহি না। তাহাকে আমার আশীর্বাদ আর নাম-কীর্তনের জন্যে আমার একতারাটি দিয়া যাইতেছি।'

সুধীর লাফিয়ে, চেঁচিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল: 'আমি দেখে নেব... দেখে নেব। ভন্ড, জোচ্চোর, পাজি, শুটকো বুড়ো!'

সেদিন অতি কষ্টে তিনজনে মিলে ধরাধরি করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

ব্যাঙ

ভবতোষের মেয়ের বিয়েতে নেমতন্ন ছিল। বেশ খাওয়ালে। জামাইটির সঙ্গেও আলাপ হল। খাসা ছেলে। একেবারে চোখেমুখে কথা বলে। তার মুখ থেকে তুবড়ির মতো কথা যেমনি ছোটে, সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জিনিসও ছোটে, যাতে করে খানিকটা দূরে বসেও সেদিন আমাকে প্রায় নেয়ে উঠতে হয়েছিল।

এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'বাবাজীর কী করা হয়?'

'আজ্ঞে, ব্যবসা করি।'

'কিসের ব্যবসা?'

'ব্যাঙের।'

'ব্যাঙের!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাঙ চেনেন না? ঐযে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ওরই ব্যবসা। কেমন করে জানবেন? বাঙালী ব্যবসার বোঝে কী? বম্বের ডিগলভিরাম ঝুন-

ঝুনওয়ালার নাম শুনেছেন তো। শুধু কোলা ব্যাঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে গেল। আমি অবিশ্যি তিন-চার রকমের চালাচ্ছি—কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, কটকটে ব্যাঙ, আর ভাউয়া ব্যাঙ। চীন, জাপান আর ফ্রান্সে একসঙ্গে কারবার চলছে।'

ধন্য ভবতোষের জামাই! মেয়েটার বহু জন্মের তপস্যার ফল, তাই এমন বর পেলে। যে-সে ব্যবসা নয়, ব্যাঙের ব্যবসা, তাও তিন-চার রকম।

আমার বড় ছেলে রামগতি বি. এ. পাস করে চাকরির চেষ্টায় অফিসে-অফিসে ঘুরে তিনমাসে দুজোড়া জুতোই ছিঁড়ে ফেললে। ডেকে বললাম, 'ওরে মুখ্যু, চাকরি করে কী করবি? এই ব্যাঙের ব্যবসা কর, দুদিনে লাল হয়ে যাবি।'

সে কথাটাকে আমলই দিলে না। কপালে দুঃখ থাকলে খণ্ডায় কে? ভবতোষের জামাই ঠিকই বলেছিল, বাঙালী ব্যবসার বোঝে কী? যদি বুঝত তা হলে রামগতির গতিও হতো, আর দু-জোড়া জুতোও ছিঁড়তো না।

মাস কয়েক পরে অফিস থেকে বেরোচ্ছি, ডালহৌসি স্কোয়ারে ফুটপাথের উপর দেখলাম, একটা লোক প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। সরে যেতে না যেতে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। 'স-রি (Sorry), মাপ করবেন মশাই, ভয়ানক ব্যস্ত, দেখতে পাই নি।'

আরে, এ যে আমাদের ভবতোষের জামাই! বললাম, 'বাবাজী, ভালো আছ?'

বললে, 'ভালো! এখনও ভালো থাকতে বলেন? একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে, জানেন না? একখানা জাহাজভর্তি মাল—দশ হাজার কোলা, তেরো হাজার কুনো, আর পঁচিশ হাজার তিন-শ কটকটে, সব গেছে মশাই, সব গেছে।' বলে, কপাল চাপড়াতে লাগল।

বড় দুঃখ হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে গেল?'

'জাহাজডুবি। কিন্তু আমি এমনি ছাড়ব না। ওসব কাপ্তেন বার করে দেব। তিরিশটি হাজার টাকার মামলা ঠুকে দেব। বাছাধন তখন টের পাবেন।'

ভবতোষের জামাই এই বলেই ছুটবার আয়োজন করলে। বাধা দিয়ে বললাম, এখন ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ কোথায়?'

'যাচ্ছি দেখতে। তারা সব ফিরে আসছে যে! জানেন, ব্যাঙ কী রকম দেশ-ভক্ত জীব? বিশেষ করে ঐ কুনো ব্যাঙগুলো। সব বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে গঙ্গা সাঁতরে চলে আসছে! এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। যাবেন দেখতে?'

বললাম, 'বল কী হে? গঙ্গা সাঁতরে আসচে! চলো তো দেখে আসি।'

আউটরাম ঘাটে গিয়ে একটা নৌকা করা গেল। ফোর্ট ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই দেখলাম, দূরে জলের ওপর কালো-কালো কী সব লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। ভবতোষের জামাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ, ঐ দেখুন।'

আরো কাছে এলে যা দেখলাম, সে দৃশ্য জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না দেখলাম, প্রশস্ত গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে জল আর দেখা যায় না, শুধু কুনো ব্যাঙ আর কুনো ব্যাঙ, হাজারে-হাজারে, কাতারে-কাতারে উজান ঠেলে লাফিয়ে আসছে। ধন্য দেশভক্তি! চোখে জল এসে গেল।

এদিকে নৌকার ওপর সেও এক দৃশ্য। ভবতোষের জামাই বুক ঠুকে কপাল চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে এমন লাফাতে শুরু করল যে নৌকাডুবি হয় আর কী! রীতিমতো ভয় পেলাম, বললাম, 'বাবাজী, তোমার ঐ ব্যাঙদের দেশভক্তির জোর আছে, তাই তিন-শ মাইল দূর থেকে ওরা ভেসে আসছে। কিন্তু আমি বাবা তিন হাতও যেতে পারব না, দয়া করে যদি একটু আস্তে লাফাও।'

সে আর লাফাল না, বসে-বসে কাঁদতে লাগল। বাস্তবিক বুক ফেটে যাবার কথাই বটে। ব্যাপারে তো যে-সে নয়, দশ হাজার কোলা, তেরো হাজার কুনো, আর পঁচিশ হাজার তিন-শ কটকটে।

বাড়ি ফেরার পথে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ক'দিন পরেই কাগজে পড়লাম, চীনদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, টাকায় চারটা ব্যাঙ বিক্রি হচ্ছে···ইত্যাদি। বুঝলাম, ঐ জাহাজডুবির ফল। রামগতিকে আবার ডেকে পাঠালাম। সোজাসুজি বললাম, 'এই নাও পঁচিশটা টাকা। রাতের গাড়িতেই বিক্রমপুর যেতে হবে। এই আষাঢ় মাসে খাল, বিল, নালায় নতুন জল এসেছে। বিস্তর ভাউয়া আর কোলা পাবে। এই দুর্ভিক্ষটা থাকতে থাকতে অন্তত দশ হাজার আনা চাই-ই।'

রামগতি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এনে রাখব কোথায়? মা'র কথা কী আপনি ভুলে গেছেন নাকি?'

তাই তো! ব্যাপারটা যে আমার খেয়ালই ছিল না। রামগতির মা, অর্থাৎ আমার গৃহিণী সুন্দরবনের দেশের মেয়ে। ছেলেবেলায় তিনি পোড়া কাঠ নিয়ে বাঘ তাড়াতেন, কিন্তু ব্যাঙ—দেখা দূরে থাক, নাম শুনলেই তাঁর একেবারে দাঁতকপাটি। সেবার সিঁড়ির নীচে একটা কটকটের ডাক শুনে এমন এক লাফ মেরেছিলেন যে তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

সুতরাং রামগতির ভাবনা হবার কথাই। কিন্তু ওদিকে চীনদেশের দুর্ভিক্ষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছেলেকে বললাম, 'ওসব ভয় করতে গেলে চলে না। যতটা সম্ভব চুপিচুপি চালাতে হবে। লাভটাও তো দেখছ। ঐ তো ভবতোষের জামাই বলছিল, বোম্বের কোন্ ডিগবাজিরাম ঘ্যান্ঘ্যান্ওয়ালা শুধু কোলা ব্যাঙের দৌলতে একেবারে লাল হয়ে গেছে!'

কথাটা এবার রামগতির মনে ধরল। পরদিনই সে চলে গেল এবং দিন পনেরো পরে ফিরে এল—সঙ্গে এক গোরুর গাড়ি বোঝাই প্রায় ৪০ বস্তা ভাউয়া। ভাগ্যক্রমে গিন্নী তখন তাঁর বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাতের মতো সেগুলো বাইরের ঘরেই রাখা হল। স্থির হল, কাল ভোরেই একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে হবে। আমি, রামগতি আর ভজা চাকর—এই তিনজন ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানল না।

সে রাত্রে ভবানীপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন ছিল। গিন্নী সন্ধ্যার পরই ফিরে এসেছিলেন, কাজেই বাড়িতে তিনি একাই রইলেন। আর নীচের ঘরে রইল ভজা—যদি হঠাৎ কিছু দরকার হয় এইজন্য।

অনেক লোকের নেমন্তন্ন। আমাদের যখন ডাক পড়ল, রাত তখন প্রায়

বারোটা ! পেট কী বলছে সে কথা না বললেও চলবে। দু-চারটে তরকারি খেয়ে সবে গলদা চিংড়ির মাথাটা মুখে তুলেছি, সে-বাড়ির একজন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'হৃদয়বাবু টেলিফোন করছিলেন, বাড়িতে ভয়ানক বিপদ।'

'অ্যাঁ, বলেন কী ?' গলদা চিংড়ি রইল পড়ে, দুজনেই উঠে পড়লাম। হৃদয়-বাবু আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী।

একটা ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল। বাড়ির সামনে আসতেই যা দেখলাম, বিপদ যে খুবই ভয়ানক তাতে আর সন্দেহ রইল না। দু খানা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর একখানা পুলিশভ্যান, লাল পাগড়িতে ভর্তি। এ ছাড়া লোকও জমেছে প্রায় শ-পাঁচেক। মনে হল, বুকের ভিতরটা আর নড়ছে না। কী দেখব, কপালে কী আছে কে জানে ? দরজা খোলাই ছিল। বহু কষ্টে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখলাম, নীচে কেউ নেই, সেই ব্যাঙগুলো চারি-দিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সিঁড়িতেও সেগুলো একেবারে ঠাসা। উঠতে গিয়ে দু-চারটেকে মাড়িয়েও দিলাম। শোবার ঘরের মেঝেতেও তাদেরই দৌরাত্ম্য। কিন্তু গিন্নী কই ? রামগতি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। তিনি ছাদের ওপর থেকে সাড়া দিলেন। ছুটে গিয়ে দেখলাম, সেখানেও ব্যাঙের ভিড়, তবে অনেকটা কম। তিনি ছাদের পাশে রেলিংএর উপর উঠে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছেন। পড়ে যান নি যে সেইটেই আশ্চর্য। বললাম, 'কী ব্যাপার, ভজা কৈ ?'

তিনি একেবারে জ্বলে উঠলেন, 'এ সব কোত্থেকে এল ?'

রামগতি অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁকে নামিয়ে নীচে নিয়ে গেল। আমি ছাদে দাঁড়িয়েই হৃদয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

হৃদয়বাবু বললেন, 'রাত যখন প্রায় এগারটা, হঠাৎ আমার ছাদ থেকে একটা চিৎকার শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। বারান্দায় এসে দেখেন, একটি মহিলা রেলিং-এ উঠে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন। বারংবার জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর না পেয়ে অগত্যা ফায়ার ব্রিগেডের আড্ডায় খবর দিয়েছেন, আর লালবাজার পুলিশ-ঘাঁটিতে ফোন করে দিয়েছেন। আমাকেও ঐ সঙ্গে ফোন করেছিলেন।'

শোবার ঘরে ফিরে এসে চারদিক চেয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল। দেখলাম, লোহার সিন্দুকের ডালা খোলা, ভিতরে গহনার বাক্স নেই, টাকা-কড়ি যা ছিল তাও নেই। ভজা চাকরের খোঁজ পাওয়া গেল না। গিন্নী বললেন, তিনি দরজা খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ দুপ-দাপ শব্দ শুনে জেগে ওঠেন। অতগুলো ব্যাঙ দেখে দৌড়ে ছাদে চলে গেছেন, আর কিছু জানেন না। অর্থাৎ আমরা যখন ব্যাঙের বস্তা জড়ো করে রাতারাতি রাজা হবার স্বপ্ন দেখছি, তখন তারই গোটা কয়েক খুলে দিয়ে আমারই চাকর আমাকে একেবারে ফকির বানিয়ে রেখে গেল। তার মনিব ঠাকরুনটিকে সে ভালো করেই চিনেছিল। চুরি অনেক রকম শুনেছি, কিন্তু এ রকমটা যে হতে পারে কে ভেবেছিল ?

নীচে আসতেই দমকলের সাহেব জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, বাবু ফায়ার ?'

বললাম, 'না সাহেব, ফায়ার নয়, ফ্রগ্‌স্।'

'ড্যাম্ !' বলে, সে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। একটু পরে পুলিশের

গাড়িও গেল।'

কিন্তু লোকগুলো আর যেতে চায় না। আমার মাথা তখন একেবারেই ঠিক নেই। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, গোটা দুই বস্তা তখনও খোলা হয় নি। সেই গুলোর মুখ খুলে রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আধ-সের তিন-পো ওজনের এক-একটি ভাউয়া…মাথায় পড়তেই সবাই 'বাবাগো' বলে পথ দেখল।

তারপর ? তারপর জেনে আর কী হবে ? রামগতির নতুন জুতো এসেছে। তাই পরে দু-বেলা সে আবার অফিসে অফিসে ঘুরছে।

যমরাজার বিপদ

শশধর সান্যাল রংপুরের সরকারী উকিল। যেমন মস্ত বড় পসার, তেমনি নাম-ডাক। সদর রাস্তায় জমকালো বাড়ি। চাকর-বাকর লোকজনে গম্‌গম্‌ করছে। রোহিণী সরকারও উকিল। কিন্তু তাঁর বাড়িতে মক্কেলের বদলে পাওনাদারের ভিড়। লক্ষ্মীর বদলে শনির রাজত্ব। ইস্কুল কলেজে এঁরা একসঙ্গে পড়েছিলেন। সে বন্ধুত্ব এঁদের কিছুমাত্র বদলায় নি। দুজনের আশ্চর্য মনের মিল এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এঁদের চেহারার মিল। তফাতের মধ্যে শশধরের দাড়ি আছে, রোহিণীর নেই। তা না হলে কোন্‌টি কে বুঝবার উপায় থাকত না।

সেদিন কাছারি ফেরৎ দু'বন্ধুতে কথা হচ্ছিল। শশধর বললেন, 'না, এখানে আর ভাল লাগছে না, হাইকোর্টে যাওয়া যাক। ক. বল হে রোহিণী ?'

রোহিণী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! রংপুর আবার একটা বার (bar) ? তোমাদের মতো লোকের এখানে পড়ে থাকার কোনো মানেই হয় না।'

মাসখানেকের মধ্যেই শশধরের যাবার বন্দোবস্ত সব পাকা হয়ে গেল।

রোহিণী এসে বললেন, 'আমার একটা কথা আছে শশধর।'

শশধর বললেন, 'কী কথা ?'

রোহিণী বললেন, 'তোমার বাড়িটা আমাকে দিয়ে যেতে হবে। অবিশ্যি ভাড়া আমি দেব।'

শশধর বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সে যখন যাব…'

কলকাতা যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, শশধর জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, রোহিণী এসে হাজির।

শশধর বললেন, 'এসো হে রোহিণী, বসো।'

রোহিণী বললেন, 'না ভাই, বসব না। তোমাকে একটু আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। বড্ড জরুরি দরকার।'

শহরের শেষে মতি পরামানিকের চুল-দাড়ির দোকান। এ অঞ্চলে যাত্রায় কিংবা সখের থিয়েটারে যতকিছু চুল-দাড়ির দরকার সব আসে ঐ মতির দোকান থেকে।

রোহিণী শশধরকে নিয়ে ওখানে গিয়ে উঠলেন। শশধর অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী রোহিণী? এখানে তোমার কিসের দরকার, তা তো বুঝতে পারছি নে।'

রোহিণী কিছু বলবার আগেই দুজন ষণ্ডা মতন লোক পিছন দিক থেকে এসে শশধরবাবুর দুটো হাত চেপে ধরলে, আর একজন তাঁর দাড়িতে সপাসপ ক্ষুর চালিয়ে দিলে। ছাড়া পেয়েই শশধরবাবু লাফিয়ে উঠে লাঠি ঠুকে বললেন, 'এর মানে কী? বলি, এর মানে কী রোহিণী? আমি তোমার নামে পুলিশ কেস্ করব।'

রোহিণী নরম হয়ে বললেন, 'রাগ কোরো না ভাই, তোমার ঐ দাড়ি দিয়ে কোনো কাজই হচ্ছিল না। ওটা গিয়েছে বলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ওর থেকে আমার একটা মস্ত বড় উপকার হবে।

এমন সময়ে মতি সেই দাড়ি দিয়ে একটা চাপ দাড়ি তৈরি করে রোহিণীর মুখে পরিয়ে দিলে।

শশধর অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, তিনিই রোহিণী সরকার, আর ঐ দাড়ি-চোর লোকটাই হচ্ছে শশধর সান্যাল।

শশধর চলে গেলেন হাইকোর্টে। তাঁর বাড়ি আর দাড়ি নিয়ে রইলেন রোহিণী সরকার। বাইরের লোক ব্যাপারটা বুঝল না। শশধরের যত মক্কেল তেমনি দল বেঁধে আসতে লাগল রোহিণীর কাছে। দেখতে দেখতে তাঁর পসার জমে উঠল। টাকা আসতে লাগল হুড়মুড় করে। যারা ব্যাপারটা জানত তারাই শুধু বলাবলি করলে, 'দেখলে হে, একেই বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। এই রোহিণীটা খেতে পেত না। দাড়ি চুরি করে বড়লোক হয়ে গেল।'

কিন্তু এসব কথা রোহিণীর কানে পেঁছিল না। দেশবিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

এমনি করেই কয়েক বছর কেটে যায়। তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

জজসাহেবের এজলাসে এক লোমহর্ষণ খুনী মামলার বিচার হচ্ছে। এক-দিকে আছেন রোহিণী, আর একদিকে বাছা-বাছা সাতজন উকিল। ক্রমাগত দুদিন ধরে একজন সাক্ষীর জেরা হয়েছে। আজ তৃতীয় দিন। রোহিণী হুঙ্কার ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুনের খবর যখন আপনার কানে এল, তখন আপনার কান দুটো কোন্‌দিকে ছিল—উত্তর না দক্ষিণ?'

সাক্ষী কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'আজ্ঞে পশ্চিম দিকে।'

রোহিণী গর্জে উঠলেন, 'ঠিক করে বলুন। আপনার—'

ব্যস্, গর্জন থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীর দেহটা প্রথমে চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চারদিকে ভীষণ হৈ-চৈ লেগে গেল। জজ এবং জুরিরা ছুটে এলেন। সবাই মিলে তাঁকে তুলে নিয়ে একটা বড় টেবিলে শুইয়ে দিলেন। পাখা এল, জল এল এবং শেষটায় ডাক্তার এসে বললেন, 'হার্টফেল।'

অতবড় উকিল! তৎক্ষণাৎ সমস্ত কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল এবং উকিলদের লাই-ব্রেরীতে শোকসভার আয়োজন চলল।

হঠাৎ মৃত্যু। কাজেই দেহটা যখন পড়ে রইল জজসাহেবের কাছারিতে, যম-রাজার কাছারি থেকে তলব হল প্রেতাত্মার। দুদিকে দুই ভয়ঙ্কর যমদূত। অন্তহীন মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে বায়ুবেগে রোহিণী ছুটে চলেছেন। মাথার উপর আলোকময় নক্ষত্রলোক, পায়ের তলায় মেঘমালায় ঢাকা মাটির ধরণী। তারই কথা মনে পড়ছে বার-বার, চোখ ছাপিয়ে উঠছে জলধারা। হায়, এত শীঘ্র তাঁর বাঁধন কাটল! শেষ সময়ে আপনজনের একটি কথাও কানে পৌঁছল না, একটি ফোঁটা চোখের জলও কপালে এসে পড়ল না।

হঠাৎ একটি ভয়ানক শব্দ কানে যেতেই রোহিণী চমকে উঠে দেখলেন, এক প্রকাণ্ড বিচার-সভায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক সামনেই সোনার সিংহাসনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যমরাজ, হাতে বিশাল দণ্ড। তাঁর কণ্ঠ থেকে আষাঢ়ের মেঘ গর্জে উঠল, 'চিত্রগুপ্ত, এ ব্যক্তির পাপতালিকা দাখিল কর।'

পাহাড়ের মতো উঁচু একটা প্রকাণ্ড খাতার পাশে বসে এক বৃদ্ধ। রোহিণীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার নাম কী শশধর সান্যাল?'

রোহিণী হাতজোড় করে বললেন, 'আজ্ঞে না। আমার নাম রোহিণী সরকার।'

চিত্রগুপ্তের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘনঘন সেই বিশাল খাতাটার পাতা উল্‌টে যেতে লাগলেন। যমরাজ গম্ভীর। সমস্ত সভাটা থমথম্ করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে চিত্রগুপ্ত মুখ তুলে বললেন, 'ধর্মরাজ, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আমরা যাকে চাই, তার নাম শশধর সান্যাল। এর মৃত্যুকাল এখনও উপস্থিত হয় নি।'

যমদূতদের ডাক পড়ল। তারা এসে জানাল, 'বাড়ি আর দাড়ি দেখে একেই তারা শশধর মনে করেছিল, তাদের কোনো দোষ নেই।'

যমরাজ গম্ভীর মুখে হুকুম দিলেন, 'অবিলম্বে ইহাকে স্বস্থানে লইয়া যাও।'

রোহিণী উকিল মানুষ। অত সহজে ব্যাপারটা ছাড়তে রাজী নন। জোড় হাত করে বললেন, 'ধর্মাবতার, আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

'নিবেদন কর।'

'আমি বিখ্যাত উকিল, জরুরি মোকদ্দমার দায়িত্ব আমার হাতে ছিল। অকারণে তাতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এবং আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হয়েছে। তার দরুন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার আজ্ঞা হোক।'

যমরাজ বিপদে পড়ে বললেন, 'বৎস, তোমার বাক্যে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।'

'বর! বর তো আমি চাই না। আমি চাই ক্ষতিপূরণ।'

চিত্রগুপ্ত বুঝিয়ে দিলেন, 'এটা তোমার জজসাহেবের আদালত নয়, এটা যমালয়। এখানে দুটো জিনিস আছে, বর আর শাপ। প্রথমটা যদি না চাও, দ্বিতীয়টার জন্যে প্রস্তুত হও।'

রোহিণী ভয় পেয়ে গেলেন। হঠাৎ কোনো বরও মনে আসতে চায় না। আর-একবার তাড়া খেয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমার মৃত্যু-দিনটা দয়া করে

জানিয়ে দিন।'

যমরাজের হুকুমে চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে জানিয়ে দিলেন, 'চার বছর পরে মাঘী পূর্ণিমার রাতে তোমার মৃত্যু হবে।'

এদিকে জজের এজলাসে সমস্ত সহর ভেঙে পড়েছে। বিরাট প্রসেশন হবে। রোহিণীর দেহটা শ্মশানে নেবার জন্যে সবে তুলতে যাবে এমন সময় তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলাম? আপনার কান কোন্‌দিকে ছিল?'

রোহিণীর দিন তেমনি চলছে। পসার আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। ফাঁসীর হুকুম হবার পরে খুনী আসামী যেমন রাতারাতি শুকিয়ে যেতে থাকে, রোহিণীও তেমনি শুকোতে লাগলেন। চার বছর পরের সেই ভয়ঙ্কর মাঘীপূর্ণিমাটা তাঁর রক্ত শুষে নিতে লাগল।

রংপুর সহরের একধারে একজন বুড়ো পাদরি সাহেব থাকত। রোহিণী সেই পাদরির কাছে যাতায়াত করতে শুরু করলেন। সাহেব রোহিণীকে সান্ত্বনা দেয়, যীশুখৃষ্টের উপদেশ শোনায়। একটা আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কটা আঙুল আছে?'

রোহিণী বললেন, 'একটা।'

'সেই মটো ঈশ্বরও এক।'

সেদিন দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলছিল, কোন্ ধর্ম বড়—হিন্দু ধর্ম না খৃষ্টান ধর্ম। সাহেব বলল, 'টুমি অংক জানো?'

রোহিণী বললেন, 'কিছু-কিছু জানি।'

ঘরে একটা ব্ল্যাকবোর্ড ছিল। সাহেব তাতে লিখলেঃ

$$\frac{\text{যীশুকৃষ্ট}}{\text{কৃষ্ট}}\text{।}$$

তারপর রোহিণীকে ডেকে সাহেব বললে, 'ডেখো, **Simple cross multiplication.** টোমাডের অবটার কৃষ্ট, আমাডের অবটার যীশুকৃষ্ট। কৃষ্টে কৃষ্টে কাটা গেল, যীশু ঠাকিল। অটএব যীশু বড় আছে।'

রোহিণী সরকার পাদরির কাছে দীক্ষা নিয়ে খৃষ্টান হয়ে গেলেন।

তারপর দেখতে দেখতে চার বছর যায়! সেই মাঘীপূর্ণিমা এসে পড়ল। রোহিণী অসুখে পড়লেন। বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, 'আমার জন্যে ডাক্তার ডেকে পয়সা নষ্ট কোরো না। আমি বাঁচব না। একটা কাজ করো। আমি মারা গেলে আমার দেহটা একদিন একরাত রেখে দিও! কেউ যেন ছোঁয় না।'

মাঘীপূর্ণিমার রাতে রোহিণীর মৃত্যু হল। আবার সেই একনম্বর যমদূত বললে, 'ব্যাটা উকিল, সেবার আমাদের বড্ড ভুগিয়েছিলে। এবার চল না, দেখবে মজা। বাড়ি আর দাড়ি দেখিয়ে যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

দু'নম্বর বললে, 'যা বলেছিস ভাই। চিত্রগুপ্ত ঠাকুর বলে-কয়ে না রাখলে

তো চাকরিটাই গিয়েছিল আর কী!'

রোহিণী কোনো কথার উত্তর দিলেন না। সেই মেঘলোকের মধ্য দিয়ে তাঁকে যমরাজের বিচারশালায় হাজির করা হল। চিত্রগুপ্ত হাঁক দিলেন, 'তোমার নাম রোহিণী সরকার?'

'হ্যাঁ। ষ্টিফেন রোহিণী সরকার।'

যমরাজের কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'আমার আদেশে তিন সহস্র যুগ ধরে...'

রোহিণী চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার একটা কথা...একটা নিবেদন শ্রবণ করুন, ধর্মাবতার।'

যমরাজ রক্তচক্ষু মেলে বললেন, 'ব্যক্ত কর।'

রোহিণী হাতজোড় করে বললেন, 'ধর্মরাজ নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আমি বর্তমানে হিন্দু নই, খৃষ্টান। হুজুর হিন্দুর দেবতা। সুতরাং আমার উপর অত্র আদালতের **jurisdiction**, অর্থাৎ যাকে বলে কোনো হাত নেই। এ অধম ধর্মরাজার এলাকার বাইরে। অতএব এ অধীনকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হোক।'

রোহিণীর বক্তৃতা শুনে যমরাজার প্রকাণ্ড মাথাটা ঘুরে গেল। রক্তচক্ষুর ভিতরটা একদম সাদা হয়ে উঠল। পাশে চেয়ে দেখলেন, চিত্রগুপ্তের মাথাটাও একদম ঝুঁকে পড়েছে, আর তিনি ক্রমাগত সেই মহাবিশাল পুঁথিটার পাতা উল্টে চলেছেন।

চিত্রগুপ্তের পাকা মাথায় এ প্রশ্নের কোনো উত্তর জুটল না। রোহিণীকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি আবার বেঁচে উঠেছেন। এদিকে যমরাজ ক্রমাগত দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে দূত পাঠাচ্ছেন, কিন্তু সেখানেও কোনো মীমাংসা হয় নি। রোহিণীকে নিয়ে ধর্মরাজ বড়ই বিপদে পড়েছেন।

[অংশবিশেষ কোনো জার্মান গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।]

কেটা

ডাক্তারি করি। সাধারণ ডাক্তার নয়, সরকারী ডাক্তার; অর্থাৎ চিকিৎসা যা করি, তার চেয়ে অনেক বেশী করি চাকরি। আজ চাটগাঁয় পাহাড়তলীতে বসে কালাজ্বর তাড়াচ্ছি, কাল হয়তো খবর এল, জলপাইগুড়ির টেরাইতে গিয়ে ম্যালেরিয়া ঠ্যাঙাও। এমনি করে রোগজীর্ণা বঙ্গমাতার রোগের ঘাঁটি প্রায় সবগুলোই ঘোরা হয়ে গেছে।

তখন আশ্বিনের মাঝামাঝি। শরতের নীলাকাশ জুড়ে রোদ আর ধরে না। চেয়ে চেয়ে মনটা কেমন হালকা হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা মনে হয় ভারী। থার্মোমিটারটা বগলে লাগাব কিনা ভাবছি, এমন সময় এল এক টেলিগ্রাম। পড়ে দেখি বদলির হুকুম। রাণাঘাটের রেল থেকে দার্জিলিঙের জেল। দার্জিলিং। মনটা যেন নেচে উঠল। এতদিন পরে কপাল ফিরল।

শিলিগুড়ি পৌঁছতেই একগাদা মোটরওয়ালা চেপে ধরলে। সবারই মুখে

এক কথা, 'বহুৎ জলদি পৌঁছ যায়গা।'

আমি বললাম, 'জলদিই যদি পৌঁছব, তবে দেখব কি?'

আসল কথা, মোটর হচ্ছে অতি পুরনো জিনিষ। কিন্তু ঐ যে ছোট ছোট পালকীর মতো খেলাঘরের রেল, ওটা একেবারে নতুন জিনিষ। দেখলেই মনে হয় চড়ে বসি। ওতেই উঠলাম। গাড়ি চলল নিবিড়-ছায়া-ঢাকা হিমালয়ের বনপথ বেয়ে, এঁকেবেঁকে উপরে উঠে, নীচে নেমে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে তিনধরিয়া ছাড়াতেই চোখে পড়ে ডাইনে, বাঁয়ে, সুমুখে, পিছনে সহস্রশীর্ষ হিমালয়ের গভীর উপত্যকা, শ্যামলে শ্যামল, কোথাও এতটুকু রুক্ষতা নেই। যে মেঘ ভেসে যায় আকাশে, তাকে দেখলাম পায়ের নীচে বনঝোপের মাথায়। দেখলাম বাতাসিয়া লুপ, যেখানে গার্ডের গাড়ি আর এঞ্জিনে প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি! ইষ্টিশনের নামগুলো, তাতেও যেন পাহাড়ী-সুরের মায়া…'রংটং, কার্সিয়াং' টুং, ঘুম, দার্জিলিং।'

যার জায়গায় যাচ্ছি, সেই ডাক্তারবাবুটি একেবারে তৈরী হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'এই যে এসেছেন। আমি ক্রমাগত দিন গুনছি।'

আশ্চর্য লাগল। দার্জিলিঙে বসেও কেউ দিন গোণে? বললাম, 'আপনার এখানটা ভালো লাগে নি?'

'আরে রামো, দায়ে না পড়লে এদেশে মানুষ থাকে? এই দেখুন না, সব দাঁতগুলো রেখে যাচ্ছি, আর নিয়ে যাচ্ছি বাত।' বলে, তিনি হাঁ করে দাতের ফাঁকগুলো দেখিয়ে দিলেন।

তারপর আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে বললেন, 'এই দেখুন আপনার বাসা, আর এই জিনিসগুলো বুঝে নিন। সরকারী জিনিস, ভালো করে মিলিয়ে নিন। আবার যেন চিঠি লিখে বসবেন না, এটা পাই নি, ওটা পাই নি।' বলে, একটা লিস্ট আমার হাতে দিলেন।

আমি জিনিসগুলো মিলিয়ে নিলাম এবং তাঁর কথামত প্রত্যেক জিনিসের গায়ে ঢ্যারা দিলাম—একটা শিল, আধখানা নোড়া, একটা তিন পা-ওয়ালা চেয়ার, গোটা দুই বালতি, একটা জলের ড্রাম (তাতে চাল থাকে), একখানা পিঁড়ি (একদিকে নীচু, আর একদিকে উঁচু), একটা ভাঙা টিনে খানিকটা ফিনাইল ইত্যাদি। আমি বুঝে নিয়ে সই দিলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর একটা জিনিষ আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি যখন একা এসেছেন, কাজে লাগবে।' বলেই হঠাৎ বাড়ি ফাটিয়ে হাঁক দিলেন, 'কেটা, এই কেটা, আ আ আ!'

কেউ সাড়া দিলে না।

তিনি তখন রান্নাঘরে গিয়ে একটা ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। বছর পনেরো বয়সের একটা পাহাড়ী ছেলে। ঠোঁট দুটো অতিরিক্ত সিগারেট টেনে টেনে কালো, চোখ দুটো লাল, পরনে ফর্সা বেনিয়ান, আর ভীষণ ময়লা সুরুয়াল (পায়জামা)। তার চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে অনেক দিন সে জলের মুখ দেখে নি।

আমি বললাম, 'এটিও সরকারী নাকি ? কিন্তু লিস্টে তো পেলাম না।'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে না, এটি আপনার প্রাইভেট, চমৎকার Combined hand···একাধারে ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, বেয়ারা। সব করবে··· জুতো ঝাড়া থেকে ভাত রাঁধা। খুব কাজের লোক, তবে ঘুমটা একটু বেশী।'

বললাম, 'তোর নাম কি রে ?'

কেটা গম্ভীরভাবে বললে, 'ব্যম্ বাহাদুর গুড়ুম।'

অর্থাৎ কেটা মানে কেউকেটা নয়, রীতিমতো ব্যম্ বাহাদুর গুড়ুম। শুনে ভয় হল। কেননা, দিনের মধ্যে বার পাঁচেক ব্যম্ বাহাদুর আওড়ালে মাস খানেকেই দম ফুরোবার সম্ভাবনা। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিলেন, 'ওসব ছেড়ে দিন, ওর নাম কেটা, এদেশে সব ব্যাটাই কেটা।'

ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন। কেটা খুবই কাজের লোক। শুধু একজন লোক চাই তাকে জাগিয়ে রাখতে। ডাক্তারবাবু সেটা নিজেই করতেন। তাঁর বাঁজখাই গলার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর বাড়িতে আর যাই থাক ঘুম যে থাকতে পেত না একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মুসকিল হল আমার। হয়তো জল-তেষ্টা পেয়েছে, বললাম, 'কেটা এক গেলাস জল দে তো।'

কেটা অমনি গেলাস হাতে ছুটল। আর দেখা নেই। মিনিট পনেরো পরে গিয়ে দেখি, ডান হাতে গেলাস, বাঁ-হাত কুঁজোর গায়ে, কেটা ঘুমুচ্ছে।

সকাল ন'টায় বললাম, 'কেটা, এক সের মাংস লে আও।'

কেটা চলে গেল। যখন সে ফিরল, তখন বেলা দুটো। কি ব্যাপার ? রাস্তায় চলতে চলতে ঘুম পেয়ে গেল। পড়ে গেল সেইখানেই, পুলিশ এসে ডেকে দিয়েছে। সকাল নেই, দুপুর নেই, পাইখানার সিঁড়িতে, বাথরুমে, কয়লার গাদায়, উনুনের ধারে, কেটার নাক ক্রমাগত ডেকে চলেছে, কিন্তু তোমার ডাক তার কানে পৌঁছবে না। অনিদ্রা রোগের চিকিৎসা অনেক করেছি, এবার এই অতিনিদ্রা রোগ নিয়ে পড়লাম। খুব কড়া চা খেতে দিলাম। ফল হল উলটো। আগে কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচালে উঠত, এখন টেনে না তুললে ওঠে না। তখন ব্যবস্থা হল ঠাণ্ডা সরবৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ফল। সরবৎ কি খেতে চায়, জন-দুই কয়েদী চেপে ধরে তিন বেলা সরবৎ খাওয়ায়। মাসখানেক পরে ঘুমটা একটু কমে এল।

তোমরা মনে যাই কর, আমি একটু সাহেবী ধরনের লোক। চাকরদের নাম ধরে হাঁক-ডাক আমি পছন্দ করি নে। আমার পকেটে সব সময়ে একটা 'কলিং বেল' থাকে, যখন দরকার হয় বাজিয়ে দিই। এখানেও সেই নিয়ম চালাতে শুরু করলাম। সেদিন কয়েকজন হোমরা-চোমরা বন্ধু এসেছেন। চা চাই। কলিং বেল টিপে দিলাম। একবার, দু'বার, তিনবার, কোনো সাড়া শব্দ নেই। অগত্যা গলা ছাড়তে হল। তাতেও জবাব নেই। উঠলাম। গিয়ে দেখি, উনুনের উপর আলুর দম পুড়ে কয়লার দম হয়ে গেছে। কাছে শুয়ে ব্যম্ বাহাদুরের নাসিকা-গর্জনে রান্নাঘর গম্-গম্ করছে। টেনে তুলে বললাম, 'চা লে আও, চার-কাপ··· জলদি।'

কেটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'লে (অর্থাৎ আচ্ছা)।'

মিনিট দশেক পরে বসবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হল। ব্যম্ বাহাদুর। মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে জানালে, 'চিয়া ছৈনা (চা নেই)।'

সর্বনাশ! সে-কথা এখানে এসে না জানালেই হত না? তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জেলারবাবুর বাড়ি থেকে চা আনানো গেল। আবার মিনিট দশেক। দরজা ফাঁক, কেটার মুখ। বললাম, 'কি রে?'

জবাব এল, 'চিনি ছৈনা।'

সেটাও আনানো গেল। আশা করছি এবার চা আসবে। পাঁচ মিনিট পরে দরজা সবটা খুলে গেল। এবার কেটার শুধু মুখ নয়, সর্বশরীর প্রকাশিত হল। বললাম, 'কি হল রে?'

'দুধ ছৈনা।'

বন্ধুরা বললেন, 'থাক, থাক, আপনার বড্ড কষ্ট হল। চা আমার বাড়ি গিয়েই খাব।'

জেলারবাবু এলেন। সিগারেট কেসটা আনবার জন্য কলিং বেল ঠুকছি, তিনি বললেন, 'কেন মিছে যন্তরটা ভাঙছেন। কলিং বেল তো দূরের কথা, কলিং ঢাক পিটলেও ওর ঘুম ভাঙবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন, একটা লম্বা দড়ি রাখুন। তার একদিক থাকবে আপনার হাতে, আর একটা দিক ওর টিকিতে বাঁধা। দরকার হলেই এক টান। এ ছাড়া আর পথ নেই।'

সেদিন অফিসে বড্ড কাজের ভিড়। বিকেলে সকাল-সকাল বেরোতে হল। বেশ শীত পড়েছিল। কেটাকে ডেকে বললাম, 'ঠিক চারটেয় উনুনে আগুন দিয়ে লুচি-মাংস করে রাখবি।'

কেটা বলল, 'ল।'

ফিরতে রাত সাড়ে আটটা হয়ে গেল। ক্ষিদে যা পেয়েছিল, মনে হল পেটের ভিতর একটি নাড়ীও বাকি নেই, সব হজম হয়ে গেছে। কিন্তু একি! চারদিক অন্ধকার। কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। কেটা পালাল? রান্নাঘরটা খাঁ-খাঁ করছে। হায়রে লুচি-মাংস! ছেলেমানুষের মতো দু'চোখ জলে ভরে গেল।

বসবার ঘরে একটি চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। বসে ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে দেখলাম, ঘরের কোণে একটা কম্বলের পুঁটলি পড়ে আছে। ওটা তো ওখানে আগে দেখি নি। কাছে গিয়ে খোঁচা মারতেই সেটা নড়ে উঠলো এবং তার পরেই শ্রীমান ব্যম্ বাহাদুর মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চার বাজ্ গিয়া?'

পেটের আগুন চড়ে গেল মাথায়। ইচ্ছে হল, এখুনি ওর মাথার উপর জুতো দিয়ে চার বাজিয়ে দিই। কোনো রকমে নিজেকে সামলে বললাম, 'চুলামে আগুন লাগাও।'

কেটা ছুটে গেল এবং মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে জানাল, 'কয়লা ছৈনা।'

'স্টোভ জ্বালাও।'

'ইস্পিরিট ছৈনা।'

ইস্পিরিট হৈনা! কাল একটা পুরো বোতল আনা হয়েছে! ধমক দিয়ে বললাম, 'কি করেছিস্ স্পিরিট? খেয়েছিস্?'

কেটা খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'জু।'

শুনে মাথা ঘুরে গেল। একদিনে এক বোতল মিথিলেটেড্ স্পিরিট কেউ খেয়ে ফেলতে পারে, কে বিশ্বাস করবে? মানুষের সবই সহ্য করবার একটা সীমা আছে। সেটা পেরিয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'নিকাল যাও উল্লুখ, অভি নিকাল যাও।'

কেটা কোনো কথা না বলে কাপড়খানা নিয়ে জুতো জোড়া পরে বেরিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে আবার বদলির হুকুম। মেদিনীপুরে কলেরা ক্যাম্প। আকাশ থেকে পড়লাম। তারপর মনে হল, বেশ হয়েছে। কেটা ব্যাটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ওকে ডেকে পাঠিয়ে মাইনে চুকিয়ে দিলাম এবং সেই সঙ্গে আর একটা টাকা বখশিস্ দিয়ে বললাম, 'আমার মালগুলো দেখেশুনে বাসে তুলে দিস।'

ঠিক হল, জিনিসপত্তর নিয়ে একটা বাস রিজার্ভ করে শিলিগুড়ি যাব।

শিলিগুড়িতে পেঁৗছে মাল গুণে নিচ্ছি। তেরটা হবার কথা, হচ্ছে চৌদ্দটা। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে, বেশী কি করে হল? দুজন কুলি মাল নামাচ্ছে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা কুলি 'রামা হো' বলে এক হাঁক দিয়েই কলা-পাতার মতো কাঁপতে লাগল।

'কী কী কীরে?'

'ঐঠো হেলতা হ্যায়, বাবুজী!'

'কোন্ঠো রে?'

'ঐ কম্বল।' বলে, সে কেঁদে ফেলে আর কি!

আমি গিয়ে এক ঠেলা দিতেই বেরিয়ে এলেন আমার মূর্তিমান্ ব্যম্ বাহাদুর। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেটা চারদিক দেখে একেবারে অবাক। সে মোটেই ইচ্ছে করে আসে নি। মাল তুলে দিতে এসে ঘুম পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কম্বল মুড়ি, তার পরেই শিলিগুড়ি। দার্জিলিং ছাড়লে কি হয়, কেটার হাত থেকে আমার ছাড়া নেই।

রাম-বিভ্রাট

ত্রিলোচন তেওয়ারী রামজীর ভক্ত। প্রথম নাতি হতেই তার নাম দিলেন রামচন্দ্র। তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। উইল করে গেলেন, তাঁর বংশে যত ছেলে হবে, তাদের নামের প্রথম দিকটা হবে 'রাম' আর শেষটা কোনো দেবতার নাম।

বছর দুই না যেতেই রামচন্দ্রের একটি ভাই জন্মাল। তার নাম হল

রামশশী। তারপর তেওয়ারীদের ঘরে যেন ছেলের বান ডাকল—রামহরি, রামকৃষ্ণ, রামগোপাল, রামশঙ্কর।

ছেলেদের বাপ মহাদেব তেওয়ারী মহাবিপদে পড়লেন। নাম যে আর পাওয়া যায় না। অথচ ছেলেরও বিরাম নেই। একটা মেয়েও কি হতে নেই? ক্রমে মহাদেব একেবারে ভেঙে পড়লেন। মনে সুখ নেই, মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই। এদিকে শেষের ছেলেটির বয়স ছ'মাস হয়ে গেল, নাম তো একটা রাখতেই হবে। মহাদেব পুঁথিপত্তর নিয়ে বসে গেলেন নাম খুঁজতে। রামবরুণ, রামবায়ু, রামব্রহ্মা, রামযম—দূর ছাই, একি আর নাম হল? হতাশ হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে নমস্কার করলেন, 'রাম রাম, মহাদেববাবু!'

মহাদেব একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'রাম রাম, রাম রাম—পেয়েছি। ওঃ বাঁচালেন আপনি। আর একটু হলে তো পাগলই হয়ে যেতাম।'

ছেলের নাম রাখা হল 'রাম রাম'।

মহাদেব গিন্নীকে শাসিয়ে দিলেন, 'সাবধান, এবার যদি ছেলে হয়, সে হতভাগার আর নাম জুটবে না, তা বলে দিচ্ছি।'

গিন্নী দিনরাত দেবতাদের ডাকতে লাগলেন, কালীঘাটে পুজো মানত করলেন—হে মা কালী, এবার একটা মেয়ে দিও। কিন্তু কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? রামজীর দয়ায় এবারও হল ছেলে। রামশঙ্কর ছুটতে ছুটতে বাবাকে খবর দিতে গেল। মহাদেব তার মুখে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। তারপর একটা জামা আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেরা এসে পথ আগলে দাঁড়াল, কেঁদে কেটে বলল, 'কোথায় যাও বাবা?'

মহাদেব তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

ক্রোশ দুয়েক দূরে এক সাধু থাকতেন। মস্তবড় জ্যোতিষী। ক'টা ছেলেমেয়ে, মাথায় ক'গাছা চুল, পরীক্ষায় ক'বার ফেল করবে, সব হাত দেখে টপাটপ বলে দেন। মহাদেব সোজা এসে একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সাধুজী, আমার…'

সাধুজী বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু, তোমায় কিছু বলতে হবে না, কেন এসেছ আমিই বলে দিচ্ছি। একটা ফুলের নাম কর—'

মহাদেব বললেন, 'গোলাপ ফুল।'

সাধু চোখ বুজে ধ্যান করলেন, তারপর বললেন, 'তোমার খুব বিপদ যাচ্ছে।'

'বিপদ বলে বিপদ!' মহাদেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাই তো প্রভুর শরণ নিতে আসা। এবারটি উদ্ধার না করলে যে আর রক্ষা নেই। সাধু মহারাজের সেবার জন্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব সবই করব।' এই বলে মহাদেব নিবেদন করলেন, 'একটি নাম বলে দিতে হবে, যার প্রথমটা থাকবে রাম, আর শেষের দিকটা দেবতার নাম।'

সাধু বলে যেতে লাগলেন, 'রামশঙ্কর, রামকৃষ্ণ, রামগোপাল—'

মহাদেব জানালেন, ও সবগুলোই রয়েছে, নতুন নাম চাই। তারপর জ্যোতিষীর গণনা শুরু হল। ঘরের সমস্ত মেঝেটা জুড়ে খড়ি দিয়ে আঁক কাটা কাটা হল। মহাদেব তেমনি বসে রইলেন। শেষটায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে সাধুজী মুখ তুলে বললেন, 'রামসিংহ।'

'রামসিংহ!' মহাদেব মাথা চুলকে বললেন, 'কিন্তু প্রভু, সিংহ তো কোনো দেবতার নাম নয়।'

সাধুজী গর্জে উঠলেন, 'তুমি মূর্খ, তাই তর্ক করছ। সিংহ যে পশুরাজ একথা তো জানো।'

'জানি প্রভু।'

'শাস্ত্র বলে, রাজা দেবতা, এটা তো অজানা নেই!'

'না মহারাজ।'

'সুতরাং সিংহও দেবতা।'

মহাদেব বাড়ি এসে ছোট ছেলের নাম জানিয়ে দিলেন, কিন্তু মনে হল, এটা কারুর পছন্দ হল না।

ক্রমে ছেলেরা বড় হল এবং সবাই পাঠশালায় যেতে শুরু করল। গণেশ পণ্ডিত এদের নাম নিয়ে বড়ই মুসকিলে পড়লেন। কারণ, এতগুলো রাম তাঁর কিছুতেই মনে থাকে না। তখন তিনি নামগুলো দিয়ে একটা ছড়া তৈরী করলেন—

রামচন্দ্র রামশশী রামশঙ্কর রামরাম।
রামকৃষ্ণ রামহরি রামগোপাল রামসিং॥

ছড়া মুখস্থ চলল। পাশার আড্ডায় গণেশ পণ্ডিতকে আর দেখা যায় না। রোজ সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের আলো জেবলে দুলে দুলে শুরু করেন, 'রামচন্দ্র রামশশী'— ঘামে যখন গা ভিজে যায়, এরারুট মেখে আবার লেগে যান। এমনি করে নাম তো মুখস্থ হল, কিন্তু গোল মিটল না। কোন্ নামটা কার, এ সমস্যা রয়ে গেল। তার ফল হল এই যে, রামকৃষ্ণ দোষ করলে রামশঙ্কর মার খায়, আর রামগোপালকে আদর করতে গিয়ে রামরামের পিঠে চাপড়ে দেন। রামকৃষ্ণ ছেলেটা বেজায় দুষ্টু, পড়াশুনার ধার দিয়েও যায় না। রামশঙ্কর আবার তেমনি ভালো-মানুষ, মন দিয়ে পড়াশুনা করে। পণ্ডিত মশায় বাড়িতে আঁক কষতে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ একটাও করতে পারে নি, রামশঙ্কর সবগুলোই করেছে। খাতাগুলো সবই পণ্ডিত মশায়ের টেবিলের উপর জড় করা রয়েছে।

পণ্ডিত মশায় একটা খাতা তুলে নিয়ে হাঁকলেন, 'রামশঙ্কর!'

রামশঙ্কর কাছে এল।

'বেঞ্চির ওপর দাঁড়াও। একটা আঁকও হয় নি, না?'

'না স্যার, আমি তো সবগুলোই করেছি।'

'বটে, আমার সঙ্গে চালাকি! নাড়ুগোপাল হও, হও নাড়ুগোপাল।'

বেচারি রামশঙ্কর নাড়ুগোপাল হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর এল রামকৃষ্ণের

পালা। তকে ডেকে নিয়ে পণ্ডিত মশায় তার পিঠ চাপড়ে আদর করলেন, আর বললেন, তার আজ এক ঘণ্টা আগে ছুটি। সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু একথা কেউ জানল না যে, পণ্ডিত মশায় যখন তার রোজকার দিবা-নিদ্রাটুকু সেরে নেবার জন্যে টেবিলে পা তুলে, চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এক ফাঁকে তার নিজের খাতার নাম কেটে রামশঙ্করের নাম আর রামশঙ্করের খাতায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়ে এসেছিল।

ঘোষেদের গাছে ভালো লিচু হয়েছে। রামকৃষ্ণ একদিন সব সাবাড় করে এল। নিতাই ঘোষ এসে নালিশ করলে মহাদেবের কাছে। মহাদেব বললেন, 'কে খেয়েছে লিচু?'

'কে আর খাবে? আপনার ঐ রামরাম।'

মহাদেব বললেন, 'কিন্তু রামরাম তো নেহাৎ ছোট, সে গাছে উঠতে জানে না।'

মহাদেবের কথা শুনে নিতাই বিরক্ত হয়ে বললে, 'তা হলে ঐ রামচন্দ্র খেয়েছে।'

'রামচন্দ্র! সে তো আজ তিনদিন হল মামারবাড়ি গেছে।'

নিতাই রেগে বেরিয়ে গেল। চোর ধরা পড়ল না।

এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তারপর একদিন এক ভীষণ গোলমাল হয়ে গেল। সেই কথাই বলব।

মহাদেবের স্ত্রী এবার বুড়ো হতে চলেছেন। রান্না-বান্না, সংসারের এত কাজ আর পেরে ওঠেন না। একদিন কর্তাকে বললেন, দেখ, আমাদের রামচন্দ্র তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সতের-আঠার বছরের হল। এবার একটা বৌ এনে দাও।'

কর্তা দেখলেন, কথাটা ঠিকই। তারপর কনে দেখা চলল। ক্রোশ দশেক দূরে মধুপুরের বৃন্দাবন মিশ্রের মেয়েটি বেশ পছন্দমত। বয়স সবে বারো। এরই মধ্যে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে, আর কাজ-কর্মে সে হীরার ধার। ঐ মেয়েই চাই। তেওয়ারী গিয়ে মেয়ে পছন্দ করে এলেন। বৃন্দাবনও কথা দিলেন, একদিন ছেলে দেখতে আসবেন। ছেলের নামটি জেনে নিলেন রামচন্দ্র—।

দিন চারেক পরের কথা। রবিবার, ইস্কুল ছিল না। তেওয়ারী কোথায় বেরিয়েছিলেন, বৃন্দাবন এসে হাঁক দিলেন, 'রাম বাড়িতে আছ? রাম!'

ডাক শুনে একসঙ্গে আট ছেলে বেরিয়ে এল।

বৃন্দাবন বললেন, 'রাম বাড়ি আছে?'

আট ছেলে একসঙ্গে বললে, 'কি বলুন, আমি রাম।'

'মানে! তোমরা তো ভারি জ্যাঠা ছেলে দেখছি। সবাই রাম! ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পেলে না?'

আট ছেলে মিলে বোঝাতে গেল, তারা ইয়ার্কি দিচ্ছে না, সত্যিই তারা সকলেই রাম। ফল হল উলটো। বৃন্দাবন মিশ্র রেগে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞা করে গেলেন, মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেবেন, সেওভি আচ্ছা,

তবু এমন বাড়িতে কখনও বিয়ে দেবেন না।

চৈত্রমাস, বেলা দুপুর হয়ে গেছে। রোদ তো নয়, যেন আগুনের হল্‌কা। মহাদেব বাড়ি ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন, একজন লোক হন্‌হন্‌ করে চলে যাচ্ছে। একি! এ যে বৃন্দাবন। এগিয়ে গিয়ে সংবর্দ্ধনা করে বললেন, 'বেয়াই যে! আসুন, আসুন, কখন এলেন?'

বৃন্দাবন আগুন হয়েই ছিলেন, ছিট্‌কে উঠে জবাব দিলেন, 'থাক, আর ভদ্রতা জানাতে হবে না। এদিকে ছেলেদের তো শিখিয়ে রেখেছেন অপমান করতে।'

মহাদেব তো শুনে অবাক্‌। অপমান! বেয়াই বলে কি? তারপর সমস্ত ঘটনা শুনে চৈত্র মাসের মাঠের আগুন তাঁর মাথায় গিয়ে উঠল। নিঃশব্দে বাড়ি এসে শোবার ঘর থেকে একখানা খাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে এলেন উঠোনে। বললেন, 'কই, কোথায় গেল পঙ্গপালের দল? সব কেটে শেষ করব।'

তাঁর অগ্নিমূর্তি দেখে যে যেদিকে পারল, পালাল। গিন্নী ছুটে এলেন। চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক জড় হল। তেওয়ারীকে কি কেউ ধরে রাখতে পারে? ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'ছেড়ে দাও তোমরা, রক্তবীজের দল আমি আজই সাবাড় করব। আর সহ্য হয় না।'

তারপর এলেন মোড়ল। মহাদেবকে বসিয়ে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'ওদের কেটে কি হবে? তার চেয়ে ওদের 'রাম' কেটে দাও। দেখবে কোনো গোল থাকবে না।'

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। মহাদেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

পরদিন মস্ত বড় যজ্ঞের আয়োজন হল। গ্রামের দশজন এসে বসলেন, পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়লেন। মহাদেব অগ্নিসাক্ষী করে বললেন, 'আজ থেকে আমার ছেলেদের 'রাম' কাটিয়া দিলাম।'

কিন্তু ছেলেদের মুখ ভার হয়ে রইল। তাদের নামগুলো যে বিশ্রী ছোট হয়ে গেল। মোড়ল বোঝালেন, 'না-না, তোমাদের নামের শেষের দিকটা যে দেবতার নাম। রাম কাটা গেল, দেবতার নাম রয়ে গেল। আজ থেকে তোমরা দেবতা।'

তাই নাকি! শুনে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

'—' দেখানো

বড়বাবু হবার পর থেকে হরিধন দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন। দাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাছ-বিচারের বহরটাও বেড়ে চলেছে। শুধু খাওয়া-পরা, চলা-ফেরায় নয়, দেখাশুনোর ব্যাপারেও। একই ঘরে বসেন এমন দু-একটি বাবু আছেন, সকালের দিকে প্রথমেই যাদের মুখ দেখাটা ওঁর পছন্দ নয়। তাই তাদের এমন কাজ দিয়েছেন যা বেলায় এসেও সেরে ফেলা যায়। উনি নিজে ভোরে উঠে পুজো-আহ্নিক এবং তার পরে আখের গুড় আর কাঁচা হলুদ দিয়ে জলযোগ সেরে নিয়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই আফিসে এসে পড়েন। সকালবেলা নিরিবিলিতে

কাজটাও হয় ভালো। বেলা বাড়লেই ভিড় বাড়ে, মালপত্তর আসতে থাকে, তার পিছনে ঠিকাদারের দল। জেলখানার চাকরি, নানান ঝামেলা।

কিছুদিন আগে আবার একদল 'স্বদেশী কয়েদীর' আমদানী হয়েছে। তাদের উৎপাত লেগেই আছে। হরদম 'এটা দাও, সেটা দাও।' মাল যোগাবার ঝক্কিটা বড়বাবুর ওপরেই বেশী।

সেদিন কলমটা কপালে ঠেকিয়ে সবে ক্যাশ-বই খুলে বসেছেন, এমন সময় স্বদেশীওয়ালাদের মেস্-ম্যানেজার সঞ্জয় সেন বেশ গরম হয়ে ঘরে ঢুকল, বললে, 'এই দেখুন, আজও ঠিক মাপ মতো হয় নি। এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ কম।'

তার বাঁ হাতে একটা মাপবার ফিতে, যাকে বলে টেপ্। আর ডান হাতে··· সর্বনাশ!

এক পলক তাকিয়েই বড়বাবুর মাথায় আগুন চড়ে গেল।

সঞ্জয় তখন সে জিনিসটা ওঁর টেবিলের উপর রেখে ফিতে দিয়ে মেপে দেখাবার আয়োজন করছে, হরিধন গর্জে উঠলেন, 'সরিয়ে নিন।'

'কেন? কী হয়েছে? অতো মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন?' তেড়ে জবাব দিল সঞ্জয় সেন। সাধারণ কয়েদী নয়, রাজনৈতিক বন্দী সে। চড়া কথা শোনাবার জন্যে জেলে আসে নি।

বড়বাবু চোখ কুঁচকে আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে জোরে-জোরে হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, 'নিয়ে যান বলছি।'

'নিয়ে যাবো বৈকি। যতসব বদ্দি মাল চালাবেন, আর দেখাতে গেলেই চোখ গরম।'

'দেখাবার কি আর জিনিষ পেলেন না, মশাই? সকালবেলা আফিসে আসতে না আসতেই ছিঃ ছিঃ ছিঃ যান, পরে আসবেন।'

'আমার দায় পড়েছে বারে বারে আসতে। এই রইল আপনার কলা। আমি সুপারের কাছে যাচ্ছি।'

গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল সঞ্জয়। 'অযাত্রা'টা টেবিলের উপরেই পড়েছিল বড়বাবুর তাড়া খেয়ে একজন কয়েদী এসে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে গেল।

সুপার···মানে সুপারিনটেন্ডেন্ট, অর্থাৎ জেলখানার বড় সাহেব মেজর ঘোষ মহা ফাঁপরে পড়লেন। একদিকে তাঁর হেডক্লার্ক, আর একদিকে একজন 'স্বদেশী' মামলার বন্দী, দেশের একজন মাঝারি গোছের নেতাও বটে। দুজনেই লম্বা নালিশ দায়ের করেছেন।

বড়বাবু লিখেছেন, 'দি প্রিজনার শোড্ মি প্ল্যান্টেন্'—বন্দী আমাকে কলা দেখিয়েছে।

সঞ্জয় লিখেছে, 'দি হেড ক্লার্ক শোড্ মি রেড্ আইজ্'—বড়বাবু আমাকে লালচোখ দেখিয়েছেন।

কোনোটিকেই তুচ্ছ করা যায় না। নিজে থেকে কেউ ঠাণ্ডা হবে সে রকম

কোনো লক্ষণও দেখা যচ্ছে না।

সঞ্জয়ের তেমন কিছু দোষ নেই। জেলের বরাদ্দ খাবারে উপর বাড়তি হিসাবে ডাক্তার তার জন্যে রোজ একটি করে মর্ত্তমান কলা মঞ্জুর করেছেন।

কলাটির 'আকার' কি হবে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। ঠিকাদারের চেষ্টা যত ছোট দিয়ে পারে, সঞ্জয় এবং তার বন্ধুদের চেষ্টা যত বড় আদায় করা যায়। এই নিয়ে রোজ ঝগড়াঝাঁটি। কোনো কোনো দিন সুপারকে তার জের মেটাতে হয়।

একদিন দু'পক্ষকে ডেকে তিনি কলার একটা সাইজ ঠিক করে দিলেন। বোঁটা বাদ দিয়ে লম্বায় সাড়ে চার ইঞ্চি। তার কম হলে ফেরৎ।

সাতদিন যেতে না যেতেই সঞ্জয়ের তরফ থেকে আবার নালিশ এল, কলা বড় সরু হচ্ছে।

তখন বেড়টাও বেঁধে দিলেন ঘোষ সাহেব। মাল বুঝে নেবার জন্য সঞ্জয়কে একটা টেপ্ আনিয়ে দেওয়া হল।

রোজ সকালে এসে সে নিজে হাতে কলা মাপে। একটু-আধটু এদিক্ ওদিক্ হলে সে-মামলা মিটিয়ে দেয় স্টোরকীপার অনিল দত্ত। ঐ দিনটাতে সে কোথায় যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল, কাছে ছিল না। সঞ্জয় কলা নিয়ে সোজা গিয়ে উঠে-ছিল তাই বড়বাবুর কাছে।

হরিধনের তরফেও অনেক কিছু বলার আছে। সাত্ত্বিক মানুষ, পুজোপাট নিয়ে আছেন। হাঁচি-টিকটিকি মেনে চলেন, পাঁজি না দেখে আনাজপাতি কেনেন না। নবমীতে লাউ কিংবা ত্রয়োদশীতে বেগুন তাঁর হেঁসেলের ধারের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। এবকম মানুষকে সাত-সকালে কলা দেখানো!

কে না জানে কলা অযাত্রা? 'রক্তচক্ষু'র উপরে আরো খানিকটা যদি এগিয়ে যেতেন, অর্থাৎ সঞ্জয়কে একটা গলা-ধাক্কা দিয়ে বসতেন, তাহলেও তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যেত না।

'আজ-কাল' করে কয়েকদিন কেটে গেল। ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল।

'স্বদেশী'রা নোটিশ দিলেন, হেড্‌ক্লার্কের বিরুদ্ধে সঞ্জয় যে নালিশ করেছে দু-একদিনের মধ্যে তার ফয়সালা না হলে তাঁরা দল বেঁধে হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু করবেন—যাকে বলে 'না-খাওয়া ধর্মঘট'।

হেডক্লার্কও তাঁকে অন্য কোনো জেলে বদলি করবার জন্যে আর একখানা দরখাস্ত পেশ করলেন।

ঘোষ সাহেব বড়ই ভাবনায় পড়লেন—কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কোনো দিকে কূলকিনারা দেখতে পেলেন না।

পরদিন সুপারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বড়বাবু কাগজপত্তর সই করাচ্ছেন। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, চারিদিক্ অন্ধকার মনে হল। কেউ এসে ধরবার আগেই তিনি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লেন।

সুপার নিজে ভালো ডাক্তার। মাথায় জলটল দিয়ে, ওষুধপত্তর খাইয়ে

খানিকক্ষণ পরে ওকে সুস্থ করে তুললেন। ব্লাড্‌প্রেশার নিয়ে দেখলেন, যতটা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী। তখনই বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। পুরো পনেরো দিন একটানা বিশ্রাম।

সঞ্জয়কে কোনো কারণে গেটে আসতে হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে বড়বাবুকে গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

'কী হয়েছে?'

জিজ্ঞেস করতে বাবুরা মোটামুটি অসুখটা জানিয়ে দিল। কাজ সারা হলে সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আমার সেই দরখাস্তটা—'

সুপার বিরক্ত হলেন। বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হাতের কাছেই রেখেছি। লোকটাকে একটু সামলে উঠতে দিন।'

'ওটা একটু দেখতে পারি?'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

ঘোষ সাহেব দরখাস্তখানা সঞ্জয়ের হাতে দিতেই সে সেটা চার টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে বললে, 'আমার পিসে-মশায়ের এই প্রেশার ছিল। কথা বললেই তেড়ে আসতেন, আর চোখ দুটো জবা-ফুলের মত লাল। তার তুলনায় ওঁর তো কিছুই নয়। আমাকে মাপ করবেন, আমি জানতাম না। জানলে, যা-ই করি, কলাটা দেখাতাম না।'

একদিক তো মিটল। বাকিটার কি করা যায় যখন ভাবছেন, ঘরে ঢুকলেন ভুবন পণ্ডিত।

সপ্তাহে একবার করে কয়েদীদের ধর্মকথা শুনিয়ে যান, এবং তার জন্য ভাতা পান আড়াই টাকা। সেটা আদায় করতে এসেছিলেন। যাবার সময় সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে যাচ্ছেন।

মেজর ঘোষ বললেন, 'আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, কলার মতো একটা নিরীহ ফলের ওপর আপনারা এতো খাপ্পা কেন বলুন তো?'

'কি রকম?'

'অন্য কিছু দেখালে দোষ হয় না, কলা দেখালেই কুরুক্ষেত্র!'

পণ্ডিত মশাই হাসলেন। তারপর বললেন, 'বাংলা অভিধান আছে?'

'কার অভিধান?'

'ধরুন, রাজশেখরের চলন্তিকা।'

'কেন?'

'আনতে বলুন না কাউকে।'

উপরেই জেলার সাহেবের বাসা। সেখান থেকে চলন্তিকা আনানো হল। পণ্ডিত মশাই 'কলা' শব্দের পাতাটা খুলে ধরলেন।

লেখা আছেঃ 'কলা দেখানো'—বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।

বললেন, 'কলা দেখানোর সঙ্গে গাছের কলার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা আসলে এই বুড়ো আঙুল। কলা বেচারাকে লোকে না বুঝে দোষ দেয়।'

সেইদিনই বড়বাবুকে দেখতে গিয়ে কলার অপবাদ ঘুচিয়ে দিলেন ঘোষ সাহেব। উনিও সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে উঠলেন। দুদিন পরে আফিসে এসে তাঁর প্রথম কাজ হল সঞ্জয়ের কাছে মাপ চাওয়া।

আমড়া গাছ

তখনও ভোর হয় নি। ঘুম চলে গেছে। চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে তার মায়া। কখন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে…ভরা শ্রাবণের ধারা। কানে আসছে তার একটানা ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ। মনে হচ্ছে, আজ যেন আর উঠতে হবে না। পাশ-বালিশটাকে টেনে নিয়ে আর একবার চোখ বুজব কিনা ভাবছি, এমন সময় কানের কাছে টেলিফোনটা বেজায় জোরে বেজে উঠল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা তুলে বললাম, 'হ্যালো! কে, পিসীমা? কী খবর? গাড়ি পাঠিয়ে দেব? কেন? কোথায় যাবেন? কাশী? হঠাৎ কাশী কেন? বড্ড অশান্তি হচ্ছে? ও, আমি যাচ্ছি।'

ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে, এইটুকু বোঝা গেল, আজ কপালে আমার অনেক দুঃখ আছে। চশমাটা পরে নিয়ে সবে দরজা খুলবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, অমনি ক্রীং-ক্রীং…

আবার রিসিভারটা তুলে বললাম, 'হ্যালো! কে, পিসেমশাই? এত ভোরে? গেঁটেবাতটা কি খুব জোর করেছে? কি বলছেন? বাত নয়? কোথায় যাচ্ছেন? কলম্বো? আজই? কী সর্বনাশ! আচ্ছা, আমি যত শীগগির হয়ে আসছি।'

একজন চলেছেন কাশীধামে, আর একজন কলম্বো; অর্থাৎ বেশ বড় রকমের কিছু একটা ঘটে গেছে নিশ্চয়। পিসীমা আর পিসেমশাই যেন গৌরী আর হর। এরকম মিল আর দুটো দেখা যায় না। শোনা যায়, পিসীমার বাবা তাঁর জন্যে বর খুঁজতে গিয়ে চাটগাঁ থেকে মেদিনীপুর, আর দার্জিলিং থেকে বরিশাল অবধি গোটা বাংলাদেশটা একেবারে চষে ফেলেছিলেন। ঠিকুজির মিল আর কিছুতেই হয় না। গণ-এ মেলে তো রাশি রুখে থাকে, রাশি ঠান্ডা হয় তো গণ যায় ক্ষেপে। শেষটায় জুটলেন এই পিসেমশাই। জ্যোতিষী নাকি টিকি দুলিয়ে বলেছিলেন, 'সাবাস্‌! এরকম মিল আর দেখা যায় না। একেবারে রাজযোটক।' ঘটা করে বিয়ে তো হয়ে গেল। সেও আজ অনেকদিন। কিন্তু রাজযোটকের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে আমার অবস্থা তো কাহিল। এই ভবানীপুর আর শ্যাম-বাজার করে-করে আমার গাড়ির টায়ার ফাটে বছরে পঁচিশবার, আর তেল পোড়ে রোজ এক গ্যালন। এ ছাড়া আর যা হয় সেটা না হয় না-ই বললাম।

দোতলায় হল-ঘরে ঢুকেই দেখলাম, ওঁরা দুজনেই রয়েছেন। একজন এদিকের দেয়ালের পাশে উত্তর দিকে মুখ করে, আর একজন ওদিকের দেয়ালে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। আমাকে দেখে দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে এলেন এবং প্রায় একসঙ্গেই বললেন, 'এই যে অজয় এসেছো? বোসো, বসো।'

'ইস্ ! তুমি যে একেবারে ঘেমে উঠেছ দেখছি।' বলে পিসেমশাই উঠে গিয়ে পাখাটা খুলে দিলেন। পিসীমা তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সেটা বন্ধ করে বললেন, 'চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নে, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে।'

পিসেমশাইএর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার চা-টা তাহলে এখানেই এনে দিক।' বলেই হাঁক দিলেন, 'হরে।'

হরি আসতেই পিসীমা অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, 'যা তো বাবা হরি, অজয়বাবুর জন্যে চট্ করে একগ্লাস ঘোল নিয়ে আয়। বড্ড গরম পড়েছে।'

পিসেমশাই এবার রীতিমতো রুখে উঠলেন। চেয়ারের হাতল চাপড়ে বললেন, 'এর মানে কী ? আমি জানতে চাই অজয়, এর মানে কী ?'

মিনতি করে বললাম, 'থাক পিসেমশাই, আমি ঐ চা এবং ঘোল দুটোই খাব। ওতে করে যা মিকশ্চারটা হয়, আপনাকে কি আর বলব···একেবারে অমৃত। সেদিন 'ফারপো'তে দেখে এলাম, বড়-বড় সাহেবরা কেবল হাঁড়ি-হাঁড়ি ঘোল আর চায়ের মিকশ্চার খেয়ে যাচ্ছে।'

এই দরকারী খবরটা পিসেমশাইএর পছন্দ হল বলে মনে হল না। মুখখানাকে তেমনি হাঁড়ির মতো করেই তিনি বললেন, 'সে যাক, তাহলে আমার রেঙ্গুন যাবার ব্যবস্থাটা তোমাকেই করে দিতে হবে। জানো তো, আমার গেঁটেবাতটা···'

'রেঙ্গুন ! কিন্তু টেলিফোনে যেন বললেন, কলম্বো !'

'হ্যাঁ, ঐ একই কথা। সংসারের অশান্তির মূল যখন আমি, তখন আমাধ কাছে কাবুল আর কলম্বো সবই সমান। আমি চলে যেতে চাই।'

পিসীমা দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, 'শুনলি অজয়, শুনলি তো ? আমার জন্যেই যত অশান্তি। বেশ, আমি আজই চলে যাচ্ছি। দ্যাখ তো বাবা, ক'টায় ছাড়ে মাদ্রাজের গাড়িটা ?

বললাম, 'কিন্তু তখন যে বললে কাশী ?'

পিসীমা রীতিমতো অবাক্ হয়ে বললেন, 'কাশী আবার কখন বললাম ? না, না, কাশী নয়, আমি যাব মাদ্রাজ।'

বললাম, 'বেশ, তাই হবে। তবে আপাততঃ বুঝলে পিসীমা, আপনাকেও বলছি পিসেমশাই···আপাততঃ মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুনের বদলে আপনারা একজন ভাঁড়ার ঘরে, আর একজন পড়বার ঘরে গিয়ে যদি বসেন, আমি একটু নিশ্চিন্ত মনে টিকিট কিনতে যেতে পারি।'

প্রস্তাবটি দুজনেরই মনে ধরল এবং দুজনে উঠে দুদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি খবরের কাগজটা টেনে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন বাড়ি ফিরছি, সিঁড়ির মুখেই দেখি পিসেমশাই। বললেন, 'এই যে অজয়, চললে ? আচ্ছা, এসো বাবা। হ্যাঁ দ্যাখো, একটা কথা তোমায় বলা হয় নি। চিরতাটা রোজ খাবে। আমি বড্ড পছন্দ করি। কিন্তু এ বাড়িতে ওর নাম করবার জো নেই। আর শোনো, বাজারে বড্ড ইলিশমাছ উঠেছে। খবরদার যেন খেও না। একেবারে বিষ, বুঝলে, একেবারে বিষ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'সে আমায় বলতে হবে না, পিসেমশাই। চিরতা আমি সন্দেশের চেয়েও বেশী পছন্দ করি। আর ইলিশমাছ? ওর নাম শুনলে আমার পেটের নাড়িসুদ্ধ বেরিয়ে আসতে চায়।'

সিঁড়ির নীচে পা দিতেই ছুটে এলেন পিসীমা। এসেই বললেন, 'এ কি, তুই পালাচ্ছিস্ নাকি? না-না, আর একটু বোস। এমন সুন্দর টাট্‌কা গঙ্গার ইলিশটা আনা হল, চট্ করে দুখানা ভাজা করে দিক, খেয়ে যা। বেশী নয়, এই দশ মিনিট…'

বললাম, 'ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ পেলে দশ মিনিট কি বলছ, দশ ঘণ্টা বসে থাকতে রাজী আছি, পিসীমা।'

বিধাতা ওঁদের ছেলে-মেয়ে দেন নি। দুটো বুড়ো শিশুকে এমনি করে নানা উপায়ে ভুলিয়ে রাখতে হয় আমাকেই! আমার সঙ্গে সম্পর্কও বহু দূরের। তবুও এমন ব্যবহার করেন, যেন একান্ত আপনজন।

কয়েকদিন নিরাপদে কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরতেই শুনলাম, পিসীমা বার পাঁচেক ফোন করেছেন। কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই আবার ক্রীং-ক্রীং শব্দ! খবর অত্যন্ত খারাপ। পিসেমশাই সকাল থেকে উধাও। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খোঁজ করা হয়েছে, সন্ধান পাওয়া যায় নি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, কোনো উত্তর আসে নি। খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন পাঠানো হয়েছে!

পিসেমশাই-এর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, আজকের ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল একটা শক্ত ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটা এই, 'বাঙালীদের আসল পোশাকটা কী? শার্ট না পাঞ্জাবি?' পিসীমা নিয়েছিলেন শার্টের পক্ষ, আর পিসেমশাই পাঞ্জাবির। দেখতে দেখতে তর্ক উঠল তুমুল হয়ে। তারপর আর খেই পাওয়া গেল না। হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে পিসীমা বলে ওঠেন, 'পুরুষ মানুষ যদি রোজগার না করে, তার জীবনের মূল্য কি?' কথাটা ঝাঁ করে বিঁধল গিয়ে পিসেমশাইএর বুকে। কেননা, তিনি হচ্ছেন জমিদারের ছেলে। রোজগার করে খেতে হয় না। হলেও বোধ হয় পারতেন না। প্রথমটা তিনি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই অবস্থায়—যাকে বলে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সরকারকে বলে গেছেন, 'যদি কোনোদিন রোজগার করতে পারি তবে ফিরব, নইলে এই শেষ।'

পিসীমা চোখের জল মুছে বললেন, 'ঝগড়া করি আর যা-ই করি বাবা, উনি যে আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন, একথা আমি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নি। আমি না দেখলে যাঁর দশ মিনিটও চলে না।'

বলে এলাম, 'আজকের রাতটা সাবধানে থেকো। কাল সকালেই আবার আসছি।'

সেই রাতেই ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। রাত তখন বারোটা কি একটা। কৃষ্ণপক্ষের রাত। তার উপর মেঘ করে আছে। পিসীমাদের বাড়ির পিছনে ছিল একটা

আমড়াগাছ। তার উপর উঠে একটা ডাল বেয়ে একেবারে দোতলায় এসে পড়া যায়। কর্তা বাড়ি নেই। দারোয়ান কিষণ সিং অনেক রাত পর্যন্ত 'তুলসীদাস' পড়ে শোবার আগে একবার লাঠি হাতে চারদিকটা ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ মনে হল, আমড়াগাছের উপরে কে একটা লোক? দেখেই সে 'চোর' 'চোর' বলে দিলে হাঁক। দুজন চাকর, গঙ্গাদীন ঠাকুর, সব ছুটে এল এবং সবাই মিলে আমড়াগাছ থেকে চোরকে সহজেই টেনে নামাল।

ভীষণ অন্ধকার। তার মধ্যে যে-যেখানে পারল বসিয়ে দিলে কয়েক ঘা। কিন্তু চোর না দিলে কোনো সাড়া, না করলে পালাবার চেষ্টা। গিন্নীমার কাছ থেকে পুরস্কার পাবার লোভে কিষণ সিং চোরের হাত ধরে সদরে টেনে নিয়ে এল। পিসীমাও তখন নীচে নেমে এসেছেন। সদর-দরজার আলোটা জ্বালতেই তিনি অস্ফুট এক চিৎকার করে পড়ে গেলেন। কিষণ সিং 'রামা হো' বলে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। গঙ্গাদীন ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিলে। দুটো চাকরের একটা ছুটে গিয়ে চোরের পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল, আর একটা এদিক-ওদিক চেয়ে খোলা দরজা দিয়ে দে-ছুট।

সকালে গিয়ে দেখলাম, পিসেমশাই তাঁর খাটে শুয়ে আছেন। হাত পায়ে ব্যাণ্ডেজ। কপালের নীচেটা ফুলে উঠে একটা চোখ প্রায় ঢেকে গেছে। আমাকে দেখেই তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন। বললাম, 'এত জায়গা থাকতে আপনি রাত-দুপুরে আমড়াগাছে চড়তে গেলেন কেন?'

পিসেমশাই বললেন, 'আর বোলো না বাবা। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। মনে করলাম, পড়বার ঘরের দেরাজটা খুলে কয়েকখানা নোট আর চেক-বইটা নিয়ে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ঐ ব্যাটা দারোয়ান কিছুতেই আর সদর ছেড়ে নড়ে না।'

পিসেমশাই-এর অবস্থা দেখে দুঃখ যে হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁর কথা শুনে হাসিও পেল। সকালেই যাদের সামনে দর্প করে বলে গেছেন, রোজগার না করে ফিরব না···সন্ধ্যাবেলায় তাদের চোখের উপর দিয়ে চেক-বইয়ের খোঁজে আসা যায় না। তাই তাঁর আমড়াগাছের দরকার হয়েছিল।

বেচারা আমড়াগাছ! পিসীমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওরই উপর। লোক ডাকিয়ে সকালেই দিলেন তাকে সাবাড় করে।

আমড়াগাছ গেছে। সেই সঙ্গে ও বাড়ির হালও গেছে বদলে। এখন, সকালে উঠেই পিসীমা এক'গ্লাস করে চিরতার শরবত খান, আর গঙ্গার ইলিশ না হলে পিসেমশাই-এর পেট ভরে না।

একটি 'করুণ গল্প'

কানাঘুষা শোনা গেল, কবি প্রভঞ্জন তরফদার নাকি আর লিখছেন না। সম্পাদকের দল চঞ্চল হয়ে উঠল। সামনেই পুজো। বিশেষ সংখ্যার তোড়জোড়

চলছে। প্রথম পাতায় কবি প্রভঞ্জনের একটা জমকালো কবিতা না থাকলে যে বাজারই মাটি। ছুটলাম বিষ্টুনগরে। না, যা ভয় করছিলাম, তা তো নয়। কবি বেশ সুস্থই আছেন। আমার সামনেই এল তাঁর বৈকালিক জলখাবার···বেশ বড় একডিশ ফজলি আম, আর তার পাশে পুরো আধসের সন্দেশ। সঙ্গে এল এক ঝাঁক রাক্ষুসে মাছি। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। হ্যাঁ, যুদ্ধ বৈকি! ফজলি আমের অধিকার নিয়ে মানুষে আর মাছিতে যুদ্ধ। সমানে দু-হাত চালিয়ে মানুষ জয়ী হলেন বটে, কিন্তু পাঁচ মিনিটেই তাঁকে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হল। এক-গ্লাস জল খেয়ে একটু দম নিয়ে তরফদার বললেন, 'তোমার জন্যে একটু চা-টা···'

হাতজোড় করে বললাম, 'মাপ করবেন, ক্ষিধে একেবারে নেই।'

কবি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। হাতটা ধুয়ে নিয়ে বললেন, 'এরি নাম বিষ্টুনগর। সন্ধ্যার পরে যদি থাক, একটা মজার ম্যাজিক দেখতে পাবে।'

'ম্যাজিক!'

'হ্যাঁ, ম্যাজিক বৈকি। তোমার রং বদলে যাবে। আহো টুকটুকে ফরসা, হয়ে যাবে আমার এই মানকের মতো ভ্রমরকৃষ্ণ!'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কি রকম?'

'বুঝতে পারছ না? মশা! মশা! বেমালুম ঢাকা পড়ে যাবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি চমৎকার মশার প্লাস্টার।' বলেই কবি হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, সন্ধ্যা হতে আর ঘণ্টা দেড়েক দেরি। আসল কথাটা পাড়লাম, 'তাহলে লেখাটা কবে দিচ্ছেন, স্যার? পুজো-বার্ষিকীর দু-তিন ফর্মা ছাপা হয়ে গেল।'

কবি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'লেখা! না, ওসব চুকে গেছে। লেখা চেয়ো না আমার কাছ থেকে।'

কথাটা এমন করুণ শোনাল যে, আমার মুখেও হঠাৎ কোনো জবাব এল না। কিছুক্ষণ পরে বললাম, 'না, এ কিছুতেই হতে পারে না। কাব্য-জগৎ থেকে হঠাৎ আপনি সরে দাঁড়াবেন, এ আমরা সইব না। লিখতে আপনাকে হবেই।'

তরফদার মাথা নেড়ে বললেন, 'সে হয় না। কলম আর ধরা চলবে না।'

অত সহজে হাল ছেড়ে দিলে সম্পাদকগিরি করা চলে না। কবিকে চেপে ধরলাম, 'কী এমন ঘটল যার জন্যে এমন অসময়ে আপনাকে বিদায় নিতে হচ্ছে?'

তরফদার অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তারপর হাসলেন, 'বলতেই হবে? আচ্ছা, তবে শোনো।'

উঠে গিয়ে ভিতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে কবি শুরু করলেন:

'বদলি হয়ে এলাম বিষ্টুনগর। মনে হল বেঁচে গেলাম। তোমার মতো কাগজওয়ালাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বেশ আরাম করে ঘুমোনো যাবে দুদিন। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এ দেশেও দেখলাম

সম্পাদক আছেন। ক'দিন যেতেই পেছনে লাগলেন একজন। বললাম, 'কি আপনার কাগজের নাম ?'

'হুঙ্কার।'

সর্বনাশ ! আপনি অন্য লোক দেখুন। নেহাৎ নিরীহ মানুষ আমি। জীবনে কোনোদিন চেঁচিয়ে কথা বলি নি। হুঙ্কার ছাড়তে পারব না।

সম্পাদকমশাই তাঁর দাড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? নামটা ঐ একটু জমকালো বটে, কিন্তু আসলে ছাপি আমরা সবই···চুটকি, চাটনি, যখন যা পাই।'

আমাকে কি দিতে হবে ? চুটকি না চাটনি ?

না, ওসব নয়। আপনার কাছে একটি গল্প চাই··বেশ প্রাণখোলা হাসির গল্প।

শুনে দুঃখই হল। Ah ! What a full···'হুঙ্কার' চায় প্রাণখোলা হাসির গল্প। বললাম, তোমাদের পাল্লায় পড়ে কবিতা-টবিতা দু-চারটে লিখছি বটে, কিন্তু গল্প তো কখনো আসে না, তাও আবার হাসির গল্প।

কিন্তু উপায় কি ? সম্পাদক একেবারে পেয়ে বসলেন। অগত্যা ভাবতে শুরু করলাম। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ভাবি, বেড়াতে বেড়াতে ভাবি, শুয়ে-শুয়ে ভাবি। কিছুই ছাই মাথায় আসে না। হাসির গল্প ভেবে-ভেবে আমার অবস্থা হয়ে উঠল রীতিমতো করুণ।

তারপর মনে মনে যা হোক একটা কাঠামো খাড়া করে একদিন দুপুরবেলা বসলাম তোড়জোড় করে। বাঁ হাতে পাখা, মাছি তাড়াবার জন্যে, ডান হাতে কলম। দু-চার লাইন সবে এগিয়েছি, রাস্তার দিকের ভেজানো দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। দেয়াল থেকে খসে পড়ল এক চাপড়া চুন-বালি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন, ডাকাত নয়, আমাদের স্বামীজী। স্বামী বজ্রানন্দ। গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, হাতে মোটা লাঠি।

দু-কাপ চা আনতে বলুন, আর কিছু খাবার। বলে, তিনি তোমার ঐ চেয়ারটাতে বসলেন। মচমচ করে উঠল বেচারা। নেহাত কাঠের শরীর, তাই টিঁকে গেল। তবে, অন্তত দু-মাসের পরমায়ু ঝরে গেল ঐ এক ধাক্কায়।

কী লিখছেন ওটা ? বজ্রানন্দ হাঁক দিলেন।

ও কিছু না, একটা গল্প।

কিসের গল্প ?

এই একটা হাসির গল্প।

হাসি ! গর্জে উঠলেন স্বামীজী। হাসির দিন কি এখনো শেষ হয় নি ? এই দেশজোড়া দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অবিচার, অত্যাচার···এসব দেখেও কি আপনাদের হাসির স্রোত রুদ্ধ হয় নি ? আর হাসি নয়, প্রভঞ্জনবাবু ! কান্নার দিন এসেছে বাঙালীর। কাঁদুন, প্রাণ ভরে কাঁদুন যদি দেশকে বাঁচাতে চান, বদলে দিন আপনার সাহিত্যের সুর। রসসৃষ্টি করতে চান, করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু একটি মাত্র রস আছে আজ বাংলায়, সেটা হচ্ছে করুণ রস।

ঝড়ের মতো ছুটে চলল বজ্রানন্দের বক্তৃতা। তারি মাঝখানে ঝড়ের মতোই উড়ে গেল একথালা খাবার আর দু-পেয়ালা চা। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের মতো। যাবার আগে শুধু লাঠিটা ঠুকলেন একবার। কেঁপে উঠল কংক্রীটের মেঝে।

স্বামীজী কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিটাই বদলে দিয়ে গেলেন। ঠিকই তো। দেশজোড়া হাহাকার। দাঁত বার করে হাসি কোন্ লজ্জায়? ছিঁড়ে ফেলে দিলাম হাসির নক্শা। চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলাম তরল থেকে জমাট করুণ রসের দিকে। করুণ গল্প চাই একটা।

মোটা সিগারের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে তন্ময় হয়ে ভাবছি গল্পের প্লট। বেশ ঝিমিয়ে এসেছে মনটা।

বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?

চমকে উঠলাম। ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটা অচেনা লোক। অত্যন্ত রোগা। পরনে ময়লা কাপড় আর তালি-দেওয়া কোট। বিরক্তির সুরে বললাম, কে তুমি?

আজ্ঞে, আমি টিকাদার।

এখানে কি চাই?

কিছু চাই না। টিকা দিতে এসেছি। বলে, সে তার যন্ত্রপাতি বের করল।

না-না, টিকা নেবার সময় নেই আমার। অন্য সময়, আরেক দিন এসো।

লোকটা মিনতির সুরে বলল, জানেন তো স্যার, সারা শহর ঘুরতে হয় আমায়। এ পাড়ায় এসেছিলাম। সব বাড়িই প্রায় সেরে এসেছি। যদি দয়া করে নিয়ে নিতেন। বেশী সময় নেব না।

বড্ড জ্বালাতে শুরু করলে দেখছি। বলছি, সময় হবে না আজ। তবু ঘ্যান-ঘ্যান করছ।

টিকাদার মুখখানা শুকনো করে তার যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হল, লোকটার চেহারা, চলবার ধরন,মুখের ভাবটা —সবই যেন বড্ড করুণ। ঠিক হয়েছে, ঐ আমার গল্পের নায়ক। ওরই ওপরে কল্পনার তুলি বুলিয়ে গড়ে তুলব করুণ গল্প। গল্পের নাম দিলাম, 'টিকাদার'।

গল্প শুরু হল।

গরিব টিকাদার। নাম ব্যোমকেশ। সামান্য মাইনে। এই দুর্দিনে দু-বেলা দু-মুঠো-অন্ন জোটে না বেচারীর। গায়ে নেই মাংস, মনে নেই বল। রোদে, জলে দিনের পর দিন খেটে মরে সারা বছর। না আছে ছুটি, না আছে অবসর। শহরে যখন মহামারী লাগে, ব্যোমকেশ তখন ভুলে যায় বিশ্রাম, ভুলে যায় স্নানাহার। ঘরে ঘরে দেখা দেয় তার ছোট্ট ছুরিখানা নিয়ে। হাসি মুখে হাতে-হাতে ঢেলে দেয় ছোট্ট টিউব থেকে তার মহৌষধি। মানুষকে মহাব্যাধির হাত থেকে মুক্তি দেবার ব্রত নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু হায়, তার এই মহাদানের মূল্য কেউ বোঝে না। তার উপরে নেই কারো স্নেহ, নেই এতটুকু সহনাভূতি। একটু ভদ্র

ব্যবহার, একটি মিষ্টি কথাও জোটে না তার কপালে।

এমনি করে এগিয়ে চলল গল্প। মাঝে মাঝে দু-চার লাইন কবিতাও দিলাম ঢুকিয়ে:

ব্যোমকেশ টিকাদার,
টাক-মাথা কুঁজো,
খোঁচা-খোঁচা দাড়ি,
দেহ কঙ্কালসার।
চৈত্রের দুপুরে, ঘরে-ঘরে সবে সুখনিদ্রায় মগ্ন;
ব্যোমকেশ ছোটে এ-পাড়া ও-পাড়া,শিরোছত্রটি ভগ্ন।
গিন্নীরা বলে, 'এ কোন্ আপদ?'
ছেলেগুলো হাঁকে, 'ভাগো।'
ব্যোমকেশ হেসে বের করে ছুরি—
'দেখি হাতখানা' মাগো।'

সবার ঘরের সঙ্গে ব্যোমকেশের যোগ। কিন্তু নিজের ঘরের খবর রাখবার তার সময় নেই। সংসারে রুগ্না স্ত্রী—সারা বছর ভোগে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে। তাই নিয়েই খাটে সারাদিন। পরনে ছেঁড়া কাপড়। কোনো দিন জানে না, কাকে বলে আরাম বা আনন্দ। একটিমাত্র ছেলে। সারাক্ষণ কাঁদছে। পেটে পিলে, গলায় মাদুলি। বৌ কোনোদিন বলে, ওগো শুনছ! ছেলেটা এত ভুগছে, একজন ভালো ডাক্তার দেখাও। খেঁকিয়ে ওঠে টিকাদার, টাকাটা কি আকাশ থেকে পড়বে? বৌ তর্ক করে, তাই বলে বাছা আমার বিনি-চিকিচ্ছেয় মারা যাবে? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা। ব্যোমকেশ আর কথা বলে না।' হুঁকোয় জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ছুরি আর ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

এমনি করে চলে বছরের পর বছর। তারপর ভীষণ মহামারী। ঘরে ঘরে দেখা দিল করাল বসন্ত। ব্যোমকেশের খাটুনি বেড়ে গেল দশগুণ। ব্যাধি আর বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীর। ভাঙা হাড়গুলো কোনো রকমে বয়ে নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে টিকা দেয় বাড়ি-বাড়ি। সবারই চোখে মুখে আতঙ্ক। ব্যোমকেশ তাদের সাহস দেয়, দেয় সান্ত্বনা।

বৌ বলল, শহরসুদ্ধ লোককে তো টিকে দিচ্ছ। বাড়ির দিকে একবার চাইতে নেই? আমার কথা বলছি না। এ পোড়া প্রাণ গেলেই বাঁচি। কিন্তু ছেলেটাকে একটা খোঁচা দিতে হবে তো। পাশের বাড়িতে যে তিনজনের হয়েছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ চমকে উঠল, তাই নাকি! আচ্ছা, স্কুল থেকে আসুক খোকা। দিয়ে দেব'খন ওবেলা!

ওবেলা আর দেওয়া হল না। ছেলে ফিরল, গায়ে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। রাতারাতি সমস্ত শরীরে ছেয়ে গেল বসন্তের গুটি। টিকাদারের মুখে নামল চিন্তার ছায়া। ধরনটা বড় মারাত্মক। টেকানো কঠিন হবে। বৌ লুটিয়ে কেঁদে পড়ল, ওগো, এ কি হল গো?

ব্যোমকেশ ফিস-ফিস করে বলল, চুপ, চুপ। জানো না, বাড়িতে বসন্ত হলে আফিস যাওয়া বারণ! আবার না বেরোলে মাইনেও পাব না। এদিকে বেশী কামাই হলে বুড়ো বয়সে চাকরিটাও যাবে। চেপে যাও। ভগবানকে ডাকো! কান্নার সময় নেই আমাদের।

এর পরের অংশটা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি করুণ। সাত দিনের দিন ব্যোমকেশ হারাল তার একমাত্র ছেলে।

মায়ের চোখে জল নেই। কথা বলে না। ডাকলেও সাড়া দেয় না। যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। মাঝে-মাঝে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ব্যোমকেশ তেমনি আছে। তেমনি ছুটছে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া—রোদে, বৃষ্টিতে, শীতে ও বর্ষায়। ছেলেপিলে দেখতে পেলেই ডাকে। বলে, চট্ করে টিকাটা নিয়ে নাও তো বাপধন। মোটেই লাগবে না, ঠিক একটি পিঁপড়ের কামড়· ·

গল্প শেষ হল। পড়ে নিজের চোখেই জল এসে গেল। গেলাম পাশের ঘরে। গিন্নী শুয়ে ছিলেন, হাতে একখানা ডিটেকটিভ বই। বললাম, শোনো দিকিন, কেমন হল গল্পটা।

তিনি রেগে উঠলেন, রক্ষে কর বাপু, তোমার ঐসব নাকে-কান্না ভালো লাগে না আমার।

আহা! শোনোই না একবার। তারপর না হয় বোলো যা খুশি।

মিনিট পাঁচেক পড়বার পরেই তাঁর নাক-ডাকা শুরু হল। আশা হল, গল্পটা তাহলে উতরেছে। শরৎ চাটুজ্জে, বিভূতি বাঁড়ুজ্জের করুণ গল্পগুলো পড়তে পড়তেও এমনি নাক ডাকে আমার গৃহিণীর। দিলাম পাঠিয়ে। সম্পাদক খুশি হলেন। ছেপে দিলেন 'হুঙ্কারের' প্রথম পাতায়।

তারপর মাসখানেক কিভাবে কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা এই ঘরে এই চেয়ারটিতে বসে কি একটা বই পড়ছিলাম। ঝড়ের মতো ঢুকল সেই টিকাদার। একখানা 'হুঙ্কার' আমার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, এটা আপনার লেখা?

দেখে বললাম, হ্যাঁ।

টিকাদার তেড়ে উঠল, কেন লিখেছেন এসব মিথ্যে কথা? কে বলেছে আপনাকে যে আমার ছেলে মারা গেছে বসন্তে?

তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে বললাম, আ-হা-হা! আমি তো তোমার কথা লিখি নি। ওটা একটা গল্প।

টিকাদার ভেংচে উঠল, গল্প! ব্যোমকেশ টিকাদার দু-দশটা রয়েছে বিণ্টু নগরে না?

তোমার নাম কি ব্যোমকেশ?

না, ব্যোমকেশ হবে কেন? আপনার জন্যে আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নামটাও দেখছি বদলে দিতে হবে।

কী সর্বনাশ? বিশ্বাস কর, টিকাদার, আমি সত্যিই জানতাম না যে তোমার

নাম ব্যোমকেশ। ওটা একেবারেই আন্দাজে দেওয়া।

ব্যোমকেশ মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল, যার মানে হচ্ছে, আমার কৈফিয়ত সে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। তাকিয়ে দেখলাম, শুধু ব্যোমকেশ একা নয়, আরো জন চারেক ষণ্ডা মতন ছেলে ঐ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম, তোমাদের কি চাই?

একজন এগিয়ে এসে আস্তিন গুটিয়ে বলল, ক্ষতিপূরণ চাই। আপনার ঐ লেখার জন্যে আমাদের বাবার চাকরি গেছে।

চাকরি গেছে! কেন?

উত্তরে ছেলেগুলো যা বললে, সে এক তাজ্জব ব্যাপার।

মাস দুয়েক আগে ওদের এক ভাই আমাশায় ভুগে মারা যায়। ঘটনাটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জানতে পারেন, এবং আমার গল্পটাও কেমন করে তাঁর নজরে পড়ে। তিনি ব্যোমকেশকে ডাকিয়ে বলেন, ওসব বাজে কথা। কাগজে বেরিয়েছে তোমার ছেলে মারা গেছে বসন্তে। ভদ্রলোক আগে থাকতেই কোনো কারণে ওর ওপর রেগে ছিলেন, কোনো কৈফিয়তই শুনলেন না। বসন্তের খবর লুকিয়ে রেখে আফিস করেছে বলে চাকরিটি নিয়ে নিলেন।

টিকাদার মুখ বেঁকিয়ে বলল, কেন, আপনি কি লেখেন নি যে চাকরি যাবার ভয়ে ছেলের বসন্ত চেপে গেছি? এখন যে বড্ড ন্যাকা সাজছেন?

কী যে বলব ভেবে পেলাম না। ব্যোমকেশের দল শাসিয়ে গেল, তারা নালিশ করবে। করলও তাই। যেতে হল কোর্টে। হাকিমকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমি যা লিখেছি সেটা নিছক গল্প, খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়। আমি কবি, রিপোর্টার বা সাংবাদিক নই।

কোনো ফল হল না। তিনি একটু বিদ্রূপ করে বললেন, কিন্তু আপনার কাছে যেটা কাব্য, ওর পক্ষে যে সেটা মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল। চাকরিটি তো আর কবির কল্পনা নয়।

দু-হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের হুকুম হল। বন্ধুরা বললেন, এ জুলুম। তুমি আপীল কর। আমি বললাম, কোর্টে আর নয়। কিন্তু কোথায় পাই দু-হাজার টাকা? শেষ পর্যন্ত গিন্নীর গয়নায় টান পড়ল। তিনি চুপ করে রইলেন। বুঝলাম, এটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

দিন চারেক পরে আফিস থেকে ফিরে দেখলাম, উঠোনে একগাদা কাগজপত্তর পুড়ছে। গিন্নী গালে হাত দিয়ে পাশে বসে আছেন। বললাম, ওসব কি পোড়াচ্ছ?

কোনো উত্তর পেলাম না। কেমন একটু সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দেখলাম, আমার লিখবার টেবিলের সব দেরাজ খোলা। ভেতরটা একদম খালি। দু-বছর ধরে একখানা কাব্য লিখছিলাম। আশা ছিল, বাংলা-সাহিত্যে আলোড়ন তুলবে আমার সেই গ্রন্থ। এ ছাড়াও ছিল অনেক ছোট-বড় কবিতা— আমার যৌবনের স্বপ্ন, পরিণত বয়সের সৃষ্টি। সব শেষ হয়ে গেল ঐ উঠোনের

কোণে। টেবিলের উপরে নজর পড়তেই দেখলাম, একখানা কাগজ। গৃহিণীর হাতে বড়-বড় অক্ষরে লেখা, 'আর যদি কোনোদিন ঐসব ছাইপাঁশ লিখেছ দেখতে পাই, সেদিন আমি গলায় দড়ি দেবো।'

কবি প্রভঞ্জন তরফদার তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। জ্ঞান ছিল না যে সন্ধ্যা কখন চলে গেছে। সর্বাঙ্গে মশার প্লাস্টার—তাও একেবারে খেয়াল হয় নি।

উঠলাম। পূজা-সংখ্যার লেখা আর চাওয়া হল না।

পুরস্কার

বাড়ির পিছনে খানিকটা পোড়ো জায়গা অনেক দিন খালি পড়ে ছিল। একেবারে খালি নয়, সেখানে ছিল একটা ছাইএর গাদা, দুটো ফুটো এনামেলের গেলাস, ভাঙা চীনামাটির থালা, খান কয়েক থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন, আর কোণের দিকে একটা কাঁটা-মনসার গাছ। কুমড়োর দর চড়ে যাওয়ায় মলয়বাবুর ইচ্ছা হল ঐখানে গোটা দুই গাছ পুঁতে ব্যবসা করবেন। সেই ভেবেই সেদিন সকালে ওখানে গিয়েছিলেন। এমন সময় ছাইগাদার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট মাথা বলে উঠল, 'মিঁউ'।

সর্বাঙ্গে কালিমাখা, রোগা, লোম-উঠে-যাওয়া একটা সাদা রঙের বিড়ালের বাচ্চা। মলয়বাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। ছেলেবেলা থেকে বিড়াল দেখলেই তাঁর মাথায় খুন চেপে যায়। ব্যাপারটা হল, একবার এক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করতে সে হাত দেখে বলেছিল, আগের জন্মে তিনি ইঁদুর ছিলেন, বিড়ালের হাতে প্রাণ যায়। এজন্মে মানুষ হয়েও সে আক্রোশ ভুলতে পারেন নি। সে যাক্।

মলয়বাবু তৎক্ষণাৎ চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'ওটাকে বস্তায় পুরে মাইল পাঁচেক দূরে একেবারে ধাপার মাঠে রেখে আসবি। চোখ বেঁধে নিয়ে যাবি, যেন পথ চিনে আসতে না পারে।'

এদিকে মলয়বাবুর সেজ মেয়ে আন্নাকালী ছিল বাপের ঠিক উল্টো। সে চাকরটাকে বলে-কয়ে বিড়ালটাকে রেখে দিল। মলয়বাবু যখন বাড়িতে থাকেন. বিড়ালটা থাকে ছাদের উপরে ঝুড়ি চাপা, অন্য সময় ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়ায়। আন্নাকালীর ভাগের দুধ-মাছ আর তার হাতের চড়-চাপড় খায়, রাতের বেলায় তারই কাছে শোয়। বেচারী আন্না চোরের মতো থাকে, ভাই-বোনদের সঙ্গে কখনও লাগে না। একটা কিছু হলেই তারা শাসায়, 'আচ্ছা, বাবাকে বলে দেব বেড়াল পুষেছ।' সে আর কথা বলে না।

এমনি করে-করে মাস খানেকের মধ্যেই বিড়ালটা রীতিমতো বড় হয়ে উঠল। তাকে আর চেনা যায় না।

সেদিন ছিল রবিবার। মলয়বাবু খেতে বসেছেন। দেশের পুকুর থেকে একটা বড় রুইমাছ এসেছিল। তার মাথাটা পাতের কাছে বাটীর ভিতর থেকে

পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। মলয়বাবু সেদিকে তাকাচ্ছেন, আর তাড়াতাড়ি ডাল দিয়ে খাচ্ছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কি সাদমতো সাঁ করে ঘরে ঢুকল এবং চোখের নিমেষে মাথাটা তুলে নিয়ে একেবারে উধাও।

সকলে একসঙ্গে রা-রা করে উঠল। মলয়বাবু মিনিট খানেকের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সোজা সেইদিকে ছুটলেন। বিড়ালটা ততক্ষণে রাস্তায় এসে মাথাটা খাবার আয়োজন করছে। মলয়বাবুকে দেখে সেও দিল ছুট। তারপর সে এক ভীষণ রেস্। রাস্তাময় গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, তার ভিতর দিয়ে একটা বিড়াল মস্তবড় মাছের মাথা মুখে করে ছুটছে, আর তার পিছনে একটা লোক প্রাণের আশা ছেড়ে তাকে তাড়া করছে আর বলছে, 'ধরুন, ও মশাই, ধরুন। শেষটায় বিড়ালেরই হার হল। একটা নর্দমা পেরোতে গিয়ে সে যেমন থমকে দাঁড়িয়েছে, মলয়বাবু তাকে মালসুদ্ধ পাকড়াও করলেন।

এক হাতে মাছের মাথা, আর এক হাতে বিড়ালের মাথা চেপে ধরে তিনি যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, ঐ দুটোর সঙ্গে বাড়ির সকলের মাথাও বোধ হয় তিনি চিবিয়ে খাবেন। কিন্তু আপাততঃ সেটা খেলেন না। চাকরের উপর হুকুম হল, 'লে আও চট, দাঁড়, খবরের কাগজ আর সুঁচ।' অর্থাৎ এবার নিজেই ওটাকে প্যাক্ করে একেবারে ধাপায় রেখে আসবেন। অর্ধেক প্যাকিং হয়ে গেছে, এমনি সময়ে হাতের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

পুরস্কার! পুরস্কার!! পুরস্কার!!!

আমার মধ্যমা-কন্যা মিস্ লীলির বড় আদরের বিড়াল ফুলটুসি আজ তিন দিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। সেই অবধি শ্রীমতী জলটুকুও গ্রহণ করে নাই। যদি কেহ বিড়ালটির খোঁজ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহাকে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী রবিবার সকালবেলা আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত মিস্ লীলি স্বয়ং বিড়াল পরীক্ষা করিবে।

জে. বি. ডস্ (দাস)

বার-য়্যাট্-ল।

বিজ্ঞাপন পড়ে মলয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর আন্নাকালীকে ডেকে বললেন, 'বেড়ালটাকে রেখে দে, দেখিস্ যেন পালায় না।'

পরদিন থেকে মলয়বাবুর যেন পুনর্জন্ম হয়ে গেল। যে লোক রাস্তায় বিড়াল দেখে দাঁত কড়মড় করে লাঠি নিয়ে তাড়া করত, সে আজ দাঁড়িয়ে থেকে বিড়ালের সেবা করছে। কী দারুণ সেবা! গুরুদেব কিংবা সাধুমহারাজদেরও কপালে অতটা জোটে না। বিড়ালের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, সকালে রুটি-মাখন এবং দুটো মুরগীর ডিম; আটটায় একসের দুধ, দশটায় পোলাও, মাছের কালিয়া এবং অন্যান্য তরকারী; বিকালে ভীম নাগের সন্দেশ, স্পঞ্জ রসগোল্লা এবং পাঁচ রকমের ফল; রাত্রে লুচি, মাংস এবং রাবড়ি। তিন দিনে বিড়াল একেবারে ফেঁপে উঠেছে। দেখে মনে হয়, আর পনেরো দিন পরে সে সুন্দরবনে গিয়ে তার বোনঝিদের দলে মিশে যাবে।

মলয়বাবু মিস্টার ডস্‌কে চিঠি লিখেছিলেন, 'একটা বেড়াল আমার বাড়িতে এসেছে। সে-ই 'ফুলটুসি' কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ফুলটুসির কোনো রঙীন ছবি থাকলে দয়া করে পাঠাবেন।'

সকালের ডাকে একখানা 'তৈলচিত্র' এসে পেঁছেছে। মলয়বাবু নিজে গিয়ে নানা রকমের রং কিনে এনেছেন। এদিকে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কাণ্ড দেখে একেবারে অসাড় হয়ে গেছে পাড়ার লোকে নানান কথা বলাবলি করছে। ছেলেদের মা লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন—কারণ তিনি ভাবলেন, শেষটায় সত্যি-সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল! তাঁর এক ভাই থাকেন দিল্লীতে। তাঁকে অবিলম্বে আসবার জন্য চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে। এ-বিপদে আত্মীয়স্বজনদেরও তো দরকার।

শনিবার দিন দুপুরবেলা একজন আর্টিস্ট্ এসে উপস্থিত হল, সঙ্গে তার তুলি টুলি নানা সরঞ্জাম। অনেক রাত পর্যন্ত দুয়ার বন্ধ করে দুজনে মেনি বিড়ালটাকে নিয়ে কি সব হল। রবিবার সকাল হতেই তাকে একটা লাল কাপড় ঘেরা খাঁচায় পুরে মলয়বাবু বেরিয়ে পড়লেন।

মিষ্টার ডসের বাড়ি পেঁছে দেখেন, সে এক রাজসূয় যজ্ঞ। বাড়ির সামনের মাঠটায় প্রায় দু'শ' বিড়াল জড় হয়েছে। প্রত্যেকের গলায় দড়ি বাঁধা, সঙ্গে লোক রয়েছে—সেও প্রায় আড়াইশ'। একজন সরকার বসে মস্ত একটা খাতায় বিড়ালের নাম-ধাম-বিবরণ সব লিখে নিচ্ছেন এবং একটা করে নম্বর দেওয়া টিকেট দিচ্ছেন। ঠিক আটটার সময় টিকেটের নম্বর ধরে-ধরে ডাক পড়ল। সামনের হলঘরে মিস্ লীলি একটি একটি করে পরীক্ষা করছে। অনেকে ঘরের দুয়ার থেকেই ফিরে আসছে, তাদের বিড়াল মোটেই ফুলটুসির মতো নয়। তারপর এল মলয়বাবুর পালা। একজন চাকর হাঁক দিল, '১৮৩ নম্বর তুঙ্গভদ্রা হাজির?' (বিড়ালের নাম জিজ্ঞেস করলে মলয়বাবু আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে দিয়েছেন 'তুঙ্গভদ্রা'।)

মিস লীলি খাঁচার ঢাকা খুলতেই তার মুখখানা একেবারে খুশিতে ভরে গেল। এই তো ফুলটুসি। খাঁচাসুদ্ধ উপরে চলে গেল। মলয়বাবু একশ টাকার একটা চেক্ পকেটে করে বাড়ি ফিরলেন।

মলয়বাবুর বাড়িতে আজ মস্তবড় ভোজ। বাজারের কোনো ভাল জিনিসটাই বাদ যায় নি,…মায় চানাচুর পর্যন্ত। জন দশেক বন্ধুবান্ধবের নেমন্তন্ন হয়েছে। ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষ্যে যার যা' ইচ্ছে পেয়ে গেছে। বড় মেয়ে নিয়েছে জংলা শাড়ী, মেজ মেয়ে কুকুরের বাচ্চা, সেজ রাগ করে কিছু চায় নি। মলয়বাবু তাকে খুশি করবার চেষ্টায় আছেন। তার জন্যই তো সব। ছেলেরা কেউ ফাউণ্টেন পেন, ঘড়ি, কেউ লাট্টু—মলয়বাবু সবাইকেই খুশি করে দিলেন।

বেলা প্রায় এগারোটা। খাবার-দাবার সমস্ত তৈরি। পাতা দেওয়া হয়েছে। ডাক পড়বে, এমন সময় বৈঠকখানায় এক পুলিশ কর্মচারী এসে হাজির। সঙ্গে মিষ্টার ডসের সেই সরকার।

দারোগাটি ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই মলয়বাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার নামে তিনটি বড় বড় অভিযোগ আছে।'

মলয়বাবু চমকে উঠলেন, 'কিসের অভিযোগ ?'

দারোগা একটা কাগজ দেখে বলে যেতে লাগলেন, 'এক নম্বর, মিণ্টার ডসের কন্যা মিস্ লীলির ফ্লুটর্সি বিড়াল নিরুদ্দেশ হবার পর তিনি কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আপনি তার উত্তরে একটা মিথ্যা বিড়ালকে রং করে ফ্লুটর্সি বলে চালিয়েছেন।

দু' নম্বর, আপনার বিড়ালের রং লেগে লীলির দামী শাড়ী নষ্ট হয়েছে।

তিন নম্বর, আপনার বিড়ালকে ফ্লুটর্সি মনে করে আদর করতে গেলে, সে মিস্ লীলির গালে তিনটে নখ বসিয়ে দিয়েছে ; সেজন্যে তিনবার ডাক্তার মৃগেন মিত্তিরকে কল্ দিতে হয়েছিল। এই তিনটি অপরাধের জন্যে আইনের অনেকগুলো বড়-বড় ধারা আপনার মাথায় ঝুলছে। আপনি··'

দারোগা তাঁর কথা শেষ করবার আগেই মলয়বাবু ধপাস্ করে মেঝের উপর বসে পড়লেন। জল, বরফ, পাখা ইত্যাদির জন্য হাঁক-ডাক পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হলে মলয়বাবুর মাথায় অন্যমতলব এল। বললেন, 'দেখুন আপনি এতক্ষণ যা কিছু বলে গেলেন তার কিছুই আমি বুঝতে পারি নি, এ সব যে আমার দ্বারা হয়েছে তার সাক্ষী আছে ?'

'আছে বৈকি। আমরা পুলিশের লোক, কাচা কাজ করি না। সাক্ষী সঙ্গেই আছে।' বলে, বাইরে থেকে একটা খাঁচা এনে তার ঢাকনি খুলে দিলেন। রংকরা তুঙ্গভদ্রা দর্শন দিলেন, শাদায়-কালোয় একাকার।

মলয়বাবু তখনও হটবার পাত্র নন, বললেন, 'কিন্তু এ তো আমার বেড়াল নয়।'

দরজার আড়াল থেকে আন্নাকালী বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি চিনতে পাচ্ছ না, এই তো আমাদের মেনি, কে রং মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে দিয়েছে।' বলেই ঘরে ঢুকে বিড়ালটাকে নিয়ে চলে গেল।

মলয়বাবু সেদিকে এমন করে তাকিয়ে রইলেন যে, দুর্বাসা ঋষি শাপ দেবার সময়ে অমন করে তাকাতেন না।

বাঁচবার আর কোনো রাস্তাই রইল না। মোকদ্দমা এড়াবার উপায়ও নেই, আর মোকদ্দমা শুরু হলে জেল নিশ্চয়, কেননা ওদিকে ব্যারিস্টার স্বয়ং। কাজেই ধড়পাকড় চলল। অনেক কান্নাকাটির পর ও-পক্ষ নরম হলেন। স্থির হল, চেক্-খানা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং শাড়ী, টিনচার, আইডিন, ডাক্তার ইত্যাদির বাবদ আর দু-শ' টাকা।

নগদ দু-শ' টাকা ঘর থেকে দিয়ে মলয়বাবু অতি কষ্টে গোটা তিনেক আইনের ধাক্কা কোনো রকমে সামলে এক রকম জেলের মুখ থেকে ফিরে এলেন। বিড়ালটাকে সেইদিনই প্যাক করে রেলভাড়া দিয়ে একেবারে বর্ধমানে ছেড়ে দিয়ে এলেন। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, 'সাত বছরের মেয়ের জন্য এক মাসের মধ্যে যে কোনো পাত্র চাই, তার বাড়ি হবে বর্মা কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।'

এ ব্যবস্থা আন্নাকালীর জন্য, যদিও তার বড় দু' বোনের বিয়ে হয় নি।

টেলিফোনের কবলে

খুকুমণির একটিমাত্র দাঁত। তার চোটে সবাই অস্থির। সামনে যা-কিছু পড়বে, ঐ খুদে দাঁতটুকু থেকে কারো নিস্তার নেই। ধূর্জটি ঘোষের ছেলে কমলের অবস্থাও ঠিক তার মতন। বাড়িতে টেলিফোন এসেছে। আর যায় কোথায়? চেনা, আধচেনা কিংবা মুখচেনা—টেলিফোনের নাগালের মধ্যে পড়েছ কি আর রক্ষা নেই? দিনে সতেরোবার কমলের ক্রিং-ক্রিং কান ঝালাপালা না করে ছাড়বে না। যাদের বাড়িতে ফোন নেই, তাদেরও কি বাঁচবার পথ আছে? পাশের বাড়িতে কিংবা কাছাকাছি কোনো দোকানে ক্রিং বেজে উঠল ঃ

'কাকে চাই?'

'বাদলকে একটু ডেকে দিতে পারেন?'

'কে বাদল?'

'আপনাদের পাড়ায় তেত্রিশ নম্বর বাড়িতে থাকে। বলবেন, কমল ডাকছে।'

গরমের ছুটি চলছে। ইস্কুল বন্ধ। বেলা দশটায় বাবা বেরিয়ে যান কোর্টে। কমলও সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে তৈরী। তারপর সারা দুপুর বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে চলতে থাকে টেলিফোন। মা থাকেন ওপরে, এসব খবর রাখেন না। তাছাড়া দুপুর রোদে টো-টো না ঘুরে ছেলে যে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িতে বসে আছে, এতেই তিনি খুশি।

এদিকে ক্রমাগত 'রিং' খেয়ে নিজের লোক আর বন্ধু-বান্ধবরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আজকাল তারা আর সাড়া দেয় না। পিসীমা এমন খেঁকিয়ে উঠেছিলেন যে, কমলের মনে হল, তার কানের পর্দাটাই বুঝি ফেটে গেল। সেজমামা ধমকে দিয়েছিল, দাঁড়াও তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি। কমল তাই বিরক্ত হয়ে চেনা মহল ছেড়ে দেওয়া স্থির কবল। এবাব তার ফোনের পাল্লায় পড়ে গেল গোটা কলকাতা শহর। গাইড দেখে বেছে-বেছে যাকে খুশি ডাকে, কখনো কোনো বড় দোকান বা কোনো বড় আফিস, কিংবা কোনো নামজাদা বড়লোক। কেউ ভদ্র-ভাবে সাড়া দেয়, দু-মিনিট হয়তো একটু গল্পও করে, কেউ বা রেগে-মেগে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দেয়। কারো গলাটা ভারী মিঠি, কেউ বা আবার কথা বলে যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে। সে এক বিচিত্র জগৎ। সমস্ত দুপুর সে তন্ময় হয়ে থাকে, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে তারের জালে ঘেরা টেলিফোনের রহস্য-লোকে।

'হ্যালো!'

'আপনি কি ঝট্পটিলাল খট্মট্ওয়ালা?'

'জী। আপ কাঁহাসে বোল্তে হেঁ?'

কমল গলাটা যদ্দুর সম্ভব গম্ভীর করে বলে, 'আমি প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ কথা বলছি।'

'প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ ! সেলাম হুজুর ! বোলিয়ে ক্যা হুকুম ?'

'দেখুন, আপনাদের কাছে ভালো বেনারসী শাড়ি হবে তো ?'

'জরুর হোবে। আপনি কোতো চান ?'

'বেশী নয়, খান-পঞ্চাশেক শাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনি দিচ্ছি।'

'না, না, এখনি নয়। বিকেলের দিকে পাঠালেই চলবে।'

'বহুৎ আচ্ছা। আপনার ঠিকানাটা যদি মেহেরবানি কোরে ··

কমল ঠিকানাটা জানিয়ে দিল।

সেদিন বিকেলে ভালো খেলা ছিল মাঠে। কিন্তু খট্‌মট্‌ওয়ালার লোক তার বেনারসীর বোঝা নিয়ে কি রকম নাকালটা হয় দেখবার জন্য খেলার লোভও ছাড়তে হল। চারটে বেজে পঞ্চান্ন। ধূর্জটিবাবু আফিস থেকে ফিরেই আবার একদল মক্কেল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, এমন সময় একখানা জমকালো মোটর এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। নামলেন একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। সঙ্গে বিশাল এক কাপড়ের বাণ্ডিল। ঘরে ঢুকে রাম-রাম জানিয়ে বললেন, 'প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ আছেন কি ?'

ধূর্জটিবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, 'প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ ! সে আবার কে ? আপনি বাড়ি ভুল করেছেন।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বললেন, 'জী নেহি। নম্বর হামি সাথ-সাথ নোট কোরে লিয়েছি। ভুল হামি কঁরি নাই।'

ধূর্জটিবাবু রুক্ষভাবে বললেন, 'দেখুন বাজে তর্ক করবার সময় আমার নেই। এটা আমার বাড়ি। কোনো প্রিন্স-ট্রিন্স এখানে থাকে না। দয়া করে এবার আসুন, নমস্কার।'

'আপনি কোণ্টো কোবে একটু খবর লিয়ে দেখুন। প্রিন্স পঁচাশ জোড়া বেনারসীর অর্ডার দিলেন। ঘুরে গেলে বড্ডো গোসা হোবেন। হামিও—'

আঃ, লোকটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে দেখছি। একশোবার বলছি এটা আমার বাড়ি। আমি ধূর্জটি ঘোষ, ওকালতি করে খাই। আমার চোদ্দ-পুরুষে কেউ প্রিন্স নেই।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বললেন, 'লেকিন···'

'আবার লেকিন ! আপনি যাবেন কিনা, জানতে চাই ?'

দু-চারজন মক্কেলও বোঝাতে চেষ্টা করল, মাড়োয়ারিবাবুর নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। টেলিফোনে বাড়ির নম্বর এবং রাস্তার নাম হয়তো তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি ! কিন্তু মাড়োয়ারি নাছোড়বান্দা। জোরের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, 'পঁচিশ বছর টেলিফোন নিয়েই হামার কারবার। ভুল হামার হতেই পারে না বাবুজি। সময়ের দাম হামারভি আছে। গাড়ি-ভাড়া অর মুটে-খরচ নেহি লেকে হামি কিছুতেই নড়বে না। হামার মনিব বড়বাজারের খট্‌মট্‌ওয়ালা, বহুত বড়া কারবারী। লাখো টাকার মালিক, এরকম উকিল দু-চার ডজন তাঁদের গদিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।'

ধূর্জটিবাবু রুখে এলেন আস্তিন গুটিয়ে। মাড়োয়ারিও পিছপা নয়। মক্কেলরা মাঝখানে পড়ে হাতাহাতিটা আর হতে দিল না। কোনো রকমে ঠেলেঠুলে মাড়োয়ারিকে গাড়িতে তুলে রওয়ানা করে দিল। সে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেল, 'আচ্ছা, হাম্ ভি দেখ লেঙ্গে।'

রোখারুখি দেখে কমল প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ মজাই লাগল। টেলিফোনটা মুখে তুলে দুটি মাত্র কথা। তার থেকে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড!

কমলদের বাড়ির ঠিক সামনে, রাস্তার ওপারে থাকতেন এক জমিদার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি, তার সঙ্গে ফলের বাগান। ভদ্রলোকের থাকবার মধ্যে আছেন তাঁর স্ত্রী আর এক ভাগ্নে।

হাড় কঞ্জুস। সারাদিন যক্ষের মতো বসে আছেন বাইরের ঘরে। পাড়ার কোনো ছেলে গেটের ভিতর পা দিয়েছে কি দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করেন। অথচ অমন গাছ-ভর্তি আম, ডাল-ভেঙেপড়া লিচু আর জামরুল। এসব দেখে ঠিক থাকাই বা যায় কেমন করে? সেদিন একটা সুখবর পাওরা গেল, বুড়োর নাকি অসুখ।

দুপুরবেলা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাসনওয়ালা কাঁসর বাজিয়ে চলে গেল। কমল আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হয়ে গেটটা আলগোছে টপ্কে বাগানে ঢুকে পড়ল। মালিটারও দেখা নেই। বোধহয় ঘুমুচ্ছে। সামনেই একটা ছোট লিচু গাছ, সহজেই ওঠা যায়। টপাটপ কয়েকটা পাকা লিচু মুখে পুরে দিতেই কমলের প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর দু-পকেট ভর্তি করে যেমান নেমেছে, ব্যস! একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জমিদার বুড়ো।

'কে হে তুমি, চাঁদ?'

কমল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদারবাবু এগিয়ে এসে চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরে বললেন, 'ওঃ, ঘোষেদের ঐ বাঁদর-ছোঁড়াটা? বাবা অত বড় উকিল, আর ছেলে হল চোর! বিশ্বকর্মার ব্যাটা চামচিকে। কান ধর্…ধর্ কান্ বলছি!'

কমল দু'পকেট থেকে লিচুগুলো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগে অপমানে তার দু-চোখ ফেটে বেরিয়ে এল কান্না।

পরদিন দুপুরবেলা টেলিফোন বেজে উঠল এক ডাক্তারের ক্লিনিকে।

'হ্যালো!'

'ডাক্তার সান্যাল আছেন কি?'

'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

কমল অনুনয়ের সুরে বললে, 'দেখুন, আমার মামার বড্ড অসুখ। আপনাকে এখখুনি আসতে হবে, ডাক্তারবাবু।'

'কী অসুখ?'

'তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথার অসুখ বলে মনে হচ্ছে।'

'মাথার অসুখ!'

'হ্যাঁ। যাকে দেখছেন, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাড়া করছেন। বাড়িতে আমি আর মাসীমা ছাড়া কেউ নেই। আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি।'

'আপনার নাম আর ঠিকানা?'

কমল জমিদারবাবুর বাড়ির ঠিকানা আর তাঁর ভাগনের নাম বলে দিল।

জমিদার ঘনশ্যাম রায় তাঁর বৈঠকখানার পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ও-পাশের ঘরে তাঁর ভাগনে কী একটা করছিল! ডাক্তারের গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামল। ডক্টর সান্যাল নেমে এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলল ঘনশ্যামের ভাগনে।

'যতীনবাবু আছেন?'

'আমারই নাম যতীন।'

'ওঃ আপনিই বুঝি ফোন করেছিলেন? মামা কেমন আছেন?'

'মামা!'

'যাঁর মাথার অসুখ। তিনি আপনার মামা নন?'

যতীন মুখচোরা লোক। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে জবাব দিতে পারল না।

কথাটা ঘনশ্যামের কানে গেল। তিনি এ-ঘরে এসে কড়া মেজাজে বললেন, 'কে আপনি?'

'আমি ডাক্তার।'

'এখানে কী দরকার?'

ডাক্তার সান্যাল বুঝলেন, ইনিই তাঁর রুগী। মাথার গোলমাল, চটালে চলবে না। ঠাণ্ডাভাবে মোলায়েম করে বললেন, 'আমি আপনার কাছেই এসেছি। এখন কেমন আছেন বলুন তো?'

'থাক, অতটা দরদ না দেখালেও চলবে। যান এবার, মানে-মানে সরে পড়ুন।'

ডাক্তার সান্যাল যতীনের দিকে চেয়ে বললেন, 'বাড়িতে চাকর-বাকর আছে তো? একটু ধরতে হবে যে।'

ঘনশ্যাম গর্জে উঠলেন, 'কী, ধরতে হবে আমাকে? কী মতলব তোমার? যতীন, পুলিসে খবর দে। লোকটি মনে হচ্ছে ডাকাত।'

ঠিক এমনি সময় একখানা অ্যাম্বুলেন্স এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'এটাই কি ২৫ নম্বর বাড়ি?'

যতীন বললে, 'হ্যাঁ।'

'যতীনবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, এখানে নাকি একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'অ্যাকসিডেণ্ট নয়, একটা মেণ্টাল কেস···মাথার ব্যাপার। যাক, এসে ভালোই হয়েছে। হাসপাতালেই নেওয়া দরকার।'

ঘনশ্যাম হঠাৎ ফেটে পড়লেন যতীনের উপর। গালে একচড় কসিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন, 'এসব হচ্ছে কী, উল্লুক?'

যতীন কেঁদে ফেলল। ডাক্তার সান্যাল অ্যাম্বুলেন্সওয়ালাদের কি একটা

ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিন-চারজনে মিলে ঘনশ্যামকে জাপটে ধরল এবং টেনে-হিঁচড়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে শুইয়ে দিল। জমিদারবাবু কেঁদে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে পাড়া মাথায় করে তুললেন। যতীনের মামীমা উপরের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। সোরগোল শুনে যখন বেরিয়ে এলেন, গাড়ি তখন স্টার্ট দিয়েছে।

ডাক্তার সান্যাল নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনি ভাববেন না মা, আপনার স্বামীর চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।'

অ্যাডভোকেট ধূর্জটি ঘোষ তাঁর কোর্ট আর মক্কেলের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। একমাত্র ছেলের পড়াশুনোর খবরদারি করবার সময় ছিল না। বদভ্যাস ছিল কমলের এক কাকার। তিনি ছিলেন গোবর্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। একদিকে একথালা রসগোল্লা আর একদিকে একখানা অঙ্কের প্রশ্নপত্র রেখে যদি তাঁকে বলা হত, কোন্‌টা চাই, তিনি ঐ প্রশ্নপত্রটা তুলে নিতেন। এহেন কাকাকে কমল প্রাণপণে এড়িয়ে চলত।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, কোথাও এবার বেড়াতে যাওয়া হল না। রবিবারের দুপুরটা বোটানিক্যালে ঘুরে এলে কেমন হয়। খেয়ে-দেয়ে কমল এই সম্বন্ধে একটা প্ল্যান করছিল। হঠাৎ কাকা হাঁক দিলেন, 'কমল, অ্যালজেব্রা নিয়ে এসো।'...তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা-চল্লিশেক শক্ত-শক্ত ইকোয়েশন, হার্ডার ফ্যাক্টর্স, আর আইডেনটিটিজ। কমল ঠিক করল, এর শোধ নিতে হবে।

এবারকার টেলিফোন ঝঙ্কার দিল থানায়।

'অফিসার-ইন-চার্জ কথা বলছি।'

'সর্বনাশ হয়েছে বড়বাবু, শীগগির পুলিস পাঠান!'

'কোথায়? কী ব্যাঙ্কের বললেন? কে আপনি?'

'আমি গোবর্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। এখনি সাহায্য চাই।'

সন্ধ্যাবেলা কাকা যখন ফিরলেন, তার মুখ দেখে চমকে উঠল সবাই! দারোয়ান বললে, 'কে কোত্থেকে উড়ো খবর দিয়েছে, ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। থানার বড় দারোগা এসে যাচ্ছেতাই করে বকে গেল ম্যানেজারবাবুকে। উনি কত করে বললেন, আমি কিছুই জানিনে, তা কে শোনে! যাবার সময় দারোগা শাসিয়ে গেল, পুলিশকে মিথ্যে হয়রাণ করার জন্যে মামলা করবে।'

কমলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ দারোগার উপর। আচ্ছা, সেও মজা দেখাতে জানে। একটা রাত আর কয়েক ঘণ্টার মামলা। তারপর বাবজী টের পাবেন কত ধানে কত চাল।

পরদিন বেলা এগারোটা।

'নাম্বার প্লিজ।'

'হ্যালো!'

'বড়বাবু আছেন?'

'তিনি তো কোর্টে গেছেন। আপনার কী দরকার?'

'ওঁকে এক্ষুনি খবর দিন যে ওঁর ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে। ভয়ানক

পাগলা কুকুর।'

ফোনের ওদিকটা আঁৎকে উঠল, 'কুকুরে কামড়েছে! কী সর্বনাশ! আপনি কে বলুন তো?'

'আমি ওঁদের পাড়ার লোক।

ফোন রেখে কমলের মনে হল, গলা যেন তার চেনা-চেনা। ঘন্টাখানেক পরে একখানা ট্যাক্সি এসে হাজির। ধূর্জটিবাবুর মুহুরী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাড়ি ঢুকল। পিছনে ওদের পুরনো ডাক্তার গজপতি সেন। কমল বাইরের ঘরেই ছিল। ডাক্তার সেন এগিয়ে এসে তার হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'কতক্ষণ আগে কামড়াল? কুকুরটা ক্ষ্যাপা না পোষা, লক্ষ্য করেছ?'

কমল অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

ডাক্তার তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বোকা ছেলে! পাগলা কুকুরের কামড় লুকোতে আছে কখনো? নিজে-নিজেই বুঝি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে?'

কমল বলল, 'কী সব বলছেন আপনি? এ তো কিছুর কামড় নয়। খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে কাঁটা-তারে কেটে গেছে খানিকটা।'

ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন, 'বেশ, তাই হল! এবার ওঠো দিকিনি। একটা জামা পরে নিয়ে চল আমার সঙ্গে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

মুহুরীর সঙ্গে মা নেমে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। 'কী সর্বনেশে ছেলে! মাগো! পাগলা কুকুরের কামড়। কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, দিব্যি চুপচাপ বসে আছে—দুটো ইনজেকশন দেবে এই ভয়ে।'

মুহুরী বলল, 'যা বলেছেন মা! ভাগ্যিস পাড়ার একটি ছেলে বুদ্ধি করে খবরটা দিলে, তাই! বাবু সবে কোর্টে গিয়ে মামলা ধরেছেন। জানাই কী করে? চুপ করেও তো থাকা যায় না। শেষটায় খবর দিতে হল। শুনে কোর্ট সুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবু বললেন, ট্যাক্সি নিয়ে ছোট, নিবারণ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়ে দেখ, ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা।'

মা কেঁদে ফেললেন, 'কী হবে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার সেন ভরসা দিলেন, 'না, ভয়ের কিছু নেই। এখখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

কমল বুঝল, প্রতিবাদ টিকবে না। নিজেকে ছেড়ে দিল ভাগ্যের হাতে। ভাগ্য বৈকি! নইলে সে চাইল, ওয়ান ও ফাইভ সেভেন, আর এক্সচেঞ্জ-ডেভিলটা দিয়ে বসল, ওয়ান ও নাইন সেভেন। একেবারে তার বাবার নম্বর! পাঁচের বদলে নয়···তার ফল যে এতখানি মারাত্মক হবে কে কবে ভাবতে পেরেছিল?

পাস্তুর ইনষ্টিটিউট। একটা উঁচু মতো বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল তাকে। কাঁটা-তারের খোঁচাটাকে ছুরি দিয়ে কেটে বাড়িয়ে দিল কচ্‌কচ্‌ করে। যেন শশা কাটছে! তার মধ্যে ঢেলে দিল কষ্টিক না কি-এক পৈশাচিক ওষুধ। কমলের চোখে দুনিয়ার সব আলো নিভে গেল দপ্‌ করে, বুক চিরে বেরিয়ে এল এমন এক বীভৎস চিৎকার, যার তুলনা মেলে শ্মশানের প্রেতগুলো যখন চেঁচায়। তারপর আর একটা জহ্লাদ এসে পেটের উপর ফুটিয়ে দিল প্যাঁট-প্যাঁট করে

দুটো ইনজেকশন। হেসে বলল, 'ভয় কী খোকা? এই তো সবে শুরু। এই রকম আঠাশটা দিতে হবে চৌদ্দ দিন ধরে।'

কমল শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একবার।

উকিলের চিঠি

দুটো জিনিসকে এককড়িবাবু প্রাণপণে এগিয়ে চলতেন—শুঁয়োপোকা আর উকিল। ১৩১৭ সালে শুঁয়োপোকার কামড় খেয়ে পুরো দুটি মাস পালা-জ্বরে ভুগেছিলেন। সেই অবধি বেরোতে হলেই পকেটে এককৌটা কয়লার গুঁড়ো নিতে কখনও ভোলেন না। মাধব কবরেজ বলেছেন, শুঁয়োপোকার কামড়ে কয়লা একেবারে ধন্বন্তরি।

উকিলের পাল্লায়ও একবার পড়েছিলেন, সেবার আদালতে 'সাক্ষী' দেবার সময়। লোকে বলে, জেরার চোটে তিনি কোর্টের মধ্যেই কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বাপের নামটাও মনে করতে পারেন নি। সে অনেক দিনের কথা। সম্প্রতি আবার এক উকিলের ফ্যাসাদে পড়েছেন।

এককড়িবাবুর বাড়িটা হচ্ছে একেবারে সদর রাস্তার ওপর। সেদিন বাজার থেকে এসেছিল বড়-বড় মর্তমান কলা। ছোট ছেলেটা তার দুটোকে কখন শেষ করেছে আর ধরা পড়বার ভয়ে খোসাটা ফেলেছে সামনের ফুটপাথে। সেখান দিয়ে এক মেমসাহেব যাচ্ছিলেন তাঁর খুর-ওয়ালা জুতো পরে। যেমনি কলার খোসায় পা দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তিন হাত ছিটকে গিয়ে চিৎপাত। গাড়ি-ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে পড়ল। এককড়ির বাড়ির ছাদ থেকে খানিকটা চুনবালিও খসে পড়ে গেল। একেবারে রৈ-রৈ কাণ্ড, হৈ-হৈ ব্যাপার! জন-দশেক মিলে মেমসাহেবকে কোনোরকমে টেনে তুলল। তিনি যদি বা সোজা হলেন, তাঁর কোমর রইল বেঁকে। একটা গাড়িও কী ছাই পাওয়া যায়? অনেক পরে টুনটুন করতে করতে এক রিক্‌শওয়ালা এসে হাজির। তাকে বলতে সে মেমসাহেবটিকে দু-একবার বেশ করে দেখল, তারপর বলল, 'আমি তো মোটর-লরি নই।' শেষটায় আর কী করা যায়, একটা মোষের গাড়ি ডেকে মেমসাহেবকে টেনে তোলা গেল।

পরদিন বেলা দশটায় এককড়িবাবুর নামে এক মস্ত বড় উকিলের চিঠিঃ 'এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, গত ১৩ই এপ্রিল বেলা দশ ঘটিকার সময় আপনার বাড়ির সামনে রাজপথের উপর যে কলার খোসা পড়িয়াছিল তাহাতে পা পিছলাইয়া আমার মক্কেল মিস্ ফেদার-ওয়েট ভূমিসাৎ হন এবং তাহার ফলে তাঁহার কোমরের হাড় বাঁকিয়া যায়। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, বাই-সনের দেহ হইতে হাড় কাটিয়া ঐ স্থানে জোড়া দিতে হবেই। উক্ত হাড়ের মূল্য পাঁচশত টাকা। অতএব আপনি অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে ঐ টাকা অত্র ঠিকানায় জমা দিবেন, নতুবা আপনাকে ফৌজদারি-সোপর্দ করা হইবেক।'

সর্বনাশ! এককড়ি একেবারে বসে পড়লেন। কোথায় পাবেন পাঁচশ' টাকা? এদিকে মোটে সাত দিন সময়। তারপর আবার আদালত, আবার উকিলের

জেরা। তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল, শরীর আধখানা হয়ে গেল, কিন্তু কূল-কিনারা কিছুই পাওয়া গেল না।

সাত দিন কেটে যেতেই তিনি একেবারে বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। সারাদিন সদর-দরজা বন্ধ, লোকজন ডেকে পায় না। এককড়ির ছিল গুড়ের ব্যবসা, সেটা একেবারে অচল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নী বেজায় চঞ্চল হলেন, কিন্তু এককড়ি একেবারে নিশ্চল।

সেদিন দুপুর বেলা এককড়ি বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন ; সদরে কে কড়া নাড়ল। ছোট ছেলে লিটু এসে খুলতেই দেখে আদালতের এক পেয়াদা, পিতলের চাপরাসটা চকচক করছে।

'এককড়িবাবু আছেন ?'

এককড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে একবার তাকিয়েই একেবারে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেল।

পেয়াদা হাঁকছে, 'আপনার নাম এককড়ি ঘোষ ?'

এককড়ি ঘুমে একেবারে অচেতন।

'ও মশাই, শুনছেন ? আপনি এককড়ি ঘোষ, পিং মৃত পীতাম্বর ঘোষ ?'

এককড়ির নাক এত জোরে ডাকতে লাগল যে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল।

পেয়াদাও নাছোড়বান্দা। বাইরে রোয়াকে চেপে বসল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, লিটু এসে ডাকল, 'বাবা, ও বাবা, তুমি আজ উঠবে না ?'

এককড়ি মাথা তুলে চুপিচুপি বললেন, 'পেয়াদাটা গেছে ?'

বাইরে থেকে সাড়া এল, 'আজ্ঞে না, যাই নি। আপনিই তো এককড়ি ঘোষ ?'

এককড়ি চারদিক তাকিয়ে দেখলেন, আর একবার শুয়ে নাক-ডাকানো সম্ভব নয়। গম্ভীরভাবে বললেন, 'না।'

'তবে আপনার নাম ?'

'মোহিনী কাঞ্জিলাল।'

'পিতার নাম ?'

'পীতাম্বর ঘোষ।'

পেয়াদা হেসে উঠল, 'সে কী মশাই, নাম লুকোচ্ছেন কেন ? আপনার নামে একটা নোটিস…'

এককড়ি একেবারে 'মরিয়া' হয়ে উঠলেন। রেগে, চেঁচিয়ে, রুখে, হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, 'কী রকম লোক হে তুমি ? বলছি আমি এককড়ি নই, তবু 'নোটিস' 'নোটিস' করছ। এককড়ি আমি নই, কখনো ছিলাম না, কোনো কালে হব না। আমার চোদ্দ পুরুষে এককড়ি নেই, উইল করে যাব, যাতে পরের চোদ্দ পুরুষেও কেউ না থাকে। এর ওপর আর একটি কথা বলেছ তো—' বলে, একটা মস্তবড় টেবিল তুলে তাড়া করলেন।

এককড়ির বাড়ির সদর দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। উপরে নীচে

সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ ! রাতের বেলাতে আলো-জ্বালা বারণ। ছোট মেয়েটার বয়স বছরখানেক। এককড়ি গিন্নীকে শাসিয়ে দিয়েছেন, 'কখনও যদি এতটুকু কান্না শুনতে পাই, একেবারে গলা টিপে সাবাড় করব।'

দিন দুই পরে বাড়ির সুমুখে লোকের সাড়া পেয়ে দোতলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এককড়ি যা দেখলেন, একেবারে চক্ষুস্থির ! সেই পেয়াদাটা আছে, সঙ্গে আরো গোটা দুই, আর একটা বাবু—সম্ভবত নাজির-টাজির হবে। তালা বন্ধ দেখে বোধ হয় চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন মূর্তিমান জামাতা বাবাজী।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করল, 'এ কার বাড়ি মশাই ?'

জামাই বললে, 'এককড়ি ঘোষের।'

'তালা বন্ধ কেন ?'

'কী জানি ! বোধ হয় বেড়াতে-টেড়াতে গেছে। আচ্ছা, আমি দেখছি।' বলে. 'লিটু, ও লিটু !' করে ডাকতে লাগল।

লিটু এককড়িব ছোট ছেলে, নীচেই কোথাও ছিল, ছুটে এল। গিন্নীও জামাই-এর গলা পেয়ে জানলা খুললেন। দরজা খোলা হলে, জামাই-এর সঙ্গে অন্য সবাই ঢুকে পড়ল। জামাই উপরে আসতেই শ্বশুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'দুটো দিন আর বাবাজীর সবুর সইল না ?'

অতএব নীচে নামতেই হল। আদালতের বাবুটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এককড়ি ঘোষ ?'

'না।'

'আপনার নাম ?'

'আমার নাম নেই।'

'দেখুন. আপনি আমাদের অনেক ভুগিয়েছেন, আমাদের পেয়াদাকে টেবিল নিয়ে তাড়া করেছেন। এখনও যদি ঠিকঠিক জবাব না দেন, আপনাকে আদালতে যেতে হবে।'

আদালতের নামে এককড়ির বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু সেদিনকার সে নামটা যে ছাই মনেও নেই ! খানিক ভেবে বললেন, 'আমার নাম ননীগোপাল চাকলাদার।'

সেই পেয়াদাটা সঙ্গেই ছিল। হেসে বললে, 'আপনার নাম বুঝি রোজই একটা করে গজায় ? মোহিনী থেকে ননী, আর কাঙ্গালীলাল থেকে চাকলাদার।'

এককড়ি রেগে বললেন, 'দুটো নাম কী কারুর থাকতে নেই ? আমার দুটো নাম—একটা বাবার দেওয়া, একটা মা'র।'

আদালতের বাবুটি বললেন, 'তা হলে আপনি এককড়ি ঘোষ নন ?'

'কতবার বলব মশাই ? এককড়ি, দু-কড়ি, সাতকড়ি, ন-কড়ি তো দূরের কথা, আমি হাজারকড়ি, লাখকড়িও নই।'

এমন সময় 'এককড়ি আছ হে ?' বলতে বলতে একটি ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন। তিনি এককড়ির বিশেষ বন্ধু মহীতোষবাবু, অনেক দিন পরে দেখা।

'কী হে এককড়ি, ব্যাপার কী ? এরা সব কারা ?'

এককড়ির এবার একেবারে ভরাডুবি। তবু ডুববার সময় যেমন লোকে একগাছা ঘাসকেও আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে বললেন, 'আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ! আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, আমি এককড়ি নই।'

'বল কী হে ? তোমায় ভুল করব ? তুমি আমাদের সেই এককড়ি, দশ বচ্ছরে একটুও বদলাও নি। ঠিক সেই শুষ্কং কাষ্ঠম্…'

আদালতের বাবুটি বললেন, 'যাক, আমার আর সময় নেই। আপনি তা হলে এককড়ি ঘোষ নন ?'

'না।'

'তা হলে উঠতে হল।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানতে পারি ?'

বাবুটি বললেন, 'সে আর বলবেন না মশাই। কী বিপদেই পড়েছি ? ব্যাপারটা অতি সোজা। মহিমচন্দ্র ঘোষ বলে একটা লোক হাজার দশেক টাকা রেখে হঠাৎ মারা গেছে। উইলে রয়েছে, তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হচ্ছে এককড়ি ঘোষ, পিং মৃত পীতাম্বর ঘোষ, সাকিন—নং কুঞ্জ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা। সেই নোটিসটা জারি করার জন্য আজ একমাস হাঁটাহাঁটি চলছে। দু-দুবার ইনি আমার পেয়াদাকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন, একবার টেবিল নিয়ে তাড়া করেছেন। অথচ সবই মিলছে, গোলমাল শুধু আসল জায়গায়, এককড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাক, এবার রিপোর্ট দিলাম, 'অনেক অনুসন্ধানে জানা গেল, এককড়ি বলিয়া কোনো ব্যক্তি উক্ত ঠিকানায় নাই।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'টাকাটার কী হবে ?'

'সরকারী ফাণ্ডে জমা হয়ে যাবে।'

সবাই উঠে পড়ল। আর দেরি করা চলে না। এককড়ির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ। তিনি এমনি করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে বসলেন ?

এককড়ি বাবুটির দুহাত জড়িয়ে ধরে একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'দোহাই মশাই, সর্বনাশ করবেন না, আমিই এককড়ি ঘোষ ! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, সাতাশ মণ গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। দোহাই আপনার, আমি বুঝতে পারি নি, মনে করেছিলাম সেই মেমসাহেবটা…'

আদালতের বাবুটি হেঁকে উঠলেন, 'সে কী মশাই, হাজার-বার বললেন আপনি এককড়ি নন, এখন টাকার কথা শুনেই বুঝি এককড়ি হয়ে গেলেন। আপনাকে ফৌজদারী সোপর্দ করব, সাত বছর জেল হয়ে যাবে।'

এককড়ির কান্না বেড়ে গেল। মহীতোষকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মহীতোষ ভাই, তুমি একবার বলো !'

মহীতোষ বললেন, 'সর্বনাশ ! সরকারী রিপোর্টে যখন প্রমাণ হয়ে গেল তুমি এককড়ি নও, তখন তোমাকে এককড়ি বলে আমি জেল খাটব ?'

সবাই চলে গেল। এককড়ি দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

সেদিন দশটা তখনও বাজে নি। আদালতের সামনেটায় ভয়ানক ভিড়। অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে দেখলাম, একটা কাণ্ড বটে! এককড়ি জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছেন, পিছনে একহাত ঘোমটা মাথায় তাঁর স্ত্রী, আর তাঁর পিছনে সারি-সারি তিন ছেলে, জিটু, লিটু, সিটু আর তিন মেয়ে, আলোক বাসিনী, দ্যুলোক-বাসিনী, আর ভূলোক-বাসিনী ; তারপর দুটো গোরু, একটা কুকুর আর পাঁচ-ছটা বাচ্চা সমেত একটা বেড়াল।

এককড়ি চিৎকার করে বলছেন, 'দোহাই হুজুর, আমিই এককড়ি ঘোষ। আর পেছনে আমার পরিবার বর্গ। আমিই যে এককড়ি এবং এখনো জীবিত তার প্রমাণ, এই আমার স্ত্রীর হাতে নোয়া, আমার ছেলেরা আর মেয়েরা আমাকেই 'বাবা' বলে ডাকে, কুকুরটা আমাকে দেখেই ল্যাজ নাড়ে, বেড়ালগুলো 'মিউ-মিউ' করে মুখের দিকে তাকায়। হুজুর স্বচক্ষে দেখুন।'

শেষটায় হাকিমের মনে দয়া হল। প্রমাণ যথেষ্ট মনে করে মহিম ঘোষের সম্পত্তি এককড়িকে দেবার হুকুম দিলেন।

খবর পাওয়া গিয়েছে, এককড়ি সেইদিনই মিস ফেদার-ওয়েটের বাড়ি সন্ধান করে তার টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোমরের হাড় এখনও সোজা হয় নি।

সোনার ঘড়ি

রামবাবু বড়ই বিপদে পড়েছেন। বড় মেয়ে মলিনার বিয়েতে জামাইকে যে ঘড়িটি দিয়েছিলেন, বাবাজী সেটা পছন্দ করেন নি। ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন। একটি ভালো সোনার রিস্ট-ওয়াচ চাই, তার সঙ্গে সোনার ব্যাণ্ড। জামাইটি রেলে চাকরি করেন, একটা সোনার ঘড়ি না হলে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাতেই পারছেন না।

সে তো সত্যি কথা! কিন্তু ঘড়ি কিনবার টাকা কোথায়? এদিকে রামবাবুর অফিসের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, চাকরিটি থাকে কিনা বলা যায় না। বড় সাহেব রীতিমতো ক্ষেপে গেছেন। আরদালি বলছিল, কাল রাত দুটোর সময়ে সাহেব নাকি একটা ঢিলে পায়জামা পরে ক্রমাগত ছাদের উপর ডিগবাজি খেয়েছেন।

খাবার কথাই। অতগুলো টাকার শোক! ঘটনাটা তো সোজা নয়। সাহেব বুনো ওলের ব্যবসা করে বেশ গুছিয়ে নিয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নৌকা দু-হাজার মণ ওল সমেত পদ্মায় ডুবে গেছে। ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হলে কথা ছিল কিন্তু তা হল না। পদ্মার জল খেয়ে সাতখানা গাঁয়ের লোক গলা ফুলে মারা যায় আর কী। শেষটায় ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েছেন দশ দিনের মধ্যে দু-হাজার মণ বাঘা তেঁতুল পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিতে হবে, তা না হলে সাহেবের নিস্তার নেই। মাদ্রাজের গ্রামে গ্রামে লোক পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এখনও পাঁচশ' মণের বেশী যোগাড় হয় নি। রামবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, কেননা, তেঁতুল যোগাবার ভার পড়েছে তাঁরই উপর।

তাই বলছিলাম, রামবাবু বড়ই বিপদে পড়েছেন। কাউকে অবহেলা করবার উপায় নেই—যেমন সাহেব, তেমনি জামাই। যেমন বাঘা তেঁতুল, তেমনি সোনার ঘড়ি। ভাবতে ভাবতেই ক'দিন চলে গেল। তারপরই মলিনার এক চিঠি। মেয়ে অনেক দুঃখ করে লিখেছে যে, ঘড়ির জন্য তাকে বেশ দু'কথা শুনতে হচ্ছে। কাজেই রামবাবু কিছু টাকা ধার করে ঘড়িটা কিনে ফেললেন। আর দেরি করা উচিত নয়। স্থির হল, ওটা নিজে গিয়েই দিয়ে আসবেন। মেয়েটিকে অনেক দিন চোখে দেখেন নি। জল-ভরা চোখের উপর ঘোমটা টেনে কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়ার গাড়ির কোণটিতে গিয়ে বসল—মলিনার সেই বিদায় বেলাকার মলিন মুখখানি যেন চোখের মধ্যে ভরে আছে। দেখতে দেখতে ছ'টা মাস চলে গেল।

অফিসে ছুটির কথা জানাতেই সাহেব ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে তাড়া করলেন। তাই অগত্যা বড় ছেলে মণীশের উপর ভার পড়ল ঘড়িটা পৌঁছে দেবার। মণীশের মা আপত্তি করেছিলেন, ছেলে যদিও এবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই, এবং কোনো কালে হবে বলেও ভরসা নেই ; একেবারেই পাগল ! ওর হাত দিয়ে অত বড় দামী জিনিসটা পাঠানো—পথে-ঘাটে, একেবারেই কাজের কথা নয়।

মণীশ তো শুনে একেবারে আগুন। বললে, 'তোমরা কী যে বল তার ঠিক নেই। একটা ঘড়ি নিয়ে যেতে পারব না, আমি কী খোকা নাকি ? সেদিন আমাদের ক্লাসের নটেন তার মাকে নিয়ে কাশী চলে গেল, আর আমি এখান থেকে এখানে বহরমপুর যেতে পারব না ?'

ছেলে যাই বলুক, তার বুদ্ধির উপর রামবাবুরও যে বিশেষ ভরসা ছিল তা নয়। কিন্তু অন্য কোনো উপায় নেই বলেই রাজী হলেন। তা ছাড়া মলিনার বিয়ের সময়ে মণীশ পরীক্ষা নিয়ে কলকাতার বাসায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল, দেশে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে পার নি। জামাইবাবুর সঙ্গেও দেখাশুনা হয় নি ; এই উপলক্ষ্যে আলাপ-সালাপও হবে। ঠিক হল, পরশু ভালো দিন আছে, সেদিনই যাওয়া হবে।

এই দুটো দিন মণীশ যেন হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে লাগল। উৎসাহের উত্তেজনায় তার সমস্ত রাত ঘুমই হয় না। যে সে কথা নয়! জীবনে প্রথম সে রেল-গাড়ি চড়ে অনেক দূর যাবে ; কারও সঙ্গে নয়, একা···একেবারে একা। উঠতে বসতে কারও ধমক শুনতে হবে না। 'ওখানে যেও না, ওখানে শুয়ো না' বলে কেউ তাড়া করবে না। যা খুশি করবে, যেখানে খুশি বসবে, দাঁড়াবে। মাথার উপর কেউ নেই, সে একা। মণীশের সমস্ত মনপ্রাণ প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াতে লাগল।

রামবাবু নিজে গিয়ে টিকিট কিনে ছেলেকে শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিলেন। অনেক বার করে বললেন, 'জানলা দিয়ে মুখ বাড়িও না, গাড়ি একদম না থামলে কক্ষণো নেমো না, ইস্টিশনের খাবার খেয়ো না' ইত্যাদি ! রানাঘাটে গাড়ি বদলে ওভার ব্রীজের উপর দিয়ে ওপারে গিয়ে আবার গাড়িতে

উঠতে হবে, সেটাও ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন।

গাড়ি ছাড়তেই মণীশ ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে হাতে পরে নিল। যদিও সময় দেখবার দরকার ছিল না, তবু দু-চার মিনিট অন্তর কেবলই হাতটা ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখতে লাগল, যেন এখনই তার ভয়ানক জরুরি কাজ আছে। পাশের একটি ভদ্রলোক বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন, 'ক'টা বেজেছে খোকা ?'

মণীশের বুকখানা যেন দশ হাত ফুলে উঠল। সে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, 'আটটা তেরো।'

একটা বড় স্টেশনে গাড়ি ঢুকতেই মণীশ পড়ল, রানাঘাট! ছোট পুঁটুলিটা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। ওপারের প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। মণীশ একটি ই. বি. আর. মার্কা সাদা পোষাক-পরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কোথাকার গাড়ি স্যার ?'

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'থার্টিন আপ।'

মণীশ বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল। 'থার্টিন আপ'। অর্থাৎ 'তেরো উপরে' মানে যে কী সেটা আর একেবারেই মাথায় ঢুকল না। আর একটি ভদ্রলোকের কাছে সে জেনে নিল যে তার গাড়ির এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। এতক্ষণ কে বসে থাকে ? একবার ঘুরে আসা যায় না ? মণীশ দেখল, অনেকে গেটে টিকিট দেখিয়ে বাইরে যাচ্ছে। সেও তার বাইরের পকেটে মনিব্যাগের ভিতর থেকে টিকিট বার করে দেখাল।

ইস্টিশনের কাছেই একটা জায়গায় গোল হয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মণীশ উঁকি মেরে দেখল, ম্যাজিক। সে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। একেবারে আজব কাণ্ড! একটা দাড়িওয়ালা লোক একটা আমের আঁটি সকলের চোখের সামনে মাটিতে পুঁতে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঝুড়ি তুলতেই একটি চমৎকার আমের চারা। তার চেয়েও আশ্চর্য সেই কাগজের দড়িটা। লোকটা কতগুলো টুকরো কাগজ চিবিয়ে খেল। তারপর মুখে হাত দিয়ে টেনে বার করল কাগজ-পাকানো দড়িটা। সে-দড়ি বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই, তার আর শেষ নেই। মণীশ হেসে আকুল। এমনি সময়ে একটা ঘণ্টা কানে যেতেই সে ছুটে ইস্টিশনে এল এবং ওভারব্রীজ পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

একটা ইস্টিশন পরেই সাদা পোষাক-পরা ক্রু এসে উপস্থিত। সবাই টিকিট দেখাচ্ছে। মণীশ পকেটে হাত দিতেই মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল, সমস্ত শরীরে ঘাম ছুটল। সর্বনাশ, ব্যাগ কই! তারপর এ পকেট, ও পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজেও ব্যাগের দেখা মিলল না। মণীশ মনে করে দেখল, রানাঘাটে ইস্টিশনের গেটে টিকিট দেখিয়ে ব্যাগ পকেটে রেখেছিল, তারপর আর খোঁজ করে নি। মনিব্যাগে কিছু টাকা এবং কয়েক আনা পয়সাও ছিল।

এদিকে ক্রু এগিয়ে আসছে। মণীশের মনে হল, তাকে কে যেন একটা প্রকাণ্ড এরোপ্লেনের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলেছে, সে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ছে। তার চারদিক সব ঘুরছে—মাঠ, গাছপালা, লোকজন, মায় সাদা

পোষাক-পরা ক্রুটি পর্যন্ত।

'টিকিট।'

মণীশ হঠাৎ চেয়ে দেখল, ক্রু বাবাজী একেবারে তার সমুখে দাঁড়িয়ে। তার গলা দিয়ে স্বর ফুটতে চায় না, কোনো রকমে জানাল, 'টিকিট চুরি হয়ে গেছে।'

'তবে পয়সা দাও।'

'পয়সাও তাই।'

ক্রু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'ও সব চালাকি রেখে দাও ছোকরা। পয়সা বের করো।'

পাশে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, একটু হেসে বললেন, 'আজকালকার ছোকরা, ছেলে তো নয়, এক-একটি রত্ন। দেখুন না ঘড়ি বাঁধার ঘটাটা!'

মণীশ অনেক মিনতি করে বলল, তার ব্যাগ সত্যিই চুরি গেছে, কিন্তু ক্রু ছাড়ল না। বহরমপুর ইস্টিশনে নেমে একজন ওপরওয়ালা সর্দার-ক্রুকে ডাকা হল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'ভাড়া না দিলে তোমাকে পুলিসে দেওয়া হবে, তিনমাস জেল হয়ে যাবে।'

জেলের নাম শুনে মণীশের কান্না বেড়ে গেল। হাত জোড় করে বলল, 'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে পয়সা এনে আপনাদের দেব।'

আগেকার ক্রুটি বলল, 'তোমার দিদি-টিদি চিনি না। পয়সা না দিতে পার তো ঐ ঘড়িটা রেখে যাও।'

'আজ্ঞে, ঘড়ি আমার নয়, জামাইবাবুর।'

দুটি ক্রুই হেসে উঠল।

শেষটায় তাই হল। ঘড়ি রেখে মণীশকে ছেড়ে দেওয়া হল। কথা রইল, ভাড়া এবং ফাইন সমেত ছ' টাকা বারো আনা যদি সে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই জমা দিতে পারে তবে ঘড়ি ফিরে পাবে।

মণীশ চলে গেলে ক্রু অটলবাবু আর সর্দার-ক্রু পটলবাবুতে অনেক ফিসফাস চলল।

অটলবাবু বললে, 'আপনি ক্ষেপেছেন। ঐ ছোকরা কখনও টাকা নিয়ে আসে? আর যদি আসেই, সোজা 'না' বলে দেব। প্রমান কই? আপনি আর আমি···'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল স্যাকরার দোকানের উদ্দেশ্যে। স্যাকরা চালাক লোক। অনেক দর কষাকষির পর তিরিশ টাকার বেশী আর এক পয়সাও উঠতে চাইল না। শেষে তাতেই রফা হল, যদিও সবাই বুঝল, ঘড়ির দাম দেড়শো টাকার কম নয়। ভাগে অটল পেল দশ, আর পটলবাবু কুড়ি।

দশ টাকায় নোটখানা পকেটে ফেলে অটলের মন একেবারে সোলার মতো হালকা হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল, গলা ছেড়ে গান ধরে। কিন্তু তাতে রাস্তার লোক পাছে কিছু মনে করে বসে এই ভয়ে গুনগুন করে গাইল, 'আনন্দেরি সাগর

থেকে এসেছে আজ বান।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে একেবারে শোবার ঘরে হাজির। বারান্দায় একটি ছেলে খেতে বসেছে। অটল চমকে উঠল, 'এ কে !'

মলিনা হেসে ফেলল, 'ও মা, তুমি ভয় পেলে নাকি ? এ যে আমাদের মণীশ।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'কী রকম কান্ড দেখো দিকিন। বাবা এত টাকা দিয়ে তোমার জন্য সোনার ঘড়ি কিনে পাঠালেন, ছেলেমানুষ পেয়ে তোমাদের কোন্ মুখপোড়া ক্রু কেড়ে নিয়ে নিলে। ও তো ফেঁদেই আকুল। আমি বললাম, তোর জামাইবাবু এলে…এ কী, তোমার আবার কী হল ?'

অটল সেই ধড়াচুড়া-সমেত মেঝের উপর বসে পড়ে শুকনো গলায় বলল, 'জল।'

মলিনা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে জল আনতে ছুটল। মণীশ মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল।

ফুটবলের বিভীষিকা

ভূতনাথবাবুর মতো ভালোমানুষ এ অঞ্চলে আর নাই। অত্যন্ত সাদাসিধে লোক ? একটি চাকর, একটি দাসী, একটি ভুঁড়ি, আর একটি টাক, ব্যস। ঘরে স্ত্রী আছেন, ছেলে আছে, আর আছে এক সিন্দুক টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন চলে। কিন্তু দুটি জিনিসের নাম শুনলে ভূতনাথবাবুর জ্ঞান থাকে না—সানাই-বাঁশি আর ফুটবল। বিবাহের সময় সানাই বাজিয়াছিল বলিয়া জীবনে আর শ্বশুরবাড়ি যান নাই এবং শ্বশুরের মুখ দেখেন নাই ? আর, সব ইস্কুলেই ফুটবল খেলা হয় বলিয়া ছেলেকে লেখাপড়া শেখান নাই। অথচ এমন বাপের কড়া নজরে থাকিয়াও সিধু মস্ত বড় ব্যাক বলিয়া দেশ-বিদেশে নাম করিয়া ফেলিল। ভূতনাথবাবু প্রথমে ধমকাইলেন, শাসাইলেন, তারপর মারধোর করিলেন, না খাইতে দিয়া তালা লাগাইলেন, কিন্তু রাইট-ব্যাক সিধু ঘোষের কিকের (**kick**) জোর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

সেবার গ্রামে খুব কাপ-ম্যাচের ধুম। বহু দেশ থেকে অনেক বাছা-বাছা দল আসিয়াছে। সিধুদের টিম পড়িয়াছে দিনাজপুর টাউন ক্লাবের সঙ্গে। শোনা যাইতেছে, তাহারা মোহনবাগান থেকে খেলোয়াড় আনিবার চেষ্টায় আছে। এমনি সময়ে ভূতনাথবাবু একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সিধুও যে সে পাত্র নয়, অনেক করিয়া মাকে ধরিয়া বাবাকে ঠিক খেলার দিনটাতেই দিদির বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল।

বৈকাল বেলা সিধু নিশ্চিন্ত মনে খেলিতে নামিয়াছে। আজ তাহার এক-একটা মার যেন আগুন। হঠাৎ দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড মোটা লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। কেহ কিছু বলিবার আগেই ভূতনাথবাবু সোজা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া সিধুর কান ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই মূর্তি দেখিয়া কেহ সুমুখে যাইতেই সাহস করিল না। সে রাত্রে সিধুর

ঘরে আবার তালা পড়িল। ভূতনাথবাবু তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পাছে সেই রাত্রেই তালা ভাঙিয়া খেলার মাঠে গিয়া জোটে এই ভয়ে ঘরের মেঝেতে বাড়ির চাকর রামচরণের শোবার ব্যবস্থা করিলেন।

সিধুর মাথায় তখনও ফুটবল ঘুরিতেছিল। অনেক রাত্রে স্বপ্নে দেখিল, একটা মারাত্মক বল একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। গোল হয়-হয়। চারিদিকে অসংখ্য লোক চিৎকার করিতেছে, গোল—গোল। রাইট-ব্যাক সিধু ঘোষ আর থাকিতে পারিল না, খাট থেকে এক লাফে নীচে পড়িয়া দুম করিয়া ভীষণ জোরে এক কিক বসাইয়া দিল। বেচারা রামচরণ 'বাবাগো' বলিয়া একটা হাঁক দিয়াই চুপ। লাথি মারিয়াই সিধুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। বেগতিক দেখিয়া সে ফস করিয়া জামাটা টানিয়া নিয়া, বাক্স খুলিয়া গোটা কয়েক টাকা সঙ্গে করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি থেকে রেলস্টেশন অনেক দূর। ভোরবেলা পৌঁছিয়া একখানা কলিকাতার টিকিট কিনিয়া সিধু গাড়িতে চাপিয়া বসিল।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল সিধু ফিরল না। মা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কর্তাও চিন্তায় পড়িলেন। তাই তো, গেল কোথায়? সন্দেহ হইল, হয়তো মামার বাড়ি গিয়াছে। কিন্তু সেখানে খোঁজ নেওয়া অসম্ভব; সানাই-বাঁশির ব্যাপারটা অত সহজে ভোলা যায় না। রামচরণকে পাঠাইবেন, সে উপায়ও নাই। তাহার মাথায় ব্যথা, ভালো হইতে এখনও অন্তত এক মাস। সিধুর এক মামা কলিকাতায় থাকিতেন। সেখানেও যাইতে পারে, এই ভাবিয়া ভূতনাথবাবু স্টেশন মাস্টারকে খবর পাঠাইয়া জানিলেন যে দিন চারেক আগে সে একটা কলিকাতার টিকিট কিনিয়াছিল বটে। এবার দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। কেননা, প্রথম নম্বর, কলিকাতা অতি ভয়ানক জায়গা। সেখানে কলমি শাক কিনিয়া খাইতে হয়, সেখানে গাড়ি চাপা পড়িয়া রোজ বহু লোক মরে, আর একলা পাইলেই কিংবা বোকা দেখিলেই গুণ্ডায় ছোরা মারিয়া টাকা-পয়সা কাড়িয়া নেয়। আরো ভয়ের কথা, সেখানে এই সময়ে ফুটবলের বেজায় ধুম। সিধুর সেই হতভাগা মামাটা নিজেই এক ফুটবলের মস্ত চাঁই। অথচ সেখানে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। জীবনে কখনও যান নাই।

এদিকে গিন্নীর কান্না বাড়িতে লাগিল, ভূতনাথবাবুর মনটাও বড় খারাপ হইয়া গেল। ঐ একমাত্র ছেলে। শেষে যাইতে হইল। ভালো দিন দেখিয়া 'ক্যামবিসের' ব্যাগে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আর কিছু কাপড়-চোপড় ভর্তি করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। ভালোই হইল, ঐ সঙ্গে গঙ্গায়ও একটা ডুব দিয়া আসা যাইবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া দেখিলেন, পাশেই একসার মোটর দাঁড়াইয়া আছে। এই জিনিসটির উপর ভূতনাথবাবুর গোপন লোভ ছিল। কিন্তু দেশে পাছে কেউ ঠাট্টা করে এইজন্য অনেকবার দিনাজপুর গিয়াও চড়িতে সাহস করেন নাই। এখানে সে ভয় নাই। একটি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বাপু, কালীঘাট যেতে কত নেবে বল দিকিন?'

শিখ মহারাজ কথাটা বোধ হয় বুঝিল না। ভূতনাথবাবু হিন্দী করিয়া কহিলেন, 'আরে শুনত্যা হ্যায় হো গাড়োয়ানজী, কালীঘাট যাতা হ্যায় তো কেত্‌না লেতা হ্যায় ?'

ড্রাইভারটি লোক ভালো। সে বুঝাইয়া দিল, মোটর-গাড়ির ভাড়া আগে ঠিক করিতে হয় না, ওটা 'মিটারে' আপনিই ওঠে। কালীঘাট পর্যন্ত টাকা তিনেক উঠিতে পারে।

ভূতনাথবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 'হামকো বাঙ্গাল পাতা হ্যায় ? তিন রুপেয়া। হারে, চার আনায় হোতা হ্যায় ?'

শিখ কথা কহিল না। ভূতনাথবাবু কহিলেন, 'আচ্ছা আট আনা ?'

পাশের গাড়িতে একটি বাঙালী ড্রাইভার ছিল। সে কহিল, 'আসুন আমার গাড়িতে।'

ভূতনাথবাবু গাড়িতে উঠিলেন। খুশি হইয়া মনে মনে বলিলেন, আরে সবাইকে ঠকানো কী এতই সোজা ? আসল কথা, একটু দরাদরি করিতে জানা চাই।

কিছুদূর গিয়া রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়া গেল। ভূতনাথবাবু বলিলেন, 'কী হল হে ?'

ড্রাইভার কহিল, 'আজ্ঞে একটু নামতে হবে, গাড়ির কল বিগড়ে গেছে।'

ভূতনাথবাবু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'ঠেলতে হবে নাকি ?'

ড্রাইভার বলিল, 'আজ্ঞে একটুখানি।'

ভূতনাথবাবু ব্যাগটা ভিতরে রাখিয়া নামিয়া পড়িলেন। ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালাইয়া দিল। ভূতনাথবাবু প্রথমে মনে করিলেন, ড্রাইভার আবার আসিবে। কিন্তু খানিক দূর গেলেই তাঁহার ভয় হইল। তখন 'ও মটর-গাড়োয়ান, ও মটর-গাড়োয়ান' বলিয়া পিছন পিছন ছুটিলেন।

অনেক লোক জড় হইয়া গেল। ভূতনাথবাবু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। সকলে কহিল, 'গাড়ির নম্বরটা দেখে রেখেছেন তো মশাই ?'

ভূতনাথবাবু বলিলেন, 'না।'

তখন ভিড়ের মধ্য থেকে পাগল, বোকা, পাড়াগেঁয়ে ভূত ইত্যাদি, নানা জনে নানা কথা বলিয়া সরিয়া পড়িল। ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুটপাথ ধরিয়া চলিলেন।

ছুটোছুটি এবং কান্নাকাটিতে ভূতনাথবাবুর পেট জ্বলিতেছিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, দুই টাকা সাড়ে তিন আনা তখনও আছে। কিন্তু কী খাওয়া যায় ? চলিতে চলিতে হঠাৎ চোখে পড়িল, একটা প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ির গায়ে লেখা আছে 'কলিকাতা হোটেল'। ভূতনাথবাবু দাঁড়াইলেন। হোটেলে খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল, দিনাজপুরে মকদ্দমা করিতে গিয়া অনেক বার হোটেলে থাকিতে হইয়াছে। প্রতি বেলায় পাঁচ আনা, বালিশের জন্য দু' পয়সা, আর শীতকালে লেপ নিলে এক আনা বেশী। কিন্তু সে তো টিনের ঘর আর বাঁশের বেড়া। এ যে একেবারে চারতলা বাড়ি ! তা হোক, তবু হোটেল তো ! না

হয় পাঁচ আনার জায়গায় সাত আনা লাগিবে, এই তো ?

সাহসে ভর করিয়া ভূতনাথবাবু ভিতরে ঢুকিলেন এবং সম্মুখেই চাপকান-পরা দরোয়ান দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। কিন্তু দরোয়ান মারিবার বা ধরিবার চেষ্টা করিল না, সমাদর করিয়া উপরে লইয়া একটা ঘর দেখাইয়া দিল। পাশের ঘরেই কল। ভূতনাথবাবু একবার খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে জল ফেলিতে সাহস করিলেন না, স্নান না করিয়াই খাইতে বসিলেন।

বিকালের দিকে মনে করিলেন, কালীঘাটে তাঁহার সেই বখাটে শালার বাসাটা খুঁজিয়া নেওয়া দরকার। ম্যানেজার আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত দিতে হবে ?'

ম্যানেজার কহিল, 'আজ্ঞে ছ' টাকা।'

'অ্যাঁ, ছ' টাকা !' বলিয়া ভূতনাথবাবু মেজের উপরেই ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন। মিনিট পাঁচেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'এক গ্লাস জল।'

জল আনা হইল। তারপর অনেক কটু কথার পর সেই দুই টাকা সাড়ে তিন আনা এবং সেই সঙ্গে বাকি তিন টাকা সাড়ে বারো আনার হ্যাণ্ডনোট লিখিযা দিয়া রেহাই পাইলেন।

আবার পথে। কালীঘাটের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভূতনাথবাবু গড়ের মাঠের ধারে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, দলে দলে লোক ব্যস্ত ভাবে ছুটিতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে কী হচ্ছে মশাই ? মেলা-টেলা বুঝি ?'

সকলে হাসিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে মেলা নয়, খেলা।'

ভূতনাথবাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'রাম-রাম !'

কিন্তু কিছুদূর গিয়া তাঁহার হঠাৎ খেয়াল হইল, এই খেলার মাঠেই সেই বখাটে শালাটার খোঁজ মিলিবে নিশ্চয়ই, এবং চাই কী সেই সঙ্গে তাঁহার মূর্তি-মান কার্তিকেরও দেখা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ঐখানে যাওয়াই ঠিক।

মাঠের মধ্যে সব চাইতে যেখানে ভিড় বেশী ভূতনাথবাবু সেইদিকেই চলিলেন। ফুটবলের জন্য এত কাণ্ড ! চারিদিকটা খুব উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা, তার পাশেই বেঞ্চির ওপর বেঞ্চি সাজানো। কত হাজার হাজার লোক বসিয়া আছে ! দূর থেকে মনে হয়, পদ্মা নদীর উপরে লাখ খানেক কালো হাঁড়ি ভাসিতেছে। ভূতনাথবাবু সেই ঘেরা জায়গাটার চারিদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক পাশে আসিয়া দেখিলেন, একখানা অদ্ভূত রকমের ঘর—ন্যাকড়ার ছাউনি, কাঠের মেঝে, দেখিতে মন্দ নয়। তাহারই বারান্দায় সারি সারি চেয়ার টেবিলে অনেক বাবু-লোক বসিয়া চা, খাবার খাইতেছে। ঐ না সেই বখাটে ছোঁড়াটা ? হাঁ, সেই বটে ! ভূতনাথবাবুর শালা সুধীরও দেখিতে পাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, 'এই যে, ঘোষ মশাই যে, আপনি !'

তাহাকে দেখিয়া ভূতনাথবাবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।' তারপব সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাইয়া কহিলেন,

'সিধে কই ?'

সুধীর কহিল, 'ভয় নেই, সে আমার ওখানেই আছে। আসুন, এক গ্লাস লেমোনেড খান।' বলিয়া একরকম জোর করিয়াই ঘোষজাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল।

ঘরের মধ্যে সিধুর বুকের রক্ত বরফ হইয়া গেল। সে এখানে আসিয়া আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলিতেছে। আজ তাহাদের খেলা। তাহারই আয়োজন চলিতেছিল।

সুধীর ভগিনীপতিকে চিনিত। সিধুকে গিয়া কহিল, 'ভয় নেই, তুই খেলতে যা। আমি ওঁকে আটকে রাখব'খন।'

মাঠে প্রথম হুইসেল পড়িতেই এগারো জন খেলোয়াড় ঘরের ভিতর থেকে বাহির হইয়া আসিল। সকলের আগে সিধু। ভূতনাথবাবু এক মুহূর্তে লেমোনেডের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, 'ওরে হারামজাদা, আবার ফুটবল!' সঙ্গে সঙ্গে একটা মহামারী কাণ্ড! বেয়ারার হাতের এক-ট্রে গরম চা একেবারে ম্যানেজারের মাথায়। তিনি দিলেন এক লাফ। পায়ের ধাক্কায় একটা টেবিল তীরের মতো একটি ভদ্রলোকের পিঠে গিয়া পড়িল। তাহার উপর ছিল প্লেট তিনেক মাংস ; সব সুদ্ধ গিয়া পড়িল একটি মহিলার দামী শাড়ির উপর। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বামী হাঁক দিলেন, 'পুলিশ! পুলিশ!' দুইটা গোরা সার্জেণ্ট ছুটিয়া আসিল। এদিকে ভূতনাথবাবু বিপদ দেখিয়া ঘরের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পলাইতে সাহস করেন নাই। একটা বেয়ারা গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিল। সম্মুখে সাহেব দেখিয়া তিনি এদিক-ওদিক চাহিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। গোরা দুইটা হাসিয়া চলিয়া গেল।

সেক্রেটারীর কাছে খবর গিয়াছিল। তিনি হুকুম দিলেন, লোকটাকে আটকে রাখো, খেলার পরে বিচার হবে। এদিকে সুধীর সেক্রেটারীকে ব্যাপারটা সব বুঝাইয়া দিল, এবং দুইজনে মিলিয়া একটি ফন্দি আঁটিয়া রাখিল।

খেলার শেষে কোট-প্যাণ্ট-পরা সেক্রেটারী আসিলেন। ভূতনাথবাবুকে তাঁহার কাছে হাজির করা হইল। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আপনার নাম ভূতনাথ ঘোষ?'

ভূতনাথবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, 'আজ্ঞে হুজুর।'

'আপনার বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ, আপনি এই ক্লাবের ম্যানেজারের মাথা পুড়িয়ে দিয়েছেন, আটটা চায়ের কাপ, তিনখানা প্লেট এবং একটা টেবিলের পা ভেঙে দিয়েছেন। আপনি একটি ভদ্রমহিলার ১৫০ টাকা দামের শাড়ী নষ্ট করেছেন, এবং তাঁকে এমন করে ভড়কে দিয়েছেন যে ডাক্তার দেখাতে হবে। এ সমস্তের ক্ষতিপূরণ বাবদ আপনি যদি একশ' টাকা এখুনি এই ফুটবল-ফাণ্ডে না দেন. আপনার দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে, অর্থাৎ জেল খাটতে হবে।'

ভূতনাথবাবু রুক্ষভাবে কহিলেন, 'আমি ফুটবলে টাকা দিতে পারব না।'

'তাহলে জেলে যান। পুলিশ!'

একটি কনস্টেবল আসিয়া ভূতনাথবাবুর হাত ধরিল। ভূতনাথবাবু এবার চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'নিন, যত ইচ্ছা মারুন। ভাঙা কাঁঠাল পেয়েছেন কিনা ? বেটা গাড়োয়ান আমার পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে পিট্‌টান দিলে। হোটেলওয়ালা তিন টাকা সাড়ে বারো আনার হ্যান্ডনোট নিয়ে তবে ছাড়ল। আপনারা আবার ঘাড় ভেঙে একশ' টাকা নিতে চান। কেন, আমি কী করেছি আপনাদের ?'

সমস্ত ঘর নীরব। ভূতনাথবাবু একটু থামিয়া হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া কহিলেন, 'এই আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, আর কক্ষণো কলকাতা আসব না। আমায় ছেড়ে দিন !'

সেক্রেটারী গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু একটা কথা। আপনার ছেলে ক্লাবের খেলোয়াড়। তার খেলা সম্বন্ধে কোনোদিন আপত্তি করতে পারবেন না।'

ভূতনাথবাবু এত সহজে ছাড়া পাইয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তাই হবে।' বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সুধীর আর সিধু দাঁড়াইয়া আছে। সিধুর চোখে জল। কহিল, 'রামচরণ কেমন আছে বাবা ?'

ভূতনাথবাবুরও চোখের জল বাড়িয়া গেল। অনেক দিন পরে ফিরাইয়া-পাওয়া হারানো ছেলের কাধে হাত রাখিয়া কহিলেন, ভালো আছে।'

পাঞ্জাবী সাহেব

অনেক দিন পরে কলকাতায় এসেছি। 'মেট্রো'তে একবার ঢুঁ মেরে না গেলে লোকে বলবে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে। তাই একটু ব্যস্ত হয়েই ধর্মতলা দিয়ে চলেছিলাম। ওয়াছেল মোল্লার দোকানের সামনে এক পাঞ্জাবী সাহেবের সঙ্গে 'কালিশন' হয়ে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আঁখ নেহি হ্যায় ?'

কোনো জবাব এল না। প্রকাণ্ড পাগড়ির নিচে একমুখ দাড়ির মধ্যে হাসি দেখা দিল। ভয়ানক কড়া রকম একটা কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় সাহেব কপালের উপর থেকে পাগড়িটা একটু সরিয়ে দিলেন। চমকে উঠলাম, 'একি, অখিল, তুমি !'

মেট্রো রইল পড়ে। বাল্যবন্ধুর হাত ধরে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়া গেল।

অনেক দিন আগেকার কথা।

সে-বছর আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস। পূর্ববাংলার এক পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে পড়ি, আর থাকি তার পাশের বোর্ডিংএ।

বর্ষাকাল। আমাদের ইস্কুল আর বোর্ডিংএর ঘরগুলো কোনোরকমে জেগে আছে, আর সব জলে জলময়। যতদূর দেখা যায় থৈ-থৈ করছে জল, যেন একটা একটানা মহাসাগর। সেদিকে চেয়ে ভাবতেই পারা যায় না যে ছ' মাস পরে এই মহাসাগর ভোজবাজির মতো উবে যাবে, আর দেখা দেবে ফাটলধরা মাঠ।

সেবার বর্ষাটা একটু বেশী হয়েছিল। বোর্ডিংএর রান্নাঘরের মাটির দাওয়া ধসে পড়েছে। চাকরদের ঘর ডুবুডুবু। রোজই একটা কিছু মজা চলছে। রাত বারোটার সময় ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ভীষণ হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে বেরিয়ে এসে দেখি, ঠাকুরের খাটিয়ার অর্ধেক চলে গেছে জলে। সে কোনোরকমে বেড়ায় আটকে গিয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

আর একদিনের কথা। তিন নম্বর ঘরের বেড়ার ধারে পরেশের ট্রাঙ্ক ছিল। সকালে উঠে দেখি, কিছু নেই। সেখানে একটা বিরাট ফোকর, আর ঠিক নিচেই জলের গর্জন। রামধন চাকর ভোরে উঠে কয়লা ভাঙছে। ফোঁস করে উঠল চার হাত লম্বা ইয়া এক মস্ত কেউটে। তোমরা যারা কলকাতায় থাক, শুনে হয়তো শিউরে উঠবে। কিন্তু আমাদের ওসব একেবারে সয়ে গিয়েছিল। তবে, সেদিনকার ঘটনাটা নতুন ধরনের বটে।

অন্ধকার রাত। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে। খাবার ঘরে মিট্‌মিট্‌ করে হ্যারিকেন জ্বলছে। তারই আলোতে ভিজে মেঝের উপর কাঠের পিঁড়ি পেতে আমরা সব খেতে বসেছি। বড় বড় কই মাছ, আর তার সঙ্গে এক বাটী করে ঝোল, অর্থাৎ হলুদ গোলা গরম জল। খুব খাচ্ছি, হঠাৎ ওধার থেকে অখিল হাঁক দিলে, 'ও মাগো! এটা কি গো!'

সাপ-টাপ প্রায়ই বেরোত। তাই মনে করে আমরা লাফিয়ে উঠেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। অখিলের পাতে যে মাছটা পড়েছিল সেটা খুব বড় বটে, কিন্তু তার চারটে পা। কই মাছেব তো পা থাকে না। চিংড়ির ঠ্যাং থাকে বটে, কিন্তু ভালো করে দেখা গেল, চিংড়ি নয়, মস্ত বড কোলা ব্যাঙ। সকলেরই গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করে উঠল। পবেশ তো ছুটল বমি করতে। অখিল ঠাকুরের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললে, 'এটা কি ?'

ঠাকুর কাঁদ-কাঁদ হয়ে তাব পূর্ববঙ্গীয় হিন্দী ভাষায় জানাল, 'হামি কি করিবে? রামধন মছ্‌লি বানাইয়া দেছে, হামি তো খালি কড়ামে ছাড়িয়া দিছি।'

রামধন বললে, 'আমি কি করবাম্‌। ম্যানেজার আইন্যা দেছেন, আমি কুইট্যা ধুইয়া দিছি। আমি কি দ্যাখছি ওডা কই মাছ না ব্যাঙ?'

ম্যানেজার অর্থাৎ বোর্ডিংএর সরকার শিববাবুর উপরে আমাদের ভীষণ রাগ ছিল। তার প্রধান কারণ, তিনি গাঁজা খেতেন এবং তার পয়সা জুটত এই বোর্ডিংএর 'বাজার' থেকে। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া প্রায়ই খারাপ হত এবং তা নিয়ে ঝঞ্ঝাটের অন্ত ছিল না। কথায় কথায় দল বেঁধে শিববাবুর ঘর চড়াও করা আমাদের একরকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকের এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে আমাদের আক্রোশ অনেকগুণ বেড়ে উঠল। ব্যাঙটা কিভাবে এল, কে তার জন্য দায়ী, ওসব তুচ্ছ প্রশ্ন ভাববার সময় আমাদের ছিল না। ম্যানেজারকে একহাত নিতে হবে, এই হল কথা।

শিববাবুর কপাল ভালো, সেদিন তিনি বোর্ডিংএ ছিলেন না। কিন্তু তাতে

করে রাগ আমাদের চড়েই গেল। জন-পাঁচেক একটা নৌকা নিয়ে সেই রাত্রেই চললাম হেডমাস্টারের কাছে। মাইলখানেক দূরে তিনি থাকতেন। ব্যাপার শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আমাদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, পরদিনই তিনি এ সম্বন্ধে রীতিমতো তদন্ত করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন।

তদন্ত হল। আমরা তারস্বরে শিববাবুর নামে নালিশ জানালাম। কিন্তু তার কিছুই হল না। হেডমাস্টার মশায় রায় দিলেন, উনুনের পাশে মেঝেটা যেখানে ভেঙে গেছে, ঐখান দিয়ে ব্যাঙ ঢুকে মাছের কড়াতে লাফিয়ে পড়েছিল। ঠাকুর দেখতে পায় নি। ঠাকুরের দু'টাকা জরিমানা হল, আর লোকজন এসে ঐ ভাঙাটুকু ভরতি করে দিয়ে গেল। হেডমাস্টার মশায়ের বিচারটা আমাদের একেবারেই মনের মতো হল না।

সেই রাত্রেই আমাদের এক নম্বর ঘরে মিটিং বসল। একটা জিনিষ বলতে ভুলে গেছি। অখিল শিববাবুর দূরসম্পর্কের আত্মীয় হত এবং তাঁর ঘরেই থাকত। কিন্তু শিববাবুর উপর আক্রোশটা আমাদের সবার চেয়ে ওরই ছিল বেশী। সে-রাত্রের মিটিংএ সব চেয়ে বড় বক্তৃতা হল ওরই। জোর গলায় ও বললে, 'বন্ধুগণ, আমরা যে আজ কতখানি বিপন্ন, তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের চরম সর্বনাশ উপস্থিত হইতে পারে। ম্যানেজার আজ কই মাছের বদলে ব্যাঙ দিয়াছে, কাল মাংসের বদলে শামুক কিংবা ডালের বদলে কাদাগোলা জল খাওয়াইবে। আমরা দূরদেশ হইতে পিতামাতার বহু কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া পড়াশুনা করিতে আসিয়াছি, অখাদ্য খাইয়া প্রাণ বিসর্জন দিতে আসি নাই। অতএব তোমরা বদ্ধপরিকর হও, এই অমানুষিক অন্যায়ের প্রতিকার চাই।' ইত্যাদি।

আমরা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। একসঙ্গে হাত তুলে বললাম, 'হ্যাঁ, এর প্রতিকার চাই।'

প্রতিকার চাই, অর্থাৎ ম্যানেজারকে জব্দ করতে হবে। কিন্তু কি করে সেটা হবে, কি উপায়ে, কিছুই স্থির করা গেল না। ব্যাপারটা আমাদের সকলেরই মাথার মধ্যে গরম হয়ে ঘুরতে লাগল।

প্রায় শনিবারই অখিল ছুটির পরে বাড়ি যেত, ফিরে আসত সোমবার সকালে। বরাবর সে একাই ফেরে। সেদিন দেখলাম, সঙ্গে কে একজন অচেনা লোক। তাকে সোজা আমার কাছে সে নিয়ে এল। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বেজায় খুশি হয়ে বললে, 'এবার কেল্লা ফতে।'

বললাম, 'তার মানে?'

অখিল বলল, 'এই যে লোকটি দেখছিস, চমৎকার উল্কি দিতে জানে। সে এমনি দাগ দেবে যে সারা জীবনেও উঠবে না। এবার ম্যানেজার টের পাবেন মজাটা, কই মাছের বদলে কোলা ব্যাঙ খাওয়াবার ফন্দিটা এবার দেখাচ্ছি।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললাম, 'কিন্তু…'

'কিন্তু নয়, বেশ অন্ধকার রাত যাচ্ছে। একদিন চার-পাঁচজনে মিলে

বাছাধনকে চেপে ধরবে, আর এ লোকটা উল্কি দিয়ে কপালের উপরে বেশ বড় করে লিখে দেবে, 'চোর'।'

উৎসাহে একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। চমৎকার! এর চেয়ে আর ভালো প্ল্যান আর হতে পারে না। তবে, চেপে ধরবার কাজটা আমাদের দিয়ে হবে না। পাশের গ্রাম থেকে জন-চারেক ষণ্ডা-মতো লোক যোগাড় করতে হবে।

অখিল বলল, 'ভাই, আর একটা কথা! আমি কিন্তু সেদিন বোর্ডিংএ থাকব না। গেঁজেলটা আমাকেই সন্দেহ করবে, আর বাবার কাছে লাগিয়ে দেবে দশখানা করে…'

আমি বললাম, 'কুছ্ পরোয়া নেই। আসছে শনিবারে তুই বাড়ি চলে যা। ঐদিন রাত্রেই লাগিয়ে দেব।'

মনের মতো চারজন লোক যোগাড় হয়ে গেল। নগদ দু-টাকা করে হাতে পেয়ে তারা তো লাফাতে শুরু করলে। কিন্তু উল্কিওয়ালা জানাল, সে রবিবারের আগে আসতে পারবে না। তাতে অবিশ্যি আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না। কেননা, অখিল সোমবারের আগে ফেরে না।

রবিবার। রাত প্রায় বারোটা। আমরা পাঁচজন পাণ্ডা ছেলে, গ্রামের চার জন ষণ্ডা লোক, আর উল্কিওয়ালা—সবাই মিলে পা টিপে টিপে ম্যানেজারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকার রাত, তার উপরে মেঘ করে আছে। যতই ডানপিটেগিরি করি না কেন, বুকটা রীতিমতো ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল। তবু আস্তে আস্তে দরজায় হাত দিলাম। ওটা বাইরে থেকেই একটু চেষ্টা করে খোলা যেত, কিন্তু সে প্রয়োজন হল না। একটু ঠেলে দিতেই খুলে গেল। অখিলের খাট খালি। হাত দিয়ে তার পাশে শিববাবুর খাটটা দেখিয়ে দিয়ে আমরা সরে এলাম।

পরক্ষণেই একটা ধস্তাধস্তি শব্দ, একটুখানি অস্ফুট চিৎকার। তারপর সব চুপ। আমরা ঘুমের ভান করে নিজ নিজ বিছানায় পড়ে আছি। উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছে না। হঠাৎ কে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল এবং আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

এ কি! এ যে অখিল?

দলের সকলেই ছুটে এসে জড় হল। অখিল কপালে হাত দিয়ে কেঁদে ফেলল, 'এ কি করলি ভাই?'

আমরা তখনও ব্যাপারটা বুঝি নি। তারপর আলো জেবলে দেখি, সর্বনাশ! অখিলের সমস্ত কপাল জুড়ে বড় বড় অক্ষরে উল্কির কলঙ্ক, 'চোর'।

অর্থাৎ, সোমবার ছিল মঘা নক্ষত্র। কাজেই অখিলের বাবা তাকে রবিবার রাত্রেই রওনা করে দেন। সে যখন বোর্ডিংএ এসে পৌঁছায় তখন রাত এগারোটা। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে শুয়ে পড়ে। দরজাটাও বন্ধ করা হয় নি। শিববাবু তখন ঘরে ছিলেন না, কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তারপর মিনিট দশেক পরে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। চেয়ে

দেখে, বিছানা ভরতি অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। তাদের কামড়ে টিকতে না পেরে সে শিববাবুর খালি বিছানায় উঠে গিয়েছিল।

আমি বললাম, 'ওরা যখন চেপে ধরল তখন, চেঁচাতে পারলি নে হতভাগা ?'

অখিল বলল, 'একটা ভীষণ গুণ্ডা প্রথমেই আমার মুখ চেপে ধরেছিল, চেঁচাবার অবসর দেয় নি।'

পরদিনই কাউকে কিছু না বলে অখিল ইস্কুল ছেড়ে চলে গেল। মনটা বড় দমে গিয়েছিল। আমিও মাসখানেক পরে ওখানটা ছেড়ে অন্য ইস্কুলে ভর্তি হলাম।

তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। অখিলের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ওয়াছেল মোল্লার দোকানের সামনে কলিশন।

দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা। কিন্তু প্রাণ খুলে আলাপ জমল না। ঐ পাঞ্জাবী পোষাকের পাগড়িটা মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগল।

বিষে বিষক্ষয়

কাঞ্চননগরের অশোক সেনকে এ যুগের অভিমন্যু বলা যেতে পারে। তফাৎ শুধু এই যে, অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থেকে শিখে এসেছিলেন যুদ্ধ, আর অশোক শিখেছে অভিনয়, অর্থাৎ যাকে বলে অ্যাকটিং। একমাস যখন তার বয়স, দেখা গেল, সে হাত-পা ছোঁড়ে তাল রেখে, হাসে-কাঁদে নাটকের সুরে, তার মুখের উপর এমন সব ভাব ফুটিয়ে তোলে, যেটা ডগ্‌লাস্‌ ফেয়ারব্যাঙ্ককেও হার মানাতে পারে। এইসব দেখেই তার ছোট মামা বাজি রেখে বলেছিলেন, 'এ ছেলে যদি বেঁচে থাকে, শিশির ভাদুড়ীর নাম ডোবাবে, তোমরা দেখে নিও।'

মামার কথা মিথ্যা হয় নি। বছর পনেরো-ষোল যেতে না-যেতেই অশোক একজন মস্তবড় অভিনেতা হয়ে উঠল। তার ঢেউ-খেলান কোঁকড়া চুল সাপের ফণার মতো নেমে এল ঘাড়ের উপর। কাঁধে বোতাম, পাঞ্জাবির ঝুল থামল গিয়ে হাঁটুর নিচে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে তোমরা যেখানে বল, 'এই, কেমন আছিস ?' অশোক তেমন স্থলে তার গলাটাকে মধুর করে বলে, 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?'

এমনি যখন অবস্থা, তখন একদিন অশোকের বাবা ব্রজেন্দ্রবাবু হঠাৎ বাড়ি ফিরলেন।

গুজব রটেছিল, ব্রজেন্দ্রবাবু পাঁচ বৎসর ধরে আসামের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে একেবারে লাল হয়ে এসেছেন। কিন্তু বাড়ি যখন এলেন দেখা গেল, একজন কালো ভদ্রলোক···তাঁর মাথার চুল সামনে পিছনে সমান করে ছাঁটা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জমকালো গোঁফ নিচের ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে। পরনে মোটা কাপড় আর গায়ে মার্কিনের হাফ-শার্ট। ব্যাপার দেখে অশোক বাপের কাছ থেকে একটু

দূরে দূরে বেড়াতে লাগল।

দুদিন পরের কথা। দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে উঠে গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু অশোককে ডেকে পাঠালেন। অশোক ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্রবাবু একবার চোখ খুলে নিয়েই বললেন, 'অশোককে ডেকে দাও।'

অশোক বলল, 'আজ্ঞে, আমি এসেছি।'

ব্রজেন্দ্রবাবু যেন চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, তুমি! যাও শেমিজটা ছেড়ে এসো।'

অশোক বলতে যাচ্ছিল, 'আজ্ঞে, এটা শেমিজ নয়, পাঞ্জা…'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওটা ছেড়ে এসো, আর নিধেকে ডেকে দাও।'

নিধে আসতেই হুকুম হল, নাপিতকে ডেকে দেবার জন্য। আধঘণ্টার মধ্যেই নাপিত এল এবং সেই অবেলায় অশোকের থিয়েটারী চুলের বোঝা উড়ে গিয়ে মাথাটা হয়ে দাঁড়াল কদমফুল। পাঞ্জাবিগুলো দর্জীর বাড়ি ঘুরে এসে হয়ে গেল বেঁটে-খাট হাফ-শার্ট।

সে-রাত্রে অশোক না খেয়েই শুয়ে পড়ল। মা এলেন বোঝাতে। হাত ধরে বললেন, 'চল্, খাবি চল্।'

অশোক নাটকের সুরে বলল, 'মানুষের জীবনে এমন জিনিস আছে যেটা অন্নের চেয়েও বড়, সেটা হচ্ছে আদর্শ। তাই যদি না রইল, তুচ্ছ অন্ন না হলেও চলবে।'

গভীর রাত্রে অশোক যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পেল, তার মা শিয়রে বসে ডাকছেন, 'আয় বাবা, দুটো খাবি আয়।' ভীষণ রোষে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছন্দ ঃ

'ভাত নাহি খাব আমি
ধরিয়াছে মাথা,
যাও মাতঃ, বিরক্ত করো না মোরে।'

এই গর্জন পাশের ঘরে তার বাবার কানে গিয়ে পেঁছিল। তিনি সমস্ত রাত ঘুমিয়েই কাটালেন এবং ভোর না হতেই শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে অশোকের আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করলেন। বুকে স্টেথিস্কোপ, বগলে থার্মোমিটার ইত্যাদি লাগিয়ে, নাড়ি ধরে, পেট টিপে, পিঠ ঠুকে বললেন, 'মাথাটা ওপেন (open) করতে হবে।'

ব্রজেন্দ্রবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কি ?'

'হ্যাঁ, মাথার খুলিটা খুলে, বাঁ-দিকে গোটা দুই স্ক্রু ঢিলে হয়ে আছে, সে দুটোকে একটু এঁটে দিতে হবে।'

ব্রজেন্দ্রবাবু বললেন, বাঁচবে তো ?'

ডাক্তার একটু হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তা বলা যায় না। নাও বাঁচতে পারে। তবে অসুখ সেরে যাবে।'

অশোকের বাবা তাতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু মা কান্নাকাটি শুরু

করলেন। ফলে, অপারেশন হল না। তার বদলে স্থির হল, অশোক আপাততঃ তাঁর সঙ্গে আসামের জঙ্গলে গিয়ে কাঠের কারবারে হাত পাকাবে।

অশোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কিন্তু তার বাবার সংকল্প ভাঙল না।

বনের পর বন চলে গেছে। যতদূর দেখা যায়, শাল আর সেগুনের সারি। সেইদিকে চেয়ে অশোকের চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সে জল ফেলবার অবসর নেই। হুকুম বড় কড়া। বসে থাকবার উপায় নেই। ভোরে উঠেই যেতে হবে মাইল তিনেক দূরে, যেখানে কুলীরা গাছ কেটে-কেটে স্তূপ করে রাখছে। খেয়ে আবার বেরোতে হবে—নদীর ঘাটে, যেখানে বড় বড় নৌকা বোঝাই করে সেই গাছ চলে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের বন্দরে। এর পর আছে মিস্ত্রীখানা এবং রাত্রে লম্বা হিসাবের খাতা।

মাঝে মাঝে অশোকের মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মরিয়া হয়ে বলে, 'আর পারি না।'

এমনি একদিন শালের বনে নেমেছিল অকাল-বর্ষণ। মেঘে আকাশ ছিল ঘেরা, আর নদীর জলে ঢেউ উঠেছিল ক্ষেপে। অশোক বনের ধারে দাঁড়িয়ে কুলীদের কাজ দেখছিল। হঠাৎ তার কি মনে হল। চিৎকার করে ডাকল, 'সর্দার!'

সর্দার এগিয়ে এলে অশোক বলল, 'বাড়ি চলে যা। তোদের আজ ছুটি।'

কিছুক্ষণ পরেই সরকার মশাই এসে বললেন, 'এ করেছেন কি? বাবু যে একেবারে খেয়ে ফেলবেন। অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।'

'টাকা!' অশোকের ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠল ঘৃণায়। হাত মুঠো করে গর্জে উঠল, 'টাকা! সেই টাকা চাই না সরকার মশাই, মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে যার জন্ম।'

কথাটা কর্তার কানে গেল, তিনি চুপ করে রইলেন। সেই রাত্রে অশোকের টেবিলের উপর পাঁচখানা বড় বড় খাতা এল এবং বাবা জানিয়ে গেলেন 'হিসাব-গুলো সকালেই চাই।'

হিসাব যখন শেষ হল, রাত দুটো বেজে গেছে। বাইরে শালের বনে তখন চলেছিল অবিশ্রান্ত অকাল-বর্ষণ।

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে ব্রজেন্দ্রবাবু ঘুম থেকে উঠে দেখলেন অশোকের ঘর খোলা—অশোক নেই। জিনিষপত্র সব যেমনটা ছিল তেমনি আছে, শুধু কয়েকখানা নাটক নেই। দিন গেল, রাতও গেল, অশোক ফিরল না। ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলল। কোনো ফল হল না। বাড়িতে চিঠি লেখা হল। উত্তর এল, সেখানেও নেই। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাবেন এমন সময় একজন লোক খবর নিয়ে এল যে, মাইল দশেক দূরে যে চা-বাগান আছে, তারই ক্লাবে অশোককে দেখা গেছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করছিল সেখানে?'

'আজ্ঞে, থিয়েটারের মহড়া দিচ্ছিলেন। দাদাবাবু এমন সুন্দর অ্যাকটো···'

'চোপরাও !' ব্রজেন্দ্রবাবু গর্জে উঠলেন।

সেই রাত্রেই হুকুম হয়ে গেল ভোর না হতেই দশজন কুলী গিয়ে হতভাগাকে ধরে নিয়ে আসবে।

ছেলে যে একেবারেই গোল্লায় যেতে বসেছে, তাতে আর ব্রজেন্দ্রবাবুর সন্দেহ ছিল না। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সেই কথাই আলোচনা করছিলেন।

কবিরাজ মশাই সব শুনে বললেন, 'দেখুন ব্রজেন্দ্রবাবু, কলেরা-বসন্তের মতো এই থিয়েটারটাও একটা ব্যাধি। এরও চিকিৎসা করার দরকার। আপনি যদি বলেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ব্রজেন্দ্রবাবু হতাশভাবে বললেন, 'সে চেষ্টা কি আর না করেছি মশাই ? কিন্তু মাথার খুলিটা না ভেঙে কিছু কি করা যাবে না আর ?'

কবিরাজ মশাই বললেন, 'ডাক্তাররা বলেছে তো ? ওদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের পবিত্র আয়ুর্বেদ যখন এখনও বেঁচে রয়েছে, তখন ওদের কাছে যাবার দরকারটা কি ?'

'আপনাদের আয়ুর্বেদে এর কোনো বিধান আছে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই আছে। আয়ুর্বেদে কি না আছে ?'

'তাহলে একবার দেখুন। কি কি জিনিষ লাগবে তার একটা ফর্দ...'

'আজ্ঞে, আপাততঃ কিছুই লাগবে না। ঐ থিয়েটারটা চুকে যাক।'

'চুকে যাক ! আপনি বলেন কি ? এই আপনার চিকিৎসা !' ব্রজেন্দ্রবাবু রুখে উঠলেন।

'উত্তেজিত হবেন না। এ-ও আয়ুর্বেদের বিধান···বিষে বিষক্ষয় ! ঐ থিয়েটার দিয়েই থিয়েটারের বীজাণুকে মারতে হবে।'

জোর রিহার্সেল চলছে। চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় হবে। ডিরেকশন দিচ্ছে অশোক। চাণক্যের পার্টেও তাকেই নামতে হবে। তার অ্যাকটিং দেখে ম্যানেজার পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেছেন। খাতির, সমাদর আদর-যত্নের আর অন্ত নেই। সেদিন রিহার্সেল শেষ করে অশোক সবে ক্লাবের বাইরে পা দিয়েছে, অমনি সামনেই দেখে কবিরাজ মশাই। অশোক চমকে উঠল।

কবিরাজ মশাই তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস ! তোমার অভিনয় দেখে দু'চোখ জলে ভরে গেছে, অশোক। মনে হচ্ছে, সেই বিশ্রুত-কীর্তি মহাপণ্ডিত চাণক্যকে যেন চোখের উপর দেখছি। কিন্তু বাবা, গলাটা আরও একটু গম্ভীর করতে হবে। অতবড় দার্শনিক···'

সেটা অশোকও বুঝতে পারছিল। চাণক্যের পক্ষে তার গলাটা একটু কোমল হয়ে পড়ছিল।

কবিরাজ মশাই বললেন, 'কণ্ঠের গাম্ভীর্যকে বাড়াবার মতো ওষুধ আমার কাছে রয়েছে।'

অশোক যেন হাতে স্বর্গ পেল। বলল, 'দিন না আমাকে।'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু আজ নয়। থিয়েটার শুরু হবার আধঘণ্টা আগে কয়েকটা বড়ি পরপর খেতে হবে।'

কবিরাজ মশাই ঐখানেই রয়ে গেলেন। পরদিনই বোঝা গেল, ক্লাবে একটা দল আছে যারা অশোকের শত্রু। তাদের নেতা হচ্ছে রজত পুরকায়স্থ। তাকেই হটিয়ে অশোককে ডিরেক্টর করা হয়েছে। কিন্তু সে খুশি মনে হটে নি। কবিরাজ মশাই পুরকায়স্থের সঙ্গে দেখা করে গোপনে জানিয়ে দিলেন, 'এ আর কেউ নয়, ব্রজেন সেনের ছেলে। পাঁচ-ছ'বছর আগে চা-বাগানের সঙ্গে একটা মামলায় ব্রজেন্দ্র হেরে যান। কে জানে, তাঁর ছেলে তার শোধ নিতে এসেছে কিনা? হয়তো থিয়েটারকে শেষ মুহূর্তে পণ্ড করাই তার মতলব।'

কথাটা অনেকেরই মনে ধরল। একটা চাপা আন্দোলনও হল। কিন্তু সাহেব ম্যানেজার এক ধমকে সব থামিয়ে দিলেন।

তারপর থিয়েটারের দিন এসে গেল। মস্ত বড় স্টেজ। সিন, ড্রেস্, পেইণ্টার, ড্রেসার সব এসেছে কলকাতা থেকে। টাকা ঢালা হয়েছে জলের মতো। কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে থেকে দলে দলে লোক এসেছে...ছেলে, বুড়ো কেউ বাদ নেই। পিঠে চিড়ে আর গুড় বেঁধে গ্রামের চাষীরাও ভিড় কম করে নি। মহিলাদের দলটাও বেশ ভারী। অশোক এতদিন যে সাধনা করে এসেছে, আজ তার পরীক্ষা। আজকের সাফল্যের উপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কবিরাজ মশাই দশমিনিট অন্তর চায়ের সঙ্গে তাঁর বড়ি দিয়ে চলেছেন।

ড্রপ্ উঠে গেল। সেকেন্দর শাহ্ এলেন, আর এলেন তাঁর সেনাপতি সেলুকস। অভিনয় জমে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে কারুর বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই। সকলের সামনে সাহেব ম্যানেজার এবং তাঁর পিছনে বিশাল জনতা সময় গুণছে, কখন চাণক্য আসবে...মহাপণ্ডিত চাণক্য।

অবশেষে সময় হল। চাণক্য দেখা দিলেন। সমস্ত লোক হাততালি দিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই অতবড় হল্ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ কি! এযে শুধু মুখ নাড়ছে, হাত-পা চালাচ্ছে, কথা তো বলছে না! অশোক দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে, কিন্তু স্বর ফুটছে না। আর একবার সমস্ত জোর দিয়ে চেষ্টা করল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়েছে, মুখ রক্তবর্ণ, কিন্তু কথা বেরোল না। গলা দিয়ে শুধু একটা সাঁই-সাঁই আওয়াজ ফুটল, কেউ শুনতে পেল না। এদিকে সমস্ত লোক অধীর হয়ে উঠেছে। চিৎকার উঠল, 'জোরে বলুন...লাউডার প্লিজ...শুনতে পাচ্ছি না!' কি করবে অশোক? তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে উঠল। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বয়ে যেতে লাগল, কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না।

এইবার এগিয়ে এল পুরকায়স্থের দল। তারা আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক, বেরিয়ে যাও। Down with the Traitor! আমাদের থিয়েটার পণ্ড করতে এসেছ!'

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে পাঁচশ' লোক রুখে উঠল। মেয়েরা যে যেদিকে পারলেন সরে পড়তে লাগলেন। চিড়ে আর গুড় নিয়ে চাষীরা ভেগে পড়ল।

ম্যানেজার বেগতিক দেখে চম্পট দিলেন। পুরকায়স্থের দল এগিয়ে চলল স্টেজের দিকে·· চেয়ার ভেঙে, আলো ভেঙে···অশোককে ধরবার জন্যে। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। সেই সুযোগে অশোক তার প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে হলের বাইরে এসে দাঁড়াল এবং এদিক-ওদিক চেয়ে সোজা ছুটতে আরম্ভ করল। যতক্ষণ গোলমাল শোনা গেল, ততক্ষণ সে নিঃশ্বাস নিতেও একবার থামে নি।

দিন পাঁচেক পরে ব্রজেন্দ্রবাবু আর কবিরাজ মশাই বসে আলাপ করছেন। দুজনেই বেজায় খুশি। অশোক পাশের ঘরে বসে খুব মন দিয়ে একটা 'এস্টিমেট' পরীক্ষা করছে। কাঠের কারবারটা বাড়িয়ে তুলতে হবে, তারই প্ল্যান। ব্রজেন্দ্রবাবু সেদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'এই অসম্ভব কাণ্ডটা কেমন করে করলেন বলুন তো ?'

কবিরাজ মশাই মৃদু হেসে বললেন, 'বিশেষ কিছুই না। শুধু কয়েক মাত্রা ব্যাঘ্রতিন্তিড়-বটিকা। গলা এমন বসল যে, কিছুতেই উঠল না।'

'কি বললেন। কি বটিকা ?' ব্রজেন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন।

'ব্যাঘ্রতিন্তিড়···অর্থাৎ আপনারা যাকে বলেন বাঘা তেঁতুল।'

'ওঃ, তাই নাকি !' বলে ব্রজেন্দ্রবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

দু'চারজন চাকর ছুটে এল। কর্তাকে এত জোরে হাসতে তারা কখনও দেখে নি।

নন্দী খুড়ো

চন্দননগরের নন্দী খুড়ো নামজাদা লোক। খুড়োর আসল নামটা ছিল গোবর্ধন। কিন্তু খুড়ী থেকে আরম্ভ করে ও-পাড়ার পটলা পর্যন্ত সবাই ডাকে নন্দী খুড়ো। গ্রামের শেষে একটা পোড়ো ভিটে। চারদিকে কেবল তেঁতুল-গাছ আর গাবগাছের জঙ্গল, তারই মধ্যে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—সেটাই ছিল নন্দী খুড়োর বাড়ি। মাথার সব চুল উঠে গেছে। দাড়ি-গোঁফ কখনও গজায় নি। হাত-পাগুলো কাঠির মতো। একটা লাঠি নিয়ে কেশে কেশে বুড়ো যখন খটাখট্ করে চলত, আমরা ভাবতাম, পিছন থেকে একটা ফুঁ দিলেই খুড়ো একেবারে আকাশে উড়ে যাবে। লোকে বলত, 'তাই তো খুড়ো, এই বুড়ো বয়সে একা-একা ঐ জঙ্গলটার মধ্যে পড়ে না থেকে গাঁয়ের ভেতর এসো না কেন ?'

খুড়ো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলত, 'কোথায় থাকব ? বাড়িটা আকাশ থেকে পড়বে, না ?'

সকলে বলত, 'বাড়ি না-হয় আমরা দশজনে চাঁদা করে তুলে দেব।'

খুড়ো রুখে উঠত, 'আহা-হা-হা, শখ দেখে আর বাঁচি না ! গাঁয়ের মধ্যে বাড়ি করে দাও, তারপর সাত ব্যাটায় মিলে দু'বেলা তামাক টেনে দাও বুড়োটাকে ফতুর করে।' বলেই, সে লাঠি নিয়ে তাড়া করত।

খুড়োর ছেলে-মেয়ে ছিল না। অনেক দিন আগে একটা মেয়ে হয়েছিল।

বিয়ে দিতে টাকা লাগবে বলে তাকে খেতে দিত না। মেয়েটা শুকোতে শুকোতে মরে গিয়েছে। খুড়ীও যখন প্রায় মর-মর, তখন একদিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে, আর আসে নি। খুড়ো তো বেজায় খুশি। কেননা এলেই খরচ বাড়ে। খুড়োর খোরাক—একবেলা শাক ভাত, একবেলা জল-সাগু। লোকে বলে, তার শোবার ঘরের মেঝেতে, সাত হাত মাটির নিচে সাত ঘড়া টাকা পোঁতা আছে। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমোয়, খুড়ো লাঠি হাতে কাশে, আর পাহারা দেয়। পাড়ার লোকেরা হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে খাবার আগে খুড়োর নাম করে না। তোমরা যখন এ গল্প পড়বে, রান্না হয়েছে কিনা জেনে তবে পড়ো। নৈলে বুঝতেই পারছ···

সেবার নন্দী খুড়োর বেজায় অসুখ। খুড়োর আনন্দ আর ধরে না। ঐ একবেলা ভাতের খরচ—তাও লাগবে না। এবার দু'বেলাই জল-সাগু। কিন্তু তিন চার দিনেই অবস্থা বেশ কাহিল হয়ে উঠল। গাঁয়ের দু'একজন ভদ্রলোক গিয়ে বললেন, 'একজন ডাক্তার ডেকে আনি, কি বল?'

খুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরোও সব, বেরোও আমার বাড়ি থেকে। সাত ব্যাটা মিলে যুক্তি করে আমাকে ফতুর করতে এসেছ, না?' বলেই খক্ খক্ করে কাশি। 'আমার সঙ্গে চালাকি?' আবার খক্ খক্ খক্!

তারপর খুড়ো যখন প্রায় মর-মর, তখন খুড়ীকে খবর দেওয়া হল। খুড়ী এসে দেখল, কাশির চোটে বুড়োর দম আটকায় আর কি! বলল, 'তুমি এখনও খক্-খক্ করছ, পোড়া যম কি তোমায় চোখে দেখে না?'

খুড়ীর দিকে একবার চেয়ে, খুড়ো কাশির বেগে গজ্‌গজ্ করে বলল, 'হ্যাঁ' আমি মরি, আর তোমরা সাত ব্যাটায় মিলে আমায় ফতুর করে দাও।'

খুড়ী তো অবাক! বলল, 'পোড়া কপাল! মরেই যদি গেলে, তারপরেও ফতুর হবার ভাবনা?'

খুড়ো হাঁপাচ্ছিল, একটু দম নিয়ে বলল, 'থাম্, থাম্।'

সেইদিনই সন্ধ্যা বেলায় নন্দী খুড়োর মৃত্যু হল। খুড়ী যাই বলুক, তবু স্বামী তো? 'ওগো, আমার কি হবে গো?' বলে, একদিন একরাত কাঁদল।

পাড়ার লোকজন এসে বলল, 'আর কেঁদে কি হবে খুড়ী, খুড়ো যা কিছু রেখে গেছে, তার থেকে ওকে একটু জল দাও! বেচারী সারা জীবন না খেয়ে মরেছে, এবার একটু খেয়ে বাঁচুক।'

তারপর আমাদের সে কি স্ফূর্তি। লাঠি-সোঁটা, কোদাল, কুড়ুল যা যেখানে ছিল, সব জড় হল। গাঁয়ের সব ছেলে-বুড়োয় মিলে নন্দী খুড়োর পোড়ো-বাড়ি খুঁড়তে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই ঘরের মেঝে। কিন্তু একি হল! সাত হাত কেন, দশ হাত গর্ত করে ঘড়া দূরের কথা, একটি ঘটিও মিলল না। সমস্ত লোক রুখে গেল। বাড়িময় কোদাল চলল। সারাদিন গেল, রাত হল। তারপর রাত যখন প্রায় দুপুর, বাড়ির এ কোণে একটা তেঁতুল-গাছের গোড়ায় দমাদম কোদাল পড়ছে, হঠাৎ মাটির নিচ থেকে একটা ভীষণ গলায় গোঁ-গোঁ শব্দ। সকলেই থমকে দাঁড়াল। এবার আবার সেই খক্ খক্

খক্ কাশির শব্দ। তারপর শোনা গেল, কে যেন নাকি-সুরে ঘড়-ঘড় করে বলছে, 'আরে বাবা, মঁনে কঁরেছ, খুঁড়ো মঁরেছে, এঁবার সাত ব্যাটায় মিঁলে তাঁকে ফঁতুর কঁরবে? সেঁটি হঁচ্ছে নাঁ। রীতিঁমতো লাঁঠি নিঁয়ে এঁখনও রাত জাগছি। আর এঁককোপ দিঁয়েছ কিঁ মাঁথা ফাটবে!' খক্ খক্ খক্।

তারপর এক মহামারী কাণ্ড! কোথায় গেল কোদাল-কুড়ুল, আর কোথায় গেল লাঠি? 'বাবাগো, মাগো!' বলে, যে যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল এবং ঘরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কপাটে খিল দিল।

সেইদিন থেকে গ্রামের কেউ আর সে-মুখোও হয় না। নন্দী খুড়ো তেঁতুল-তলায় নির্বিবাদে পাহারা দেয়। এমনি করে বছর খানেক গেল। একদিন এক কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, 'নন্দী খুড়ো কোথা গিছে?'

ছেলেরা বলল, 'কেন?'

'বুড্ডা হামারা কাছে কাপ্ড়া লিছে। হামি দো-টাকা দো-আনা পাবে।'

সকলে হেসে উঠল, 'আর পেয়েছ তোমার দু-টাকা দু-আনা। সে-বুড়ো মরে ভূত হয়ে তার টাকা আগলাচ্ছে। দেখে এসো না তেঁতুল-তলায়!'

কাবুলি চটে উঠল, বলল, 'কেয়া, ভূত হুয়া? হামিও ভূত আছে। হামি দেখে লিবে সে কেমন ভূত আছে!' বলে, লাঠি দেখালে।

সেই তেঁতুলগাছের গোড়ায় গিয়ে কাবুলি হাঁকল, 'হো নন্দী খুড়ো—নন্দী খুড়ো হো!'

কোনো সাড়া নেই। কাবুলি গলা চড়িয়ে লাঠি ঠুকে ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তেঁতুলগাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপরই বার কয়েক খক্ খক্। সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচ থেকে একটা মাথা উঠল, যেন প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ি। বড় বড় দুটো চোখ, আর কুলোর মতো দুটো কান। তার নিচে সরু-সরু দুখানা পা, আর কিছু নেই।

কাবুলি হেসে উঠল, 'তোমার হাত কোথা গিছে, খুড়োবাবু?'

'দরকার নেই খাঁ-সাহেব। এখন আর খেতে হয় না। মস্ত খরচ বেঁচেছে। পা-ও যাচ্ছে। থাকবে কেবল চোখ আর কান। পাহারা দিতে হলে ঐ দুটোই চাই। নৈলে সাত ব্যাটায় মিলে দেবে আমায় ফতুর করে।'

কাবুলি বলল, 'বেশ! বেশ! হামারা দো-টাকা দো-আনা, আউর উস্‌কো সুদ।'

খুড়ো তাড়াতাড়ি বলল, 'সেসব তো ও জন্মের কথা। আমি তো আর বেঁচে নেই।'

এক কথায়, দু'কথায় লেগে গেল বিষম তর্ক। কাবুলি রেগে গিয়ে লাঠি নিয়ে নন্দী খুড়োর মাথার উপর মারল। কিন্তু কোথায় খুড়ো? কোথাও কিছু নেই। খালি তেঁতুলগাছের উপর লাঠিটা ভীষণ জোরে পড়ে ভেঙে গেল, আর মাটির নিচ থেকে ভাঙা গলার বিকট হাসি গুম-গুম করে মাটি কাঁপিয়ে তুলল।

কাবুলিও রাগে ফুলতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় এক মতলব এল।

এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'ওঃ, তুমি ভূত আছে, হামিও ভূত হোবে!' বলে, তার সেই প্রকাণ্ড পাগড়িটা খুলে গাছের ডালে টাঙিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ল। আমরা চিৎকার করে উঠলাম।

কাবুলি গলায় দাঁড় দিয়ে মরল। মড়াটাকে কোথায় নেওয়া যায় এ সব ভাবছি, হঠাৎ মাটির নিচে দুড়ুম্ দুড়ুম্ শব্দ!

একটা ভাঙা মোটা গলা ক্রমাগত গর্জন করছে, 'রুপেয়া দেও—দো-টাকা দো-আনা, আর সুদ।'

আর একটা সরু গলা ঘড়-ঘড় করে বলছে, 'আহা, বোসো না, একটু তামাক খাও!'

আবার সেই গর্জন, 'নেহি, আভি রুপেয়া দেও।'

হায় রে নন্দী খুড়ো! মরেও কাবুলিওয়ালার দেনা এড়াবার উপায় নেই।

শেষটা কি হল জানতে পারি নি। আমাদের দলের দুজন পাণ্ডা—ভুলো আর মোন্তা, হঠাৎ কি মনে করে দে ছুট্। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কোনোরকমে জান্ নিয়ে পালিয়ে বাঁচি।

লটারি

ভগেলু ধোপা দেশে যাবে। শুনেছি সে নাকি আর ফিরবে না। টাকা পয়সা যেখানে যা পাওনা ছিল আদায় হয়ে গেছে। জিনিসপত্তর পোঁট্লা-পুঁট্লিও বাঁধা-ছাঁদা শেষ। গোল বেধেছে তার গাধাটাকে নিয়ে। ইস্টিশনের মালবাবু বলেছেন, ওটাকে নিয়ে যেতে হলে তের টাকা সাড়ে পাঁচ আনা লাগবে। কাজেই বিক্রি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু গাধাটাকে কিনবে কে?

পাঁচকড়ি পাঠকের সেজ ছেলেটা এই বয়সেই একটু অতিরিক্ত চালাক হয়ে পড়েছে। তার বাপ আর তাকে বাগ মানাতে পারছে না। কবিরাজ মশাই ব্যবস্থা করেছেন, রোজ আধসের করে গাধার দুধ। ভগেলু তাই শুনে পাঁচ-কড়ির বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করেছিল। কিন্তু ছেলেটা জানতে পেরে তাকে লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করেছে যে, সেখানে আর যাওয়া চলে না।

ভগেলু অবশ্য শেষটায় নগেশবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল। নগেশবাবু মানে ও-পাড়ার নগেশদা'। পাকা লোক। এই তিন বছর ফার্স্ট ক্লাসে আছেন। মড়া পোড়াতে, খোল বাজাতে, লাঠি চালাতে আর পরীক্ষায় ফেল করতে তাঁর জোড়া নেই। ভগেলুর বিপদ শুনে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। কাল আসিস্, আমি গাধা কিনব।'

পরদিন তিন টাকা চার আনায় নগেশদা' গাধাটা কিনে নিলেন। সবাই বললে, 'নগেশের মতলবটা কি?'

সেটা অবিশ্যি পরদিনই বোঝা গেল। সকালে উঠেই দেখলাম, ইস্কুলে, কালীবাড়িতে, কাছারিতে, বাজারে বড় বড় বিজ্ঞাপন:

লটারি! লটারি! লটারি!

একটি চমৎকার গাধা।
টিকিট একআনা মাত্র।

ইস্কুলে নগেশদা'র বেজায় প্রতাপ। সবাইকেই টিকিট কিনতে হল। এমনকি দারোগাবাবুর ছেলে অজয়ও বাদ পড়ল না। অজয় অবশ্য গোড়াতে রাজী হয় নি। সে যে-সে ছেলে নয়। সারা বছর ক্লাসে একটি কথা বলে না। সেইজন্য গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ তার একচেটে। কিন্তু নগেশদা'র পাল্লায় পড়ে সেও একটা কিনল।

লটারি হল দিন তিনেক পরে। খেলার মাঠে থার্ড্ মাস্টার জগৎবাবু একটা বড় টিনের কৌটায় টিকিটগুলো পুরে খুব খানিকটা ঝেঁকে নিলেন। তারপর তাঁর তিন বছরের ছেলে মিণ্টুকে বললেন, 'একখানা কাগজ তোল।'

মিণ্টু তুলল। সবারই বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে, কার নাম ওঠে। জগৎবাবু হেঁকে বললেন, 'অজয় সেন।'

অজয় বাড়িতে বসে আঁক কষছিল। ছেলের দল গিয়ে খবর দিতেই হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু কাঁদলে ছাড়ে কে? সবাই মিলে ধরে এনে তাকে সেই গাধার পিঠে চড়িয়ে দিলে। তারপর আরম্ভ হল প্রসেশন। সে কি প্রসেশন! রাজা গজেন মল্লিকের ছেলের বিয়েতেও তেমনটা দেখি নি। গাধার গলায় একটা দেড়শ' হাত দড়ি। দু-শ' ছেলে তাই ধরে টানছে, এ ছাড়া আশেপাশে এবং পিছনে আরও শ'দুয়েক। বাদ্য হরেক রকমের। স্বয়ং নগেশদা'র কাঁধে খোল। এ ছাড়া গোটা চারেক ক্যানাস্তারা, একটা ধামা, গোটা পাঁচেক কুলো, একটা প্রকাণ্ড শিঙে। সবগুলোর সঙ্গে গাধাটার আনন্দ-ধ্বনিটা বেশ খাপ্ খেয়ে গেল। কিন্তু অজয়ের 'ভেউ-ভেউ'টা আর শোনা যাচ্ছিল না।

সন্ধ্যার সময় থানার কাছে এসে শোভাযাত্রা থামল। গাধার দড়িটা অজয়ের হাতে দিয়ে নগেশদা' থিয়েটারী কায়দায় বললেন, 'নাও ভাই, নামমাত্র মূল্যে যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলে প্রাণপণে তাকে রক্ষা করো।'

অজয় তিন হাত ছিটকে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বললে, 'কক্ষণো না, আমি নেব না। সব জোচ্চুরি, আমি বাবাকে বলে দেব, সব জোচ্চোর!'

নগেশদা' অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাবে বললেন, 'তা বোলো, কিন্তু ঐটা তোমার জিনিস। বেঁধে না রাখলে পরের ক্ষেতে গিয়ে হাজির হবে। তারা নিয়ে যাবে খোঁয়াড়ে। ছাড়াতে পয়সা লাগবে। সেটা বুঝে দেখ।'

থানার একটা সিপাই বুদ্ধি করে গাধাটাকে সে-রাতের মতো হাজত-ঘরে বন্ধ করে রেখে দিলে। সেদিন হাজতে কোনো আসামী ছিল না।

অজয়ের বাবা মফস্বলে গিয়েছিলেন। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন এবং ভোর না হতেই পুলিশ সাহেবের লঞ্চ্ এসে থানার ঘাটে ভিড়ল। সিপাই এবং বাবুদের মহলে হুলস্থূল পড়ে গেল। গাধাটার কথা কারুর খেয়ালই রইল না।

বেলা তখন গোটা দশেক। পুলিশ সাহেব আফিসে বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। হঠাৎ পাশের ঘরে বেজায় জোরে গর্দভের মিষ্টিকণ্ঠ হেঁকে উঠল।

ব্যাপার কি ? সাহেব উঠে গিয়ে একটু মুচকি হেসে দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি মকদ্দমার আসামী ?'

দারোগাবাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, চুরি এবং ট্রেসপাস্। একজনের জমিতে ঢুকে পাকা ধান খেয়েছে। তদন্তটা শেষ করেই ৩৭৯ এবং ৪৫৪ ধারায় চালান দেব।'

সাহেব বললেন, 'ওঃ !'

পুলিস সাহেবের লঞ্চ্ ছেড়ে যেতেই দারোগাবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল, 'এই ইধার আও কিষ্কিন্ধ্যা সিং, গন্ধমাদন পাঁড়ে। কোন্ বেয়াকু ফ্কা কাম হ্যায় ?'

জানা গেল, 'বেয়াকুফ্' আর কেউ নয়, তাঁরই শ্রীনন্দন অজয়কুমার। অজয়ের ডাক পড়ল।

দারোগাবাবু তেড়ে উঠলেন, 'ব্যাটা উজবুক, চাকরিটা খেয়েছিলি আর কি ! ভাগ্যিস্ ফস্ করে বুদ্ধিটা যোগাল। কোথায় পেলি ওটাকে ? বল্ শীগ্গির।'

অজয় সমস্ত ইতিহাস বলে গেল। নগেশদা'র নামে একটু বেশী করে বলল। দারোগাবাবু রুখে উঠলেন, 'বটে, আমার সঙ্গে চালাকি ! সব ব্যাটাকে ৩৯৫ ধারায় চালান করব। ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখ নি। আভ্ভি নিকাল দাও গন্ধমাদন পাঁড়ে, পিঠমে ডাণ্ডা মারকে নিকাল দাও।'

হুকুম পেয়ে সিপাই জোরে ডাণ্ডা মেরে গাধাটাকে বিদায় করে দিলে।

দিন সাতেক পরের কথা। দারোগাবাবু মফস্বল যাবার জন্যে ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, এমন সময় ইউনিয়ন বোর্ডের এক চাপরাসী সেই গাধাটা নিয়ে উপস্থিত। একগাল হেসে সেলাম করে বললে, 'দিন পাঁচেক হল একে হালদাররা খোঁয়াড়ে দিয়েছিল। হুজুরের জিনিস জানতে পেরে নিজেই নিয়ে এসেছি।' বলে, একখানা কাগজ হাতে দিল।

দারোগাবাবু দেখলেন, সাত টাকা সাড়ে এগারো আনার একটা বিল। তিনি গর্জে উঠলেন, 'নেহি লেগা। উ গাধা হামারা নেই হ্যায়। ভাগো হিঁয়াসে।'

চাপরাসী বলল, 'আজ্ঞে, আপনার ছেলের মানেই আপনার। খোকাবাবুর কপালের জোর আছে। চার পয়সায় এমন একটা জলজ্যান্ত গাধা…'

দারোগাবাবু ঘোড়ার গদিটা তুলে নিয়ে চাপরাসীকে তাড়া করলেন। কিন্তু টাকাটা শেষপর্যন্ত দিতে হল। সরকারী খোঁয়াড়। না দিয়ে উপায় কি ?

আবার অজয়ের ডাক পড়ল। দারোগাবাবু তিনটি আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এক…দুই…তিন। তিন দিন সময় দিলাম। চার দিনের দিন যদি ওই আপদ্ কোথাও দেখতে পাই, তোমার হাড় আর মাংস এক জায়গায় থাকবে না, জেনে রেখে দাও।'

অজয় সে কথা জানত। কিন্তু তিন দিন তো দূরের কথা, তিন বছরেও এই গাধার হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো রাস্তা তার চোখে পড়ল না। আরও

বিপদ এই যে, গাধাটা কিষকিন্ধ্যা সিং আর গন্ধমাদন পাঁড়ের হাতে ক্রমাগত ডাণ্ডা খেয়ে অজয়ের ভয়ানক বাধ্য হয়ে উঠল। একদণ্ড তাকে না দেখলেই গলা ছেড়ে এমন বিলাপ শুরু করে যে, আশপাশের সকলের মাথায় রীতিমতো খুন চেপে যায়।

অজয়ের চোখে আর ঘুম নেই। দু'দিন চলে গেছে। তিন দিন যায়-যায়। রাতে শোবার ঘরে বসে বসে সে ভাবছিল কি করা যায়। থানার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বেজে গেল। অজয়ের মাথায় তখন এক ফন্দি এসেছে। গাধাটা মাঠে বাঁধা ছিল। চুপি চুপি গাধার দড়িটা ধরে অজয় অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

পুরো চার মাইল রাস্তা হেঁটে কৃষ্ণপুর। সেখানে একটা ধোপার আড্ডা আছে, তাদের কয়েকটা গাধাও আছে। গাধাগুলো বাইরেই চড়ে বেড়াচ্ছিল। অজয় আস্তে আস্তে তাদের কাছে গিয়ে তার গাধাটাকে ছেড়ে দিলে। তখনও একটু রাত ছিল, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে সরে পড়ল।

এতদিন পরে সমস্যাটা মিটল, এই ভেবে অজয়ের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। খানিকটা পথ যেতেই শুনতে পেল, তার গর্দভচণ্ডী পাড়া মাথায় করে গান ধরেছে। অজয় জোরে জোরে পা চালাতে লাগল। আরও কিছুদূর যেতেই দেখলে, তার গাধাটা প্রাণপণে ছুটে আসছে।

এদিকে ধোপাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারা চট্ করে বুঝে ফেলল, নিশ্চয়ই কেউ তাদের গাধা চুরি করতে এসেছে। একটা লোকের পেছনে একটা গাধাকে ছুটতে দেখে তাদের সন্দেহ বেড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাড়া করল। অজয় তখন প্রাণপণে ছুটছে। কিন্তু কতক্ষণ? ধোপারা এসে তাকে ধরে ফেলল এবং কিছু বলবার আগেই দু-চারটে চড়-চাপড় বসিয়ে দিলে। অজয় অনেক করে বলল, 'সে চুরি করতে যায় নি, বরং একটা গাধা তাদের দান করতে গিয়েছিল।' সকলে তো হেসেই খুন। আহা! কত বড় দয়ালু! রাত দুপুরে উনি গাধা দান করতে এসেছেন!

যাক, ছেলেমানুষ বলে অজয়কে আর বিশেষ কিছু উত্তম-মধ্যম সইতে হল না। তবে, এ রকম চোরের উচিত সাজা হওয়া দরকার, এই মনে করে ধোপারা চোবাই-মাল সুদ্ধ তাকে থানায় নিয়ে চলল।

তখন বেলা হয়েছে। থানার বারান্দায় বসে দারোগাবাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। অজয়কে তাঁর সামনে এসে হাজির করা হল। হাতে-কোমরে দড়ি বাঁধা, আগে-পিছে তিন-চারজন ধোপা। দারোগাবাবু হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল। টেবিলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল উঠানে, একটা কুকুরের গায়ে। সেটা ঘেউ-ঘেউ করে ছুটল। দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, 'নিকাল দেও, নিকাল দেও, কিষকিন্ধ্যা সিং, গন্ধমাদন পাঁড়ে।'

ধোপারা হাত জোড় করে বলল, 'দোহাই হুজুর, আমরা কোনো অপরাধ করি নি। এই চোট্টা আমাদের গাধা চুরি করে পালাচ্ছিল। মালসুদ্ধু ধরে

এনেছি। বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন।' বলে, সেই গাধাটাকে হাজির করল।

ব্যাপার দেখে দারোগাবাবুর মাথার সমস্ত মগজটাই ঘুলিয়ে গেল। অজয় সব কথা বুঝিয়ে বলতেই তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের গাধা নিয়ে যাও। চোর আমার জিম্মায় রইল।'

ধোপারা গাধা নিয়ে চলে গেলে দারোগাবাবু কিষকিন্ধ্যা সিংকে ডেকে বললেন, 'খোকাবাবুকো এক রুপেয়াকা রসগুল্লা, আউর দোঠো লেমনেড খিলায় দেও।'

গাধার সমস্যাটা এত সহজে মিটবে, দারোগাবাবু তা আশা করেন নি।

অ্যাক্সিডেন্ট্

ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস ঘণ্টা চারেক লেট। হাওড়া পৌঁছবার কথা ভোর বেলায়। ব্যাণ্ডেল আসতেই বাজল নটা। কাগজওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল। একখানা বাংলা কাগজ কিনলাম। ভাঁজ খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের নামটা চোখে পড়তে থেমে যেতে হল। পড়ে দেখলাম, কাল রাতে আমার মৃত্যু হয়েছে। চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে আর একবার পড়লাম। না, ভুল করি নি। নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'হাটখোলা-নিবাসী বিখ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রীগোলোক চন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে মথুরা এক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে ট্রেন হইতে পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি হউক।'

বর্ণনা নির্ভুল। আমারই নাম গোলোক সান্যাল। নিবাসও হাটখোলা। বস্ত্র-ব্যবসায়ে কিছুদিন হল 'বিখ্যাত' হয়েছি, সে-কথাও ঠিক। যে রাস্তা ধরে বিখ্যাত হয়েছি সেটা ঠিক 'সাদা' রাস্তা নয়। সেইজন্যই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় আমার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেছেন।

প্রথমটা বেশ মজা লাগল। মন্দ কি? নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজেই পড়ছি। সে-সুযোগ ক'জন পায়? হঠাৎ গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো! রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কে জানে, তখন যদি দেহান্তর হয়ে গিয়ে থাকে? এই যে আমি শ্রী গোলক সান্যাল, মথুরা এক্সপ্রেসের একখানা ক্লাস 'টু' কামরায় বসে কাগজ পড়ছি, এ হয়তো ঠিক কালকের 'আমি' নই। নাড়ি দেখলাম; ঠিক আছে। নিঃশ্বাস? তাও বইছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম, রীতিমতো লাগছে। গাড়িতে রোদ এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, ছায়াও পড়ছে। তবে?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?'

বসে পড়ে বললাম, 'না, না, ও কিছু নয়।'

অন্য লোককে কেমন করে বলি যে আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে

বেরিয়েছে সেই খবর ? মনে পড়ল, অনেকদিন আগে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। কে এক যাদব চক্রবর্তী, বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল, তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বল, আরে এই তো আমি বেঁচে আছি কিন্তু কেউ স্বীকার করে না। আমার কি সেই দশা হল ? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। এই সেদিনও পাড়ায় শখের থিয়েটারে ২০০ টাকা দিয়েছি। গিন্নীর হাতে ভারী আর্মলেট। হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা খোলোর দাম বলে নিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা। নাঃ, আমি দু-নম্বর যাদব চক্রবর্তী হতে রাজী নই। এসব এই কাগজওয়ালাদের ধাপ্পা। নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আমার নাম গোলোক সান্যাল।

হাওড়ায় পেঁছে বাড়ি যাওয়া আর হল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটলাম সেই কাগজওয়ালার আফিসে।

একটা প্রকাণ্ড টেবিল। পুরোনো বনাতে মোড়া। জায়গায় জায়গায় কালির দাগ। মাঝে মাঝে ছেঁড়া। একরাশ কাগজপত্তর ছড়ানো তার ওপর। একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক এক মনে লিখে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। আমার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, 'বসুন।' বলেই আবার ডুবে গেলেন লেখার মধ্যে।

খানিকক্ষণ বসে থেকে বললাম, 'আপনিই কি সম্পাদক ?

'সহকারী সম্পাদক।'

'আপনাদের আসল ব্যবসাটা কি বলুন তো ?'

এবার তিনি চোখ তুললেন। কাগজখানা তাঁর সামনে ফেলে দিয়ে বললাম, 'এসব কী হচ্ছে ? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়ে কাজ হাসিল করতে চান ?'

সহকারী সম্পাদকের নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে হাঁ-টা বড় হয়ে গেল। পুরু চশমার আড়ালে চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। মুচকি হেসে মিহি গলায় বললেন, 'দেখুন, প্রথমত, আপনিই যে গোলোক সান্যাল সে-কথা এখনো প্রমাণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে আমাদের সংবাদদাতা এ খবরটা কোত্থেকে পেয়েছেন। তৃতীয়ত…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক, আর তৃতীয়তে দরকার নেই। এই নিজস্ব সংবাদদাতার ঠিকানাটা দিন। বোঝাপড়া ঐখানেই করে নেবো।'

সহকারী মহাশয় গলাটা আরো মিহি করে বললেন, 'আজ্ঞে, সংবাদদাতার নাম-ঠিকানা আমরা প্রকাশ করতে পারি না।'

'কেন ?'

'ওটা সাংবাদিক রীতি নয়।'

'তার মানে, ঐসব সংবাদদাতা-টাতা সব ভুয়ো। আজগুবি খবরগুলো বুঝি এই বনাত ছেঁড়া টেবিলে বসেই তৈরী হয় ?'

কোনো জবাব এল না। কাগজটা তুলে নিয়ে বললাম, 'এই দামী খবরটা *কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটুকু বলবেন কি ?'*

'ঐ কাগজে যেটুকু আছে, ওর বেশী আমার কিছু বলবার নেই।'

কাগজটা খুলে দেখলাম, খবর এসেছে ধানবাদ থেকে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, আসলে দেখলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন। ধানবাদের মতো জায়গায় খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দাবিভাগের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন কিছু একটা না করে যাই-বা কি করে? একদিন এ-পাড়া, একদিন ও-পাড়া ধরনা দেওয়া শুরু করলাম। বাংলা কাগজখানার নামই কেউ জানে না, তার সংবাদদাতার খোঁজ দেওয়া তো দূরের কথা। একটা উড়ো খবর পেয়ে ঘুরে এলাম দিন দুই। এমনি করে কেটে গেল ছ-সাত দিন। শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে এসেছে। ফিরে যাব মনে করেই শেষটায় ইস্টিশনে ওয়েটিং রুমে এসে আড্ডা গেড়েছি। দেখলাম, একজন খদ্দর-ধারী চশমা-পরা ছোকরা রোজ কলকাতার খবরের কাগজগুলো বুঝে নিতে আসে। গাড়ি আসতেই চেপে ধরলাম তাকে।

'আপনিই কি অমুক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা?'

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'কেন বলুন তো?'

বুঝলাম, নরম রাস্তা ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, 'বিদেশী লোক, বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনিই তাহলে—'

'হ্যাঁ, আমিই এখানকার রিপোর্টার। বলুন কি করতে হবে আমাকে?'

'ওঃ, বাঁচালেন মশাই। এই খবরটা দেখুন। এই গোলক সান্যাল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইনি কি করে মারা গেলেন, দেহটারই বা কি ব্যবস্থা হল? অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা—বিশেষ করে ওঁর বাড়ির সবাই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না। রেলপুলিশে খবর নিন। মৃতদেহ এখানেই আনা হয়েছিল। ময়না তদন্তও হয়েছে, এই পর্যন্ত জানি। নামধাম সব ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি।'

পরদিন রেল-পুলিশের আফিসে হানা দিলাম। দারোগাবাবু মন দিয়ে আমার সব কথা শুনে গেলেন এবং একটা গোটা সিগারেট শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে এবং আপনার এ খবরে কি দরকার?'

'আমি গোলক সান্যালের নিকট-আত্মীয় আর সেইজন্যে এ খবরে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমরা তো সেইদিনই তার বাড়ির ঠিকানায় তার করে সব জানিয়ে দিয়েছি।'

নিজের অগোচরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী বললেন? বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন?'

'তা ছাড়া আর কি করা যেত বলুন? কোনো অন্যায় হয়েছে কি?'

'শুধু অন্যায় ? সর্বনাশ ! চরম সর্বনাশ করেছেন আপনি।'

দারোগার চোখে-মুখে ঘোর সন্দেহের ছায়া পড়ল। আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি ?'

নাম মুখে এসে গিয়েছিল, সামলে নিলাম। সত্য পরিচয় দিয়ে লাভ হত না। বিশ্বাস করবে না। বললাম, 'নাম জেনে আর কি হবে আপনার ?'

'জানতে একটু ইচ্ছে হয় বৈকি। নতুন আলাপ হল।'

হঠাৎ যা মনে এল বলে ফেললাম, 'আমার নাম গোবিন্দলাল সামন্ত।'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'দেখুন বাবুসাব, আমরা পুলিশের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। কিন্তু যতটা কম আপনারা মনে করেন, ঠিক ততটা নয়। সান্যালের আত্মীয় হতে হলে আর যাই হোক, সামন্ত হওয়া চলে না। নামটা বদলে দিন। নইলে অনেক ফ্যাসাদ। জানেন তো পুলিশের লোক আমরা।'

এর পরে আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না। বললাম, 'তা জানি বৈকি ! আপনাদের বিদ্যের কি আর অন্ত আছে ? একটা জ্যান্ত মানুষকে শুধু মড়া বানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, মরার খবরটা বেশ ঘটা করে তার বাড়িতে জানিয়েও বসে আছেন।'

দারোগাবাবু এবার চটলেন। রুক্ষ ভাবে বললেন, 'এসব আপনি কি বলছেন ?'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছি। আমার আসল নামটা শুনলে বিশ্বাস করবেন ? যে লোকটাকে নিয়ে আপনারা এত কাণ্ড করছেন, আমিই সেই গোলক সান্যাল।'

চলে যাচ্ছিলাম। দারোগাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায় ? উঁহু, এটা মোটেই সাধারণ অ্যাক্সিডেণ্ট নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে।' বলে, একটি হাঁক দিলেন, 'এই, কোন্ হ্যায় ?'

একজন সিপাই ছুটে এল। দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, 'উন্‌কে হাজতমে লে যাও।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। কিছু মনে করবেন না, আবার কাল দেখা হবে। নমস্কার।'

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। না-হয় ছেপেছিল একটা মৃত্যুসংবাদ। সত্যিসত্যিই তো আর মরি নি। শুধু কাগজে-কলমে মরা। কোনো ক্ষতি ছিল না। আর এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দু-রাত ধরে ছারপোকা আর মশা মিলে যে রকম রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত-ঘর থেকে যে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব, এমন ভরসা নেই। দুটো দিন পেটে কিছু পড়ে নি। দারোগাবাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেন নি। ত্রুটি আমারই, সেটা মুখে তুলতে পারি নি। ছেঁড়া কম্বলের ওপরে একরকম অসাড় হয়ে পড়ে ছিলাম। একটি পুলিশ এসে বলল, 'আমাকে এবার জেলে যেতে হবে।'

যেখানে হোক যাবার জন্যে মনটা অত্যন্ত ছটফট করছিল। বললাম, 'বেশ চল। জেলেই চল।'

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি। তারই একটা দিক পুলিশের হাতে। সবাই তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত দেখিয়ে হাসছে। দুধার থেকে কানে আসছে, চোট্টা হ্যায়···নামকরা পকেট-মার···কি রকম ডাকাত দেখেছ?

চোখে জল এসে পড়ল খানিকটা। পাশ দিয়ে একখানা গাড়ি চলে যাচ্ছিল। যে লোকটি ভিতরে বসে, মনে হল যেন চেনা মুখ। সেও ঝুঁকে পড়ে দেখল। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তার চোখ এড়ানো গেল না।

'এই, রোখো, রোখো।'

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধানবাদের কয়লা-খনির মালিক বংশীপ্রসাদ, আমার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু। চোখের জল এবারে আর বাধা মানল না, অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

'বেপার কি সানিয়েল বাবু?'

ব্যাপার বলবার মতো অবস্থা তখন আমার নয়। তবু, বংশীপ্রসাদের গাড়িতে থানায় ফিরে এলাম এবং খানিকটা সামলে নিয়ে মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বললাম। বংশীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরেই সেই দারোগাবাবুটি ছুটতে ছুটতে এলেন। একগাল হেসে, একরাশ ক্ষমা চেয়ে এবং একবোঝা বিনয় দেখিয়ে, এমন আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কখন এর হাত থেকে রেহাই পাব। রেহাই পেতে অবিশ্যি দেরি হল না। বংশীর গাড়িতে যেতে হল তার বাড়ি, সেখান থেকে কিছু মুখে দিয়েই সোজা ইস্টিশনে।

তীর-বেগে ট্যাক্সি ছুটছে। বাড়ির কাছে এসে কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই। মনটা বিষিয়ে উঠল। স্ফূর্তি করবার আর সময় পেলেন না বাবাজীরা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

গেটে গাড়ি থামল। কিন্তু এ কি! এত লোকজন কিসের? দুধারে কলাগাছ। আগাগোড়া গেটটা ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। বাড়ি ভুল করি নি তো? নাঃ। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, একেবারে চক্ষুস্থির। সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি জুড়ে জমকালো চাঁদোয়া খাটানো। তার নীচে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। মেহগনির খাট, তার ওপরে দামী বিছানা, চৌকি, আসন, বোঝা-বোঝা বাসন-পত্তর, রুপোর সেট, ছাতা, জুতো, কার্পেট, শতরঞ্জি, আরো কত কি! হঠাৎ চোখে পড়ল তারি মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান···মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে পুরোহিত। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা হচ্ছে শ্রাদ্ধবাসর। শ্রাদ্ধ হচ্ছে আমারই। ছেলেরা বেশ ঘটা করেই করছে, যেমনটা ঠিক হয়ে থাকে অন্য পাঁচজন বড়লোকের বেলায়।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে! ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরোহিত তার হাতে এক কুশী জল দিয়ে বললেন, 'ভীত হয়ো না বৎস। নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার প্রেতাত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল সিঞ্চন কর। বল, স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব।'

হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেতাত্মা! লাথির পর লাথি মেরে সব একাকার করে দিলাম। প্রেতাত্মা! হঠাও সব। চারিদিকে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল অত বড় শ্রাদ্ধবাসর।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখলাম, সে আর এক কাণ্ড। হলঘরের মেঝের উপর গিন্নী পড়ে আছেন। পরনে সাদা থান, গায়ে গয়না নেই, পুরোপুরি বিধবার বেশ। দু-তিনজনে মাথায় জল ঢালছে। জ্ঞান নেই।

এমন সময় খবর এল, পুলিশের কোনো সাহেব এসেছেন দেখা করতে। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়।

'কি চাই বলুন?'

'আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর বেরিয়েছিল সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সব কাগজে প্রতিবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'সে তো দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

পুলিশ-সাহেব একখানা নাম-ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, 'এটা আপনার কার্ড?'

'হ্যাঁ, আমারই কার্ড। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন?'

'২২ তারিখে ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস থেকে নামতে গিয়ে একজন লোক হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মণিব্যাগে নাম-ঠিকানা-লেখা এই কার্ডখানা ছিল।'

'ওঃ! সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক! এলাহাবাদে তার সঙ্গে আলাপ। আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। একখানা কার্ড দিলাম। মনিব্যাগেই যেন রাখল মনে হচ্ছে। আহা! লোকটি মারা গেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন?'

পুলিশ-সাহেব কথা বললেন না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভুলটা ধরা পড়ল কি করে?'

'ময়না তদন্তে ডাক্তারের সন্দেহ হল, মৃত ব্যক্তি বোধ হয় মারোয়াড়ী। আরো তদন্ত চলল। তারপর ধানবাদ থানায়…'

'তার সাক্ষী তো আমি নিজেই। কিন্তু এই ভুলটা আগে জানতে পারলে নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না। আর এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধও এড়ানো যেত।'

পুলিশ-সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। মন্থরগতিতে মাথা চুনি করে বেরিয়ে গেলেন।

'হ্যালো ?'

'আমি নবেন্দু।'

'কেমন আছ নবেন্দু ? অনেক দিন খোঁজ-খবর নেই।'

'খোঁজ-খবর আর কেমন করে নেব, বলুন ? বড় বিপদে পড়েছি।'

'বল কি ! কী বিপদ ?'

'বিপদ সাংঘাতিক। 'মুক্তধারার' সম্পাদক বারবার তাগিদ দিচ্ছেন, পুজো-সংখ্যার জন্যে একটা গল্প চাই। পুজো এসে গেল। গল্পটাও মাথায় এসে গেছে, কিন্তু বসে লিখবার মতো একটা ঘর পাচ্ছিনে।'

হেসে বললাম, 'কেন, তোমাদের বাড়ির ঘরগুলো সব কোথায় গেল ?'

নবেন্দু একটু থেমে চাপা গলায় বলল, 'বাড়িতে বড়দিদি রয়েছেন যে।'

সত্যিই তো। এ খেয়াল আমার আগেই হওয়া উচিত ছিল।

নবেন্দুর বিপদটা বুঝতে হলে তার বড়দিদির একটু পরিচয় দরকার।

অল্প বয়সে বিধবা হয়ে তিনি যখন বাপের বাড়ি এলেন, তার কিছু দিন পরেই ওঁদের মা মারা যান। নবেন্দু তখন শিশু। বড়দিদিই তাকে মানুষ করে তোলেন। মরবার সময় মা বলে গিয়েছিলেন, 'ছেলেটাকে তোরই হাতে দিয়ে গেলাম, মা। ওকে কোনোদিন চোখের আড়াল করিসনে।'

মায়ের এই শেষ কথাটি বড়দিদি অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছেন। নবেন্দু যতদিন ছোট ছিল, ততদিন তো কথাই নেই। আজ সে বড় হয়েছে। দুদিন বাদে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এখনও ভোরে উঠে মুখ ধোওয়া থেকে শুরু করে রাত ন'টায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত কাজ বড়দিদির চোখের সামনে করতে হয়।

খেতে বসে এটা ফেলে রাখবার উপায় নেই। সামনে বসে বড়দিদি। ভালো ভালো স্বাস্থ্যের বই পড়ে আর বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ভাইয়ের জন্যে একটা "আদর্শ খাদ্য-তালিকা" তৈরি করেছেন। এতটা প্রোটিন, এতটা ফ্যাট, আর এতটা ভিটামিন, তাকে রীতিমতো অঙ্ক কষে খাওয়ানো হয়।

কতক্ষণ সে বাইরে থাকবে, তারও সময় একেবারে বাঁধা। কলেজ থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলেই বড়দিদি প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করেন। আর বেড়াবার সময় দশ মিনিট পেরিয়ে গেলেই, সরকার মশাইকে ছুটতে হয় থানায়।

নবেন্দুর আবার একটু লিখবার অভ্যাস আছে। তার জন্যে নিরিবিলি বসে দু-দণ্ড ভাবা দরকার। কিন্তু ভাবতে বসলেই বড়দিদি ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বারে বারে এসে গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে দেখেন। একটু বেশী সময় বসে ভাবলেই নবীন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান।

শরীর খারাপ বলে একা থাকতে চাইলে তিনি কিছুতেই পাশ থেকে ওঠেন না। মন ভালো নেই বললে অমনি পুরুত ঠাকুর এসে ভাগবত শোনান কিংবা

ওস্তাদজী শোনান ধ্রুপদ।

কাজেই, 'মুক্তধারার' সম্পাদক যে নবেন্দুকে সত্যিই বিপদে ফেলেছেন তাতে আর সন্দেহ কি ?

দিন পাঁচ-ছয় পরে নবেন্দুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। একগাল হেসে এগিয়ে এল। বললাম, 'কি খবর ? বড্ড খুশি যে ?'

'বেজায় সুখবর, দাদা। বড়দি যাচ্ছে কাল।'

'অ্যাঁ! কোথায় যাচ্ছেন।'

'তাঁর কোন্ ভাসুরপো, না কার অসুখ। একদিনের জন্যে ভবানীপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ, বেশ! গল্পটা লিখছ তাহলে ?'

'আশা তো করি!' বলে, প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই বড়দিদি নবেন্দুকে ডেকে তুললেন। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। সাবধানে থাকিস, আর বাইরে টো-টো করে ঘুরিসনে।'

নবেন্দু যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'তুমি ক্ষেপেছ! এই আমি এক্ষুনি শুয়ে পড়ছি। তুমি ফিরলে তবে উঠব।'

বড়দিদি গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ও মা! সে কি কথা! সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাবি ?'

নবেন্দু খানিক ভেবে বলল, 'বেশ, তাহলে বসে থাকব।'

'না, না, চুপ করে বসে থাকলেই আবার ভাবতে শুরু করবি।'

'তবে বসব না, পায়চারি করে বেড়াব।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! সারাদিন পায়চারি করলে পা ব্যথা করবে না ?'

নবেন্দু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'তা বটে! তাহলে কি করব ?'

বড়দিদি ভরসা দিয়ে বললেন, 'তোকে কিচ্ছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করব।'

নবেন্দু যেন ভয়ানক ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমনি ভাবে মুখ ধুতে চলে গেল।

বড়দিদি তাঁর বোনেদের কাছে কতগুলো ফোন করলেন। তারপর বাড়ির ঠাকুর চাকর ঝি দারোয়ান সরকার ড্রাইভার—সবাইকে ডেকে ভাইয়ের সম্বন্ধে যাকে যা বলা দরকার বলে, বুঝিয়ে তাঁর ভাসুরপোকে দেখতে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দুর ঘরেও কপাট পড়ল।

একটা জমকালো গল্প ক'দিন থেকে তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সাধারণ ধরনের ঘরোয়া প্লট নয়, ছোট-খাটো হাসি, রহস্য কিংবা করুণ-রসের কাহিনীও নয়, একেবারে ভীষণ জোরালো লোমহর্ষক অ্যাড্ভেঞ্চার…

···বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ারের ছেলে সুরজিত তার থার্ড ক্লাসের বোন মীরাকে নিয়ে এরোপ্লেনে আফ্রিকা পাড়ি দিচ্ছে। একেবারে নন্-স্টপ ফ্লাইট। পথে ঘটবে বিপদ। এরোপ্লেনের ডানা ভেঙে গিয়ে পড়বে তারা নায়েগ্রার ধারে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে দেখা দেবে সিংহ, ভালুক, গরিলা আর মানুষ-খেকো বুনো মানুষের দল। মীরাকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাবে দেবীর আসনে, আর তারই সামনে বলি দেবার আয়োজন হবে সুরজিতের। তারপর···

এই হল মোটামুটি গল্পের প্লট বা খসড়া।

নবেন্দুর গল্প লেখা শুরু হল। এগিয়ে চলল পাতার পর পাতা। কলম ছুটল তীব্রবেগে। কিন্তু আরব সাগর পাড়ি দিয়ে সুয়েজে পৌঁছবার আগেই তার ঘরের দরজার কড়াটা কড়কড় করে বেজে উঠল। বিরক্ত মুখে দরজাটা খুলে দিতেই পুরানো চাকর রামঠনাঠন সেলাম করে বলল, 'গোছল কা টাইম হো গিয়া।'

'তোমার মাথা হো গিয়া।' বলে, নবেন্দু দুম করে দরজাটা তার মুখের উপরেই বন্ধ করে দিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। গল্পের নায়ক সুরজিত আর তার বোন মীরা ততক্ষণে মিশরের মরুভূমির ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

যতদূর দৃষ্টি যায়, দিগন্তজোড়া অনন্ত বালুরাশি। তার উপর আগুন ছড়িয়ে চলেছেন আফ্রিকার মধ্যাহ্ন সূর্য।

কলমের গোড়াটা কামড়ে ধরে নবেন্দু একমুহূর্ত ভেবে নিচ্ছে, কেমন করে রূপ দিলে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা তার পাঠকের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবে।

হঠাৎ দরজার শিকলটা ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠল। নবেন্দু টেবিলে বসেই চিৎকার করে উঠল, 'কে ?'

'মু নটবর ঠকুর অছি। তমর ভাত দেউছি।'

'রাজা করেছ! যাও, ভাত খাবার সময় নেই আমার।'

বেলা বেড়ে চলেছে। মাথায় জল নেই, পেটে খাবার নেই। নবেন্দু পাগলের মতো কলম চালিয়ে দিয়েছে···

··উল্কার মতো ছুটে চলেছে এরোপ্লেন, বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী পেরিয়ে। সেই গতির নেশার ছোঁয়াচ লেগেছে তার দুটি আরোহীর মনে। বাইরের জগৎ ডুবে গেছে অন্ধকারে।

ঠিক এমনি সময় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল টেলিফোন। নবেন্দুর কলমও যেন ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল। রুক্ষ গলায় সাড়া দিল, 'হ্যালো!'

'আমি মেজদি বলছি।'

'কি জন্যে জ্বালাচ্ছ এই দুপুর বেলা ?'

'তুই কেমন আছিস ?'

'খুব খারাপ।' মেজদি আর কিছু বলবার আগেই নবেন্দু রিসিভার রেখে দিল।

গল্পের বেগ এবার একটু মন্দা হয়ে এল।

সুরজিত আর মীরা উড়ে চলেছে নীল নদের উপর দিয়ে। মাথার উপর সীমাহীন নীল আকাশ, পায়ের নিচে তরঙ্গায়িত নীল জল। ওদের মনে পড়েছে দেশ, পিছনে ফেলে-আসা জন্মভূমি। মনে পড়ছে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধবের বিদায় বেলাকার মুখ···নবেন্দুর মনেও জেগে উঠল সেই করুণ ছবি। হঠাৎ তার সমস্ত স্বপ্ন-জাল ছিঁড়ে দিয়ে টেবিলের উপর বেজে উঠল—ক্রীং-ক্রীং-ক্রীং-ক্রীং···

নবেন্দু এক ঝটকায় তুলে নিল রিসিভার। গর্জন করে উঠল, 'কে আপনি ?'

'কে, নবু ?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আমি তোর সেজদি।'

'কি চাই তোমার ?'

'চেঁচাচ্ছিস কেন ? কি হয়েছে তোর ?'

'হয়েছে কলেরা, বসন্ত আর টাইফয়েড। হোলো ?'

ঘটাং করে টেলিফোন রেখে দিয়ে সে ঘরের কোণে ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। গল্প লেখার মতো উৎসাহ তখন আর একটুও নেই।

দেয়ালের ঘড়িতে টং-টং করে দুটো বেজে গেল। নবেন্দুর মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। কিন্তু আর তো সময় নেই। সন্ধ্যা না হতেই বড়দিদি ফিরে আসবেন। তার আগে যেমন করেই হোক গল্পটা শেষ করতেই হবে।

ক্লান্ত শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে নিয়ে সে আবার গিয়ে বসল লিখবার টেবিলে। লেখা চলল, এক লাইন, দু'লাইন, তিন লাইন। ব্যস ! আবার বেজে উঠল সেই হতভাগা যন্ত্রটা। সেই একঘেয়ে ক্রীং-ক্রীং।

নবেন্দুর ইচ্ছে হল এক লাথি মেরে ওটার ভবলীলা শেষ করে দেয়। কিন্তু ততটা জোরও তার গায়ে ছিল না। কোনো রকমে চোঙটায় মুখ দিয়ে সাড়া দিল 'হ্যালো !

জবাব এল, 'আমি বীণা।'

'ছোড়দি ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কেমন আছি, জানতে চাও ?'

'হ্যাঁ, ভালো আছিস তো ?'

'হ্যাঁ, ঘাটে যাবার আর দেরি নেই। বুঝলে ?'

লাইনের ওপার থেকে একটা আঁতকে ওঠার শব্দ শোনা গেল। এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নবেন্দু সোজা গিয়ে দড়াম করে দরজা খুলল।

ঠিক সামনেই সিনেমা-যাত্রীর মতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন সরকার মশাই, নটবর ঠাকুর, রামঠনাঠন, দারোয়ান মহাবীর পাঁড়ে, আর ড্রাইভার উজাগর সিং।

নবেন্দুর মাথায় খুন চেপে গেল। পাশেই ছিল একটা আলনা। সেটাকেই

তুলে নিয়ে গর্জে উঠল, 'কি দেখছ তোমরা? বেরিয়ে যাও, নিকাল যাও বলছি।'

দু-মিনিটের মধ্যে ভোজবাজির মতো বারান্দাটা ফাঁকা হয়ে গেল। নবেন্দুর মনে হল, এ বাড়ির চেয়ে জেলও তার ভালো। এই খবরদারির অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না। দেরাজ খুলে কয়েকটা টাকা আর আলনা থেকে একটা সার্ট টেনে নিয়ে সে নিচে নেমে গেল এবং গেটের সামনে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে চেপে বসল।

সরকার মশাই তার দলবল নিয়ে কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিলেন। মনিবকে উধাও হতে দেখে বেরিয়ে এসে দিলেন এক হাঁক। সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গর দল একযোগে লাগিয়ে দিল হল্লা। পাশের বাড়ির লোকেরা মনে করল, চোর পালাচ্ছে। তারা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে এল।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে যে ব্যাপারটা চলল, তাকে বলা যেতে পারে গলার জোরের কম্পিটিশন। সবাই চেঁচাচ্ছে, কেউ শুনছে না। তাও মিনিট দশেক। তারপরই হঠাৎ সব চুপচাপ। ব্যাপার কি? সবাই অবাক হয়ে দেখল, তিনখানা জমকালো চেহারার মোটর গাড়ি গম্ভীরভাবে ফটকে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে একে-একে নামলেন মেজদি, সেজদি, ছোড়দি, আর তাদের গুটি পনেরো ছেলেমেয়ে আর গুটি আষ্টেক ঝি-চাকর। কাউকে কোনো কথা না বলে এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে তাঁরা একটা প্রসেশন করে উপরে উঠে গেলেন।

ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইল, 'কীধার যানে হোগা।'

নবেন্দু বলল, 'চল, যেখানে খুশি।'

শিখ-বাবাজীর দাড়ির জঙ্গলে একটুখানি হাসির ঝিলিক দেখা দিল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'উতার যাইয়ে।' অগত্যা নবেন্দুকে নামতে হল। সামনেই সাত নম্বর প্ল্যাটফরমে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। একখানা যে-কোনো স্টেশনের টিকিট কিনে সে ঢুকে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও দিল ছেড়ে।

বর্ধমানে নেমে সে প্রথম হাঁপ ছাড়ল। ভয়সা হল, এতক্ষণে বড়দিদির হাতের বাইরে আসতে পেরেছে।

আশ্রয় জুটল মৃত্যুঞ্জয় কুশারীর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এ। তারই একটা নড়বড়ে তক্তপোশে শুয়ে দুটো রাত কেটে গেল।

পরেরদিন সকালে স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে পাতা উল্টোতেই চমকে উঠল নবেন্দু! তার নিজের ছবি! ওপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপা ঃ

ছবির নিচে রয়েছে বর্ণনা ঃ 'ছেলেটি লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ছিপছিপে চেহারা রং ফর্সা, বয়স কুড়ি বছর, কপালের উপর কাটা দাগ আছে, নাম নবেন্দু মজুমদার। কবিতা এবং গল্প লিখিয়া থাকে। রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া

গিয়াছে। কেহ দয়া করিয়া খোঁজ দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

সকলের শেষে আছে: 'নবু, লক্ষ্মী ভাইটি ফিরে আয়। বড়দি না খেয়ে আছেন। ঠিকানা জানালেই টাকা পাঠাব।···মেজদি।'

নবেন্দুর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। হোটেলে ফিরে দেখল, ম্যানেজারের ঘরে জোর সভা বসেছে। ম্যানেজার আর তার তিন বন্ধু। সামনে ঐ দিনকার খবরের কাগজ। তাকে দেখেই সব হঠাৎ চুপ করে গেল। নবেন্দু কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল। কিন্তু চার জোড়া চোখ যে তাকে একেবারে গিলে খেতে চাইছে, সেটা তার চোখ এড়াল না।

পুজোর আর দিন পনের বাকি। এখনো হয়তো সময় আছে। কোনো-রকমে কয়েকটা পাতা জুড়ে দিতে পারলে চলে যায় গল্পটা। খাতাটা তার পকেটেই ছিল। বের করে উলটে-পালটে দেখছিল নবেন্দু। হঠাৎ দরজায় পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখল, ম্যানেজার আর তাঁর তিন বন্ধু ঘরে ঢুকছেন। নবেন্দুর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

ম্যানেজার একটা খাতা আর কলম বের করে বললেন, 'মশায়ের নামটা জানতে পারি ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আজ্ঞে, ওটা আমাদের এই খাতায় টুকে রাখতে হয়। এই দেখুন না, হোটেলের সমস্ত বোর্ডারদের নাম-ধাম সব এখানে লেখা আছে।'

নবেন্দু একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, 'আমার নাম বনমালী সামন্ত।'

বনমালী সামন্ত! চার বন্ধুতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'ওটা, কি লিখছেন ? কবিতা ?'

'আজ্ঞে, না। এ একটা গল্প।'

'গল্প! বাঃ, দেখি কি রকম গল্প ?'

'না। এটা এখনো শেষ হয় নি। বলে, খাতাটা মুড়ে নবেন্দু পকেটে পুরতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। খুলতেই সকলের উপরে পাওয়া গেল গল্পের নাম এবং তার নিচেই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা শ্রীনবেন্দু মজুমদার।

চার বন্ধুতে বেশ একচোট হেসে নেবার পর ম্যানেজার বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক, মশাই। দিদিরা রইলেন না খেয়ে, আর ভাইটি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে দিব্যি দু'বেলা হোটেলের অন্ন সাবাড় করছেন। রাগ বটে এক-খানা!'

আরেক বন্ধু বললেন, 'যাক্। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ুন। চলুন, আমরাও তৈরি হয়ে নিই। ঘণ্টাখানেক বাদেই একটা ল্যোকাল আছে। ওতেই সাঁ করে চলে যাওয়া যাক।'

নবেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'যেতে হয়, আমি একাই যেতে পারি। আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

ম্যানেজার বললেন, 'সে কি মশাই ? বিজ্ঞাপনটা এখনো দেখেন নি নাকি ?

নগদ পাঁচশ টাকা ! ভাগে কত পড়ল হে ? দ্যাখ তো হিসেব করে।'

ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'এর আর দেখা-দেখি কি ? পুরোপুরি একশ পঁচিশ।'

তখনো সন্ধ্যা হয় নি। নবেন্দুর বাড়ির ফটকে একখানা প্রকাণ্ড ট্যাক্সি দাঁড়াল। প্রথমে নামলেন আদর্শ হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার, তার পেছনে একে-একে তার তিন বন্ধু আর সবার শেষে মাথা নিচু করে নবেন্দু।

সরকার মশাই ছুটে এলেন। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। পুরনো চাকর রামঠনাটন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। খবর পেয়ে দিদিরা নেমে এলেন এবং নবেন্দুকে ধরে একেবারে বড়দিদির ঘরে নিয়ে তুললেন। তাঁর উঠবার শক্তি নেই। কি একটা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ম্যানেজার অ্যাণ্ড কোম্পানী' নগদ পাঁচশ টাকা পকেটস্থ এবং পুরো পাঁচ সের লুচিমণ্ডা উদর পুরে খেয়ে বিদায় নিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বড়দিদির কাছ থেকে যখন ছুটি পাওয়া গেল, নবেন্দু নিজের ঘরে গিয়ে দেখল, তার নামে একটা চিঠি পড়ে আছে। 'মুক্তধারার' সম্পাদক শেষ তাগিদ দিয়েছেন।

চিঠি পড়া শেষ হতেই ঝি এসে জানাল, 'বড়দিদি ডাকছেন।' অ্যাড-ভেঞ্চারের আধখানা গল্প তখনো তার পকেটে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর একটা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লিখল ঃ 'সম্পাদক মশাই মাপ করবেন। গল্প লেখা হল না। কেন হল না, সেকথা আপনি বুঝবেন না। আপনার তো আর বড়দিদি নেই।'

শুধু একটি নম্বর

পেন্‌শন নেবার পর থেকে বৈকুণ্ঠবাবু রোজ সকালে তিন ঘণ্টা করে খবরের কাগজ পড়ে থাকেন ! উখরুলে জাপানীরা কতটা হটল, নরম্যাণ্ডীতে আইসেন-হাওয়ার ক' মাইল এগুলেন—এসব জমকালো খবর তো আছেই, তাছাড়া মুন্সী-গঞ্জের ডাকাতি, নোয়াখালির চালের দর, কর্মখালি, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, মায় কেশতৈলের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত—কোনোটাই বাদ দেন না।

সেদিন শুক্রবার। বৈকুণ্ঠবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে 'কলিকাতা গেজেটের' পাতাটা পড়ছিলেন। হঠাৎ গলা থেকে একটা চমকে ওঠার মতো শব্দ হল। তার পরেই দিলেন এক হাঁক, 'ওগো, শুনছ ? শীগগির দেখে যাও, ন্যাড়া আসছে, আমাদের ন্যাড়া।'

গিন্নী ছিলেন রান্নাঘরে। মোচার ঘণ্টে খুন্তি চালাচ্ছিলেন। বিকট চিৎকার শুনে খুন্তি হাতেই ছুটলেন বাইরের ঘরে। বৈকুণ্ঠবাবু তখন রীতিমতো লাফাচ্ছেন, 'দেখেছ, ন্যাড়া, ন্যাড়া।'

গিন্নী দরজার দিকে এগিয়ে বললেন, 'কই, কই, কোথায় ?'

'আরে না, না, ওখানে নয়, এই কাগজে। গেজেট হয়েছে, বরিশালে আসছে বদলি হয়ে। এই দ্যাখ।'

গিন্নী ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

ন্যাড়া, ওরফে বিজয় সেন পুলিশের ডি. এস. পি. বৈকুণ্ঠবাবুর সম্পর্কে নাতি, কিন্তু আসলে আপন নাতির বাড়া। চাকরি পেয়েছে বছর তিনেক। তারপর থেকে আর দেখাশুনো হয় নি। বিয়ে হয়ে গেল বছর দুই আগে। তখনো এঁরা যেতে পারেন নি। তারপর বৈকুণ্ঠবাবুরা বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন বরিশালে, আর ওরাও বেড়াচ্ছে সাতঘাটের জল খেয়ে। চিঠিপত্র দুদিক থেকেই বন্ধ।

সেই ন্যাড়া আসছে বদলি হয়ে ওঁদের কাছে। সস্ত্রীক বৈকুণ্ঠবাবু যেন বৈকুণ্ঠ হাতে পেয়ে গেলেন।

গিন্নী বললেন, 'একটা চিঠি লিখে দাও, এইখানেই উঠুক। দু-চারদিন থেকে তারপর নিজের বাসায় যাবে'খন।'

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'আরে না না! তাহলে আর মজাটা হল কোথায়? ওদের বাসাতেই উঠুক। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব।'

তারপর একদিন খবর পাওয়া গেল, বিজয়বাবুরা এসেছেন এবং জর্ডন কোয়ার্টার্সে ডি. এস. পি-র বাংলোয় উঠেছেন।

রবিবার দেখে বৈকুণ্ঠবাবু মস্তবড় এক ভোজের আয়োজন করলেন। পোলাও কালিয়া, এসব তো হলই। তাছাড়া যার নাম শুনলেই গোটা বরিশাল পাগল হয়ে যায়, সেই মহাবস্তু অর্থাৎ 'কাউঠ্যা'ও (কচ্ছপ) এসে গেল গোটা পাঁচ-ছয়। দশজন বন্ধুবান্ধবকেও এই উপলক্ষে বলতে হল।

তারপর, শুধু ভোজ দিলেই তো আর চলে না। নাতবৌএর মুখ দেখে কিছু দিতে হবে। গিন্নীর পছন্দমতো একখানা দামী বেনারসী আর একটা জড়োয়া নেকলেস কেনা হল। বেরিয়ে গেল ৩৭৫৷৷১০ আনা। এর কমে হবে কেন যুদ্ধের বাজারে? স্থির হল, গয়না কাপড় নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু নাতবৌএর মুখ দেখে ওদের দুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পুলিশের ডি. এস. পি.। বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হল না। গেটের সামনেই ছিল এক সিপাই। বৈকুণ্ঠবাবু গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে জেনে নিলেন, এটা ডি. এস. পি. বিজয়বাবুর কুঠিই বটে।

পুলিশ জানাল, 'সাব বাহার গিয়া।'

বৈকুণ্ঠবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মাইজী?'

'মাইজী উপরমে হ্যায়।'

'আচ্ছা, তাহলে ওপরেই যাওয়া যাক।'

পুলিশ একটু ইতস্তত করল, কিন্তু বাধা দিলে না। বৈকুণ্ঠবাবু সিঁড়ির মাঝখান থেকেই হাঁক দিলেন, 'ও নাতবৌ, নাতবৌ গো! বলি, ও ছোট গিন্নী…'

উপরের হল-ঘরে সোফায় বসে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে কি একটা সেলাই করছিল। অচেনা লোক দেখে মাথার কাপড়টা একটু টেনে উঠে দাঁড়াতেই

বৈকুণ্ঠবাবু একেবারে সামনে এসে বললেন, 'উহুঁ, পালালে চলবে না, একেবারে ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি। নড়লেই হাতকড়ি লাগিয়ে দেব। বাঃ, খাসা বৌ হয়েছে তো বিজয়ের। তারপর, কেমন আছ তোমরা ?'

বৌটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনাকে চিনতে পারছিনে তো ?'

'কেমন করে চিনবে বল ? বিয়ের সময় তো আর যেতে পারি নি। তোমার দাদু আমি। বিজয় বলে নি বুঝি আমাদের কথা ? আচ্ছা, আসুক একবার। কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেব।'

মেয়েটি একটু হেসে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বৈকুণ্ঠবাবু তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এসো দিদি, এসো। হ্যাঁ, তারপর তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি। দ্যাখ দিকিনি কেমন হল ?' বলে, কাপড় এবং গহনার প্যাকেট দুটো তার হাতে দিলেন।

মেয়েটির মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'খোল। খুলে দ্যাখ। তোমার দিদিমা বুড়ির পছন্দ তো ? কেমন হয়েছে কে জানে ?'

বৌটি প্যাকেট খুলতে খুলতে বললে, 'ইস, আমার দিদিমাকে আপনি বুড়ি বলছেন ? দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি গিয়ে বলে দিচ্ছি। বাঃ ! কি চমৎকার কাপড় ? নেকলেসটা আরও ভালো। এসব বুঝি দিদিমা পছন্দ করেছেন ?'

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'সে ছাড়া আর কে করবে ? আমি তো ওসব খুব বুঝি।'

'এর পরেও আপনি তাঁকে বুড়ি বলতে চান ?'

'না, না, না। ষাট-ষাট, বুড়ি হবে কেন ? তোমার দিদিমাটি একেবারে কচি খুকি।' বলে বৈকুণ্ঠবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

চাকর এসে জানাল, 'মা, বাবু তিন কাপ চা চাইছেন।'

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'বিজয় এসেছে নাকি ?'

চাকব বললে, 'আজ্ঞে নিচে দুজন বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।'

'তাহলে নিচেই যাই। কি বল নাতবৌ ?'

নাতবৌ বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, আপনি বসুন। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি ওঁকে।' যেতে যেতে বলল, 'পালাবেন না যেন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

একটি আঠারো-উনিশ বছরের সুন্দর ছেলে এসে বৈকুণ্ঠবাবুকে প্রণাম করল।

বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'কে তুমি বাবা ?'

'আজ্ঞে, আমার নাম নিখিলেশ।'

'কার ছেলে তুমি ?'

'বিজয়বাবুর ছেলে।'

বৈকুণ্ঠবাবু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বিজয়ের ছেলে তুমি ! আমাদের এই বিজয় ?'

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অসম্ভব !'

'অসম্ভব মানে ?'

'অসম্ভব মানে, এ হতে পারে না।'

ছেলেটি রীতিমতো রেগে উঠল, 'কি বকছেন পাগলের মতো ? মাথা খারাপ নাকি আপনার ?'

বৈকুণ্ঠবাবু রুখে উঠলেন, 'মাথা খারাপ আমার, না তোমার ? তোমার মতো একটা ধাড়ি ছেলে হল কিনা বিজয়ের ছেলে ! আরে, তার বিয়েই তো হল এই দু-বছর।'

নিখিলেশ এই বুড়োকে পাগল মনে করে সরে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে একটি চাকর ছিল। সে এগিয়ে এসে গলা খাটো করে বলল, 'আজ্ঞে, ইনি হচ্ছেন আমাদের বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে। আর এই মা হচ্ছেন বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ।'

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'দ্বিতীয় পক্ষ ! তোমরা সব বলছ কি ? সবাই মিলে দেখছি আমার মাথাটাই খারাপ করে দেবে। আচ্ছা, দাঁড়াও তো !'

বিড় বিড় করতে-করতে বৈকুণ্ঠবাবু নিচে নেমে গেলেন।

বসবার ঘরে তিনজন ভদ্রলোক কথা বলছিলেন—ডি. এস পি. বিজয় সেন, মুন্সেফ সাদেক হোসেন, আর সাবডেপুটি জ্ঞান দত্ত। বৈকুণ্ঠবাবু এসে তিন-জনের মুখের দিকে বার-বার তাকাতে লাগলেন।

বিজয়বাবু বললেন, 'আপনি কাকে চান ?'

'বিজয়কে চাই।'

'আমিই বিজয়।'

'আপনি কোন্ বিজয় ?'

'কোন্ বিজয় মানে ?'

'মানে, আমি যাকে চাই, তার নাম বিজয় সেন এবং তিনি পুলিশের ডি. এস. পি। রংপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

'আমিই বিজয় সেন, ডি. এস. পি. রংপুর থেকে আসছি।'

'আপনি বিজয় সেন ! ঠাট্টা করছেন নাকি আমার সঙ্গে ? বুড়ো হয়েছি বলে চোখ দুটো এখনো এত খারাপ হয় নি ?'

মুন্সেফ সাহেব বললেন, 'আপনি কি বিজয়কে কখনো দেখেছেন ?'

বৈকুণ্ঠবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'দেখেছি মানে ? নিজের হাতে মানুষ করেছি। অবিশ্যি তিন বছর দেখি নি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, তিন বছরের মধ্যে লোকের এমনি মাথা জুড়ে টাক পড়ে, গোঁফগুলো সব পেকে যায়, না চামড়াগুলো সব ঝুলে পড়ে ?'

সাব-ডেপুটিবাবু নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে বললেন, 'অনেকগুলো স্ক্রু-ঢিলে আছে দেখছি।'

বৈকুণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন মশাই। বিজয় সেনটেন এখানে কেউ নেই। দেখছেন না, এটা একটা জোচ্চোরের আড্ডা।'

বৈকুণ্ঠবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাইতো দেখছি। তবে আপনারাও জেনে রাখুন, জোচ্চুরি কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে আমি জানি। বৈকুণ্ঠ দাশকে সবাই চেনে। হুম—'

বৈকুণ্ঠবাবু রেগে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে একটা হাসির রোল উঠল।

চাকর চা নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'সে বুড়োবাবু গেলেন কোথায় ?'

বিজয়বাবু বললেন, 'কেন ?'

'মা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

বৈকুণ্ঠবাবু বাড়ি ফিরলেন আগুন হয়ে। লাঠি আর চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁক দিলেন, 'কইগো, জল দাও এক গেলাস।'

গিন্নী ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'কি খবর ? তারা এল না ?'

'দুত্তর ! পড়েছিলাম এক জোচ্চোরের পাল্লায়। এক টেকো বুড়ো, বলে কিনা, আমিই বিজয় সেন। আসলে সে বিজয় সেনের বাবা।'

'আর নাতবৌ ? তাকে দেখতে পাও নি ?'

'কি জানি, নাতবৌ না কে ? চাকরটা তো বললে দ্বিতীয় পক্ষ।'

গিন্নী গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা, সে কি কথা ! তারপর, কাপড়-গয়না কি করলে ?'

'সে তো আগেই দিয়ে ফেলেছি। তখন কি জানি এর মধ্যে জোচ্চুরি আছে ? উঃ ! চার-চারশ' টাকা ঠকিয়ে নিলে। জোচ্চোর, বদমাস, ঠক ! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব··'

গিন্নী একেবারে বসে পড়েছিলেন। মুখ শুকনো করে বললেন, 'তুমি আর কী দেখে নেবে ? তারা হল পুলিশের লোক !'

বৈকুণ্ঠবাবু বীরত্ব দেখিয়ে বললেন, 'হলই বা পুলিশের লোক। এই তো মুখের ওপর বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে এলাম ? কী করবে ?'

গিন্নী ধীরভাবেই বললেন, 'ভালো কর নি। টাকা তো গেলই। তার ওপর দ্যাখ আবার কি ফ্যাসাদ বাধে।'

সে ভয় বৈকুন্ঠবাবুর মনেও ছিল। কিন্তু বাইরে তিনি চুপ করেই রইলেন।

রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি থামানোর শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই চাকর এসে জানাল, 'দুজন পুলিশের লোক ডাকছে।'

'পুলিশের লোক !'

বৈকুণ্ঠবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। গিন্নী কেঁদে ফেলে বললেন, 'না-না, তুমি যেও না। ওরা ধরে নিয়ে যাবে।'

পুলিশের জমাদার বাইরে থেকেই হাঁক দিল, 'বৈকুণ্ঠবাবু হ্যায় ? জলদি আইয়ে।'

বৈকুণ্ঠবাবু চোরের মতো এসে দাঁড়ালেন তাদের কাছে।

জমাদার বললে, 'ডি. এস. পি. সাব আপকো সেলাম দিয়া।'

শুকনো গলায় জবাব এল, কি জন্যে ?'

'কি জন্যে, ও হামি কি জানে ? হুকুম হল, লিয়ে যেতে। চলিয়ে।'

বৈকুণ্ঠবাবু ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠলেন। দরজার আড়ালে গিন্নী হঠাৎ

একটা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ঝি মাথায় তেল-জল দিতে লাগল।

বৈকুণ্ঠবাবু মনে করেছিলেন, তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাকে আনা হল ডি. এস, পি-র বাড়ির দোতলায়। কিছুক্ষণ পরে সেই নাতবৌ এল। একগাল হেসে বললে, 'চা না খেয়ে পালিয়ে গেলেন যে বড়? আপনাকে তাই ধরিয়ে নিয়ে এলাম।'

বৈকুণ্ঠবাবু অত্যন্ত শুষ্কে ক্লান্তভাবে বললেন, 'তুমিই আমাকে ডেকেছ?'

'না, আমিও ডেকেছি।' বলে, বিজয়বাবু দেখা দিলেন এবং প্রণাম করে বললেন, 'বেয়াদপি মাপ করবেন, দাদু। আপনাকে চিনতে পারি নি।'

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনাকেও চিনতে পাচ্ছিনে। আপনি তো আমাদের ন্যাড়া নন!'

বিজয়বাবু টাকে হাত দিয়ে বললেন, 'না, ন্যাড়া নই, তবে টেকো। পাশের চুলগুলো পড়ে গেলেই ন্যাড়া হয়ে যাব। তার বেশী দেরিও নেই।'

বৈকুণ্ঠবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

বিজয়বাবু বললেন, 'আজ্ঞে না, সবই ঠিক আছে। গোলমাল শুধু একটা নম্বরের।'

'তার মানে?'

'আপনি যাকে চান, তিনি হচ্ছেন বিজয় সেন দু'নম্বর, আর আমি হচ্ছি বিজয় সেন এক নম্বর। তিনিও ডি. এস. পি., আমিও ডি. এস, পি। তফাৎ শুধু ঐ একটা নম্বর। গেজেটটা ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

খবরের কাগজের সেই পাতাটা বৈকুণ্ঠবাবুর পকেটেই ছিল। তাড়াতাড়ি বের করে দেখলেন, তাই বটে। বিজয় সেনের নামের শেষে একটা 'এক নম্বর' লেখা আছে।

বিজয়বাবু বললেন, 'দেখলেন তো। কিন্তু শুধু ঐ একটা নম্বরের জন্যে আমাদের আপনি ত্যাগ করবেন?'

'কখ্খনো না। দাদু বুঝি তেমনি লোক।' বলে, নাতবৌ একথালা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। বৈকুণ্ঠবাবু দেখলেন, তাঁর নাতবৌএর পরনে তাঁরইদেওয়া বেনারসী এবং অন্য সব গয়নার সঙ্গে তাঁরই দেওয়া নেকলেস। সে দিকে চেয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা টন-টন করে উঠল। নাতবৌ তাড়া দিয়ে বলল, 'কই, খাচ্ছেন না যে? দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে যাব কখন?'

যন্ত্রের মতো বৈকুণ্ঠবাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। মনে হল, এ চা নয়, এককাপ কইনাইন মিকশ্চার।

পেটের জোর

লোকে জমিজমা করে টাকার জোরে, কিংবা লাঠির জোরে। চৌধুরীর জমিদার হল পেটের জোরে। ব্যাপারটা তাজ্জব হলেও অনেকেরই জানা। যারা জানো না, মন দিয়ে শোনো।

বেশীদিন নয়, তিন পুরুষের কথা। মুকুল চৌধুরীর ঠাকুরদাদা গজানন চৌধুরী ছিলেন বেজায় গরীব। জমিজমা যেটুকু ছিল, অন্য কারুর হয়তো চলে যেত, কিন্তু গজাননের পেটটা ছিল সত্যিই গজাননের মতো। তারপর আবার তার দুটি পক্ষ এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই দশ বারোটি করে ছেলেমেয়ে।

গজাননের দিন আর চলে না। জমির খাজনা বাকি পড়ল। কাছারির পেয়াদা এসে বারবার শাসিয়ে গেল, জমি কেড়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু তখনকার দিনে জমিদারদের দয়া-ধর্ম ছিল। গজানন ভাবলেন, একবার যদি সদরে গিয়ে কর্তাবাবুর কাছে কেঁদে পড়া যায়. খাজনাটা হয়তো মাপ হতে পারে। গিন্নীরাও সেই পরামর্শই দিলেন। তারপর একদিন ভালো দিনক্ষণ দেখে, চাদরে সের দশেক চিড়ে বেঁধে গজানন জমিদারের কাছে চললেন।

পুরো একদিন হেঁটে জমিদারের বাড়ি মিলল। ব্রাহ্মণ বলে গজানন বেশ খাতির-যত্নই পেলেন। অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা হল এবং মস্তবড় সিধেও একটা এসে গেল! জানানো হল, খাওয়া-দাওয়ার পর তিনটের সময় জমিদারের সঙ্গে দেখা হবে।

তিনটে বাজতেই এক পেয়াদা এসে হাজির। কিন্তু গজাননের তখনও রান্না হয় নি। গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। চোখ-মুখ বসে গেছে। পেয়াদা বললে, 'কি ঠাকুরমশাই, আপনার এখনও ভোজন হয় নি?'

গজানন একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'না ভাই, হয় নি।'

'কেন?'

'চালটা এখনও পাই নি।'

'সে কি! পুরো দেড় সের চাল যে আমি নিজে দিয়ে গেলাম।'

'সেটা তো ফুরিয়ে গেছে ভাই।'

'ফুরিয়ে গেছে! রান্না হল না, অথচ চাল ফুরল কি করে?'

গজানন বড্ড লজ্জায় পড়লেন। কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'স্নান করে উঠে একটু চাল-জল খেয়েছি।'

জমিদারের কাছে খবর গেল, অতিথিশালায় এক ব্রাহ্মণের এখনও খাওয়া হয় নি। যে 'সিধে' দেওয়া হয়েছিল, চাল-জল খেতেই শেষ হয়েছে। জমিদার তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন, 'ব্রাহ্মণের যা-কিছু দরকার, যেন এখুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দৈ, ক্ষীর, ফল, মিষ্টি—কোনোটার যেন ত্রুটি না হয়।'

হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল করা হল। চারদিকে এই ব্যাপার নিয়ে রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ঘণ্টাদুয়েক পরে জমিদার নিজে চললেন ব্রাহ্মণের খাওয়ার তদারক করতে। সে এক দৃশ্য। গজানন খেতে বসেছেন। একটা মস্তবড় কাঁসার পরাতে পাঁচ-ছয় সের চালের ভাত। তার পাশে এক গামলা ডাল, এক গামলা ভর্তি একটা তিন সেরি রুইএর ডালনা, দশখানা বেগুন ভাজা, এক বালতি আলুর দম, এক হাঁড়ি দই, এক ঝুড়ি সন্দেশ, এক ছড়া মর্তমান কলা এবং আরো অনেক কিছু। একজন ব্রাহ্মণ মাছি তাড়াচ্ছেন, দুজনে দুদিক থেকে হাওয়া করছেন, আর

একজন দাঁড়িয়ে আছেন, কখন কি চাই, তার জন্যে।

ভোজন নির্বিঘ্নে সমাধা হল। তারপর সাড়ে তিনঘণ্টা বিশ্রাম। বিশ্রামের পর জমিদার আবার এলেন, প্রণাম করে বললেন, 'ঠাকুরমশাই, আপনাকে দেখলে পুণ্য হয়। আপনার পায়ের ধুলোয় আমার গৃহ পবিত্র হল। দয়া করে বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

গজানন বললেন, 'আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আপনার প্রজা। ছেলেপুলে নিয়ে দুটো পেট ভরে খেতে পারি, এই ব্যবস্থা করে দিন। সারাজীবন দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করব।'

জমিদার হুকুম দিলেন, 'গজাননের নিজ গ্রাম লখেরচর এবং তার আশে-পাশের সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করা হোক।'

পরদিনই দানপত্র তৈরী হল। গজানন খুশিমনে বাড়ি ফিরলেন।

সেই থেকে চৌধুরীরা জমিদার।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরেই গজানন মারা গেলেন। তারপর তাঁর বারো ছেলেয় মিলে লাগিয়ে দিল বারো ভূতের নাচ। কেউ কিনল হাতি, কেউ কিনল ঘোড়া, কেউ খুলল যাত্রার দল, কেউ ধরল মদ। দেখতে না দেখতে জমিদারিটা উড়ে গেল ঠিক ধোঁয়ার মতো।

ধনবল যখন যায়, জনবল আর দেরি করে না। অতবড় বাড়িটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু একজন—চৌধুরীদের সবেধন নীলমণি, আমাদের মুকুল চৌধুরী।

ঠাকুরদাদার জমিদারিটা তার হাতে এসে পৌঁছল না। লাভ হল শুধু তাঁর পেটটা। ফলে আবার সেই টানাটানি···দিন চলে তো রাত চলতে চায় না। আজ চলে তো কাল অচল। মুকুল পাবনা কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল। সেই জোরে খবরের কাগজে 'কর্মখালি' দেখে চাকরির দরখাস্ত শুরু করে দিল।

মাস কয়েক কেটে গেল। কোনো খবর নেই! শেষটায় একদিন একখানা চিঠি এসে হাজির মেদিনীপুর থেকে: আগামী সোমবার বেলা দশটায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কয়েকজন কেরাণী নেওয়া হবে।'

সোমবারের তখনও দিন চারেক দেরি। কিন্তু মুকুল সেইদিনই বেরিয়ে পড়ল, পাছে চাকরিটা ফসকে যায়।

কালেক্টরী অফিসের বড়বাবু ছিলেন নিকুঞ্জবাবু। তাঁর পিসতুতো ভাই মুকুলের ভগ্নীপতির মামা। আপনার লোকই বলতে হবে, তবে যাতায়াত নেই, তাই চেনাশোনাও হয় নি। তবু মুকুল তাঁরই বাড়িতে গিয়ে উঠল। নিকুঞ্জবাবু পরিচয় পেয়ে কুটুম্বকে আদর-যত্ন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও বেশ ভালো রকমই হল।

সেদিন ছিল কিসের ছুটি। নিকুঞ্জবাবু কুটুম্বকে নিয়ে পাশাপাশি খেতে বসলেন। মুকুলের পাতে প্রথমে যে ভাত দেওয়া হয়েছিল সেটা উঠে গেল চচ্চড়ির সঙ্গেই। তারপর এল আবার ভাত, আবার ডাল। আবার ডাল আবার ভাত। মাছের ঝাল, ঝোল, অম্বল ইত্যাদি শেষ হবার পর দই'তে পৌঁছবার

আগেই তার পাঁচবার ভাত নেওয়া হয়ে গেল। দই-এর পাতে চারটি ভাত না হলে মুকুলের খাওয়াটা জমে না। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পেরে হাঁকলেন, 'ঠাকুর, ভাত নিয়ে এসো।' কিন্তু ঠাকুর আর আসে না। আবাব হাঁক দিলেন, তবু ঠাকুরের সাড়া নেই। রান্নাঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখলেন, গৃহিণী হাত নাড়ছেন, আর ছুটছেন গামলা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে—ভাত বাড়ন্ত, আরেক হাঁড়ি বসাতে হবে।

চারজন লোকের খাওয়া তখনো বাকি। নিকুঞ্জবাবু বিষম লজ্জায় পড়লেন। কিন্তু উপায় কি ?

ওবেলা থেকে মুকুলের খাওয়ার ব্যবস্থা হল একটা হোটেলে, আর থাকবার জায়গা হল কালেক্টরী অফিসের একতলায় পিওনদের ঘরের পাশে।

পরদিন সকালবেলা। নিকুঞ্জবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন। মুকুল ঘরে ঢুকল ···মুখখানা কাচুমাচু।

'কি খবর ?'

'আজ্ঞে, হোটেলওয়ালা বলেছে, ওখানে সুবিধে হবে না।'

নিকুঞ্জবাবু একটু হেসে বললেন, 'চার্জটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।'

মুকুল বললে, 'ডবল চার্জ দিতে রাজী ছিলাম, তবু স্বীকার করে না।'

'তা হলে কি করা যায় ?'

'আজ্ঞে, আপনি যদি অনুমতি দেন, কাছারির ঐ ঘরটাতেই আমি চারটি চাল ফুটিয়ে নিতে পারি।'

সেই ব্যবস্থাই হল।

দেখতে দেখতে সোমবার এসে পড়ল। পনেরো-ষোলজন লোক ডেকে পাঠানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুকুম করেছেন, ঠিক দশটায় তাঁর আফিসের বারান্দায় সবাইকে দাঁড় করানো হবে। তিনি নিজে দেখেশুনে বেছে নেবেন।

সাড়ে নয়টা না বাজতে, যাদের ডাকা হয়েছিল সব একে-একে উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু মুকুলের দেখা নেই। বড়বাবু চাপরাশীকে পাঠিয়ে দিলেন তাকে ডেকে আনবার জন্যে। চাপরাশী গিয়ে দেখে, মুকুলবাবু পোশাক চড়াতে গিয়ে ঘেমে অস্থির প্যান্টটা করানো হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। অনেক টানাটানি করেও পেটটা কিছুতেই গলছে না। চাপরাশীকে দেখে মুকুল যেন হাতে স্বর্গ পেল। বললে, 'একটু ধর তো ভাই। একা-একা পেরে উঠছি না।'

চাপরাশীর গায়ে জোর ছিল। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির ফলে পেট হার মানল বটে, কিন্তু বাবুকে দেখে মনে হল, অজগর ছাগল গিলেছে।

চাপরাশী বললে, 'এটা খুলে ফেলুন বাবু। সাহেব চটে যাবেন।'

মুকুল অবাক হয়ে গেল, বলে কি! কাপড় পরে কখনো সাহেবদের কাছে যাওয়া যায় ?

সেইদিন ছিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি-বাড়ি তদারক করবার দিন। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে মুকুলের ঘরে এসে হাজির। বারান্দায় একধারে একটা প্রকাণ্ড চুলার উপর পাঁচসেরি হাঁড়িতে রান্না চাপানো হয়েছে। তার পাশে

চুপড়িতে তরকারী আর গামলায় ভিজানো ডাল। ব্যাপার দেখে সাহেব তো একেবারে আগুন। বললেন, 'কে টুমি ?'

মুকুল জোড় হাত করে বললে, 'আজ্ঞে, আমি মুকুল চৌধুরী।'

'ড্যাম্ ইট ! এখানে কার হুকুমে হোটেল খুলেছ ?'

'আজ্ঞে, এটা হোটেল নয়। নিজের জন্যে রান্না করছি।'

'এটো রান্না ! ননসেন্স ! বড়বাবুকো বোলাও !'

চাপরাশীরা ছুটে গিয়ে বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে এল। সাহেব ভীষণ রেগে বললেন, '**What is this** বড়াবাবু ? কোর্টের মধ্যে হোটেলওয়ালা **I want him to be driven out at once** (আমি চাই, ওকে এখুনি তাড়িয়ে দেওয়া হোক)।'

বড়বাবু হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, লোকটা একটা স্টোভ্ জ্বালিয়ে যাহোক দুটো রেঁধে খাবে। এতবড় একটা যজ্ঞিরান্নার আয়োজন হবে, স্বপ্নেও ভাবতে পাবেন নি। ভাবলে, কখনো রান্না করার অনুমতি দিতেন না। যাই হোক, ব্যাপারটার জন্যে দায়ী তো তিনিই। তাই সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন, 'স্যর, এ লোকটা হোটেলওয়ালা নয়। নিজের জন্যেই রান্না করছে।'

ফল হল উলটো। সাহেব আরও রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন '**Don't think. I am a child**—(মনে করো না আমি কচি খোকা) ! এটো জিনিষ একটা লোক খেতে পারে ?'

বড়বাবু বেগতিক দেখে চুপ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ঘরে ঢুকে দেখলেন. বিছানার পাশে একটা প্রকাণ্ড ধামায় এক ধামা মুড়ি-মুড়কি, আর তার কাছে এক হাঁড়ি ঝোলা গুড়। বড়বাবু বুঝলেন. ওটা মুকুলচন্দ্রের বিকলবেলার জলখাবার। কিন্তু সেকথা বলবার উপায় নেই। সাহেব ছড়ি নিয়ে ধামাটায় একটা খোঁচা মেরে মুকুলকে বললেন, 'টুমি এখনও বলটে চাও টুমি হোটেল-ওয়ালা নও ?'

মুকুলের চট করে মনে পড়ে গেল, তার ঠাকুরদাদা খাওয়া দেখিয়ে জমিদারি পেয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'সাহেব, তুমি যদি অনুমতি দাও, এই এক ধামা মুড়ি আমি তোমার সামনেই খেয়ে ফেলতে পারি।'

সাহেব চমকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে মুকুলের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, '**What** ! টুমি কি পাগল ?'

মুকুল মরিয়া হয়ে বললে, 'না সাহেব, পাগল নই। আমি গজানন চৌধুরীর পৌত্র। পেটের জোরটা আমাদের বংশগত।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রুখে উঠে বললেন, 'ড্যাম্ ইওর গজানন চৌধুরী ! চাপরাশী, উস্‌কো নিকাল দেও। **He must be a crazy fellow** (লোকটা নিশ্চয়ই পাগল) !'

মুকুল আবার কি একটা চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চাপরাশীরা সে সুযোগ দিল না। তাকে জোর করে ধরে একেবারে কাছারির সীমানায়

বাইরে বার করে দিয়ে এল।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন, 'দুঃখ কোরো না মুকুল। কালের হাওয়া বদলে গেছে। তাই, পেটের জোর দেখিয়ে তোমার ঠাকুরদাদা পেয়েছিলেন জমিদারি, আর তুমি পেলে গলাধাক্কা।'

বড় কুটুম্ব

কানাইবাবু-স্যার ভয়ানক কৃপণ লোক। হাত দিয়ে তাঁর নম্বর গলতে চায় না। অঙ্কের খাতায় মনোজকে তিনি বরাবরই একটি 'O' দিয়ে থাকেন। তবে, এবার যেটি দিয়েছেন, তার আকারটা আগের চেয়ে বেশ বড়—এইটুকুই যা সান্ত্বনা। ইংরিজির খাতা দেখেছেন হেডমাস্টার মশাই। বুড়ো মানুষ। দয়াধর্ম আছে। দানধ্যানও করেন শোনা যায়। কিন্তু নম্বরের বেলায় ১০এর বেশী তাঁর হাতে উঠল না। ইতিহাসের স্যার রমেশবাবু যেমনি কাঠখোট্টা, তেমনি খিটখিটে। ১২ পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছেন, সেই যথেষ্ট। আর স্বাস্থ্য? খগেনবাবু যে স্বাস্থ্যের কী বোঝেন, তিনিই জানেন। মাসের মধ্যে দশদিন ভোগেন কালাজ্বরে, পনেরো দিন গেঁটেবাতে, আর বাকি পাঁচদিন হাঁপানিতে। অথচ তিনিই দেখেছেন 'স্বাস্থ্যের' কাগজ এবং ঘচ করে বসিয়ে দিয়েছেন ৭। তারপর রইলেন, ভূগোলের স্যার ইস্‌লাম সাহেব। জন্ম থেকে কোলকাতার বাইরে কোথাও পা দেন নি। তিনি কি জানেন, কোথায় স্টকহোলম আর কিসের জন্য বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া? কিন্তু প্রশ্ন করবেন দেড় হাত, আর সবগুলো লিখলেও নম্বর দেবেন ৩।

এরকমই ইস্কুলে ভদ্রলোকে কি করে পড়তে পারে, মনোজ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

নম্বরের লিস্টিখানা হাতে করে, এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনোজ ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরল। মনটা তার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। গেল বারেই তার বাবা বলে রেখেছেন, আসছে পরীক্ষাতে যদি ভালো করতে না পারো, দোকানে বেরুতে হবে। তাদের একটা মসলার দোকান আছে। সেখানে বসে বসে জিরে পাঁচফোড়ন ওজন করতে তার বড্ড খারাপ লাগে। কিন্তু কোনো উপায়ই চোখে পড়ে না। তার বাবা একেবারে এক কথার মানুষ।

বাড়ি ফিরে তার মাথায় একটা সোজা উপায় এল। নম্বরগুলো বাড়িয়ে দিলে দোষ কি? বাবা তো সেকেলে লোক, চোখেও কম দেখেন, কিছুই ধরতে পারবেন না। নম্বরের কাগজখানা খুলে সে মনের আনন্দে যা খুশি বসিয়ে যেতে লাগল। ১০এর বাঁদিকে বসাল ১, ১৩র ডান দিকে শূন্য; ৭এর বাঁদিকে ৯; ৩এর আগে ৮। হোক না নিজের হাতে, তবু অনেক দিন পরে মোটা মোটা নম্বর পেয়ে মনটা পালকের মতো হাল্‌কা হয়ে গেল।

কিন্তু ঐযে ইংরাজীতে একটা কথা আছে, মানুষ জল্পনা-কল্পনা করে, ভগবান দেন ভেস্তে। নম্বর দেখে তার বাবা গেলেন ক্ষেপে। বললেন, 'যে ছেলে

১০০র মধ্যে ১১০ পায়, তার বিদ্যে অনেক হয়ে গেছে। ইস্কুলে তার দরকার নেই। কাল থেকে তুমি দোকানেই বসবে।'

মনোজ বুঝল, এ হুকুমের উপরে আপীল নেই, দোকানে তাকে যেতেই হবে। মা নেই যে একবার কান্নাকাটি করে দেখবে। থাকবার মধ্যে আছে এক মাসতুতো দিদি। ভবানীপুরে মামার বিয়েতে একবার শুধু তার সঙ্গে দেখা। তাকে অবিশ্যি খুব ভালোবাসেন। কিছুদিন হল ওরা বর্ধমানে এসেছেন বদলি হয়ে। এসেই তাকে যাবার জন্যে লিখেছেন। সেখানে গেলে কেমন হয়? বর্ধমান বেশ জায়গা, সীতাভোগ-মিহিদানার দেশ। সেখানে পড়লে বেশ হয়। মাস্টার মশাইরা নিশ্চয়ই কানাইবাবুর মতো কৃপণ নন, রমেশবাবুর মতো কাঠখোট্টাও নন।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনো ভালো করে ফর্সা হয় নি। মনোজের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বর্ধমানের দিদির কথা। চট্ করে জামাটা পরে সে বেরিয়ে পড়ল, অন্য সকলে উঠবার আগে। বড়বাজারের কাছেই তাদের বাসা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হাওড়া স্টেশনে এসে পড়ল।

তিন নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে তখন একটা গাড়ি ছাড়ছে। গেটে টিকিটচেকার টিকিট দেখছেন। মনোজ জিজ্ঞেস করল, 'এ গাড়ি কোথায় যাবে বলতে পারেন, স্যর?'

চেকার বললেন, 'বর্ধমান।'

ঠিক সেই সময়ে একগাদা লটবহর নিয়ে কতগুলো লোক এসে পড়ল। চেকার তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই ফাঁকে মনোজ আস্তে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফরমে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গার্ড-সাহেবও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। গাড়িটাও দাঁড়িয়েছিল বেশ খানিকটা দূরে। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে যখন সে পৌঁছল, গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। মনোজ এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর গার্ড যেমনি লাফ দিয়ে তার গাড়ির পাদানিতে উঠতে যাবেন, মনোজ দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে নিয়ে যান, স্যর!'

গার্ডসাহেব আটক! প্ল্যাটফরমসুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে উঠল, এবং চক্ষের নিমেষে একটা হাট জমে গেল—কুলি, পুলিশ, 'চানাচুর-ওয়ালা', 'পাঁউরুটি-বিস্কুট' 'চা গরম!' গাড়িটাও কয়েক হাত গিয়ে থেমে গেল। মনোজ সুযোগ বুঝে চট্ করে উঠে পড়ল একটা কামরায়। যারা ভিড় করেছিল, বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে সরে পড়ল এবং বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়িও ছেড়ে দিল।

মনোজ যে কামরায় উঠেছিল, সেটা বেশ বড়। তার অর্ধেক বেঞ্চিগুলো দখল করে শুয়ে আছে জন পাঁচ-ছয় কাবলিওয়ালা, আর বাকি অর্ধেকটায় কোনো রকমে ঠাসাঠাসি করে রয়েছে প্রায় ত্রিশজন বাঙালী। কাবলিওয়ালাদের উঠতে বলবে এমন সাহস কারুর হয় নি। মনোজ চারদিকে কোথাও একটু বসবার জায়গা পেল না। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পাশেই এক প্রকাণ্ড বুড়ো সটান শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে উঠছে তার নাকের শব্দ। অতবড় গাড়িটা গমগম করছে। সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে মনোজের হাতটা ঢুকে গেল

পকেটে এবং বের করল একটা নস্যির কৌটো। আর একবার তাকিয়ে দেখল, সব কাবলি ঘুমে বিভোর। তখন আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গিয়ে এক টিপ নস্যি নিয়ে তুলে ধরল ঐ বুড়ো কাবলির নাকের ডগায়।

বেদম হাঁচির বেগে কাবলি যখন লাফিয়ে উঠে পড়েছে, মনোজ কোত্থেকে একটা পাখা যোগাড় করে চটপট চালিয়ে দিল তার মাথার উপর।

কাবলি তখন হেঁচে চলেছে—ছাদফাটানো বিকট হাঁচি—এক, দুই, তিন করে প্রায় পঁচিশটা। দম বেরিয়ে যায়-যায় এমনি অবস্থা। মনোজ পাখা ফেলে দিয়ে শুরু করল বুকে মালিশ। পুরো আধঘণ্টা পরে কাবলি একটু সুস্থ হল, এবং মনোজকে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ভাঙা মোটা গলায় গজ-গজ করে যেটা বলল, সেটা গালাগালি না কৃতজ্ঞতা মনোজ ঠিক বুঝতে পারল না।

'আপ কাঁহা যায়েঙ্গে খাঁ সাহেব ?' মনোজ জিজ্ঞেস করল।

খাঁ সাহেব আর একদফা হাঁচি শেষ করে জানাল, 'বড়দোয়ান।'

দু-চার মিনিট বসেই কাবলিকে আবার শুয়ে পড়তে হল।

মনোজ তার মাথার কাছে নাকটা চেপে ধরে বসে রইল। বোঁটকা গন্ধে মনে হল, পেটের নাড়ীগুলো বুঝি এবার বেরিয়ে আসবে।

শ্রীরামপুর বড় স্টেশন। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই মনোজ নেমে পড়ল। তার পরেই দেখা গেল, একটি ছেলে, মাথায়-মুখে কাপড় জড়ানো···কাবলিদের কামরার পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'বড়দোয়ান, বড়দোয়ান, বড়দোয়ান।'

'বড়দোয়ান' কানে যেতেই বুড়ো কাবলি ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং হাঁকডাক করে সবাইকে টেনে তুলে, মোটঘাট নিয়ে নেমে গেল। পরক্ষণেই গাড়ি ছেড়ে দিল এবং মাথায় কাপড় ফেলে মনোজ উঠে এল তার কামরায়।

চারদিকটা একদম ফাঁকা। সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়েও পড়ল। মনোজকে নিয়ে একটা আলোচনাও হল। কেউ বললে, 'খাসা ছেলে'। কেউ বলল, 'একখানা চীজ'। কেউ কেউ কাছে ডেকে আলাপ করল, 'খোকা তোমার নাম কি, বাড়ি কোথায় ?'···ইত্যাদি।

শ্রীরামপুর ছাড়াতেই এক ক্রু দেখা দিলেন। মনোজের বুকটা কেঁপে উঠল। সম্বলের মধ্যে তো একটা নস্যির ডিবে। তা দিয়ে কাবলি তাড়ানো যায় বটে, কিন্তু ক্রুকে ভোলানো যাবে না।

'টিকেট! টিকিট!' সবাই টিকেট দেখাচ্ছে। ক্রমে মনোজের পালা এসে গেল।

'টিকেট!'

মনোজ পকেটে হাত দিয়ে কি ভাবল। তারপর নস্যির ডিবেটা বের করে বলল, 'একটু নেবেন স্যর ?'

ক্রু গম্ভীর ভাবে বলল, 'ও-সব ফাজলামি রেখে দিয়ে টিকেট দেখাও খোকা। এই বয়সেই বেশ পেকে উঠেছ দেখছি।'

মনোজ যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমনি ভাবে বলল, 'ও-ও টিকেট? ঐ ওঁর

কাছে আছে' বলে, গাড়ির ওপাশে একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল।

ক্রু তাঁর কাছে গিয়ে মনোজের টিকেট চাইল।

ভদ্রলোকের নাম দীনেশবাবু। প্রথমটা তিনি কিছু বুঝতেই পারলেন না। বললেন, 'কার কথা বলছেন? আমার সঙ্গে তো আর কেউ নেই।'

'আজ্ঞে, আমি ঐ ছেলেটির কথা বলছি। ও যে বললে, আপনার কাছে ওর টিকেট আছে। এই খোকা, এদিকে এসো তো।'

'ওঃ, এর কথা বলছেন। হ্যাঁ, তা ইনি বলতে পারেন সবই! এরকম ধুরন্ধর ছেলে বড় একটা দেখা যায় না।'

'তাহলে ও আপনার সঙ্গেই যাচ্ছে?'

দীনেশবাবু রেগে উঠলেন, 'আমার সঙ্গে মানে? আপনি বলছেন কি?'

ক্রু মনোজের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি তোমার কে হন খোকা?'

মনোজ একবার এগিয়ে এসেছে, আর পেছিয়ে যেতে পারে না। গোটা দুই ঢোক গিলে বলে ফেলল, 'উনি আমার ভগ্নীপতি।'

দীনেশবাবু রীতিমতো ক্ষেপে উঠলেন, 'what! আমি ওর ভগ্নীপতি! জীবনে ওকে চোখে দেখি নি মশাই। জোচ্চোর! জোচ্চোর! রীতিমতো জোচ্চোর। ওকে পুলিশে দেওয়া দরকার। বলে কিনা আমি ওর ভগ্নীপতি।'

রগড় দেখে দু-চারজন লোক এগিয়ে এসেছিল। একজন দুধের ভেণ্ডার সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল, দীনেশবাবুর কাছে এসে বলল, 'পয়সাটা ফেলে দিন মশাই। জোচ্চোর যে কে, সে কথা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। ছিঃ ছিঃ! দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্যে নিজের শালাকে বলছেন কেউ না। আচ্ছা ভদ্দরলোক তো আপনি!'

গয়লার চেহারা এবং হাতে বাঁক দেখে দীনেশবাবুর মেজাজটা একটু খাটো হয়ে এল। সবার দিকে চেয়ে কাতর ভাবে বললেন, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, সত্যিই ও ছেলেটা আমার কেউ নয়।'

ডেভিড কোম্পানীর অরুণবাবু ছিলেন ডান পাশে। রুক্ষভাবে বললেন, 'এতগুলো লোকের কাছে ধরা পড়েও আপনার লজ্জা হচ্ছে না এটাই আশ্চর্য। লোকে রাস্তার লোককে ভগ্নীপতি বলে জড়িয়ে ধরে, এই কথা আপনি আমাদের বোঝাতে চান?'

উত্তরে দীনেশবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ক্রু বাধা দিয়ে বললে, 'থাক, ওসব কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। আপনি ওর ভাড়া আর জরিমানা দেবেন কিনা বলুন? না দেন তো ওকে পুলিশে যেতে হবে।'

অরুণবাবু বললেন, 'তা কখনো হতে পারে না। ওঁর দোষে ঐ ছেলেমানুষ জেলে যাবে? ভাড়া আমরা দিয়ে দিচ্ছি, তবে ভগ্নীপতিটিকে আমরা একবার দেখে নেব।'

চার-পাঁচজনে সায় দিলে। গয়লা বললে, 'নিন, আমি দিচ্ছি এক টাকা।'

দীনেশবাবু একবার তার কুড়িয়ে-পাওয়া বড় কুটুম্বের দিকে, আর একবার রুখে-যাওয়া জনতার দিকে চেয়ে পকেট থেকে মনিব্যাগটা নিয়ে একখানা দশ

টাকার নোট ছুঁড়ে দিলেন ক্রু-ম্যানের গায়ে, 'নিন মশাই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে অনেক দণ্ডই দিতে হয়। কিন্তু রাস্তার লোকের ভগ্নীপতি সাজতে হবে, এতটা আশা করি নি।'

বর্ধমানে গাড়ি থামল। সবাই নামছে। মনোজকেও নামতে হল। কোথায় তার দিদির বাড়ি সে জানে না। এমন কি ভগ্নীপতির নাম কিংবা ঠিকানাটাও মনে নেই যে লোককে জিজ্ঞেস করবে। এদিকে দীনেশবাবু নেমেই হন-হন করে চলতে শুরু করেছেন।

অরুণবাবু এসে বললেন, 'কি খোকা, তোমার জামাইবাবু যে চলে গেলেন, তুমি যাচ্ছ না? সঙ্গে সঙ্গে না গেলে আবার টিকেট চাইবে।'

মনোজ এখন কেমন করে বলে যে উনি তার জামাইবাবু নন। অগত্যা আবার টিকেট-বিভ্রাটের ভয়ে সে এগিয়ে চলল এবং গেট পার হতে আর কোনো বেগ পেতে হল না।

অরুণবাবু কাছেই ছিলেন। তাঁর ভাইও রয়েছে সঙ্গে। সুটকেসটা ভাইএর হাতে দিয়ে বললেন, 'নে তো তরুণ। ছেলেটাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, যেতে সাহস করছে না।' তারপর মনোজকে বললেন, 'এসো খোকা আমার সঙ্গে। ভয় কি?'

মনোজের না গিয়ে উপায়ও নেই। দীনেশবাবু অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা জোরে জোরে পা ফেলে গিয়ে ওকে ধরল।

দীনেশবাবু ফিরে তাকাতেই অরুণবাবু বললেন, 'ছেলেমানুষ শ্যালকটিকে একা ফেলে চলে এলেন? আপনার তো বেজায় রাগ দেখছি!'

'দেখুন, আমি একশ' বার বলছি যে এটি আমার শ্যালক নয়। তবু আপনারা আমার পিছু নিয়েছেন কেন বলুন তো? জানেন, আপনাদের দুজনকেই আমি পুলিশে দিতে পারি?'

'আহা-হা, চটছেন কেন মশাই! আগে বাড়ি চলুন, শ্যালকটিকে খেতে-টেতে দিন। তারপর না হয় দেবেন আমাদের জেলে।'

বৈঠকখানায় ঢুকে দীনেশবাবু ওদের বসিয়ে নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'তারপর? এবার বলুন তো আপনাদের মতলবটা? আপনারা কি চান? টাকা আমি আর দেব না।'

অরুণবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না, টাকা চাই না। এবার উঠতে চাই।…যাও খোকা, বাড়ির ভেতরে যাও।'

দীনেশবাবু রুখে উঠলেন, 'বাড়ির ভেতরে! তোমরা কি ডাকাত নাকি হে? কথা নেই, বার্তা নেই, একটা উটকো লোক চলে যাবে বাড়ির ভেতর! পুলিশ ডাকব?'

চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ছেলেরা এসে আগেই জুটেছিল। এবার পরদার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে তাদের মায়ের আঁচলটাও দেখা গেল। দীনেশবাবু আর একবার পুলিশ ডাকবার হুমকি দিলেন এবং সেই সময়ে তার মেয়ে এসে বলল, 'বাবা, মা ওকে ভেতরে যেতে বলছেন।'

দীনেশবাবু রুক্ষভাবে বললেন, 'কেন ?'

'দরকার আছে।'

মনোজকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে একবার মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে বলল, 'দিদি, তুমি !'

দিদি তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই কোত্থেকে ? আহা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।' দীনেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'চিনতে পারছ না ? এ যে আমাদের মনোজ···ছোট মাসীমার ছেলে !'

দীনেশবাবু তো একেবারে থ' ! মিনিট তিনেকের মধ্যে খেয়ালই হল না এবার মুখ বোজা দরকার।

তারপর ? তারপর অরুণবাবু মস্ত বড় ভোজ খেয়ে বাড়ি ফিরলেন।

লাভের গুড়

কাল থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। মোটমাট পাঁচদিন। একে সওদাগরী অফিস, তায় খাস ব্রিটিশ। এইটুকু দাক্ষিণ্য যে দেখিয়েছে, সেই ঢের। একেবারে না দিলেই বা কী করতে পারতাম ?

কথাটা শুনে আজকের পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাই বলে রাখি, ঘটনাটা ত্রিশ বত্রিশ বছর আগেকার। এখন হলে বলতাম, কী না করতে পারতাম !

শেয়ালদা থেকে বনগাঁর প্রথম গাড়ি ছাড়ে বলতে গেলে শেষ রাতে। ওটাতে বোধহয় হয়ে উঠবে না। তার পরেরটা অবশ্যই ধরতে হবে। পাঁচদিনের পাঁচটা মিনিটই বা মেস-এ বসে নষ্ট করি কেন ? সুতরাং বড়মামার সঙ্গে দেখা করার পালাটা আজই সেরে রাখতে হয়। ডালহৌসী থেকে উত্তরের ট্রাম না ধরে দক্ষিণমুখী হলাম।

ভবানীপুরের বাসায় ঢুকতেই মামাতো ভাই নন্তুর সঙ্গে দেখা। গম্ভীরভাবে বলল, 'এই যে ছোড়দা এসে গ্যাছ ? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।'

'কী ব্যাপার ?'

'বসো, আসছি।'

একটু ভাবনা হল। কোনো গোলমেলে খবর হবে নিশ্চয়ই। নন্তু এল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। হাতে কাপড় ঢাকা দেওয়া কী একটা জিনিষ। আমার পাশে রেখে ঢাকাটা তুলেই হেসে উঠল। বলল, 'অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি তোমার জন্যে।'

আমি পরম স্নেহে জিনিষটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'অ্যালসেশিয়ান বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে মানে ? একেবারে হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট পিওর। ক্রস্ ব্রীড-ফ্রীড নয়। ক্রীপ সাহেবের মালীকে নগদ দশটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে বের করতে পেরেছি। সাহেব জানে না। তাকে বলেছে, বাচ্চাটা মরে গ্যাছে, সাহেব।'

একটা অ্যালসেশিয়ানের স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। আমার চেয়েও বেশী ছোট বোন তরুর। যখনই বাড়ি যাই তার প্রথম কথা হল, আমার কুকুর? অন্য কোনো জাত হলে চলবে না। অ্যালসেশিয়ান! অনেক চেষ্টা করেছি। হাতিবাগানের বাজারে দু-একটা পেয়েছিলাম। দাম যা হাঁকল, শুনে চক্ষুস্থির। মাত্র দশটি টাকায় এ জিনিষ! কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল আজ!

পুজোয় বাড়ি যাওয়া মানে অনেক ঝামেলা। কাপড়-জামার সঙ্গে টুকটাক অনেক জিনিষ জড়ো হল। পাশের বাড়ির ঘোষাল-দাদুর ফরমাস ছিল এক ঝুড়ি কড়া পাক। মফস্বলের নরম নরম সন্দেশ তাঁর পছন্দ নয়। ভীম নাগ থেকে নিতে বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বাড়ির জন্যেও কিছু নিতে হল। মিষ্টিই হল গোটা পনেরো টাকার। তার মানে এখনকার প্রায় একশ' টাকা।

স্টেশনে যখন পৌঁছলাম, গাড়ি ছাড়তে মিনিট দশেক বাকি। কুকুর তো বুক না করে নেওয়া চলে না, হলই বা বাচ্চা। ভীষণ কড়াকড়ি তখন রেলের। রাস্তায় ক্রুর উৎপাত আছে। ধরতে পারলে ভাড়া তো নেবেই, তার উপরে মোটা টাকা পেনালটি আদায় করে ছাড়বে। এখনকার আমল তো নয় যে সহযাত্রীদের সাহায্য পাবো। ভাড়া চাইলে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে ক্রু-বাবাজীকে! এত সুখ ছিল না তখন। পরাধীন দেশ তো। আইন মেনে চলতে হত।

পুজোর ভিড়। অত কম সময়ে কুকুর বুক করা অসম্ভব। 'যা থাকে কপালে' বলে উঠে পড়লাম,। বসবার জায়গা নেই। হাতের বাচ্চাটির দিকে নজর পড়তে, এক ভদ্রলোক তার পাশে একটু জায়গা করে দিলেন। অর্থাৎ কুকুরের কল্যাণে বসতে পেলাম।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক আমারই মতো কুকুর-পাগল, এবং তার উপরে এদের জাতধর্ম-বিষয়ে জানেনও অনেক কিছু। অর্থাৎ, যাকে বলে সারমেয়-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। এক ফাঁকে দামটা জানতে চাইলেন। আমি তো আর বলতে পারি না, এটি চোরাই মাল, কিংবা ঘুষের সংগ্রহ। বললাম, 'পঁচিশ টাকা নিয়েছে।'

ভদ্রলোক খুব বিস্মিত হলেন, 'খুব সস্তায় পেয়েছেন, যাকে বলে দাঁও মারা। আসল অ্যালসেশিয়ান। খাইয়ে-দাইয়ে ঠিক মতো মানুষ করতে পারলে এই কুকুর আপনার বাঘের কাজ দেবে।'

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল! একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই কামরার ওধারে ক্রুর দর্শন পাওয়া গেল। ভদ্রলোক আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। বললেন, 'দিন ওকে আমার কাছে!' বাচ্চাকে জামার তলায় লুকিয়ে ঢুকে পড়লেন বাথ-রুমে। পরের স্টেশনে গাড়ি থামবার পর আরো খানিকটা সময় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ক্রু তখন চলে গেছে। আমি বললাম, 'খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

স্বভাবতই আমার সুরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'ও কিছু না। এখনো কিন্তু আমাদের বিপদ কাটে নি। ক্রুর ওপরে আবার সর্দার-ক্রু

আছে, ক্রু-ইন-চার্জ। সে ব্যাটা যেখানে সেখানে উঠে সারপ্রাইজ চেক্ করে। এক কাজ করা যাক। আমার পকেটে চকোলেট ছিল। খাইয়েছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শীগগির আর সাড়া-শব্দ দেবে না। ওপরে তুলে দিই।'

ভদ্রলোকের জিনিষপত্র ছিল বাঙ্কের একেবারে কোণের দিকে, তারপরেই আমার মাল। ওরই কোনো একটা ফাঁকে বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি।

চমৎকার গল্প জমাতে পারেন ভদ্রলোক। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। বিরাটী ছাড়িয়ে কি একটা ছোট স্টেশনে আসতেই তিনি উঠে পড়ে বললেন, 'আমি এবার নামবো। আপনার বাচ্চা দেখে নিন।'

হেসে বললাম, 'গোড়াতে আমার ছিল, এখন ওটা আপনার। ওর জন্যে যা কাণ্ড করতে হয়েছে আপনাকে ...'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আশেপাশে যারা ছিল, তাদের মুখেও হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল। অর্থাৎ, কথাটা সকলেই উপভোগ করল। উনি কুলী ডেকে মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।

বারাসতে পোঁছে খুচরো জিনিষগুলো নিচে নামাতে গিয়ে দেখি, বাচ্চাটা তো নেই! কোথায় গেল? কোনো বাক্স-বিছানার আড়ালে ঢুকে গেছে হয়তো। সারা বাঙ্ক খালি হয়ে গেল। কই, নেই তো! আশেপাশের চোখগুলোয় এবারেও হাসি-হাসি ভাব লক্ষ্য করলাম। অর্থাৎ এটাও সকলে উপভোগ করছে।

মিষ্টির ঝুড়িটা নামাতেই টের পেতাম, অত সাধের অ্যালসেশিয়ান মাঝপথে চলে গেলেও প্রভুকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে নি। কিঞ্চিৎ স্মৃতি রেখে গেছে। 'ভীম নাগ'-এর মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঝুড়ির উপর কখন চড়ে বসেছিল। স্বাদ নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, কড়াপাকের সন্দেশগুলোকে সরস করে দিয়ে গেছে।

বহুরূপী

পনেরো বচ্ছর পরে দেশে ফিরছি। যা দেখে গিয়েছিলাম, তার অনেক কিছুই নেই। সে শ্রী নেই, সে স্বাস্থ্য নেই, সে আনন্দ নেই। চলতে চলতে আনমনে এই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকলে, 'কে, অমল নাকি?'

ফিরে দেখি, একটি দেশী সাহেব। প্যান্টের ঝুল গোড়ালি থেকে আধ হাত উপরে উঠে গেছে। তার রংটা আগে বোধহয় শাদাই ছিল, এখন হয়েছে তামাটে। কোটের ঘের আর পেটের বেড়ে চলেছে জোর কম্পিটিশন। বোধ হয় কোটকেই হার মানতে হবে। হঠাৎ চিনতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'কি হে, চিনতে পাচ্ছ না? আমি মাধব।'

হেসে বললাম, 'কি করে চিনব বল? একেবারে সাহেব হয়ে গেছ!'

মাধব পকেট থেকে তার বুক দেখার যন্ত্রটা বের করে গলায় ঝুলিয়ে বলল, 'কি করব ভাই? যে ব্যবসা করি, একটু ভড়ং-টড়ং না হলে কেউ আমলই দেয় না।'

'ডাক্তার হয়েছ কদ্দিন হল ?

'তা, হল বছর তিনেক। এসো না, এই তো ডিসপেনসারি। কতকাল পরে দেখা! খবর-টবর সব শোনা যাক।'

মাধবের ডিসপেনসারি মানে একখানা টিনের একচালা। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া! দরজার পাশে ঝুলছে একটা কাঠের সাইনবোর্ড···বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ ডাক্তার এম. সি. কাননগু, এম-বি। রীতিমতো চমকে উঠলাম। কেননা, বেশ ভালো করেই জানি, মাধব বার দুই ম্যাট্রিকে ঘায়েল হবার পর, বার বার তিনবার বলে যখন কোমর বেঁধে লাগল, নতুন হেডমাস্টার মশায়ও বেঁকে বসলেন, টেস্টে ওকে কিছুতেই অ্যালাউ করলেন না। সেই মাধব এম-বি হল কবে এবং কেমন করে? কথাটা জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি। দরকার হল না। সে নিজেই বললে, 'ভড়কে যেয়ো না। ব্রাকেটের মধ্যে 'এইচ' আছে।'

দেখলাম, তাই বটে। 'এম-বি' কথাটার নিচে ছোট্ট করে একটা 'এইচ' লেখা আছে। এত ছোট যে, খুব কাছে না গেলে চোখে পড়ে না। এটাও বোধহয় ওর ঐ বিলাতি সুটের মতোই আর একটা 'ভড়ং'। লোকে জানুক, সে একজন সত্যি-সত্যি এম-বি—হোমিওপ্যাথিক এম-বি নয়।

ডিসপেনসারি-ঘরে একটা লোহার চেয়ারে বসলাম। সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছি, মাধব রা-রা করে উঠল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওষুধের আলমারী খোলা। সব নষ্ট হয়ে যাবে।' বলে, তাড়াতাড়ি আলমারি বন্ধ করে তার উপর একটা চট টাঙিয়ে দিল। তারপর সাহেবি পোষাক ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে হুঁকো নিয়ে এসে বসল।

আমি বললাম, 'তারপর, তুমি ডাক্তার হলে কেমন করে? সেই সব বল।'

'ডাক্তার হলাম কেমন করে?' মাধব শুরু করল, 'সে এক রীতিমতো কাহিনী। লেখাপড়া খতম করে বাড়িতেই বসেছিলাম। বাবার গালাগালি, আর মাঝে মাঝে খড়মের ঘা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল। তখন একদিন গোটা কয়েক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়! সারাদিন চাকরির চেষ্টায় ঘুরি। কোথায় চাকরি? শেষটায় জুটল এক চামড়ার দালালি। মাইনে-টাইনে কিছু না, শুধু দুটো খেতে দেয়, আর এক বোঝা দুর্গন্ধ চামড়ার নমুনা ঘাড়ে চাপিয়ে দৌড় করায়—শ্যাম-বাজার থেকে বেলেঘাটা। এই অবস্থায় একদিন দেখা হয়ে গেল মামার শালা বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে। সব কথা শুনে তিনি বললেন, এসব কি করছ? দেশে যাও, গিয়ে হোমিওপ্যাথি কর।'

বললাম, 'সেও তো পড়তে হবে, শিখতে হবে।'

মামার শালা মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'আরে দূর! হোমিওপ্যাথি আবার কেউ পড়ে। এক বাক্স ওষুধ আর একটা সাইনবোর্ড কিনে নিয়ে যাও। তারপর অমুক চন্দ্র এম-বি বলে লেগে পড়। শিখবার মধ্যে শুধু আছে একটা ছড়া।'

বললাম, 'কিসের ছড়া?'

বিশ্বনাথবাবু নোট-বুক বের করে বললেন, 'লিখে নাও।'

লিখে নিলাম ঃ

পেট কামড়ানি, কাশি ঠনঠন,
সিনা ইপিকাক দেবে ঘন-ঘন।
ঘুষঘুষে জ্বর পেটজোড়া পিলা,
চোখ বুজে দাও পালসেটিলা।
বুক ধড়ফড়, কান কটকট,
দাও রাসটকস, যাবে চটপট।

মামার শালা বললেন, 'এইটিই হচ্ছে হোমিওপ্যাথির বীজমন্ত্র।'

'কথাটা মনে লাগল। সেইদিনই সাইনবোর্ডের অর্ডার দিলাম এবং তিনদিন পরেই ফিরলাম বাড়ি। তারপরেই তৈরি করি এই ডিসপেনসারি। তা, তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে একেবারে মন্দ হচ্ছে না। তবে...'

গলায় চাদর, বগলে শাদা কাপড়ের ছাতা, হাতে চটিজুতো নিয়ে একটা লোক মুখ বাড়াল! মাধব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকে চাই?'

'ডাক্তারবাবুকে চট করে ডেকে দিতে পার?'

'কোথায় যেতে হবে? কি অসুখ?'

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'সে কৈফিয়তটা তোমাকে নাই বা দিলাম। যা বলবার ডাক্তারের কাছেই বলব।'

মাধব একটু থেমে বলল, 'আমাকে বলতে পারেন। আমিই ডাক্তার।'

লোকটা যেন ভুত দেখেছে, এমনি ভাবে কিছুক্ষণ সেই লুঙ্গি-পরা ছোকরা ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি ডাক্তার? অ্যাঁ! তুমি ডাক্তারির কি বোঝ?'

এইবার মাধব চটল। বেশ একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলল, 'না, যা-কিছু বোঝেন তোমাদের ঐ ফোকলামুখো দিগম্বর সান্যাল! তার কাছেই যাও।'

লোকটা এক মুখ দাঁত বের করে হেসে উঠল, 'আরে বাপু, পাসই কর আর সাইনবোর্টই লাগাও, তোমার মতো ছেলে-ছোকরার হাতে কে প্রাণটা তুলে দেবে বল!'

মাধব আপন মনে গজগজ করতে লাগল।

দিন কয়েক পরে একদিন সকালবেলা মাধবের ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখি, পাড়ার কয়েকটি নিষ্কর্মা ছোকরা বসে আড্ডা দিচ্ছে। মাধব নেই! একটু পরেই সে এল একেবারে হন্তদন্ত হয়ে। তার বিলাতী সুট তখন ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে। কে একজন বললে, 'আজ কি রকম হল, ডাক্তার?'

মাধব পকেট থেকে গোটা পাঁচেক টাকা টেবিলের উপর ফেলে বলল, 'আর বোলো না ভাই! সারাদিন রোদে পুরে এই পাঁচটি টাকা! কালও এর বেশী পাই নি। এমন হলে কি আর ডিসপেনসারি রাখা চলে?'

আমি বললাম, 'গ্রামে বসে এর চেয়ে আর কত বেশী আশা কর? এ তো বেশ হচ্ছে।'

সকলের মুখে কেমন একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। একটি ছোকরা

বলে উঠল, 'টাকা কটা বদলাও মাধবদা। ওগুলো আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।'

মাধবের মুখখানা হঠাৎ ছাইএর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে, যেন শুনতে পায় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তারপর, কিছুদিন আছ তো ?'

'না। শীগগিরই ফিরতে হবে। যে রকম অসুখ-বিসুখের বহর দেখছি, গ্রামে আর থাকতে সাহস হচ্ছে না।'

মাধব বললে, 'অসুখ ! সেজন্যে ভাবনা কিসের ? আমি রয়েছি কি জন্যে ?'

মাধব যতই অভয় দিক, দু-চারদিনের মধ্যেই কলকাতা ফিরতে হল। ক্রমে মাধবের কথাও মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে এলো। এমন সময় একদিন শুনলাম, গামের লোকেরা তাকে একঘরে করেছে এবং সে তার ওষুধের বাক্স-টাক্স নিয়ে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। একঘরে করার কাহিনীটা বেশ নতুন ধরনের। তাই মনে আছে।

আজগর মোল্লার ছেলের হয়েছিল কালাজ্বর। মাধবের ওষুধ খেয়ে সেরে উঠল। আজগর গরীব মানুষ। ফি দিতে না পেরে দিলে দুটো মুরগী। এই পাখিটার উপর মাধবের একটু গোপন লোভ ছিল। কিন্তু সাবধান না হলে এ জিনিসটা সামলানো কঠিন হবে, সে কথা সে জানত। তাই, সেদিন ভোর না হতেই, ও দুটোকে বেশ করে গামছায় বেঁধে সে চলেছিল নদীর ধার দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে মহাদেব শিরোমণি মশাই প্রাতঃস্নান সেরে গঙ্গাস্তব পড়তে পড়তে ফিরছিলেন ঐ একই রাস্তায়। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

শিরোমণি বললেন, 'কি হে ডাক্তার, ওটা কি নিয়ে যাচ্ছ ?'

মাধব চট্ করে বলল, 'আজ্ঞে, এটা একটা কাঁঠাল।'

বলতে না বলতেই গামছা-বাঁধা কাঁঠাল হঠাৎ জোর গলায় সাড়া দিয়ে উঠল, 'কোঁকড় কো··'

শিরোমণি নাক টিপে ধরে কানে আঙুল দিয়ে কোনো রকমে বাড়ি ফিরলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার দশজনকে ডেকে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিলেন। তারপর থেকেই মাধবের আর কোনো পাত্তা নেই।

মাধব থাক আর না থাক, দিন কারো বসে থাকে না। দেখতে দেখতে তিন-চার বছর কেটে গেল। পড়াশুনো ছেড়ে শুরু হয়েছে রোজগার। মাধব কিংবা তার হোমিওপ্যাথির ছড়া মনে রাখবার মতো অবসর নেই।

বর্ধমান শহরে থাকি। মিহিদানা, সীতাভোগের দেশ। নিন্দা করতে চাই না। তবে, একথা নেহাৎ সত্যের খাতিরে বলতে হবে যে, আমার বাড়িটি কিছু-দিনের মধ্যে রীতিমতো হাসপাতাল হয়ে দাঁড়াল। একধার থেকে পেটের গোল-মাল। তার মধ্যে একটু ভাবিয়ে তুললেন বড় ছেলে শ্রীমান বিশ্বম্ভর ! অ্যালো-প্যাথিকদের একমাত্র সম্বল কার্মিনেটিভ মিকশ্চার। কয়েক ঘড়া শেষ হল, কিন্তু রোগের সুরাহা হল না। তারপর এলেন কবিরাজ। অরিষ্ট, রসায়ন, বটিকা এবং পাঁচনের ঝড় বয়ে গেল, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকাল ও সন্ধ্যায়। অনুপানের

অনুসন্ধানে একটা গোটা জঙ্গল সমূলে উড়ে যাবার উপক্রম, কিন্তু অসুখের মূল নড়ল না। হেকিমির খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে মুন্সেফ গগনবাবু এসে বললেন, 'হোমিওপ্যাথ দেখান।'

হোমিওর নাম শুনেই মনে পড়ে গেল মাধবকে, আর তার সেই বিচিত্র ছড়া ঃ 'পেট কামড়ানি, কাশি ঠনঠন…'

গল্পটা ওঁকে শোনালাম। কিন্তু হোমিওর ওপর গগনবাবুর অচলা ভক্তি। বললেন, 'আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি খাঁটি ডাক্তার। টাটকা পাস-করা ছেলে-ছোকরা নয়। আপনার মাধবের মতো হাতুড়েও নয়, প্রাচীন এবং পাকা লোক। আমরা সবাই তাঁকে ডাকি। জজসাহেবের বাড়িতে ওঁকে রোজই একবার যেতে হয়। ফি বেশী নয়, আট টাকা। একটা কল দিয়ে দেখুন না ?'

অগত্যা রাজী হতে হল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার এলেন। নামটি বেশ, বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত। দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। চোখ দুটো শান্ত। চুলগুলো একদম শাদা। মুখে রবীন্দ্রনাথের মতো পাকা দাড়ি। অত্যন্ত ধীরে ধীরে রোগীর পাশে এসে বসলেন, এবং কেবল নাড়ীটাই দেখলেন দশ মিনিট ধরে। আমাদের যা বলবার বলে গেলাম। শুনে শুধু মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বাথরুমটা কোন্ দিকে ?'

বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে রোগীর ঘরটা একবার ঘুরে এসে দেখি, বসবার ঘরে বসে আছে মাধব। রীতিমতো চমকে উঠলাম। খুশিও হলাম খুব। এখানে এতদিন পরে এমন সময়ে মাধবকে দেখতে পাব, একেবারেই আশা করি নি। চেহারাটা তেমনি ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষই আছে। শুধু আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে। দু-চারটে কুশল প্রশ্নের পর উঠল দেশের কথা, ছেলেবেলাকার কথা। এমন সময় চাকর এসে বলল, 'মাইজী জানতে চেয়েছেন ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন কিনা ?'

তাই তো ! ডাক্তারবাবু কোথায় গেলেন ? এখনও বাথরুম থেকে বেরোন নি ? মাধবকে বললাম, 'একটু বোসো ভাই, এখনি আসছি।'

বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে কেউ নেই ! তারপর এ-ঘর, ও-ঘর, বারান্দা, নিচে, উপরে, সব খুঁজে দেখা গেল। ডাক্তারবাবু নেই। ব্যাপার কি ?

ভৌতিক কাণ্ড ! বসবার ঘরে ফিরে আসতে মাধব বললে, 'কাকে খুঁজছ ?'

'খুঁজছি আমাদের ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তার বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত। চেন নাকি তুমি ?'

'চিনি বৈকি।'

'লোকটা কি ক্ষ্যাপা নাকি হে ? হঠাৎ 'বাথরুম কই' বলে একেবারে উধাও হয়ে গেল।'

মাধব একটু হেসে বলল, 'উধাও হয় নি, এই ঘরেই আছে।'

'এই ঘরেই আছে ! তুমিও ক্ষেপলে নাকি ?'

মাধব এর কোনো উত্তর দিল না। পকেট থেকে বের করল একটা শাদা পরচুলা আর পাকা চাপদাড়ি। মুখের সামনে গোটা-তিনেক বাঁধানো দাঁত ছিল। ফেলল খুলে। কথা বলব কি? আমি শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ম্যাজিক নয়, স্বপ্নও দেখছি না। আমি, শ্রীঅমলচন্দ্র রায়, সজ্ঞানে এবং রীতিমতো জেগে বসে দেখছি যে, আমার সামনে যে লোকটি বসে আছেন, তিনি মাধব কাননগু নন, একেবারে জলজ্যান্ত বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলার মতো অবস্থা যখন ফিরে এল বললাম, 'তুমি এই বহুরূপী ব্যবসা ধরেছ কদ্দিন থেকে?'

মাধব বললে, 'কি করব ভাই! এই বহুরূপীই তো তোমরা চাও।'

'তার মানে?'

'মানেটা একটু খুলেই বলি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, যতদিন দেশে ছিলাম, 'ছোকরা' 'ছোকরা' করে কেউ আমলই দিলে না, তারপর করলে একঘরে। চলে গেলাম জলপাইগুড়ি। বড়লোকের দেশ। বেশ বড় করে দিলাম ডিসপেন-সারি। নতুন নতুন চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারি। স্যুট তৈরি করালাম বিলিতি দোকান থেকে। ফল কি হল? সেই এক কথা—ছোকরা ডাক্তার! আর আমার পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ভাঙা তক্তপোষে বসে একটা লোক শুধু জল আর সুগার অব মিল্ক দিয়ে বাড়ি তুলল দোতালা। সম্বলের মধ্যে এক মাথা পাকা চুল। বুঝলাম, ঐটাই আসল মূলধন। তার পরেই এল এই পরচুলা আর দাড়ি। ছেলেবেলায় ফুটবল খেলে তিনটে দাঁত হারিয়েছিলাম। সেটাও এবার কাজে লেগে গেল। বাড়ি ফাঁদতে আর দেরি নেই। তারপর'

বাইরে জুতোর শব্দ। চোখের নিমেষে মাধবের মুখ-চোখের বয়স বেড়ে হল পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচাত্তর। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন গগনবাবু। নমস্কার করে বললেন, 'এই যে ডাক্তারবাবু, এসে পড়েছেন? তারপর রোগীর খবর ভালো তো?'

মাধব ডান হাতখানা আস্তে আস্তে উপরে তুলে গলা কাঁপিয়ে বলল, 'স-ব-ই-ভ-গ-বা-নে-র-ই-চ্ছা।'

দারোয়ান

আমি হচ্ছি এক নাম-করা খবরের কাগজের সম্পাদক। আমার শোবার ঘরে খাটের পাশেই আছে একটা টেলিফোন। গভীর রাতে তোমরা যখন আরাম করে ঘুমোও, তখন আমার সাব-এডিটর হরবিলাসবাবু ঐ যন্ত্রটা বাজিয়ে প্রায়ই আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকেন।

সেদিনটা ছিল বোধ হয় রবিবার। রাত বারোটা কি একটা হবে। ঘুমটা সবে জমেছে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল টেলিফোন। রিসিভারটা তুলে নিয়ে রুক্ষস্বরে বললাম, 'আপনার জ্বালায় ছুটির দিনেও একটু রেহাই নেই।'

'বড্ড বিপদে পড়ে আপনাকে বিরক্ত করছি।'

একি! হরবিলাসবাবুর গলাটা এমন মিহি এবং মিষ্টি হল কবে থেকে?

বললাম, 'আপনি কে জানতে পারি?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার বড্ড বিপদ।'

'কি বিপদ, বলুন?'

আমার স্বামী আজ তিনদিন হল কোথায় চলে গেছেন। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। সেটা যাতে কাল ভোরেই…'

'ওসব ব্যাপার আফিসে জানাবেন। এটা আমার বাড়ি।'

মহিলাটি অত্যন্ত কাতর হয়ে বললেন, 'জানি। কিন্তু ওঁরা যে ছাপতে চাইছেন না। বলছেন জায়গা নেই।'

কি আর করি? হরবিলাসবাবুকে ডেকে জায়গা করে দিতে হল।

সকাল বেলা কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই বিজ্ঞাপনটার কথা মনে হল। 'হারানো, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ' কলমের নিচের দিকে ছাপা হয়েছে ঃ

'আমি তোমার নামে শপথ করে বলছি, আর কোনোদিন ওকথা মুখে আনবো না। একবার শুধু ফিরে এসো। তোমার পায়ে পড়ি।' হতভাগিনী অলকা।

দিন চারেক পরে। আফিসে বসে কাজ করছি। টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো।'

'আমি অলকা। নমস্কার।'

'ওঃ, নমস্কার। আপনার স্বামী ফিরে এসেছেন?'

'না, কি করি বলুন তো?'

'তাই তো। খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু…'

মহিলাটি যেন অনেকখানি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি। আর একটা অনুরোধ করব?'

'কি বলুন? আমি যতটা পারি নিশ্চয়ই করব।'

'দয়া করে একবার যদি আমার বাড়িতে আসেন, বড়ই উপকার হয়।'

একজন ভদ্রমহিলা বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছেন। তা ছাড়া ব্যাপারটা সম্বন্ধে মনে মনে অনেকখানি কৌতূহলও ছিল। সুতরাং রাজী হলাম।

মস্ত বড় বাড়ি। মাধবীলতার ছাওনি-ঘেরা গেট। সামনে ফুলের বাগান। দুধার দিয়ে কাকর-বিছানো পথ। গেটের গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা ঃ বি. কে. বসাক।

নামটা খুবই চেনা।

ভিতরে গাড়ি-বারান্দার নিচে আমার গাড়ি থামতেই দারোয়ান এসে উপরে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। একেবারে আধুনিক ধরনে সাজানো বড়লোকের ড্রইংরুম। মিনিট তিনেক বসতেই একটি মহিলা এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, 'আপনিই কি…'

'হ্যাঁ, আমিই অলকা।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

'নিশ্চয় ।'

'এটাই কি বিখ্যাত ব্যারিস্টার বিজন বসাকের বাড়ি ?'

'হ্যাঁ, তিনিই আমার স্বামী ।'

আমি, যাকে বলে, একেবারে হতভম্ব । ক'মিনিট তো কথাই বেরুল না। তারপর কোনো রকমে বললাম, 'মিস্টার বসাক নিরুদ্দেশ ! এ কেমন করে হল ?'

মহিলাটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই কথা বলবার জন্যেই আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি । আমার আর কেউ নেই । যারা ছিল, তারাও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে ।'

অত্যন্ত দুঃখ হল । বললাম, 'আমার দ্বারা যদি আপনার কোনো উপকার হয়, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না ।'

অলকা দেবী বললেন, 'আপনাকে একটু উঠতেই হবে ।'

অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে আমরা থামলাম । ঘরটা বন্ধ ছিল । উনি নিজে তালা খুলে আমাকে ভেতরে যেতে বললেন । ফাঁকা ঘর । আসবাবের মধ্যে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল ! আর উপরে একটা রুপোর কোটো এবং একটা কলকে । টেবিলের পাশে একখানা সাধারণ চেয়ার । অলকা দেবী কোটোটা খুলে আমার সামনে ধরে বললেন, 'এটা কী চিনতে পারছেন ?'

খানিকক্ষণ দেখে বললাম, 'গাঁজা বলে মনে হচ্ছে ।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই ! আর এটা ?'

'ওটা তো কলকে ।'

'গাঁজার কলকে ।'

বললাম, 'এসব এখানে কেন ?'

অলকা দেবী আর একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন, 'আমার স্বামী খেয়ে থাকেন ।'

আঁতকে উঠে বললাম, 'অ্যাঁ, বলেন কি ! বসাক সাহেব গাঁজা খান ?'

নিঃশব্দে বসবার ঘরে ফিরে এসে অলকা দেবী বললেন, 'আপনাকে সব কথা খুলে বলছি । তেরো বছর আগে আমাদের বিয়ে হয় । বিয়ের তিন দিন পরেই জানতে পারি যে, আমার স্বামী গাঁজা খেয়ে থাকেন । মনে আছে, সেদিন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম । অত বড় ঘরের ছেলে, বিলেত-ফেরৎ ব্যারিস্টার, চাল-চলনে পুরো সাহেব· গাঁজার কলকেয় দম দিচ্ছেন,—দৃশ্যটা সইতে পারি নি । বিলেতে কোনো এক সাধুর পাল্লায় পড়ে নাকি এটা ধরেছিলেন, আর ছাড়তে পারেননি । পারেন নি বলি কেন, ছাড়তে চান নি ! উনি বলেন, এত বড় আনন্দ নাকি দুনিয়ায় আর কিছুতেই নেই । যতক্ষণ কলকে হাতে থাকে, ওঁর মনে হয়, উনি সশরীরে স্বর্গে আছেন ।

অনুরোধ, অভিমান, ঝগড়া, রাগারাগি, সবই করে দেখেছি । কোনো ফল

হয় নি। এই লজ্জা আর এত বড় দুঃখ কাউকে জানানো যায় না। তেরো বছর ধরে কি করে দিন কেটেছে আমি বোঝাতে পারব না। আরো কত বছর হয়তো এমনি করেই কাটত, হঠাৎ একটা চরম কাণ্ড ঘটে গেল।

দিনটা ছিল আমার জন্মদিন। উৎসবের আয়োজন ছিল, আর সেই সঙ্গে একটা চায়ের আসর। কলকাতার অনেক বিশিষ্ট লোক এসেছেন। মহিলাদের ভিড়ই বেশী। হঠাৎ ঐ ছোট ঘরের পাশ দিয়ে যেতে একটি তরুণী কিসের কড়া গন্ধে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। গন্ধের ব্যাপারটা আমি জানি, আর কারুর তো জানা ছিল না! কিন্তু জানতে আর দেরি হল না। লোকজন হৈ-চৈ, জল, পাখা, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি হট্টগোলের মধ্যে বেরিয়ে এলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার বসাক— গায়ে ফতুয়া, হাতে গাঁজার কলকে, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, সারা গায়ে উৎকট গন্ধ। মেয়েদের মধ্যে আরো দু-চারজন ফিট হয়ে পড়ে গেল। পুরুষেরা কেউ দিলে গালাগালি, কেউ ডাকল ডাক্তার, আর কেউ ছুটল পুলিশে ···থানায়।

আর আমি? মাথায় বোধ হয় খুন চেপে গিয়েছিল। তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। চিৎকার করে বললাম, বল, কাকে চাও? স্ত্রী, না গাঁজার কলকে? শেষ একটা উত্তর দিতে হবে।

তিনি কি একটা বোঝাতে গেলেন, কিন্তু বারবার আমি একই কথা বলে গেলাম, বল, কোন্‌টা চাও? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরে বেয়ারা একখানা চিঠি নিয়ে এল। ভেতরে একটুকরো কাগজ। লেখা আছেঃ সব ছেড়ে যাচ্ছি, গাঁজা ছাড়তে পারব না।

তারপর তিনদিন ধরে বহু জায়গায় খোঁজ করে শেষটায় গভীর রাতে আপনার কাছে ফোন করেছিলাম।'

অলকা দেবীকে সাহায্য করব, কথা দিয়েছিলাম। করেওছি অনেক কিছু। পুলিশে খবর দিয়েছি, কোর্টের মারফত হুলিয়া বের করিয়েছি, আর কাগজে-কাগজে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। তাঁর ছবি দিয়ে সিনেমায় 'স্লাইড্' দেওয়া হয়েছে—তোমরা নিশ্চয় দেখে থাকবে। কিন্তু কোনো খবর পাওয়া যায় নি!

একেবারে হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা। এমনি সময়ে এক ভাটিয়া ভদ্রলোকের একটা চিঠি এল। লিখেছেনঃ এলাহাবাদের কাছে মিঃ বসাকের মতো একজন লোক দেখতে পাওয়া গেছে। ভদ্রলোক তাঁর মক্কেল। আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাড় পান নি।

মিসেস বসাকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম, ঐ দিনই এলাহাবাদ যেতে হবে। শহরের ঠিক বাইরেই আমার পিসেমশাই আছেন। জমিদার লোক। মস্ত বাড়ি। অনেক লোকজন। পিসীমারাও আছেন। ওখানেই ওঠা যাবে, অলকা দেবীর অসুবিধা হবে না।'

পিসীমাকে লিখে দিলামঃ 'একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে তাঁরই কোনো জরুরী

কাজে এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

স্টেশনে পৌঁছে দেখি, গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে পিসতুতো ভাই সুব্রত আর বোন মঞ্জু। অলকা দেবীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

কয়েক মাইল গিয়ে পিসেমশায়ের প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকে গাড়ি ঢুকল। দারোয়ান এসে দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সকলের শেষে নামলেন অলকা দেবী। এক-পা ফুটবোর্ডের উপর, এক-পা মাটিতে—পাশের দিকে একবার তাকিয়েই মিসেস বসাক হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

মঞ্জু ছুটে এসে ধরে না ফেললে বোধহয় মাথাটাই ফেটে যেত। ধরাধরি করে নিচেই একটা ঘরে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার এলেন। জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল। এই অবসরে আমি ওঁর মোটামুটি ইতিহাসটা সবাইকে খুলে বললাম।

ঘণ্টা খানেক পরে অলকা দেবী চোখ খুললেন। পিসীমা পাশেই ছিলেন। বললেন, 'এখন কেমন লাগছে, মা?'

অলকা দেবী ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ভালো।'

'তা হলেও তুমি শুয়ে থাকো। এখন উঠো না।'

মঞ্জু খানিকটা দুধ নিয়ে এল। কয়েক চামচ খাইয়ে দিয়ে পিসীমা বললেন, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা। আমরা পঁচিশজন লোক ঠিক করেছি। তারা চারদিকে মিস্টার বসাককে খুঁজতে যাচ্ছে।'

'খুঁজবার দরকার নেই।'

'কেন?'

'তাঁকে পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে! কোথায়?' বলে, পিসীমা ব্যস্ত হয়ে আমাদের ডেকে পাঠালেন।

ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বসাক সাহেব কোথায় আছেন অলকা দেবী?'

তিনি জবাব দিলেন না। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পিসীমা আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'বল মা' কোথায় দেখলে?'

'আপনার দারোয়ান।' বলে, অলকা দেবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পরদিনই ফিরব আশা করেছিলাম, কিন্তু পিসীমা ছাড়লেন না। দিন তিনেক সবাইকে থেকে যেতে হল। যাবার দিন বসবার ঘরে বসে জটলা হচ্ছে। মিস্টার বসাকও ছিলেন। বললাম, 'হঠাৎ গা-ঢাকা না হয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এত কাজ থাকতে হঠাৎ দারোয়ান হবার শখ হল কেন বলতে পারেন মিস্টার বসাক?'

বসাক সাহেব বললেন, 'শখ নয়, প্রয়োজন!'

'কি রকম?'

'দেখুন, এ কথা আমি ভালো করেই জানি, ঐ যে জিনিষটা, যা না হলে আমার একদিনও চলে না, ভদ্রসমাজে ওটা অচল। তাই এমন একটা পেশা বেছে নিতে হল, যেখানে ওটা অবাধে চলতে পারে। শহরে থাকলে লোকে চিনে

ফেলবে। তারপর আপনাদের বিজ্ঞাপনের জ্বালায় চেহারা বদলেও লুকিয়ে থাকা দায়। তাই শহর ছেড়ে এলাম শহরতলীতে। জমিদারের বাড়ি দেখে ঢুকে পড়লাম। বললাম, দারোয়ান রাখবেন? মাইনে চাইনে। শুধু দুটো খেতে দেবেন, আর এক কলকে ঐ···! ওঁরা তো বেজায় খুশি।'

পিসেমশাই বললেন, 'কিন্তু আমাকে যে অপরাধী করে রেখে গেলেন···'

'কিছু না, কিছু না। আপনি আমার অন্নদাতা। তার চেয়েও বেশী প্রাণদাতা। কেননা, ঐ বস্তুটাই হচ্ছে, যাকে বলে, আমার প্রাণ।'

তারপর অলকা দেবীর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু এখন থেকে প্রাণটা বুঝি বেঘোরে···'

অলকা দেবী বললেন, 'ভয় নেই, প্রাণটা বেঘোরে যাবে না।' বলে, শাড়ির আড়াল থেকে কলকেটা বের করে ওঁর হাতে দিলেন।

মিস্টার বসাক এমনভাবে দু-হাত পেতে সেটাকে তুলে নিলেন, যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছেন।

সকলের মিলিত হাসিতে ঘর ভবে উঠল।

টু-লেট্

নতুন বাড়িতে এসে প্রথম রাতটা ঘুম আসছিল না। এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ধারালো বিকট শব্দে ঘুমটা যেন ঝাঁকানি খেয়ে ভেঙে গেল! ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। শব্দটা আসছিল পাশের বাড়ির দিক থেকে। কোনো রকমে কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে খালি পায়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দরজা খোলাই ছিল। ঢুকেই ডান দিকে একটা ছোট ঘর। তার মাঝখানে কম্বলের উপর বসে একজন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী গোছের লোক বেপরোয়া চিৎকার করছে। গলা চিরে রক্ত পড়ছে না এটাই আশ্চর্য। জানি না সে কি উৎকট ব্যাধি, যার তাড়নায় মানুষকে এমন করে আর্তনাদ করতে হয়। সমস্ত মুখ কুঁচকে আসছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে, আর মাথাটা মনে হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে ছিটকে পড়ে যাবে। কি করব ভাবছি, এমন সময় একজন কে এগিয়ে এল।

'আপনার কি চাই?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'উনি অমন করছেন কেন? কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি। উনি সুর-সাধনা করছেন।'

'সুর-সাধনা করছেন!'

'হ্যাঁ, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ওস্তাদ সচ্চিদানন্দ বটব্যাল।'

তারপর বেলা যেমন বাড়ল, নানা জাতের, নানা বয়সের কত সব শিষ্য এবং শিষ্যা এসে জড় হল ওস্তাদজীর বৈঠকখানায়। কেউ এল ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ

মোটর হাঁকিয়ে, কেউ বা রিকশায়। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই শুরু হল 'আলাপ', অর্থাৎ সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁদে, কঁকিয়ে, গর্জে উঠল! সে কি সুরের তাণ্ডব! মনে হল, আর কিছুক্ষণ শুনলেই মাথায় খুন চেপে যাবে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সরে এলাম।

মা এসে বললেন, 'জিনিষপত্তর আর খুলে কাজ নেই। আজই অন্য বাড়ি দ্যাখ।'

ছোট বোন বললে, 'মনখানেক তুলো কিনে আন মেজদা। যতক্ষণ আছি, বেশ করে না ঠাসলে কানের পরদা ফেটে যাবে।'

বুঝলাম সবই। কিন্তু কলকাতা শহরে বাড়ি খোঁজা! তার চেয়ে অনেক সহজ মেক্সিকোর জঙ্গলে সোনা খুঁজে বের করা। ভাগ্যিস পিসতুতো ভাই সমরেশ ছিল। ক্যালকাটা পুলিশের মস্ত চাঁই। তারই চেষ্টায় এবং ছ-মাসে তিন জোড়া জুতোর তলা ক্ষয় করে এই সাড়ে তিন খানা ঘর জোটানো গিয়েছিল। এবার আবার কোথায় যাই?

সেইদিনই সমরেশের শরণ নিলাম। সব শুনে সে বললে, 'কি করবে বল? মনে করে নাও, তোমার বাড়ির পাশে 'জেসোপ কোম্পানি' চব্বিশ ঘণ্টা লোহা পিটছে।'

আমি বললাম, 'আপত্তি নেই। বাড়ির আরেক পাশে যদি 'টাটা' এসে ছত্রিশ ঘণ্টা ইস্পাত ঠোকে, তাও সইব। কিন্তু সচ্চিদানন্দের সুর-সাধনা? উঃ! সে একেবারেই অসহ্য।'

সমরেশ কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, দেখি কি করা যায়।'

চার-দিন কেটে গেল। কি করে কাটল, বোঝাতে চাই না, চাইলেও পারব না। দরজা জানালা বন্ধ। তারই ভিতর দিয়ে ফুঁড়ে আসছে সুরের জিমন্যাস্টিক, আর তালের খচমচ। হঠাৎ সেদিন মনে হল, যেন একটা বেসুরো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখলাম, হ্যাঁ, একটা নতুন কিছু বটে। বটব্যালের বাড়ির সামনে এক মস্তবড় ভিড়, কম করেও জন পঞ্চাশেক লোক।

উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় বোঝাচ্ছেন, 'একশ' বার বলছি, মশাই, এটা আমার নিজের বসত-বাড়ি। তিন পুরুষ ধরে ছেলেপিলে নিয়ে বাস করছি, আর আপনি বলছেন, ভাড়া দেবো? কেন? কোন্ দুঃখে?'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বললে, 'ভাড়া দেবেন না তো এতগুলো 'টু-লেট' লাগিয়ে কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

বটব্যাল একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, 'টু-লেট! আমার বাড়ির সামনে টু-লেট? আপনি বলছেন কী?'

দেখা গেল, বলেছেন ওঁরা ঠিকই, বাড়ির গায়ে গেটের সামনে তিন-চারখানা ছাপানো 'টু-লেট'। তাতে লেখা আছে, 'ভেতরে অনুসন্ধান করুন।' একটা চাকর গিয়ে সবগুলো খুলে নিয়ে এল। বটব্যাল কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকে হঠাৎ রুখে উঠলেন, 'এসব চক্রান্ত। আমি পুলিশে যাব, আমি দেখে নেব…'

শিষ্যেরা এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। সেদিনকার সুর-সাধনা আর তেমন করে জমল না। পরদিন সকালে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। বেলা তখন আটটাও বাজে নি। সরু গলিটা একেবারে লোকে লোকারণ্য। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সবারই লক্ষ্য বটব্যালের বাড়ি! পুলিশ এসে লোকগুলোকে লাইনে দাঁড় করাতে লাগল—সিনেমার টিকেট ঘরের সামনে যেমন করে কিউ দিতে হয়। ওস্তাদের দরজা বন্ধ। ভিড়ের মধ্যে তখন ভয়ানক সোরগোল চলছে। কেউ বলছে, দরজা ভেঙে ফেল। কেউ হাঁকছে, কে আছেন, বেরিয়ে আসুন, মশাই!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর চাকর এসে দরজা খুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোজন লোক ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বটব্যাল সামনেই ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, 'কি চান আপনারা?'

সকলে একসঙ্গে বললে, 'বাড়ি-ভাড়া।'

বটব্যাল যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন, 'দেখুন, এ বাড়িতে আমি বাস করি। এটা যে ভাড়া দেওয়া হবে, একথা তো আমি কাউকেই বলি নি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের উপর এসে পড়ল কতকগুলো কাগজ এবং তিন-চারজন গর্জে উঠল, 'এসব কি তাহলে তামাসা?'

বটব্যাল পড়ে দেখলেন, এগুলোও ছাপানো টু-লেট, তবে গতকাল থেকে একটু ছোট। কিন্তু এতে বাড়ির নম্বর দেওয়া আছে, আর বলা আছে, ভাড়ার জন্যে স্বয়ং বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়েছে শহরময়···শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ, আর বেলেঘাটা থেকে বড়বাজার,—লাইটপোস্টে, বাড়ির দেওয়ালে, ইস্কুল-কলেজের নোটিশ বোর্ডে। বটব্যাল দেখলেন, চটলে সুবিধে হবে না। ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন, আপনাদের নাম-ধাম সব দিয়ে যান, পরে খবর দেব।'

প্রথমে এগিয়ে এলেন একজন, তার দেশ বোধহয় মাদ্রাজ। বটব্যাল খাতা-পেনসিল নিয়ে বললেন, 'আপনার নাম?'

'ভেঙ্কটরাম আচারিয়া।'

বটব্যাল লিখতে লিখতে পড়লেন, 'কটমটরাম আচারিয়া। তারপর?'

'NO, NO! Not কটমটরাম। ভেঙ্কটরাম, My name is ভেঙ্কটরাম।'

'ঐ একই হল মশাই। যে ভেঙ্কট, সে-ই কটমট। তারপর···'

দুনম্বর এলেন এক মাড়োয়ারী। নাম বললেন, 'গঙ্গাধরলাল বক্‌রিওয়ালা।' তারপর বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ভাটিয়া, উড়িয়া···বটব্যালের খাতা ভরে উঠল।

বাইরে তখন তুমুল কাণ্ড চলছে। ভীষণ ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি। সবাই একসঙ্গে ঢুকতে চায়। বাড়ি বুঝি ভেঙেই পড়ে। অগত্যা ওস্তাদজী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং জোড় হাত করে কি একটা বলতেও গেলেন, কিন্তু জনতার হুঙ্কারে কিছুই শোনা গেল না। জনকয়েক এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। বটব্যাল হাঁকলেন, 'পুলিশ! পুলিশ!'

কোথায় পুলিশ ? শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এসে দাঁড়াল, কিন্তু কি করবে ভেবে পেল না। এমনি যখন অবস্থা, তখন ঘটল এক খণ্ড-প্রলয়। হঠাৎ সেই ক্ষেপে-ওঠা লোকগুলো, 'বাবা গো, মাগো' বলে এ পড়ে ওর ঘাড়ে, ও পড়ে এর ঘাড়ে। কি ব্যাপার ? দেখলাম, বটব্যাল-গিন্নী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বালতির পর বালতি গোবর-গোলা জল দিয়ে ঢেলে চলেছেন রাস্তায়। ওপরে চেয়েছ কি মুখের ওপর এক বালতি। এতবড় যে জনতা, একেবারে কর্পূরের মতো কোথায় উবে গেল !

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। বড়বাজারে গিয়ে ছিলাম, কি একটা কাজে। দেখলাম, একজন লোক প্রত্যেক গ্যাস-পোস্ট থেকে কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছে। এ কি ! এযে আমাদের সচ্চিদানন্দ !

'ও কি করছেন, ওস্তাদজী ?'

বটব্যালের চোখে লালা। বললেন, 'পরশুরামের কথা জানেন তো ? তিনি পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। আমি কলকাতা শহরকে বিজ্ঞাপন-শূন্য করব।'

দিন কয়েক আর কোনো উপদ্রব হল না। মাঝে মাঝে দু-চারজন লোক আসে, কড়া নাড়ে। চাকরে দরজা খুলে জানিয়ে দেয়, বাড়ি-ভাড়া নেই। তারা চলে যায়। মনে হল, ওস্তাদের ফাঁড়া এবার কাটল ! সুর-সাধনা কিছুদিন বন্ধ থেকে আবার চলতে শুরু হয়েছে। হঠাৎ আবার কি হল ? রবিবার সকাল আটটা নাগাদ বটব্যালের বাড়ির সামনে দলে দলে কাতারে কাতারে লোক জড় হতে লাগল। প্রায় সকলের হাতেই একটা করে খবরের কাগজ। আবার সেই ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, 'ও মশাই, ও মিস্টার বটব্যাল, বাড়িটা একবার দেখতে চাই।'

ওস্তাদজীর একজন শিষ্য এসে বললেন, 'এ বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে !'

'আরে মশাই, আজ সকালে কাগজে বেরিয়েছে, এরি মধ্যে হয়ে গেল ? ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পেলেন না ?' বলে কয়েকজন তাদের কাগজখানা শিষ্যকে দেখালেন।

শিষ্য অবাক হয়ে দেখলেন, দস্তুরমতো বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন। শুধু বাড়ির নম্বর নয়, বাড়িওয়ালা বটব্যালের নাম পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। একখানা কাগজ নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বাইরের ভিড় জোয়ারের জলের মতো ফুলে উঠতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে দুখানা ঘোড়ার গাড়ি বহু কষ্টে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এসে দাঁড়াল ওস্তাদজীর গেটের সামনে। তার উপর চাপানো হল বাক্স, বিছানা, টিনের সুটকেস, দড়িবাঁধা আলনা, কাপড়ে-জড়ানো মাদুর, আর নানা আকারের হাঁড়ি-কলসি। একটু পরেই তানপুরা কাঁধে নেমে এলেন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ এবং তার পেছনে ছেলের হাত ধরে বটব্যাল-গিন্নী।

দু-চারজনে জানতে চাইলেন, 'বাড়িটা ভাড়া দেবেন নাকি ?'

'না। ভাড়া নয়, একেবারেই দিয়ে যাচ্ছি। তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে দিলাম। যাও, বেশ করে ভোগ কর।' বটব্যালের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

একজন বোধ হয় চেনা লোক, জিজ্ঞেস করল, 'একি! ওস্তাদজী কোথায় যাচ্ছেন?'

ওস্তাদজী দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'চুলোয়।'

'আরে, এসো, এসো, সমরেশ যে।'

সমরেশ পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে বললে, 'বটব্যাল ব্যাটা চলে গেছে তো?'

'হ্যাঁ, সে তো পরশু।'

'যাক। এবার তাহলে বিলটা দিয়ে দাও। ন-টাকা তেরো আনা।' বলে, পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের বিল!'

'পাঁচশোখানা টু-লেট ছাপাবার খরচ, আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন একদিনের।'

'ও-ও-হো! এসব তাহলে তোমার কাণ্ড?'

সমরেশ কথা বলল না। হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ছলে বলে কৌশলে

ম্যাট্রিকের ফল বেরোলে দেখা গেল 'দীনবন্ধু গার্লস স্কুল'এর দুটি মেয়ে জলপানি পেয়েছে, কিন্তু 'জগদম্বা একাডেমি'র কোনো ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে পর্যন্ত যেতে পারে নি। 'দীনবন্ধু'তে সেদিন আর পড়াশুনা হল না। হলঘরে মিটিং করে গলায় মালা আর কপালে চন্দন দিয়ে মেয়ে দুটিকে অভিনন্দন জানানো হল। হেডমিস্ট্রেস সুমিত্রা সেন একাই একঘণ্টা তেইশ মিনিট বক্তৃতা করলেন। মিটিং শেষ হতে বেজে গেল ছ'টা। গীতা যখন বাড়ি ফিরল, তার দাদা অজয় তার অনেক আগেই এসে গেছে। গীতাকে বাড়ি ঢুকতে দেখেই বললে, 'কীরে, এত সকাল-সকাল ফিরলি যে? আমরা তো ভেবেছিলাম উৎসবটা বুঝি তোদের সারারাত ধরেই চলবে।'

গীতা বইগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বললে, 'উৎসবের মতো ব্যাপার হলেই উৎসব হয়ে থাকে।'

'কী-কী হবে শুনি? পুতুল-নাচ, ম্যাজিক-লণ্ঠন? তারপর আবার বাজিও পুড়বে নাকি হাজার টাকার?'

গীতা গম্ভীরভাবেই বললে, 'না, ওসব হবে বলে তো শুনি নি। তবে শুনেছি একটা শোকসভা হবে।'

অজয় অবাক হয়ে বললে, 'শোকসভা! কেন?'

গীতার ঠোঁটদুটোতে একটু চাপা হাসি দেখা গেল। বললে, 'ছেলেদের দুঃখে সমবেদনা জানাবার জন্যে।'

'ইস, খুব যে কথা বলতে শিখেছিস দেখছি! ছেলেদের মন অত ঠুন্‌কো নয়। সারারাত জেগে আর একবস্তা নোট মুখস্ত করে পনেরো টাকা জলপানি পাওয়াটাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়।'

গীতা বেজায় গম্ভীরভাবে বললে, 'নিশ্চয়ই নয়! কথামালার শেয়ালটাও ঠিক ঐ কথাই বলেছিল—দূর ছাই, আঙুর আবার কেউ খায়? টক···টক, একেবারে বাঘা তেঁতুল।'

'তবে রে!' বলে, অজয় তাকে তাড়া করলে। তার আগেই সে দৌড়ে পাশের বাড়ি।

'জগদম্বা একাডেমি'র কর্তাদের মুখ ভারি হয়ে উঠল। জরুরি বৈঠক বসল সেক্রেটারির বৈঠকখানায়। পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ইস্কুল এই জগদম্বা। ঐ পাঁচ বছরের মেয়ে-ইস্কুলটার কাছে এমনি করে হেরে যাবে? একটা কিছু না করলে আর চলে না। তারিণী খুড়ো সেকেলে লোক—ইস্কুলের প্রথম আমলের পাস। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন, 'হবে না? আমি একশোবার করে বলছি, ইস্কুল ভালো করতে হলে আগে চাই একটি ভালো হেডমাস্টার। খালি এম এ পাস করলেই হয় না, ইংরিজি লিখতে জানা চাই। হ্যাঁ, মাস্টার ছিল বটে তিনকড়ি তালুকদার! সাবেকি আমলের এফ এ. ফেল, কিন্তু ইংরিজি লিখত কী একখানা। তোমাদের এই এক ডজন ডবল এম. এ. ঘায়েল হয়ে যাবে। আচ্ছা, বিনয় বাবাজী তো শুনছি এবার এম. এ দেবে। বল দিকিনি, কুড়িজন লোক কলেরায় মারা গেছে, এর ইংরিজি কী?'

বিনয় হেসে বললে, 'ওসব ভুলে গেছি খুড়োমশাই।'

'আরে বলই না?'

বিনয়কে বলতে হল, **'Twenty men died of cholera.'**

খুড়ো নাক সিঁটকে বললেন, 'আরে ছোঃ! এ কি একটা ইংরিজি হল? তবে শোনো, একটা গল্প বলি! বাংলা ১৩০৩ সন। গ্রামে লাগল কলেরা। ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যালকন সাহেব এলেন তদন্তে। দত্তদের বৈঠকখানায় মাতব্বরদের ডাক পড়ল। তিনকড়িবাবু গেলেন সাহেবদের সঙ্গে আলাপ করতে। সাহেব ভাবলে, এ আবার ইংরিজি কি বুঝবে! বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কটো আদমি মারা গেছে বাবু?'

তিনকড়িবাবু বুক ফুলিয়ে বললেন, **'Your honour, one score of human being gave up their ghosts on account of the ravages of cholera.**

সাহেব তো একেবারে থ! তাই বলছিলাম, একটি ভালো হেডমাস্টার আন।'

রসিকবাবু অল্প কথার লোক। পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'মাস্টার দিয়ে কী হবে? ছেলে কই? গাধা পিটিয়ে তো আর ঘোড়া হয় না।'

পশুপতিবাবুর বাড়ি ইস্কুলের কাছে। বললেন, 'ছেলে কই কী রকম? গিয়ে দেখো একদিন ওদের টিফিনের সময়। রীতিমতো পঙ্গপাল। একটু চোখ বোজে কার সাধ্য!'

রসিকবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাটাছেলে হলেই তো তাকে ছেলে বলা যায় না।'

সেক্রেটারি একমনে গড়গড়া টানছিলেন। একটা লম্বা টান দিয়ে নলটা তারিণী খুড়োর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'রসিক ঠিকই বলেছে। গ্রামের ছেলেগুলো সব গোল্লায় গেছে। বাইরে থেকে ক'টি ভালো ছেলে আনতে পার? ইস্কুলে ফ্রি মাইনে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা যাবে।'

মহীতোষবাবু ইস্কুলের একজন মাস্টার। এতক্ষণ কথা বলেন নি, এবার ভরসা পেয়ে তিনি বললেন, 'সে আর শক্ত কী, স্যার? বলেন তো এই রূপসার ইস্কুল থেকেই ভাঙিয়ে আনা যায়।'

সেক্রেটারি বললেন, 'তাই আন না; ঐ 'দীনবন্ধু'র মেয়েগুলো তোমাদের মুখে চুনকালি দিচ্ছে, আর তোমরা চুপ করে থাকবে? ওদের হটাতেই হবে, যেমন করে হোক···'

মাইল তিনেক দূরে রূপসার বাবুদের নতুন ইস্কুল। সঙ্গে একটা হোস্টেলও আছে। তারই একখানা ছোট ঘরে ওদের সবচেয়ে ভালো ছেলে প্রিয়লাল আসছে বছর পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। ছেলেটি ভারি ভক্ত। দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গির মধ্যে একখানি সরস্বতী মূর্তি। সকাল-সন্ধ্যায় সে সেখানে ধূপধুনো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে, তারপর সে পড়তে বসে।

সে রাতটা ছিল বোধহয় অমাবস্যা। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে প্রিয়লাল শুয়ে পড়েছে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়েছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে সে চোখ আর ফেরাতে পারলে না। চেঁচাতে গেল, গলায় স্বর ফুটল না। টেবিলের উপর একটি ছোট মোমবাতি জ্বলছে। তারই আলোতে দেখা গেল, তক্তপোশের ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে এক দেবীমূর্তি। প্রিয়লাল হাতজোড় করে ভক্তিভরে কি যেন বলতে গেল।

দেবী নিজ ওষ্ঠের ওপরে আঙুল রেখে নিষেধ জানালেন। প্রিয়লাল আর থাকতে পারল না। দেবীমূর্তির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে দেখে কেউ কোথাও নেই। শুধু তার মাথার কাছটিতে একটুকরো কাগজ পড়ে আছে। স্পষ্ট অক্ষরে লেখা—আমি দেবী সরস্বতী। তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়া দর্শন দিতে আসিলাম। আমার আদেশ, তিন দিনের মধ্যে তুমি এই ইস্কুল ত্যাগ করিয়া জগদম্বা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হইবে।

হঠাৎ প্রিয়লালের কাছ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পেয়ে সমস্ত ইস্কুল যেন আকাশ থেকে পড়ল, বিশেষ করে হেডমাস্টার। অনেক অনেক করে বোঝাল—অনেক অনুনয়, প্রলোভন, অভিমান। কিন্তু প্রিয়লাল একেবারে অটল। তার মুখে এক কথা—আমার মায়ের আদেশ। তার মা কখন কি ভাবে আদেশ দিলেন এটা কেউ জানল না।

'জগদম্বা'তে এসে সেক্রেটারির বাড়িতেই তার থাকবার খাবার ব্যবস্থা হল। সকলের আগে আলাপ হল অজয়ের সঙ্গে। প্রথম দেখা হতেই প্রিয়লাল চমকে

উঠল। মুখখানা যেন তার চেনা। যেন কোথাও স্বপ্নে দেখেছে, কিন্তু ভুলতে পারে নি।

'দীনবন্ধু গার্লস'-এর দিন কাটছিল একেবারে নির্ভাবনায়। অপর্ণা তাদের আগুনের মতো মেয়ে। আশির নিচে কোনো বিষয়েই পায় না। তার কাছে ঘেঁসে এমন ছেলে কোথায় পাবে 'জগদম্বা'? এমন সময় প্রিয়লালের অপ্রিয় খবরটা একঝলক বিদ্যুতের মতো তাদের চমকে দিলে। হেডমিস্ট্রেস সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

নাঃ, তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। অপর্ণাকে আসতে হল হেড-মিস্ট্রেসের বাড়িতে। তার প্রত্যেকটি মিনিট তিনি রুটিন দিয়ে বেঁধে দিলেন। এতটুকু ফাঁক নেই! চারদিকে ঠাসা কেবল জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য আর বীজগণিত। মেয়ে শুকোতে লাগল। তার বাবা মা চিন্তিত হয়ে উঠলেন; কিন্তু সুমিত্রা লেগে রইলেন যক্ষের মতো।

প্রিয়লালের ঘাড়ে চাপল টিউটরের বোঝা—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। একজন উঠতেই আর-একজন। তার উপর মহীতোষবাবুর খবরদারি, হেড-মাস্টারের খোঁজ-খবর. আর সেক্রেটারির আদর-যত্ন। প্রিয়লাল হাঁপিয়ে উঠল। অজয় দুবেলা এসে উৎসাহ দেয়, তবু ও মুষড়ে পড়ছে দিন দিন।

আর অপর্ণা? তার শরীরে আর মনে লেগেছে বিদ্যুতের তেজ! এগিয়ে চলেছে আগুনের মতো—নম্বর উঠছে নব্বই, নিরানব্বই। 'জগদম্বা' কোন্ ছার? সব ইস্কুলকে সে ছাড়িয়ে যাবে। প্রিয়লাল পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারবে না—প্রচার করে দিলেন সুমিত্রা সেন।

জগদম্বার সেক্রেটারি সিদ্ধেশ্বরবাবুর বৈঠকখানায় আবার বৈঠক বসল—অজয়, মহীতোষ, হেডমাস্টার আর পাড়ার দু-চারজন! এমন সময় খবর এল, তাঁর ছেলে বি. সি. এস্ পাস করে সাব-ডেপুটি হয়েছে। সকলে বাহবা দিতে লাগল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন।

কোনোদিন যা হয় নি—অপর্ণাদের বসবার ঘরে হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরবাবু এসে উপস্থিত। তার বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কোথায় বসান, কী করেন? সিদ্ধেশ্বর একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন, 'তোমাদের আশীর্বাদে ছেলেটা হাকিম হয়েছে। কাজে বসবার আগেই বিয়েটা দিতে চাই। তোমার অপর্ণাকে দিতে হবে। দাবি-দাওয়া কিছু নেই। তবে, বিয়ে হবে একমাসের মধ্যে।'

অপর্ণার বাপ তো হাতে স্বর্গ পেলেন। কিন্তু দু-মাস পরে মেয়েটার পরীক্ষা। বিয়ের দিন কি পেছিয়ে দেওয়া যায় না? সিদ্ধেশ্বর জানালেন, কোনো মতেই না।

মেয়ের বাপ যখন ভাবছেন, মেয়ের মা আড়াল থেকে বললেন, 'মেয়ের বিয়ে আমি একমাসের মধ্যেই দেব।'

সেই রাত্রেই খবর শুনে অপর্ণা কেঁদে ফেলল। সুমিত্রা না খেয়ে ঘরে দোর দিলেন। পরদিন টেলিগ্রাম গেল তাঁর ভাইয়ের কাছে, 'মৃত্যুশয্যায়। একবার দেখতে চাই। অবিলম্বে এসো।'

ভাই দিনাজপুরে পুলিসের ডি. এস. পি.। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাজির। দিদি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছেন। ভাইয়ের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোমার মৃত্যুশয্যাটা কোথায় দিদি?'

সুমিত্রা বিছানার উপর বসে পড়ে বললেন, 'এই শয্যাটাই এক মুহূর্তে মৃত্যুশয্যা হয়ে দাঁড়াবে যদি আমার একটা কথা না শোনো।'

'কী কথা, শুনি?'

ভাইবোনেতে অনেক কথাই হল।

অপর্ণার বাবা পড়লেন ফাপরে। একদিকে হাকিম আর একদিকে পুলিশ। পুলিশ শুনে গিন্নীর নাক কুঁচকে উঠল। কর্তা বোঝালেন, 'আরে পুলিশ মানে কি দারোগা? রীতিমতো পুলিশ সাহেব। তাছাড়া এরা বিয়ে দেবে তিন মাস পরে। পরীক্ষাটা হয়ে যাবে। মেয়েটাও কান্নাকাটি করছে।'

শেষটায় তাই হল! হাকিমের হার হল পুলিশের কাছে। সুমিত্রার ভাইয়ের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ের পাকাপাকি হয়ে গেল তিনমাস পরে।

পরীক্ষা এসে গেল। একই সেণ্টারে সীট পড়ল ছেলেদের জিলা ইস্কুলে, আর মেয়েদের সদর গার্লস ইস্কুলে। প্রিয়লালের সঙ্গে এল অজয় আর মহীতোষ। অপর্ণাকে নিয়ে এলেন স্বয়ং সুমিত্রা। ইংরিজি দুজনেই ভালো লিখল। বাংলাটাও উতরে গেল ভালোয়-ভালোয়। পরদিন অঙ্ক। এরই উপর নির্ভর করছে কে জিতবে আর কে হারবে।

অপর্ণার সীট পড়েছে একটা ছোট ঘরে। আট-দশটি মেয়ে। একজন নতুন গার্ড এসেছে। তার মাথায়-মুখে ব্যাণ্ডেজ। খোলা আছে খালি চোখদুটো, আর তার নিচে একজোড়া জমকালো গোঁফ। দাঙ্গায় অ্যাসিড লেগে তার নাকি এই অবস্থা। লোকটা যেন কেমনধারা। কেবল-কেবলই অপর্ণার পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অপর্ণার সেদিকে খেয়ালই নেই। একমনে অঙ্ক লিখে চলেছে। পুরো নম্বর তাকে পেতেই হবে যেমন করে হোক।

চারদিকে সব চুপচাপ। হঠাৎ অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে হাউ-মাঁউ করে উঠল। বিকট চিৎকার, 'মাগো! খেয়ে ফেললে গো···!' চেঁচামেচিটা এল অপর্ণাদের ঘর থেকেই। হেডমিস্ট্রেস ছুটে এলেন, কিন্তু দোরগোড়া পর্যন্ত এসেই 'ওঃ মাগো' বলে দু-হাতে শাড়ি গুটিয়ে পিট্‌টান। একেবারে নিজের ঘরে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। একদিকে দপ্তরি আর একদিকে কেরানীবাবু দুখানা পাখা নিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করে চলল। ততক্ষণে সব ঘর থেকেই মেয়েরা বেরিয়ে আসতে লাগল। সকলের চোখে-মুখে আতঙ্ক। কেউ বলছে গোখরো সাপ, কেউ বলছে নেকড়ে। দারোয়ান হেঁকে উঠল, 'বুনো শুয়োর!' মাস্টার মশাইদের মধ্যে দু-চারজন যাঁদের সাহস আছে, আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন অপর্ণাদের ঘরের দিকে। কই, কিছু তো নেই? নেকড়েও নয়, শুয়োরও নয়। ঘরময় কিলবিল করছে একরাশ আরশোলা! তার কতকগুলো তখনো অপর্ণার চুলে আর পিঠে লেগে আছে, আর সে ক্রমাগত চুল ছিঁড়ে কাপড় ঝেড়ে

সমস্ত ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। বাকি মেয়েরা একজনের পর একজন ঘরের একটা কোণ ঘেঁসে এমন করে দাঁড়িয়েছে যে, আর একটু হলেই তাদের দম আটকে যেত।

হেডমিস্ট্রেসের ঘরে সবাইকে এনে বসানো হল। তিনি তখন খানিকটা সামলে নিয়েছেন। অপর্ণাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আপদগুলো এল কোত্থেকে ?'

অপর্ণা চোখ বুজে বসে রইল। তার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, সে বললে, 'ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা গার্ডটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পকেট থেকে একটু রুমালের পোঁটলা বের করে ফস্ করে ঝেড়ে দিল অপর্ণার পিঠে। একঝুড়ি আরশোলা! বাবাগো ···' মেয়েটি আর বলতে পারল না। কেঁপে উঠে চোখ বুজলো। এমন সময় খবর পেয়ে সুমিত্রা এসে পড়লেন। একটু পরেই সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা গার্ডকে দারোয়ান টানতে টানতে এনে হাজির করল।

হেডমিস্ট্রেস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এই মেয়েটির গায়ে আরশোলা ফেলেছেন ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন ?'

গার্ড চুপ করে রইল।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'বলুন! আপনি জানেন, কী মারাত্মক জিনিষ এই আরশোলা ? মেয়েটির হার্ট ফেল করতে পারত!'

গার্ড কোনো কথা বললে না। দারোয়ান তার ঘাড়ে হাত দিয়ে জোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'বল না বাবু!'

ব্যস! ঝাঁকুনির চোটে জমকালো গোঁফজোড়া খুলে পড়ে গেল। দারোয়ান একটান মেরে ব্যাণ্ডেজটাও দিলে খুলে। সুমিত্রা অস্ফুট চিৎকার করে বললেন, 'অজয়, তুমি!···এ সর্বনাশ কেন করলে ?'

অজয় গম্ভীরভাবে বললে, 'ছলে, বলে, কৌশলে শত্রু দমনই হচ্ছে আমাদের পণ!'

'শত্রু! কে তোমার শত্রু ?'

অজয় বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে, 'সমস্ত স্ত্রী-জাতিই হচ্ছে আমাদের শত্রু। যারা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমাদের ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিত করছে··· হটিয়ে দিচ্ছে আমাদের ইস্কুলে, কলেজে, আফিসে, খেলার মাঠে··· তাদের যেমন করে পারি হটাবো।'

অজয়কে পুলিশে দেওয়া হল। দারোগাবাবু কেস নিলেন না। বললেন, 'আরশোলা ছুঁড়েছে তো কী হয়েছে ?'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করা হল, নতুন করে পরীক্ষা নেবার জন্যে। ভাইস চ্যান্সেলরও আরশোলাকে আমল দিলেন না।

সুমিত্রা সেন বললেন, 'আমাদের দিনও একদিন আসবে।'

পিস্তল

রায়বাড়ির বৌ হয়ে আসবাব মাসখানেকের মধ্যে এখানকার প্রায় সব কিছুই দেখে নিয়েছে শোভনা। শাশুড়িই দেখিয়েছেন ডেকে ডেকে। মস্তবড় বাড়ি। সাতাশ-খানা ঘর। সব জিনিষপত্র ঠাসা। কত দামি দামি আসবাব! বেশীর ভাগই সাহেবি দোকান থেকে কেনা। রায়গিন্নি বৌকে শুধু দেখান নি, সেইসঙ্গে শুনিয়েছেন ওদের রকমারি ইতিহাস। 'কোন্ রাজার দেওয়ান চমৎকার কাজকরা কর্পূরের কাঠের টিপয়ে চা খাইয়েছিল কর্তাকে। জাঁক দেখিয়ে বলেছিল, এর দাম কত জানেন, রায়বাহাদুর? এক হাজার টাকা। ব্যস, আর যায় কোথায়! সেই-দিন থেকেই ক্ষেপে গেলেন, ঐ রকম টিপয় চাই। লোক চলে গেল মাইসোরে। ঠিক ঐ রকম কি আর পাওয়া যায়? জিনিষ যদি বা পছন্দ হয়, দাম বলে কম। শেষকালে এক দালালের পাল্লায় পড়ে কিনলেন ঐটা। যখন আনা হল, ভুরভুর করছে কর্পূরের গন্ধ। ও হরি! তখন কি জানি, বাজে কাঠের উপর কর্পূরের সেণ্ট মাখিয়ে দিয়েছে? মাসখানেক যেতেই সব উবে গেল। তখন আর তাকে পাই কোথায়?' বলে, হাসলেন রায়গিন্নী।

শোভনা বলল, 'কত দাম নিয়েছিল?'

'দেড় হাজার।'

'কী সর্বনাশ! ডাকাত নাকি লোকটা?' কপালে চোখ তুলল শোভনা।

'আর ঐযে বুদ্ধমূর্তিখানা দেখছ, ওটা কিনেছিলেন এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। আমি গিয়েছিলাম কালীঘাট। বাড়ি ফিরতেই সিঁড়ির মুখ থেকে ধরে নিয়ে এলেন এই ঘরে—দ্যাখ কী জিনিষ একখানা! আসল শ্বেতপাথরের মূর্তি। দাম মোটে আড়াইশো। চমকে উঠলাম, বল কী! ওটা যে পেটেণ্ট স্টোন। সাড়ে তিন টাকায় বিক্রি হচ্ছে কালীঘাটের মোড়ে। শুনেই ছুটলেন সে-লোকের খোঁজে। সে কি আর তখন বসে আছে ওঁর জন্যে?'

একটা বড় ড্রেসিং টেবিল দেখিয়ে বললেন রায়গিন্নী, 'এটা যেদিন কিনতে যাই, কী মজার কাণ্ড শোনো। আমাকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে গেলেন সেই সাহেব-পাড়ায়। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। বললেন, এসো, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বলে, ঢুকে পড়লেন এক রেস্তোরাঁয়। আমি তো ভয়ে মরি! চারিদিকে খালি সাহেব-মেম। একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলাম আমরা। মাছ-মাংস চলবে না, খাবার কথা শুধু আইসক্রীম। কী খেয়াল হল, বলে বসলেন, দাঁড়াও, নতুন ধরনের নিরামিষ কিছু নেওয়া যাক ঐ সঙ্গে। বয় মেনু নিয়ে এল। পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিলেন। খাবার যখন এল, উনি চান আমার দিকে, আমি চাই ওঁর দিকে। দু-ডিশ জোড়া এই বড় বড় দুই ঢ্যাঁড়স!'

'ঢ্যাঁড়স!' হেসে গড়িয়ে গেল শোভনা।

'হ্যাঁ, গোটা ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ। বেশ করে সাজিয়ে দিয়েছে ডিশের ওপর। বয় আসতেই রেগে উঠলেন, এটা কী এনেছ ?'

আজ্ঞে, লেডিজ ফিঙ্গার। তাই তো অর্ডার ছিল আপনার। বলে, দেখিয়ে দিলে পেন্সিলের দাগ। চারিদিকে লোকগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তক্ষুনি বিল চুকিয়ে মানে মানে সরে পড়লাম।

ফেরবার পথে বললেন গাড়িতে বসে, মনে করলাম, নামটা যেমন মিষ্টি জিনিষটাও আ-মরি-গোছের হবে নিশ্চয়ই। লেডিস-ফিঙ্গার মানে যে ঢ্যাঁড়স তা কেমন করে জানব ! যেমন বিটকেল জাত, তেমনি ব্যাটাদের ভাষা !

ইংরিজী তো শেখেন নি, আর-একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন রায়গিন্নী, প্রথম-প্রথম নাম লিখতেও জানতেন না। এদিকে অত বড় রাজার ম্যানেজারি পেয়ে গেলেন। বড় বড় টাইপ করা চিঠি সই করতে হবে। কী করেন ? ছেলেকে ডেকে বললেন, আমার নামটা লিখে দে তো একটা কাগজে। খোকা লিখল, এন. এন. রায়। তার ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যা-হোক একটা দাঁড় করালেন। কাজ চলে গেল। সই তো অনেকেরই পড়া যায় না। তারপর ছেলের কাছেই শিখতে শুরু করলেন এ. বি. সি. ডি। বেশী দূর এগোতে পারেন নি। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে কথাবার্তা হিন্দিতেই চালাতেন। চিঠিপত্তর পড়ে শোনানো, আর উনি যেমন যেমন বলে দিতেন সেইভাবে মুসাবিদা করে উত্তর লিখে টাইপ করতে পাঠানো—এসব কাজের ভার ছিল খোকার হাতে। এই-জন্যেই ওকে চাকরি করতে দেন নি। ওকালতি পাস করিয়ে নিজের কাছে রেখে-ছিলেন।'

এইসব কথা বলতে বলতে কোথায় যেন ডুবে যেতেন রায়গিন্নী। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, 'তবু একটা জীবনে কী না করে গেছেন। এই যা-কিছু দেখছ, সব এক হাতের গড়া।'

শোভনা গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনত। ভারি অদ্ভুত লাগত এই ভেবে, অত বড় শ্বশুর তার, তাঁর জীবনেও ছোট ছোট মজার কাহিনীর অন্ত নেই ! সব বড়লোকের জীবনেই বোধহয় এমনধারা ঘটে, বাইরের লোক তার খবর রাখে না।

এমনি আস্তে আস্তে খানিকটা খানিকটা করে শ্বশুরের সব কথাই জানতে পারল শোভনা।

বরিশাল জেলার কোনো এক গ্রামে গরীবের ঘরে নগেন রায়ের জন্ম। ছেলে-বেলায় বাপ-মা উভয়েই মারা যান। কাকার সংসারে দিনগুলো সুখের ছিল না। গ্রামের পাঠশালায় দিন-কয়েক বাংলা আর ধারাপাত পড়েছিল। ঐ পড়া পর্যন্তই। শেখাটা বেশী দূর এগোয় নি। তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিল মাছ ধরতে, খোল বাজাতে আর তাসের আড্ডায় তামাক টানতে। একদিন এই শেষের বিদ্যাটা কাকার চোখে পড়তেই নগদ পুরস্কার জুটল গোটা-কয়েক খড়মের ঘা। পিঠের দাগ হয়ত একদিন মিলিয়ে যেত, কিন্তু মনে যে দাগ পড়ল

তা সহজে মিলতে চাইল না। তার দিন-দুই পরেই ভোর রাত্রে ঘর ছাড়ল নগেন রায়। কত আর বয়স তখন? চোদ্দ-পনেরো হবে। স্টীমারের কেরানির সঙ্গে ভাব ছিল। খুলনা পর্যন্ত বিনা ভাড়াতেই যাওয়া গেল। তারপর রেল। তার আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। এদিকে পকেট গড়ের মাঠ। অগত্যা সোজা শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ডাক্তারের ডিসপেনসারি। ডাক্তারবাবু বসে বসে চা খাচ্ছেন। নগেন রায় ঢুকে পড়ে চেয়ার টেনে বসল। গম্ভীরভাবে বললে, 'আমার জন্যেও এক কাপ আনতে বলে দিন স্যার! তার সঙ্গে কিছু খাবার।'

ডাক্তারের চোখ তো ছানাবড়া! বেশ কিছুক্ষণ লাগল সামলাতে। বললেন, 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না?'

'চিনবেন কেমন করে? আমি তো এখানকার লোক নই।'

ডাক্তার গলায় ঝোলানো রবারের নলটা হাতে তুলে নিলেন। বাগিয়ে ধরবার আগেই রাস্তায় নেমে পড়ল নগেন। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা দৌড়।

স্টেশনে ফিরে দেখল, মস্ত বড় এক বরযাত্রীর দল চলেছে কলকাতা। ভিড়ে পড়ল তাদের মধ্যে। হাঁকডাক করে কুলির মাথা থেকে জিনিষপত্র ধরে, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল যেখানে যেটা মানায়। খাটতে শুরু করল বাবুদের ফাই-ফরমাস। তামাক সেজে হুঁকোটা ধরিয়ে দিল কর্তার হাতে। কোনো এক বড় স্টেশন আসতেই জল বদলাবার নাম করে নেমে গেল। আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে দিয়ে নিল কয়েকটা লম্বা টান। বর বেচারা ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছিল। বিয়ের দিনে তো খাওয়া চলে না' হাতের ইশারায় নামিয়ে নিয়ে গেল নগেন। দোকানের পিছন দিকে বসে পেট ভরে খাইয়ে দিল সিঙাড়া, সন্দেশ আর চা। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবস্থা যা তার পরিমাণটা বেশ গুরুতর।

বিয়েবাড়িতে পৌঁছে নগেন একাই একশো! রান্না থেকে ভাঁড়ার, বাসর থেকে বৈঠকখানা চলল তার ছুটোছুটি। বরপক্ষ মনে করল কনেপক্ষের ছেলে, আর কনেপক্ষ ভাবল বরপক্ষের কুটুম্ব। খাতির-যত্ন পাওয়া গেল দু-তরফেই। পরদিন সকালে যখন জানাজানি হল, তার আগেই উধাও হয়ে গেছে নগেন রায়। টাকাকড়ি, জিনিষপত্তর সব ঠিক আছে। পাওয়া গেল না কেবল খান-দুই শান্তিপুরী ধুতি, একটা সিল্কের জামা, আর একজোড়া নতুন জুতো।

তারপর কেমন করে, কাদের চোখে ধুলো দিয়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি চড়ে হঠাৎ একদিন দেওঘরে গিয়ে উদয় হল নগেন রায়, সেও এক মস্ত বড় কাহিনী। সে-কথা আরেকদিন হবে। তার পরের টুকু আজ বলে রাখি।

ওখানে ছিলেন ওর এক মাসতুতো ভাই। এক টিকায়েত অর্থাৎ সাঁওতাল রাজার কাছারির নকল-নবিশ। তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠল নগেন। কদিন পরে তিনিই নায়েববাবুকে বলে-কয়ে ঢুকিয়ে দিলেন চাকরিতে। তহশিলদারের পেয়াদা। মাইনে পাঁচ টাকা, তার সঙ্গে খাওয়া-পরা। কাজ হল, সাঁওতালদের গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরা, মনিবের ফাই-ফরমাস খাটা, রান্নাবান্না করা, আর দরকারমতো

মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে করে তার সঙ্গে খাজনা আদায় করে বেড়ানো। দেখতে দেখতে সাঁওতালী ভাষাটা বেশ রপ্ত হয়ে গেল। শুধু ভাষা নয়, আপনজনের মতো জানতে চাইল ওদের মনের খবর, ওদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ।

আগের সব পেয়াদাদের বাইরে ভয় আর মনে মনে ঘৃণা করত সাঁওতালেরা। নগেন রায় পেল ওদের ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব। এতে করে লাভই হল রাজ-সরকারের। অনেক বেয়াড়া প্রজা, যারা কোনোদিন বাগ মানে নি, রীতিমতো খাজনা দিতে শুরু করল। আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক গুণ। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন টিকায়েতের ম্যানেজার। কয়েক মাস যেতেই পেয়াদা থেকে তহশিলদার হল নগেন রায়। তারপর ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে মুহুরি, নায়েব এবং সহকারী ম্যানেজার। শেষটায় একেবারে শেষ ধাপ ডিঙিয়ে পুরোপুরি ম্যানেজার মিস্টার এন. এন. রায়। সাঁওতাল রাজা কিছু দেখেও না, বোঝেও না। ম্যানেজারই হল আসল রাজা।

'ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন!' গর্বের সঙ্গে বললেন রায়গিন্নী। 'দশটা বছর ডাঁটের সঙ্গে রাজত্ব করে গেছেন। বাড়ি, গাড়ি, টাকাকড়ি, লোকজন, তার সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' খেতাব। কোনোদিকে কোনো অভাব রেখে যান নি।'

সবই দেখল শোভনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিলেন শাশুড়ি। বাকি রইল শুধু একটা ঘর। তেতলায় ঠাকুর-দালানের পাশে। সেখানে কোনোদিন নিয়ে যান নি বৌকে। সে ঘরখানা কখনো খুলতে দেখে নি শোভনা। ওখানে কী আছে? জানতে ভারি কৌতূহল। কিন্তু নিজে থেকে যখন দেখালেন না, বলতে কেমন বাধো-বাধো লাগে। গেল কয়েক দিন। শেষটায় আর থাকতে পারল না। হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো! কদিন আর চেপে রাখবে পেটের কথা! ঠাকুর-দালানে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞেস করে বসল, 'ও-ঘরটায় কী আছে মা?'

রায়গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'আজ থাক মা, আরেক দিন দেখো। শুধু দেখালে তো বুঝবে না, বলতেও হবে অনেক কিছু।'

তারপর একদিন নিজে থেকেই বললেন সব কথা।

'দেশ সুদ্ধ সাঁওতাল একবার ক্ষেপে গিয়েছিল জানো তো? লোকে যাকে বলে সাঁওতাল-বিদ্রোহ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বইতে পড়েছি।' মাথা নেড়ে বলল শোভনা।

'আর আমরা চোখে দেখেছি। বইতে আর কতটুকু লিখেছে। সে যে কী জিনিষ, না দেখলে ধারণা করা যায় না। এমন শান্তশিষ্ট জাত, কাজের সময় গাধার মতো খাটে। ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে জানে না। কাজ যখন থাকে না, দল বেঁধে নাচে গায় বাঁশি বাজায়, আর প্রাণভরে হাঁড়িয়া টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তারাই একদিন রুখে উঠল তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে। যাকে দেখে তাকেই মারে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। অথচ কী যে হয়েছে বেশীর ভাগ লোকই

জানে না। সর্দার বলেছে, ব্যস ! সর্দারদেরও জানা নেই সব কথা।'

একটুখানি থেমে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর উপর যেন একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন রায়গিন্নী, 'যুদ্ধ লেগেছে পশ্চিমে। মেসোপটেমিয়া না কি দেশ, সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করতে হবে, পুল বানাতে হবে। হাজার হাজার কুলি চাই। সাঁওতালদের মতো কাজের লোক পাবে কোথায় ? তাই ইংরেজ সরকারের হুকুম এল আমাদের রাজার উপর—কুলি পাঠাও। তোমার শ্বশুরকে ডেকে পাঠালেন লাটসাহেব। চাপিয়ে দিলেন কুলি জোটাবার ভার, আর তার সঙ্গে একবোঝা আনকোরা নতুন নোট। বললেন, টাকার জন্যে ভাববেন না, দরকার হলে আরো দেব। হুকুম মানতেই হবে। গ্রামে-গ্রামে আড়কাঠি লেগে গেল। অনেকেই ভিড়ল চকচকে টাকার লোভে। কিন্তু বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন চলল জোর-জুলুম। সেখান থেকেই শুরু হল গণ্ডগোল। তারপর যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যেও একদল মেয়ে-পুরুষ কি সব হাঙ্গামা বাধিয়ে গুলি খেয়ে মরল। কতগুলো পালিয়ে এসে রটিয়ে দিল, ওখানে অনেক কষ্ট···খাওয়া-পরাব কষ্ট, থাকবার কষ্ট, তাছাড়া মেয়েদের মান-ইজ্জত নেই। কথায়-কথায় মারধোর, গালিগালাজ করে। এইসব শুনে বেঁকে বসল সাঁওতালরা। কুলি আর পাওয়া যায় না। আড়কাঠিরা মার খেয়ে ফিরে এল। খুনও হয়ে গেল জন-কয়েক। সরকারি লোকও মারা পড়ল কিছু। ধর-পাকড় শুরু হতেই গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। উনিও জড়িয়ে পড়লেন। এত যে ভালোবাসত, ওঁকে, সব কোথায় তলিয়ে গেল ! গোপনে খবর এল, ফাঁক পেলে ওঁকেও তারা ছাড়বে না। কিন্তু কথাটা উনি আমার কাছে চেপে গেলেন।

মাঝে-মাঝে বড় বড় বস্তিতে সভা ডেকে উনি গিয়ে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন। এমনি-এক সভায় যাচ্ছিলেন একদিন। বনের ভিতর দিয়ে পালকি চলেছে। আগে-পিছে পাইক-বরকন্দাজ। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। পালকি থামিয়ে নেমে এসে দেখলেন, পিঠের মাঝখানে বিঁধে গেছে সাঁওতালি তীর। মারাত্মক বিষ থাকে তার ফলায়। একবার বিঁধলে ধন্বন্তরি এসেও বাঁচাতে পারবেন না। হঠাৎ সোরগোল কানে যেতেই দেখা গেল, শালবন ভেঙে জোয়ারের মতো ছুটে আসছে বিশাল দঙ্গল। চোখের নিমেষে পালকি, বেয়ারা, পাইক-বরকন্দাজ যারা ছিল, সব কোথায় মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন উনি এক[illegible] লোকগুলো খানিকটা কাছে আসতেই চেঁচিয়ে বললেন, খবরদার ! আর এক পা এগুলেই গুলি করব ! বলেই পকেটে হাত দিলেন। প্রথমটা ওরা একটু থমকে গেল। তারপরেই আবার হট্টগোল করে এগিয়ে আসতে লাগল। আর দেরি করা যায় না। পকেটে যে জিনিষটা ছিল, উঁচিয়ে ধরে উনিও মরিয়া হয়ে ছুঁড়লেন ওদের দিকে, চিৎকার করে বললেন, এখনো বলছি সরে যা, নইলে গুলি করব ! ঠিক সেই সময়ে শাঁ করে একটা তীর বেরিয়ে গেল ওঁর ঠিক কানের পাশ দিয়ে। তখনো উনি তেমনি হাত উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছেন সেই মারমুখো লোকগুলোর দিকে।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, পিস্তল! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে সেই শ-পাঁচেক লোক একেবারে হাওয়া। দশ মাইল হেঁটে উনি বাড়ি ফিরে এলেন।'

এতক্ষণে যেন নিঃশ্বাস পড়ল শোভনার। চোখদুটো রগড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শাশুড়ি বললেন, 'চল, ওপরে চল।'

এতদিন যে-তালা খুলতে সে দেখে নি, শাশুড়ির হাত থেকে চাবি চিনে নিয়ে আজ নিজেই সেটা খুলে ফেলল। সামনেই বেদীর উপর একটা কাঠের বাক্স। রায়গিন্নী ডালাটা তুলে বললেন, 'এইটাই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেদিন।'

শোভনা ভিতরে একবার উঁকি মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, এযে একটা তামার পাইপ! কিন্তু কত বড়!'

'হ্যাঁ, অনেকটা তামাক ধরবে বলে অর্ডার দিয়ে করানো। সেই ছেলেবেলাকার হুঁকোর নেশা তো!'

ভীষণ হাসি পেল শোভনার। কিন্তু গলাটা চড়িয়েই হঠাৎ থেমে গেল শাশুড়ির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে। উনি বললেন, 'একে প্রণাম কর, বৌমা?'

বেথুন কলেজের বি. এ. পাস করা মেয়ে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল সেই পাইপটার সামনে।

নাম-বিভ্রাট

চাঁদমোহনের বাড়ি শ্যামবাজার, বিয়ে করেছেন হাতিবাগান, মামার বাড়ি দর্জ্জি-পাড়া, পিসী থাকেন উল্টাডিঙি, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে চাঁদমোহন একেবারে খাঁটি, পুরোদস্তুর কলকাতার লোক।

কলকাতা সহরের বাইরেও যে একটা দেশ আছে, চাঁদমোহন সেটা জানেন ভূগোল পড়ে, আর দু-একবার মধুপুর বা দেওঘর বেড়াতে গিয়ে। শিয়ালদ ইস্টিশনের নাম শুনলেই তাঁদের বুক শুকিয়ে যায়। তাঁরা জানেন, ওখান থেকে গাড়ি ছাড়লেই দুধারে কেবল মশা, মাছি, সাপ আর ম্যালেরিয়া।

এমনি কপালের ফের! এমন যে চাঁদমোহন, তাঁর চাকরি জুটল দূর পূর্ববাংলার এক জেলা। তাঁর বাপ-দাদারা চিরটা কাল কলকাতায় সরকারী কিম্বা সওদাগরী আফিসে কলম পিষে গেলেন। কিন্তু অত বড়-বড় বাড়িগুলোয় চাঁদমোহনের একটু জায়গা হল না, তাঁকে যেতে হল একেবারে তেপান্তরের মাঠে, অর্থাৎ গাড়ি চড়ে একরাত, স্টীমারে এক দুপুর, আবার রেলে প্রায় একদিন। শুনে অবধি বাড়ির মেয়েরা শুরু করলেন কান্নাকাটি, কর্তারা করলেন নাম-জপ, আর পুরুত ঠাকুর করলেন চণ্ডীপাঠ। চাঁদমোহন জামার হাতায় চোখের জল মুছে শিয়ালদ গিয়ে গাড়ি চড়লেন।

কয়েকদিন পরের কথা। চাঁদমোহন আফিসে বসে কাজ করছেন। জমাদার একটা কয়েদীকে ধরে এনে মেঝের উপর বুট ঠুকে সেলাম করে জানাল, 'এই লোকটা বহুৎ বদমাস আছে।'

চাঁদমোহন বই থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম তোর ?'

'আইগ্যা, চাঁদের বাপ।'

চাঁদমোহন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'কী!'

লোকটা জোড়হাত করে বললে, 'চাঁদের বাপ, হুজুর।'

চাঁদমোহনের মুখ দিয়ে প্রথমটা কথাই বেরোল না। তারপর হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কেয়া দেখতা হ্যায়, জমাদার? হামারা বাপ তুলে কথা! এত বড় সাহস! লে আও উস্‌কো টিকিট। জলদি লে আও, আমি আবভি রিপোর্ট করে গা।'

সিপাই, কয়েদী সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। জেল-গেটে যে বন্দুকধারী শাস্ত্রী থাকে, সে সঙ্গীন লাগিয়ে তৈরী হয়ে রইল, হুকুম পেলেই 'পাগলা-ঘণ্টি' বাজিয়ে দেবে।

'পাগলা-ঘণ্টি' হয়তো বাজানো হত, এমন সময় চাঁদমোহনের সহকারী মাধব-বাবু এসে পড়লেন। ব্যাপার দেখে-শুনে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ওর নাম চাঁদের বাপই বটে। এখানকার লোকগুলোর অনেকেরই দুটো করে নাম থাকে, তার মধ্যে একটা কারুর না কারুর বাপ। এই বলে তিনি চাঁদবাবুকে জেলের ভিতরে নিয়ে গেলেন। কয়েদীরা 'ফাইল' করে দাঁড়াল এবং নাম বলে যেতে লাগল—পিঁপড়ার বাপ, ক্যান্দ্‌ড়ার বাপ, মশার বাপ, জজের বাপ, পুলিশের বাপ, ট্যাংড়ার বাপ, টিকটিকির বাপ, ইত্যাদি। এই 'বাপের' জঙ্গলে দাঁড়িয়ে চাঁদ-মোহনের মনে হল, এখনি এ দেশ থেকে 'বাপ-বাপ' বলে বেরিয়ে পড়া দরকার।

পুরুষগুলো যেমনি বাপ, মেয়েরা তেমনি মা। দশ বছরের মেয়ে, তার নাম হল, ভুষার মা। এমনি খুসীর মা, বাঘার মা, মহারাজের মা, পুলিশের মা··· ইত্যাদি।

শুধু কি এই 'বাপ-মায়ের' অত্যাচার? নামগুলোও যেন সব এক রকম। তাছাড়া, বইতে লেখা এক, মুখে বলে আর। এমনিধারা এক গোলমালে তাঁকে পড়তে হল দিন তিনেকের মধ্যেই। একটি কয়েদীর খালাসের হুকুম এসেছে। হুকুম-নামায় নাম রয়েছে 'নঝা'। লোক খুঁজে বার করা হল দুজন। সহোদর ভাই। একজন তার নাম বলে 'নজা', আর একজন বলে 'নছা'। বাপের নাম এক। বাড়ি, ঘরদুয়ার, মোকদ্দমার বিবরণ সব এক এবং সবই মিলে যাচ্ছে হুকুম-নামার সঙ্গে। সমস্যা দাঁড়াল এই, হুকুমটা কার জন্য—'নজা' না 'নছা'? কোন্‌টাকে ছাড়া যায়? অনেক ভেবে চাঁদমোহন স্থির করলেন, 'জ' আর 'ঝ' থাকে পাশাপাশি, 'ছ'টা একটু দূরে', কাজেই 'নঝা'র সঙ্গে 'নজা'র মিল বেশী, 'নছা'র মিল কম। সুতরাং 'নজা'কে ছেড়ে দেওয়া হল, 'নছা' রয়ে গেল জেলে।

পরদিন চাঁদমোহন ভয়ানক ব্যস্ত। পঁচিশটা কয়েদী যাবে অন্য জেলে চালান, তারই সব ব্যবস্থা হচ্ছে। ভীষণ কাজের ভিড়। এমন সময় গেটের সিপাই জানাল, 'এক মোক্তারবাবু এসেছেন দেখা করতে।'

বাবুটিকে আনা হল। মাথাজোড়া টাক, নাকের নিচে জাঁকালো গোঁফ,

পরনে আধময়লা প্যাণ্ট হাঁটুর একটু নিচে নেমেই শেষ হয়ে গেছে। গায়ে কালো চাপকান, আর তার উপর পাকানো চাদর সাপের মতো গলা, কাঁধ, বগল জড়িয়ে আছে। নিজেই চেয়ার টেনে বসে প্রশ্ন করলেন, 'আমার মক্কেল খালাস পায় নি কেন, মশাই ?'

চাঁদমোহন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কে আপনার মক্কেল ?'

'নছা।'

চাঁদমোহনের বুকটা কেঁপে উঠল। সর্বনাশ, তাহলে কি ভুল হল ? বাইরে সে ভাব না দেখিয়ে একটু কড়া ভাবেই বললেন, 'আমরা হুকুম-নামা দেখেই কয়েদী ছেড়ে থাকি। আপনার মক্কেল কি কার মক্কেল সে সব জানি না। আপনি এবার যেতে পারেন।'

'আজ্ঞে, আমি তো যাবই, কিন্তু আপনারাও বিশেষ আরামে থাকতে পারবেন না। রামের বদলে শ্যামকে ছেড়ে দেবেন, তার ওপর আবার চোখ রাঙানো! এত চেষ্টা, এত টাকা পয়সা ব্যয় করে আমরা নিয়ে এলাম 'নছা'র হুকুম, আর আপনি ছেড়ে দিলেন তার ভাই, পরম শত্রু 'নজা'কে। আসল লোকটা পচতে লাগল জেলে, আর নকল গিয়ে বাড়ি বসে মাছের মুড়ো চিবোচ্ছে। ব্যাপারটা আমরা সহজে ছেড়ে দেব এই আপনি মনে করেন ?'

মোক্তার উঠে পড়লেন। চাঁদবাবুকেও উঠতে হল। বোঝা গেল, ভুলই হয়েছে ...মারাত্মক ভুল। একসঙ্গে দুটো অপরাধ—একটা লোককে বে-আইনি আটকে রাখা, আর একটা লোককে বে-আইনিভাবে ছেড়ে দেওয়া। চাকরি তো যাবেই, এর পরে আরো টানাটানি চলবে।

চাঁদমোহনের মনে পড়ল মায়ের কথা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেছিলেন, বাবা চাঁদু, আমরা বরং দুবেলা শাক-ভাত খাব। শ্যালদর ইস্টেষণে গাড়ি চড়িসনে। ও আমাদের সইবে না। মায়ের কথা না শুনেই আজ এই দুর্দশা! যা হোক, মোক্তারবাবু লোকটি ভালো ছিলেন। কয়েক কাপ্ চা, একথালা খাবার, পান, সিগারেট এবং সেই সঙ্গে মিষ্টি বাক্যে আপ্যায়িত হয়ে তিনি বলে গেলেন, এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবেন না। চাঁদমোহনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

তার পরদিন রাত ন'টার সময় চাঁদমোহন খেতে বসেছেন। মাছের ঝোলটা মুখে দিতেই চোখে জল এসে গেল। ঠাকুরকে ডেকে বললেন, 'এটা কি রেঁধেছ ?'

ঠাকুর খুশি হয়ে বলল, 'আইগ্যা, নলা মাছের রসা।'

'তোমার মাথার রসা। ক'টা লঙ্কা দিয়েছিলে ?' ঠাকুর বুঝতে পারল না। চাঁদমোহন গলা চড়িয়ে বললেন, 'মরিচ, মরিচ! কতগুলো মরিচ দিয়েছ ?'

'আইগ্যা, বারোডা আর আউধখান।'

চাঁদমোহন কোনো কথা না বলে উঠে মুখ ধুতে গেলেন। এমনি প্রায়ই হয়, কোনোদিন আধপেটা, কোনোদিন অনাহার।

চাঁদমোহন শুতে যাবেন, হঠাৎ বাইরে ভীষণ গোলমাল। গিয়ে দেখেন, বাইরের ঘরের সামনে প্রায় এক হাট লোক। এক বুড়ো, এক বুড়ী, একটি ঘোমটা-ঘেরা বৌ, আর নানা বয়সের ছেলেমেয়ে গুটি সাতেক। তাঁকে দেখে

সবাই মিলে একসঙ্গে নানান্ সুরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল! সেটা কান্না না কোরাস গান, চাঁদমোহন প্রথমটা বুঝতেই পারলেন না। বুড়ীর গলাটাই সকলের উপরে শোনা যাচ্ছিল, 'আমার নছারে, ও নছা···আ···আ!'

একটা লোক ওদের থামাবার চেষ্টায় ছিল। তাকে ডেকে চাঁদমোহন জানতে পারলেন যে, এরা হচ্ছে নছার বাপ, মা, বৌ এবং ছেলেমেয়ের দল! নছাকে ছাড়া হয় নি,···মোক্তারের কাছে এই খবর পেয়ে অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছে। সারাদিন খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। লোকটা আরও বললে, 'নছার বোন, পিসী, মাসী আর শালা এখনও খবর পায় নি। তারা কাল আসবে।'

চাঁদমোহনের মাথাটা ঘুরে গেল। তাঁর সর্বস্ব দিয়েও যদি নছাকে ছেড়ে দেওয়া যেতো সে ব্যবস্থা তিনি এখনই করতেন। কিন্তু সে উপায় নেই। উপায় আছে, এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া। তাতেও সমস্যা মিটবে না। এই নছার জের তাকে টানতেই হবে। হাজার গণ্ডা কৈফিয়ৎ, তারপর কোর্ট-কাছারী, শেষ পর্যন্ত জরিমানা কিংবা জেল। নিস্তার তাঁর কোনো মতেই নেই। চাঁদমোহন সেই বারান্দার উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরোল, 'উঃ, ভগবান!' এদিকে তাঁকে ঘিরে কোরাস কান্না সমানে চলতে লাগল।

পরদিন। চাঁদমোহনের ঠাকুর আফিসে গিয়ে খবর দিল, তার বাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে ছুটে এসে দেখল, জিনিষপত্তর সব পড়ে আছে, ঘর খোলা, কেবল চাঁদমোহন নেই। জোর খোঁজখবর করা হল। কলকাতায় টেলিগ্রাম, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, কোনোটাই বাকি নেই। কিন্তু চাঁদমোহন নিখোঁজ।

পোষাক মাহাত্ম্য

জেলে গিয়ে প্রথম দিকটা কার্তিকের খুব কষ্টে কেটেছে। পুরো দু-মাস ঘানি টানতে হল। সেখান থেকে গেল গম ভাঙতে। রোজ বারো সের গম পিষে আটা করতে হত। তারপর তাকে পাঠানো হল বাইরের বাগানে কোদাল চালাতে। তবু এসব কোনোটাই অভ্যেস ছিল না। মুদির দোকানে চাকরি করত। টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। তার থেকে মারামারি! মারটা যা খেয়েছিল, তার চেয়ে দিয়েছিল অনেক বেশী। একবছর জেল হয়ে গেল।

বাগানে তাকে বেশীদিন থাকতে হয় নি। এক বন্ধুর পরামর্শে বড় জমাদারের হাতে-পায়ে ধরে চলে গেল 'পানি-দফা'য়।

সেই অনেকদিন আগে জেল যখন তৈরি হল, সে অঞ্চলে জলের কল ছিল না। জল আসত পুকুর থেকে। যারা জেলে থাকে, তাদের জন্যে তো বটেই, যারা জেলে গিয়ে থাকে, অর্থাৎ ছোট-বড় চাকরে, তাদের জন্যেও ঐ ব্যবস্থা। পাঁচ-সাত দশজন করে কমমেয়াদি কয়েদী নিয়ে এক-একটা দল তৈরি হত। বড় বড় লোহার বালতি করে বাসায়-বাসায় জল পোঁছে দেওয়া যাদের কাজ, তাদের বলা হত 'জল-ভরি' বা 'পানি-দফা', ইংরেজিতে বলত, ওয়াটার ক্যারিয়িং গ্যাঙ্'।

তারপর কল বসল। ট্যাপ খুললেই জল। পানি-দফার আর দরকার রইল

না। কিন্তু গ্যাঙগুলো রয়ে গেল। তাদের কাজ হল, জেলবাবুদের বাড়িতে কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাটনা বাটা, গিন্নীদের ফাই-ফরমাশ খাটা, মায় ছেলেপিলে রাখা পর্যন্ত। কয়েদীরা খুশি হয়ে করত। খাটনি অনেক কম। তাছাড়া জেলে এসেও অনেকখানি ঘর-সংসারের স্বাদ! এ তো উপরি পাওনা।

কার্তিককে যে বাড়িতে দেওয়া হল, জেলের একজন ছোট দরের অফিসার, সেখানে তাকে মাঝে-মাঝে রান্নার কাজও করতে হত। 'গিন্নীমা' খুব ভালো-বাসতেন। যা রান্না হত, তার থেকে ওকেও কিছুটা দিতেন। জেলের সেই একঘেয়ে বিস্বাদ খাবার খেয়ে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। একটু মুখ বদলাবার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেল কার্তিক।

বাবু বামুন। কার্তিককেও বলা হয়েছিল, কেউ জাতের কথা জিজ্ঞেস করলে সে যেন বলে, 'আমি বামুন।' তবে ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। কার্তিক রাঁধত ভালো। তাতেই সবাই খুশি।

তারপর 'দেশ' থেকে একদিন বাবুর কাকা এসে হাজির। ভীষণ গোঁড়া। খবর-টবর দিয়ে এলে 'বৌমা' নিজেই রান্নাঘর আগলাতেন। হঠাৎ এসে পড়েছেন। কার্তিক তখন মাছ ভাজছে। তিনি একনজরে দেখেই বললেন, 'ওটি কে?'

বৌমা তো কোনোরকমে ঢোঁক গিলে বললেন, 'ঠাকুর।'

কাকা বাজিয়ে না নিয়ে ছাড়বেন না। কার্তিককে বাইরে আসতে বললেন। সে ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়াল। পরনে ডোরা-কাটা জাঙ্গিয়া, কুর্তা।

'ওসব কী পরেছিস? জেলের পোষাক বলে মনে হচ্ছে।'

কার্তিক উত্তর দেবার আগেই বৌমা বললেন, 'জেল থেকে কিনে এনেছি কাকা। খুব মোটা আর টেকসই। বড্ড বেশী কাপড় ছেঁড়ে হতভাগা।'

'ও। তা নাম কী তোর?'

'আজ্ঞে, কার্তিক ব্যানার্জি।'

'ব্যানার্জি! সাহেবি বুলি ছাড়ছে ব্যাটা। বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারিস না? এবার থেকে নাম জিজ্ঞেস করলে বলবি, শ্রীকার্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।'

কার্তিক মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে।'

'যা, কাজ কর গে।'

কার্তিক এগিয়ে এসে কাকার পায়ের ধুলো নিতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'থাক, থাক। রান্না যেন ভালো হয়।'

জেল থেকে খালাস পেয়ে কার্তিক গেল 'গিন্নীমার' সঙ্গে দেখা করতে। পরনে তার নিজের জামা-কাপড়, যা নিয়ে এসেছিল জেলে। একটা ধুতি, আর ছিটের হাফশার্ট, কাঁধের কাছটা ছেঁড়া। গিন্নীমা তাই দেখে বাবুর একটা পুরানো খাকি প্যাণ্ট আর শার্ট এনে দিলেন। কার্তিকের চোখ দুটো খুশিতে জ্বল-জ্বল করে উঠল। একটা পেন্টালুনের সাধ তার অনেক দিনের। সাধ্যে কুলোয় নি। এবার গিয়ে দুটো পেটের ভাত আর একখানা কাপড় জুটবে কোত্থেকে তারই ঠিক নেই। পেণ্টালুন তো স্বপ্ন।

জেল থেকে তাকে দেওয়া হয়েছিল তার বাড়ির কাছের স্টেশন পর্যন্ত

একখানা রেলের পাস, আর খোরাকি বাবদ ছ-আনা পয়সা। গিন্নীমা দুটো টাকা দিলেন। বললেন, 'দশটা বাজে। এ বেলাটা এখানেই দুটো খেয়ে যা না।'

কার্তিক বলল, 'না, মা। ইস্টেশন থেকে বাড়ি পাকা আট কোশ পথ। অনেক রাত হয়ে যাবে।'

গিন্নীমাকে প্রণাম করে তাঁর দুটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে, আদর করে কার্তিক যখন বেরিয়ে এল, তার চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে যে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, কার্তিক খবর নিয়ে জানল, ওটা তাদের স্টেশন হয়ে যাবে। থার্ড ক্লাস কামরাগুলোয় ভীষণ ভিড়, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একখানা দেখল বেজায় ফাঁকা। ব্যাপার কী? ঢুকতে গিয়ে একটু ইতস্তত করছিল। হঠাৎ দেখল, গার্ড সাহেব সবুজ নিশান দেখাচ্ছেন। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

দশ-বারোজন মেয়ে-পুরুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। কার্তিক চার দিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দেখল, সবগুলো চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বুঝল, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু এদের চটে যাবার মতো কী করল সে?

একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসতে যাচ্ছিল। ওদিক থেকে একজন কোটপ্যাণ্ট-পরা ছোকরা ছুটে এল, 'এ গাড়িমে কাহে আয়া?'

কার্তিক বুঝতে পারল না তার অপরাধটা কোথায়। কাঠের বেঞ্চি, গদি-টদির বালাই নেই। তার কাছে টিকেটও আছে। তবে?

ছোকরা আবার রুখে উঠল, 'দেখতা নেই, এ সাহেব লোককা গাড়ি হ্যায়?'

এবার লক্ষ্য করল কার্তিক, যারা বসে আছে সকলের পরনেই সাহেবি পোষাক—পুরুষের কোট-প্যাণ্ট-টাই, কারো বা শুধু প্যাণ্ট-শার্ট, মেয়েদের গাউন। কিন্তু গায়ের রং কারোই আসল সাহেবের ধারে-কাছেও যায় না।

ফর্সা দু-চারজন না আছে তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই তার মতো কিংবা তার চেয়েও দু-এক পোঁচ ঘোর। ও-পাশে যে মোটা 'মেমসাহেব'টি বসে আছে, তাকে দেখে তার পোষা কালো বেড়ালটার কথা মনে পড়ল। ও রকম সুন্দর মিসকালো বেড়াল সাহেবের ধারে-কাছেও যায় না।

ছোকরা তাকে শাসিয়ে দিল, 'গাড়ি থামলেই যেন সে ভালোয়-ভালোয় নেমে যায়। তা না হলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া হবে।'

কার্তিক দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিক থেকে একজন মাঝবয়সী 'সাহেব' হাতের ইশারায় তাকে কাছে যেতে বললেন। এগিয়ে যেতেই বসতে বললেন এবং হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলেন, 'তুমি ভুল করেছ। এটা থার্ড ক্লাস হলেও ইওরোপিয়ান থার্ড। বাইরে বোর্ড দেওয়া আছে। তুমি তো ইংরেজি জানো না। তাই পড়তে পারো নি। ওদেরও উচিত ছিল দরজায় একজন চেকার রাখা। রেল কোম্পানির নিয়ম হল, নেটিভদের এ গাড়িতে উঠতে দেওয়া হবে না।'

এ হল ইংরেজ আমলের কথা। তখন এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু কার্তিকের তা জানা ছিল না। পরে অবিশ্যি শুনেছিল।

গাড়িটা বোধহয় একসপ্রেস অথবা ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার। তিন-চারটে স্টেশন পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ছোকরা-সাহেব কার্তিককে উঠবার ইঙ্গিত করল। কার্তিক পোঁটলা হাতে উঠল। কিন্তু দরজার দিকে না গিয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

মিনিট কয়েক পরে গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে ছোকরা সাহেব এবং আরো কয়েকজন দুমদাম করে দরজায় ঘা দিতে লাগল। ভিতর থেকে কোনো সাড়া নেই। আরো কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলতেই ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে গেল কার্তিকের দিকে। তারপর হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে এমনভাবে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কার্তিকের পরনে খাকি ফুল-প্যাণ্ট, তার উপরে মিলিটারি শার্ট। হাসিমুখে বেরিয়ে এসে সেই ছোকরা সাহেবের ডান হাতটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলল. 'গুড মর্নিং।'

সাহেবরা ঐ রকম করে 'হ্যাণ্ডশেক' করে, কার্তিকের জানা ছিল।

টনিক

বাপ ছিলেন কালীভক্ত। ছেলের নাম রেখেছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি কেমন করে জানবেন, ঐ ছেলে একদিন সরকারি অফিসের উপরতলায় বড় সাহেব হয়ে বসবেন, আর ঐ নামটা তাঁকে খচখচ করে বিঁধবে? ভাগ্যিস সেখানে বোধ হয় তাঁর পুরো নামটা কেউ জানত না। তার আগেই তিনি মিস্টার আর. পি. সেন. বা সেন সাহেব হয়ে গেছেন।

বড় সাহেবদেরও বয়স হয়। সেন সাহেব আটান্ন পার হয়ে অফিসের গদি ছেড়ে বাড়িতে এসে বসলেন। লেক টাউনে চমৎকার বাড়ি। গেটের গায়ে ইংরেজিতে লেখা আর. পি. সেন।

কাজ নেই। এত বছর ধরে যারা তাঁর তাঁবেদারি করে এসেছে তারাও নেই। কিন্তু মেজাজটা অনেকখানি সাহেবি রয়ে গেছে। কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারেন না। নিজেকে বড় একা মনে হয়।

ওঁর মতো যাঁরা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন. পাড়ায় তাঁদের একটা আড্ডা বসে। সেখানে গিয়ে বসতে শুরু করলেন। তেমন জুত পেলেন না।

এরপর এক ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনাই বলা যেতে পারে।

সেন সাহেবের অফিসে তাঁর অনেকটা নিচে চাকরি করতেন এক ভদ্রলোক। তিনিও ঐ ক্লাবে এসে জুটেছেন। চাকরিতে যখন ছিলেন, কালে-ভদ্রে ফাইল-টাইল নিয়ে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়াতেন, আর 'স্যার-স্যার' করতেন। ক্লাবে একেবারে অন্য মূর্তি। সেদিন ঘরে ঢুকেই হেসে-হেসে বললেন, 'এই যে রামপ্রসাদবাবু, ভালো আছেন?'

পরদিন থেকে সেন সাহেবের ক্লাবে যাওয়া বন্ধ।

শরীর এতদিন মোটামুটি ভালোই ছিল। আরও বয়স বাড়তে টের পেলেন, এখানে-সেখানে ভাঙন শুরু হয়েছে। আসলে শরীরটা তো একটা যন্ত্র, ভিতরে অনেক কল-কব্জা! সেগুলো পুরনো হলে জোর কমে যায়, মেরামত করতে হয়।

পুরনো গাড়ি বিগড়োলো মিস্ত্রি ডাকতে হয়। সে এসে এটা-সেটা ঠোকে, নাট-

বল্টু টাইট করে। শরীর বিগড়ালে আসেন ডাক্তার। তাঁর কাজও মেরামতি। হাতে ফিতে বেঁধে ব্লাড-প্রেশার দেখেন, বুকে স্টেথোসকোপ লাগান, জিভের নিচে থার্মোমিটার। আরও নানারকম পরীক্ষা। তারপর ওষুধ লিখে দিয়ে যান।

সেন সাহেবের বাঁধা ডাক্তার আছেন। নিয়মিত আসেন, দেখেন, ওষুধপত্র দেন।

এমনি একদিন এসেছেন। সেন সাহেব ছিলেন ভিতরে। বসবার ঘরে খেলা করছিল তাঁর এক নাতি ও একটি নাতনি। তারা চলে যাচ্ছিল, ডাক্তার তাদের ডেকে ফেরালেন ও দু-চার মিনিটের মধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেললেন। ফুটফুটে দুটি শিশু। তেমনি স্মার্ট। চোখে-মুখে কথা বলে। ছেলেটির বয়েস পাঁচ মেয়েটি ছোট, বছর তিনেকের হবে।

ডাক্তার নাম জিজ্ঞেস করতে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রজত আর রুনু।'

একটু পরে দাদু আসতেই ওরা ভিতরে চলে গেল।

'কেমন আছেন?' জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'সেটা তো তুমিই বলবে।' বলে, ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন সেন সাহেব।

ডাক্তার একে-একে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁর যা দেখবার দেখে গেলেন। তারপর বললেন, 'ভালোই তো আছেন দেখছি। ঐ ওষুধই চলুক।'

'গায়ে তেমন জোর পাচ্ছি না। একটা টনিক-ফনিক দেবে নাকি?'

ডাক্তার মুচকি হাসলেন, 'গায়ে না মনে?'

উঠে পড়েছিলেন। আবার বসে ব্যাগ থেকে প্যাড বার করে প্রেসক্রিপশন লিখে রুগীর হাতে দিলেন।

'একি! এ যে তুমি আমার নাতি-নাতনির নাম লিখে দিয়েছ!'

'ওরাই আপনার টনিক।' বলে, ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

হরি-হর

একই রাস্তার এপার-ওপার ঠিক মুখোমুখি দুইখানি বাড়ি। একখানি সাদা রঙের একতলা। তার দেয়ালের গায়ে লেখা আছে, ডাক্তার হরিনাথ ধর। আর একখানি লাল রঙের দোতলা। গেটের উপর লেখা, ডাক্তার হরনাথ কর। দুই ডাক্তারে ভাবের আর অন্ত নেই। ধর, করের নাম শুনিলেই বলে, 'পাজী'; আর কর ধরের নাম শুনিলেই বলে 'ছুঁচো'। পাড়ার লোকে বলাবলি করে, 'হরিনাথ আর হরনাথ যেন হরি-হর-আত্মা।'

হরিনাথ ওপারের দোতলার দিকে কটমট করিয়া তাকায়, আর দাঁত কড়মড় করিয়া বলে, 'একটা ভূমিকম্প, ভগবান, একটা ভূমিকম্প। সকালে উঠে যেন দেখতে পাই, ঐ দোতলার সব ইট ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।'

দিন যায়, ভূমিকম্পও দু-একটা হয়, কিন্তু দোতলার ইট ঠিকই থাকে। শেষটায় স্থির হইল, নিজের বাড়িটাই দোতলা করিতে হইবে। গিন্নীর কাছে কথাটা পাড়িতেই তিনি অবাক হইয়া কহিলেন, 'টাকা।'

হরিনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, 'কিছু টাকা হাতে আছে, আর বাকিটা ভাবছি তোমার গয়নাগুলো যদি…'

গিন্নী তিনহাত ছিটকাইয়া গিয়া নথ নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া বলিলেন, 'হা-হা ! শখ দেখে আর বাঁচি না !'

স্ত্রীর সেই মূর্তি দেখিয়া হরিনাথের বুক শুকাইয়া যায়। দোতলার আশা পর্যন্তই থাকে।

সেদিন দুপুরবেলা হরিনাথ খাইতে বসিয়াছে, আর হরনাথ দাড়ি কামাইবার জন্যে মুখে সাবান ঘসিতেছে। এমন সময়ে রাস্তা থেকে কে ডাকিল, 'ডাক্তারবাবু আছেন ?'

দুই ডাক্তার একসঙ্গে সাড়া দিল, 'আজ্ঞে, আসুন।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুইজনে দুইদিক হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং পরস্পরের দিকে এমন করিয়া তাকাইল যে, সত্যযুগ হইলে দুইজনেই ভস্ম হইয়া যাইত। ভাগ্যিস্ এটা কলিকাল। হরনাথের হাতে সাবান-মাখা ব্রাশ, আর হরিনাথের হাতে ডাল-মাখা ভাত। লোকটি তো অবাক !

হরিনাথ বলিল, 'আপনার কি অসুখ ?'

সঙ্গে সঙ্গে হরনাথও কহিল, 'আপনার কি অসুখ ?'

হরিনাথ হাঁকিয়া বলিল, 'সাবধান বলছি।'

হরনাথ আরও জোরে হাঁকিল, 'সাবধান বলছি।'

ব্যস্ ! লাগিয়া গেল হরি-হরের যুদ্ধ। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, হরিনাথের ভাত গিয়াছে হরনাথের ডান গালে, আর হরনাথের সাবান আসিয়াছে হরিনাথের বাঁ গালে, রোগী অনেকক্ষণ চম্পট দিয়াছে।

দিন দুই পরে ডাক্তার ধর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া একটি ব্যাগ হাতে করিয়া রোগীর বাড়ি যাত্রা করিয়াছে। এক ফুটপাথ দিয়া ডাক্তার ধর চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ফুটপাথ ধরিয়া ঠিক একই ভাবে পা ফেলিয়া ডাক্তার করও ব্যাগ ঝুলাইয়া চলিয়াছে। পথে একজন ভিখারী পয়সা চাহিতে হরিনাথ একটি পয়সা দিল। হরনাথ ভাবিল, আমার বুঝি পয়সা নাই। কিন্তু কাছে অন্য ভিখারীও নাই, সুতরাং উহাকেই ডাকিল, 'ওরে !'

ভিখারী ডাক শুনিয়া ভয় পাইল। ভাবিল ডাক্তার নিশ্চয়ই তাহাকে অস্ত্র করিবে। অতএব, আর কোনো দিকে না চাহিয়া সোজা দৌড় ! হরনাথ ছাড়িবে কেন ? সেও পিছন পিছন ছুটিল। মিনিট পনেরো পরে ভিখারীটিকে ধরিয়া টানিতে টানিতে হরিনাথের সম্মুখে আনিয়া তাহার হাতে দুইটা পয়সা দিল। হরিনাথও দিল তিনটি। অমনি হরনাথ চারটি। এমনি করিয়া ধর যত দেয়, কর দেয় তারও বেশী। দেখিতে দেখিতে পয়সা ফুরাইয়া গেল। তখন টাকা।

টাকাও ফুরাইয়া গেল। তখন নোট, নোটগুলোও যখন শেষ হইয়াছে, দুইজনে দুইজনের দিকে জ্বলন্ত চোখে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। ভিখারীটা কাঁদিতে লাগিল। টাকা না দিয়া মার দিলে সে খুশি হইত।

সিধু সরকার হরনাথের রোগী। সেদিন অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়িতেই তাহার ছেলে ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে ছুটিয়াছিল। পথে হরিনাথের সঙ্গে দেখা, 'কিরে বাপ্পা ? শোন্ শোন্, ছুটছিস কেন ?'

বাঞ্ছা কহিল, 'আজ্ঞে, বাবার বড্ড অসুখ। ও ডাক্তারবাবুকে…'

হরিনাথ কহিল, 'অসুখ! তবে চল্ দেখে যাই।'

বাঞ্ছা কহিল, 'কিন্তু…'

'আবার কিন্তু কিরে? চল্।'

সিধুর ডান হাতে হরনাথ একটি মাত্র ইনজেকশন দিয়াছিল। সুতরাং হরিনাথ বাঁ হাতে দুটা ইনজেকশন লাগাইয়া দিল। তাই শুনিয়া হরনাথ ডান হাতে আরো তিনটে এবং পরদিনই হরিনাথ আসিয়া বাঁ হাতে চারটা। এমনি করিয়া কদিন চলিল। সিধু যত বলে, 'মরে গেলাম ডাক্তারবাবু, আর ফুঁড়বেন না।' হরিনাথ তত বেশী করিয়া ফোঁড়ে আর বলে, 'ঐ পাজীটার হাতে যদি মরে না থাক আমার হাতেও মরবে না।'

সিধু সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু হাত দুইখানা গেল। ক্ষতিপূরণের দাবিতে সে দুই ডাক্তারের নামে নালিশ রুজু করিল। জজসাহেব আসামীদের তলব করিলেন। বিচারে স্থির হইল, 'হরিনাথের অপরাধ বেশী। তাহার জরিমানা দু-শ' টাকা, আর হরনাথের দেড়'শ'।' হরনাথ হাতজোড় করিয়া কহিল, 'হুজুর, আমারও শ-দুই টাকা জরিমানা আজ্ঞা হোক।'

জজসাহেব অবাক হইয়া কহিলেন, 'কেন?'

'আজ্ঞে, ঐ ছুঁচোটা যদি দু-শ' দেয়, আমিও দিতে পারব।'

হরিনাথ রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে কহিল, 'আর ঐ পজীটা যদি দুশ' দেয়, হুজুর আমি দেব তিন-শ'।'

হরনাথও রুখিয়া উঠিয়া কহিল, 'তাহলে আমার চার-শ'।'

এবার মারামারির উপক্রম। তখন পুলিশ আসিয়া দুইজনকে থামাইল। জজসাহেব দেখিলেন মহাবিপদ, কহিলেন, 'আচ্ছা আবার বিচার হবে।'

পরের দিন আদালতে ভীষণ ভীড়। জজসাহেব হুকুম দিলেন, 'তোমাদের শাস্তি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত এজলাসের কাছে তোমরা দুজনে কোলাকুলি করবে।'

ধর ও করের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। হরিনাথ কাঁদিয়া কহিল, 'হুজুর আমাকে সাতবছর জেল দিন, তবু ওটা আমি পারব না।'

হরনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমাকে আটবছর দিন হুজুর!'

জজসাহেব হাঁক দিয়া কহিলেন, 'আমার হুকুম মানতে হবে।'

তারপর দুই ডাক্তারকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হইল। জজসাহেব বলিলেন, 'এক-দুই-তিন!' ব্যস। ধরে এবং করে কোলাকুলি হইয়া গেল। সব গোলমাল একেবারে মিটমাট।

আজকাল দুই ডাক্তারে বেজায় ভাব! হরিনাথ ডাকে, 'ভাই হরনাথ।'

হরনাথ বলে, 'কি ভাই হরিনাথ।'

পাড়ার লোক আবার বলাবলি করে, 'হরিনাথ আর হরনাথ, যেন হরি-হর-আত্মা।'